শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
হারিয়ে যাওয়া লেখা

# হারিয়ে যাওয়া লেখা

## প্র থ ম খ ণ্ড

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

# হারিয়ে যাওয়া লেখা

প্র থ ম খ ণ্ড

সংগ্রাহক রঞ্জন মুখোপাধ্যায়

পত্রভারতী

www.bookspatrabharati.com

**প্রথম প্রকাশ** এপ্রিল ২০১৮
**দ্বিতীয় মুদ্রণ** সেপ্টেম্বর ২০১৯

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পত্রভারতী, ৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০০০৯
থেকে প্রকাশিত এবং হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন,
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

**প্রচ্ছদ ও অলংকরণ** সুব্রত মাজি
**ব্যাক কভার পোর্ট্রেট** রঞ্জন মুখোপাধ্যায়



HARIYE JAOWA LEKHA—Vol 1
by Shirsendu Mukhopadhyay
Published by PATRA BHARATI 3/1 College Row, Kolkata 700 009
Phones 2241 1175, 94330 75550, 98308 06799
E-mail patrabharati@gmail.com
visit at www.facebook.com/Patra-Bharati-521504074559888

ISBN 978-81-8374-505-5

" রা-স্বা "

বন্দে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রম

## পত্রভারতী প্রকাশিত বই

হারিয়ে যাওয়া লেখা (দ্বিতীয় খণ্ড)
শীর্ষেন্দু ৭৫
এককুড়ি একডজন
মনের অসুখ
ঈগলের চোখ
ভ্রমণ সমগ্র। ভবকুঁড়ের বাইরে-দূরে
ঝুড়ি কুড়ি গল্প
শীর্ষেন্দু। বিন্দু থেকে সিন্ধু
শীর্ষেন্দুর সেরা ১০১
পাঁচটি উপন্যাস
ময়নাগড়ের বৃত্তান্ত
রূপ মারীচ রহস্য
ভৌতিক গল্পসমগ্র

# কৈফিয়ত

আমি বড় অগোছালো মানুষ। এটা কোনও গুণের কথা নয়। অগোছালো বলে জীবনে আমি বিস্তর কষ্ট পেয়েছি। অনেক মূল্যবান কিছু হারিয়েও গেছে। তার মধ্যে গল্পের ফাইল কপি থেকে আরও অনেক কিছু। এগারোবার বাসা এবং বাড়ি বদল করার ধাক্কাতেও খুইয়েছি অনেক মহার্ঘ সম্পদ। বর্ধমানের রঞ্জন মুখোপাধ্যায় নামে একজন পরম বন্ধুর মতো এগিয়ে না এলে আমার অনেক মুদ্রিত রচনা হারিয়েই যেত চিরতরে। রঞ্জন দীর্ঘকাল ধরে আমার লেখা সংগ্রহ করেছে, ব্যক্তিগত পরিচয় না থাকা সত্ত্বেও। তার সেই সংগ্রহশালাই এই দুই খণ্ড গ্রন্থের উৎস।

অবশ্য গ্রন্থিত সব লেখাই নিরুদ্দিষ্ট ছিল এমন নয়। কিছু লেখার হদিশ ছিল, কিন্তু আমার সংগ্রহে ছিল না। জন্মান্তর লেখাটি সম্ভবত পুজো সংখ্যার আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশ পেয়েছিল। আগাগোড়া সংলাপে লেখা গোটা উপন্যাস, কোথাও কোনও ন্যারেশন নেই। ন্যারেশন বা বিবরণ অংশও সংলাপের অঙ্গীভূত। এ ধরনের লেখা এর আগে কেউ লিখেছেন কিনা আমার জানা নেই। আমি শুরু করেছিলাম একটা পরীক্ষা নিরীক্ষা হিসেবেই। এবং দেখলাম, এভাবেও লেখা যায়।

জলতরঙ্গ দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত আমার প্রথম গল্প। তখন আমার বয়স বাইশ কি তেইশ। এম এ পড়ি এবং হোস্টেলে থাকি। গল্পটা তেমন উচ্চমানের নয় হয়তো, কিন্তু আমার এই লেখালেখির জীবনের সূত্রপাত ওই গল্পটি থেকে। তাই ওই গল্পটির প্রতি একটু দুর্বলতা আমার আছে। কয়েকদিন আগে গল্পটার একটা কপি হাতে এল। পড়বার চেষ্টা করলাম, কিন্তু কয়েক লাইন পড়ে আর পড়তে ইচ্ছে হল না। কেন, কে জানে।

তবে প্রথম খণ্ডে একটা গল্প আছে, ভূতের বাড়ি। কে বিশ্বাস করবে যে, এটা আসলে প্রেমের গল্প? প্রেমের গল্প কতভাবে লেখা যায় তারই একটা কসরৎ করতে গিয়ে এই গল্পটির সৃষ্টি হল।

আমি যে খেলা-পাগল তা অনেকে জানে। আমার কাছে ক্রীড়াভূমির মতো এমন আকর্ষক আর কিছুই নয়। বাল্যে কৈশোরে এমন খেলা নেই যা আমি খেলিনি। দারিয়াবান্ধা, কাবাডি, ক্রিকেট, ফুটবল, ভলিবল, ব্যাডমিন্টন, ডাংগুলি, মার্বেল, হাইজাম্প, লংজাম্প, দৌড়। সবচেয়ে প্রিয় ছিল টেবিল টেনিস। একবার কলেজের চ্যাম্পিয়নও হই। সেই সুবাদেই খেলা বিষয়ক নানা লেখা।

এখন আর রাজতন্ত্র নেই। তবু আমি রাজা বিষয়ক বেশ কিছু গল্প লিখেছি। তার একটা কারণ হয়তো ইংলন্ডবাসীর মতোই আমারও রাজতন্ত্রের প্রতি অমোঘ একটু দুর্বলতা আছে। রাজতন্ত্রের সবটাই খারাপ এমন আমার মনে হয় না। গল্পে রাজাকে একজন মহান ব্যক্তির প্রতীক হিসেবেই চিহ্নিত করেছি। কখনো ট্রাজিক, কখনও সন্ন্যাসী বা নিছক মজার চরিত্র হিসেবে। মনে হয় আমার রাজার গল্পগুলিরও একটা ভিন্ন সংকলন হতে পারে।

হারিয়ে যাওয়া লেখা মানে একটা মিশ্রণ। কিছু গল্প, উপন্যাস, নিবন্ধ, রিপোর্টাজ ইত্যাদি। কাজেই এখানে আমার নানা চরিত্রেরই প্রকাশ।

এখানে কুড়িয়ে বাড়িয়ে কিছু উদ্ধার করা লেখা সন্নিবেশিত হল। আরও কিছু নিরুদ্দেশ লেখা আছে, যা অনেক আগেকার কয়েকটি অপ্রধান, ছোট পত্রিকায় প্রকাশ পেয়েছিল। যদি আমার ভাগ্যক্রমে সেগুলো খুঁজে পাওয়া যায় তাহলে আবার তা নিয়ে পাঠকের দরবারে হাজির হওয়া যাবে।

২১.১.২০১৮
কলকাতা

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

# বিনম্র শ্রদ্ধার্ঘ্য

বাংলা ভাষার কিংবদন্তী কথাসাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়-এর প্রায় দুষ্প্রাপ্য কিছু রচনা পুনরুদ্ধার করে দুই খণ্ডে 'হারিয়ে যাওয়া লেখা' গ্রন্থটি নির্মাণ করা হয়েছে। এর প্রায় পঁচানব্বই ভাগ লেখা বই আকারে কখনো প্রকাশিত হয়নি।

এই সুবৃহৎ সংকলনের দুটি খণ্ডে লেখকের ৬টি উপন্যাস, ৭৩টি বিভিন্ন স্বাদের গদ্য-রচনা ও ৫৭টি ছোট-বড় বিভিন্ন আকারের গল্প সন্নিবেশিত হয়েছে।

পূর্বে গ্রন্থিত যে দু-একটি লেখা এই সংকলনে আছে, সেগুলির অন্তর্ভুক্তি প্রসঙ্গে দু-একটি কথা বলতে হয়। যেহেতু শুরুতে লেখকের 'প্রথম গল্পের জন্মবৃত্তান্ত' শীর্ষক মূল্যবান রচনাটি রাখা হয়েছে, তাই সঙ্গত কারণে তাঁর প্রথম গল্প 'জলতরঙ্গ' এই সংকলনের 'গল্প' বিভাগে সর্বাগ্রে জায়গা দিতে হয়েছে।

শীর্ষেন্দু বাংলা সাহিত্যের শীর্ষবিন্দু। তাঁর বৃহৎ আকারের উপন্যাসগুলি বাংলা সাহিত্যের এক-একটি মাইল ফলক। 'উপন্যাস সমগ্র'-তে সেই বড় মাপের উপন্যাসগুলিকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করে সংকলিত করা হয় এবং তার সঙ্গে ছোট মাপের দু-একটি কাহিনি সংযোজিত হয়। অনেকে তাই এই ধরনের 'সমগ্র' সংগ্রহ করতে অনীহা বোধ করেন। এই সংকলনে গৃহীত 'টানাপোড়েন' উপন্যাসটি সেই রকমই একটি স্বল্প পরিচিত ভিন্ন স্বাদের ছোট উপন্যাস।

এছাড়া এই সংকলনে গৃহীত লেখকের 'অভিযান' নামক অগ্রন্থিত কাহিনিটি একটি অসমাপ্ত উপন্যাস। কিন্তু সম্পূর্ণ কাহিনির একটি সার্বিক আভাস এই রচনায় সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান।

এই সংকলনের সবচেয়ে আকর্ষণীয় জায়গা হল, লেখকের বিভিন্ন বিষয়ক স্বাদু প্রবন্ধমালার উজ্জ্বল উপস্থিতি। খেলাধুলা, সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ক রচনাগুলি ছাড়াও লেখকের একগুচ্ছ অগ্রন্থিত আধ্যাত্মিক রচনা রয়েছে এই সংকলনে। সংযোজিত হয়েছে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের কলমে একমাত্র চলচ্চিত্র সমালোচনাটিও।

এই সংকলনের প্রবন্ধ বিভাগে রইল লেখকের অগ্রন্থিত একরাশ স্মৃতিকথার পসরা, যা পাঠকদের নিয়ে যাবে মায়াময় অতীতের হারিয়ে যাওয়া সময়ের আনন্দ-ভ্রমণে। 'সাহিত্য ও সাহিত্যিক' বিষয়ক রচনাগুলোতে লেখক যেমন নিজের সাহিত্যিক জীবনের গল্প শুনিয়েছেন, করেছেন তাঁর সমসাময়িক লেখকদের উপন্যাস নিয়ে আলোচনা, তেমনি তিনি করেছেন আশাপূর্ণা দেবী, কমলকুমার মজুমদার, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, সমরেশ মজুমদার, বুদ্ধদেব গুহ, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, সাগরময় ঘোষ প্রমুখদের মতো বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের নিয়ে স্মৃতিচারণা।

অঞ্জন দত্তর গানের সেই বিখ্যাত লাইন মনে পড়ে? 'তুমি না থাকলে তোমার চিঠি জমানোই হত না!' হ্যাঁ, এখানেও কথাটা একশো ভাগ সত্যি! শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের সোনার কলমটি না থাকলে ছড়ানো-ছিটানো এই মণিমুক্তগুলো সংগ্রহ করে রাখাই হত না। তাঁর লেখনী আশৈশব আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এই সংকলনটি তাঁর প্রতি আমার বিনম্র শ্রদ্ধার্ঘ্য।

পত্রভারতী প্রকাশনার কর্ণধার ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রশ্রয় ছাড়া এই মহাগ্রন্থটির নির্মাণ কখনোই সম্ভব হয়ে উঠত না। তাঁকে ধন্যবাদ দেওয়ার স্পর্ধা আমার নেই। চুমকি চট্টোপাধ্যায় উৎসাহ ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে পাশে থেকেছেন, তাঁকে অজস্র ধন্যবাদ। এই গ্রন্থটির গবেষণা পর্বে প্রধান সহায়ক হিসেবে পাশে থেকেছেন বন্ধু সন্দীপ মণ্ডল। তাঁকে ধন্যবাদ দেওয়া বাতুলতা। ধন্যবাদ প্রাপ্য আমার মাতৃদেবী ও অর্ধাঙ্গিনীসমেত আমার বৃহত্তর পরিবার এবং সংশ্লিষ্ট পত্রভারতীর সকল কর্মীবৃন্দের।

এবার পাঠকদের কোর্টে বল। তাঁদের প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষায় রইলাম।

রঞ্জন মুখোপাধ্যায়

১লা জানুয়ারি ২০১৮
শ্রীপল্লী, বর্ধমান

# সূচিপত্র

# উপন্যাস

# চোর ও রমণী

১

জেল খেটে গাঁয়ে ফিরছিল রঘু। বর্ষা শেষ হয়ে আসছে। আকাশে মেঘের রাজ্যে এখন ভাঙা হাট। তেমন জোট বেঁধে উঠতে পারে না। ছানাকাটা দুধের মতো কেটে যায়। টুকরো টুকরো মেঘ দিশেহারা হয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে। এই সব মেঘের খেলাটেলা দেখার খেয়াল হয় না রঘুর। তার বিশ্বাস, ওপরের দিকটায় কিছু নেই তেমন। ওই সনাতন চাঁদ সূর্যি আর ফ্যাকাশে আকাশ। তার চোখ বরং নীচের দিকটায় খোঁজে। যা কিছু মাল সামলত তা নীচের দিকটাতেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

বাড়ি যাওয়ার তাড়া নেই তেমন। তার জন্যে পা ছড়িয়ে তো কেউ বসে নেই সেখানে। ট্রেন থেকে নেমে প্ল্যাটফর্মেই খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে চারদিকটা দেখল সে। দেখার অবিশ্যি কিছুই নেই। সেই পুরনো স্টেশনঘর, সেই লোহার বেড়া, চৌহদ্দির বাইরে সেই সব গুমটি ঘরের মতো চা-বিস্কুট, পান-বিড়ি, সেলুন আর সস্তা মিষ্টির দোকান। এ সব ছাড়ালে একমুঠো গঞ্জের এলাকা, তারপর খেত। আলপথ ধরে পাক্কা তিনটি মাইল হাঁটলে তবে তার মুকুন্দপুর গ্রাম। আজকাল খালের ওপর পাকা পোল হওয়ায় বাস আর ভ্যানগাড়িও যায়। তবে সে মেলা ঘুরপথ। বাড়িতে তার তেমন সুবিধেও নেই। একফালি বাড়িতে বাইরের উঠোনের দিকে একখানা টিনের ঘর আছে তার। নড়বড়ে দরজা, পাল্লা-ভাঙা জানলা, ভিতরে একখানা তক্তপোশ। চট পেতে তাইতেই শোয়ার ব্যবস্থা। বাড়ির লোকজন কেউ তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না। বুড়ি মা এখনও বেঁচে আছে বটে, কিন্তু তার মুখদর্শনও করে না। দাদার পিওনের চাকরি। বউ-বাচ্চা নিয়ে তার মাখো-মাখো সংসার।

সেখানে চোরের ছায়া পড়লেও অমঙ্গল। দুটো বোনের বিয়ে হয়ে গেছে কবেই, কিন্তু তারা ভয়ে তাঁকে ভাইফোঁটা দিতেও ডাকে না। এ সব বিচার করলে রঘুর বাড়ির মায়া না থাকারই কথা। নেইও। কাজেই সে বিশেষ উতলা হল না। স্টেশন থেকে বেরিয়ে বিনোদ মান্নার চায়ের দোকানে গিয়ে বসল।

বেলা বারোটা বেজে গেছে। দোকানে তেমন খদ্দের নেই। বিনোদ মান্না তাকে দেখে বিরল মুখে বলল, কবে খালাস পেলি?

আজ সকালে।

এবার যেন কয় মাসের মেয়াদ ছিল?

তিন মাস।

তোর তো সবই পেটি কেস!

পেটি কেস যে নাক সিঁটকানোর ব্যাপার সেটা রঘু বোঝে। দুনিয়ায় ছোট আর মাঝারির কোনও দাম নেই। শ্রদ্ধেয় পুলিশবাবুরাও তাকে নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায় না। তবে এলাকায় চুরিটুরি হলে তাকে ধরে নিয়ে কেস ঠুকে দেয়। একমাত্র সেই জানে সবকটা কেস তার নয়। তবে জেলখানা কিছু খারাপও লাগে না তার। দোবেলা পেটের চিন্তা নেই। ধান্দাবাজির ব্যাপার নেই। গতরে খেটে দাও, খাও, সাঁঝবেলায় টেনে ঘুম লাগাও। ত্রিশের কাছাকাছি বয়সে এ যাবৎ বার দশেক ছোটখাট মেয়াদ খাটতে হয়েছে তাকে। তল্লাটের দারোগা বিষ্ণুবাবু একবার তাকে বলেছিলেন, বুঝলি রঘু, চোর-চোট্টা-বদমাশ ছাড়া দেশ চলে না। সমাজে সবরকমই লাগে।

গারদ থেকে বেরলে দুনিয়াটা বড্ড বড় আর উদোম মনে হয়।

চায়ের নেশা নেই রঘুর। মিষ্টি-মিষ্টি লাগে, গন্ধটাও গাছাপালার জংলা গন্ধের মতো। বেশ লাগে, তাই মাঝে মধ্যে খায়। সেই হিসেবে বিনোদ মান্নার চা বেশ ভালো।

তা ইদিককায় খবর-টবর কি গো বিনোদদা?

বিনোদ তলচক্ষুতে তার দিকে চেয়ে বলল, কীসের খবর চাস?

এই দেশগাঁয়ের খবরটবর, চাষবাস কীরকম হল, কেচ্ছাটেচ্ছা কিছু শুনলে কি না।

বাপরে! দেশগাঁয়ের জন্য বড় দরদ দেখছি!

বিনোদ তাকে পছন্দ করে না। বিনোদের আর দোষ কী, রঘুকে পছন্দ করে এমন লোক সাত গাঁয়ে ঘুরেও পাওয়া যাবে না। দুঃখের কথা হল, রঘু একবার বিয়েতে বসেছিল সেই বছর পাঁচেক আগে। জৌগ্রামের সদাশিব দাসের মেয়ে বিউটি। দেখতে ট্যাপাটোপা পুতুল-পুতুল, কালোপানা। মন্দ ছিল না। কিন্তু টিকতে পারল কই। সেই বছর কপালদোষে বিয়ের পর ন মাসে তিনবার পুলিশ গিয়ে তুলে আনল তাকে। আর গোবিন্দপুরের হাটে তামাকের ব্যাপারি মৃত্যুঞ্জয়ের তহবিল ভাঙার জন্য হাটুরে মার খেল। নতুন বউ তখনই ব্যোমকে গিয়েছিল। তবু কষ্টেসৃষ্টে বছরটাক ছিল টিকে। তারপর সদাশিব একদিন দলবল নিয়ে এসে হাজির। বলল, জামাইয়ের জন্য নাকি তার ভারি বদনাম হচ্ছে। গাঁয়ে লোকে দুয়ো দিচ্ছে তাকে। সে ছাড়ান কাটান চায়। কেউ আপত্তি করল না। বউটা পর্যন্ত এই প্রস্তাবে ডগোমগো হয়ে তাড়াতাড়ি জিনিসপত্র গুছিয়ে বিদেয় হয়ে গেল। রঘু সেই থেকে স্থির বুঝে গেছে তাকে ভালো চোখে দেখার লোক নেই কেউ।

বিনোদের একটা মুদ্রাদোষ আছে। একটা ঝাড়ন দিয়ে বার বার সামনের টেবিলটা ঝাড়ে আর মোছে। বরাবর দেখে এসেছে রঘু। মুছতে মুছতে হঠাৎ বলল, শিবু কার জন্য মেয়ে দেখেছে রে? তোর জন্য নাকি?

শিবু হল গে রঘুর আপন মায়ের পেটের দাদা। চা শেষ করে উদাস চোখে বাইরের নর্দমার ধারে বসা একটা কাকের দিকে চেয়ে রঘু বলে, কী যে বলো বিনোদদা! আমার জন্য মেয়ে দেখবে দাদা? আমার কপালে দাদায় আর তালুইমশাইতে তফাত নেই।

তবু ভালো। আমি ভাবলুম তোর মতি ফেরাতে বিয়ের জোগাড়যন্তর করতে লেগেছে বুঝি।

বয়সের শালা আছে একটা। তার জন্যই হবে হয়তো। শালা পঞ্চায়েতে জিতেছে। দিব্যি আছে এখন। দুটো পয়সা আসছে হাতে।

তুই তা হলে খবরটবর পাসনি। তোকে খবর দেবেই বা কে?

জেলের হাজাম ব্যাটা উলটোপালটা ক্ষুর চালিয়েছে। তখনই টের পেয়েছিল রঘু। বাঁ গালে দাড়ির গোড়া কেটে গিয়ে জ্বালা করছে তখন থেকে। গালটায় একবার খড়খড়ে হাতটা বুলিয়ে নিয়ে বলল, তোমার কাছে তো খবর জানতে চাইলুম। তখন তো মুখে পিঠে গুঁজে রইলে।

তা আমি কী করে জানি যে, তুই খবর পাসনি!

খবরটা কী?

শিবুর বউটা মরেছে যে!

মরেছে! বলে সত্যিকারের অবাক হল রঘু। বউদির বয়স তো বেশি নয়। মেরেকেটে পঁচিশ-ছাব্বিশ হবে। দু-দুটো বাচ্চা। তেমন শোকতাপ নয়, তবে রঘুর মনটা একটু খারাপ হল। কারও মরার খবর পেলে যেমনটা হয়।

জীবনের অনিত্যতার কথা ভেবেই বুঝি রঘু একটু উদাস হয়ে গেল। মিয়ানো গলায় বলল, মরল কীসে? তরতাজা মানুষটা! বয়সও তো বেশি নয়!

সেইখানেই তো গেরো রে। আর তাই নিয়েই হলুস্থুলুস।

অত টিপে টিপে বলছো কেন? উবুড় করে ঢালো তো বাপু।

প্রথমে তো শুনেছিলুম সাপকাটিকে মরেছে। ভোরবেলা মাঠ সারতে গিয়েছিল, তখনই ঠুকে দেয়। কিন্তু শিবুর শালা সম্বন্ধীরা শোরগোল তুলল, বিষ খাইয়ে মেরে সাপকাটি বলে চালাচ্ছে। শ্বশুরবাড়ির লোকেরা বিস্তর হুজ্জত বাঁধিয়ে দেয়। থানায় ধরেও নিয়ে গিয়েছিল শিবুকে। তবে শেষ অবধি নালিশ টেকেনি। শালার সঙ্গে সেই থেকে শিবুর সম্পর্ক ডাউন মেরে গেছে।

রঘু আরও একটু ভেবে বলল, অঙ্ক মিলছে না।

তার মানে?

বছর দুই অগে দাদা খরচাপাতি কবে সেপটিক ট্যাংক সমেত পাকা পায়খানা আর টিউবওয়েল বসাল যে! বউদির মুখনাড়া খেয়েই তো! ঘরে পাকা ব্যবস্থা থাকতে মাঠে যাবে কেন?

তা অনেকে যায়। আমারও গেল বার পাকা ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু আমার বাপু বন্ধ ঘরের মধ্যে বসতে বড় ঘেন্না হয়। গাড়ু নিয়ে খোলা মাঠে বাতাসের মধ্যে গিয়ে বসবার আরামই আলাদা।

তা হবে হয়তো! আমি আর তাদের কতটুকু খবর রাখি বলো। সম্পর্কই ছিল না।

কথাটা হল, শিবু মেয়ে দেখে বেড়াচ্ছে। তা হ্যাঁরে, বউটা মরতে না মরতেই কি শিবু ফের বিয়ের জন্য হেঁদিয়ে পড়ল নাকি?

তা তো হতেই পারে। ঘরে দুটে কচি বাচ্চা। তাকে দেখে কে বলো। আমার মায়ের হাড় মটমটি ব্যারাম, মা পেরে ওঠে না। ফের বিয়ে বসলে দোষটা হচ্ছে কোথায়? বত্রিশ-তেত্রিশের বেশি বয়সও হয়নি দাদার।

সে একটা ছেড়ে দশটা করুক না, কার কী? কিন্তু চিতেটা যে এখনও ভালো করে জুড়োয়নি। এত তাড়াতাড়ি নতুন বউ আনলে পাঁচজেনে পাঁচ কথা বলবে যে!

কিছু লোকের কাজই তো কথা কওয়া। আমাকে নিয়েও কি কম বলে!

আমার মনে হয় শালা সম্বন্ধীরা হেনস্থা করেছিল বলেই বোধ হয় তাদের জব্দ করার জন্য কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে। আর একটা বিয়ে করে তাদের পালটি দেবে।

তাও হতে পারে।

রঘু উঠে পড়ল। মনটা বড্ড ভার-ভার লাগছে। এরকমটা তার লাগে না বড় একটা। তার মায়া-দয়া বলে কিছু নেই এমনটাই সবার ধারণা, তার নিজেরও তাই। আর বউদি বাসন্তীর সঙ্গে তার সম্পর্কটাও

খাড়াখাড়িই। সেবার ম্যালেরিয়া হয়ে শীতে কোঁ কোঁ করতে করতে সে বেভুলে ভিতরবাড়িতে গিয়ে সামনে বউদিকে পেয়ে তাকেই বলেছিল, তোমাদের লেপ-কম্বল কিছু অছে? দাও তো, চাপা দিয়ে পড়ে থাকি। তাতে বউদি এমন খ্যাঁকাল যে ম্যালেরিয়াই পালিয়ে গেল রঘুর দেহ ছেড়ে। কাজেই দাদার বউ মরেছে বলে তার দুঃখ হওয়ার কারণ নেই।

খিদেটিদে পাচ্ছে না আজ। তিন মাইল পায়ে পায়ে উড়ে গেল, খিদে তেষ্টা হওয়ার কথা। কিন্তু আজ যেন ভেতরটা একদম থম মেরে আছে।

সুন্দরজ্যাঠার সঙ্গে মুকুন্দপুরের রথতলাতেই দেখা হয়ে গেল। মাথায় ভাঁজ করা ভেজা লাল গামছা। শীলতাপুকুরে চান করে ফিরছে। এই পুকুরের জল নাকি ভালো। ডুব দিয়ে চান করলে হাঁপানি সেরে যায়। তাকে দেখে জ্যাঠা থমকে গেল।

কে রে! রঘু নাকি?

এই এলাম জ্যাঠা।

কোথা ছিলি? দেখিনি তো এতদিন! ফের হাজতে পুরেছিল নাকি?

তিন মাস।

করেছিলিটা কী? চুরি-জোচ্চুরি নাকি?

পুলিশ শালারা আর লোক খুঁজে পেলে তো!

চুরি-জোচ্চুরি ছাড়া তোদের আর উপায়টাই কী বল! যা দিনকাল পড়েছে। যে লাইনেই যাস, চুরি না করলে উন্নতি নেই। পুলিশগুলোই বা চোর ধরে কোন লজ্জায়? ওদের মতো চুরি করতে পাকা চোরেরও চক্ষুলজ্জা হবে। তা যা বাপ, ঘরে যা। বুড়ি মা হয়তো চোখের জল ফেলছে। মা-মরা নাতি-নাতনি নিয়ে নাস্তানাবুদ। শুনেছিস তো সব!

শুনেছি।

ঘরে তালা নেই। নারকেলের দড়ি দিয়ে করা দুটো বাঁধা। বাঁধন এখনও অটুট। চোর এ ঘরে ঢুকবে না, তবে কুকুর বেড়াল ঢুকে নোংরা করে যায় বড়।

দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে রঘু দেখে, ধুলো বড় কম জমেনি। ধুলোর সর পড়ে আছে সারা ঘরে। আর তেমনি মাকড়সার জাল। কুঁজোটা ঠনঠন করছে শুকনো। তক্তপোশের ওপর দুখানা চট গুটিয়ে রাখা। ওইটেই তার বিছানা।

ক্ষয়া একটা ঝ্যাঁটা দিয়ে খানিকক্ষণ ধুলো ওড়াল রঘু। ঝ্যাঁটায় ধুলো যায় না। ধুলো এক জায়গা থেকে উড়ে আর এক জায়গায় বসে। যতদূর সম্ভব ঘরটাকে ঝ্যাঁটাপেটা করে কুঁজোটা নিয়ে ভিতরবাড়ির দিকে গেল সে। বাঁশের বেড়ার ঘেরের ও পাশে উঠোন। একপাশে দাদার ঘর, দাওয়া। আর ভিতরদিকে তার কাকাদের অংশ।

কল পাম্প করার শব্দে মা বেরিয়ে এল।

কে রে কল ঝাঁকাচ্ছিস?

আমি মা। আমি রঘু। জল নিচ্ছি।

বড্ড রোগা দেখাচ্ছে মাকে। চুলগুলো আরও পেকেছে, কেমন উলোঝুলোও বটে। তা বয়সও হচ্ছে। উঠতে বসতে হাঁটু আর কোমরে মট মট শব্দ হয়। মাঝে মাঝে ব্যথায় বিছানা ছাড়তে পারে না। চোখ দুটো বেশ গর্তে ঢুকে গেছে। রঘুর দিকে বিরস মুখে চেয়ে থেকে বলল, যখন তখন ধূমকেতুর মতো এসে হাজির হলেই হল? বলি এটা গেরস্ত বাড়ি, নাকি?

কথাটার খোঁচা ঠিক ধরতে পারল না রঘু। তবে খোঁচা একটা থাকেই। কিন্তু ও সব কোনওদিনই গায়ে মাখে না রঘু। সেই ছেলেবেলা থেকে রঘুর একটাই গুণ, কক্ষনও মেজাজ খারাপ করে না, মাথা গরম করে না। কারও সঙ্গে আজ অবধি ঝগড়া করেনি সে। বিউটি যে মাঝে মাঝে মা-বাপ তুলে তার বিষ ঝাড়ত,

তাতেও কখনও রঘুর মেজাজ খারাপ হয়নি, উলটে গালগাল দেওয়া বা গায়ে হাত তোলার ইচ্ছে যায়নি। বরং হাসি-হাসি মুখ করে শুনে গেছে। তাতে অবশ্য আরও খেপে যেত বিউটি। বর পালটি না দিলে মেয়েদের সুখ কী? পুরুষটাকে খেপিয়ে বেহেড পাগলা ষাঁড়ের মতো করে না তুললে বাক্যবাণের নিরখ পরখ হয় না যে!

ভারি মোলায়েম গলায় রঘু বলল, বড় তেষ্টা পেয়েছে তো, তাই।

শিবু গাঁটের পয়সা খরচা করে কল বসাল কি তোর জন্য? বাইরের পাতকো থেকে নিতে পারিস না? জেল-খাটা শয়তান, বেহায়া, মুখে যেন মধু ঝরছে দেখ! হায়া-লজ্জা বলে যদি কিছু থাকে।

কুঁজো ভরে ঘরে ফিরে এল রঘু। কাল থেকে পাতকোর জলই নিতে হবে। বছরটাক হল পাতকোর জল ঘোলাটে মেরে গেছে একটু। গাছের পাতাটাতাও পড়ে তাতে। ইদানীং কাকাদের অংশেও টিউবওয়েল হয়ে যাওয়ায় পাতকোটার তেমন ব্যবহার নেই। তা হোক, রঘুর আর জলের বিচার করে কী হবে? তার একটা হলেই হল।

খুব যে তেষ্টা পেয়েছে তা নয়। তবু ঘরে এসে কুঁজোটা উঁচু করে ঢকঢক করে খানিকটা ঠাণ্ডা জল খেয়ে নিল সে। দুপুর বেশ তেজালো। সে জানে, একটু বাদেই খিদে পাবে। আর খাওয়া বেশ হাঙ্গামার ব্যাপার। চাল ডালের জোগাড় নেই, কেরোসিন নেই, ঘরের কোণে একটা পুরনো জনতা স্টোভ আছে বটে, কিন্তু সেটাও ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়ার কথা। মেটে হাঁড়ি আর কলাইয়ের থালা অবশ্য আছে, কিন্তু সেগুলো এখন মাজে ঘষে কে? খুব খিদে পেলে বরং মুড়িটুড়ি চিবিয়ে থেকে যাওয়া যাবে। জেলখানায় আর যা হোক এ সব হ্যাপা ছিল না। ঘোর দুপুরে এখন পাওয়াও যাবে না কিছু। দোকানের ঝাঁপ ফেলে দোকানিরা বাড়ি গেছে। বিকেলবেলা বরং ভেবে দেখলে হবে।

শরীরে তাব কোনও আলস্যি নেই। দরকার হলে নাগাড়ে খাটতে পিটতে পারে। পেটাই চেহারা তার, জেলখানার অখাদ্য খেয়েও টসকায়নি। সুতরাং তিন মাইল হেঁটে তার মোটেই জিরোতে ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু দুপুরবেলাটায় লোকজন পাওয়া মুশকিল। কাছেই সে চটটা বিছিয়ে নিয়ে তক্তপোশে একটু শুল। শুয়ে শুয়ে মতলব আঁটতে মন্দ লাগবে না।

আচমকা দেখলে দরজার ফাঁকে একটু মুণ্ডু। কে যেন উঁকি মেরে দেখছে তাকে।

কে রে?

বছর দুয়েকের রোগা-ভোগা লগবগে চেহারার একটা ছেলে আড়াল থেকে বেরিয়ে দরজার চৌকাঠে দাঁড়াল। মাথায় এক টোকা চুল, গায়ে একটা ময়লা হাতকাটা গেঞ্জি, পরনে পেন্টুল। কেমন যেন ভাসন্ত চোখ। এ হল মনো, তার দাদা শিবুর ছেলে। বারণ আছে বলে মনো বা তার দিদি মিতুল কখনও রঘুর ধারেকাছে আসে না।

রঘু উঠে বসে বলল, কী রে মনো? কিছু বলবি?

আমার মা মরে গেছে, জানো?

জানি। আয়, তক্তপোশে উঠে বোস এসে।

আজ নির্দ্বিধায় মনো এসে তক্তপোশের একধারে উঠে ঠ্যাং ঝুলিয়ে বসল। ভারি শান্ত ভাব।

চুল ছাঁটাসনি কেন? তোর মাথায় তো জট পড়ে গেছে।

সেই যে ন্যাড়া হয়েছিলুম, আর ছাঁটা হয়নি। মা থাকলে ঠিক ছাঁটিয়ে আনত।

রঘু পাষণ্ড বটে, কিন্তু এ কথাটায় তার মনটা খারাপ হল। এই যে তার মা তাকে এত মুখ করে, দু চোখের বিষ মনে করে, ছেলেবেলায় তো এমন ধারা ছিল না। তখন আলাই-বালাই থেকে মা-ই তো সেঁটে রাখত বুকে!

আজ ইস্কুলে যাসনি বুঝি?

গিয়েছিলাম। হাফছুটি হয়ে গেছে।

কীসের ছুটি তা আর জিগ্যেস করল না, রঘু। ইস্কুল-টিস্কুল নিয়ে তার তো মাথাব্যথা নেই।
মায়ের জন্য কষ্ট হচ্ছে খুব?
মনো নীরবে মাথা নেড়ে না জানাল। তারপর মুখেও বলল, না।
কচি মুখখানায় কান্না যে থম ধরে আছে তা বুঝতে কষ্ট নেই। কিন্তু এই শোক ভোলাবে সেই সাধ্য কি তার আছে!
বাবা আমাদের সৎ মা আনবে, জানো?
তাই বুঝি?
হ্যাঁ। বাবা বিয়ে করবে। তারপর সৎ মা এসে আমাদের খুব নাকি পেটাবে, খেতে দেবে না, কথা না শুনলে ঘর থেকে বের করে দেবে।
দূর! সৎ মা কি আর অত খারাপ হয় রে! কে বলেছে তোকে ও সব?
সবাই বলছে তো। বিঙ্গিপিসি, নরেনদাদু, কেতো, ফুলু সবাই বলে।
কী হয়েছিল তোর মায়ের, জানিস?
জানি। সাপে কামড়েছিল।
কীভাবে, কোথায় কামড়েছিল শুনেছিস?
ভোরবেলা। মা মাঠপানে গিয়েছিল, তখন। আমরা ঘুমোচ্ছিলাম।
তোর মা মাঠে গেল কেন? তোদের তো পায়খানা আছে।
কী জানি। বলে মনো ঠোঁট ওল্টাল। তারপর একটু ফাঁক দিয়ে বলল, পায়খানা নোংরা হয় বলে যেত না। আমরাও তো বাগানের বেড়ার ধারে বসে—
তাই বল।
সাপটাকে তুমি মারতে পারবে?
তা পারব না কেন? মারতে চাস?
হ্যাঁ। সাপটাকে কিন্তু মারতেই হবে। তুমি ঠিক পারবে।
তুই কী করে জানলি যে আমি পারব?
সবাই তো বলে, তুমি নাকি সব পারো!
রঘু অবাক হয়ে বলে, কে বলে রে?
সবাই তো বলে তোমার গায়ে নাকি ভীষণ জোর আর খুব সাহস। তুমি নাকি একাই দশটা ডাকাতকে মেরে ঠান্ডা করে দিতে পারো। উঁচু উঁচু দেয়াল নাকি লাফ দিয়ে পার হয়ে যাও...
দূর দূর। কে বলেছে ও সব কথা?
বৃন্দাদিদি বলে, দমনদা বলে, ইন্তি বলে। স্কুলের বন্ধুরাও বলে।
বাজে কথা বলে রে। আমি মোটেই ওরকম নই। আর তোর ঠাকুমা, কিংবা বাবা কী বলে, মা-ই বা কী বলত?
ওরা তোমাকে দু চোখে দেখতে পারে না। মা বলত, তোর কাকা একটা ভীষণ খারাপ লোক, খবরদার ওর ধারে কাছে যাবি না!
ঠিকই বলে রে। আমি বেশ খারাপ একটা লোক।
কিন্তু আমি তোমার কাছে আসব। সাপটাকে তুমি মেরে দেবে তো!
সাপ মারা এখন কিছু শক্ত কাজ নয়। একখানা লাঠি থাকলে তুইও পারিস। আমি বরং সাপটাকে ধরে দেবো, তুই মারবি।
পারবে? সাপ তোমাকে কামড়াবে না?
কায়দা করে ধরলে কি আর কামড়াতে পারে? সাপ তো আসলে বোকা জীব।

মা'কে কামড়াল কেন বলো তো। মা'র মুখে ফেনা উঠছিল, চোখ উলটো হয়ে গিয়েছিল...

ও সব তোকে ভাবতে হবে না। চল, বরং একটু ঘুরেটুরে আসি। দুপুরে ভাত খেয়েছিস তো!

খেয়েছি। তুমি খাওনি?

আমি খেয়ে এসেছি। চল।

মনো আপত্তি করলো না। টপ করে রঘুর হাত ধরে নেমে পড়ল চৌকি থেকে।

হ্যাঁরে, এই যে আমার ঘরে এলি তোর বাবা আর ঠাকুমা আবার রাগ করবে না তো!

কী জানি! করতেও পারে। আমি চুপ করে চলে এসেছি।

গাঁয়ের রাস্তাঘাট যেমন হয়। জলকাদায় গ্যাদগ্যাদে হয়ে আছে। আল মাড়ানো কাদা এখনও রঘুর চটিতে মেখে আছে। প্যান্ট আর হাওয়াই শার্টের পিছনটাও চিত্রবিচিত্র হয়ে আছে তা রঘু ভালোই জানে। ডাঙা দেখে দুজনে এগোতে লাগল। তার চেয়ে বরং মনোই এ সব রাস্তাঘাটকে চেনে ভালো।

কোথায় যাবে কাকা?

এই একটু ঘুরেটুরে দেখি।

এতদিন তুমি কোথায় ছিলে?

আমাকে পুলিশে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। জেলখানায় ছিলাম।

পুলিশ মারে, তাই না?

তা মারে।

তোমাকেও মেরেছে?

তা কি আর মারেনি!

তুমিও মেরেছ?

ওরে বাপ রে! পুলিশকে মারলে রক্ষে আছে?

ওই যে গোবিন্দজ্যাঠার বাড়িটা দেখেছ?

কেন রে, গোবিন্দদার বাড়িতে কী?

গোবিন্দজ্যাঠার বোনের সঙ্গে নাকি বাবার বিয়ে হওয়ার কথা ছিল? শিবানীপিসির সঙ্গে।

তাই নাকি? ঠিক হয়ে গেছে?

না। হবে না। শিবানীপিসি আমাকে আর দিদিকে পছন্দ করে না।

রঘু একটু হেসে বলল, ও সব শুনিস বুঝি আড়াল থেকে?

বাবা আর গোবিন্দজ্যাঠাতে একদিন কথা হচ্ছিল যে উঠোনে বসে।

ও সব শুনতে যাস কেন! বড়দের কথা না শোনাই ভালো। আজ নয়নপুরের হাট। চল বরং হাটটা দেখে আসি।

তোমার কাছে পয়সা আছে?

আছে কিছু। কেন?

একটা ক্রিকেটের ব্যাট কিনে দেবে? বাবাকে কতবার বলেছি, বাবা কেবল রেগে যায়।

পয়সায় কুলোলে দেব। চল দেখি। হাঁটতে পারবি তো অত দূর?

খুব পারব। চলোই না।

নয়নপুর বেশি দূরে ন। মাইল দেড়েক রাস্তা। খানিকক্ষণ কাঁচা রাস্তার পর বেশ পাকা রাস্তা পাওয়া যায়। বড্ড মায়া হচ্ছিল রঘুর। এই যে রোগা ছেলেটা লগবগ করতে করতে তার পাশে পাশে হাঁটছে একে এতদিন তো আপনজন বলে মনেই হয়নি। কোলেকাঁখে নেওয়ারও মওকা পায়নি। আজ আচমকা এসে তার সঙ্গে ভাব করায় এখন ভিতরটায় একটা মায়া তৈরি হল। এইভাবেই হয় বোধ হয়। তার ওপর রক্তের সম্পর্ক তো!

তা ব্যাট-বল হল, জিলিপি-শিঙাড়া হল। আর হাট দেখে মনোর মুখচোখের সেই জলে-ডোবা ভাবটা উবে গিয়ে ভারি ডগোমগো দেখাতে লাগল। নয়নপুরের হাটের তেমন চেকনাইও কিছু নেই যে, দেখে লোকে মোহিত হবে। কিন্তু মনোর কাছে এটুকুই অনেক। তাকে তো কেউ এমন আদর করে হাটেটাটে নিয়ে যায় না।

ফেরার সময় হাঁটতে হাঁটতে মনো বলল, তোমার সাইকেল নেই, না কাকা?

না রে। সাইকেলের কথা কেন বল তো! পা ব্যথা করছে নাকি?

মনো লজ্জা পেয়ে বলে, না না।

আয় আমার কাঁধে উঠে পড়। খানিক দূর তো তোকে কাঁধে নিয়ে যাই।

লজ্জা পেয়ে খানিক 'না না' করল বটে, শেষ অবধি উঠেও পড়ল কাঁধে। হালকা-পলকা ছেলে, কাঁধে যে কিছু আছে তা টেরই পাচ্ছিল না রঘু। মাইলটাক অনায়াসে বয়ে আনল।

তারপর মনো বলল, এবার নামিয়ে দাও কাকা। বন্ধুরা দেখতে পেলে খ্যাপাবে।

গাঁয়ের কাছেপিঠে এসে নামিয়ে দিল মনোকে। বলল, হ্যাঁরে মনো, ঠাকুমা জিগ্যেস করলে কী বলবি?

তোমার কথা বলব না? বললে বকবে নাকি?

ধন্দে পড়ে রঘু বলে, তাই বলিস। যদি বকে তো পরে অন্য কিছু ভেবে দেখা যাবে।

## ২

কুমুদিনীর দুটো ব্যথা। একটা হল তলপেট, আর একটা বীরেন সাধুখাঁ। প্রথম ব্যথাটা হয় ঋতুমতী হওয়ার সময়। সে এমন ব্যথা যে শয্যা নিতে হয়। ডাক্তার অবশ্য বলে, ভয়ের কিছু নেই। অনেকেরই হয়। দ্বিতীয় ব্যথা বীরেন সাধুখাঁ। বয়স্ক মানুষ। লোকটা এল আই সি-র এজেন্ট, জমির দালাল রেজিস্ট্রি অফিসের মুহুরি, হোমিওপ্যাথ, টাইপিস্ট এবং ঘটক। কোনটা তার আসল পেশা তা বুঝে ওঠা মুশকিল। তবে লোকে বলে বীরেন সাধুখাঁ দলিলটা লেখে বড় ভালো। তার বাংলা দলিল গোটা গোটা পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লেখা, যে-কেউ পড়ে ফেলতে পারে। আর তার আসল রোজগারও ওই থেকে। মফস্সলের রেজিস্ট্রি অফিসে কম্পিউটার চালু হওয়ার আশু সম্ভাবনা খুবই কম। তবু কে যেন বীরেনকে বুঝিয়েছে কম্পিউটার এলে তার রোজগার বন্ধ হবে। সেই ভয়ে বুড়োবয়সে এখন তার কম্পিউটার শেখার বাই চেপেছে।

কুমুদিনীর কম্পিউটার সেন্টার তিন বছর হল চালু হয়েছে। রোজগারের জন্য ততটা নয়, কারণ তার শ্বশুরবাড়ির অবস্থা খুবই ভালো। গঞ্জে তাদের কাপড়-জামার বিরাট পাইকারি কারবার, মংলাহাটে তাদের বড় সাপ্লাই যায়। কম্পিউটার নিয়ে বিসিএ পাশ করা ছিল বলে শখ হয়েছিল কম্পিউটার শেখানোর একটা সেন্টার খোলার। শুনেই শাঁসালো শ্বশুর তক্ষুনি ঝা-চকচকে একটা সেন্টার খুলে দিল। গোটা পাঁচেক কম্পিউটার, চেয়ার, টেবিল, টেলিফোন, ইন্টারনেটের ব্যবস্থা এবং জেনারেটর—কোনও ব্যবস্থারই ত্রুটি নেই। ছাত্রছাত্রীও হল মন্দ নয়। ট্রেনার বেশি পাওয়া যায় না এখানে। জনা তিনেক মোটামুটি ট্রেনার দিয়ে ঠিকা কাজ চালানো হচ্ছে। বেশিরভাগ খাটুনি কুমুদিনীরই।

একদিন ধুতি আর ময়লা পাঞ্জাবি পরা বীরেন সাধুখাঁও এসে হাজির। হ্যাটা করার উপায় নেই, বীরেন সাধুখাঁ আবার তার শ্বশুরমশাইয়ের বিশেষ বন্ধু। তিনি কম্পিউটারে বাংলা লেখা শিখতে চান। সেটা আর এক গেরো। কুমুদিনী ছাড়া বাংলা কী-বোর্ড সম্পর্কে কেউ কিছু জানে না।

প্রথমে ব্যাপারটা পাশ কাটাতে কুমুদিনী বলল, দলিল লেখার জন্য বাংলার দরকার কী? ইংরেজিতে লিখলেই তো হয়। আর টাইপ তো আপনি জানেনেই।

সে হবে না মা। চিরকাল বাংলায় লিখে এসেছি, বুড়ো বয়সে ইংরেজিটা আর সাপটে উঠতে পারব না। কাঁচা বয়সের মাথায় নতুন জিনিস সহজেই বসে যায়, বুড়ো বয়সের পেকে যাওয়া মাথায় ঢুকতেই চাইবে না। আর গাঁয়ের লোকেরাও ইংরেজি দলিল সন্দেহের চোখে দেখে। ভাবে, কী জানি কোন ক্লজ ঢুকিয়ে দিল।

অগত্যা বাংলা সফটওয়্যার জোগাড় করে বীরেনকে শেখাতে বলল সে। আর তখনই ব্যথাটা শুরু হল। তার কারণ বীরেন আজ যা শেখেন কাল তা ভুলে যান, এখন যা শেখেন তখন তা ভুলে মেরে দেন। বকুনি দেওয়ার উপায় নেই। বয়স্ক মানুষ, তার ওপর শ্বশুরের বন্ধু। কিন্তু ধৈর্য রাখাই কঠিন। কুমুদিনী ক্লান্ত হয়ে পড়লেও, বীরেনের কিন্তু ক্লান্তি নেই। রোজ সময়মতো এসে হাজির হন এবং ঘণ্টা দুয়েক নাগাড়ে কম্পিউটার নিয়ে ধস্তাধস্তি করে উঠে যান। দিন দশেকের চেষ্টায় একটা যুক্তাক্ষরবর্জিত বাক্য হয়তো লিখে ফেললেন। কিন্তু পরদিন আবার সেই বাক্যটাই লিখতে ভুল হল।

আর একটা দোষ হল, বীরেনের বগবগানি। এই গঞ্জ শহর আর আশপাশের গাঁ নিয়ে বীরেনের বিশাল কর্মক্ষেত্র। তার কোথায় কী ঘটছে সেই সব খবর সোৎসাহে শোনানোর বাতিক আছে তাঁর। কুমুদিনী লক্ষ্মীপানা মুখ করে শুনে যায়, কিন্তু কিছুই তার তেমন মনে থাকে না। এই দ্বিতীয় ব্যথাটা নিয়ে কুমুদিনীর এখন নতুন সমস্যা।

তার প্রথম ব্যথাটা অর্থাৎ তলপেটের যন্ত্রণা শুরু হয় মাসের মাঝামাঝি। প্রথম দিকে অল্পস্বল্প, তারপর চৌদুলে উঠতে থাকে। পিরিয়ড পেন। শাশুড়ি ডাক্তারের সঙ্গে একমত নন, তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছেলেপুলে হলেই প্রসব ব্যথাট্যথা কমে যাবে। কিন্তু কুমুদিনীর বয়স মাত্র বাইশ এবং তার এখনও শখ আহ্লাদ কিছু বাকি আছে। অক্টোবরে তার বৈষ্ণোদেবী যাওয়ার কথা বরকে নিয়ে। তার হাউইপোঁদা ছোটমামার প্ররোচনায় তমসা ভ্যালিও সামনের বছর না গেলেই নয়। তার বর শমীক তাকে সিঙ্গাপুর এবং ব্যাঙ্কক ঘোরাবে কথা দিয়ে রেখেছে। কলকাতার বাইপাসের কাছে তাদের যে ফ্ল্যাটটা হচ্ছে তা শেষ হবে ডিসেম্বরে। সেটা সাজিয়েগুছিয়ে তুলে সেখানে থেকে এম সি এ-টা কমপ্লিট করারও প্ল্যান আছে তার। বাচ্চাকাচ্চা হলে কি আর সে সব হবে? শাশুড়ি অবশ্য ভরসা দিয়ে বলেন, তুমি বাপু বিয়োও তো, তারপর সব ঝক্কি আমরা সামলাব। বাচ্চার জন্য তোমাকে খুঁটি গেড়ে এখানে বসে থাকতে হবে না।

কথাটা মিথ্যে নয়। তার শ্বশুরবাড়িতে কাজের লোকের অভাব নেই। তার নিজের খিদমত খাটবার জন্যই দুজন ঝি আছে। একজন প্রবীণা, একজন ছুঁড়ি। প্রবীণা মতির মা কাজের চেয়ে গল্প করতে বেশি ভালোবাসে, কাজেও একটু মাঠো। আর ছুঁড়িটার বয়স মাত্র ষোলো সতেরো, কুমুদিনীর ভীষণ ন্যাওটা এবং ছায়াসঙ্গী। দৌড়ঝাঁপ করে কাজ করতে ভালবাসে, আর ভালোবাসে হাসতে। হাসি ছাড়া তাকে দেখাই যায় না কখনও। বাচ্চা হলে তাকে আগলে রাখার, আদরযত্ন করার লোকের অভাব হবে না বটে, কিন্তু বাচ্চার মা হয়ে পড়লে তারই কি আর উড়ু উড়ু মন থাকবে? তখন বাচ্চাই হয়ে উঠবে বাধক।

এই সব নিয়ে মনের একটা দোলনায় দোল খাচ্ছে সে। একবার এ দিক, আর একবার ও দিক।

গতকাল সেই প্রথম ব্যথাটা উঠেছে। দিন তিনেক বড় কষ্ট। তার ছুকরি ঝি প্রণতি হটওয়াটার ব্যাগে সেঁক দিচ্ছিল তাকে। দুপুরবেলা। আজ প্রণতির মুখটায় সেই হাসি দেখছিল না কুমুদিনী। নিজের ব্যথায় কাতর বলে প্রথমটায় লক্ষ করেনি। সেঁকের পর ব্যথা একটু কমেছে, তখন দেখল। বলল, হ্যাঁ রে পনু, মুখখানা শুকনো কেন?

দেখো না, বীরুদাদু কী সব অসভ্য অসভ্য কথা কইছে।

সে কী রে, বুড়োর কী ভীমরতি হল! কী বলেছে তোকে?

বিয়ের কথা বলছে।

বিয়ে! কাকে? বীরেনজ্যাঠাই বিয়ে করতে চায় নাকি তোকে?

এবার গোমড়া মুখেও ফিক করে হাসল প্রণতি, তাই বলেছি বুঝি! বীরুদাদু যে ঘটক।

তাই বল। তা বিয়ের কথায় অসভ্যতা হল কীসে?

ইস! বিয়ে করতে আমার বয়েই গেছে।

বিয়ে করবি না বলে দিলেই তো হয়।

আমাকে জিগ্যেস করেছে নাকি? কথা তো হয়েছে বাবার সঙ্গে। আর বাবা তো তাই শুনে ডগোমগো।

তা বাবাকেই বল না কেন?

আমি পারব না। তুমি একটু বলে দিও তো। তোমাদের কথা ফেলতে পারবে না।

কী বলব শুনি! তোর বয়স আঠেরোর নীচে তা আমি জানি। কিন্তু ও সব আইন তো আর গাঁয়ে-গঞ্জে কেউ মানে না। আইনকে ভয়ই খায় না কেউ আর পুলিশও ঘাঁটায় না কাউকে। তা হলে বলবটা কী?

লোকটা যে দোজবরে, বুড়ো। বড় বড় ছেলেমেয়ে আছে।

কত বয়স?

বত্রিশ তেত্রিশ।

তোর দাদার সঙ্গে আমার বয়সের তফাত জানিস! তেরো বছর।

যাঃ! দাদাকে মোটেই তোমার পাশে বেমানান লাগে না।

তা হয়তো লাগে না, তোকেও হয়তো লাগবে না। ছেলেমেয়ের বয়স কত?

একটার ছয়, একটার সাত।

সেইটে একটা চিন্তার কথা বটে। আগে শুনি পাত্র কেমন, কী করেটরে।

ডাকঘরের পিওন।

পাকা চাকরি না একস্ট্রা ডিপার্টমেন্টাল?

পাকা চাকরি।

আমার শুনে খুব খারাপ লাগছে না। তবে ছেলেমেয়ে থাকলে ভাবনার কথা।

আমি এ বিয়ে করব না গো। মেরে ফেললেও না।

ঠিক আছে। না করলে না করবি। বীরেনজ্যাঠাকে বলে দেবোখন।

পাত্র হল গিয়ে আমাদের পাশের গাঁয়ের শিবু। তার ভাইটা ডাকাত।

ও বাবা! ডাকাতের ভাই! তা হলে বাবু দরকার নেই। কিন্তু হ্যাঁ রে, তোর বগার চেয়ে কিন্তু এ পাত্র অনেক ভালো।

বগার নামে প্রণতি মুখ লুকলো। লুকনোরই কথা। ইস্তিরিওলার ছেলে বছর বিশ বাইশের ছোকরা বগা। এই বয়সেই মদ ধরেছে। তারপর সাট্টা, জুয়া কিছু বাকি নেই। চেহারখানা বেশ ভালো। মাঝে মাঝেই বগার সঙ্গে পিছনের বাগানে কিংবা পাড়ার অলিগলিতে গুজগুজ ফুসফুস করতে দেখা গেছে প্রণতিকে। আর তা নিয়ে এ বাড়িতে কথা উঠেছে, দুশ্চিন্তা দেখা গেছে। আচমকা যদি বগার সঙ্গে ভেগেটেগে যায় বা কেলেঙ্কারি বাঁধিয়ে বসে তা হলে ওর বাবা হয়তো এ বাড়ির দোষ দেখবে। পিছনে দাঁড়ানার লোকও অনেক জুটবে। এ বাড়ির তো শত্রুর অভাব নেই। বড় মানুষকে টেনে নামানোর মধ্যে একটা পৈশাচিক উল্লাসও তো আছে। কাজেই প্রণতির একটা বিয়ে হয়ে গেলে মন্দ হয় না।

মনে রাখিস, বগা কিন্তু খুব খারাপ ছেলে। দু দিন ফুর্তি লুটবে, তারপর নিয়ে গিয়ে বাজারে বেচে দেবে। মেয়েমানুষের তো ওই মাংসটারই যা দাম।

বগার সঙ্গে আর মিশি না তো।

মারব থাপ্পড়। পরশুদিন বামুনদির দোক্তা আনবার নাম করে দু ঘণ্টা কোথায় গিয়ে আটকে ছিলি? বামুনদি তো আকাশ থেকে পড়ে বলল, দোক্তা আনতে দেব কী, গতকালই তো আমার ভাইপো দেশ থেকে এত দোক্তা এনে দিয়ে গেছে।

প্রণতি মিনমিন করে বলল, আগের দিন কিন্তু বলেছিল, দোক্তা ফুরিয়ে এসেছে। তাই—

আহা, বামুনদির জন্য কত দরদ! এমনিতে তো দুজনে আদা-কাঁচকলায়।

প্রণতির মুখে কুলুপ পড়ে গেল।

ব্যথা কমলেও চিনচিন ভাবটা আছে এখনও। তবু কুমুদিনী উঠল। আর উঠতে গিয়েই টের পেল, আগের তুলনায় তার শরীর কত ভারী হয়ে গেছে। বড়লোকের বাড়ির এই হল জ্বালা। শুয়ে বসে আর খাঁটি জিনিস

খেয়ে ধাঁ করে ওজন বেড়ে গেছে শরীরের। এ বাড়ির সকলেরই অল্পবিস্তর চর্বি। তার বর শমীক বিয়ের সময় থেকেই একটুভারী চেহারার ছিল। এখন আরও বেড়েছে। বাড়িতে জিম করার সব যন্ত্রপাতি সাজানো আছে, কেউ ছোঁয়ও না।

দাঁড়িয়ে উঠে বড় আয়নায় একবার নিজেকে দেখে নিল কুমুদিনী। মোটা হওয়া যেমন সহজ, রোগা হওয়া তেমনি সুপার ডুপার কঠিন। খাওয়া কমিয়ে, ডায়েটিং করে চেষ্টা করেছিল সে, তাতে কিছু কিছু জিনিসের ঘাটতি ধরা পড়ল। হিমোগ্লোবিন, ক্যালসিয়াম আরও কী কী যেন। শাকপাতা, ফল এ সব তার মুখেও রোচে না। শাশুড়িমা আর দিদিশাশুড়ি আবার ডায়েটিংয়ে খড়্গহস্ত। তিন-তিনটে গরুর দুধ তা হলে কী হবে, পাকা মাছের পেটি তবে কার পেটে যাবে, এত মণ্ডমেঠাই তবে কার ভোগে লাগবে?

কম্পিউটার সেন্টার থেকে রচনা ফোন করে বলল, আপনি কি আজ আসবেন না? বীরেন সাধুখাঁ এসেছেন, বসে আছেন আপনার জন্য।

শরীরটা ভালো নেই। ঠিক আছে, যাচ্ছি। ওঁকে একটু বসতে বল।

একটু ভাবনা নিয়েই পোশাক পরে বেরলো। সেন্টার বাড়ির গায় লাগোয়া। পৌঁছে দেখল, বীরেনজ্যাঠা কম্পিউটারে খুটখুট করছেন। কিন্তু সুবিধে করে উঠতে পারছেন না। তাকে দেখে এক গাল হেসে বললেন, য-ফলার কম্বিনেশানটা ভুলে গেছি মা। কী যেন বলেছিলে!

কুমুদিনীর মাথা বেশ ঠাণ্ডা। সে ঘণ্টাখানেক ধরে পুরনো পাঠই আবার শেখাল বীরেনজ্যাঠাকে। তারপর কম্পিউটার বন্ধ করে বলল, হ্যাঁ জ্যাঠা, পনুর জন্য আপনি নাকি পাত্র দেখেছেন! কেমন পাত্র?

বীরেন হেসে বলেন, খারাপ নয় মা। এখানকার পোস্ট অফিসের পিওন। চাকরি পাকা, পি এফ আছে, পেনশন পাবে। তার ওপর পণটন নেবে না। দোষের মধ্যে বউটি এই কিছুদিন হল গত হয়েছে। সাপে কেটেছিল।

মাগো!

গাঁ দেশে ওরকম কত হয়। সাপখোপের সঙ্গেই তো বাস।

ছেলেমেয়ে আছে বলে শুনলাম যেন!

ঠিকই শুনেছ। ওই ছেলেময়ের জন্যই বিয়ে করতে চায়। বাড়িতে রোগাভোগা বুড়ো মা আছে। তা সেই বুড়ি হ্যাপা সামলাতে পারে না। শক্তপোক্ত একটা বউ না হলে কি ঘর-গেরস্থি চলে, বলো তো! তবে পাত্রী আরও কিছু দেখা আছে, প্রণতির কথাও উঠেছে, এখনও কিছু স্থির হয়নি।

প্রণতি তো এ বিয়েতে মোটেই রাজি নয়।

রাজি না হলে আর কী হবে। ও পাত্র কি আর পড়ে থাকবে? সরকারি চাকুরে, তা ছাড়া পোস্ট অফিসের অনেক স্কিম থেকে ভালো কমিশন পায়। দেখতে শুনতে ভালো, জমিজিরেত আছে, নেশাভাঙ করে না। ও মেয়ের কপাল ভালো যে এরকম সম্বন্ধ এসেছে। না করলে তো জবরদস্তির কিছু নেই।

পাত্রের ভাই নাকি ডাকাত!

আরে না। ডাকাত-ফাকাত নয়, ছ্যাঁচড়া চোর একটা। তবে দেখলে বুঝবে না, নিপাট ভালোমানুষের মতো দেখতে। লম্বায় চওড়ায় বিশাল চেহারা বটে, কিন্তু মেনিমুখো। চেহারাটা ওরকম বলে লোকে ভাবে না জানি কত ডাকসাইটে বদমাশ।

তা যদি হয় তা হলে বিয়ে তো দেওয়াই যায়।

আমিও তো তাই বলি। পট করে বউটা সরে যাওয়ায় আতান্তরে পড়েছে। ছেলেমেয়ে দুটোকে দেখার লোক নেই। তাই হুটোপাটি করে পাত্রী দেখছে। এমন পাত্র পাবে না মা। প্রণতি বাপের ভাগ্যি যে শিবুর মতো ছেলের সঙ্গে বিয়ের কথা উঠেছে।

আপনি পাত্র হাতছাড়া করবেন না। আমি ওকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজি করাতে চেষ্টা করব।

কাঁচা বয়সের মেয়ে, কবে কোথায় কার সঙ্গে ঢলে পড়ে তার ঠিক কী?

হ্যাঁ, সেইটেই দুশ্চিন্তার কথা। একটা বদমাশ ছেলের সঙ্গে মেশে।

ওই তো মুশকিল। যখন বয়স থাকে তখন বিবেচনা থাকে না, আর যখন বিবেচনা হয় তখন বয়স থাকে না।

শাশুড়িমা তো ওকে বিদেয় করতে চাইছেন। পাঁচ ছয় বছর ধরে আছে, আমি বলি বরং বিয়ে দিয়ে বিদেয় করলেই ভালো হয়। আপনি একটা দিন ঠিক করে পাত্রটিকে নিয়ে আসুন, দেখি।

সে তো এই তল্লাটেই চিঠি বিলি করে মা। ঠিক আছে, তাই হবে।

কুমুদিনীর শ্বশুরবাড়ি বড্ড বড়। তার একটা কুমারী ননদ আছে, এ বাড়িতেই থাকে, কিন্তু কালেভদ্রে দেখা হয়। সে থাকে দোতলায়। দুটো দেওর আছে, তারাও সারাটা বছর ব্যবসার কাজে হিল্লি-দিল্লি করে বেড়াচ্ছে। তাদের অবশ্য বিয়ে হয়নি। সে আর তার বর শমীক থাকে একতলায় তিনখানা ঘর নিয়ে। শ্বশুর-শাশুড়িও তিনখানা ঘর নিয়ে একতলায়। আর একতলায় একধারে দুখানা ঘর নিয়ে দিদিশাশুড়ির বাস। মাঝখানে বিরাট ডাইনিং কাম লিভিং রুম। চারদিকে বিরাট বাগান-ঘেরা কম্পাউণ্ড, ফটকে দারোয়ান।

কুমুদিনী সেন্টার থেকে ফিরে এসে শাশুড়িকে পাকড়াও করল ভাঁড়ার ঘরে গিয়ে।

মা, একটা কথা ছিল।

বলো মা।

প্রণতির বিয়ের একটা সম্বন্ধ এনেছেন বীরেনজ্যাঠা।

বিয়ে! বলে শ্রীময়ী ভ্রু কোঁচকালেন, তা বীরেনবাবুর অত গরজ কেন?

না, মানে একটা পাত্রের সন্ধান আছে, তাই।

পাত্রের গরজ নাকি? তা পাত্রটি কে? বগা নয় তো!

কুমুদিনী হেসে ফেলল, বগা আবার পাত্র কীসের? এ অন্য লোক।

দেখো মা, এ সব ঝামেলা বেশি ঘাড়ে নিতে যেও না। তার চেয়ে কিছু টাকাপয়সা দিয়ে বিদেয় করে দেওয়া ভালো। ওই ছোঁড়া নাকি রোজই দুপুরে সাইকেলে আশপাশে চক্কর দেয়। সিটি-টিটি মারে। এ সব আমি ভালো বুঝছি না। ওর বাপকে খবর পাঠিয়েছি। সে নাকি চাষবাস নিয়ে খুব ব্যস্ত, তাই আসার ফুরসত পাচ্ছে না। এলেই বিদেয় করে দেব। আর না এলে সঙ্গে লোক দিয়ে দেশে পাঠিয়ে দেব। সোমথ মেয়ে রাখাই ঝকমারি।

কিন্তু বগার এত আস্পদ্দাই বা হল কী করে? তাকে ডেকে এনে শাসন করে দিলেও তো হয়।

তা হবে না কেন?

আমাদের লোকলশকর গিয়ে পিছমোড়া করে বেঁধে আনতে পারে। দু-চার-ঘা বসানোই যায়। কিন্তু তাতে কিছু হবে? সে হয়তো নাকে খত দিয়ে হাতে পায়ে ধরে 'আর করব না' বলে চলে যাবে। কিন্তু তখন আবার শোধ তুলতে অন্য পথ ধরবে। প্রণতির যদি সায় না থাকত, তা হলে কি অত সাহস হয় ওর? চিরকাল দেখেছি এ সব প্রেম-পিরিতের ব্যাপারে জোর ফলাতে গেলে হিতে বিপরীত হয়। ও সব করলে হয়তো দেখবে, দুজনেই পালিয়ে গেছে। তখন মুখ দেখানোর জো থাকবে আমাদের? তার চেয়ে বিদেয় করে দিতে পারলে বাঁচি। তারপর ফগা-বগা যার সঙ্গে খুশি লটঘট করুকগে।

পরদিন সকালেই অবশ্য প্রণতির বাপ এসে হাজির। বেশ পরিষ্কার ধুতি আর জামা পরনে। বশংবদ হাসি-হাসি চেহারা।

শাশুড়ি তাকে ঘরে ডেকে মোড়ায় বসতে দিলেন। চা বিস্কুটও দেওয়া হল।

শাশুড়ি বেশ স্পষ্টবক্তা। চেয়ার টেনে মুখোমুখি বসে বেশ ঝাঁঝের গলায় বললেন, তা মেয়ের ব্যাপারে কী ঠিক করলে লোচন?

লোচন ভারি গ্যালগ্যালে হেসে বলে, আজ্ঞে আমি আর কী ঠিক করব? আপনারা যা ভালো বুঝবেন। তবে একটা বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে। পাত্র বড্ড ভালো। সেই কথাটাই বলতে আসা। খরচাপাতিও তো আছে।

দেখ বাপু, মাসে মাসে আটশো টাকা করে ওর নামে পোস্টঅফিসে জমা হয়। পাঁচ ছয় বছরে তা বড় কম হয়নি। আর বিয়ে বাবদ আমি বরং আরও চার পাঁচ ধরে দিচ্ছি থোক। তুমি আজই মেয়ে নিয়ে যাও বাপু। সোমখ মেয়ে ঘরে রাখতে আমার ভয় হয় বাপু। পাড়ার একটা ছেলে বড্ড ভনভন করছে। কখন কী হয় বলা তো যায় না। দেশের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বিয়ে দাওগে।

লোকটা একটু জড়সড় হয়ে গেল। বলল, আজই যাবে?

শুভস্য শীঘ্রং। আজই ভালো।

কিন্তু ভাদ্র মাসটা যে—

ভাদ্র মাসে দোষ কীসের? শুভ মাস। আর যাবে তো নিজের বাড়িতে। ভাদ্র মাসই ভালো।

লোচন হাত কচলাতে কচলাতে বলে, আজ্ঞে আজ একটা বিশেষ কাজে আসা। পাত্রের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের ব্যাপার আছে। আজ ওবেলা পারলে এসে নিয়ে যাব মা। না হয় তো পরশুদিন।

তাই এসো। আমি বরং ওর টাকাপয়সা সব তুলে রাখব। মেয়েকে ভালো করে বিয়ের কথা বুঝিয়ে বলে যাও। শুনছি নাকি কন্যের মন উঠছে না। এ সব তো ভালো নয়। ওইটুকু গুয়ের গ্যাংলা মেয়ে সংসারের ভালোমন্দ কবে এত বুঝে উঠল কে জানে। মতামত করার মতো বোধবুদ্ধি হয়েছে নাকি ওর?

হ্যাঁ মা, তা বুঝিয়ে বলে যাচ্ছি। শিবুরও ওকে নাকি অপছন্দ নয়।

শিবুটা আবার কে?

সে-ই পাত্র মা। এখানকার পোস্ট অফিসের পিওন।

ও মা! আমাদের পিওনটা বুঝি? রেজিস্ট্রি চিঠি-টিঠি নিয়ে আসে! লম্বা চওড়া দিব্যি তো চেহারা। গায়ের রংটাও কটা আছে।

সে-ই মা।

তা তাকে অপছন্দ হচ্ছে কেন ওর? আর কোন রাজপুত্তুর আসবে ওই ডানাকাটা পরিকে নিয়ে যেতে?

কুমুদিনী মুখে আঁচল চাপা দিয়ে মৃদু-মৃদু হাসছিল। পুরনো আমলের মানুষেরা কেমন ঠোঁটকাটা হতে পারে তাই দেখছিল। সে কি ওই বয়সে এরকম স্পষ্ট কথা বলতে পারবে? পারবে না। ওটা একটা ধাত। কেউ পারে, কেউ পারে না।

কুমুদিনী মৃদু গলায় বলল, পনু কিন্তু দেখতে খারাপ নয় মা।

আমার চোখে তো আর ছানি পড়েনি, রোজ দেখছি। খারাপ তো বলিনি। গাঁ দেশে সুন্দরীই বলবে। আর তার জন্যই তো কাগা-বগারা পিছনে লেগেছে। যৌবনে ফুফ্লুরী ধন্য। আর এ তো মানুষের ছা। সংসারে টিপিকাল পড়ে রস নিংড়ে গেলে তখন শ্রীছাঁদ কী দাঁড়ায় সেটাই যা ভাবনার কথা।

লোচন উঠল। মেয়েকে নিয়ে গিয়ে দোতলায় ওঠার সিঁড়ির তলাটায় বসে চাপা গলায় কথা কইতে লাগল।

কুমুদিনী নিজের ঘরে এসে আলমারি খুলে তার অজস্র শাড়ি দেখতে লাগল।

## ৩

ক দিন যাবৎ পরানচন্দ্রের একটা হাঁফ-ধরা ভাব চলছিল। শ্বাসের কষ্ট, বুকের মাঝ বরাবর চিড়িক ব্যথা। বনমালী ডাক্তার হোমিওপ্যাথির পুরিয়া দিয়ে ভরসা দিয়েছিল, ও কিছু নয়, পেটে বায়ু হচ্ছে।

সেটা শীতকাল, বেশ মনে আছে বীথির। সকালে উঠে পরানচন্দ্র মাছ ধরতে যাওয়ার জন্য তোড়জোর করছিল। সে গিয়ে বলল, ও বাবা, তোমার শরীর খারাপ যে! মাছ ধরতে যাচ্ছ কেন?

পরানচন্দ্র একগাল হেসে বলল, এ সময়টায় বড্ড সরেস সরলপুঁটি ওঠে রে মা। ভাবিস না, শরীর তেমন খারাপ নয়। শীতকালে পুঁটিমাছের বেশ তেল হয় শরীরে।

সেই বাবার সঙ্গে বীথির শেষ কথা। বড় বিলে মাছ ধরতে গেল সকালবেলায়। বেশ দূরের রাস্তা। গড়ানে বেলায় যখন গরুরগাড়ি করে নিয়ে আসা হল তখন চৈতন্য নেই। শ্বাসবায়ুর জন্য যেন আঁকুপাঁকু, ছটফট। দুনিয়ায় তো বাতাসের অভাব নেই, তবু পরানচন্দ্রের বুক চোপসানো বেলুন হয়ে গেল কেন কে জানে।

বনমালী ডাক্তারই এল, ওষুধপত্রও দিল বটে, কিন্তু পরানচন্দ্র ঝিমিয়ে গেল আস্তে আস্তে। বড্ড দেরিতে যখন গঞ্জের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল তখন ভরতিই নিল না তারা। বলল, এ তো হয়ে গেছে। ভরতি করলে কিন্তু ডেডবডি আমরা পাঁচঘণ্টার আগে ছাড়তে পারব না।

বীথি বাবার বুকে হাত রেখেই বসে ছিল হাসপাতালের বারান্দায়। বাবা যে মরেই গেছে তা বুঝতে পারেনি তখনও। শরীরে তাপ ছিল তখনও।

লোকে মরে। সেইটেই দুনিয়ার নিয়ম। কিন্তু বেঁচে থাকার মধ্যেও মাঝে মাঝে নানা কারণে বার বার মরতে হয়। বীথিরই যেমন হল। বাবার আদুরে মেয়ে, আদরে আশকারায় ছিল। শ্বশুরবাড়ির পাট চুকিয়ে এসেছে বলে মনেই হত না। ফের যেন কুমারী জীবনের হালকা পলকা দিনগুলো ফিরে এসেছিল। তবে আকথা-কুকথা কানে আসত বড় কম নয়। মা খিটখিট করত, দাদা-বউদিরা, পাড়াপড়শিরা কেউই সুযোগ পেলে বলতে ছাড়ত না। তা সে সব গায়ে মাখত না বীথি। বাবা পরানচন্দ্র তাকে বুক দিয়ে আগলে রেখেছিল।

বাবার দাহ হল, সেই সঙ্গে সুখের ঘরেও আগুন লাগল তার। রাত না পোহাতেই দুনিয়া পালটে যেতে লাগল। সামনের দিককার কোণের ঘরখানা বরাদ্দ ছিল তার জন্য। শ্রাদ্ধ মিটতে না মিটতেই বড়দা, মেজদা আর ছোড়দা, সঙ্গে তিন বউ এসে হানা দিয়ে বলল, এ ঘর এবার না ছাড়লেই নয়। বাবা মারা যাওয়ায় এখন ঘরের অদলবদল হবে।

তা বীথিও ছেড়ে কথা বলেনি। গলার জোর, জিবের ধার তার কিছু কম নয়। কিন্তু সে দিন হঠাৎ বুঝতে পারল, চেঁচানোর পিছনে কি যেন একটা তেমন কাজ করছে না। ঠেকনোর অভাব। তার পিছনে কোনও শক্তপোক্ত খুঁটি নেই। শুধু গলার আওয়াজ ফাঁকা আওয়াজের মতো শোনাচ্ছে। বাড়ির কেউ তার পক্ষ নিল না। না মা, না বিধবা পিসি, না পাড়াপড়শি।

শেষ অবধি নিজের জিনিস গোছাতে হল, গুটি গুটি গিয়ে উঠোনের ও পাশে পিছনের দিককার মাঠকোঠার ঘরে ঢুকতে হল। তেমন আলো হাওয়া নেই। ঘুপসি মতো পাশের ঘরে পিসি। অন্য পাশে দা-কুড়ুল-শাবল রাখার ঘর। গোয়ালের গন্ধ আর মশার উৎপাত তো আছেই। খুব কেঁদেছিল বীথি। কিন্তু তখন চোখের জলের দাম আর নেই।

বাবা তার নামে একটু জমি লিখে দলিল করে দিয়েছিল। আর নয়নপুরেরই গিরিধারী দাসের মেজো ছেলের সঙ্গে তার বিয়ের একটা কথা চলছিল। নিরীহ ভালোমানুষ। তাদের ছেলে, দেখেছে বীথি। তেমন পছন্দের নয়, তবে দ্বিতীয় হিসেবে খ্যামাঘেন্না করে মেনে নেওয়া যায়।

কিন্তু পরানচন্দ্র চোখ বোজার পর জমির দলিলটা আর খুঁজে পাওয়া গেল না। দলিলের কথা শুনে দাদারা এমন অবাক হল যেন ভূতের গল্প শুনছে। গিরিধারি দাসেরও আর গরজ দেখা যাচ্ছিল না। তার ছেলে একদিন টোপর পরে কোথা থেকে যেন এটা বউও জুটিয়ে এনে ফেলল।

কিন্তু সবচেয়ে বিপদ হল, বীথির হতে যে বাবা পাঁচটা দশটা করে টাকা দু-চারদিন পর পর দিত সেটাও বন্ধ। বাড়ির বরাদ্দ খাবারটুকু পাওয়া যায় বটে কিন্তু কিচ্ছুটি কেনার উপায় নেই। চুলের ফিতে কি কাঁটা, একটু পাউডার, এমনকী দাঁতের মাজন কিংবা হাওয়াইচটি, শাড়ি বা ব্লাউজ এ সব অমিল হতে লাগল বড্ড। এভাবে যে দিন যাবে না তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছিল সে।

এ সব সেই তিন বছর আগেকার কথা। শ্বশুরবাড়িতে অভাব ছিল বটে, কিন্তু অধিকারটাও ছিল। নিজের ঘরে নিজের দাপটে থাকত, দরকার মতো আনাজপাতি বাগান থেকে তুলে আনত। সেদ্ধপোড়া খেয়ে থাকলেও এমন চোরের মতো মনে হত না নিজেকে। কিন্তু বাপের বাড়িতে এমন অবস্থা হল যে, ঘটিটা পর্যন্ত ধরতে ভয় করে, গাছের একটা পেয়ারা পাড়তে গেলেও মনে হয়, চুরি করছি। এটাও অসহ্য। তার ওপর বউদিদের বাক্যবাণ তো আছেই। মাকে কিছু বলে লাভ হয় না। ছেলেদের সংসারে তারও কিছু বলার মুখ নেই। পিসিতো ধর্তব্যের মধ্যেই নয়।

একদিন চোখে জল নিয়ে মরবে বলে ঠিক করে ফেলেছিল সে। মেয়েরা তো মরতে ভালোইবাসে। আর যেন নারীজন্ম না হয়, এই কথা ঠাকুরকে বলে ফাঁসিতে লটকেই পড়ত সে। কিন্তু সেই দিনই ফেনি এসে তার সঙ্গে গল্প জুড়ে বসল। পাড়ারই বউ। কয়েক মাস হল বিয়ে হয়ে এসেছে ভিন্ন গ্রাম থেকে। ফেনি বলল, তোমার কষ্ট আমি বুঝি। কিন্তু হাত-পা গুটিয়ে সারাদিন বসে থাকো কেন বলো তো! হাত, পা, বুদ্ধি, চোখ, কান, এ সব কি ভগবান জমিয়ে রাখার জন্য দিয়েছেন? এ সব তো কাজে লাগাতে হয়।

কী কাজে লাগব?

আগে শুনি, তুমি কী কী জানো।

অনেক ভেবেচিন্তে কিছু খুঁজে পেল না বীথি। বলল, আমি কিছুই জানি বলে মনে হয় না।

সেলাই-ফোঁড়াই? গান? ছবি আঁকা? উলবোনা? পুতুল তৈরি করা?

কিচ্ছু না।

বড়া ভাজতে পারো?

বড়া! বলে বীথি হেসেই খুন, বড়া ভেজে কী হবে?

বড়া ভেজেও হয়। লজ্জাসরম ছেড়ে যদি নয়নপুরের হপ্তাহাটে বড়া ভেজে বিক্রি করতে লেগে যাও তা হলেও কিছু পয়সা আসবে।

ও বাবা, সে আমি পারব না। আমার বাবার তো একটা নাম আছে।

তাতে মান নষ্ট হবে না। হাটে কে কাকে চিনবে বলো। ঘোমটা দিয়ে বসবে, কাউকে পাত্তা দেবে না। দেখই না চেষ্টা করে। আমার বর তো হাট কমিটির সেক্রেটারি। জায়গা করে দিতে পারবে।

মরমে মরে গেল বটে বীথি, কিন্তু মরার আগে একটু আঁকুপাঁকু করতে দোষ কী, এই ভেবে সে মনকে স্থির করল।

ফেনির বর হল টেকো তপেন। একদিন ফেনিই তাকে ধরে নিয়ে গেল তপেনের কাছে। তপেনদা বলল, হাটে জায়গা পেতে হলে তো পয়সা লাগে রে। তা তুই আর কোত্থেকে দিব্যি? যাকগে, ওটা পরে দিলেও চলবে। খাতায় লিখে রাখবখন।

কীসের বড়া ভাজবে, তা তার মাথায় আসছিল না। সবচেয়ে সোজা হল ডালের বড়া বা পেঁয়াজি। ফেনি শুনে ঠোঁট উলটে বলে, ও তো সবাই ভাজে। নতুন কিছু না করলে লোকে তোমার বড়া খাবে কেন?

এই নতুন কিছু ভাবতে গিয়েই তার বুঝি কাল হল। সে কুমড়ো ফুল আর বকফুল, পাটপাতা, শেফালিপাতা, পাকা কুমড়োর টুকরো এই সব ব্যসনে ডুবিয়ে ভাজবে বলে ঠিক করে ফেলল।

নয়নপুরের হাট বেশ নামকরা। পাঁচ সাতটা গাঁয়ের লোক সওদা করতে জড়ো হয়। সকাল থেকে রাত অবধি টানা বিকিকিনি। এ ধারে ছোট একটা চটের টুকরো আর চারটে খুঁটি, তোলা উনুন আর বাসনপত্র নিয়ে লজ্জার মাথা খেয়ে হাটে বসে পড়ল বীথি। মরার আগে বাঁচার শেষ চেষ্টা। প্রথম খদ্দের একজন বুড়োসুড়ো মানুষ, বড়ার টানে না বড়াউলির টানে কে জানে, হাসি হাসি মুখ করে পলতা পাতার বড়া নিল। খুব দেখছিল বীথিকে। লজ্জায় আর ভয়-ভয় ভাবে বীথি জড়সড় হয়ে রইল। বড়া মুখে দিয়ে মোটেই খুশি হল না লোকটা, এঃ, এ যে বেজায় তেতো! কচি পাতা পাওনি? বুড়ো পাতার কি স্বাদ হয়?

মনটা খুব দমে গেল বীথির, না হচ্ছে না, এ সব নতুন জিনিসের বড়া চলবে না বোধ হয়।

কিন্তু বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে খদ্দের এল, এবং আসতে লাগল। তার ফুল আর পলতার বড়া উড়ে যেতে লাগল। যখন সন্ধের মুখে বিকিকিনি শেষ করল সে, তখন নোটে আর খুচরোয় তার ঝুড়ি ভরতি। বাড়ি ফিরে হিসেব করে দেখল, এ হাটেই তার খরচা বাদ দিয়ে দুশো তেরো টাকা লাভ হয়েছে। এতটাকা বহুদিন দেখেনি সে একসঙ্গে। আহ্লাদের চোটে রাতে ভালো করে ঘুমোতেই পারল না সে। পরদিন সকালে গিয়ে ফেনিকে জড়িয়ে ধরে বলল, ওঃ, কী বুদ্ধিটাই দিয়েছিলে ভাই!

রোসো বাপু, খবর আমি পেয়েছি। তবে বুদ্ধি আরও খাটাও। মেয়েদের স্বনির্ভর করার ট্রেনিং আমি নিয়েছিলাম বলে জানি, নতুন কিছু করার জন্য মাথা খাটাতে হয়। তুমি ব্যসনটার মধ্যে মশলাপাতি কিছু দিও, আর বেকিং পাউডার এবং সোডা।

আরও অনেক পরামর্শ হল দুজনে। পরের সপ্তাহের হাটবারে আগের খদ্দের অনেক এল, সঙ্গে নতুনরাও। বীথির লাভ তিনশো ধরে ফেলল প্রায়।

কিন্তু কুসুমে তো কীট আছে। গোলাপে কাঁটা। হাটে গিয়ে বড়া বিক্রির খবরে বড় দুই দাদা এবং বউরা রেগে কাঁই। এ বাড়ির মেয়ে হাটে গিয়ে দোকান দিয়েছে, এতে নাকি তাদের মাথা কেটে গেছে। মানসম্মান বলে কিছু আর রইল না। গাঁ-সুদ্ধু লোক নাকি ছিঃ ছিঃ করছে, ইত্যাদি।

বীথি সপাটে বলল, তোরা কি আমাকে মাসোহারা দিস যে এত কথা কইছিস! আমাকেও তো বেঁচে থাকতে হবে।

বড়জা বলল, ও সব করতে হলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যা।

বীথি বলল, এর বেশি আর মুরোদে কুলোল না তো! মেয়েমানুষকে বাড়ির বের করলে বুঝি খুব প্রেস্টিজ থাকবে? তখন গাঁয়ের লোক ছি ছি করবে না? যদি বুকের পাটা থাকে তো তা হলে বরং বোনের পাশে এসে দাঁড়াবি, সাহায্য করবি। একচোখা, স্বার্থপর বলেই পরের ভালোর কথা ভাবলি না কখনও।

বেশ ভালোই বেঁধে গিয়েছিল ঝগড়া। অনেক দূর গড়াত। কিন্তু বীথির ছোড়দা বড় দুজনের মতো নয়। সে এসে বোনের পক্ষ নিয়ে বলল, ও তো ঠিক কাজই করেছে। বাঁচার জন্য, নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য কোনও কাজই ফ্যালনা নয়। গাঁয়ের কেউ ওর নিন্দে করলে আমার কানে আসত। বরং অনেককেই বলতে শুনেছি, বীথির সাহস আছে।

ছোড়দা রোখাচোখা মানুষ। বড় দুজন তাকে সমঝে চলে। তাই আরও কিছুক্ষণ তড়পে তারা রণে ভঙ্গ দিয়েছিল।

একটাই মুশকিল। হাটবারের জন্য সারা সপ্তাহ হাঁ করে বসে থাকতে হয়। গাঁয়ে রোজকার কিছু খদ্দের যে পাওয়া যাবে না তা নয়। কিন্তু তাতে খরচা বা খাটুনিতে পোষাবে না। কাজেই সপ্তাহের আর ছটা দিন কী করে রোজগারের ধান্দা করা যায় তা নিয়ে ভাবতে বসল বীথি।

শেষ অবধি ফেনিই তাকে গঞ্জে নিয়ে গিয়ে এক মহিলার সঙ্গে ভিড়িয়ে দিল। তার নাম অঞ্জু। বাচ্চা মেয়েদের পোশাক তৈরির ব্যবসা এবং বেশ বড় ব্যবসা। ফেনির সঙ্গে খুব ভাব। সব শুনেটুনে বললেন, আমার তো এক্সপার্ট লোকের বড্ড অভাব। বেশিরভাগ কাজ শিখে সরে পড়ে, নিজের ব্যবসা খোলে। তা এখানে শিখতে পারো।

কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না বীথির। কিন্তু সপ্তাহের ছটা দিন সে খুব মন দিয়ে নতুন কাজ শিখতে শুরু করেছিল। মাস দুয়েকের মধ্যেই ব্যাপারটা বুঝে গেল সে। মাপ অনুযায়ী ডিজাইন দেখে ফ্রক বা জামা কেটে ঠিকঠাক সেলাই করা কঠিন কাজ নয়। মাথা খেলালে কিছু নতুন ধরনের ডিজাইন বেরও করা যায়। যাই হোক, বীথি কাজে ডুব দিল। হপ্তাহাটের দোকানেও তার কামাই নেই।

গঞ্জের বড় কারবারি হল চৌধুরীরা। তাদের মাল মংলা হাটে যায়। বর্ধমানের কাটোয়া হয়ে অনেকদূর মফস্সলের বাজারে তাদের জিনিস বিক্রি করে দোকানদারেরা। শস্তা আর চটকদার জিনিস—ঠিক যেমনটা গাঁ-গঞ্জের লোকদের পছন্দ। অঞ্জুদি চৌধুরীদের সাপ্লায়ারদের মধ্যে একজন। চৌধুরীদের গদি থেকে একটা ছোকরা, তার নাম সুদেব, অঞ্জুদির দোকানে আসে তদারক করতে। চৌধুরীদের আত্মীয় হয়, ভারি চালাক-চতুর ছোকরা। অঞ্জুদির সঙ্গে চৌধুরীদের সঙ্গে যোগাযোগও সে-ই করে দিয়েছিল। ফলে অঞ্জুদির কাছে তার বেজায় খাতির। সে এলে বেশ একটা শোরগোল পড়ে যায় দোকানে। চা আনানো হয়। মিষ্টি আসে।

কয়েকদিন আড়ে আড়ে দেখেছিল বীথি। মাঝে মাঝে চোখে চোখ পড়ে যেত। চোখ বড় পাজি জিনিস। চোখ থেকে যে কত সর্বনাশ হয়!

মাস দুয়েক বাদে অঞ্জুদি তাকে আড়ালে ডেকে বলল, হ্যাঁরে, সুদেব তোর খোঁজখবর নিচ্ছিল কেন রে? জানিস?

ভারি অবাক হওয়ার ভান করে সে বলল, না তো?

বোধ হয় মনে ধরেছে। সুদেব নকড়া ছকড়া ছেলে নয় কিন্তু। ভালো ঘরের ছেলে, লেখাপড়া জানে। আমি একটু চেপে চুপে বলেছি।

বুকে খুব একটা দুলুনি লাগছিল। কিন্তু পুরুষমানুষকে সে পুরোপুরি বিশ্বাস করে না। চোখে দেখেই মজে যায়, দখল করে, আর তার পরেই রোখ কমে যায়, মন তখন আলোয় আলোয় ঘোরে। ভালোবাসা জিনিসটাই পুরুষদের মধ্যে নেই। শুধু খিদে আছে। সে একটু সাবধানে বলল, চেপেচুপে বলার মতো কিছু নেই। তা জানতে চায় যখন, সবই জানিয়ে দিও।

যদি তোকে পছন্দই করে বসে, তা হলে কি রাজি হবি?

এ কথার জবাব বীথির কাছে ছিল না। সে বলল, ভেবে দেখি।

বরং একটু কথাটথা কয়ে দেখ।

তা কথাও হল তাদের মধ্যে। প্রেমের ডায়ালগ নয়, এই নানারকম কথা। তার যে বিয়ে হয়েছিল এবং এক বছরের বেশি টেকেনি সেটা অঞ্জুদির কাছেই শুনেছে সুদেব। তবে তাতে তার বিশেষ হেলদোল হল না। বরং বীথির জন্য তার ভারি মায়াই হয়েছিল।

বীথিকে পছন্দ আরও দু-তিনজন করেছিল। কিন্তু তারা সব হাড়হাভাতে বা বুড়ো বা বদমাশ। বীথির আজকাল ঢলে পড়ার মতো মন নয়। অভাবে পড়ে সে একটু শক্তপোক্ত হয়েছে। আর পুরুষমানুষের তেমন প্রয়োজনও সে বোধ করে না। একা বিছানায় সে অভ্যাস করে ফেলেছে। কিন্তু সুদেব এসে একটু গোলমাল করেছিল হিসেবে। বীথির মনে হচ্ছিল, একটা বিয়ে হলে বোধ হয় মন্দ হয় না। সুদেব নিজে আলাদা ব্যবসা করতে চায়। সে ক্ষেত্রে বীথি সুদেবের ব্যবসায় সাহায্য করতে পারে। সুদেব বলেছে, শেয়ার হবে সমান সমান।

ভাবসাব হওয়ার পর বীথি একটু সাজগোজ করতেও শুরু করেছিল। তার চেহারায় একটা আলগা চটক আছে, স্বাস্থ্যটাও ভালো। সাজলে তাকে বেশ ভালোই দেখায়। রাস্তায় ঘাটে লোকজন বেশ লক্ষ করে তাকে।

কিন্তু এই নিয়েও বাড়িতে তার দুই বড় দাদা আর বউদিরা কম টিকাটিপ্পনী কাটে না। অত সাজগোজ কীসের? লাইন নেমেছে কি না, এই সব অসভ্য কথা।

সুতরাং সুদেবকে একদিন সে বলেই ফেলল, তুমি যদি আমাকে বিয়ে করতেই চাও তা হলে বেশি দেরি কোরো না, বাড়িতে কথা হচ্ছে।

সুদেব বলল, ব্যবসা করার জন্য আরও কিছু টাকা চাই। জ্যাঠা রাজি আছে সাহায্য করতে। ব্যবসাটা খুলেই বিয়ে করব। ভেবো না।

একটাই মুশকিল হচ্ছিল বীথির। বিয়ের কথায় তার তেমন কোনও আনন্দ বা উত্তেজনা হচ্ছিল না। কিংবা সুদেবকে দেখলে তেমন কোও উথালপাথালও হচ্ছিল না তার। অবশ্য ওগুলো না হলেও কিছু নয়। সে তো আর জীবনে প্রথম বিয়ে করছে না, কাজেই কুমারী মেয়েদের মতো তার ওরকম হওয়ার কথাও নয়। এ হচ্ছে দুটো পোড়খাওয়া মানুষের হিসেবনিকেশ করে এগোনো। হিসেবনিকেশই ভালো। ভাবের ঘোরে কিছু করে ফেলে পস্তানোর মতো বয়স কি তার আছে?

বয়সের একটা হিসেব করে অবশ্য বেশ অবাক হল বীথি। ষোলো বছর বয়সে রঘুর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল তার। এখনও, এত তিক্ত অভিজ্ঞতার পর, নিজেকে যখন প্রায় বুড়ি ভাবতে শুরু করেছে তখন হিসেব কষে দেখল তার বয়স সবে একুশ ছাড়িয়েছে। বয়সটা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল সে।

বছর দুয়েকের প্রাণপাত চেষ্টায়, জ্যাঠার সাহায্যে আর ব্যাঙ্ক থেকে ধার করে নিজের কারবার খুলেছে সুদেব। গঞ্জে একখানা দোকানঘর নিয়েছে, সাইনবোর্ড লাগানো হয়েছে। মহরতও হয়ে গেল সে দিন। আর

একটু সামলে নিয়েই বিয়ে সেরে ফেলবে। কথা মোটামুটি হয়েই আছে।

অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করছে বীথি। নিজেকে তেমন অসহায় লাগছে না আর।

ঘটনাটা ঘটল হপ্তাহাটে। দিন আষ্টেক আগে। সেই থেকে ঘটনাটা ভুলতে পারছে না বীথি। আজকাল বাঁশের খুঁটিতে মজবুত ত্রিপল খাটিয়ে হাটে দোকান বসায় সে। জোগেড়ে মেয়ে আছে দুটো। বিক্রিও বেড়েছে খুব। অবশ্য বিয়ের পর এ ব্যবসা তাকে তুলেই দিতে হবে। মেয়ে দুটোকে বলেই রেখেছে, আমি ছেড়ে দিলে তোরা ব্যবসা করবি। মেয়ে দুটো খুব রাজি। আজকাল এক হাটেবারেই তার সাত-আটশো টাকার বিক্রি। দম ফেলার ফুসরত নেই। কারও দিকে তাকানোরও সুযোগ পায় না।

তবু যা চোখে পড়ার তা ঠিকই চোখে পড়ল তার। হাটভরতি লোকের মধ্যে সকলের চেয়ে এক মাথা উঁচু, পেল্লায় চেহারার একটা লোক একটা বাচ্চা ছেলের হাত ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দেখেই বুকটা ছাঁত করে উঠল। হাত-পা ঠান্ডা মেরে গেল। অন্যমনস্ক হয়ে পড়ায় কড়াইয়ের ভাজাটাও গেল খানিক পুড়ে। না, রঘু তার দিকে তাকায়নি, লক্ষই করেনি তাকে। বড়া খেতেও আসেনি। তবু বীথি বড্ড ঘাবড়ে গেল। তাকে দেখতে পায়নি ভাগ্যিস।

অবশ্য চট করে সামলেও নিল সে। দেখলেই বা কী? ওকে কি আর ভয় পায় নাকি বীথি? সম্পর্ক চুকে গেছে পাঁচ বছর আগে। আর সম্পর্কই যখন নেই তখন চিন্তা কীসের?

কিন্তু খদ্দের সামলাতে সামলাতেও সে নির্ভুল টের পাচ্ছিল তার বুক দুরু দুরু করছে। কেমন একরকম ভয়-ভয়, তেষ্টা-তেষ্টা, শীত-শীত করছিল তার। বড়া ভাজতে ভাজতে বারবার এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল। একবার যেন, অনেকটা দূরে, একঝলক দেখতেও পেল। তার পর আর নয়।

সন্ধের পরও ভাঙা হাটে অনেকক্ষণ বসে রইল সে। খুব ধীরেসুস্থে জিসিনপত্র গোছাল।

চিন্তাটা তবু গেল না কিন্তু বীথির। সে দিন রাতেও শুয়ে শুয়ে ভাবল, শ্বশুরবাড়ির গাঁয়ে ঘুর ঘুর করে বেড়াচ্ছে কেন ও? মতলবটা কী? হাড়হাভাতে, পাজির পা-ঝাড়া, মিটমিটে শয়তানটা কি কোনও মতলব আঁটছে? রাগ-রাগ ভাব হচ্ছিল বটে বীথির। কিন্তু ভেবে দেখলে রঘুর ওপর তার রাগের তেমন কারণ নেই। চোর হোক, ডাকাত হোক, কোনও দিনই বীথির সঙ্গে কোনও খারাপ ব্যবহার করেনি। বীথি যখন ওর বিষ ঝেড়ে দিত তখন উলটে কিছু বলত না। একটা খারাপ কথা না, গায়ে হাত তোলা না। বীথি বলে নয়, রঘুকে কখনও কারও সঙ্গে উঁচু গলায় কথা বলতে শোনেনি সে। ঝগড়া কাজিয়ায় যেত না কারও সঙ্গে। চুরির দোষ ছিল বটে, কিন্তু সব কটা চুরিই যে রঘু করত না, তা জানে বীথি। অন্যের দোষেও পুলিশ ওকে তুলে নিয়ে গেছে কয়েকবার। সব দিক বিচার করলে রঘুর ওপর তার এত রাগ হওয়ার কথা নয়।

গতকালই আবার সেই কাণ্ড। এত খদ্দেরের মধ্যে, থমথমে অবস্থার মধ্যেও ঠিকই চোখে পড়ল বীথির। সে দিন আবার বছর সাতেকের মেয়ে আর সেই ছেলেটাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। হেলেদুলে হাঁটছে। সে দিনও মোটে চোখাচোখি হল না। ভাইপো ভাইঝির সঙ্গে গল্প করতে করতে হাট দেখে বেড়াচ্ছিল। বীথির অবশ্য আগের দিনের মতো বুক কাঁপুনি ওঠেনি। কিন্তু চমক তো লাগবেই একটু। এক বছর ঘর তো করেছিল। বীথি বলে ডাকত না কখনও আদর করে বলত, বিউটি। তার বাবা মেয়ের ভুল বিয়ে দিয়ে খুব মনস্তাপে ভুগেছিল। নিজেই গিয়ে তুলে এনেছিল একদিন। ভেবেছিল মেয়ের ফের একটা বিয়ে দিয়ে ঘর বসাবে। সেটা হয়ে ওঠেনি।

দ্বিতীয়বার হাটে রঘুকে দেখার পর দুশ্চিন্তা একটু বাড়ল বীথির। ফেনি তার মুখে সব শুনে বলল, মতলব খারাপ নাও হতে পারে। চিন্তা কোরো না। হয়তো হাটে কিছু কিনতে-টিনতে এসেছিল। তবে যদি বল তা হলে আমি আমার বরকে বলে ওকে শাসিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করব। তা হলে আর গাঁয়ে ঢুকবে না।

প্রস্তাবটা শুনে একটু ভাবল বীথি। অতটা করা কি ঠিক হবে? এখনও তো তার দিকে নজরই পড়েনি ওর। মতলব যে খারাপ তারও কোনও লক্ষণ দেখা যায়নি। তা হলে খামোখা হাল্লাচিল্লা করে লাভ কী?

বীথি বলল, থাক, দরকার নেই। মতলব খারাপ বুঝলে তোমাকে বলব।

সে-ই ভালো।

ক দিন খুব আনমনা আছে বীথি। বড্ড মনে পড়ছে এক বছরের কথা। তেমন কোনও সুখস্মৃতি হয়তো নয়। তবু মনে পড়ে। লোকটা যদি ভালো হত, তা হলে আজ বীথি হত ওর ছেলেপুলের মা। যত নষ্টের গোড়া এই লোকটাই তার জীবনটাকে নষ্ট করেছে। ভিতরে ভিতরে রাগে ফোঁসফোঁসানিটা কমে গিয়েছিল, এখন রঘুকে দেখার পর সেটা আবার হতে লেগেছে। মাঝে মাঝে নিশপিশ করছে তার হাত-পা।

বলতে নেই, বীথির হাতে এখন দুটো পয়সা আসছে। তার খরচাপাতি বেশি নয়। তাই রোজগারের অনেকটাই জমে যায়। চোদ্দো-পনেরো হাজার টাকা গাঁয়ের ব্যঙ্কে জমা করেছে সে। ওই টাকাটা নিয়েই চিন্তা। চোরটা যদি টাকার গন্ধ পেয়ে শুঁকে শুঁকে এসে থাকে তা হলে সাবধান হওয়া দরকার। রঘুর মতো লোককে বিশ্বাস করা তো ঠিক নয়। দুশ্চিন্তা হচ্ছে, ভয়ও করছে। কিন্তু কী করা উচিত সেটাই বুঝে উঠতে পারছে না।

কয়েকটা দিন বুকের দুলুনি গেল না বীথির। রঘুর এই আচমকা উদয় হওয়াটা সে মোটেই সহজ মনে মেনে নিতে পারছে না।

ঘরে একটা সেলাই মেসিন বসিয়ে নিয়েছে বীথি। নিজেই কাটে, সেলাই করে, ডিজাইন করে। মোটামুটি বিক্রিও হয়ে যায়। গাঁ-গঞ্জের খদ্দেরের কথা মাথায় রেখে মার্জিন রাখতে পারে না বেশি। আয়ের তুলনায় খাটুনি বেশি। দাম বাড়ালে বিক্রি হয় না।

কাজকর্ম নিয়ে মেতে থাকলে দুর্ভাবনা কমে যায়। তাই সারাদিন নিজেকে ঠেলেঠুলে কাজে বসিয়ে দেয় সে।

এবার হাটবারে দোকান খুলে বসার পর বার বারই আনমনা হচ্ছিল বীথি। ওই বুঝি জাম্বুবানটা আসে! সারাদিনটাই বুকটা ধক ধক করতে লাগল। বার বার ভিড়ের মধ্যে আঁতিপাতি করে নজর করল। না, রঘু এল না আজ। বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হয়ে গেল। যাক বাবা, তা হলে ঘাড় থেকে নেমেছে। বাঁচোয়া।

উনুন নিবিয়ে, কড়াইয়ের তেল টিনে ঢেলে, কাজের মেয়ে দুটোকে গোছগাছে লাগিয়ে দিয়ে পয়সা গুনতে বসেছিল বীথি। ইদানীং হ্যাজাক লণ্ঠন হয়েছে তার। চারদিকে বেশ আলো হয়। মাথা নিচু করে গুনছিল বলে লক্ষ করেনি। হঠাৎ গলা শুনে এমন চমকে গিয়েছিল যে, হাত থেকে পয়সা খসে পড়ে গেল।

এ দোকানটা বুঝি তোমার?

বিহ্বল এবং অসহায় চোখে বিশাল চেহারাটার দিকে একটু চেয়ে রইল বীথি। তারপর চোখ সরিয়ে নিয়ে তেতো গলায় বলল, এখানে তোমার কী দরকার?

লোকটার মুখে একটু শিশুসুলভ হাসি। গলায় কোনও ঝাঁঝ নেই। কোনওকালে ছিলও না। বলল, না, দরকার কিছু নেই তো! গাঁয়ের বিশে বলছিল, তুমি নাকি নয়নপুরের হাটে দোকান দিয়েছ। তেলেভাজার দোকান।

দিয়েছি, দেখতেই তো পাচ্ছ।

সেইটেই দেখার ইচ্ছে হল। আরও দুবার এসেছি, তখন জানা ছিল না।

এখন তো জানলে। এবার যাও।

এই যাই। খবরটবর সব ভালো তো!

আমার খবরের জন্য বুঝি ঘুম হচ্ছে না তোমার!

না, তা নয়। দোকান দিয়েছ শুনে ভাবলাম, যাই গিয়ে দেখে আসি। কতদিন তো তোমার খবর জানতাম না।

এ কথার জবাব না দিয়ে পয়সা গুনতে লাগল বীথি। কিন্তু আসলে সে পয়সা গুনতে পারছিলই না। আবোল তাবোল যোগ করে যাচ্ছিল।

খবর তো পেলে! আর কিছু বলবে?

না। কী আর বলার আছে?

মেয়ে দুটো কাজ থামিয়ে হাঁ করে দেখছিল রঘুকে।

রঘু নিপাট ভালোমানুষের মতো বলল, বউদি সাপকাটিতে মারা গেছে জানো তো!

খবরটা শুনে একবার চোখ তুলল বীথি, কবে?

মাস তিনেক তো হলই। ছেলেমেয়ে দুটো জলে পড়েছে। কেউ দেখার নেই তো। তাই ওদের নিয়ে হাটে এসেছিলাম। যদি একটু ভুলে থাকে।

গায়ে পড়ে এ সব শোনাচ্ছে কেন কে জানে। সে চুপ করে রইল।

আচ্ছা, তবে যাই।

রঘু একটু দূরে বাচ্চা দুটোকে দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছে। এখন ফিরে গিয়ে উবু হয়ে বসে দুজনকে দুই কাঁধে তুলে ফেলল। তারপর লম্বা লম্বা পা ফেলে হাট ছাড়িয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

ও দিদি, লোকটা কে গো?

ও একটা রাক্ষস।

সত্যি গো দিদি, দৈত্যদানোর মতো চেহারা কিন্তু!

ফেরার সময় পা চলতে চাইছিল না বীথির। শরীরে এক ভয়ঙ্কর অবসাদ এসে ভর করেছে। বুকটার মধ্যে একটা কাঁপন।

রাতে ভাত মুখে দিতে পারল না। অনেকটা জল খেয়ে শুয়ে পড়ল। মাথাটা গরম। ঘুম হবে না। হাতপাখা নাড়তে নাড়তে আর আবোলতাবোল ভাবতে ভাবতে রাত ভোর হয়ে গেল তার। শেষ রাতে একটু ঘুমিয়ে বেলায় উঠল।

সকালে উঠেই তার মনে হল, সুদেবের সঙ্গে তার বিয়েতে আবার রঘু কোনও বাগড়া দেবে না তো? পরমুহূর্তে মনে হল, সেই ভয়ের কোনও মানেই হয় না। রঘু কি আর মানুষ?

জায়ের সঙ্গে তার ভাবও ছিল না, আড়াআড়িও ছিল না। মানুষটা কেমন যেন সবসময়ে আঁশটে মুখে থাকত। যেন সব কিছুর ওপরেই বিরক্ত। তখন অল্পবয়স বীথির। সংসারের অনেক ব্যাপারেই জানা নেই। মাথার ওপর কেউ থাকলে ভালো হত। কিন্তু কেউ তাকে শেখানো পড়ানোর দায়িত্ব নেয়নি। শাশুড়ি মানুষটাও কেমন রগচটা। চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলত। তবে ভাসুর লোকটা খারাপ ছিল না। সরকারি চাকরি করত, এখনও করে। গঞ্জে একদিন সাইকেলে চেপে চিঠি বিলি করতে দেখেছেও সে, কথা কয়নি। প্রথম বছর পুজোর সময় তাকে একখানা শাড়ি দিয়েছিল ভাসুর। আর খোঁজখবরও নিত। ওই এক বছরে তিনবার পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়েছিল রঘুকে। কী দিনই যে গেছে। একা ঘরে থাকতে কেঁপে কেঁপে ভয়ে অস্থির হত সে। একটা বছর যেন দুঃস্বপ্ন।

তবু স্বীকার করতে হবে, রঘু তার সঙ্গে কখনও ভুলক্রমেও কোনও খারাপ ব্যবহার করেনি। পুরুষদের নেশাভাঙের অভ্যাস থাকে। রঘু বিড়ি পর্যন্ত খেত না। সব সময়ে নরম গলায় কথা কইত। মাঝে মধ্যে রেগে গিয়ে বীথি ওকে আঁচড়ে কামড়ে দিয়েছে, গালমন্দ করেছে। একবার শিলনোড়ার নোড়া অবধি ছুড়ে মেরেছিল। রঘু সেটা লুফে নেয়, কিন্তু তাকে কিচ্ছুটি বলেনি। লোকে বলত বটে 'অমায়িক খচ্চর'। তা কথাটা মিথ্যে নয়।

যখন তার নাকের ডগা দিয়ে বাবা বীথিকে নিয়ে এল, তখন রঘু তেমন কোনও প্রতিবাদ করেনি, রুখেও ওঠেনি। ভারি মন খারাপ করে উদাস মুখে ঘরের বাইরে তেঁতুলগাছের নীচে বসেছিল। যখন চলে আসছে তখন করুণ গলায় বলেছিল, সব গুছিয়ে টুছিয়ে নিয়েছ তো! কিছু পড়ে নেই তো?

কথাটার জবাব দেয়নি বীথি।

না, সেখানে কিছু পড়ে নেই বীথির। পাট চুকেবুকে গেছে। তার জীবনে রঘুর ভূমিকা শেষ।

বীরেন সাধুখাঁ যে দলিল ভালো লেখে তাই নয়, দলিল তার মনেও থাকে। পঁচিশ বছর আগে কোনও পাঁচি দাসের দলিল করেছিল তাও টুসকে দিলে সে ঠিক মনে করে ফেলে। কিন্তু মুশকিল হল, দলিল দস্তাবেজের বাইরের দুনিয়াটা তার কাছে তত স্পষ্ট নয়। বরং আবছা মতো। দলিল মোতাবেক মানুষগুলোকে তার সবটা মনে থাকে, অন্য মানুষগুলোকে ততটা নয়।

চৌধুরীদের ভাইপো সুদেব সকালবেলাটায় এক ছুঁড়িকে নিয়ে এসে ধরে পড়ল, একটা দলিলের একটু হিল্লে করে দিতে হবে কাকা।

কার দলিল, কী বৃত্তান্ত সব খুলে বলবি তো আগে। মেয়েটা কে?

এরই দলিল। অঞ্জুদির দোকানে কাজ করে। এর নাম বীথি।

অ। তা কী ব্যাপার মা?

আমার বাপ আমাকে দু-আড়াই বিঘে জমি লিখে দিয়েছিল। দলিল ছিল বাবার কাছেই। কিন্তু বাবা মারা যাওয়ার পর দলিলটা আর পাওয়া যায়নি। দাদারা বলছে ওরকম কোনও দলিলই নাকি বাবা করেনি।

বাবার নাম কী?

পরানচন্দ্র কীর্তনীয়া।

আর তোমার নাম?

বীথি দাস।

দাস! তবে ছাড়ান কাটান হয়ে গেছে। বাপের বাড়িতেই থাকতে হবে বলে বাবা বাড়ির পিছন দিককার দু-আড়াই কাঠা জমি লিখে দিয়েছিল।

দু কাঠা, না আড়াই কাঠা?

অত মনে নেই।

কত সাল তা মনে আছে?

বাবা মারা গেছে তা তিন বছর হল। তারও বছরটাক আগে।

গ্রাম, থানা, মৌজা যা যা মনে আছে তা একটা কাগজে লেখো। দলিল হয়ে থাকলে তার কপি পাওয়া যাবে। তবে খরচা আছে মা।

কত টাকা লাগবে?

চার-পাঁচশো ধরে রাখো। কিন্তু কথা হল দলিল বেরলে জমি দখলের ব্যাপার আছে। দাদারা যদি দিতে না চায়, তা হলে লাঠালাঠি করে নিতে হবে। তুমি একা মেয়ে তো, তাই বলছি।

দাদারা সহজে দেবে না।

জমি বড় সাঙ্ঘাতিক জিনিস মা, সব্বনেশে ব্যাপার। এ বয়স পর্যন্ত কত দেখলুম। সার্টিফায়েড কপি নিয়ে দাদাদের দেখাও। তারা মেনে নিয়ে জমি ছেড়ে দিলে তো মিটেই গেল। না হলে মামলা মোকদ্দমায় নামতে হবে।

সুদেব বলল, ন্যায্য দাম দিলে ও জমি ছেড়ে দেবে।

দেখো চেষ্টা করে। দিন পনেরো বাদে খোঁজ নিও। শ'চারেক টাকা রেখে যাও।

দলিলের কপি বের করাটা কোনও মেহনতের ব্যাপার নয় বীরেন সাধুখাঁর কাছে। কিন্তু যেটা ধন্দের ব্যাপার সেটা হল, দলিলটা তারই লেখা। এবং মাত্র বছর চারেক আগে। কিন্তু পরানচন্দ্র কীর্তনীয়ার নামটা তার মনেই পড়েনি। ঝট করে সবার নাম মনে পড়বে এমনটা নাও হতে পারে। কিন্তু নামটা শুনলে মাথার মধ্যে একটু টিকটিক তো করবে রে বাপু! কেন যে করল না কে জানে। তবে দলিলের কপি হাতে পাওয়ার পর পরানচন্দ্রকে বেশ মনে পড়ে গেল তার। রসগোল্লা আর পান খাইয়েছিল দলিল রেজিস্ট্রি হওয়ার পর।

মেয়েটা এল দিন পনেরো পর। দলিলটা তার হাতে দিয়ে বীরেন বলল, ধর্মত, ন্যায্যত জমিটা তোমারই মনে হচ্ছে। এখন দেখোগে দখল পাও কি না। গাঁ-গঞ্জে এখনও জোর যার মুলুক তার, তায় তুমি একা

মেয়েমানুষ।
মেয়েটা কেমন থমথমে মুখ করে বসেছিল। দলিলটা হাতে মুঠো করে ধরা। যেন উৎসাহটা নিবে গেছে। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, দিন সাতেক আগে দাদারা মিটিং করে আমাকে বলল, যে ঘরটায় এখন আছি সেই ঘর আর পিসির ঘরখানা আমায় দিয়ে দেবে। কিন্তু ও বলছে, ও ঘরের কোনও দাম নেই। বরং জমিটা বেচলে বেশ কিছু টাকা পাওয়া যাবে।
বীরেন একটু হাঁ করে থেকে বলল, কার কথা বলছ মা?
সুদেব।
সুদেব বেচে দিতে বলছে?
হ্যাঁ।
কিন্তু দখল পেলে তো বেচবার কথা। চেষ্টা করে দেখতে পারো। তা সুদেব বেচতে বলছে কেন? তার গরজ কী?
বলছে, গাঁয়ে তো আর পড়ে থাকতে হবে না, জমি ফেলে রাখার মানেই হয় না।
সব গুলিয়ে যাচ্ছে মা, কিছু বুঝতে পারছি না। গাঁয়ে থাকবে না তো থাকবে কোথায়?
সুদেবের সঙ্গে যে আমার বিয়ে।
বুড়ো বয়সের নানা দোষ। জটিল জিনিস পরিষ্কার হতে একটু সময় লাগে। তা বীরেন সাধুখাঁরও লাগল। এবং পরিষ্কার হয়ে মোটেই ব্যাপারটা ভালো লাগল না তার। বিরস মুখে বলল, তাই বলো।
মেয়েটার একটু লাজলজ্জা আছে। বিয়ের কথাটা বলে ফেলেই মাথা নিচু করে ছিল কিছুক্ষণ।
কথাটা হল সুদেবের জন্য তার কাকা অনিরুদ্ধ চৌধুরী পাত্রী খোঁজ করতে লেগেছেন। বীরেনকে হুড়োও দিচ্ছেন রোজ। তা বীরেন মোটমাট জনা চারেক পাত্রী বেছেছে। একটাও ফ্যালনা নয়। গত এক মাসে তিনটি পাত্রীকে সদলবল দেখেও এসেছেন অনিরুদ্ধবাবু। আর একটি দেখে নিয়ে তবে পাকা কথা হবে। কিন্তু এ মেয়েটা যা বলছে, তাতে তো সব কেঁচে যাবে। তার ওপর একটা কেচ্ছাও তো বটে। অনিরুদ্ধবাবু একজন মান্যগণ্য লোক। তার ভাইপো হয়ে সুদেব যদি এখন অন্যের ভাগানো বউয়ের সঙ্গে বিয়ে করে বসে, তা হলে শহরে একটা ছিছিক্কারও পড়ে যাবে তো!
বিয়ের কথাটা বলতে সুদেব বারণ করেছিল।
বীরেনের গলায় আর রসকষ রইল না। একটু রুখু গলাতেই বলল, বলে ভালোই করেছ। নইলে জল আরও গড়াত।
মেয়েটা এ কথায় যেন একটু জড়সড় হয়ে গেল। তারপর সঙ্কোচে উঠে দাঁড়াল। বলল, আসছি কাকা।
এসো গিয়ে।
কাঁচা বয়সে পছন্দের মেয়েছেলের জন্য পুরুষমানুষ না পারে হেন কাজ নেই। দু-দিন পরই পুরুষের ফূর্তি উবে যায়। জোয়ার নেমে যাওয়ার পর কাদায় পা হড়কানোর পালা। তা কি আর করা যাবে, যে বয়সের যা ধর্ম। বীরেন সাধুখাঁ নিজেও কি একসময়ে পটলির জন্য পাগল হয়নি! বাবা জুতোপেটা করে কান ধরে নিয়ে গিয়ে বনমালার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিল। তা তখনকার কথা ভিন্ন।
কিন্তু সুদেব বড্ড ভাবিয়ে তুলল বীরেনকে। কমলপুরের পরেশ রায়ের মেয়ে শিবানীকে অনিরুদ্ধবাবু একরকম দেখেই রেখেছেন। শেষ অবধি ওখানেই পাকা কথা হয়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা। ভাদ্র মাস আর দিন পনেরো, তারপর আশ্বিন কার্তিক পেরলে অগ্রহায়ণেই বিয়ে হবে বলে একরকম ঠিক হয়ে আছে। কিন্তু এ তো একেবারে সানকিতে বজ্রাঘাত!
মেয়েটা দরজার ও পাশে গিয়ে পায়ে চটি গলাচ্ছিল। একটু গলা খাঁকারি দিয়ে বীরেন তাকে ডাকল, শোনো বাছা, আর একটু বসেই যাও বরং। দু-একটা কথা জানার আছে।

মেয়েটা একটু অবাক হল। চটি ছেড়ে আবার ভিতরে এসে চেয়ারে চুপটি করে বসল। চেহারাখানি মন্দ নয়। মুখে শ্রী আছে। বয়সের চটক আছে। রংমাখা চেহারা নয়।

বীরেন বলল, বিয়েটা টিকল না কেন বলতে পারো?

টিকবে কী করে? লোকটা যে চোর।

চোর! বীরেনের একগাল মাছি। হাঁ মুখটা বন্ধ হচ্ছিল না যেন। তারপর অবাক গলায় বলল, তা চোরকে বিয়ে করতে গেলে কেন?

প্রশ্নটা করেই নিজের ভুল বুঝতে পারল বীরেন। আহাম্মক আর কাকে বলে! চোর-ডাকাতদের কি আর বিয়ে হচ্ছে না নাকি? আকছার হচ্ছে। গুণ্ডা-বদমাশ লাফাঙ্গারা কি আর আইবুড়ো থেকে যাচ্ছে নাকি? আরও নির্যাস সত্যি কথা বলতে গেলে বলতে হয়, অল্পবিস্তর চোর নয়ই বা কে? ধর্মত ন্যায্যত গোটা দেশটাই তো গিজগিজ করছে রকমারি চোরে। ছোটলোক চোর, ভদ্রলোক চোর, বড়লোক চোর, উর্দিপরা চোর, সরকারি চোর, বেসরকারি চোর। চোরে চোরে ধুল পরিমাণ।

মেয়েটা কিছুক্ষণ চুপচাপ মাথা নিচু করে বসে রইল। তারপর খুব মিনমিনে গলায় বলল, চোর বলে তো তখন বোঝা যায়নি। এক আত্মীয় সম্বন্ধটা এনেছিল। বাবা তখন আমার বিয়ে দেওয়ার জন্য ভারি ব্যস্ত। তাই হয়ে গেল।

সে তোমাকে আইনমাফিক ত্যাগ দিয়েছে তো!

গাঁ দেশে তো আর আইনটাইন কেউ জানে না। বিয়ের পর যখন দেখা গেল, ওকে বার বার পুলিশ ধরে নিয়ে যায় আর জেল খেটে আসে, তখনই বাবা গিয়ে আমাকে নিয়ে আসে। বিয়ের বছরটাক পরে।

ছেলেপুলে হয়নি?

মেয়েটা মাথা নেড়ে বলে, না।

তা কতদিন আগে বিয়ে হয়েছিল?

বছর পাঁচেক আগে।

তখন বয়স কত?

পনেরো।

তা হলে সেই বিয়ে তো পাকা বিয়েই নয়। আইনে টেকে না। তুমি তখন মাইনর ছিলে।

হ্যাঁ।

কিন্তু কথা কি জানো বাপু, সুদেব হল অনিরুদ্ধ চৌধুরীর সাক্ষাৎ ভাইপো। বড় বাড়ির ছেলে। অকালে বাপ মরায় কাকার হাতেই মানুষ। কাজ-কারবারও কাকার কাছেই শেখা। ওকে যদি বিয়ে করো তা হলে পরিবারে খুব অশান্তি হবে। ভালো করে ভেবেচিন্তে দেখো মা।

মেয়েটা মাথা নিচু করে ছিল। হঠাৎ আঁচল তুলে চোখ দুটো মুছল। তারপর ধরা গলায় বলল, আমি কি করব বলুন, সুদেবই তো—

এক হাতে কি আর তালি বাজে বাপু? তা সে যাকগে, তোমার আর দোষ কী? তুমি তো আর ইচ্ছে করে চোরের ঘর করতে যাওনি! এই কাঁচাবয়সে তোমার গতিই বা কী হবে! সে দিক থেকে দেখতে গেলে সুদেব একটা মহৎ কাজই করছে। কিন্তু আমি ভাবছি সুদেবের কাকা শুনলে কী কাণ্ডটাই না হবে। এমনিতে ঠান্ডা মাথার লোক বটে, কিন্তু রেগে গেলে হিতাহিত জ্ঞান থাকে না।

মেয়েটা খুব নিচু গলায় বলল, কিন্তু এখন তো আর উপায় নেই।

বীরেন একটা বড় শ্বাস ফেলে বলে, তা বটে। তা তোমার বর এখন কোথায়? জেল খাটছে, না ফেরার? খবরটবর পাও?

ফেরার নয়। ক'দিন আগেই নাকি জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে।

তোমার খোঁজখবর নেয়?

না। তবে কদিন আগে দেখা হয়েছিল।

বটে! বিয়ের কথা কি তার কানে গেছে?

মেয়েটা মাথা নেড়ে বলে, না।

চোর-ডাকাতরা তো আর ভালো লোক হয় না মা, তাই বলছি। বিয়ের কথা শুনলে সে আবার বিগড়ে বসবে না তো! আইন তার হাতে নেই বটে, কিন্তু চাপ দিয়ে কিছু আদায় উসুল করার চেষ্টাও তো করতে পারে! চারদিক খতিয়ে দেখতে বলছি।

মেয়েটা মাথা নেড়ে বলে, সে সেরকম লোক নয়।

তা হলে কীরকম লোক?

খুব ভিতুগোছের, নরমসরম। কখনও উঁচু গলায় কারও সঙ্গে কথা বলে না। আমি রেগে গিয়ে কত গালমন্দ করতাম, কক্ষনও উলটে আমাকে কিছু বলেনি। কখনও গায়ে হাত তোলেনি।

বলো কী?

নেশাভাং পর্যন্ত করত না। এমনকি বিড়ি, সিগারেটও না।

বলতে বলতে মেয়েটার নিচু মাথা যেন ঝাঁকি খেয়ে সোজা হল। আর মুখেচোখে বেশ একটা উদ্দীপনার মতো। লক্ষণটা বীরেন সাধুখাঁর পাকা চোখে খুব একটা খারাপ ঠেকছে না। লক্ষণটা ভালোই।

বীরেন একটু হেসে বলেই ফেলল, তোমার কথা শুনে তো মনে হচ্ছে তাকে তোমার বেশ পছন্দই ছিল!

মেয়েটা এ কথায় থতমত খেয়ে বলল, সে কথা তো বলিনি! পছন্দ হবে কেন? মোটেই পছন্দ ছিল না।

তার চেয়ে কি সুদেব ভালো পাত্র মা?

মেয়েটা ভারি অস্বস্তিতে পড়ে ফের মাথা নিচু করে ফেলে বলল, সুদেবের সঙ্গে কি ওর তুলনা হয় কাকা? সুদেবের নখের যুগ্যিও নয়।

ভালো, ভালো। তা তোমার শ্বশুরবাড়ি কি কাছেপিঠে কোথাও?

মুকুন্দপুর।

অ। সে তো এক লহমার রাস্তা।

বীথি উঠল। বলল, আজ আসি কাকা।

এসো গিয়ে।

মেয়েটা চলে যাওয়ার পর বীরেন সাধুখাঁ খানিকক্ষণ বসে রইল। কোথায় একটা বেসুর বাজছে। নদী যেমন সোজাসুজি সমুদ্রে বাঁক খায় না, নানা বাঁক, নানা জটিল-কুটিল ফেরতা ফিরে, উজান ভাটেন করে, অন্য সব নদীর সঙ্গে গলাগলি মেরে নিয়ে তারপর মোহানায় পৌঁছয়, মানুষের জীবনটাও তাই। অঙ্ক বড় সরল নয়।

সৎ পথে বলে একটা পথ আছে বটে, তবে সেটা বড্ড ঘুরপথ বলে এখন আর পথটা কেউ বড় একটা মাড়ায় না। বিষ্ণু দত্ত যখন পুলিশে চাকরি পেল, তখন সে ভেবেছিল সে আর পাঁচজনের মতো এলেবেলে পুলিশ হবে না। চোর-ডাকাত, গুন্ডা-বদমাশদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে সৎ পথে আনবে। লোকে পেটের দায়েই না ও সব করে। সে চোরদের চুরি, ডাকাতদের ডাকাতি, গুন্ডাদের গুন্ডামি আর বদমাশদের বদমাইশি ছাড়িয়ে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে।

তা যেই কথা সেই কাজ। বিষ্ণু দত্ত পুলিশের চাকরিতে ঢুকেই চোর-গুন্ডাদের পিছনে আদাজল খেয়ে লেগে গেল। তা তার কথা শুনতও তারা। বেশ মন দিয়ে শুনত। মাঝে মাঝে হাই তুলত বটে, কিন্তু প্রশংসাও করত। বলত, না, ইনি একজন বেশ ভালো লোক। অন্য পুলিশ বা ওপরওয়ালারা তাকে নিয়ে হাসাহাসি করলেও চোর, ডাকাতরা কক্ষনও করত না। তবে বছর পাঁচেকের চেষ্টায় যখন সে বিশেষ সুবিধে করে উঠতে পারল না, তখন এক বুড়োসুড়ো পাকানো চেহারার চোর বনমালী তাকে বলেছিল, স্যার, সংসারের নীচের দিকে যেমন চোর-জোচ্চোর দেখতে পাচ্ছেন, ওপর দিকে তাকালেও তেমনি দেখতে

পাবেন। সংসারের গাছে গাছে চোর বসে আছে স্যার। যার গায়ে হাত দেবেন সেই চোর। ভারি উর্বরা দেখা তো, চোরের খুব ফলন।

ক্রমে ক্রমে বিষ্ণু দত্ত অনেক পালটে গেছে। সে আর চোর-ডাকাতদের সৎপথে ফেরানোর চেষ্টা করে না। তবে বলতে নেই চোর-ডাকাতদের সৎপথে ফেরাতে গিয়ে তার চোর চেনার কিছু ক্ষমতা হয়েছে। কিছু আছে, যাদের জিনের মধ্যে ঘাপটি মেরে চোর বসে আছে। তাদের ইনস্টিংক্টে সেঁধিয়ে আছে চুরি। তাদের চোখেমুখে চোরের গুপ্তকথা প্রকাশ হয়ে পড়ে। বিষ্ণুর পাকা চোখ সব দেখতে পায়। আর কিছু আছে, আর কিছু পেরে ওঠেনি বলে চুরিতে নেমে পড়েছে। এরা তেমন পেরে ওঠে না কখনও। বড্ড যা তা ভুলচুক করে বসে।

আর কিছু না হোক বিষ্ণু চোর চেনে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, চোর সম্পর্কে তার এই গভীর জ্ঞান তেমন কোনও কাজে লাগল না। সে নিয়মমাফিক পুলিশ হয়ে গেল। চোরেরা রয়ে গেল চোরেদের জায়গায়।

তাই সন্ধেবেলায় বীরেন সাধুখাঁ এসে হঠাৎ একটা চোরের তত্ত্বতালাশ নিতে শুরু করায় খুশিই হল বিষ্ণু। নাক সিঁটকে বলল, রঘু! আরে দূর দূর! ওটা আবার চোর নাকি? একটা গর্ভস্রাব। চোর বংশের কুলাঙ্গার। ওর তো চোরের জিনটাই নেই।

বটে! তবে জেলখাটে বলে শুনি যে!

তা খাটে। কাঁচা হাতের কাজ করলে খাটারই কথা। বুদ্ধির দোষে বলির পাঁঠাও হতে হয়। কোটা পূরণ করার জন্য মাঝে মাঝে খামোখা ধরে এনে কেস দিয়ে দেয় পুলিশ। হদ্দ বোকা হলে যা হয়, বোকার মতো মেয়াদ খেটে মরে।

তার যে একটা বিয়ে হয়েছিল তা জানো?

হয়েছিল নাকি?

জেল খাটত বলে বিয়ে ভেঙে গেছে।

তা ওরকম কতই তো হয়। কিন্তু আজ হঠাৎ রঘু শালাকে নিয়ে আপনার চিন্তা হচ্ছে কেন?

বৃত্তান্ত একটু আছে ভায়া। রঘু নস্করকে আমার একটু দরকার।

তার আর ভাবনা কী? গঞ্জে এলে মাঝে মাঝে আসে আমার কাছে। গল্পটল্প করে যায়। যতদূর জানি এখন ছাড়া আছে। এলে পাঠিয়ে দেবোখন আপনার কাছে।

৫

বউ মরলে শোকের চেয়ে বিপদ বেশি। শিবুর আবার ডবল বিপদ। প্রেম-পিরিতের কথা হচ্ছে না, আসল কথা হল, একটা ঘুঁটি নড়ে গেলে সংসারের সিস্টেমটাই হাঁটকে মাটকে যায়। দু দুটো গুয়ের গ্যাংলা বাচ্চা, তার ওপর বুড়ি মা নিয়ে একটা আতান্তরে পড়ে শিবু যখন গলা জলে, তখনই তার লায়েক শালা যতন এসে উদয় হল সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে। এবং শিবু তাকে মোটেই সেই যতন বলে চিনতে পারল না। সেই যতন আর নেইও। ভ্রু কোঁচকানো, চোখে রীতিমতো বাঘা চাউনি, আর গলার কী জোর বাবা। চেঁচিয়ে মেচিয়ে পাড়া কে পাড়া, গ্রাম কে গ্রাম জড়ো করে ফেলল। কী বৃত্তান্ত? না, তার বোনকে নাকি খুন করা হয়েছে। মুকুন্দপুরের নিমকহারাম লোকদের আসল চেহারা এতকাল চিনতে পারেনি শিবু। যতনের চেঁচামেচিতে তারাও বেশ ঢলে পড়তে লাগল তার দিকে। দু-চারজন তার পক্ষ নিলেও তেমন সুবিধে করে উঠতে পারল না। যতন পার্টিবাজি করে, ভাষণটাসন দেয়, কথার মারপ্যাঁচ তার ভালোই জানা। শিবুর তখন একগাল মাছি।

বলতে নেই যতনের সঙ্গে তার এতকাল খাতির-মহব্বতই ছিল। ছিল যাতায়াতও। কোনও শলাপরামর্শ করতে হলে সে গিয়ে যতনের কাছেই হাজির হয়ে যেত। এমনকী তার কুলাঙ্গার ভাই রঘুকে কী করে বাড়ি থেকে উৎখাত করা যায়, তারও একটা ব্যবস্থা এঁটে রেখেছিল দুজনে মিলে। তা সেই যতন রাতারাতি পালটে যে এরকম মুষল হয়ে দাঁড়াবে কে জানত। বউ মরার জ্বালা হাড়ে হাড়ে টের পেল শিবু।

পুলিশের বরাবরই একটু গদাইলশকরি চাল। তবে দু'দিন দেরি হলেও, তারা এল। এবং শিবুকে ধরে নিয়ে গিয়ে পুরল ফাটকে। কেস হলে চাকরি নিয়ে টানাটানি হবে, এ শিবুর জানা ছিল। বিষ্ণুবাবু গম্ভীর হয়ে শুধু বললেন, তোর ভাগ্যি ভালো যে বউ গলায় দড়ি দিয়ে মরেনি। সাপকাটির কেস খুন বলে চালানো শক্ত। পোস্টমর্টেম রিপোর্টে কী বেরয় দেখি।

জল অবশ্য বেশি ঘোলা হল না। শিবু ছাড়া পেল, চাকরিও বেঁচেবর্তে রইল। কিন্তু দুনিয়ার ওপর শিবুর একটা খাপ্পাভাবও এসে গেল। বউ-মাগি যে কেন ঘরে পাকা ব্যবস্থা থাকতে রোজ মাঠ সারতে যেত, সেটা শিবু বিস্তর ভেবেও বের করতে পারেনি। আসলে ছোট নজর হলে যা হয়। ছোটলোকের বেটি তো। পায়খানা ঝকমকে থাক, আমরা যেমন ছিলুম তেমনি রইলুম। আর সাপশালারও আক্কেল দেখ, আর কাউকে পেলি না, বিষ ঢাললি শিবুর কপালে!

পুলিশ ছাড়লেও যতন কিন্তু নাছোড়। ফের একদিন সদলবল চড়াও হয়ে বিয়েতে দেওয়া জিনিসপত্তর তুলে নিয়ে গেল। পণের টাকার জন্য শাসিয়ে রেখে গেল।

এমনিতে ঠান্ডা সুস্থির মানুষ শিবু। সহজে মাথা গরম হয় না তার। কিন্তু যতনের উৎপাতে বড্ড তেতো হয়ে গেল ভিতরটা। শালা, গুখোরের ব্যাটার আক্রোশ দেখে ক্রমে ক্রমে তারও শীতল মেজাজটা ধীরে ধীরে টং হতে লাগল। শালা পেয়েছে কী শিবুকে? ভেড়ুয়া নাকি?

বিয়েতে মোটে দু হাজার টাকা পণ আদায় হয়েছিল, আর একখানা সাইকেল। সাইকেলখানা আগেই নিয়েছে। পণের টাকা বাবদ প্রথম কিস্তিতে পাঁচশো টাকা ফেরত দিতে হয়েছে। ভয় খেয়েই দিয়েছে শিবু। পার্টি করা লোকের অসাধ্যি কীই-বা আছে! শিবুর পাশে দাঁড়ানোর মতো তো কেউ নেই।

বউ মরতে না মরতে বিয়ে করাটা যে ভালো দেখাচ্ছে না, এটা কেউ কেউ বুঝিয়েছিল শিবুকে। কিন্তু শিবুর সাফ কথা, ওই যতন শালাকে শিক্ষে দেওয়ার জন্য বিয়ে করতে হবে।

তার ঘর সংসারের অবস্থা কহতব্য নয়। বুড়ি মায়ের শতেক রোগ, শতেক ভোগ। ব্যথা বেদনায় কাতর। দুটো গ্যাদরা বাচ্চাকে সামলানো আর হেঁশেল চালু রাখা মায়ের কর্ম নয়। কোনও রকমে ডালেচালে সেদ্ধ করে নামায়। ছেলেমেয়ে দুটোর যত্নআত্তির বালাই নেই। শিবুরও নানারকম অসুবিধে। একবার বউতে অভ্যেস হয়ে গেলে বউ ছাড়া চালু থাকা মুশকিল।

তা বিয়ের একটা জোগাড় হয়েছে। দু-চার দিনের মধ্যেই পাকা কথা হয়ে যাবে।

ঠিক এই সময়ে জাম্বুবানের মতো রঘু এসে উদয় হওয়ায় ভারি বিরক্ত হয়েছিল শিবু। বংশের কুড়াল বলতে যা বোঝায় রঘু হল তাই। তার বাবদে এ বাড়ির মানসম্মান বলতে কিছু আর বাকি রইল না। ওই অত বড়সড় গতরখানা নেড়ে আর কিছু করে উঠতে পারল না হারামজাদা। চোরের খাতায় নাম তুলে ফেলল। ঝগড়া হলে বাসন্তী প্রায়ই বলত, কত আর হবে, চোরেরইতো ভাই। কথা ছিল, এবার রঘু মেয়াদ খেটে ফিরলে যতন তার দলবল নিয়ে এসে হাজির হবে, তার পর সালিশি বসিয়ে গাঁ-ছাড়া করবে তাকে। রঘু এমনিতে মিনমিনে, ভিতুর ডিম। আর চুরি-জোচ্চুরি যারা করে বেড়ায় তাদের বুকের পাটা একটু চুপসেই থাকে। ওর শ্বশুর এসে তার মেয়েকে নিয়ে চলে গেল নাকের ডগা দিয়ে, বুকের পাটাওয়ালা পুরুষ হলে রুখে দাঁড়াত।

প্রথমটা বিরক্ত হলেও দু-চারদিন পর শিবু টের পেল, রঘু আসায় কিছু খারাপ হয়নি। তার ছেলেমেয়ে দুটোর একটা সঙ্গী হয়েছে। রঘু ওদের নিয়ে বেড়ায় টেড়ায়, গল্প করে, স্নান করায়। বাসন্তী বেঁচে থাকতে ওরা রঘুর ছায়াও মাড়াত না। কিন্তু রঘুকে পেয়ে ওরা যেন বেশ মায়ের শোক ভুলেছে। মায়ের কাজেও রঘু একটু সাহায্য-টাহায্য করে। শিবু এতকাল কথাই বলত না ভাইয়ের সঙ্গে। একদিন একটু কথাটথাও বলে ফেলল। শত হলেও মায়ের পেটের ভাই তো, ফ্যালনা নয়। তবে শিবু ফের বিয়েয় বসলে ভাইয়ের কাছ থেকে আলগা দিতে হবে।

একটা মানুষ মরে গেলে সংসারের হাল যেমন খারাপ হল, তেমনই আবার সম্পর্কেরও কিছু অদলবদল ঘটল। মনো আর মিতুল কাকাকে চিনতই না। আর এখন তাদের কাকা ছাড়া চলে না। দুজনে এঁটুলির মতো লেগে থাকে কাকার সঙ্গে। বাসন্তী বেঁচে থাকলে এ জিনিস ভাবাই যেত না।

একটু আধটু ভাবসাব হলেও রঘু এখনও ভিতর বাড়িতে বিশেষ আসে না। তবে টিউবওয়েলের জল নিয়ে যায়। শিবু নিজের পুরনো জামা গোটা দুই দিয়েছে। তবে সে বিশেষ লম্বা-চওড়া নয় বলে তার জামা রঘুর গায়ে বেশ আঁটো হয়। চ্যাংড়াট্যাংড়া কিছু বন্ধুবান্ধব আছে রঘুর, তারা বিশেষ ভালো লোক নয়। তবে তারা রঘুকে দেখেশোনে।

শিবুর রোজগারপাতি খারাপ কিছু নয়। বউ মরে ইস্তক একজনের খোরাকি কমেছে। সে দোনোমোনো করছিল, রঘুকে দু বেলা দুটি ভাত খাওয়ার কথা বলবে কি না। তারপর ভেবে দেখল, বিয়ে করলে নতুন বউ এসে আবার সম্পর্ক পালটে দেবে। দরকার কী ভেজাল বাড়িয়ে।

বিয়ের সাইকেলখানা যতন একরকম কেড়েই নিয়ে গেছে। জোর যার মুলুক তার। কী আর করা যাবে! শিবুও হাঙ্গামা করার লোক নয়। পুরনো সাইকেলটা মরচে-টরচে ধরে লজঝড়ে অবস্থা। সেটাই সারিয়ে-টারিয়ে নিয়েছে শিবু। এখন দিব্যি চলছে। বিয়েতে লোচন সর্দার একখানা ভালো সাইকেল দেবে বলে কবুল করে রেখেছে। কিন্তু সাইকেলে আর তেমন জুত হচ্ছে না। আজকাল গাঁ-গঞ্জের ছেলেছোকরারা ধপাধপ মোটরবাইক কিনে ফেলছে। পুরো টাকা ডাউন করারও ব্যাপার নেই। কিস্তিতে কিস্তিতে দিলেই চলে। লোচন সর্দারের কানে প্রস্তাবটা একবার দিয়ে রাখলে কেমন হয়? দেওয়া যায়। কিন্তু ব্যাটা মানবে কি না সেটাই কথা।

মোটরবাইক হলে গাঁ থেকে গঞ্জের পোস্ট অফিস যেতে কুড়ি-পঁচিশ মিনিটের বেশি নয়। রাস্তা ভালো থাকলে আরও কম। বর্ষায় রাস্তাটা বড্ড চোট খেয়ে গেছে কি না।

লোচনের ছোটো মেয়ে প্রণতি। মেয়েটাকে বড্ড চোখে লেগে গেছে শিবুর। মুখের ডৌলখানা ভারি মিষ্টি, চোখেমুখে আলগা চটক আছে একটা। বেশ ভদ্রলোকের ঘরের মেয়েদের মতো ভাব। তা বড় বাড়ির ভালো ভালো মেয়েদের সঙ্গে নিত্যদিন ওঠাবসা করলে ওরকম হয়ে পড়ে। সঙ্গেরও তো গুণ আছে। লোচনকে মোটরবাইকের কথা একবার বলবে সে! যদি মোটরবাইক নাও দেয়, তা হলেও পরোয়া নেই। পাত্রী যখন পছন্দ তখন মোটরবাইক না হলও চলবে।

এই ভাদুরে ভ্যাপাসা গরমে এতটা পথ সাইকেল চালিয়ে আসতে শরীরের জল সব ঘামের সঙ্গে বেরিয়ে গেছে। পুরো এক বোতল জল ভিতরে নামিয়ে দিয়ে শিবু সর্টিংয়ে বসে গেল।

আদিনাথ একটা নিভন্ত বিড়ি ফের ধরিয়ে বলল, তোমাকে একটা কথা বলে রাখি শিবু।

কী কথা?

দুদিন হল দেখছি, গোটা তিনচার ছেলেছোকরা আড়ায় আড়ায় ঘুরছে। গতকালও স্ট্যাম্প কাউন্টারে এসে এস ও ফর্মের খোঁজ করছিল। সাপ্লাই নেই শুনেও দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ গুলতানি করে চলে গেল। পরশু এসে অমুকের নামে পার্সেল এসেছে কি না জিগ্যেস করছিল। ও সব হচ্ছে বাহানা। ছেলেগুলো মোটেই সুবিধের নয়।

শিবু অবাক হয়ে বলে, এতে আমাদের কী?

আমার মনে হয় ছেলেগুলো তোমাকে সাইজ করতে আসছে।

শিবু তাজ্জব হয়ে বলে, আমাকে! আমাকে সাইজ করবে কেন?

কারণ আছে বলেই বলছি। কিছু মনে কোরো না, লোচন সর্দারের মেয়ে প্রণতির সঙ্গে কিন্তু বগার লাইন আছে। আমরা গঞ্জে থাকি তো, সবই চোখ পড়ে। একটু সাবধান হোয়ো। মেয়েছেলের ব্যাপারে ছেলেছোকরারা একটু হিরো বনতে চায় তো! মুখোমুখি না পারে, পিছন থেকে হিট-ফিট মেরে বসলে আটকাচ্ছে কে?

শিবু একটু দমে গেল। তারপর চাপা গলায় বলে, মেয়েটা কি নষ্ট নাকি হে?

আরে দূর! অত দুর নয়। বয়সের ধর্ম তো, একটু-আদটু ফষ্টিনষ্টি আর কী। চৌধুরীবাড়িতে শাসন খুব কড়া। বেচাল দেখলে রক্ষে নেই। আমি বলি কী, তোমার বেশি বেরনোর দরকার নেই। বিলিটিলিগুলো ই ডি স্টাফরাই করে দেবে। তুমি সর্টিং ভেন্ডিংটা দেখো।

আদিনাথ চিন্তায় ফেলে দিল শিবুকে।

দু দিন বাদে শিবু গঞ্জের বাজারে কিছু সওদা করে ফিরছিল। সেই সময়ে একটা দৃশ্য দেখে হতভম্ব হয়ে গেল সে। রথতলা থেকে যে রাস্তাটা কবরখানার পাশ ঘেঁষে দরগা পর্যন্ত গেছে, সেই রাস্তায় সাঁ করে একটা সাইকেল নেমে গেল। চালাচ্ছে একটা কাপ্তানগোছের ছোকরা, রডে তার বুক ঘেঁষে একটা মেয়ে বসা। এক ঝলকে প্রণতি বলেই মনে হল যেন! রাস্তাটা ভারি নিরিবিলি। লোক চলাচল নেই। নির্জনে দুটো বয়সের ছেলেমেয়ে কত কী ঘটিয়ে ফেলতে পারে।

রথতলার বটগাছের নীচে একটু থমকে দাঁড়িয়ে রইল শিবু। তার কী করা উচিত সে বুঝতে পারছিল না। কিন্তু তার মাথাটা গরম হয়ে উঠছিল। এ রকম তো হওয়া উচিত নয়। বয়সের মেয়ে, দু দিন পর বিয়ের পিঁড়িতে বসবে, তার কি এসব করা উচিত? আর ওই ছোকরাই বা কেমন? ওরই দলবল নাকি পোস্ট অফিসে গিয়েছিল তাকে সাইজ করতে!

শিবু ঠাণ্ডা মানুষ। সহজে রাগে না, উত্তেজিত হয় না। কিন্তু রাগ চড়ে গেলে নিজেকে সামলাতেও পারে না। একটু দোনামোনো করে সে মুদির দোকানে ব্যাগটা রেখে কবরখানার রাস্তায় আগু হল।

বেশি দূর যায়নি। কবরখানার দেয়াল ঘেঁষে যে শিশুগাছটা ঝেপে আছে তার ছায়ায় সাইকেলটাকে কেতরে থাকতে দেখল সে। আরও একটু এগিয়ে দু জন বড্ড ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে দেয়ালে ঠেসান দিয়ে দাঁড়ানো।

রাগটা লাগাম ছিঁড়ে এমন বেহাত হয়ে গেল যে শিবু আর সামাল দিতে পারল না নিজেকে। তার মুখ থেকে একটা বাঘা গর্জন বেরিয়ে গেল, তবে রে শুয়োরের বাচ্চা!

ছায়া দুটো ছিটকে সরে গেল বটে, কিন্তু বগা নড়ারও সময় পেল না। খ্যাপা মোষের মতো শিবু গিয়ে পড়ল তার ওপর। বগার সাধের লম্বা চুল, সেটা বাগাতে তার ঘণ্টাখানেক সময় লাগে প্রতি বেলা। শিবুর বজ্রমুষ্ঠিতে এখন সেই চুল, টানের চোটে পটপট করে ছিঁড়ছে। অন্য হাতে মুগুরের মতো ঘুঁষি মারছে শিবু।

লজ্জা করে না হারামজাদা, খানকির ব্যাটা! ঘরের মেয়েছেলে ফুসলে বার করিস...ঘরে মা-বোন নেই তোর...

দৃশ্যটা খানিকক্ষণ হাঁ হয়ে দেখল প্রণতি। তারপর নিজের ঘোর বিপদ বুঝে পাঁই পাঁই করে ছুটে অদৃশ্য হয়ে গেল।

দু-চারটে ঘুঁষির পরই বগা জমি ধরে নিয়েছে। গোঁ গোঁ আওয়াজ বেরচ্ছে মুখ দিয়ে। তার কাঁকালে একটা লাথি জমিয়ে শিবু একটু ঠান্ডা হল।

উল্টোদিকের মাঠে বিশ্বেসদের রাখোয়াল নেলো ঘাস কাটছিল। কাজ থামিয়ে কাণ্ডটা দেখে খুশি হয়ে উঠে এসে বলল, ভালো কাজ করলে একটা। বগা শালার বড্ড বাড় বেড়েছে।

তার শরীরের যে এমন খ্যাপা রাগ আছে, তা এতকাল টেরই পায়নি শিবু। খুনখারাবিও হয়ে যেতে পারত। কিন্তু রাগটা নেমে যাওয়ার পর বেশ কাহিল লাগছিল শিবুর, যেমনটা জ্বর ছেড়ে যাওয়ার পর হয়। সেই সঙ্গে ভাবনা এসে জুড়ে বসল, এই মারের তো পালটিও আছে! বগার দল কি ছেড়ে কথা কইবে তাকে?

সব শুনে আদিনাথ বলল, ভায়া, আমাদেরও মাঝে মাঝে অমনধারা ইচ্ছে যায় বটে। কিন্তু ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করি বলে পাঁচটা বিবেচনা চলে আসে। পেরে উঠি না। কাজটা মন্দ করোনি। চোখ কান খোলা রেখে চলো। ব্রিটিশ আমলের ওই যে কালো গোলপানা কাঠের রুলটা আছে, ওটা বরং সঙ্গে রাখো। বেশ ভারী। দরকার লাগবে।

রুলের অবশ্য দরকার হল না। সাইকেলে বাড়ি ফিরতে একটু ভয় ভয় করছিল বটে, কিন্তু পরদিন অফিসে গিয়ে শুনল, উঠতি মস্তান বগা যে শিবুর হাতে বেদম মার খেয়েছে, সেটা বেশ চাউর হয়েছে চারিদিকে। ঘেসেড়া নেলো সব বলে দিয়েছে। আর তাতে কাজটা খারাপও হয়নি। বাড়ির কাজের মেয়ের সঙ্গে নটঘট করায় বগার ওপর ভারি খাপ্পা হয়েছেন চৌধুরীবাবুরা। তার বাপকে ডেকে সাফ বলে দেওয়া হয়েছে, বগা আর বেয়াদবি করলে ফল ভালো হবে না। বগা এখন মাইনাসে যাচ্ছে। মাথা তোলা দেওয়ার মতো অবস্থায় নেই। ভাবের মেয়েছেলের সামনে হেনস্থা হলে ব্যাটাছেলের আর থাকে কী?

প্রণতিকেও একটু সাইজ করার আছে। আগে থেকে লাগাম না পরালে বেহাত হতে কতক্ষণ। আশকারাও বলিহারি! দিনের ফুটফুটে আলোয় খোলা জায়গায় লোকের চোখের সামনে ঢলাঢলি! হাত-পা বেশ নিশপিশ করছিল শিবুর। কিন্তু প্রণতি তো আর বগা নয়! মেয়েছেলে বলে কথা।

পরদিনই অবশ্য লোচন সর্দার এসে হাজির। মুখে ভারি গ্যালগ্যালে হাসি। বাবাজি, বড় জব্বর কাজ করেছ একটা। ছোঁড়াটা বড্ড পিছুতে লাগত আমার মায়ের। গিন্নিমা তোমার ওপর ভারি খুশি। বলছেন এমন ডাকাবুকো লোক না হলে কি হয়? বিয়েতে তোমাকে একটা ঘড়ি দেবেন বললেন।

শিবু গম্ভীর মুখে শুনছিল। এবার একটু ধমকে উঠে বলল, দাঁড়ান মশাই, দাঁড়ান। বিয়ে হলে তবে তো ঘড়ির কথা ওঠে! ও মেয়েকে বিয়ে করব কি না তাই এখন ভাবছি। ওর মতিগতির ঠিক নেই। কবে কোন ছেলেছোকরার সঙ্গে সটকে পড়বে তার ঠিক অছে কিছু?

লোচন জিব কেটে মাথা নেড়ে বলে উঠল, আরে না, না, ছিঃ, ছিঃ! কী যে বল বাবাজি! তুমি যা ভাবছ তা মোটেই নয়। বগাটাই নানারকম বাহানা করে এসে জুটত। তবে মেয়ের খুব শিক্ষা হয়ে গেছে। আর মুখ তুলে কথাটি কইছে না। গিন্নিমার কাছে বলেছে, সে তোমাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়েই করবে না। প্রত্যয় না হয় গিন্নিমাকে জিগ্যেস করে দেখ গিয়ে।

ওর কথায় বিশ্বাস কী? না মশাই, ব্যাপারটা ফের বিবেচনা করে দেখতে হবে আমাকে।

লোচন হাত কচলাতে কলচাতে বলে, আর কখনও বেচাল দেখলে বোলো বাবাজি, মেয়েকে দা দিয়ে দু টুকরো করে রেখে যাব। বড্ড ভালো মেয়ে। এবারটায় মাপ করে দাও বাবাজি। আর কখনও হবে না। তোমার মতো হিরের টুকরো ছেলেকে সে ঠিক চিনতে পারেনি। এখন চোখ খুলেছে। কাঁদছেও খুব।

তা হলে মশাই, আমারও কন্ডিশন আছে।

কী কন্ডিশন বাবাজি?

সাইকেলে হবে না। মোটরবাইক লাগবে। ভেবে দেখুন গিয়ে।

ও আর ভাবাভাবির কী আছে? মোটরবাইক দেব।

ঠিক আছে। তা হলে আসুন গিয়ে।

দিনটা তা হলে ঠিক করে ফেলি, কী বলো বাবাজি?

করুন।

## ৬

কাল রাতে বেজায় বৃষ্টি হয়েছে। ভাদ্র আশ্বিনে মাঝে মাঝে হয়। সকালে উঠে নিজের ঘরখানার অবস্থা দেখছিল রঘু। দুরবস্থা আর কাকে বলে। ফুটো চাল দিয়ে জল পড়ে ঘরে ভাসাভাসি কাণ্ড। গায়েও জল পড়েছে বিস্তর। শতরঞ্চিখানা ঝপঝপে ভেজা। ঘর সারানোর পয়সা যে তার নেই, এমন নয়। পঞ্চার কাছে তার কিছু টাকা জমা আছে। নানা সময়ে নানা ফিকিরের রোজগার। তবে সারিয়ে হবেটাই বা কী? কবে পুলিশ নিয়ে ফাটকে পোরে তার তো ঠিক নেই। রঘুর এমন ধারাই জীবন যাবে, এটা সে ধরেই নিয়েছে। তবে একটু পুটিং-টুটিং মেরে আপাতত তাপ্পি দিয়ে চালিয়ে নেওয়া যাবে।

সকালে ভারি তেড়েমেড়ে রোদ উঠেছে। দাঁতন-টাতন সেরে ঠোঙায় চাট্টি মুড়ি নিয়ে দাওয়ায় বসে ছিল রঘু। সঙ্গে বনমালীর চপ আর কাঁচালঙ্কা। বসে বসে নানা ভাবনাচিন্তা করে সে আজকাল। তার দাদা শিবুর

বিয়ে পাকা হয়ে গেল। আশ্বিন পেরলেই নতুন বউ আসবে ঘরে। তখন আবার কেমনধারা সব হবে-টবে সেই সবই ভাবে। মনো আর মিতুল বাপের বিয়ের কথায় বড্ড সিঁটিয়ে থাকে। সৎ মা যে ভালো জিনিস নয়, এ তারা বেশ ভালো জানে। দুটো বাচ্চা এখন খাবলে ধরছে রঘুকে। কেবল বলে, তুমি কিন্তু কোথাও যেও না। সৎ মা যদি মারে, দৌড়ে তোমার কাছে পালিয়ে আসব।

পালিয়ে এলেই যে রক্ষে পাবে এমনটা নাও হতে পারে। রঘু আর কদ্দিন আড়াল করে রাখতে পারবে তাদের? সারা জীবন রঘু কিছু তো পেরে ওঠেনি তেমন। বাচ্চা দুটোর সঙ্গে সম্পর্ক ছিল না, সে একরকম ভালো ছিল। মা-মরা ভাই-বোন এখন কাকাকে চোখে হারায়। আর এইটেই বড্ড পেড়ে ফেলেছে রঘুকে। তারও আজকাল বড্ড টান হয়েছে ওদের ওপর।

তেঘরে বিষ্ণুপুরের লোচন সর্দারের পয়সা আছে বলে শুনেছে রঘু। তার মেয়েটাও নাকি দেখতে শুনতে ভালো। বিয়েতে মোটরবাইক দেওয়ার কথা হচ্ছে। তা দেবে না-ই বা কেন? শত হলেও হবু জামাই সরকারি চাকরে। গাঁ দেশে সরকারি চাকরের খাতির খুব। বাসন্তীর বাবাও ঢেলে দিয়েছিল। দামি সাইকেল, সেলাই মেশিন, স্টিলের বাসন, প্রেশারকুকার। নগদও দিয়েছিল ভালো। সে সব যতন কিছু তুলে নিয়ে গেছে বলে শুনেছে রঘু। পণের টাকাও উসুল করতে চাইছে। শিবুকে জেল খাটানোরও চেষ্টা করেছিল। পেরে ওঠেনি। শিবু আবার বিয়েয় বসছে। সেটাও কি যতন ভালো চোখে দেখবে? এ বাড়িতে একটা অশান্তিই লেগে যাবে বোধ হয়।

মনো আর মিতুলের ভয় ভাঙানোর জন্য কয়েকদিন আগে শিবু তাদের তেঘরে বিষ্ণুপুরের হবু শ্বশুরবাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল। মতলবটা খারাপও ছিল না। সকালবেলাতেই সেজেগুজে ভাইবোন বাপের সঙ্গে বেরিয়ে গেল। সন্ধে পার করে ফিরল।

পরদিন মনো আসতেই রঘু জিগ্যেস করল, নতুন মা কেমন রে?

ভালো।

কেমন ভালো?

মায়ের মতন নয়।

তবে কি মায়ের চেয়ে ভালো?

তা বলিনি। বলছি নতুন মা অন্যরকম।

এক মা কি অন্য মায়ের মতো হয়। এটা তো নতুন মা।

সেই তো।

আদরটাদর করল?

হুঁ। কিছুক্ষণ কোলে বসিয়ে রেখেছিল চেপে। তখন একটু আদর করেছে। আমার লজ্জা করছিল বড্ড।

তোর মা তোকে আদর করত না?

না তো! শুধু ঝড়বৃষ্টির সময় বাজটাজ পড়লে বুকে জড়িয়ে ধরে রাখত।

এই মাও ওরকম করবে।

ধ্যেৎ! ওরকমই করতেই দেব না।

আর ভয় করছে না তো!

মনো যেন চিন্তায় পড়ে গেল। একটু ভেবেটেবে বলল, করছে।

কেন রে?

চেনা-চেনা লাগছে না তো, সেই জন্য।

চেনা হয়ে যাবে। তখন দেখিস ভালো লাগবে।

গায়ে কিন্তু মায়ের গায়ের গন্ধটা নেই।

দুপুরে মিতুলও এসে ঠ্যাং ঝুলিয়ে অনেক গল্প করে গেল। নতুন মা বেশ সাজগোজ জানে। ঠোঁটে লিপস্টিক মেখেছিল। আর চুলে শ্যাম্পু।

তা তোর সঙ্গে কী কথা হল?

বেশি কথা হয়নি। পড়াশুনোর কথা জিগ্যেস করল।

মা পছন্দ হল তোর?

একটু দিদি-দিদি লাগছিল, মা-মা নয়।

তা তাই বা মন্দ কী? ভালো লাগলেই হল।

আমাকে ভিতরের ঘরে নিয়ে গিয়ে তোমার কথা জানতে চাইছিল।

আমার কথা!

হ্যাঁ।

রঘু একটু ম্লান হেসে বলল, তা তো জানতে চাইবেই। বাড়িতে একজন চোর-ছ্যাঁচড় থাকলে খবর নেওয়ারই কথা।

সেই সব কথাই। নতুন মা শুনেছে তুমি নাকি খুব গুন্ডা। আমি বললাম, কাকা তো একটুও গুন্ডা নয়। কারও সঙ্গে ঝগড়া মারামারি করে না তো! শুনে আর কিছু বলেনি।

রাতে ভালো ঘুম হয়নি। জল-ঝড় হলে ঘরে ঘুমনো বড় দায়। তার হাই উঠছিল। একটু গড়িয়ে নেবে কি না ভেবে উঠতে যাচ্ছিল। দেখতে পেল একজন বুড়ো মানুষ রাস্তায় দাঁড়িয়ে ইতিউতি চাইছে। বোধহয় ভিতরে আসতে চায়। জলকাদার জন্য পারছে না।

রঘু একটু হেঁকে বলল, কাকে খুঁজছেন?

শিবু নস্করের বাড়ি তো এটা?

এটাই। কিন্তু দাদা তো বাড়ি নেই, কাজে বেরিয়ে গেছে। সন্ধের পর ফিরবে।

আর রঘু নস্কর?

আমিই রঘু নস্কর।

তোমার সঙ্গেই দরকার বাপু। কোথা দিয়ে ঢুকব?

আর একটু বাঁ ধারে এগিয়ে যান, ও দিকটায় ইট পাতা আছে।

রঘু একটু অবাক হল। তাকে খোঁজে কেন? পুলিশের লোকও তো নয়।

সাবধানে জলকাদা বাঁচিয়ে লোকটা দাওয়ায় এসে উঠল।

কোথা থেকে আসছেন?

আমার নাম বীরেন সাধুখাঁ।

নামে কোনও ঘাই মারল না মাথায়। এ নাম সে শোনেনি। একটু জড়সড় হয়ে বলল, এখানে তো বসার বিশেষ সুবিধে নেই। তবে ঘরে এলে তক্তপোশে বসতে পারবেন।

কুটুমবাড়ি তো আসিনি রে বাপু। চলো, ঘরেই বসা যাক।

চৌকিতে উঠে বসল বীরেন সাধুখাঁ। চারদিকটা তাকিয়ে দেখল খুব মন দিয়ে।

এটাই বুঝি তোমার ভাগে পড়েছে?

রঘু হেসে ফেলল। বলল, ভাগজোগের ব্যাপার নেই। এখানেই পড়ে থাকি আর কী। ভাগবাঁটোয়ারা নিয়ে কে মাথা ঘামায়?

টিনের চালের ফুটো দিয়ে সূর্যিঠাকুর দেখা যাচ্ছে।

হ্যাঁ, বড্ড ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। একটু পুটিং-টুটিং মারলে হয়।

যা দেখা যাচ্ছিল তা দেখে মোটেই খুশি হল না বীরেন সাধুখাঁ। ইটের মেঝে এবড়োখেবড়ো হয়ে আছে। বেড়ার টিনের নীচে বড় বড় ফাঁক। তিনটে জানলার কোনওটাতেই পুরো পাল্লা নেই। শুধু শতরঞ্চিটাই যা

নতুন।
বীরেন সাধুখাঁ সখেদে বলল, এ ঘরে মেয়েমানুষের থাকা বড় কষ্ট।
সে আছে, তবে মেয়েমানুষের বালাই নেই। থাকলে মুশকিল হত।
কেন বাপু, বালাই নেই কেন? শিবুর কাছে শুনেছি, তোমার বিয়ে হয়েছিল।
আজ্ঞে। তবে সে কবেই চলে গেছে।
কেন গেল বাপু?
আমার সঙ্গে তার ঠিক সুবিধে হচ্ছিল না কিনা।
কারণটাই তো জানতে চাইছি।
কী আর বলি বলুন। আমি লোক ভালো নই, সবাই জানে।
কেন বাপু, চোর-ডাকাতরা কি তাদের পরিবার প্রতিপালন করে না?
তা করবে না কেন? খুব করে। কিন্তু এরা ঠিক সেরকম নয়। বদনাম হয়ে যাচ্ছিল।
বউটার খোঁজখবর নাও তো?
আজ্ঞে, সেভাবে নেওয়া হয় না। তারা আমাকে পছন্দ করে না কিনা। তবে আচমকা দেখাটেখা হয়ে গেলে অন্য কথা। যতদূর জানি, ভালোই আছে।
বলি বউটের প্রতি টান-ঠান আছে এখনও?
এ কথায় রঘু ভারি উদাস হয়ে গেল। চৌকির এক ধারাটায় সঙ্কোচে বসে একটু চুপ করে রইল। তারপর বলল, মাঝে মাঝে খুব মনে পড়ে। তখন বড্ড অল্পবয়স ছিল আমাদের। সম্পর্কও তো বেশিদিন টেকেনি। মেরেকেটে বছরখানেক হবে। তার মধ্যেও আমাকে তিনবার হাজতবাস করতে হয়েছে। মিলমিশ হতেও তো একটু সময় চাই।
বীথিকে তোমার অপছন্দ ছিল না তো!
না, না, কী যে বলেন! বরং আমিই পছন্দের মানুষ নই। কিন্তু তাকে নিয়ে এত কথা হচ্ছে কেন? তার কি কোনও বিপদ হয়েছে?
হয়ে থাকলে কী করবে?
রঘু ঠোঁট উলটে বলে, কী আর করব? আমার আর ক্ষমতা কতটুকু?
মেয়েটার বড় দুর্গতি গেছে বাপু। বাপ মরার পরে বাপের বাড়িতে তার অনেক হেনস্থা হয়েছে, জানো?
কিছু কিছু কথা কানে আসে।
একবার গিয়ে তার পাশে দাঁড়াতে ইচ্ছে হয়নি?
রঘু হাসল, বলল, ইচ্ছে তো কত রকমেরই হয়। কিন্তু আমি গিয়ে দাঁড়ালে কি ভালো হত মশাই? সে যে দুচোখে দেখতে পারে না আমায়। সারা তল্লাট জুড়ে আমার বদনাম। আমার মতো মনিষ্যিকে দিয়ে তার ক্ষতি ছাড়া লাভ নেই। কিন্তু আপনি তাকে এত চিনলেন কী করে মশাই?।
বিষয়কর্মের সূত্রেই চেনা হয়েছে। তার বাবা বাড়ির লাগোয়া আড়াই কাঠা জমি তাকে দান করে দলিল রেজিস্ট্রি করে যায়। দলিলখানা গায়েব হয়েছে। সেই জন্যই গিয়েছিল আমার কাছে। জমির দখল অবশ্য পায়নি।
রঘু এ কথার জবাব দিল না। বিষয়আশয়ের কথা তার ভালো লাগে না। বীরেন সাধুখাঁর মতলবটাও সে ভালো বুঝে উঠতে পারছে না। তবে ন্যাংটার নেই বাটপাড়ের ভয়। সুতরাং রঘুর কাছ থেকে কোনও দাঁও মারার সুবিধে নেই কারও। বছরটাক আগে পাঁচু তাকে বলেছিল, শিবু আর তার শালা যতন মিলে তাকে নাকি এ বাড়ি থেকে উৎখাত করার মতলব আঁটছে। শুনে রঘুর এমন হাসি পেল যে বলার নয়। সে বলল অত প্যাঁচ কষার দরকার কী? বললেই ঘরখানা ছেড়ে দেব। ঘর দিয়ে আমার আর হবেটা কী?

বীরেন বেশ কড়া চোখেই দেখছিল রঘুকে। তারপর বলল, তোমার চেহারাটা তো বাপু পেল্লায়, কিন্তু মানুষ তুমি বড্ড মিনমিনে।

কথাটা শোনা আছে রঘুর। অনেকেই বলে। চোখ দুটো অন্য দিকে সরিয়ে সে বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি বড় অকর্মা।

বীথির যে বিয়ে ঠিক হয়েছে সে কি জানো বাপু?

রঘু ভারি অবাক হয়ে ফের বীরেন সাধুখাঁর দিকে চাইল। মাথা নেড়ে বলল, না তো!

কথাটা শুনে তোমার হেলদোল হচ্ছে না?

রঘু একটু ভাবল। বলল, আমার কথা বাদ দিন। দুনিয়া তো আমার ইচ্ছেয় চলবে না!

বিয়ে হয়ে সে অন্যের ঘর করলে কি তোমার সুখ হবে?

আমার না হোক, তার যেন হয়।

বেশ কথা বাপু। কিন্তু এ তো মরদের মতো কথা হল না।

আমার সঙ্গে তার ছাড়ান কাটান হয়েছে আজ পাঁচ বছর। তার তো সারাটা জীবন পড়ে আছে সামনে। বিয়ে তো করতেই পারে।

না হে বাপু, তুমি একেবারে পাথুরে মানুষ। রক্তমাংসের জীবই নও। আর সেই জন্যই তো লোকে আশকারা পেয়ে যায়।

রঘু একটু কাহিল হাসি হেসে বলল, কী করব বলুন। আমাকে কে পোঁছে?

এখন তোমার চলছে কী করে?

দু-পাঁচশো টাকা এক বন্ধুর কাছে গচ্ছিত আছে। তাই ভেঙে ভেঙে চলছে। বন্ধুবান্ধব আছে ক'জনা। তারাই পালা করে খাওয়ায়। আমার বায়নাক্কা নেই, চলে যাচ্ছে। আর হাজতে গেলে তো নিশ্চিন্তি। পেটের চিন্তা নেই।

প্রায়ই হাজতে যাও বুঝি?

তা যেতে হয়।

কেন বাপু? কেসটা কীসের?

একবার পুলিশের খাতায় নাম উঠলে আর দেখতে হয় না। তখন কিছু না করলেও অন্যের কেসে ফাঁসিয়ে দেবে। বিয়ের বছর তিন তিনবার তো তাই হল।

বিষ্ণু দত্ত কী বলে জানো?

বিষ্ণুবাবু! তিনি কি আমাকে মনে রেখেছেন?

খুব। তা সে বলেছে তোমার নাকি চুরির জিন নেই।

সে আমিও জানি। কী আর করব বলুন। তবে ইদানীং একটা সুযোগ এসেছে। সেটা লাগলে কয়েক বছরের জন্য নিশ্চিন্তি।

কীসের সুযোগ বাপু? চাকরিবাকরি নাকি?

আজ্ঞে না। তবে চাকরির চেয়ে কমও কিছু নয়। একজনের হয়ে বছর পাঁচেক মেয়াদ খেটে আসতে হবে।

বীরেন হাঁ করে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। বলল, বলো কী?

আজ্ঞে হ্যাঁ। তার থেকে কিছু টাকা পাওয়া যাবে। লোকটার ফলাও কাজ কারবার। জেলে গেলে কারবার লাটে উঠবে। মেলা টাকা খাইয়ে এই ব্যবস্থা করেছে।

তুমি তো সব্বোনেশে লোক বাপু!

আপনার কাছে কি প্রস্তাব খারাপ মনে হচ্ছে?

খারাপ নয়?

রঘু হেসে বলল, আমার উলটো মনে হয়। মনে হয় বরাতের খুব জোরে মওকা পাওয়া গেছে। কীই বা করার আছে বলুন? লেখাপড়া জানি না তেমন। কাজকর্ম কেউ দেয় না, চুরি ছিনতাইয়ে হাত পাকেনি। কিছু একটা করতে হবে তো! কাজটাও তেমন শক্ত কিছু নয়। আদালতে দাঁড়িয়ে দোষটা নিজের ঘাড়ে নিতে হবে।

উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে!

যে আজ্ঞে। ভেবে দেখলাম, এর চেয়ে ভালো ব্যবস্থা আর হয় না।

রোশো বাপু, ব্যাপারটা একটু বুঝতে দাও।

বোঝাবুঝির কিছু নেই মশাই। কাজটা আমি না নিলে অন্য লোক মুখিয়ে আছে। লুফে নেবে।

বীরেন সাধুখাঁ কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইল।

রঘু মিটমিট করে দেখছিল বীরেনকে। একটু ফাঁক দিয়ে বলল, আজ্ঞে আপনি কেন আমার কাছে এসেছিলেন তা বুঝতে পারলাম না। কোনও কাজের কথা ছিল কি?

তা একটু ছিল।

তা বলুন না কী করতে হবে?

ঘরে বড্ড গরম হচ্ছে। তুমি বরং গায়ে জামাটা চড়িয়ে এসো। বাইরে বেরিয়ে কথা হবে।

## ৭

কিছু আছে ভাবের কথা, কিছু আছে কাজের কথা।

ভাবের কথা শুনতে ভালো, বিশ্বাস না করলেও চলে। বীথির ভাগ্য ভাল যে, সুদেব ভাবের কথা বেশি জানে না, ভাবের মানুষও নয়। তার মুখে সর্বদাই কেবল কাজের কথা, পয়সার কথা, ব্যবসার কথা, লগ্নির কথা। শুনতে ভালো নয় বটে, কিন্তু ওতে কাজ হয়।

আড়াই কাঠা জমি নিয়ে সুদেব আজও কথা তুলল, দাদাদের দলিলটা দেখিয়েছ?

বীথি বলল, হুঁ, কিন্তু কিছু বলল না। মুখ গোমড়া করে রইল।

বলাবলির কিছু নেই। গাঁয়ের মোড়ল মুরুব্বিদের কাছে যাও। ডিমারকেশন করে বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেলতে হবে।

বীথি একটু ভয় খেয়ে বলে, খুব হাঙ্গামা হবে না তো!

তা একটু হতে পারে, কিন্তু জমিটা তো আর ছাড়া যায় না। নয়নপুরে আড়াই কাঠার দাম এখন ভালোই হবে।

আমি বলি কি জমিটা আছে থাক না। দাদারা তো আমাকে দুখানা ঘর দিয়ে দিতে চাইছে।

ও তো কাঁচাঘর, জমি এক কাঠাও নয়। আর ও ঘরে তোমার আর দরকার কী? বাপের বাড়িতে তো আর থাকতে হবে না! বরং আড়াই কাঠার ভাগ পেলে বেচে দেওয়া যাবে। তোমাদের পিছনে সুধীর মাস্টার থাকে। সে বলেছে জমিটা সে কিনতে রাজি।

বাসরাস্তা পর্যন্ত দুজনের এই সব বৈষয়িক কথাবার্তাই হল। তারপর নয়নপুরের বাসে উঠে পড়ল বীথি। মনটা বড্ড আড় হয়ে আছে। কেন যেন এই সব জমিজমার হাঙ্গামা, বিষয়আশয় নিয়ে কচলানো তার তেমন ভালো লাগছে না। একটা সময় অভাবের তাড়ায় বড্ড কষ্ট পেয়েছে সে। এখন আর অভাব নেই, দুটো পয়সা আসছে। কাজেই এখন আরও আরও পয়সার কথা ভাবতে তার তেমন ইচ্ছে যায় না।

আবার ভেবে দেখে, টাকাপয়সাও তো ফেলনা জিনিস নয়। লোকে দিনরাত হন্যে হয়ে পয়সার পিছনে কি এমনি ছোটে?

কাল হাটবার। গঞ্জ থেকে অনেক সবজিবাজার করেছে বীথি। তেল কিনেছে, ব্যসন কিনেছে। পায়ের কাছে ব্যাগটা রাখা। সে ভারি আনমনে চেয়ে আছে বাইরের দিকে। মরা বিকেলের আলোয় চারদিকটা ভারি মোলয়েম। একটু ধুলোর মতো, ধোঁয়ার মতো কিছু উঠে চারদিকে আবছায়া ছড়িয়ে দিচ্ছে? যেন নিত্যিকার

চেনা জগৎটা নয়। ওই আবছায়ার আবডালেই বুঝি ভূত-পেতনি, পরি, শীতলা ঠাকরুন, লক্ষ্মী ঠাকরুন, ষষ্ঠী ঠাকরুন সব লুকিয়ে আছে। মাঠঘাট জুড়ে আলোর চাদরখানা পড়ে ছিল তা টেনে নিল সুয্যি ঠাকুর।

রোজ জানলায় বসে দৃশ্যটা দেখতে পায় বীথি। বড্ড ভালো লাগে। মাথায় এখন বিষয়চিন্তা নেই, জমিজমার ভাবনা নেই, টাকাপয়সা নেই। এখন মাথাটা ভারি হালকা।

হঠাৎ একটা কথা মনে হল তার। আচ্ছা সে একা ফিরলে কখনও সুদেবের কথা একটিবারও ভাবে না তো! মনেই পড়ে না। রাতে যখন শোয়, তখনও তো মনের মানুষের মুখ মনে পড়ার কথা! কিন্তু মনে পড়ে না তো! সুদেব তার জন্য তো কম করছে না!

দাপুটে কাকার মতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বীথিকে বিয়ে করতে যাচ্ছে, এ তো কম কথা নয়। সুদেব তাকে সুখেই রাখবে। তবে কেন যখন তখন তার কথা মনে পড়ে না তার? বা কখনও মনে পড়লে বুকে দুলুনি হয় না, লজ্জা-লজ্জার ভাব হয় না, গা শিরশির করে না! নিজেকে বোঝাল বীথি, রোজ দেখাসাক্ষাৎ হচ্ছে তো, তাই আর অতটা বাড়াবাড়ি কিছু হয় না। তাই হবে।

তার কাজের মেয়েদুটো বাসস্টপে দাঁড়িয়ে ছিল তার জন্য। সবজির ব্যাগ আর তেলের টিন তারাই বয়ে আনল ঘরে। পুকুরে গা ধুয়ে এসে হ্যারিকেল জ্বেলে তাদের সঙ্গে শাকপাতা আর মোচা ছাড়াতে বসে গেল বীথি। কাজ নিয়ে থাকলে বড় ভালো কাটে সময়টা। তিনজনে নানা কথাটথাও হয়। হাসিমশকরাও।

রাতে বিছানায় শুয়ে আবার চিন্তাটা এল। কেন সুদেবের কথা তার যখন তখন মনে পড়ছে না? বিয়ে হবে বলে তেমন কোনও আহ্লাদও হয় না কেন তার? গা শিরশির করে না, লজ্জা হয় না, বিরহ বোধ করে না! ভারী আশ্চর্য তো! অথচ সে দিন হাটে রঘুকে দেখে তার কেন কাঁপুনি উঠেছিল?

এ সব প্রশ্নের কোনও জবাব নেই। বীথি ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন যখন দুপুরে হাটে যাবে তৈরি হচ্ছে তখন তার দুটি কাজের মেয়ে হাতা খুন্তি কড়াই নিতে এসে একটু অবাক হয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে রইল।

বীথি বলল, হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি যে বড়!

টগর হঠাৎ ফিক করে হেসে বলল, অত সেজেছ কেন গো দিদি?

সেজেছি, কোথায় আবার সাজ দেখলি? বলে বীথি তো অবাক! সাজল আবার কোথায় সে!

হিমি বলল, সাজোনি বুঝি! বেশ। বিনুনি করে খোঁপা বেঁধেছ, টিপ পরেছ, কাজল টেনেছ। আজ যে তোমাকে ভারী সুন্দর দেখতে লাগছে!

বীথি বাজ-পড়া মুখ করে চেয়ে রইল ওদের দিকে। সত্যিই কি সে সেজে ফেলেছে আজ? কখনও সাজে না তো! একটু আনমনা ছিল। ভারি অন্যমনস্কতার মধ্যে কী করেছে তা এখন সে নিজেই বুঝে উঠতে পারছে না। হাটের দোকানের দোকানি সে, তার তো সাজবার কথাই নয়। তা হলে এ কাণ্ড হল কী করে? তাড়াতাড়ি আয়নায় নিজেকে একটু দেখে নিল সে। এবং ভীষণ লজ্জা করতে লাগল। এ মা! বেখেয়ালে এ কী কাণ্ড করেছে সে? কান গরম হয়ে গেল তার, মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে করতে লাগল। টগর আর হিমি কী না জানি ভেবে নিল।

একটুকু বাদে অবশ্য অসহ্য ঘেমো গরমে আর উনুনের আঁচে সাজগোজ ভেসেই গেল তার। খোঁপা ভেঙে পড়েছে পিঠের ওপর। টিপটাও পড়ে গেছে কখন। বেঁচেছে বীথি।

সামাল-সামাল খদ্দের আজ। লাইন লেগে গেছে। বড়া ভেজে কুল করতে পারছে না সে। পয়সা গুনে নেওয়ারও যেন ফুরসত নেই। মাথা ঠাণ্ডা রাখাই দায়। আজ একটু বেশি মন দিয়ে কাজ করছে বীথি। মাথা তুলছে না, তাকাচ্ছেও না। ইচ্ছে করেই ঘাড়টা গোঁজ করে রেখেছে সে।

হঠাৎ হিমি পিছনে টগরকে বলল, এই দেখ, দেখ, সেই লম্বা লোকটা!

কোনটা রে?

ওই যে দিদির সঙ্গে কথা কইল সে দিন!

বীথির বুকটা হঠাৎ এমন ধড়াস ধড়াস করে উঠল যে দমবন্ধ হওয়ার জোগাড়। হাটে কে এল, কে গেল তাতে তার কী আসে যায়? সে কেন অন্য দিকে মন দেবে? প্রাণপণে নিজেকে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করছিল সে। কিন্তু ভুলভাল হচ্ছিল বড্ড। বড়ার গুনতিতে ভুল, পয়সা ফেরতের ভুল। বড্ড বিরক্ত হচ্ছিল নিজের ওপর।

আস্তে আস্তে বেলা গড়িয়ে বিকেল। বিকেল পড়ন্ত হয়ে সন্ধে। ভিড় কমছে। হাট ফাঁকা হয়ে আসছে। এতক্ষণে নিশ্চয়ই চলে গেছে রঘু। বাঁচা গেছে।

কিন্তু বাঁচল কই বীথি? রঘু চলে গেছে, যেই মনে হয় অমনি যেন সারাদিনের ক্লান্তি এসে ভর করল শরীরে। মনটা ভারি তিরিক্ষি। একটা বড় কাঠের বারকোশে উপচে পড়া নোট আর খুচরোগুলোর দিকে তাকিয়ে মনে হল, কোন গুষ্ঠির পিণ্ডি হবে এগুলো দিয়ে?

হাটে সার সার আলো জ্বলছে অন্ধকারে। দোকানপাট উঠে যাচ্ছে একটা দুটো করে। বীথির তেমন চাড় নেই। শরীরের জোর বল কোথায় উধাও হয়েছে কে জানে! মেয়ে দুটোকে বলল, আজ শরীরটা দিচ্ছে না রে। তোরা দুটিতে মিলেই সব গুছিয়ে নে।

ঠিক আছে দিদি।

রোজ ওর হাটে আসার কী? কেন আসে? হাট ছাড়া অন্য কোথাও কি যাওয়ার নেই ওর?

খোঁপা ফের বেঁধে নিল বীথি। আঁচলে ঘেমো মুখটা মুছল। এখন বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া ছেড়েছে একটা। প্লাস্টিকের বোতলে জল খাবে বলে ঊর্ধ্বমুখ হয়ে হাঁ করতে গিয়েছিল বীথি। কেঁপে ঝেঁপে জল পড়ে গেল কোলে। খাওয়া হল না। খাবেই বা কী করে? যমদূতটা যে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ভুঁইফুটো করে। আবার বেহায়ার মতো হাসছে দেখো।

তোমার দোকানে দিন দিন ভিড় বাড়ছে।

বীথি জবাব দিল না। দেবে কি, গলার স্বর ফুটবে নাকি?

এলাম বলে রাগ হল না তো!

বীথি গলা খাঁকারি দিয়ে ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলায় বলল, রাগ হবে কেন?

আমার আসাটা তো ভালো দেখায় না! কেউ কিছু মনে করতে পারে তো!

বীথি ভ্রুকুটি করে বলে, কে মনে করবে?

পরশু বীরেন সাধুখাঁ বলে একজন এসেছিল।

বীথি অবাক হয়ে বলে, বীরেন সাধুখাঁ! সে তোমার কাছে কেন?

কী সব বলল, ভালো বুঝতে পারলাম না।

কী বলেছে?

বিয়ে-টিয়ের কথা বলছিল। তোমার সঙ্গে সুদেব নামে একজনের...

বীথির মাথা নেমে গেল মাটির দিকে।

আমাকে অনেক কড়া কথাও শোনাল। তোমার বড় কষ্টের দিন গেছে, আমার জন্যই তো!

সে জন্য বুঝি রাতের ঘুম হচ্ছে না?

তা নয়। তবে তিন সপ্তাহ ধরে দেখলাম তো। তুমি ভারি অন্যরকম। একা হাতে কত দিক সামাল দিচ্ছ। তোমার জন্য কিছু করতে পারলে ভগবানের কাছে বলার মতো মুখ থাকত।

আর দরদে কাজ নেই।

একটা কথা কইব বিউটি? আমার কিছু টাকা আসছে। হকের টাকা, পাপের টাকা নয়। তোমাকে যদি দিই, নেবে?

তোমার টাকা আমি নিতে যাব কেন?

সেভাবে নয়। ধরো তোমার ব্যবসায় যদি খাটাতে দিই?

আমার দরকার নেই।

মুশকিল কি জানো, টাকাটা আমারও কাজে লাগবে না। কম তো নয়, চল্লিশ হাজার টাকা।

অত টাকা তোমাকে কে দিল?

রোজগারের টাকা, বিশ্বাস করো। অমি তো এবার অনেকদিন জেল খাটব। তখন টাকাটা বেহাত হয়ে যাবে।

চুরি ডাকাতি করলে নাকি?

না গো না। চুরিরও এলেম লাগে। ও আমার নেই।

তা হলে এতগুলো টাকা কে তোমায় মুখ দেখে দিল?

একজনের একটা উপকার করতে হবে। সেই বাবদ দেবে।

জেলে যাওয়ার কথা উঠছে কেন?

রঘু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, একজনের তাতে উপকার হবে যে।

রঘুর দিকে অপলক চোখে চেয়ে রইল বীথি। তারপর বলল, এ সব কথা আমি বুঝতে পারছি না। তোমার টাকা বেশি হয়ে থাকে গরিবদের বিলিয়ে দাও গে।

রঘু একটু হাসল। তারপর বলল, টাকা হড়কে যাবে। সেই জন্য চিন্তা নেই। তোমার কাছে গচ্ছিত থাকলে টাকাটার গতি হত। যাকগে। ও নিয়ে ভেবো না। আর ইদিকপানে আসা হবে না হয়তো।

রঘু আর দাঁড়াল না। লম্বা পায়ে অন্ধকারে উধাও হয়ে গেল।

বীথি রাতে বালিশ ভিজিয়ে কাঁদল। নিজের ভাগ্যের জন্য। পোড়া কপালটার জন্য। নিজের বিবশ অবাধ্য মনটার জন্য। এ সব কী হল তার? কেন হল?

সকালে উঠে কোনওরকমে পোশাক পরেই বেরিয়ে পড়ল সে। বাস ধরে সোজা গঞ্জে। বীরেন সাধুখাঁর বাড়িতে।

কাকা, আপনি রঘুর কাছে কেন গিয়েছিলেন?

বীরেন একটু হাসল, মানুষটাকে দেখতে।

কেন?

রাগ করো না মা। শিবনাথের বিয়ে আমিই ঠিক করেছি তো, সেই বাবদেই ও বাড়িতে যাতায়াত। তুমি রঘুর বউ, তা তো জানতাম না। একটু কথা কইলাম।

বীথি একটু গোঁজ হয়ে রইল। তারপর বলল, কী সাহস ওর জানেন! আমাকে টাকা দিতে চাইছে! কম নয়, চল্লিশ হাজার টাকা!

বীরেন গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বলল, জানি। টাকাটা স্বচ্ছন্দে নিতে পারো মা, ও পাপের টাকা নয়।

তা হলে পেল কোত্থেকে?

বনমালী নামে একজন কারবারি ওকে ফিট করেছে। তার একটা কেস আছে। দোষটা যদি অন্য কারও ঘাড়ে চালান করা যায়, তা হলে বনমালীকে হাজতবাস করতে হয় না, তার কারবারও বাঁচে। তা রঘু রাজি হয়েছে।

কিছুক্ষণ হতভম্বের মতো চেয়ে থেকে বীথি বলল, সব ঠিক হয়ে গেছে বুঝি?

পাকা কথা হয়ে যাবে কয়েকদিনের মধ্যেই। আমি বলি কি, রঘু তো আর টাকাটা হাজতে নিয়ে যেতে পারবে না। কারও কাছে গচ্ছিত রেখে গেলে সে হয়তো গাপ করবে। তোমার কাছে থাকলে—

পুরোটা শোনার ধৈর্য ছিল না বীথির। 'ঝাঁটা মারি অমন টাকার মুখে' বলে রাগে এক ঝটকায় উঠে ঝড়ের মতো বেরিয়ে গেল।

চুল, নখ সবই বড় হয়ে গেছে রঘুর। কাটা দরকর। গড়িমসি করে আর হয়ে উঠছে না। দাড়িটাও খোঁচা খোঁচা হয়েছে বড্ড, কুটকুট করে। কামালে হয়। কিন্তু কিছুই করে উঠতে তেমন ইচ্ছে যাচ্ছে না। একটা

বৈরাগ্যই এল কী না কে জানে! বিলে, পঞ্চাদের ওখানেও একবার যাওয়া দরকার। বনমালীবাবুর সঙ্গে ওরাই কথাটথা কইছে কিনা। টাকাটা আরও একটু চেপে বাড়ানো যায় কিনা তাই নিয়ে শলাপরামর্শ আছে। কিন্তু কিছুতেই গা উঠছে না তার।

চৌকিতে চিৎপাত হয়ে শুয়ে আছে সে। শুয়ে শুয়ে চালের অজস্র ফুটো দিয়ে সুয্যিঠাকুরকে দেখতে পাচ্ছে। ভেবে দেখেছে, এ পুটিংয়ের কাজ নয়। টিনই পালটাতে হবে। কিন্তু এত ঝক্কির দরকারটাই বা কী?

চোখটা বোধ হয় একটু লেগে এসেছিল। তখনই ঝড়টা এল।

কী ভেবেছ তুমি! অ্যাঁ! কী ভেবেছ?

তড়াক করে উঠে বসে দরজার দিকে চেয়ে রঘু হাঁ। এ কী দেখছে সে? বিউটির যে দশখানা হাত! তাতে দশ প্রহরণ! নাকের পাটা ফুলে ফুলে উঠছে রাগে। প্রবল শ্বাসে ওঠাপড়া করছে বুক। আর চোখের এমন আগুন যে চোখে চোখ রাখা যায় না। বহুকাল রঘু এমন ভয় পায়নি। তার বাক্য থেমে গেছে, চোখের পলক পড়ছে না।

কী যেন বলছে বিউটি। কথাগুলো কানে আসছে, কিন্তু ঠিক বুঝতে পারছে না। মাথাটা বড্ড ভোম্বল হয়ে আছে যে। শুধু একটা বাক্য তার মাথায় সেঁধাল। যার নিজের বউ চুরি হয়ে যায়, সে আবার কীসের চোর?

একটু বেলার দিকে মনো আর মিতুল কাকার খোঁজে বেরিয়ে এসে ভারি অবাক হয়ে দেখতে পেল, তাদের অত বড় কাকা টিনের চালের ওপর হামাগুড়ি দিয়ে চালের ফুটোয় পুটিং লাগাচ্ছে। আর নীচে দাঁড়িয়ে কোমরে হাত দিয়ে একজন সুন্দর মতো মেয়ে ঊর্ধ্বমুখ হয়ে দেখছে।

তারাও অবাক হয়ে দেখতে লাগল।

# টানাপোড়েন

মেয়েরা যখন রান্নাঘরে থাকে তখন পুরুষদের যে-কোনও সময়েই বিপদ। রান্নাঘরটা স্বভাবতই একটু গরম জায়গা, একজস্ট ফ্যান লাগানো সত্ত্বেও গরম। রাগী মহিলাদের পক্ষে রান্নাঘর মোটেই সুবিধের জায়গা নয়। তার ওপর কাল জামাইষষ্ঠী। আজই বুলা তার বরকে নিয়ে রাতের গাড়িতে এসে হাজির হবে। অর্চনাকে সুতরাং বিশাল আয়োজন করতে হচ্ছে। একটা বাচ্চা চাকর এবং একজন চব্বিশ ঘণ্টার ঝি-কাম-রাঁধুনি থাকা সত্ত্বেও এই গরমে অর্চনাকে গোটা সন্ধেটাই পড়ে থাকতে হচ্ছে রান্নাঘরে। ঊনপঞ্চাশ বায়ু কুপিত হতে দোষ কী?

তার ওপর ঝুমা আজ গাছে জল দিতে ভুলে গেছে, সামনের ঘর ডাস্টিং করেনি। বাথরুমে যাওয়রা সময় ঘরের লাইট আর ফ্যানের সুইচ অফ করেনি, দুধ খায়নি, মার্কেটিং থেকে ফিরে এসে শাড়ি ভাঁজ করে রাখেনি এবং ইত্যাদি। আঠেরো বছর বয়স ভয়ংকর সুকান্ত লিখে গেছে না। ওই বয়সের মেয়েদের মন কি ঘরমুখী থাকে কখনো? কত দিকে ছুট লাগায়, উধাও হয়ে যায়। কিন্তু ওই অত বড় মেয়ে যে মায়ের সাহায্যে আসে না, সারাদিন যে শুয়ে বসে বই পড়ে এবং টিভি দেখে সময় কাটায়, নিজের এঁটো চায়ের কাপটাও যে বেসিনে রেখে যেতে পারে না, এসব সুবীরের চোখে ক্ষমার যোগ্য অপরাধ হলেও অর্চনার চোখে নয়।

আর ঝুমা অপরাধ করলে তার সিংহভাগ তার বাপ সুবীরের ওপরে কী করে যেন অর্শায়। আর তখন ঝুমাকে উপলক্ষ করে সুবীরের ওপর অর্চনার শব্দভেদী আক্রমণ ক্রমে ক্রমে ভয়ংকর হয়ে ওঠে। পঁচিশ বছরের বিবাহিত জীবনের নানা বঞ্চনার ইতিহাস শাখা প্রশাখায় বিস্তারিতভাবে প্রকাশ পেতে থাকে। এবং এমনই মারাত্মক সব বিশেষণ ও ব্যাখ্যা থাকে যা সুবীরের কোনও সম্ভাব্য জীবনীকারই লিপিবদ্ধ করতে সাহস পাবে না।

অফিস থেকে ফিরে এই সময় সুবীর স্নান করে। নতুন বাড়ির নতুন বাথরুমে নতুন শাওয়ারের মুখ খুলে পিন-ফোটানো অজস্র জলবিন্দুতে সিক্ত হওয়ার যেমন আরাম আছে, তেমনি জলের শব্দে বাইরের আর সব শব্দ যে ডুবে যাচ্ছে সেটাও কম কথা নয়।

কিন্তু পুরোটাই যে ব্যর্থ হচ্ছে অর্চনার প্রয়াস তাও নয়। ভাষা বা অর্থ বোঝা না গেলেও অর্চনার কণ্ঠস্বরের উচ্চগ্রাম এবং উত্তাপ ফোয়ারার শব্দ ভেদ করে ঠিকই এসে বিদ্ধ করছিল সুবীরকে। চোখ বুজে, দাঁতে দাঁত চেপে বাহান্ন বছরের যুবা সুবীর ভাবছিল, অর্চনার বদলে নন্দিতা তার বউ হলে কি এর চেয়ে বেটার কিছু হত? কথাটা সে প্রায়ই ভাবে এবং ভেবে পঁচিশ বছরেও প্রশ্নটার কোনও সমাধানে আসতে পারেনি।

ঝুমা এ সময়ে টি ভি খুলে বসে। রাত আটটায় কিছু একটা ভালো প্রোগ্রাম থাকবেই। কিন্তু আজ আর সাহস পায়নি। নিজের ঘরটিতে চুপ করে বই খুলে বসে আছে। পড়ছে না। ভাবছে। এ বাড়িটাকে তার কেমন যেন আজকাল আর আপন বলে মনে হয় না। বাবা মা কেউই যেন তেমন আপনার জন্য নয় তার। মা বকবে, সে তো ঠিক কথা। কিন্তু এত নিষ্ঠুরভাবে বকে, এত সব সাঙ্ঘাতিক কথা উচ্চারণ করে যে, ঝুমার বুকটা শুকিয়ে যায়। আজকাল আর আপন বলে মনে হয় না। আজকাল তার কান্না পায় না ঠিকই, কিন্তু কেমন যেন একটা জেদ, একটা কঠিন মনোভাব তাকে ভিতরে ভিতরে মায়াহীন করে তোলে। আর বাবা যে তাকে এত ভালোবাসত সেও কি আর তেমন আছে? কেমন যেন আনমনা, অন্যমনস্ক, নিজের চিন্তায় বিভোর। বাবা আর মায়ের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব সবসময়েই লেগে আছে। এক এক সময়ে সেটা এত বিশ্রী চেহারা নেয়।

খাতা টেনে নিয়ে একটা সাদা পাতায় ঝুমা একটা সুইসাইড নোট লিখল। প্রায়ই লেখে। নতুন কিছু নয়। কী লিখবে, কিভাবে লিখবে তা বহুবার ভেবে দেখেছে সে। সে কি লিখবে "আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়," না কি "মা ও বাবার জন্যই আমাকে মরতে হল", না কি "আমার আর বাঁচতে ইচ্ছে করছে না বলেই মৃত্যুকে ডেকে নিলাম," অথবা...

আজ ঝুমা সাদা পাতাটায় একটিমাত্র শব্দ লিখল, "যাই।" তারপর চেয়ে রইল শব্দটার দিকে। বাঃ বেশ তো। ছোট্ট কিউট গভীর। পুলিশ হয়তো খুশি হবে না। কিন্তু তাতে তার কী?

অবিনশ্বর অর্থাৎ অবুর জীবনে কোনও সমস্যাই নেই। আর এই যে সমস্যাহীনতা এইটিই তার সমস্যা। বাবা সুবীর ও মা অর্চনার দুই মেয়ের মাঝখানে সে। বলাই বাহুল্য, একমাত্র ছেলে বলে তার আদর আর আসকারা একটু বেশীই হয়ে থাকবে। সুখাদ্যের শ্রেষ্ঠ অংশ, বেশী দামী জামাকাপড়, খেলনা, শখের জিনিস সে যত পেয়েছে তত আর কেউ নয়। বকা ঝকা মারধর তার ভাগে সবচেয়ে কম জুটেছে। অত যে রাগী মা, যার ভয়ে সবাই তটস্থ, সেই মা অবধি তার সামনে এক্কেবারে জল।

সমস্যা অবুর জীবনে নেই ঠিকই, তবে নন কমিউনিকেশন আছে। সে তার বাবা সুবীরকে একদম পছন্দ করতে পারছে না। মাঝে মাঝে একটু ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষ হচ্ছে আজকাল। তার বাবা সুবীরও যে তাকে একদম পছন্দ করে না এটা সে টের পায়। পছন্দ না করার কতগুলো কারণ আছে। এক হল, অবু মুখের ওপর স্পষ্ট কথা বলতে দ্বিধা করে না। অবু তার বাবাকে দেবতা বলেও ভাবে না। সে এই সংসারে মায়ের চেয়ে বাবার গুরুত্বকে অধিক বলে স্বীকার করে না। বছরখানেক অগে সুবীর একটা কাচের গ্লাস ছুঁড়ে মেরেছিল অর্চনাকে। অর্চনার হাত অনেকটা কেটে গিয়ে প্রচুর রক্তপাত হয়। অবু রাগ সামলাতে না পেরে তার বাবার হাত মুচড়ে প্রায় ভেঙে ফেলেছিল। সুবীর সামান্য মাতাল অবস্থায় ছিল বলে প্রতিরোধ করতে পারেনি। কিন্তু হাত নিয়ে দুজনেই ভুগেছিল। সেই থেকেই কি ছেলের প্রতি সুবীরের রাগ? কিন্তু লোকটার ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, বাড়িতে আরও একজন মানুষ সাবালকত্বে পা দিয়েছে, সে আর খোকাটি নেই, শক্তসমর্থ একজন পুরুষ এবং তার নিজস্ব রুচি, ইচ্ছে এবং অনিচ্ছে, তার নিজস্ব রাগ ও প্রতিহিংসা জন্ম নিয়েছে। সে উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী।

চাকরি পেলে অবু তার মাকে আলাদা করে নিজের কাছে নিয়ে রাখবে। মাকে যে সে ভীষণ ভালোবাসে এমন নয়। কিন্তু এই মহিলার প্রতি তার কিছু পক্ষপাত আছে। তার জন্য মা যত করেছে, বাবা তত নয়।

অবু ছাত্র খারাপ নয়। মেক্যানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ সে প্রথম শ্রেণী পাবে, এটা ধরেই নেওয়া যায়। চাকরির অভাব তার হবে না। আর হলেই এই পরিবারের সঙ্গে তার কাট।

আজ অবু তার স্কুটারে রত্নাকে নিয়ে এসেছে। রত্না তার অনেক বান্ধবীদের একজন। একটু উচ্ছল, গায়ে-পড়া ঢলানী। রত্নাকে সে যে খুব পছন্দ করে তাও নয়। তবে একসঙ্গে অনেকদিন একই স্কুলে পড়েছিল, এই যা। এখন রত্না কলেজে সায়েন্স পড়ে। রত্নার সঙ্গে তার প্রেমটেম নেই, তবে একটা বিশ্বস্ততা আর নির্ভরতার সম্পর্ক আছে।

বান্ধবীদের বাড়িতে আনা কোনো নতুন ব্যাপার নয় তার কাছে। এদের সকলের সঙ্গেই এ বাড়ির লোকদের চেনা জানা ও ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেছে।

স্কুটারটা শূন্য গ্যারেজে ভরে রোলিং শাটারটা টেনে নামিয়ে তালা লাগাল অবু।

রত্না বাইরে দাঁড়িয়ে বাড়িটা দেখছিল। সামনে আড়াই কাঠার মতো বাগান। এখানো গাছপালা তেমন ঘনবদ্ধ হয়ে ওঠেনি। বাড়িটারও সব কাজ শেষ হয়ে যায়নি এখনো। তবু ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে জ্যোৎস্নায়।

অবু একটু হেসে বলল, কেমন দেখছিস আমাদের তাজমহল?

ভালোই রে।

বইরেটাই ভালো। ভিতরে কবরখানা।

তুই অবু, ভীষণ স্ক্যাণ্ডালমঙ্গার। নিজের বাড়ি সম্পর্কে ওরকম কেউ বলে? আমার তো তোর ফ্যামিলিটাকে বেশ ভালোই লাগে।

তুই একটা গাধা। এই সব ধূর্ত মিডলক্লাসকে কি বাইরে থেকে বোঝা যায়। এরা সব মুখোশ পরা মানুষ।

সব বাড়িতেই একটু আধটু গণ্ডগোল থাকে। আমার বাড়িতেই কি কম?

ঠিক আছে, ঠিক আছে বাবা, স্কিপ দা ফ্যামিলি বিট। ভিতরে চল। আজ খুব খাওয়া-দাওয়া আছে। চোর জামাইটা আজ আসবে।

রত্না খিল খিল করে হেসে ফেলল, তুই না বাঙালদের মতো সরল। চোর কী রে?

আমার ভগ্নীপতি তো চোরই। বড় কোম্পানিতে আছে, সেলসে। ট্যুরের নামে হাজার হাজার টাকা ফাঁক করছে, কমিশনে মারছে, ফাণ্ডা দেখলে চোখ ট্যারা হয়ে যাবে।

আয় না, বাগানে একটু বসি। ঘরে এই গরমে ঢুকতেই ইচ্ছে করছে না। স্কুটারে এতক্ষণ কী সুন্দর হাওয়া খেতে খেতে এলাম।

বসবি। দাঁড়া তবে চেয়ারের জোগাড় করি।

চেয়ার লাগবে না। ওই তো অনেক পাথরকুঁচি পড়ে আছে। ওখানে বসলেই হবে।

তুই বোস, আমি মাকে বলে আসি যে, আমরা বাগানে আছি।

যা।

দরজার বাইরে থেকেই অবু তার মায়ের তীকষ্ন কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছিল। ডিসগাস্টিং।

কলিংবেল টিপতেই ঝুমা এসে দরজা খুলে দিল। তার মুখে আষাঢ়ের মেঘ।

আজ আবার কী হয়েছে রে?

ঝুমা মুখটা বিকৃত করে বলল, কী আর হবে? রোজ যা হয়।

জুতো পায়েই অবু সোজা রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। মাথাটা গরম।

প্রায় ধমকের স্বরে বলল, মা?

অর্চনা একসময়ে যথেষ্ট সুন্দরী ছিল। আজও আছে। তার মুখশ্রীতে মন্দির ভাস্কর্যের একটু ছায়াপাত ঘটেছে। রং ভীষণ রকমের ফর্সা। শরীরের বাঁধুনি প্রায় কিশোরীদের মতো। অর্চনা খুব লম্বা চওড়া নয়, বরং একটু ছোটোখাটো, পুতুল-পুতুল।

ছেলের ধমকে ম্যাজিকের মতো কাজ হল। অর্চনা মিইয়ে গিয়ে আঁচলে মুখ মুছে বলল, এই আসবার সময় হল তোর?

কণ্ঠে প্রগাঢ় প্রশ্রয় ও অভিমান।

অবু কড়া গলাতেই বলল, তোমাকে না বারণ করেছি, চেঁচামেচি করবে না। ফের করছিলে?

অর্চনা এই একজন মানুষকে ভয় খায়। বলল, কখন আমাকে চেঁচাতে শুনলি তুই। কথা বললেই বুঝি চেঁচানো হয়? যা তো, হাত মুখ ধুয়ে একটু মুর্গী খা। তন্দুরে করেছি।

এ বাড়িতে আরও একজন আছে। সে বৃদ্ধ এবং নির্বিকার। সে হল আইক। একটা দোআঁশলা টেরিয়ার। আজকাল তার তেজবীর্য নেই, চেঁচামেচিও বিশেষ করে না। সারাদিন ঝিম মেরে কাটিয়ে দেয়। তবে মাঝে মাঝে অত্যন্ত উদাসীন দার্শনিক ডাক ছাড়ে সে।

অসমাপ্ত সিঁড়ির চাতাল থেকে ধীর পায় নেমে এল আইক। এসে অবুকে একটু শুঁকল, পায়ের ওপর একটু মাথা ঘষে আদর জানাল। তারপর আর একটা উদাসীন আওয়াজ করে নির্দ্বিধায় চলে গেল ঝুমার টেবিলের তলায়।

অবু বলল, রত্না এসেছে, বাগানে বসছি একটু। খাবার টাবার ওখানেই পাঠিয়ে দিও।

রত্না যাওয়ার আগে যেন দেখা করে যায়। বলিস।

ঠিক আছে।

বাইরে যাওয়ার মুখে অবু বোনের ঘরে একটু উঁকি দিল। বেশ সাজিয়েছে ঘরটা। খুব দামী একটা স্টিরিও আছে ঝুমার। আর আছে গান-বাজনার সরঞ্জাম। একটা দেয়াল জোড়া ঝকঝকে কাচের শো-কেসে সব সাজানো। বুক কেস, পড়ার টেবিল থেকে ডিভান সবই বেশ পরিপাটি। নিজের ঘরখানা ঝুমা তকতকে রাখার চেষ্টা করে।

আজ টিভিতে এখন কী আছে রে? ভালো কিছু?

সিরিয়াল ছিল একটা। দেখছি না।

পড়ছিস না কি? না অভিনয়?

ঝুমা জবাব দিল না।

অবু তার বোনটিকে মোটামুটি পছন্দ করে। একসময়ে দাদা ছিল তার আইডল। এখন আর নেই। তবু দাদাকে বোধহয় ঝুমা তেমন অপছন্দ করে না। কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দূরত্ব বাড়ছে। দুস্তর ব্যবধান গড়ে উঠছে। দিদির সঙ্গে যেমন হয়েছে আজকাল।

বাইরে যাওয়ার মুখে বাপ সুবীরের সঙ্গে একবার চোখাচোখি হল অবুর। সুবীর বাথরুম থেকে বেরোচ্ছে। সিক্ত, স্নিগ্ধ শরীর। ভুর ভুর করছে চন্দন সাবানের গন্ধ।

আজকাল বাপ ব্যাটায় বিশেষ কথাবার্তা হয় না। পরস্পরকে এড়িয়ে চলে। এমন কি খাবার টেবিলেও অবু বাবার সঙ্গে একসঙ্গে খেতে বসে না।

মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে অবু দরজা খুলে বেরিয়ে এল।

## ২

সুবীর আজকাল বাড়িতে স্লিপিং স্যুট পরে থাকে। স্ট্যাটাস বেড়েছে। গোটা দুই ড্রেসিং গাউনও কেনা আছে। এখনো পরে উঠতে পারেনি।

স্নানের পর শরীরে একটু পাউডার ছড়িয়ে নিল সুবীর। আজ আর উর্ধাঙ্গের জামাটা পরল না। ফ্রিজ খুলে হুইস্কি আর জলের বোতল বের করে নিল। টেবিল থেকে তুলে নিল একটা গেলাস। সিগারেট ছাড়তে হয়েছে। কিন্তু ড্রিংকস চালিয়ে যেতে ডাক্তার বাধা দেয়নি।

ছাদে ইজিচেয়ার পাতাই থাকে। পাশে ছোটো একটা টুল। বোতল আর গেলাস তার ওপর রেখে জ্যোৎস্নায় একটু ঝুঁকে বাগানে ছেলে আর ছেলের বান্ধবীকে ঘনিষ্ঠভাবে বসে থাকতে দেখল সুবীর।

তারপর ইজিচেয়ারে বসে আকাশের দিকে চেয়ে খানিকক্ষণ চাঁদ দেখল। একটা বড় হুইস্কি ঢেলে নিয়ে জল মিশিয়ে যখন আস্তে প্রথম চুমুকটা দিল তখন আপনা থেকেই একটা অরামের শ্বাস বেরিয়ে এল বুক থেকে।

একেই কি সফলতা বলে?

সুবীর প্রায়ই এই ছাদে বসে রাত্রিবেলা নিজের ওপর একটা সমীক্ষা চালায়। নিজেকে যে সবটুকু সে বুঝতে পারে তা নয়। তবে জাগতিক সাফল্যগুলি দিয়ে নিজের কৃতিত্বকে যাচাই করে নেওয়ার চেষ্টা করে

সে। কতখানি উপরে উঠেছে সে, আরও কতদূর ওঠা যাবে, এবং এই ওপরে ওঠা কোথায় গিয়ে শেষ হবে।

এই পোড়া-দেশে জন্মেও সুবীরকে জীবন-যুদ্ধ তেমন করতে হয়নি। যে কোনো মানুষের জীবনেই মাঝে মাঝে লীন পিরিয়ড আসে। তার জীবনেও এসেছে বটে, কিন্তু সেটা দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম নয়, প্রতিকূল পরিস্থিতিতে হাবুডুবু খাওয়াও নয়। একটু আধটু ওঠাপড়া মাত্র।

সুবীর অতীতচারণ করতে ভালোবাসে না। ভবিষ্যতের ভাবনাও তাকে বিশেষ উদ্বিগ্ন করে না। এসব প্রবণতা মানুষকে ধীর করে দেয়। সে এটাও জানে যে, এক ছাদের নিচে বসবাস করলে, বিয়ে করলে বা সন্তানের জন্ম দিলেই যে আপনজন সৃষ্টি করা যাবে তা নয়। সুবীরের সেই অর্থে কোনো আপনজন নেই। বরং এরা, এই বউ ছেলে মেয়ে এরা সকলেই এক এক অর্থে তার প্রতিদ্বন্দ্বী।

সুবীর তার হুইস্কিতে চুমুক দিল। ধীরে ধীরে পানীয় তার দখল নেবে এবং পৃথিবীটা সামান্য ভিন্নরকম লাগবে, খুব সামান্যই।

সুবীর আগে অবুকে নিয়ে ভাবত না। আজকাল ভাবে। অবু আজকাল যথেষ্ট জোরালো এক পুরুষ হয়ে উঠেছে। স্বাধীন, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, একটু অবিনয়ী।

সুবীর নিজেও কোনোদিন বিনয়ী ছিল না। এখনো কাটা কাটা কথা, ঝাঁঝালো মেজাজ এবং মানুষকে একটু হীন দৃষ্টিতে দেখাই তার স্বভাবগত। অবু উত্তরাধিকারসূত্রে সেটা পেয়ে থাকতে পারে। আবার পৃথক অর্জনও হতে পারে।

একটু ঝুঁকে বাগানে অবু আর রত্নাকে দেখল সুবীর। ঘন হয়ে বসে আছে। পিছন থেকে ঠিক দেখা যাচ্ছে না, হয়তো বা একজনের কোলে অন্যজনের হাত। সুবীরের যৌবনে এতটা ঘনিষ্ঠতার মানেই হত প্রেম। কিন্তু এখন ওই অতটা কাছাকাছি হওয়া সত্ত্বেও প্রেম নয়, নিছকই বন্ধুত্ব।

জ্যোৎস্না জিনিসটা একটা ক্যাটালিটিক এজেন্ট। চারদিকটাকে কেমন পাল্টে একটা স্বপ্নের সর ফেলে দেয়। হুইস্কিও তাই। জ্যোৎস্না আর হুইস্কি এমন ককটেল কী আর হতে পারে?

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। সুবীরের ঘাড় ঘোরাতে ইচ্ছে করল না।

বাবু।

হুঁ।

মা সসেজ পাঠালেন।

সুবীর একটু অবাক হয়ে সুবালার দিকে তাকাল।

সে কী রে? হঠাৎ সসেজ কেন?

খান না। ফিস ফিঙ্গারও দিয়েছেন সঙ্গে।

প্লেটটা টুলের ওপর রাখল সুবালা।

সুবীরের কোনো খিদে নেই। আজকাল খিদে বড় একটা হতে চায় না। শরীরের নাড়াচাড়া প্রায় নেই বললেই হয়। অনিচ্ছের সঙ্গে একটা সসেজ তুলে নিয়ে সুবীর মুখে পুরল। আজকাল বাঙালীর বাড়িতে আকছার এসব হয়।

সুবালা চলে যাচ্ছিল।

সুবীর ডাকল, সুবালা, শোন।

বাবু।

কতদিন এ বাড়িতে আছিস?

তিন মাস হয়ে গেল।

দেশে যেতে ইচ্ছে করে না?

করবে না?

তবে যাস না কেন?

গিয়ে খাবো কী?

কেন, তোদের জমিজিরেত নেই?

ছিল তো। মানুষটা সব বেচে খেয়েছে।

বেচল কেন?

আপনার মতোই ছাইপাঁশ খায় যে। তার ওপর জুয়ো।

সুবীর মাথা নাড়ল। তারপর বলল, যা।

সুবালার সঙ্গে এই সংলাপের কোনও মানে হয় না। কিন্তু এ বাড়িতে আর কারও সঙ্গে এত সহজে সংলাপ রচনা করার সাধ্য সুবীরের নেই। এই আপাত শান্ত ও ভদ্র বাড়ির ভিতরে যারা বাস করে তারা রক্তের সূত্রে আত্মীয় মাত্র। কিন্তু কারও সঙ্গেই কারও যোগাযোগ নেই।

হুইস্কি আর জ্যোৎস্নায় একটু ঢুল ঢুলু ভাব এসে গিয়েছিল সুবীরের। কখন তন্দ্রা এসেছিল কে বলবে। চটকা ভাঙল গেলাস পড়ে ভাঙবার শব্দে।

সুবীর দেখলে, বেড়ালটা টুলের ওপর। প্লেটে মুখ।

বোতলটা ভাগ্যিস মেঝেয় নামিয়ে রেখে গেছে সুবালা। নইলে ওটাও ভাঙত।

সুবীর তাড়া দিল না। খাচ্ছে খাক। তার তো খিদে নেই। তবু ওর আছে।

সেই ব্যথাটা আজও আছে, সেই যে অবু অর্থাৎ তার ছেলে অবিনশ্বর তার ডান হাতটা মুচড়ে দিয়েছিল। অবু কি ক্যারাটে জানে? জানতে পারে। বাইশ বছর বয়সের ছেলের কতটুকু খবর আর রাখে সুবীর?

বয়সের ব্যথা, সহজে সারবে না। হাতটা অবু ভেঙেই দিতে চেয়েছিল। স্পষ্টই ওর চোখে জিঘাংসা দেখতে পেয়েছিল সুবীর। সে চেঁচায়নি। জৈব আত্মরক্ষার তাগিদে, রাগে, বাঁ হাতে ঘুষি মারতে চেষ্টা করেছিল। পারেনি। ধ্বস্তাধ্বস্তিতে গোটা সাজানো ডিনারসেট সমেত উল্টে পড়ে গেল টেবিল, চেয়ার। কী সাঙ্ঘাতিক শব্দ হয়েছিল, ঝনঝন ঠনঠন। কাচ, চিনেমাটি ভেঙে খান খান হল। মেঝেয় গড়াল ভাত, মুর্গী, ডাল, পুডিং, আর তার মধ্যেই এ বাড়ির দুই প্রজন্মের দু'জন পুরুষ একে অন্যকে স্থায়ীভাবে নুলো করে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল।

সুবীর পারবে কেন? তার বয়স পঞ্চাশের ওপর। আর অবুর হাতে সাঙ্ঘাতিক জোর। মুর্গীর ঝোলে পিছলে পড়ে গেল সুবীর। হাতটা তখনও অবুর বাঘা থাবায় ধরা। চূড়ান্ত বেকায়দা অবস্থা। সেই সময় অবু মোচড়ের চাপটা আর একটু বাড়ালেই মট করে ভেঙে যেত কব্জী।

কে জানে কেন, অর্চনা চেঁচিয়ে উঠেছিল, অবু, ছেড়ে দে। যথেষ্ট হয়েছে।

অবু ছাড়ল। ঝোল ডাল ভাঙা কাচের মধ্যে মধ্যবয়সী সুবীর অসহায়ের মতো শুয়ে রইল কিছুক্ষণ। পেটে সেদিনও হুইস্কি ছিল। চোখে একটা হলুদ রঙ দেখতে পাচ্ছিল সে। আর বমি আসছিল। ডান হাতটা অবশ হয়ে নেতিয়ে পড়ে ছিল। লম্বা একটা সাপের মতো। যেন হাতটা তার নয়।

নেশা কেটে গিয়েছিল সেই সময়ে। ব্যথায়, অপমানে। তার চেয়েও বড় কথা, সত্য উদ্ঘাটনে। এইভাবে যে, এক একটা ঘটনার ভিতর দিয়ে জীবন তার সত্যকে উন্মোচিত করে দেখায় তা তো জানত না সুবীর।

কেউ সাহায্য করেনি, সুবীর নিজেই উঠে বসেছিল খুব ধীরে ধীরে। বুকের মধ্যে হাঁফ ধরে গেছে। মাথা টালমাটাল। চোখে ধোঁয়া-ধোঁয়া দেখছে। সেই কুয়াশার মধ্যেই সে নিজের আপনজনদের দেখতে পেল। অর্চনা, তার বউ। অবু, তার ছেলে। ঝুমা, তার মেয়ে। সুবীরকে তারা একটূ দূরত্ব থেকে দেখছে। দেখছে, ডাল আর ঝোলমাখা একটি কমিক চরিত্রের মতো বসে আছে সুবীর। ঘরের মেঝের ওপর। ডান হাতটা কিছুতেই তুলতে পারছিল না সে। টেরই পাচ্ছিল না হাতটাকে। তবু চেয়ে রইল কিছুক্ষণ হাতটার দিকে।

ঘটনার সাক্ষী ছিল দু'জন ঝি-ও। তাদের পরে তাড়িয়ে দিয়েছে অর্চনা। তাদেরই একজন বুলি। গাঁয়ের মেয়ে, একটু বোকা সোকা সরল ধরনের। সুবীরের বগলের নিচে হাত ঢুকিয়ে সে-ই টেনে তুলেছিল সুবীরকে।

টলতে টলতে বাথরুমে গেল সুবীর। অনেকক্ষণ বাথরুমের মেঝেয় স্তব্ধ হয়ে বসে থেকেছিল সে। বাইরে তখন অর্চনা আর অবু ক্রুদ্ধ স্বরে একযোগে তার উদ্দেশ্যে যা বলে যাচ্ছিল সেগুলো যত নগ্ন অপমানই হোক, আর গায়ে লাগছিল না সুবীরের।

তখন শীত ছিল, মনে আছে সুবীরের। ভেজা মেঝের শীতলতায় কেঁপে কেঁপে উঠছিল সে।

বাথরুমের দরজায় টোকা দিয়ে বুলি বলল, বাবু, বরফ বের করেছি। হাতে লাগাবে না?

সুবীর জবাব দিতে পারেনি। অত অপমানেও নয়, কিন্তু বুলির এই কথায় তার চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়তে লাগল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল সে।

সেই কান্না অভিমান থেকে নয়, সাময়িক ভুল বোঝাবুঝি থেকে নয়, সেই কান্না সর্বস্ব-হারানো এক পুরুষের, যে অদ্য উপলব্ধি করেছে যে, তার আর কেউ নেই। ডান হাতের প্রচণ্ড ব্যথা সেই তুলনায় কিছুই নয়।

পায়জামা ছেড়ে কোমরে তোয়ালে জড়ানোরও সাধ্য ছিল না সুবীরের। ডান হাতটা তখন এতই বিবশ। সেই চেষ্টাও করল না সুবীর। ভেজা পায়জামা, নোংরা জামা যেমন ছিল তেমনি অবস্থায় সে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল। তারপর সোজা উঠে গেল ছাদে।

ইজিচেয়ার পাতাই ছিল। ওই শীতে খোলা ছাদের ওপরে বসে এক অর্ধচেতনায় সে তার ভাঙচুরগুলো হিসেব করার চেষ্টা করেছিল। সল্ট লেক-এর বিখ্যাত লক্ষ লক্ষ মশা এসে ছেঁকে ধরেছিল তাকে। সে গ্রাহ্যও করেনি। শুধু চিনেমাটি আর কাচই তো নয়, আরও কত কী ভেঙে পড়েছিল সেদিন। জীবনের সবটুকু নির্মাণ ধূলিস্যাৎ।

ওই বুলিই এসেছিল ছাদে তাকে ডেকে নামিয়ে নিতে।

সুবীর শুধু মড়ার মতো পড়ে ছিল ইজিচেয়ারে। পৃথিবীর কিছুই তাকে স্পর্শ করছিল না। মাঝে মাঝে অবুর হুংকার কানে আসছিল, ওই ব্যস্টার্ড যদি আর কোনোদিন তোমার গায়ে হাত তোলে মা, তাহলে ওকে লাথি মেরে বের করে দেবো। যাক, যেখানে খুশি চলে যাক।

এই বাড়িটা করতে লাখ দুয়েক টাকা বেরিয়ে গেছে সুবীরের। চড়া সুদের ধার আছে, প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা আছে, ব্যাঙ্ক থেকেও কিছু নিতে হয়েছে। অর্চনার নামে বাড়ি। অর্চনাও কিছু দিয়েছে, যতটা তার চাকরির সুবাদে দেওয়া সম্ভব। হয়তো অর্চনা আরও কিছু দিতে পারত। দেয়নি। তার দেওয়া মাত্র সাত হাজার টাকায় বাড়ির কাঠের কাজগুলোও সম্পূর্ণ হয়নি। তবু দিয়েছে, এটা সুবীরকে স্বীকার করতেই হয়। বাড়ি হয়ে যাওয়ার পর অর্চনা চাপ দিতে লাগল, পুরোনো আসবাব বেচে দিয়ে নতুন সব ফার্নিচার কিনতে হবে, নতুন পর্দা, নতুন সব আধুনিক ফিটিংস। এ ব্যাপারে মায়ের সঙ্গে ছেলে আর মেয়েও একজোট হয়েছিল। অগত্যা ফের টাকার জন্য সুবীরকে ছোটাছুটি করতে হয়েছে।

ভারী সুন্দর বাড়ি। অভ্যন্তরের শোভাও মুগ্ধকারী। যে দেখে সে-ই বাহবা দিয়ে যায়।

সুবীর কিন্তু সেই রাতে নিজের বাড়ির ছাদে হাতের যন্ত্রণায় অস্ফুট জান্তব শব্দ করতে করতে বাড়িটার ধ্বংসস্তূপ প্রত্যক্ষ করেছিল। এক লহমায় সংসারের অসারতা প্রকট হয়ে গেল চোখের সামনে।

বুলি এসে বলল, বাবু, ঘরে চলুন। মা কাঁদছে।

তুই যা বুলি। আমাকে বিরক্ত করিস না।

তোমাদের যে কেন এত অশান্তি বাবু, রোজ ঝগড়া। ঝগড়া আমাদের বাড়িতেও হয়, কিন্তু আমরা তো ছোটোলোক। তোমাদের কেন হবে?

সুবীর এ কথার কী জবাব দেবে?

## ৩

সুমন্ত্র হাওড়ায় নামল বিরস মুখে। এক কোলে ছেলে, অন্য হাতে মাঝারি একটা স্যুটকেস। পিছনে ভ্রূকুটি কুটিল মুখে বুলা। তার হাতে মস্ত বাস্কেট। তাতে বাচ্চার দুধের কৌটো, বোতল, তোয়ালে ইত্যাদি। এ সি

চেয়ারকার থেকে দুর্দান্ত গরমের কলকাতায় পা দেওয়া হয়তো একটা বিয়োগান্ত ঘটনা। কিন্তু তার চেয়েও বিয়োগান্ত সুমন্তের অ্যাটাচিকেসটা হাপিশ হয়ে যাওয়া। শ্বশুরের কাছ থেকে ধার করে ফেরার টিকিট কাটতে হবে। কী লজ্জা!

এই, তুমি জিআরপি তে চলো।

লাভ হবে কিছু? রাত বাড়বে। ট্যাক্সিওয়ালা সল্ট লেক-এ যেতে চাইবে না।

বেশি পয়সা দিলে ঠিক যাবে। জিআরপি-তে রিপোর্ট করলে অনেক সময়ে পাওয়া যায়।

সুমন্ত্র যথা নিয়মেই বউকে ভয় পায়। বলল, চলো, কিন্তু বাবাইটার খিদে পেয়েছে।

সহ্য করতে হবে। আমার মুক্তোর দুল'জোড়া যে কেন তোমাকে রাখতে দিলাম। ছিঃ।

দোষটা কি শুধু আমার?

তোমার দোষ তো বলিনি। তবে র‍্যাকে অ্যাটাচিকেস রাখা তোমার ঠিক হয়নি। অতগুলো টাকা ছিল, দামী পেন, ক্যামেরা, আমার দুল, দরকারী কাগজপত্র। তোমার উচিত ছিল অ্যাটাচিটা সিটের মধ্যেই গুঁজে রাখা।

পাগল! খোঁচা লাগবে না?

লাগতই না হয় একটু। চুরি তো যেত না।

এ সি চেয়ারকার থেকে চুরি যাবে কে ভেবেছিল বলো!

আজকাল লোকের হাতে অনেক টাকা। হেঁজি-পেঁজিরাও এ সি-তে ওঠে। সাবধান হওয়া উচিত ছিল।

হাওড়া স্টেশনে জিআরপিটা কোথায় তা জানা ছিল না সুমন্ত্রর। খুঁজে বের করতে অনেকটা সময় লাগল। ততক্ষণে সুটকেসের ভারে হাত ব্যথা করছে। ছেলের ভারে বাঁ অঙ্গ অবশ।

বুলা, বাবাইকে একটু নিতে পারবে?

দাও। কিন্তু ও কি আমার কাছে থাকতে চাইবে। যা বাপ-ভক্ত!

কথাটা মিথ্যে নয়। ছেলেটা অসম্ভব বাপ-ন্যাওটা। দেড় বছর বয়সে সে একটা মাত্র আপনজনকে চিনেছে। সে হল সুমন্ত্র। বাপ যতক্ষণ অফিস করে ততক্ষণ বুলার নাভিশ্বাস।

বুলা বাবাইকে কোলে নিয়ে বলল, কল্পনাকে আনলে হত। এ সময়ে কাজে লাগত। বাবাই তবু ওর কোলে থাকে।

তুমিই তো আনতে দিলে না।

একগুচ্ছের টাকা খরচ হত। এখানে তো বাবাইকে নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। মা মাসী মামা দাদুর কোলে কোলে থাকবে। আমার বাপের বাড়িতে দুটো কাজের লোক। আর একটা বাড়তি লোক চাপানো ঠিক হত না।

জিআরপি-তে বেশ ভীড়। নানা অভিযোগ দায়ের হচ্ছে। বড্ড গণ্ডগোল।

বুলা, হয়ে গেল।

কী হল?

ডায়েরী লেখাতে গেলে মধ্যরাত্রি হয়ে যাবে।

দাঁড়াও। আমি একটু দেখি। মেয়ে হওয়ার খানিকটা অ্যাডভান্টেজ তো আছেই।

সুন্দরী হওয়ারও।

বুলা এক আধজনকে মধুর ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে টেবিলের কাছে পৌঁছে গেল এবং দশ মিনিটের মধ্যে অফিসারকে কব্জা করে ফেলল।

কী ধরনের অ্যাটাচিকেসটা বলুন তো! কালার?

বুলা মুখ ফিরিয়ে সুমন্ত্রকে বলল, এই এসো না এগিয়ে।

সুমন্ত্র চোরের মতো মুখ করে এগিয়ে গেল।

অ্যাটাচির রঙ? চারকোল ব্ল্যাক। ভিতরে ছিল বাইশসো টাকা, একটা মামিয়া ক্যামেরা, পার্কার ডট পেন, একজোড়া মুক্তোর দুল, কাগজপত্র।

অফিসার সবই লিখে নিচ্ছিল।

পাওয়া যাবে?

যেতে পারে। লোকাল অ্যাড্রেস দিয়ে যান। খবর পেলে জানিয়ে দেবো। টেলিফোন থাকলে নম্বরটাও লিখে দেবেন। কোথায় চুলি গেল একটু আন্দাজ দিতে পারবেন?

সুমন্ত্র একটু ভাবল। তারপ বলল, দুর্গাপুরে আমরা চা খেয়েছিলাম। তারপর একটু জাস্ট তন্দ্রামতো...

বুঝেছি। কোথায় এসে দেখলেন যে, অ্যাটাচিটা নেই?

দেখিনি। আসলে আমাদের বাচ্চাটা একটু জ্বালাতন করছিল। আমরা ওকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। হাওড়ায় নামবার একটু আগে হঠাৎ খেয়াল হল...

বুঝেছি।

বুঝে দেখুন, এ সি চেয়ার কার-এও আমাদের নিরাপত্তা নেই।

কোথাও নেই স্যার। আজকাল দারোগার বাড়িতেও চুরি হয়।

কোনও আশা আছে?

থাকবে না কেন?

খোঁজ নেবো কি?

নিতে পারেন। পরিশ্রম বাঁচে। সই করুন।

বুলা বাচ্চাকে ফিরিয়ে দিল সুমন্ত্রর কাছে, নাও তো। বড্ড জ্বালাছে।

সুমন্ত্র বাচ্চা আর সুটকেস, বুলা বাস্কেট হাতে গেট দিয়ে বেরিয়ে এল।

ক'টা বাজে দেখ তো!

দশটা বেজে গেছে।

ইস!

ট্যাক্সি পেতে ঝামেলা হবে। তার চেয়েও বড় কথা, তুমি সল্ট লেক-এর বাড়ি চিনবে কি না। একবার তো মোটে এসেছিলে।

ঠিকানা তো আছে। দেখা যাক।

ট্যাক্সির জন্য এই রাতেও বেশ লাইন। তার চেয়েও বড় কথা, বে-লাইনে বিস্তর ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে। তারা ডাকাডাকি করছে।

বুলা সাবধান করে দিল, এই, লাইনের বাইরে ট্যাক্সি ধোরো না। ওরা ভালো নয়।

ডাকাতি করবে নাকি!

করতে পারে। চলো লাইনে দাঁড়াই।

অগত্যা সুমন্ত্রকে লাইনে দাঁড়াতে হল। বেশ বড় লাইন। গোটা দুয়েক দূরপাল্লার ট্রেন প্রায় একই সঙ্গে এসে পৌঁছেছে, ফলে এত রাতেও ভীড়।

পৃথিবীতে বেঁচে থাকা মানেই ঝঞ্ঝাট আর ঝঞ্ঝাট। একটা ঝমেলা মিটতে না মিটতে আর একটা এসে হাজির হয়। বিশেষ করে বিয়ের পর থেকে সুমন্ত্রর জীবনটা এই সব ঝঞ্ঝাটে এত কণ্টকাকীর্ণ হয়ে গেল যে, বেঁচে থাকাটাই তার কাছে একটা কাঁটার বিছানায় শুয়ে থাকার মতো। বাজার করো, এটা আনো, সেটা করো। বাচ্চা হল তো ঝঞ্ঝাট দ্বিগুণ হল। রাতে পেচ্ছাপ করে, কাঁদে, কখনো পেট ব্যথা করে, খাট থেকে পড়ে যায়। এই তো সেদিন মধ্যরাতে ছেলে পেটের ব্যথায় নীলবর্ণ ধারণ করেছিল। বুলা তাকে প্রায় ঘাড়ধাক্কা দিয়ে ঘরের বার করে বলল, যেখান থেকে পারো ডাক্তার ধরে আনো।

মধ্যরাতে ডাক্তার খুঁজতে বেরোনো যে কী সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার। আসানসোলের যে অঞ্চলে তারা থাকে তা মোটেই সুবিধের জায়গা নয়। চুরি ছিনতাই খুন জখম লেগেই আছে। তার মধ্যেই প্রাণ হাতে করে বেরোতে হল। তার গাড়ি গেছে সারাই হতে। রিকশা নেই, ট্যাক্সি নেই, আধমাইল দূরে এক আধচেনা ডাক্তারকে বিস্তর মেহনতে জাগানো গেল বটে, কিন্তু সে পায়ে হেঁটে এত দূরে আসতে নারাজ। তবে দয়া করে লক্ষণ শুনে ওষুধ লিখে দিল এবং ভিজিট চেয়ে নিল। প্রেসক্রিপশন নিয়ে সুমন্ত্র বোকার মতো পথে নেমে পড়ল বটে, কিন্তু ওষুধ পাবে কোথায়? সব দোকান বন্ধ। আবার ফিরে গিয়ে ডাক্তারকে জাগাতে হল। ডাক্তার ফের দয়া করে তার স্যাম্পেল ওষুধের কয়েকটা দিয়ে দিলেন।

ততক্ষণে বুলা আশপাশের বাড়ির লোকজনকে জাগিয়ে ফেলেছে। তারা এসে ঘর ভরে ফেলল। মা মাসি গোছের যারা ছিল তারা চুনের জল এবং আরও কী কী সব টোটকা খাইয়ে ছেলেকে সুস্থ করে ফেলেছে। সুমন্ত যখন ঝোড়ো কাকের মতো চোহারা নিয়ে চোর চোর মুখে ফিরল তখন ছেলে এক পাড়াতুতো দিদিমার কোলে গ্যাঁট হয়ে বসে খেলছে।

তা এই হল সুমন্ত্রর জীবন। সর্বক্ষণ কাঁটা হয়ে থাকা। সর্বক্ষণ সূতোর ওপর হাঁটা। কখন ঝঞ্ঝাট এসে হাজির হয়।

সুমন্ত্র গুণে দেখেছে, সামনে বত্রিশ জন। বত্রিশটা ট্যাক্সি এত রাতে হাওড়া স্টেশনে বাপের সুপুত্র হয়ে আসবে এমনটা আশা করা আর পক্ষিরাজ ঘোড়ায় বিশ্বাস করা একই ব্যাপার। তার কোলে ছেলে, কাঁধে মাথা রেখে গঙ্গার ফুরফুরে হাওয়ায় আরামে ঘুমোচ্ছে। স্যুটকেস পাহারা দিচ্ছে বুলা, সুমন্ত্র পৃথিবীর জটিলতার কথা ভাবতে ভাবতে অতিশয় উদ্বেগ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জামাইষষ্ঠী! জামাইষষ্ঠী ব্যাপারটা এখনো কেন তুলে দেয়নি লোকেরা?

আর সল্ট লেক! সেও এক রাক্ষসের পুরী বলে শুনেছে সুমন্ত্র। খাঁ খাঁ রাস্তাঘাট, সুনসান সব বড় বড় ফাঁকা জায়গা। ট্যাক্সি যেতে চায় না, বাস-টাস বিশেষ নেই। সন্ধ্যা রাত্রে সেখানে নিশুতি নেমে আসে।

এই, শোনো!

সুমন্ত্র একটু চমকে উঠে বলল, কী বলছ?

তুমি বরং বেশি পয়সার লোভ দেখিয়ে লাইনের বাইরে ট্যাক্সি ধরো।

পাগল! লাইনের বাইরে ট্যাক্সি ধরা বিপজ্জনক।

তোমার সবতাতেই এত ভয় কেন বলো তো! ওই তো লোহার বেড়ার ওপাশে কত ট্যাক্সি। লোকেরা উঠে উঠে চলে যাচ্ছে। কলকাতার ট্যাক্সিওয়ালারা এখনো অত খারাপ হয়ে যায়নি যে, চুরি বা ছিনতাই করবে। আর আমাদের ভয়ই বা কী বলো, আমাদের তো সবই গেছে।

তা বটে, কিন্তু বেশতো দাঁড়িয়ে ছিলাম।

এভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে রাত বারোটা বেজে যাবে।

এ কথায় আরো একটু আতঙ্কিত হল সুমন্ত্র। চারদিকে অসহায়ভাবে তাকাল।

বুলা তাড়া দিল, যাও না, গিয়ে একটু কথা বলেই দেখ। অমি লাইন রাখছি।

অগত্যা সুমন্ত্র পা বাড়াল। ভগবান বলে কিছু কি আছে? না থাকাই সম্ভব। থাকলে মানুষকে পদে পদে এত বিপদে পড়তে হবে কেন? ওই যে বে-লাইনের ট্যাক্সি ওরা যে সুবিধের লোক নয় তা সুমন্ত্র জানে। কত টাকা বেশি চাইবে কে জানে। তার ওপর হয়তো অন্য সওয়ারি তুলবে। টাকার জন্য সুমন্ত্র চিন্তা করে না। তার অ্যাটাচি চুরি গেলেও বুলার হাতব্যাগে কিছু টাকা আছে। শ্বশুরের কাছ থেকেও ধার নিতে পারবে। কিন্তু এই সব ট্যাক্সিতে ওঠাটাই কি বিপজ্জনক নয়!

সুমন্ত্র চার পা এগোতে না এগোতেই একটা দুর্দান্ত পুরুষালি ভরাট গলার মন্দ্র স্বর শোনা গেল, আরে এই বুলা! তুই কোথা থেকে?

সুমন্ত্র ফিরে তাকাল। দাড়িওয়ালা দুর্দান্ত চেহারার এক লম্বা-চওড়া গৌরবর্ণ যুবক লোহার রেলিংটা টপকে চলে এল কাছে।
বুলাও উল্লাসে চেঁচাল, শৌনক! ইস কত'দিন পরে দেখা!
এঃ মা, তুই বিয়ে-ফিয়ে করে একেবারে ফর্টি প্লাস হয়ে গেছিস। জবরজং দেখাচ্ছে তোকে।
এই আয় আমার বরের সঙ্গে তোর আলাপ করিয়ে দিই। ওগো, এসো না।
সুমন্ত্র এগিয়ে এল।
এই হল শৌনক, মনে আছে? বিয়েতে এসেছিল কিন্তু।
শৌনকের কণ্ঠস্বরটি এত ভালো যে, কান পেতে শুনতে ইচ্ছে করে। সেই সম্মোহনকারী গলায় একটু হেসে বলল, আরে যাঃ, আমরা যা বিরাট গ্রুপ গিয়ে কেলো করেছিলাম তোর বিয়েতে, অতজনকে কি মনে রাখা সোজা!
সুমন্ত্র আমতা আমতা করে বলল, একটু একটু মনে আছে।
এ কি তোর ছেলে?
হ্যাঁ।
আরে বাঃ, তুই তো একদম বুড়টি মেরে গেছিস তাহলে! কিছু মাইন্ড করবেন না সুমন্ত্রবাবু, বাচ্চাটা খুব তাড়াতাড়ি হয়ে গেছে আপনাদের। বিয়ের পর একটু ঝাড়া হাত পায়ে দু'চার বছর কাটানো উচিত ছিল।
বুলা চোখ পাকিয়ে বলল, খুব অসভ্যতা হচ্ছে। লোক শুনছে না? ছেলে হয়েছে বেশ হয়েছে। তোর কী?
আচ্ছা আচ্ছা বাবা। আরও হোক। তা এখানে লাইনে চুপসে দাঁড়িয়ে আছিস, চল আমার সঙ্গে।
তোর গাড়ি আছে?
আরে না, ট্যাক্সি। চল চল। আসুন দাদা। এইটে কি তোর স্যুটকেস?
তোকে নিতে হবে না।
শৌনক কথাটা গ্রাহ্য না করে স্যুটকেস তুলে নিল। তাড়া দিয়ে বলল, আয় আয়।
শোন, শোন, তুই কোথায় যাবি?
আমি যেখানেই যাই, তোকে সল্ট লেক-এ পৌঁছে দিয়ে যাবো।
বুলা সুমন্ত্রর দিকে তাকিয়ে বলল, দেখলে তো, বে-লাইনে কেমন সবাই যাচ্ছে!
সুমন্ত্র জবাব দিল না। ভগবান বোধ হয় আছেন। কিংবা থাকলেও থাকতে পারেন।
ট্যাক্সিতে আরও একজন ছিল। যুবক। শৌনক তাকে সামনের সীটে পাঠিয়ে দিল। পিছনে তিনজন।
ট্যাক্সিওয়ালাটা কী একটু আপত্তি করছিল, ফের সওয়ারি তুললেন দাদা, রাত হয়ে যাচ্ছে।
শৌনক চাপা গলায় বলল, সোজা নিয়ে লক-আপে ভরে দেবো, বুঝলে? আগে সল্ট লেক চলো।
ট্যাক্সিওয়ালা বুঝে গেল। তারা জানে কার সঙ্গে গণ্ডগোল করতে নেই।
সুমন্ত্র ভয়ে সিঁটিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে তার উপলব্ধি হল, এই দুই যুবকের অতিশয় শক্তিশালী ও উত্তপ্ত উপস্থিতির কাছে যে-কেউ উদ্যত ফণা নামিয়ে নেবে। এরা জানে কাকে কীভাবে চালাতে হয়।
ট্যক্সি ছাড়ার পর বুলা বলল, ভাগ্যিস তোর সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল। নইলে কী যে মুশকিলে পড়েছিলাম। তুই কোথায় গিয়েছিলি?
সে অনেক দূর। ট্রেকিং করতে। তমসা ভ্যালি।
ও বাবা।
বাবা ডাকছিস কেন?
তমসায় এখন হাজার হাজার ট্রেকার যায়।
বেশ আছিস।

আছিই তো। তোর মতো বিয়ে করে ন্যাদস হয়ে গেছি নাকি?

মারব থাপ্পড়। আমি ন্যাদস?

শৌনক সুমন্ত্রের দিকে চেয়ে বলল, কিছু মনে করবেন না দাদা, আপনি আমার বেস্ট ফ্রেন্ডকে প্রায় সীতা হরণের মতো করে নিয়ে গেলেন। আমার খুব ইচ্ছে ছিল বুলাকে বিয়ে করে ফেলি। একটু ঝগড়াটে, একটু বোকা ঠিকই, কিন্তু চলেবল। তাছাড়া পুরোনো বন্ধু।

তোকে বিয়ে করতে বয়েই গিয়েছিল আমার। বকবক করে মাথা ধরিয়ে দিতি তাহলে।

আমি একটু বেশি কথা বলি ঠিকই, কিন্তু আমার কথা শুনতে কোন মেয়ে না ভালবাসে বল!

সুমন্ত্র অতি দ্রুত মনে মনে মিলিয়ে দেখছিল। তার তুলনায় এই শৌনক ছোকরা কি অনেক বেশি সুপুরুষ এবং সাহসী ও পৌরুষযুক্ত নয়?

একপাশে সুমন্ত্র, অন্য পাশে শৌনক মাঝখানে বুলা। বুলা আর শৌনক অতিশয় গাঢ় গলায় পুরোনো সব কথা বলতে লাগল। সুমন্ত্র কান দিল না। সে ছেলেকে কোলে শুইয়ে চোখ বুজে পাহাড়ের কথা ভাবতে লাগল। দুঃসাহসী যুবকেরা দুর্গম সব পাহাড়ে গিয়ে ওঠে, নৌকোয় সমুদ্র পাড়ি দেয়, আরও সব কী কী করে। তার জীবন ওরকম নয়। সে ছিল গুড বয়। ওই গুডনেস আর কখনো ছাড়েনি তাকে।

কিন্তু গুড বলা কি ঠিক হবে? চাকরিতে সে দেদার ঘুঁষ পায় এবং খায়। এই বয়সেই সে বেশ কিছু টাকা করে ফেলেছে। আরও আসছে। রাশি রাশি টাকা। সে কি গুড বয়?

তারপর কী হল?

কী আবার হবে। আমি পাইওনীয়ারিং করলাম। পা রাখার জন্য ঠিক আট ইঞ্চি চওড়া জায়গা ছিল, তাও বরফে পিছল। দু'ধারেই খাদ, তিন হাজার ফুট, পারফেক্ট রিজ যাকে বলে।

ইস শুনেই গা শিরশির করে। হেঁটে চলে গেলি?

পাগল! হাঁটতে গেলেই বিপদ। গেলাম হামাগুড়ি দিয়ে। কখনো ঘোড়ায় চাপার মতো দু'ধারে পা ঝুলিয়ে বুকে হেঁচড়ে।

কতখানি?

পঞ্চাশ মিটার হবে।

শুনে সুমন্ত্ররও গা শির শির করছিল। ঘুমন্ত ছেলের দিকে একবার মায়াভরে তাকাল সে। না, ছেলেকে কখনো কোনো বিপজ্জনক খেলাধূলো বা অভিযান করতে দেবে না সে।

৪

মাঝে মাঝে এই পৃথিবীর অর্থহীনতা উপলব্ধি করে শরীরের ভিতর থেকে মুখ তুলে আইক দীর্ঘ ও বিষণ্ণ ডাক ছাড়ে। বারো বছর ধরে এ বাড়িতে সে একনিষ্ঠভাবে রয়ে গেছে। চোর বা আগন্তুক আজকাল সকলকেই সমদর্শীর মতো ক্ষমা করে দেয় সে। বয়সের ভার সমস্ত শরীরে ক্লান্তির মতো ছড়িয়ে থাকে। পিছনের প্রিয় বারান্দায় সারাদিন নিজের মধ্যে ডুবে থাকে সে।

অর্চনা টের পায়, আইক বেশিদিন আর বাঁচবে না। গড়পড়তা চোদ্দ বছর কুকুরদের আয়ু। আইকের বারো বছর হল। আইক মরে গেলে সবচেয়ে বেশি দুঃখ হবে তার। সারাদিন আর কেউ বাড়িতে থাকে না। আইক থাকে। পায়ে পায়ে আইক-ই ঘুর ঘুর করে বেড়ায়, সঙ্গ দেয়। আগে ছিল, যেখানে অর্চনা সেখানেই আইক। আজকাল আইক ঝিমোতে ভালোবাসে।

রান্নাঘরের গরম থেকে বেরিয়ে পাখার তলায় একটু জুড়োলো অর্চনা। তারপর স্নান করে পাট-ভাঙা একখানা তাঁতের শাড়ি পরল। অর্চনা স্বভাব-সুন্দরী। না সাজলেও তার চলে। আর এই মধ্যে চল্লিশেও ছিপছিপে তার গড়ন। পথে-ঘাটে ছোকরারা এখনো পিছু নেয়, শিস দেয়। প্রেমপত্র এখনো পায় অর্চনা।

স্বামীর বন্ধুদের বা বান্ধবীদের স্বামীদের সপ্রশংসা বা লোভী চোখ তাকে কিছু কম জ্বালাতন করে না। আর দুঃসাহসী শরীর-লোভীদের আক্রমণ সেই কৈশোর থেকে আজ অবধি কিছু কম ঠেকাতে হয়নি তাকে।

এখনো পরিপূর্ণ যুবতীই রয়ে গেছে অর্চনা। ধেড়ে ধেড়ে তিন ছেলে-মেয়ের মা তাকে কেউ বলবে না। বললে অবিশ্বাস করে লোক।

আয়নার সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়াতে ভালোই লাগে তার। এমন গড়ন তার দুই মেয়ের নেই, বান্ধবীদের নেই। ফিলমে নামবার বহু ডাক পেয়েছিল অর্চনা। দু'বার দুটো ছোটো রোল করেছিল। তারপর ব্যাপারটা আর তার ভালো লাগেনি। নায়িকা হওয়ার সুযোগ পেলে হয়তো আগ্রহ হত। কিন্তু তার গলার স্বরটা একটু তীক্ষ্ণ আর সামান্য ভাঙা বলে সে সুযোগ হয়নি।।

অর্চনা সিঁদুর দেয় না, শাঁখা বা নোয়া পরে না। একসময়ে সবই পরত। তারপর কেমন যেন মনের মুক্তি ঘটে গেল। বিরক্তি এল। সব ছেড়ে দিল।

সুবীরের সঙ্গে এই যে একত্র বসবাস এটাকে বিবাহিত জীবন বললে ক্ষতি নেই, না বললেও ক্ষতি নেই। তার সঙ্গে সুবীরের অবনিবনা চিরকালের। কেন যে এরকম একটা বিপরীত বিয়ে হল তার! অথচ সে নিজেই পছন্দ করেছিল সুবীরকে। বার্ণপুরে তখন তাদের বাড়িতে আসত চমৎকার ঝলমলে সেই যুবা।

একটা টিপ পরল অর্চনা। সামান্য প্রসাধনেই তাকে এত ভালো দেখায় যে, তাকে কোনোদিনই তেমন সাজতে হয় না।

অর্চনার লজ্জা একটাই। সে যখন তার জামাইয়ের চোখে মুগ্ধতা দেখে তখন ভিতরে ভিতরে কুঁকড়ে যায়। নইলে জামাই হিসেবে সুমন্ত্র চমৎকার ছেলে। ওকে পছন্দও করে অর্চনা। কিন্তু শত হলেও পুরুষ মানুষ। রূপের সামনে কে না বিহ্বল হয়ে পড়ে।

আইক!

আইক লেজটা সামান্য নাড়ল।

বারান্দার পাখাটার ইজিচেয়ারে বসল অর্চনা। আইকের মাথায় একটু হাত বুলিয়ে আদর করল।

আবছায়ায় দেখতে পেল ঝুমা পিছনের বাগানে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে।

ঝুমা!

ঝুমা দাঁড়াল, কী বলছ?

অবুদের কিছু খেতে দিয়েছিস?

বলোনি তো।

সবই বুঝি বলতে হবে?

ঝুমাকে আজকাল এরকমই কথায় কথায় বকুনি খেতে হয় অর্চনার কাছে। অর্চনা যে বকে, বড্ড বকে ওকে তা সে নিজেও জানে। জেনেও কেন যেন সামলাতে পারে না নিজেকে। ওই যে কুমারী বয়সের ভারহীন দিনযাপন ওটাকেই ভারি হিংসে হয় কি তার? ওই যে নানা সম্ভাবনায় ভরা স্বপ্নময় ভবিষ্যৎ সামনে রেখে প্রজাপতির মতো উড়ে বেড়ানো ওটাই জ্বালা ধরায় তার মনে?

কে জানে!

ঝুমা বারান্দায় উঠে এসে বলল, কী করতে হবে বলো।

গলায় ঝাঁঝ। বিরক্ত। উদ্ধত। অর্চনার ইচ্ছে করল গালে ঠাস করে একটা চড় কষাতে। কিন্তু এই বয়সটা ভালো নয়। আজকালকার মেয়ে, হঠাৎ কী করে বসে। পালিয়ে যেতে পারে, গায়ে আগুন দিতে পারে। ওর টেবিলে দু-একবার সুইসাইডাল নোট পেয়ে অর্চনার নাড়ী ছাড়ার অবস্থা হয়েছিল।

অর্চনা গম্ভীর গলায় বলল, ওরা বাগানে বসে আছে। প্লেটে সাজিয়ে কিছু খাবার দিয়ে আয়।

ঘরে এসে খেলেই তো পারে। বাগানে দিয়ে আসতে হবে কেন? কোথাকার লাটসাহেব?

ওভাবে কথা বলছিস কেন? বাগানে চাঁদের আলোয় বসে আছে, থাক না।

জ্যোৎস্নায় আমারও বেড়াতে ইচ্ছে করছে।

ফের মুখে মুখে কথা?

তুমি দাদাকে এত ইম্পর্ট্যান্স দাও কেন? না দিলে তো কথা বলতে হত না। আমি যদি আমার কোনও ছেলে বন্ধু নিয়ে এসে বাগানে গিয়ে বসি, তুমি দাদার হাত দিয়ে খাবার পাঠাবে?

এ কথায় অর্চনা এত অবাক হল! আশ্চর্য স্পর্ধা হয়েছে তো মেয়েটার!

কী বললি? ছেলে-বন্ধু নিয়ে বাগানে এসে বসবি?

যদি বসতাম!

খুব তো মুখ হয়েছে দেখছি।

মোটেই মুখ হয়নি। তুমি মুখ আনতে বাধ্য করছ।

অর্চনা আর নিজেকে সামলাতে পারল না। হাত বাড়িয়ে মেয়ের গালে একটা চড় বসিয়েই দিল।

হারামজাদী!

আশ্চর্যের বিষয়, ঝুমা নড়ল না। সরেও গেল না। ঋজু শরীরে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

আরও মারবে? মরো না।

এত সাহস কোত্থেকে হল? ক'টা ছেলে-বন্ধু জুটিয়েছিস?

কথাটা তোমার ছেলের বন্ধবীকেও তো জিগ্যেস করতে পারো। যাও না, গিয়ে জিগ্যেস করো তো, তার কেন এত ছেলে-বন্ধু? কেন সে তোমার ছেলের সঙ্গে এত রাত অবধি সল্টলেক-এ আড্ডা মারছে।

তাতে তোর কী?

ঝুমা সপাটে বলল, আমার কিছুই নয়। শুধু জানতে চাইছি তোমার বিচারটা এত একপেশে কেন।

মেয়েকে চড় মারার উত্তেজনায় হাঁফাচ্ছিল অর্চনা। এত বড় মেয়ের গায়ে হাত তোলার জন্য যতটা মানসিক শক্তি খরচ হয় ততটা চট করে পূরণ হয় না। বিশেষত মেয়ে যখন ভয় পাচ্ছে না, মাথা নিচু করছ না, অপরাধী ভাবও নেই।

অর্চনা গর্জন করল, চুপ করবি কি না!

আমাকে তুমি আর কত চুপ করিয়ে রাখবে? তুমি কি আমাকে পুতুল পেয়েছো? দুটো কাজের লোক বাড়িতে থাকতেও আমাকে কেন গিয়ে খাবার দিয়ে আসতে হবে ওদের? কাজের লোক খাবার দিয়ে এলে কি দাদার প্রেস্টিজে লাগে?

কথাটা যুক্তিযুক্ত। অর্চনার দুটো কাজের লোক। কিন্তু অবু কাজের লোকের হাতে খাবার বা জল পাঠালে সাঙ্ঘাতিক রেগে যায়। অর্চনার কোনো যুক্তিবোধ ছেলের ব্যাপারে কাজ করে না। কাজ করে অন্ধ আবেগ।

অর্চনা মেয়ের গালে হয়তো আর একটা চড় মারত। কিন্তু অবু বান্ধবীকে নিয়ে বাগানে বসে আছে। বেশী চেঁচামেচি হলে মুশকিল।

সুতরাং অর্চনা চাপা হিংস্র গলাতেই বলল, নষ্ট! নষ্ট মেয়ে কোথাকার! যা, আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যা।

ঝুমা একটা তেজী ভঙ্গিতে অর্চনাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা ও তাচ্ছিল্য করে ঘুরে আবার বাগানে চলে গেল।

পিছনের বাগানে সবজির নিবিড় ফলন হয়েছে। পাতাল রেলের মাটি কয়েক লরি ফেলিয়েছে এখানে অর্চনা। সার দিয়েছে। তারপর বাছাই বীজ আর চারা এনে লাগিয়েছে নিজের হাতে। এই তার শখ। বাগান। এই গ্রীষ্মে ঢেঁড়স, পটল, লঙ্কা সবই ফলাতে পেরেছে সে। পিছনে আড়াই কাঠার মতো জমি সবুজে সবুজ। নিবিড় গাছপালার ভিতর দিয়ে পায়ে-চলার সরু পথ।

গ্রীষ্মকালে বাগানটা খুব নিরাপদ নয়। সল্টলেক-এ সাপের প্রচণ্ড উৎপাত। এ বাড়িতে আসার পর অন্তত দশ বারোটা গোখরো আর কেউটে মারা হয়েছে। মেয়েটা ঘুরছে বাগানে। কাজটা ঠিক হচ্ছে কিনা কে জানে!

অর্চনা মেয়েকে ঘরে আসতে বলবে কিনা তা বুঝে উঠতে পারল না। হয়তো কথা শুনবে না। হয়তো বাজে একটা জবাব দেবে।

অর্চনা উঠে এল। সুবালাকে দিয়েই খাবার পাঠাল। তারপর নিজের ঘরে এসে চুপচাপ কিছুক্ষণ অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইল। রাগে, ক্ষোভে, অসহায়তায় তার শরীর দিয়ে আগুন ছুটছে। চোখে সহজে জল আসে না অর্চনার। এলে বোধহয় খানিকটা উত্তাপ বেরিয়ে যেতে পারত শরীর থেকে। কথায় কথায় সে কাঁদতে পারে না। আর তার পাগলা অনিয়ন্ত্রিত রাগটা তাকেই ছিঁড়ে খায়।

ফ্রিজ থেকে ঠাণ্ডা জলের বোতল বের করে সরাসরি কনকনে ঠাণ্ডা জল খেল সে। টনসিলাইটিস তার আছেই, সর্দির ধাতও। কিন্তু ঠাণ্ডা ভিতরে না গেলেই নয় এখন। বোতলটা কপালে, গালে, কানে বারবার চেপে চেপে ধরল সে।

নিজের ঘরে ফিরে আসবার জন্য পা বাড়িয়েছে, ঝপ করে অভদ্রের মতো নিভে গেল আলো। ইনভার্টারের জোরে আবার জ্বলল। অপ্রয়োজনীয় আলো আর পাখাগুলো নিবিয়ে দিল সে। নইলে ইনভার্টারের সব তেজ ফুরিয়ে যাবে। শুধু বসবার ঘরের একটা স্টিকলাইট জ্বালানো রইল।

টেলিফোনটা বাজতেই অস্থির অর্চনা চমকে উঠে স্থির হল। ন'টা বাজে কি?

সদর দরজার মাথায় চমৎকার ইলেকট্রনিক দেয়াল ঘড়িটার দিকে আপনা থেকেই চোখ চলে গেল তার। হ্যাঁ, ঠিক ন'টা।

তাহলে কি ও ফোন করছে?

অর্চনা টেলিফোনে 'হ্যালো' বলতে পছন্দ করে না। টেলিফোনটা তুলে নিয়ে একটু হাঁফধরা গলায় বলল, বলুন।

অর্চনা, আমি।

আবার ট্যুর ছিল বুঝি! অনেকদিন গলাটা শুনিনি।

কুড়ি দিন।

এবার কোথায় কোথায়?

হায়দ্রাবাদ, সেকেন্দ্রাবাদ, ঔরঙ্গাবাদ। এবার সব বাদ।

বেশ চাকরি। বেড়ানোও হচ্ছে, চাকরিও করা হচ্ছে।

হাঁফাচ্ছো কেন?

কোথায় হাঁফাচ্ছি?

শ্বাসের শব্দ পাচ্ছি।

অর্চনা একটু হেসে বলল, আজ মেয়ে জামাই আসছে, এতক্ষণ রান্নাবান্না করে এই বেরোলাম রান্নাঘর থেকে। দম নেওয়ার সময় ছিল না।

একেই বলে সুখের সংসার।

খুব সুখ। এসে দেখে যেও একদিন। আসবার তো মুরোদ নেই।

ও বাবা। তোমার সামনে গিয়ে দাঁড়াবো ভাবতেই পারি না।

দাঁড়ালে কী হবে?

হয়তো হার্টফেল হয়ে যাবে।

ইস বাড়াবাড়ি। তোমার হার্ট মোটেই অত দুর্বল নয়।

কী করে বুঝলে?

হার্ট দুর্বল হলে টেলিফোনেও কথা বলতে পারতে না।

টেলিফোন করার সময়েও বুক দুরদুর করে।

এ-যুগে কেউ এত নার্ভাস হয় নাকি? এই তো আমার ছেলে অবু কত অনায়াসে তার মেয়ে-বন্ধুদের সঙ্গে মেশে, এমন কি বাড়িতে অবধি নিয়ে আসে।

জানি। এ-যুগে তো রোমান্স নেই। আমাদের আমলে ছিল।

বেশি বোকো না তো! আমাদের আমল আবার কোনটা? তুমি কি বুড়ো নাকি?

তুলনামূলকভাবে বুড়োই।

তাহলে তো আমিও বুড়ি।

কণ্ঠস্বর একটু চুপ করে থেকে এক পর্দা চাপা গলায় বলল, ও-কথা বোলো না। বয়সের কথা উঠলে আমার ভীষণ অস্বস্তি হয়।

তাহলে নিজেকে বুড়ো ভাববে না বলো!

না, অর্চনা আমি সেই অর্থে বুড়ো নই। কিন্তু মনের দিক থেকে সেকেলে।

সেকেলে সে তো হাড়ে হাড়ে জানি। নইলে কেউ শুধু গলার স্বরের সঙ্গে প্রেমে পড়ে?

অর্চনা, কথাটা ঠিক হল না। তোমাকে আমি দেখেছি। একবার নয়, বেশ কয়েকবার। ট্যুরে যাওয়ার আগের শুক্রবারেও দেখেছি।

কোথায় বলো তো!

বাজারে। বেলা তখন ন'টা হবে।

তাহলে দেখেছো। কিন্তু তোমাকে তো আমি দেখিনি কখনো।

হয়তো দেখেছো। কিন্তু কোনজন আমি তা জানো না।

শোনো, একদিন চলে এসো।

এই তো ভালো। মাঝে মাঝে টেলিফোন করব। কথা হবে। এরকম করেই একদিন খেলাটা শেষ হয়ে যাবে।

আমার তো খেলাটা শেষ করতে ইচ্ছে করে না।

আমারও করে না।

বাজারে সেদিন আমাকে কেমন দেখাচ্ছিল বলো তো!

তোমাকে সব সময়েই তো অপরূপ দেখায়। চওড়া পাড়ের একটা সাদা শাড়ি পরেছিলে। মাথায় একটা সিল্কের স্কার্ফ ছিল।

ও বাবা, পোশাকটা পর্যন্ত মুখস্থ?

মুখস্থ না হয়ে উপায় আছে? গত পঁচিশ দিন ধরেই তো ওই মূর্তি ধ্যান করেছি।

খুব বুড়ি-বুড়ি লাগছিল না তো!

তোমাকে! কোনোদিন লাগবে না।

সেদিন কী হয়েছিল জানো? সকাল বেলায় হঠাৎ দেখি ডীপ ফ্রিজে মাছ নেই। আগে খেয়াল করিনি। কর্তাকে তবু ডিম ভাজা দিয়ে চালানো যায়, কিন্তু মাছ না হলে অবুর চলে না। হয়তো বাড়িতে খাবেই না সেদিন। তাই তাড়াতাড়ি সকালের রান্নাটা কোনোরকমে নামিয়েই বাজারে ছুটেছি। ভালো করে সাজিওনি।

তোমার ছেলেটি কেমন বলো তো!

কেন, ভালোই তো! এ আবার কী প্রশ্ন!

ভাবছিলাম, তুমি বোধ হয় ছেলেকে একটু বেশি আসকারা দাও।

আসকারা! তা হয়তো একটু দিই। ছেলেটা ছোটো থেকেই ভীষণ আমার ন্যাওটা।

বাপের সঙ্গে বনিবনা এখন কেমন?

ওই একরকম। এক ছাদের তলায় দু'জন থাকে, এই মাত্র।

বেশ বলেছো, দু'জনের মধ্যে কী একটা গণ্ডগোল চলছিল বলেছিলে, সেটা কি মিটে গেছে?

মিটবে না। পারসোনালিটি ক্ল্যাশ কি সহজে মেটে?

কণ্ঠস্বরটি কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, নিজেকে কেন সেকেলে লাগে জানো? আমার বাবার এখন তিরাশি বছর বয়স। এখনো তাঁর সামনে বসে কথা বলতে পারি না। দাঁড়িয়ে বলি।

তোমার বড্ড বাড়াবাড়ি।

ছেলেবেলা থেকে ওই অভ্যাস যে। তিরাশি বছর বয়স হলে কী হয়, এখনো সাঙ্ঘাতিক তেজ। সেদিন একটা মজার ঘটনা ঘটেছে। বলব?

বলো না।

আমাদের একটা ডেশুণ্ড কুকুর আছে।

ওই যে বেঁটে বিচ্ছিরি কুকুরগুলো?

হ্যাঁ। বাবা রোজ ওটাকে নিয়ে সকালে বেড়াতে যান। একদিন সকালে বেরিয়েছেন, হঠাৎ গোটা দুই দেশী কুকুর ডেশুণ্ডটার ওপর হামলা শুরু করল। রোজই করে। কিন্তু সেদিন দেশী কুকুরদের সঙ্গে একটা অ্যালসেশিয়ানও এসে জুটল। আশপাশের কোনো বাড়ির কুকুর হবে। ছাড়া পেয়ে চলে এসেছিল। বাবা পড়লেন মহা বিপদে। লাঠি নিয়ে তাড়া করলে দেশী কুকুরেরা ভয় পায় বটে, কিন্তু অ্যালসেশিয়ান ঘাবড়ায় না। সে ডেশুণ্ডকে কামড়াবেই। আর আমাদের কুকুরটাও ভয় পেয়ে তখন বাবার পায়ের ফাঁকে ঢুকে কুঁই কুঁই করছে। পায়ে কুকুরের শেকল জড়িয়ে যাওয়ায় বাবার হাঁটা বন্ধ।

অর্চনা খিলখিল করে হেসে উঠে বলল, পারোও তুমি গল্প বানাতে।

সত্যি বলছি। আমার কাছে কুকুর হচ্ছে পৃথিবীর ভয়াবহতম জীব। ওই অবস্থায় আমি পড়লে বোধহয় অজ্ঞান হয়ে যেতাম।

তুমি কুকুরকে অত ভয় পাও কেন?

কুকুরের কামড় খেয়ে পেটে চোদ্দটা ইনজেকশন নিতে হলে তুমিও পেতে।

তোমাকে কামড়ে ছিল?

উঃ, সেকথা ভাবতেই কেমন করে।

আমাদের কুকুরটার কী যে হয়েছে। শুধু ঝিমোয়।

আইকের কথা বলছ?

হ্যাঁ। বয়স হল, ভাবছি এবার বুঝি মরে-টরে যায়। হ্যাঁ, তোমার বাবার কথা কী বলছিলে?

ওঃ হ্যাঁ, তারপর বাবা এই তিরাশি বছর বয়সেও ওই সিচুয়েশন থেকে ডেশুণ্ডটাকে অক্ষত অবস্থায় ঠিক বাড়ি ফিরিয়ে আনলেন। শেষ অবধি নাকি উপায়ন্তর না দেখে তিনি নিজের কুকুরের নকল করে ঘেউ-ঘেউ করতে শুরু করেন। আর তাতেই ভড়কে গিয়ে অ্যালসেশিয়ানটা পালিয়ে যায়।

যাঃ! অর্চনা খুব হাসল।

তুমি হাসছো? আমরা কিন্তু হাসিনি।

ও'মা! এটা হাসির কথা নয়?

নিশ্চয়ই। কিন্তু বাবা যখন হাসির কথাও বলেন তখনো আমার হাসি না। গম্ভীর মুখ করে শুনি। আচ্ছা, ওই কি তোমার আইকের ডাক শোনা গেল?

হ্যাঁ, মাঝে মাঝে ওরকম ডেকে ওঠে বিনা কারণে।

কুকুরটাকে তুমি ভীষণ ভালোবাসো। না?

ওই তো আমার সারা দিনের সঙ্গী। বারো বছর হয়ে গেল। মায়া তো পড়বেই। শোনো একদিন সত্যিই চলে এসো। তোমাকে আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করে।

দেখলে কিন্তু দ্বিতীয়বার দেখতে ইচ্ছে করবে না। আমি কীরকম দেখতে বলো তো!

যেমন হও, আমার তাতে কিছু আসে যায় না।

যদি মোটে চার ফুট এগারো ইঞ্চি লম্বা হই, আর ভীষণ কালো, মোটা, তাহলে?

অর্চনা হাসছিল। বলল, তাতেই বা কী?

যদি দেখ যে, আমার একটা পা কাঠের, দাঁত উঁচু এবং ভীষণ ট্যারা?

এরকম তো হতেই পারে। চালাকি কোরো না।
তাহলে তুমি আরো কিছুদিন দেখা দাও, দেখা দাও করো, তাহলে ঠিক দেখা দেবো।
আহা রে, উনি যেন ভগবান যে, 'দেখা দাও, দেখা দাও' করতে হবে।
আমি ভগবান নই অর্চনা, তবে তুমি বোধহয় হয় আমার ঈশ্বরী।
ফের? ফোন রেখে দেবো কিন্তু?
রাখবার বোধ হয় সময় হয়েছে।
কেন।
আমাদের ফোনটা আজ আউট অফ অর্ডার। এক ডাক্তার বন্ধুর চেম্বার থেকে ফোন করছি। সে এতক্ষণ ছিল না। এইমাত্র তার গাড়ি এসে থামল।
আজ মেজাজটা খুব খারাপ ছিল, জানো? মেয়েটা, মানে ঝুমু বড্ড বেয়াড়া হয়েছে। এমনভাবে ঝগড়া করল আজ। ঠিক তুমি যখন ফোন করলে তার একটু আগে। ভীষণ রেগে গিয়েছিলাম। তোমার ফোনটা পেয়ে মন ভালো হয়ে গেল। আবার কবে ফোন করবে?
শিগগিরই।
এর মধ্যে আবার ট্যুরে যাবে না তো?
গেলে জানাবো। আমার চাকরির অর্ধেকই হল ট্যুর।
আর শোনো, তোমাকে আমি ঠিক খুঁজে বের করব।
কীভাবে?
একজন বুড়ো মানুষ একটা ডেশুন্ড কুকুর নিয়ে সকালে বেড়াতে বেরোন। সল্টলেক-এর মতো ফাঁকা জয়াগায় ঠিক আমি তাঁকে খুঁজে বের করব। তারপর ঠিকানা পেতে আর কতক্ষণ।
কণ্ঠস্বর হাসল। বলল, তুমি সেই চেষ্টা কখনোই করবে না জানি।
কীভাবে জানলে?
তোমারও কি ভয় নেই?
না। আমার কথা তো জানো না।
জানি। আর এও জানি, তোমার সেই সাহস আছে। কিন্তু পেরে উঠবে না। অতটা পরিশ্রম করার ইচ্ছেই হবে না।
ঠিক হবে। দেখো।
ঝুমা কোথায়?
বাগানে ঘুরছে।
ঝুমার কিন্তু বেশ পার্সোনালিটি আছে।
কী করে বুঝলে?
রোজ তো আর তুমিই প্রথম ফোন ধরো না। এক একদিন এক একজন ধরে। কখনো সুবীরবাবু, কখনো অবু, কখনো ঝুমা। প্রত্যেকের গলা আমার চেনা হয়ে গেছে। ঝুমার গলা যতবার শুনেছি প্রত্যেকবার মনে হয়েছে, দারুণ ব্যক্তিত্ব আছে।
তা হয়তো আছে। একটু বিদ্রোহী টাইপের।
সাবধানে হ্যান্ডেল করো। আজ ছাড়ছি।
আবার কবে ফোন করবে বললে না তো?
এরপর একদিন বেশি রাতে করব। যখন তোমার বাড়ির সবাই ঘুমোবে। তারপর সারা রাত কথা বলব।
অর্চনা একটু হাসল, দু'বার তো তাই করেছো। পাগল একটা।

ফোনটা একটু আকস্মিকভাবেই কেটে গেল। অর্চনা ফোনটা রাখতে গিয়ে দেখল, দরজার কাছ থেকে বিষদৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে ঝুমা দাঁড়িয়ে আছে। চোখে চোখ পড়তেই মুখ ফিরিয়ে চলে গেল আবার বাইরে।

শুনেছে কি কিছু? শুনলে শুনেছে, অর্চনা অত গ্রাহ্য করে না। এ সংসারের কাউকেই সে আর গ্রাহ্য করে না।

অর্চনা শোয়ার ঘরে এসে আলো জ্বালল। তারপর ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় অনেকক্ষণ ধরে দেখলে নিজেকে।

এখনো দারুণ সুন্দরী সে।

এই যে লোকটা মাঝে মাঝে ফোন করে এ অর্চনার একমাত্র প্রেমিক নয়। উল্টোদিকের দুটো বাড়ি পর অজয় মিত্র নামে যে গায়ক থাকে সেও কি অর্চনার রূপমুগ্ধ নয়? অর্চনার আরো ভক্ত সল্টলেক-এ ছড়িয়ে আছে।

তবে টেলিফোনের এই মানুষটার অন্য সকলের চেয়ে আলাদা। প্রথম যেদিন ওর টেলিফোন এল সেদিন একটু ভয় পেয়েছিল অর্চনা। ভয়টা দ্বিতীয়বারে কাটল। লোকটা ভীতু, নরম প্রকৃতির, অপ্রতিভ। প্রথমে একটা দুটো কথা বলেই ছেড়ে দিত। তারপর সাহস বাড়ল, প্রগলভ হয়ে উঠল। সেই সাহস জুগিয়ে ছিল অর্চনাই।

অর্চনা তবু শরীরী নয়। তাকে রোমান্টিক বলা যেতে পারে, কামুকা কখনো নয়।

শরীরের ব্যাপারটাকে অর্চনা বরাবরই এড়িয়ে যেতে চেয়েছে। কিন্তু লোভী পুরুষদের হাত থেকে পুরোপুরি আত্মরক্ষা হয়তো সবসময়ে সম্ভব হয়নি। তবু সে মোটামুটি নীতিবাগীশ। স্পর্শকাতর।

প্রিয় বারান্দায় আইকের পাশে এসে ফের বসল অর্চনা। মনটা ভালো হয়ে গেছে। মাথাটা আর ধরা নেই।

আইকের মাথায় একটু হাত বোলালো সে। বারান্দায় একটু হাওয়া দিচ্ছে এখন। অর্চনা চোখ বুজল। চোখ জড়িয়ে এল একটা মদির সুখে। পূজা পেতে কে না ভালোবাসে?

৫

জানালা বরাবর একসার ক্যাক্টাস। অত্যন্ত ঘনবদ্ধ বলে একটা সবুজ দেয়ালের মতো নীরেট এবং দুর্ভেদ্য। কূটবুদ্ধির সঙ্গে সৌন্দর্যবোধ মিশিয়ে অর্চনা লাগিয়েছে। এই ক্যাক্টাসের দরুণ জানলার কাছাকাছি চোরেরা আসতে পারবে না। অথচ দেখতে কী যে সুন্দর। ক্যাকটাসের সারির পাশেই একটা মানুষ সমান ঝাউগাছের মতো ঝোপ। আর সেই ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে ঝুমা।

অদূরে বাগানে মিথুনমূর্তির মতো জড়াজড়ি অবু আর রত্না। দৃশ্যটা অশ্লীল। তার কারণ, ঝুমা জানে, রত্না এবং তার দাদা অবু কখনোই প্রেমিকা প্রেমিকা নয়। ওরা কখনো বিয়ে করবে না, বিয়ের কথা ভাববে না পর্যন্ত।

তার দাদাকে কি সে হিংসে করে? এরকম প্রশ্ন কেউ করলে ঝুমা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলবে, করি। ভীষণ হিংসে করি। বরাবর ওর সঙ্গে ঝগড়া হলে মা আমাকেই তো মেরেছে বা শাসন করেছে! আমাকে কি দাদার বইপত্র, বিছানা গোছাতে হয়নি বরাবর? পিঠ চুলকে দিতে হয়নি ওর পড়ার সময়? বড় মাছটা, দুধের সরটা আমাদের দুই বোনকে বঞ্চিত করে কে খেয়েছে বরাবর? কে পেয়েছে চাওয়া মাত্র সাইকেল, দামী স্কুটার, দুর্দন্ত সব জামাকাপড়? এমন কি বাড়িতে বান্ধবীদের নিয়ে আসার স্বাধীনতাও?

শুধু আনাই নয়, অবু এ বাড়িতে অন্তত দু রাত কাটিয়েছে দুই বান্ধবীকে নিয়ে। একবার ঝড়-বৃষ্টির অছিলায় মঞ্জু বাড়ি ফিরে যেতে পারল না। তাকে রাখা হল গ্যারাজের ওপরে মেজোনাইন ফ্লোরে। ওটাই গেস্টরুম। ঝুমার ঘরেই থাকতে পারত, থাকেনি। সকালবেলায় চা দিতে গিয়ে ঝি ওদের এক বিছানায় দেখতে পায়। বেচারা ঝি এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখে যখন চোখ বড় বড় করে ছুটে এল অর্চনাকে বলতে, তখন অর্চনা তাকে ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে দেয়। সুপ্রিয়া নামে আর এক বান্ধবী একবার বাড়ি থেকে রাগ করে চলে এল। সে নাকি আর ফিরে যাবে না। তাকেও রাখা হয়েছিল এই একই ঘরে। পরদিন আর ঝিকে দিয়ে

চা পাঠায়নি অর্চনা। ওরাই একটু বেলায় নিচে নেমে এসেছিল। এবং খুব বেশি লজ্জার ভাবও ছিল না তাদের চোখে মুখে।

দিদি ছিল ভীষণ ঠোঁটকাটা আর ডাকাবুকো। দিদি থাকলে অবুকে ঝামরে দিত। কিন্তু এসব ঘটনা ঘটেছিল দিদির বিয়ের পর।

আবছা জ্যোৎস্নায় ওদের যুগল-মূর্তি দেখতে দেখতে ঝুমা সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল।

তার মা কি আশা করে টেলিফোনের প্রেমিকটির সঙ্গে একদিন শরীরেও ঘনিষ্ঠ হওয়া সম্ভব? কে জানে কী। কিন্তু টেলিফোনটা যখন আসে তারপর থেকেই অর্চনা একটু অন্যরকম হয়ে যায়। একটু যেন বেশি ভালো, একটু যেন ক্ষমাশীল, একটু বুঝি স্বপ্নাতুর।

ছাদে যথারীতি সুবীর তার ইজিচেয়ারে খানিকটা নেশায় আর খানিকটা ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছে। ছোট্ট টেবিলের ওর জলের বোতল আর গেলাশ, টেবিলের পায়ার কাছে রাখা হুইস্কির বোতল। তার পাশেই খাবারের প্লেট ভেঙে পড়ে আছে। ছত্রাখান ফিশ-ফ্রাই খেয়ে গেছে বেড়াল।

ঝুমা একটু টিপি টিপি পায়ে এগিয়ে গেল বাবার কাছে। সুবীরের নাক ডাকছে। সে যে আজকাল খুব বেশি নেশা করে তা নয়। অজকাল একটু খেলেই তার নেশা হয়। বেশি খেতে পারে না। ঝুমা গেলাসে দু'আঙুল পরিমাণ হুইস্কি ঢেলে নিল। অনেকটা জল মেশাল। তারপর চোঁ করে খানিকটা খেয়ে চোখ বুজে ফেলল গলার জ্বলুনিতে। তারপর বাকিটা খেল ছোটো ছোটো চুমুকে।

এই চুরিটুকু সে সম্প্রতি শিখেছে। হুইস্কি খেলেই দু'ধারে তার ডানার মতো কিছু একটা গজায় আর তারপর সে যে কোথায় কোথা চলে যায়। কোন কল্পরাজ্যে ঘুরতে থাকে।

সে ঠিক জানে, সে এই নোংরা পৃথিবীর কেউ নয়। একদিন বিভ্রমবশে এক স্বপ্ন রাজ্যের দরজা খুলে সে ঢুকে পড়েছিল রূঢ় নিষ্ঠুর নোংরা এই বাস্তবতায়, একদিন ফিরে যাবে।

দোতলা উঠবে বলে ছাদের রেলিং হয়নি। কার্নিশের ওপর দিয়ে নির্ভর পায়ে হাটছিল ঝুমা। একটু টালমাটাল, সামান্য ঘোর-লাগা দৃষ্টি। প্রায়ই হাঁটে, সে কখনো পড়ে না।

কে রে? কে রে তুই?

বিকট এই চিৎকারে ঝুমা এত চমকে গিয়েছিল যে, তার বাড়ানো পা কার্নিশে পড়ল না, পড়ল শূন্যে। ঝিম করে উঠল মাথা, আর বোবা অ্যানিমাল ইনস্টিংট-এর বশে সে যা পারল আঁকড়ে ধরল।

পড়ল না, ঝুমা, তবে শরীরটাকে হাঁচোর পাঁচোর করে টেনে তুলতে হল ঝুল-খাওয়া অবস্থা থেকে।

''আমি বাবা! আমি।''

পর মুহূর্তেই ভুল বুঝতে পারল। সুবীর অর্থাৎ তার বাবা-তাকে দেখতেই পায়নি। সুবীর কথা বলছে অন্য কারো সঙ্গে। কোনো অদৃশ্য মানুষ বা ভূতের সঙ্গে।

ঝুমা বসে পড়ে হাঁফাচ্ছিল।

সুবীর নিচু হয়ে বোতলটা তুলে গেলাসে হুইস্কি ঢালল। জল মিশিয়ে একবার দু'বার চুমুক দিয়েই গেলাস রেখে ফের ঘুমিয়ে পড়ল।

তার বাবা এরকম করে। নেশায় বা স্বপ্নের ঘোরে কথা বলে ওঠে, চেঁচায় বা গালাগাল দেয়। কার উদ্দেশ্যে যে করে তা কে জানে!

এবড়ো খেবড়ো শানে কনুই ছড়ে গেছে ঝুমার। জ্বালা করছে। রক্ত পড়ছে। ব্যথায় টুঁ শব্দটিও না করে ঝুমা কার্নিশ দিয়ে আবার ঝুলে পড়ল। নিচে তার ঘরের জানালার রেন শেড। তার ওপর নামতে কোনো অসুবিধে নেই। তারপর আর একবার ঝুল খেলেই বেড়ালের মতো মাটিতে নেমে দাঁড়াবে ঝুমা।

আইক চেঁচাল, আউফ।

দেখতে পেয়েছে? নাকি এমনিই অভ্যাসবশে নালিশ জানাল কাউকে?

ঝুমা পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকে সোজা রান্নাঘরে গিয়ে কৌটো খুঁজতে লাগল।

সুবালা রুটি বেলতে বলতে বলল, কী খুঁজছো?

গোলমরিচের কৌটো।

সুবালা উঠে খুঁজে দিল। ঝুমা অস্বাভাবিকভাবে মুখটা ফিরিয়ে রইল অন্য দিকে। হুইস্কির গন্ধ যে সাঙ্ঘাতিক তা সে জানে।

কয়েকটা গোলমরিচ মুখে দিয়ে চিবোতে চিবোতে ঘরে এল ঝুমা। ছড়ে যাওয়া জায়গাটা ওষুধ লাগাল।

তারপর সামনের ঘরে এসে টি ভি ছেড়ে বসল। একজন মাঝ-বয়সী লোক সরোদ বাজাচ্ছে। দশটা বেজে গেছে অনেকক্ষণ।

সরোদের মাঝখানেই ট্যাক্সির হর্নটা বেজে উঠল।

দিদি এল নাকি?

একটু লাফিয়ে চমকে উঠল হৃৎপিণ্ড। দিদি যদি গন্ধ পায়?

পরমুহূর্তেই তার মনে হল, পেলেই বা ক্ষতি কী? কী আর এমন বেশি কিছু হবে? এ বাড়িতে তার না আছে আদর, না কোনো সম্মান। একটু আগেই সামান্য অপরাধে কত অনায়াসে তাকে চড় মারল তার মা!

টিভিটা বন্ধ করে দিয়ে ঝুমা ফের দ্রুত পায়ে উঠে এল ছাদে।

গন্ধ পাবে? তাহলে ভালো করেই পাক।

সুবীর তার নেশায় জড়ানো ঘুমে অচেতন। বেড়ালের মতো হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে ঝুমা হুইস্কির বোতলটা খুলল। তার বাবা ইতিমধ্যে গেলাসটা খালি করে রেখেছে। ঝুমা ইচ্ছেমতো ঢালল। জল মিশিয়ে অতি দ্রুত ছোট্টো ছোট্টো চুমুকে গিলে ফেলতে লাগল। গলা জ্বলছে, বুক জ্বলছে, চোখ ভরে এল জলে। তবু তীব্র এক জেদ আর অভিমানে জোর করে গেলাসটা খালি করে ফেলল সে।

তারপর কিছু একটা হুলস্থুল ঘটতে লাগল তার শরীরের মধ্যে। আচমকা শরীর ভীষণ তপ্ত হয়ে গেল, কানে একটা ঝিনঝিন শব্দ হতে লাগল। বমি পেতে লাগল। আর মাথাটা কেমন যেন ফাঁকা হয়ে যেতে লাগল।

বার দুই ওয়াক তুলল ঝুমা। খানিকটা জল চলকে বেয়ে গেল।

সেই শব্দে সুবীর নড়ে উঠে বলল, কে রে? বেড়ালটা নাকি? খা ভালো করে খা...সব খেয়ে ফেল...

ঝুমা আতঙ্কিত হয়ে হামাগুড়ি দিয়ে সরে গেল কার্নিশে। তারপর ফের ঝুল খেয়ে রেন শেড-এ নেমে এক লাফে মাটিতে।

কিন্তু এবার স্বাভাবিকভাবে পড়ল না ঝুমা। পড়ল একটু পুঁটলির মতো। কোমরে বোধহয় ভালোই চোট পেয়েছে সে, কিন্তু শরীরের বোধ তার এখন এত কম যে তেমন ব্যথা বোধ করল না। সমস্ত শরীরটাই যেন ঝিঁ ঝিঁ ধরার মতো অবশ।

সে কি মাতাল হয়ে গেছে? সে কি টলছে? কিন্তু কী যে একটা হচ্ছে তার মনের মধ্যে! কী যে অদ্ভুত লাগছে! একটুও খারাপ নয়। বরং দারুণ ভালো। ভারি ভালোবাসতে ইচ্ছে করছে পৃথিবীকে। মরতেও ইচ্ছে করছে।

ঝুমা সামান্য অবিন্যস্ত পায়ে পিছনের বাগানে গাছপালার ভিতর দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল। পথ ঠাহর করতে পারছিল না। ডালপালায় শব্দ হচ্ছিল।

আইক গম্ভীর বিষণ্ণ গলায় ডাকল, আউফ! আউফ!

ঝুমা পিছনের ফটকে এসে একটু দাঁড়াল। ব্যবহার হয় না বলে এই ফটকটা তার দিয়ে শক্ত করে বাঁধা। কিন্তু ডিঙোতে কোনো অসুবিধে নেই। ঝুমা গ্রিলের ফটকের খাঁজে পা রেখে উঠল। ডিঙোলো। সারাক্ষণ টলমল করতে করতে। সে যেন অন্য এক শরীরে ঢুকে পড়েছে আজ। এ যেন তার শরীর নয়, সে নয়।

পিছনে একটা খালি জমি। তারপর রাস্তা। তারপর ফাঁকা, হাহা মুক্ত পৃথিবীর বিস্তার। ঝুমা কেন বাঁধা থাকবে এই একটি বাড়ি ও পরিবারের বন্ধনে? দুনিয়ায় আর সবাই যদি তার পর তাহলে এ বাড়ির লোকও

তার পর।

ঝুমা টলছে, পৃথিবী টলছে। মাঝে মাঝে খিল খিল করে হেসে উঠছে। অকারণে এত আনন্দ হয় মাঝে মাঝে। ঝুমা জমিটুকু পেরিয়ে গেল। তারপর রাস্তা ধরে ছুটতে গেল। পারল না। খুব ছুটবার ইচ্ছে হচ্ছিল তার। কিন্তু ইচ্ছের সঙ্গে শরীরটা পাল্লা দিতে পারল না।

পড়ে গিয়ে উঠে দাঁড়াল ঝুমা। তারপর হাঁটতে লাগল। জোরে। আরো জোরে।

একটা ট্যাক্সি বা গাড়ি যদি পেয়ে যেত সে! কিন্তু সল্টলেক এখন এত ফাঁকা, এত নির্জন, এত ভুতুড়ে যে, কোনো মানুষই নজড়ে পড়ে না।

হঠাৎ একটা হলুদ রঙ এসে রাস্তাটাকে রাঙিয়ে দিল। কোথা থেকে এল আলোটা?

ঝুমা ফিরে চাইতে গেল। অমনি ধাঁধিয়ে গেল চোখ একজোড়া জোরালো আলোয়। একটা গাড়ি কি? ভাবতে ভাবতেই ঝুমা হোঁচট খেল। পড়ো-পড়ো হয়েও পড়ল না। হেসে উঠল হি-হি করে।

হাই! বলে হাত তুলল ঝুমা। গাড়ির অন্ধকার অভ্যন্তরে যে আছে সে সাড়া দিল না। স্পীড বাড়িয়ে এগিয়ে গেল।

হাই! হাই! বলে হাত নেড়ে কয়েকবার ডাকল ঝুমা।

গাড়িটা একটা বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হল।

ঝুমা দমল না। দুনিয়াটাই তো সৃষ্টিছাড়া আর পাগল। সে মনের আনন্দে টলোমলো পায়ে হাঁটতে হাঁটতে মোড়টা ছাড়িয়ে গেল। দু'ধারেই সুদৃশ্য সব বাড়ি। আলো জ্বলছে। টিভির শব্দ আসছে। একটা স্কুটার চলে গেল পাশ দিয়ে। একটা তেজী কুকুর ভীষণ জোরে ডেকে উঠল। একটা বাড়ি পেরিয়ে যেতে যেতে ঝুমা শুনতে পেল কে যেন সিংহ গর্জন করে কাকে বলছে, তুমি একটা রাসক্যাল। আর এই সবকিছু থেকেই ভারি আনন্দ পেতে লাগল ঝুমা। চিৎকার করে সে লোকটার উদ্দেশ্যে বলল, ইউ ব্লাডি ফুল...

তারপর আবার হি হি করে হাসি।

গাড়ির হেড-লাইট আবার উদ্ভাসিত করল পথকে। ধীর গতিতে একটা গাড়ি ঝুমার পিছন থেকে এগিয়ে এল।

ঝুমা হাত তুলল, হাই!

গাড়িটা থামল না। খুব ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে লাগল ঝুমাকে ছাড়িয়ে। তবে জানালা দিয়ে এটা কৌতূহলী মুখ দেখে নিল ভালো করে। তারপর বলল, হাই!

ঝুমা জানে, গাড়িটা তাকে নেবে। তারপর বহুদূর নিয়ে যাবে। সে হাত তুলে চেঁচাল, গিভ মি এ লিফট। হাই!

গাড়িটা তবু এগিয়ে যাচ্ছিল। ধীর গতিতে। ঝুমা প্রাণপণে ছুটতে লাগল। কিন্তু তার মনে হচ্ছিল, সে ছুটছে কোমর সমান জলের মধ্য দিয়ে। এগোতে পারছে না, শরীর টলমল করছে, মাথা কেমন যেন ঘুরপাক খাচ্ছে।

কেউ কি পিছন থেকে তাড়া করে আসছে? একজোড়া দৌড়-পায়ের শব্দ না?

ঝুমা! ঝুমা! একটু দাঁড়াও!

সামনে কয়েকটা ফাঁকা প্লট। কোনো বাড়ি নেই। গাড়িটা একটু এগিয়ে গিয়ে থেমে আছে রাস্তার পাশে।

ঝুমা এবার পিছু ফিরে দেখতে চেষ্টা করল লোকটাকে। দাদা না তো? পাড়া প্রতিবেশী কেউ কি? যে-ই হোক সে আসছে ঝুমাকে ফের অন্ধকূপে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য।

ঝুমা প্রাণপণে ছুটতে লাগল।

ঝুমা! ঝুমা!

একটা লোক গাড়ির দরজা খুলে নেমে দাঁড়াল। আর ঝুমা টলতে টলতে, পড়ো-পড়ো হয়েও ছুটে হেঁচড়ে তার কাছাকাছি চলে এল।

লোকটা হাত বাড়িয়ে ঝুমাকে টেনে নিয়ে গাড়িতে ঢুকেই টেনে দিল দরজা। তারপর গাড়ি ছুটল নক্ষত্রবেগে।

পিছন থেকে একটা অসহায় স্বর শোনা গেল শুধু, ঝুমা। ঝুমা! নামো, ওরা তোমার সর্বনাশ করবে।

গাড়ির মধ্যে তিনজন প্রগলভ অবাঙালী যুবকের কোলে কোলে তখন খিল খিল করে হাসতে হাসতে গড়াচ্ছিল ঝুমা। ওরা যে কী করছে তাকে নিয়ে তা বুঝতে পারছিল না সে। কাতুকুতু দিচ্ছে? না কী অন্যরকম কিছু? খুব খারাপ কিছু? সে যা-ই হোক তার ভীষণ হাসি পাচ্ছে। ভীষণ...

৬

ঝুমা কোথায় গেল মা! ওকে দেখছি না কেন? এতক্ষনে তো ওর ঝাঁপিয়ে এসে পড়ার কথা।

অর্চনা ঠোঁট উল্টে বলল, কি জানি, আছে কোথাও। একটু রাগ হয়েছে মেয়ের। সামান্য সামান্য কথাতেই আজকাল গাল ভারী হয়। তুই ছেলেটাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে আয় তো। সোফায় শুইয়েছিস, কি জানি বাপু, আমার ভয় করে। কখন গড়িয়ে টড়িয়ে পড়বে।

সে তোমার জামাই শোওয়াবে খন। বলে বুলা তার বরের দিকে তাকাল।

সুমন্ত্র এখনো তমসা উপত্যকার কথা ভাবছে। এক ফুট চওড়া গিরিশিরার ওপর দিয়ে দু ধারে তিন হাজার চার হাজার ফুট গভীর খাদের মধ্যে ঠ্যাং ঝুলিয়ে পঞ্চাশ মিটার দূরত্ব পার হওয়ার একটা মানসিক চেষ্টা করছিল সে। হাত পা এমন শিরশির করছিল তার, মাথাটা এমন ঘুরছিল যে, সে প্রকৃতিস্থ হতে পারছিল না। তার অর্ধেক ওই না-দেখা গিরিশিরার ওপরে বসে আছে, বাকি অর্ধেক সল্টলেক-এ শ্বশুরবাড়িতে গেরস্ত জামাইয়ের মতো জামাইষষ্ঠী করতে এসেছে। দুটি ঝোড়ো দুরন্ত যুবক আজ তাকে এত ওলটপালট করে দিয়ে গেছে যে, শাশুড়িকে প্রণামটা করতে পর্যন্ত তার ভুল।

অর্চনা তার সুন্দর ভ্রু ওপরে তুলে বলল, ওমা, সুমন্ত্র। তুমি সেই থেকে যে চুপচাপ বসে আছো। জামাকাপড় ছেড়ে হাতমুখ ধুয়ে নাও। রাত হয়েছে।

সুমন্ত্র উঠল। একটু ক্লান্ত ও হতাশ স্বরে বলল, ছেলেটাকে বরং আগে শুইয়ে দিই। তিন হাজার ফুট ওপর থেকে পড়ে গেলে...

বলেই জিব কাটল সে। সোফার উচ্চতা তিন ফুটও নয়। বড়জোর দুই ফুট হবে। তাড়াতাড়ি লজ্জা ঢাকতে সুমন্ত্র ছেলেকে আড়কোলে তুলে নিল।

শোওয়ার ঘরটা যেন কোন দিকে?

এসো। তোমাদের জন্য মেজেনাইন ফ্লোরের ঘরটাই রেডি করে রেখেছি। মেঝে থেকে সিলিং অবধি মস্ত জানালা আছে, দক্ষিণের হাওয়া পাবে। পেডেস্টাল ফ্যানটাও ওই ঘরে। এই যাঃ—

বাতি হঠাৎ নিবে গেল। ঘটাং করে একটা শব্দ হল। ভাঙল একটা কাচের গেলাস এবং সেই সঙ্গে সুমন্ত্রর আর্তস্বর শোনা গেল, ওঃ বাবা।

কী হল তোমার?

সুমন্ত্র জবাব দিল না। সেন্টার টেবিলে তার হাঁটু ঠুকে গেছে জোরে। ছেলে নিয়ে সে পড়ে যেতে পারত। পড়েনি ভাগ্য ভালো বলে। এখন ন যযৌ ন তস্থৌ সে অসহায় দাঁড়িয়ে। পায়ের চারদিকে অজস্র ভাঙা কাচ। সেন্টার টেবিলের ধারে গেলাসটা সে-ই রেখেছিল, জল খাওয়ার পর।

বুলা ঝংকার দিয়ে বলল, কিন্তু ইনভার্টারটার কী হল? আলো জ্বলছে না কেন মা?

খারাপ হয়ে পড়ে আছে। এখানে একটা ভালো মিস্ত্রিও কি পাওয়া যায়। সল্ট লেক বলে কথা। বড্ড বেশি বাবু জায়গা। দাঁড়া, মোম জ্বালাচ্ছি।

রান্নাঘর থেকে সুবালাই মোম নিয়ে বেরিয়ে এল।

দেখো বাবা, কাচটাচ দেখে এসো। ছেলেটাকে বরং আমার কোলে দাও।

না, না, ঠিক আছে। ও ঘুমের মধ্যেও কোল চিনতে পারে। অদল বদল বুঝলেই চেঁচাবে।

খুব বাপ-ন্যাওটা করে তুলেছো। পরে ঠ্যালা বুঝবে। এসো সাবধানে এসো। দাঁড়াও টর্চটা আনি। সুবালা, ওপরের ঘরে যা বাতাস, মোমবাতি থাকবে না। তুই হ্যারিকেনটা বরং জ্বেলে দিয়ে আসিস।

সুমন্ত্রকে ওপরের ঘরে পৌঁছে দিল অর্চনা। চারদিকে টর্চ ফেলে ঘরটা দেখিয়ে দিয়ে বলল, সব ঠিক আছে তো। হাতের কাছেই জল আছে। ওই কোণে বাথরুম...

ঠিক আছে। সব দেখে নেবো।

পরিপাটি বিছানা করা রয়েছে। মশারি ফেলা এবং গোঁজা। সুমন্ত্র ছেলেকে অয়েল ক্লথের বিছানায় শুইয়ে দিল। তারপর বলল, আমি বরং এখানে একটু থাকি।

ছেলে পাহারা দেবে বুঝি? ঠিক আছে, থাকো। তোমার সঙ্গে শ্বশুরের আজ রাতে দেখা হবে কিনা বুঝতে পারছি না। যদি খাওয়ার টেবিলে এসে বসে তো হবে। অনেক সময় খেতেও আসে না। বেশি নেশা হলে গরমে ছাদেই ঘুমিয়ে পড়ে। আমিও ডাকি না।

সুমন্ত্র চুপ করে রইল। এখনো সে তমসা উপত্যকার সেই গিরিশিরা থেকে সম্পূর্ণ নেমে আসতে পারেনি।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে অন্ধকার সিঁড়িতে ছাদ থেকে বুলাকে নামতে দেখল অর্চনা।

তোর বাবার কাছে গিয়েছিলি নাকি?

হ্যাঁ, বাবা বরফ চাইছে। দিয়ে আসি।

সুবালাকে বল না, দেবে।

না, আমিই দিই। আর শোনো মা, ঝুমাকে কিন্তু ছাদেও দেখলাম না।

একটু আগে তো পিছনের বাগানে ঘুরছিল। মাঝখানে একবার ঘরে এসেছিল। আবার বেরিয়ে গেল। আছে কোথাও আশে পাশে।

থাকলে আসছে না কেন ঘরে? কতকাল পরে আমি এলাম।

বললাম না, রাগ হয়েছে।

ওকে বড্ড বকো তুমি। অবুটাও ওই মেয়েটারে স্কুটাকে নিয়ে যে কোথায় হাওয়া হল। বাড়িতে কোনো ডিসিপ্লিনই নেই তোমাদের।

মেয়েটাকে পৌঁছে দিতে গেছে। আসবে এখনই।

কত দূরে গেল?

মেয়েটার বাড়ি তো শুনেছি পাইকপাড়ায়।

ওর মেয়ে-বন্ধুর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে মা। আমার ছেলে-বন্ধু কিন্তু তুমি কোনোদিন অ্যালাউ করোনি। ওকে অত আস্কারা দিচ্ছো কেন? হুটহাট মেয়েদের বাড়ি নিয়ে আসে কেন? বাইরে যা খুশি করুক, বাড়িতে কেন?

কী করব বল। বড় হয়েছে।

সাবধান না হলে একদিন দেখবে একটা গেছো মেয়েকে বিয়ে করে এনে তুলবে।

কপালে থাকলে তাই হবে। কিছু করার নেই।

কী যে খারাপ লাগছে। বাড়িতে এলাম অথচ ঝুমা নেই, অবু নিপাত্তা...কী যে ভূতের বাড়ি করে রেখেছো তোমরা।

বলতে বলতে নেমে গেল বুলা। ফ্রিজ খুলে বরফের ট্রে বের করল। ব্যোল-এ বরফ ভরে নিয়ে ছাদে উঠে এল।

বাবা, বরফ।

সুবীর সাড়া দিল না। তাকে এখন ভূতে পেয়েছে। প্রায়ই পায়। এক এক সময়ে সে একটা অদ্ভুত বায়বীয়, কুয়াশাচ্ছন্ন, অস্পষ্ট এবং অদ্ভুত আকার দেখতে পায়। যেমন এখন সে দেখছে, আকাশের চাঁদ থেকে খুব

পেটমোটা একটা মূর্তি নেমে এল সাঁতার দিয়ে। লিকলিকে হাত পা, পেট আর বুক যেন একটা বড় ফুটবল, মাথাটা একটা ছোটো ফুটবল। একটার ওপর এটা খুব আলতোভাবে বসানো।

নতুন বাড়িতে ভূত থাকাটা কোনো কাজের কথা নয়। সুবীর তাই হাত নেড়ে বলল, যাঃ হ্যাট। এখানে সুবিধে হবে না।

জোড়া ফুটবল ছাদে ডন দিতে দিতে বলল, খুব হবে, খুব হবে। কার জমিতে ঘর তুলেছো হে।

সুবীর একটু ভয় পেল। কার জমি সে জানে না। মনেও পড়ল না। তাই সে চুপ করে ভাবতে লাগল, জমিটা কি তবে তার নয়? যাক, সে কি ফের কেড়ে নেবে?

সুবীর শুনতে পেল, বাড়ির সামনে দিয়ে বরফওলা হেঁকে যাচ্ছে, কুলফি বরফ...কাঠি বরফ...

সুবীরের পরনে হাফ প্যান্ট ন-বছর বয়স। ছাদের ওপর থেকেই সে ডাকল, এই বরফওলা।

বরফওয়ালা মুখ তুলে তাকাতেই চিনতে পারল সুবীর। ফটিক। গালে রুখু দাড়ি, চোখদুটো বসা। একসঙ্গে পড়েছে তারা। অথচ তার পরনে হাফ প্যান্ট, বয়স মোটে ন বছর, তাহলে ফটিক একদম বুড়ো হয়ে গেল কি করে?

ছাদ থেকেই হাত বাড়াল সুবীর। আশ্চর্যের বিষয় তার হাত লম্বা হয়ে নেমে একদম রাস্তায় পৌঁছে গেল। ফটিক খুব অনিচ্ছের সঙ্গে একটা কাঠি বরফ বের করে দিল।

বরফ...বরফ...

সুবীর এটু কষ্টেই চোখ মেলল, কে রে?

আমি বাবা, আমি বুলা।

সুবীর প্রথমটায় চিনতে পারল না। নামটি চেনা চেনা...অথচ...

ওঃ বুলা। তোরা এসে গেছিস?

কখন। তুমি যে একটু আগে বরফ চাইলে আমার কাছে।

তোর কাছে। হবে।

গেলাসে দেবো বরফ?

দে।

আর কত খাবে বাবা? তোমার বেশ নেশা হয়েছে কিন্তু।

না খেলে যে ঘুমই হবে না।

আজ আর খেও না। তোমার জামাই কী ভাববে বলো তো?

সুমন্ত্র খায় না বুঝি?

একটু আধটু। পার্টি টার্টি থাকলে।

আমিও একটুই খাবো। আর এটা বড়। ঢালবি?

ঢালছি।

তুই তো কম করে দিবি। দে আমি ঢালি।

বুলা বোতলটা ওপরে তুলে দেখে নিলে বলল, বেশি তো নেইও।

বলিস কি? বাইশ আউন্সের বোতল। এত তো খাইনি।

খেয়েছো। নইলে খাবেটা কে?

বেড়ালে ফেলেনি তো।

না। বোতল খাড়া ছিল। পড়েনি।

যাঃ বাবা, আজকাল তাহলে মদেও নেশা হচ্ছে না তেমন। শেষে কি ড্রাগ ফাগ ধরতে হবে?

তা কেন বাবা? নেশা করতেই হবে কেন? আজকাল সবাই কেন এত নেশা করে বলোতো?

ঘ্রাউ করে মস্ত এটা উদগার তুলল সুবীর। তারপর কাতর স্বরে বলল, ওঃ, নেশা করি বলেই বেঁচে আছি। আজকাল নেশা কি আর ধরতে চায়? দেখ না, বোতল প্রায় খালি, তবু ঠিকমতো নেশাটা হয়নি। কেন হল না বলতো!

বুলা অত্যন্ত আহত গলায় বলল, বাবা, আমাদের বাড়িটার কী হল বল তো! তোমরা যে কেউ ঠিক নেই। তুমি নেশা করছ, অবু বান্ধবীদের এনে তোমাদের নাকের ডগায় যা-খুশি করছে, ঝুমা এত রাত অবধি বাইরে, আর মা...

সুবীর ক্যাবলার মতো খানিকক্ষণ সামনের দিকে চেয়ে থেকে বলল, আমাকে বলে লাভ নেই। আমি এ বাড়ির কেউ নই। বোঝাপড়া করতে হলে তোর মার সঙ্গে করগে যা। বরফটা গেলাসে দিয়ে বোতলের তলানীটুকু ঢেলে দে তো।

তুমি ওটুকুও খেও না। জামাই বসে আছে তোমার জন্য। আমাদের খিদে পেয়েছে। নাতিটাকে তো একটু কোলেও নিলে না নিচে গিয়ে। চলো বাবা।

যাচ্ছি। শোন, এ বাড়িতে যা যা সব হয় তার জন্য আমাকে দায়ী করিস কেন? আমি তো জোগানদার, আর কিছু তো নই। কোম্পানীতে যেমন সাপ্লায়াররা থাকে, তারা বাইরের লোক, চাহিদামতো জোগান দেয় মাত্র, ম্যানেজমেন্টে তো তাদের ভূমিকা নেই। তোর মা আর ভাই মিলে আমাকে এইরকম টপল করে দিয়েছে। আমার ভোটের কোনো দাম নেই।

সেটা জানি। তোমারও দোষ আছে বাবা। তুমি কেন মায়ের গায়ে হাত তুলেছিলে?

সুবীর তলানি হুইস্কিটুকু গেলাসে ঢেলে উত্তেজিত কাঁপা হাতে একটা চুমুক দিয়ে বলল, পুরোনো কথা তুললে আমি একটু অ্যাজিটেটেড হয়ে পড়ি। দেখ, আমার হাত কাঁপছে। নার্ভ ঠিক নেই। আজকাল আমি বাড়িতে রাতটা কোনোরকমে কাটাই। আর কোনো সম্পর্ক রাখি না।

খুব খারাপ করো বাবা। সংসারে যদি পুরুষমানুষের কোনো ভূমিকা না থাকে তবে তাতে ভালো হয় না। আমাদেরও হচ্ছে না। আর তুমিও কেমন যেন বিচ্ছিরি হয়ে গেছ। আগে কত স্মার্ট, কত অ্যাজাইল ছিলে। আজকাল কি তাড়াতাড়ি বুড়ো হওয়ার চেষ্টা করছ?

সুবীর দু হাতে গেলাসটা ধরে একটু ঝুঁকে উল্টোদিকের বাড়িটার একটা জানালার দিকে চেয়ে ছিল। একটা বাহারী লতা জানালার ধার ঘেঁষে ছাদে উঠে যাচ্ছে। কী উচ্চাশা, ওপরে উঠবার, ছড়িয়ে পড়বার কী দুর্দম নেশা।

বাবা, চলো।

সুবীর কথাটা কানে তুলল না। আপনমনে বলল, তোর মাকে যে একটা লোক মাঝে মাঝে ফোন করে তা জানিস?

জানি, জানব না কেন?

অনেকক্ষণ ধরে কথা বলে।

তাও জানি।

লোকটাকে আমার একটুও হিংসে হয় না, তোর মায়ের ওপরেও রাগ হয় না। শুধু করুণা হয়।

তোমার তাও হয় না বাবা। তুমি একদম পাথর হয়ে গেছ।

সুবীর ঠাণ্ডা হুইস্কিটা ঢক করে গলা দিয়ে নামিয়ে দিল। তারপর চিৎপাত হয়ে আকাশের দিকে চেয়ে বলল, মেঘ করেছে, না রে?

হ্যাঁ। বৃষ্টি এল বলে।

বড্ড গরম। বৃষ্টিটা হলে বেশ হয়।

তোমাকে মশা কামড়ায় না বাবা?

খুব কামড়ায়, ভীষণ কামড়ায়। তবে আজকাল আর বিশেষ টের পাই না। সয়ে গেছে।

না বাবা, তুমি ভোঁতা হয়ে যাচ্ছো। এখানে তো দু মিনিটও দাঁড়ানো যায় না, এত মশা। ঘরে তবু একটু কম। সন্ধেবেলা স্প্রে করেছিল বোধহয়।

ঘরেও কামড়ায়।

আচ্ছা, তোমাদের কি কারও ঝুমার জন্য কোনো চিন্তা নেই বাবা? এত রাত অবধি মেয়েটা বাইরে কেন থাকবে? আমি অসছি জেনেও বাইরে থাকার মেয়ে তো সে নয়।

আমি ওসব খবর রাখি না। সন্ধেবেলা শুনছিলাম ওর মা ওকে খুব বকছে আনপার্লামেণ্টারি সব ভাষায়। আমি শাওয়ার খুলে শব্দগুলো না শোনবার চেষ্টা করছিলাম। মাগী টাগীও বোধহয় বলছিল। আজকালকার মেয়েরা ওসব ইতর ভাষা ব্যবহার করে বলেও জানা ছিল না।

বকছিল? তাই কি রাগ করেও কোথায় লুকিয়ে আছে?

হতে পারে।

কিন্তু আমি তো সব জায়গা খুঁজে এলাম। কোথাও নেই।

পিছনের বাগানটা দেখ তো। অনেক সময়ে ওখানে থাকে। টর্চ নিয়ে যাস। সাপ আছে। চার পাঁচ দিন আগেই একটা গোখরো বেরিয়েছিল।

মা বলছিল কাছেপিঠে কোথাও গেছে।

হতে পারে। কত রাত হয়েছে?

এগারোটা বেজে গেছে। নাঃ, তোমাদের দিয়ে কিছু হবে না। আমি দেখছি।

এই বলে বুলা নেমে এল ছাদ থেকে। টর্চ নিয়ে পিছনের বাগানটা চক্কর মেরে দেখে এল। কোথাও ঝুমা নেই। অথচ বাবা দিব্যি ছাদে বসে মদ খাচ্ছে। মেজেনাইন ফ্লোরের ঘরে শাশুড়ি আর জামাই কথা বলছে। অবু এখনো বান্ধবীকে পৌঁছে দিয়ে ফেরেনি। বাচ্চা চাকরটা বাইরের ঘরে সোফার কাছে মেঝেয় ঘুমোচ্ছে। সুবালা বাসন টাসন কিছু একটা ধুচ্ছে রান্নাঘরে।

বুলার এত খারাপ লাগছিল। ঝুমার ঘরটা আবার দেখল সে। টেবিলের ওপর একটা খোলা খাতা। পাতা উড়ছে। তারই একটা পাতায় লেখা, যাই।

কথাটা মোটেই ভালো লাগল না বুলার। 'যাই' মানে কী? এ কি সুইসাইডাল নোট?

ফোনটা বাজতেই বুলার বুকটা ধক করে উঠল। এত রাতে ফোন করে কে? অবু? ঝুমা?

সে গিয়ে ধরল, হ্যাল্লো।

একটা পুরুষ কণ্ঠের হাঁফধরা শব্দ পাওয়া গেল, কে, অর্চনা?

কী চাই বলুন তো?

জানতে চাই, এটা অর্চনার বাড়ি কিনা, নাকি রং নাম্বার।

অর্চনারই বাড়ি। তবে মা এখন কাছাকাছি নেই।

আপনি কি বুলা?

হ্যাঁ। আপনি কে?

আমি যে-ই হই, আপনার বোন ঝুমাকে কয়েকটা অবাঙালী ছোকরা গাড়ি করে এ বি ব্লকের দিকে নিয়ে গেছে। ওদিকটা ভীষণ ফাঁকা।

কোথায় নিয়ে গেছে? বলে চিৎকার করে উঠল বুলা।

শুনুন, ঘটনাটা বেশিক্ষণ আগে ঘটেনি। আমাদের বাড়ির সামনে দিয়েই ঝুমা যাচ্ছিল। দেখে মনে হচ্ছিল ইনটক্সিকেটেড। পা টলছিল। আমি ওই অবস্থা দেখে পিছু নিয়েছিলাম ওর।

তারপর কী হল?

একটা গাড়িকে ও হাত দেখিয়ে থামানোর চেষ্টা করে। সেটা থামেনি, কিন্তু ওরা নজর রেখেছিল। ফের ঘুরে এসে ওকে তুলে নেয়।

ঝুমা ইনটক্সিকেটেড ছিল একথা আপনাকে কে বলেছে?

আমি দেখেছি ও টলছিল। ভালো করে হাঁটতে পারছিল না। মাতালরা যেমন হাঁটে তেমনি এলোমেলো পা ফেলছিল।

আপনার নাম কী বলুন তো! কোথায় থাকেন?

ওটা বলা যাবে না।

আমার মাকে কি আপনি চেনেন? প্রথমে তো মায়ের নামই করেছিলেন!

আমি চিনি। কিন্তু অর্চনা আমাকে চেনে না। কিন্তু আপনি অনর্থক সময় নষ্ট করছেন। কয়েক মিনিটের হেরফেরে কত কী হয়ে যেতে পারে। সিচুয়েশনের গুরুত্বটা বুঝে আপনারা কিছু করুন। গাড়ির নাম্বারটা বলছি, টুকে নিন।

লোকটা শেষদিকে বেশ বিরক্তির সঙ্গে কথাগুলো বলে ফোনটা রেখে দিল।

বুলা যতক্ষণ কথা বলছিল ততক্ষণ ঘটনাটা কতখানি গুরুতর তা বুঝতে পারেনি। এখন তার মাথা ঝিম করে উঠল। হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে এল। সে আর্ত চিৎকার দিল, মা! মা! শুনছো?

দরজা খোলা ছিল। তার আর্ত চিৎকার ওপরের ঘরে শুনতে পেল অর্চনা। সাড়া দিল, কী রে, কী হয়েছে?

শিগগির এসো। ঝুমাকে কারা যেন ধরে নিয়ে গেছে।

অর্চনা নেমে এল তাড়াতাড়ি। এল সুবালা। একটু সময় নিয়ে সুমন্ত্র।

বুলা কাউকেই কিছু বলল না। দ্রুত হাতে সে থানার নম্বর ডায়াল করল। তিনবারের চেষ্টায় লাইন পেল।

হ্যালো থানা? প্লীজ, আপনারা শিগগির আসুন, আমার বোনকে কয়েকজন ছোকরা ধরে নিয়ে গেছে। আমাদের ঠিকানাটা নিয়ে নিন...

একটা গম্ভীর গলা বলল, সুবীর বসুর বাড়ি থেকে ফোন করছেন কি?

হ্যাঁ, হ্যাঁ...

একটু আগেই আর একজন ফোন করে আমদের খবরটা দিয়েছে। আপনার বোনের নাম ঝুমা তো!

হ্যাঁ, হ্যাঁ...

আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই যাচ্ছি।

প্লীজ, দেরী করবেন না। এখন প্রত্যেকটা মিনিটই ভাইট্যাল।

আমাদের জীপটা একটু বাইরে গেছে। ওয়েট করছি। জীপ এলেই আমরা বেরোচ্ছি।

মাই গড! জীপ কখন আসবে?

এখুনি এসে পড়বে।

আপনারা ট্যাক্সি করে আসুন, আমরা ভাড়া নিয়ে দেবো। প্লীজ, আর এক মিনিটও দেরী করবেন না।

হ্যাঁ, ঠিক আছে। আমরা দশ পনেরো মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে যাবো।

আমি ঘড়ি দেখছি কিন্তু।

ফোনটা রেখেই বুলা তার মায়ের দিকে তাকাল।

ঝুমা নাকি মদ খেয়েছে, তুমি কিছু জানো?

অর্চনা আকাশ থেকে পড়ে বলল, মদ খেয়েছে? কে বলল তোকে?

তোমার সেই—বলতে গিয়েও থেমে গেল বুলা। তারপর বলল, একজন অচেনা লোক। সে-ই ফোনে খবরটা দিয়েছে।

কারা ওকে ধরে নিয়ে গেছে?

কী করে বলব? ঝুমা নাকি নিজেই গাড়িটাকে থামানোর চেষ্টা করেছিল। কয়েকজন ওকে তুলে নিয়েছে।

অর্চনার মুখেচোখে দুশ্চিন্তা আর উদ্বেগ ফুটে উঠল বটে, কিন্তু সে বেশ ঠাণ্ডা গলাতেই বলল, তোর বাবাকে ডেকে আন।

বুলা হতাশ গলায় বলল, বাবা! বাবা কী করবে?

কী করবে তা তাকেই বুঝতে দে। যা, ডেকে আন। এটা তো মদ খেয়ে ফূর্তি করার সময় নয়।

বুলা সিঁড়ি বেয়ে একরকম দৌড়ে ছাদে উঠল।

বাবা!

কী রে?

শিগগির ওঠো। ঝুমাকে কারা যেন ধরে নিয়ে গেছে।

সুবীরের নেশাটা তেমন জমেনি আজ। মেজাজটা এমনিতেই সব সময়ে খিঁচড়ে থাকে। আজ আরও বেশী। মাথার ভিতরটা যদি সাঁতার না কাটে, যদি না ঘুলিয়ে যায় বাস্তবতা, যদি না দেখা দেয় অদ্ভুত সব ভূতেরা তাহলে এত পয়সার মদ গিলে কী লাভ?

সুবীর কিছুক্ষণ—কয়েক সেকেণ্ড চেয়ে রইল বুলার দিকে, কী হয়েছে বললি? ঝুমাকে কারা ধরে নিয়ে গেছে?

ওঠো বাবা, এত কথা বলার সময় নেই। এ বি ব্লকের দিকে গেছে। এক্ষুণি আমাদের কিছু করা দরকার।

সুবীর যথাসাধ্য তাড়াতাড়ি উঠবার চেষ্টা করল। বুকের ভিতরটা হঠাৎ কেন যে এত নড়ছে! মাথাটা ঘুরপাক খেল। তবু দাঁড়াল সুবীর। বেশ ভেজা ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে এখন। আর সেই হাওয়ায় সারা অকাশময় চলে এল কালো মেঘ। চমকে চমকে উঠছে বিদ্যুৎ। সুবীর যখন সিঁড়িঘরের দরজায় তখন বৃষ্টিটা নামল।

৭

ট্যাক্সিটা মাঝখানে একটু খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ড্রাইভার বনেট খুলে সেটা সারাতে একটু সময় নিল। তারপর ফের চলল।

এসব জায়গা কী ছিল আর কী হয়েছে দেখেছিস? সঞ্জয় বলল।

দেখছি।

ফ্যাণ্টাস্টিক না? আরকিটেকচারাল এক্সপেরিমেণ্ট সব এসে জুটল সল্টলেক-এ। আমার কাকা যখন সল্টলেক-এ লরি লরি মাটি ফেলার কন্ট্র্যাক্ট পেয়েছিল তখন প্রায়ই আসতাম। বিশ্বাস হয়নি যে জায়গাটা এরকম দারুণ হবে।

শৌনক একটু হাসল। বলল, জায়গাটার টারগেট ছিল বাঙালীর জন্য পুনর্বাসন। এখন মাড়োয়ারিরা দুনো দামে কিনে নিচ্ছে।

চিড়িয়াটা কে রে?

কোন চিড়িয়া?

ওই যে বুলা। তোর সঙ্গে কিছু ছিল?

একটু আধটু ছিল। হবনবিং। নাথিং সিরিয়াস।

দেখতে ভালো কিন্তু। বরটা একটু ন্যাদস মার্কা।

ওরকম হয়। এদেশে ম্যাচমেকিং বলে কিছু নেই। বরটা যদি ভালো হল তো বউটার দিকে তাকানো যায় না। বউটা যদি সুন্দর তো বরটা পিপে। কোনো স্ট্যাণ্ডার্ড নেই।

তবে বুলার মা কিন্তু হেভি সুন্দর। এখনো যা আছে—

খেলোয়াড় মেয়েছেলে। চোখ ফোখ দেখেছিস! কটাক্ষ আর কাকে বলে! রেলাও খুব। বুলার কাছে শুনেছি খুব পার্সোন্যালিটি আছে। আরে! ওটা কে রে রাস্তায় মাঝখানে হাত দেখাচ্ছে! এই ড্রাইভার, রোখকে...

ড্রাইভার গাড়ি থামাল না। বরং অ্যাকসেলেটর চেপে বোঁ করে গাড়িটা এগিয়ে নিতে নিতে বলল, দাদা, অনেক রাত হয়েছে। এসব জায়গা রাতের দিকে ভালো নয়।

শৌনক আর সঞ্জয় দুজনেই ঘাড় ঘুরিয়ে অন্ধকার রাস্তায় চেয়ে দেখল। লোকটাকে দেখা গেল না।

সঞ্জয় একটা ধমক দিয়ে বলল, গাড়িটা ঘোরান তো! লোকটা কিছু একটা চেঁচিয়ে বলছিল।

রিস্ক নেবেন না দাদা। ঝঞ্ঝাটে পড়ে যাবেন।

শৌনক ঠাণ্ডা গলায় বলল, আমরা ঝঞ্ঝাটই পছন্দ করি। আপনি গাড়ি ঘোরান। অনেক ঘাটের জল খেয়ে এসেছি, আমাদের কিছু হবে না।

লোকটা অগত্যা গাড়িটা ঘুরিয়ে নিল।

একটু জোরে চলুন। লোকটা হয়তো এতক্ষণে রাস্তা বদলে ফেলেছে।

সঞ্জয় একটু জোরে বলে উঠল, না না, ওই তো!

একজন যুবক রাস্তা ধরে দৌড়ে আসছিল। হেড লাইটের অলো পড়তেই ফের হাত তুলে চেঁচাল। বেঁধে দাদা, ভীষণ বিপদ। এটু হেলপ করুন।

শৌনক গলা বার করে বলল, কী হয়েছে?

একটা মেয়েকে কয়েকটা ছেলে একটা অ্যামবাসাডরে তুলে নিয়ে গেছে ওই দিকে। গাড়ির নম্বর ডবলিউ বি সি ওয়ান থ্রি...

আপনি গাড়িতে উঠুন। চলুন দেখছি।

ছেলেটা জানালার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, যেতে পারি। কিন্তু মেয়েটার বাড়িতে একটা ফোন করে খবরটা আগে দেওয়া দরকার। কিন্তু ফোন করতে গেলে দেরী হয়ে যাবে। ওরা বেশীদূর যায়নি। ডানদিকে ওই এ বি ব্লকে ঢুকলে সামনে একটা পার্ক আছে। আমার ধারণা ওখানে নিয়ে গেছে। প্লীজ, আপনারা একটু হেলপ করুন।

সঞ্জয় একটু চটে গিয়ে বলে, বাঃ মশাই, আমরা সীতা উদ্ধার করব আর আপনি ফোন করার নাম করে কেটে পড়বেন, তাই হয় নাকি?

ছেলেটা অসহায়ভাবে বলল, তাহলে প্লীজ একটু অপেক্ষা করুন। আমি দেখছি, সামনে এক ডাক্তারের বাড়ি আছে, যদি ফোন করতে পারি। একটু ওয়েট করবেন তো!

শৌনক ভরাট গলায় বলল, করছি। পালাব না। যান। ছেলেটা দৌড়ে চলে গেল।

ড্রাইভার একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, ঝঞ্ঝাট পাকিয়ে ফেললেন স্যার। আমার গ্যারেজ কোথায় জানেন? সেই বৈষ্ণবঘাটা। সঞ্জয় বলল, আমরা তো সাউথেই যাবো, বলেইছি। মিটার উঠছে।

সে তো বুঝলাম। হাঙ্গামায় পড়ে গেলে তো রাতও কাবার হয়ে যেতে পারে।

শৌনক ঠান্ডা গলায় বলল, হলে হবে। আপনিও তো মানুষ। কেউ বিপদে পড়লে মানুষকেই এগোত হয়।

ড্রাইভারটা আর কথা বলল না। চুপচাপ সিগারেট টেনে যেতে লাগল। সঞ্জয় নেমে দাঁড়িয়ে চারদিকটা দেখে নিল, তারপর আড়মোড়া ভেঙে বলল, শৌনক, লোকটা কোথায় গেলরে?

ওই লাল বাড়িটায় ঢুকেছে। আমি নজর রাখছি।

এ পাড়ার লোকগুলো কি খুব আরলি শুয়ে পড়ে? বেশীর ভাগ বাড়িই অন্ধকার, দেখেছিস?

নির্জন জায়গায় বোধহয় তাড়াতাড়ি ঘুম পায়। পাহাড়ে আমাদেরও পেত। মনে অছে অন্নপূর্ণা বেস ক্যাম্পে তিন দিন আমরা কিরকম সন্ধে হতে না হতেই ওই শীতেও ঘুমিয়ে পড়তাম! শিখু সিং ঘুম থেকে তুলে গরম খিচুরি খাওয়াত।

সঞ্জয় গাড়ির দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, মাইরি কী কপাল বল তো! এতদিন পাহাড় পর্বত ভেঙে বাড়িতে ফিরছি, কোথায় গিয়ে এখন গরম ভাত খেয়ে বিছানায় শুয়ে টানা আঠারো ঘণ্টা ঘুমোবো, না জুটল এসে নারীহরণ।

লাগেজ বুটটা খুলে তোর চপারটা বের কর।

কী হবে?

যদি ওরা আর্মড হয়ে থাকে!

আরে না, ফূর্তিবাজ ছেলেছোকরাই হবে। এমন হাঁক মারব যে, পালাবে।

ড্রাইভার হঠাৎ পিছনে তাকিয়ে বলল, স্যার, আপনারা খুব পাহাড়ে চড়েন না?

জবাবটা দিল শৌনক, হ্যাঁ।

সেইজন্যেই বেশ কারেজ আছে আপনাদের। অন্য সব সওয়ারী হলে পালাত।

হ্যাঁ, আমরা একটু অন্যরকম। হাঙ্গামা পছন্দ করি।

সে স্যার আমিও করি। নইলে গাড়ি না ঘুরিয়ে সোজা সল্টলেক পার হয়ে যেতাম।

তাই তো যাচ্ছিলেন।

ড্রাইভার একটু নরম গলায় বলল, সেটা হাঙ্গামার ভয়ে নয় স্যার, আমার একটি মাত্র মেয়ে। ছোট্ট। সে খুব জ্বরে ভুগছে। সকালে একশ চার দেখে এসেছি। মনটা ভালো নেই।

এ কথায় সঞ্জয় আর শৌনক একটু মুখ চাওয়া চাওয়ি করে নিল। সঞ্জয় বলল, ঠিক আছে, মিটারের ওপরে কিছু দিয়ে দেবো।

তার দরকার নেই। আমি আপনাদের সঙ্গেই আছি।

এরপর তিনজন একটু চুপচাপ হয়ে গেল।

লালবাড়ির দরজা খুলে ছেলেটা বেরিয়ে এল। পেছনে একজন মহিলা আর একজন পুরুষ।

মহিলাটি ছেলেটিকে উদ্দেশ্য করে সামান্য উঁচু গলায় বললেন, খুব চিন্তায় থাকব। মেয়েটার কী হল কাল একবার জানিয়ে যাবেন কিন্তু।

ছেলেটা ট্যাক্সির দিকে আসতে আসতে বলল, ঠিক আছে।

ছেলেটা এখন হাঁফাচ্ছে। সামনের দরজাটা খুলে ড্রাইভারের পাশে বসে পড়ে বলল, চলুন। আমি পথ দেখাচ্ছি।

সঞ্জয় পিছন থেকে ছেলেটার কাঁধে হাত রাখল, মেয়েটা আপনার কে হয় বলুন তো!

ছেলেটা একথার চট-জলদি জবাব দিল না। কেন দিল না কে জানে। সামান্য একটু সময় নিয়ে বলল, কে আর হবে। পাড়ার মেয়ে। চিনি।

কেমন মেয়ে?

ভালই। কেন বলুন তো!

কলকাতায় সল্টলেক-এর মতো পাড়া থেকে একটা মেয়েকে তুলে নিয়ে যাওয়াটা খুব সাধারণ ব্যাপার নয় কিনা। ইন ফ্যাক্ট কলকাতা শহরেই এরকম ঘটনা খুব কম ঘটে।

ছেলেটা মাথা নেড়ে বলল, তা ঠিক।

তাহলে কেসটা কী?

ছেলেটা ফের একটু সময় নিয়ে বলল, মেয়েটা, যতদূর জানি, ভালো। কিন্তু আজ মেয়েটা খুব স্বাভাবিক ছিল না।

কীরকম ছিল?

মনে হচ্ছিল ইনটক্সিকেটেড।

মালটাল টানে নাকি?

সেরকম কথা তো নয়।

তাহলে মেয়েটা ভালো বলে সার্টিফিকেট দিচ্ছেন কেন? মাল টানে, রাতবিরেতে বাড়ি থেকে বেরোয়।

শৌনক এতক্ষণ কথা বলেনি। এবার বলল, মেয়েটা কি একা ছিল? নাকি আপনি ওর সঙ্গে ছিলেন?

ছেলেটা মাথা নেড়ে বলল, আমি সঙ্গে থাকব কেন? আর থাকলে ওকে কি তুলে নেওয়া সহজ হত?

কিভাবে নিল? জোর করে?

ছেলেটা আবার সময় নিয়ে বলল, না। ঝুমা নিজেই লিফট চাইছিল।

ঝুমা! নামটা চেনা-চেনা ঠেকছে। কার মেয়ে বলুন তো?

ওর বাবার নাম সুবীর বোস।

সুবীর বোস? লে হালুয়া, এ কি বুলার সেই বোনটা নাকি?

সঞ্জয় মাথা নেড়ে বলল, ওরা খুব ঝুমা ঝুমা করছিল বটে। কিন্তু খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না।

শৌনক প্রায় চিৎকার করে বলল, মাই গড!

সঞ্জয় ছেলেটাকে ঘাড়ে একটু ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, আপনার নাম কী?

নাম দিয়ে কী হবে?

খুব খারাপ নাম নাকি? গজানন ফজানন নয় তো!

না। আমার নাম জন্মেজয় দত্ত।

ঠিকানা?

ব্লক বি বি, ছেষট্টি। এইবার ডান দিকে।

ট্যাক্সি ডানদিকে মোড় নিতেই বোঝা গেল, এদিকটায় বসতি একদম গড়ে ওঠেনি। এমন কি রাস্তাটাও ভালো নয়। রাস্তার মাঝখানে ঘাস উঠেছে। দু ধারে অন্ধকার খালি প্লট।

জন্মেজয় বলল, আর একটু এগোলেই পার্ক।

শৌনক গাড়ির হ্যাণ্ডেল ধরেই বসেছিল। গাড়ির হেডলাইটে দেখা গেল সামনে পার্ক নয়, একটা প্রায়-জঙ্গল। আসলে প্রস্তাবিত পার্ক। এখন শুধু দেয়াল দিয়ে ঘেরা অনেকটা জমি। প্রচুর আগাছা আর বড় গাছের ভীড়।

তিনজন তিনটে দরজা দিয়ে ছিটকে নামল। শৌনক চেঁচিয়ে ড্রাইভারকে বলল, হেডলাইটটা জ্বালিয়ে রাখুন।

সঞ্জয় বলল, কিন্তু গাড়িটা কোথায়?

জন্মেজয় বাঁদিকে দৌড়তে দৌড়তে বলল, ওইদিকে একটা কিছু দেখা যাচ্ছে। আসুন।

তিনজেনই প্রায় সমান্তরাল ছুটল। জন্মেজয় একটু আগে।

পঞ্চাশ গজ এগোতেই দেখা গেল, পার্কের দেয়াল ঘেঁষে অন্ধকারে পরিত্যক্ত অ্যাম্বাসাডারটা নিঃঝুম দাঁড়িয়ে। দরজা লক করা।

সঞ্জয় নিচু হয়ে সামনের ডানদিকের চাকার হাওয়া খুলে দিতে লাগল। বলল, যাতে পালাতে না পারে ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তোরা দেখ। দেখলে হাঁক মারিস।

জন্মেজয় আর শৌনক নিচু পাঁচিলটা ডিঙিয়ে পার্কে ঢুকল।

অন্ধকার বেশ ঘন। তার ওপর হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হল গাছপালায় মোহময় শব্দ তুলে।

জন্মেজয় উত্তেজিত গলায় বলল, ঝুমার নাম ধরে চেঁচাবো?

শৌনক হাত তুলে বলল, বৃষ্টি শুরু হয়েছে। ওরা নিশ্চয়ই শেলটার নিতে গাড়ির দিকেই আসবে।

সেটা তো অনুমান। যদি না আসে? চেঁচালে উই হ্যাভ নাথিং টু লুজ।

জন্মেজয়কে চেঁচাতে হল না। চেঁচাল ঝুমাই। পার্কের ভিতরে কংক্রিটের একটা গোল ঘর তৈরি হবে বলে ঢালাই হয়ে পড়ে আছে কিছুদিন। দেয়াল নেই, শুধুই ছাদ আর মেঝে। সেদিক থেকেই হঠাৎ ঝুমার চিৎকার ভেসে এল, মেঘের পরে মেঘ জমেছে...

সম্পূর্ণ বেসুরো বেতালা গলায় গান গেয়ে উঠল ঝুমা। তারপর খিলখিল করে হেসে কুটিপাটি হতে লাগল।

জন্মেজয় অন্ধকারেই শৌনকের দিকে তাকাল, ওই তো!

শৌনক মাথা নেড়ে বলে, কিন্তু এ তো আর্ত চিৎকার নয়। মনে হচ্ছে ফূর্তিতেই আছে। চলুন, দেখি।

সঞ্জয় দেয়ালটা টপকে নেমে পড়েছে পার্কে। বলল, কী হচ্ছে রে ওখানে? মাইফেল নাকি?

জন্মেজয় খুব দৃঢ় স্বরে বলল, মেয়েটা ওরকম নয়। কেন মদ খেল, কেন অচেনা কিছু ছোকারর সঙ্গে গড়িতে উঠে এল সেটা বুঝতেই পারছি না।

শৌনক গম্ভীর হয়ে বলল, এনিওয়ে, মেয়েটাকে তার বাড়িতে পৌঁছে দিতে হবে।

সঞ্জয় বলল, কেসটা অ্যান্টিক্লাইম্যাক্স গুরু? এ তো রেপ কেস নয়?

তাই তো মনে হচ্ছে। চল দেখা যাক। শার্প কিচ্ছু করার দরকার নেই। মেয়েটা তো উইলিং বলেই মনে হচ্ছে।

জঙ্গলে বৃষ্টিপাতের একটা গহীন রহস্যময় শব্দ উঠছিল। চার যুবক ও এক কিশোরী আদিম মনব মানবীর মতো দুর্বোধ্য হেসে উঠল হঠাৎ। আর তিনটে ছায়ামূর্তির মতো শৌনক, সঞ্জয় আর জন্মেজয় ধীর পায়ে পাশাপাশি উঠে এল একই ছাদের নীচে।

দৃশ্যটা খানিকটা অশ্লীল। আবার অন্যভাবে দেখলে, তেমন কিছু নয়। সম্ভবত বিস্তর হিন্দি সিনেমা দেখেছে ঝুমা। সেইরকমই একটা ভঙ্গিতে সে একটা ছেলের কোলে মাথা রেখে শুয়ে গান গাইবার চেষ্টা করছে। ছেলেগুলো মৃত পশুর চারপাশে শকুনের মতো ঘিরে আছে তাকে। ঝুমার পায়ে হাত বোলাচ্ছে একজন, অন্যেরা অন্যান্য জায়গায়। মাঝে মাঝে সম্ভবত সুড়সুড়িতেই খিলখিল করে হেসে উঠছে ঝুমা। তিনজন আগন্তুক আগমন মিনিট খানেক তারা টের পেল না।

তারপর একজন হঠাৎ টান টান হয়ে বলল, কওন?

চারজন বনাম তিনজন। ঝুমা কোন দলে তা এখনো বোঝা যাচ্ছে না। সম্ভবত ওই দলেই। সেক্ষেত্রে তিনজন বনাম পাঁচজন।

চারজন অবাঙালি যুবকের একজন উঠে দাঁড়িয়ে সভয়ে ভাঙা বাংলায় বলল, কী দাদা, কী চাই?

শৌনক কাউকে কিছু বলল না, শুধু নিচু হয়ে ঝুমার হাত ধরে টেনে দাঁড় করাল।

কী হচ্ছে কী দাদা? এসব কী? এ আমাদের ফ্রেন্ড আছে। গার্ল ফ্রেন্ড।

সঞ্জয় ছেলেটার গালে একটা চড় মারল। এত জোরে যে, একটা পটকা ফাটার মতো শব্দ হল। বলল, শুয়োরের বাচ্চা, তোমার গার্ল ফ্রেন্ড! চল শালা থানায়, গার্ল ফ্রেন্ড দেখাচ্ছি।

ছেলেগুলো ভেড়ুয়াই হবে। হঠাৎ চারজন যুবক অন্ধকারে বৃষ্টির মধ্যে হুড়মাড় করে নেমে ছুটে পালাতে লাগল।

৮

শ্বশুরবাড়িতে জামাইষষ্ঠীর নেমন্তন্ন খেতে এই যে পথটা পার হতে হয়েছে, পোয়াতে হয়েছে বিবিধ ঝঞ্ঝাট, অ্যাটাচি হারিয়েছে, পুলিশের কাছে যেতে হয়েছে এতেও দিনের গর্দিশ শেষ হয়নি। শ্বশুরবাড়ির নিরাপদ আশ্রয়ে নির্ঝঞ্ঝাট রাতটা কাটাবে তেমন কপাল কি সুমন্ত্রর? কোথাও কিছু না, স্রেফ তাকে হয়রান করার জন্য শালীটা গায়েব হল।

শ্বশুরের পা টলছে, শালা বেপাত্তা, চোরদায়ে ধরা পড়ল সুমন্ত্র।

ওগো, তুমি কী করছো? একটা ছাতা আর টর্চ নিয়ে বেরোতে পারছ না? এ বি ব্লক, ওদিকটায় একটা পার্ক আছে। যাও না...

সুমন্ত্র জলে-ডোবা মানুষের মতো চারদিকে চাইল। কোনো উপায় নেই। পেট চুঁই চুঁই করছে খিদেয়, বিছানা তাকে চুম্বকে মতো টানছে। আর বাইরে এখন চলছে দামাল হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টি।

সুমন্ত্র অনিচ্ছুক হাতটা বাড়াল। দু হাতই। ছাতা আর টর্চ তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বুলা বলল, মারপিট করতে যেও না। বিপদ দেখলে চেঁচিও।

সুমন্ত্রকে একথাটা বলার মানেই হয় না। জীবনে সে কখনো মারপিট করেনি। সেটা বুলাও জানে। কথাটা কমপ্লিমেন্ট হিসেবেও নেওয়া যায়। অন্তত বুলার তো ভয় আছে যে, সুমন্ত্র মারপিট করলেও করতে পারে!

সদর খুলে বেরোতেই দুর্যোগময়ী রাত্রি যেন ডাকিনীর মতো অট্টহাসি হেসে উঠল। আয় রে ন্যালাভোলা খ্যাপা ছেলে তোকে নিয়ে মজা করি।

একটা বাজ এমন কান ঘেঁষে পড়ল যে সুমন্ত্র যেন ঝলসে গেল তার তাপে। আর কানদুটো ভোঁ ভোঁ হয়ে গেল।

বরাবরই লক্ষ্য করেছে সুমন্ত্র যে, তার কপালে সবকিছু এরকমই হয়।

রাস্তায় নামতেই অটোমেটিক ছাতাটা প্রবল বাতাসে ঝড়াক করে উল্টে গেল। ইচ্ছে হল, ছাতাটা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। কিন্তু শ্বশুরবাড়ির ছাতা বলে ফেলল না। শুধু রাগ করে বাগানের মধ্যে ছুঁড়ে দিল। পরে খুঁজে নিলেই হবে।

প্রবল বৃষ্টিতে চোখের পলকে কাকভেজা হয়ে গেল সুমন্ত্র। অন্ধকারে অচেনা রাস্তায় সে কোথায় চলেছে তাও বুঝতে পারছিল না। বুলা শুধু অনির্দিষ্ট একটা ইংগিত দিয়েছে, এ বি ব্লকটা কোন দিকে। রাস্তায় একটাও লোক নেই যাকে জিগ্যেস করা যায়। কোনো বাড়িতে ঢুকে জিগ্যেস করতে গেলে কপালে মারধর অপমান জোটা বিচিত্র নয়।

মুহূর্মুহু বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল বটে, কিন্তু লোডশেডিং-এর নিবিড় অন্ধকারের তাতে কোনো উপকার হচ্ছে না। সুমন্ত্র কিছুক্ষণ পরেই রাস্তা গুলিয়ে ফেলল। ভয় হচ্ছিল, শ্বশুবাড়িতে ফিরে যেতে পারবে কিনা আদৌ।

কংক্রিটের দিক নির্দেশক একটা পেয়ে গেল সুমন্ত্র। টর্চের আলো জ্বালতে গিয়ে দেখল, সেটা জ্বলছে না। দোষ নেই। জল ঢুকেছে টর্চে। অগত্যা উবু হয়ে বসে বিদ্যুৎ-চমকে পড়ে নিল এ বি ব্লক ডানদিকে।

কিন্তু ডানদিকের রাস্তায় ঢুকেই সুমন্ত্র বুঝতে পারল, এদিকে বাড়িঘর নেই। লোক চলাচলের অভাবে রাস্তায় দুর্বাঘাস গজিয়েছে। দু'ধারে ফাঁকা ভুতুড়ে সব প্লট এবং প্রচুর আগাছা।

স্বাভাবিক অবস্থায় সুমন্ত্র ভগবানে বিশ্বাস করে না। কিংবা করলেও সে তা জানে না। সোজা কথায় ভগবান আছে কি নেই তা নিয়ে সুমন্ত্র মাথা ঘামায় না। কিন্তু মাঝে মাঝে বিপদে পড়লে তার মনে হয় ভগবান থাকলে বেশ হত।

আছো নাকি হে? সুমন্ত্র একবার জিগ্যেসও করে ফেলল ভগবানকে। কিন্তু জবাব পেল না। বৃষ্টির ঝরোখায় ঢাকা চারদিকটা সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিল না। কোথায় যাবে সে? কী করবে?

একটা গাড়ির হেডলাইট আদিম অন্ধকারকে ছিন্নভিন্ন করে দিল হঠাৎ। আর তখন লক্ষ বল্লমের মতো ছুটে আসা বৃষ্টির খরশান চেহারাটা দেখতে পেল সুমন্ত্র।

গাড়িটা অনেক দূরে। সুমন্ত্র তার আলো লক্ষ্য করে একরকম ছুটতে লাগল। সামনেই একটা নিচু দেয়াল। ওটাই কি সেই পার্ক? ভিতরটা জঙ্গলে ভরা।

গাড়িটা এদিকে এল না। হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে অন্য একটা রাস্তা দিয়ে ভীষণ জোরে বেরিয়ে গেল।

মাথায় ক্রমান্বয়ে চাঁটি মেরে যাচ্ছে টোপা টোপা বৃষ্টির ফোঁটা। ডুগডুগ শব্দ হচ্ছে। ঝুমাকে যারা ধরে নিয়ে গেছে তারা কি ওই গাড়িতে পালিয়ে গেল?

সুমন্ত্র পার্কের কাছাকাছি এসে গাড়লের মতো দাঁড়িয়ে রইল। এখন কী করবে সে? কী করা উচিত? পৃথিবীর কেজো ও সাহসী মানুষেরা এইরকম পরিস্থিতিতে কী করে থাকে?

আর একটা গাড়ির হেডলাইটও প্রায় একই জায়গায় জ্বলে উঠতে দেখল সুমন্ত্র। সেই গাড়িটাও অন্য পথ দিয়ে চলে গেল।

কিছু একটা করা উচিত, এরকম এটা অনিচ্ছুক তাগিদে সুমন্ত্র পার্কের দেয়ালটা ডিঙোবে বলে দু'হাতে রেলিংটা চেপে ধরল।

উঠতে যাবে, ঠিক এমন সময় রাস্তা থেকে একটা গাড়ি ডানদিকে মোড় নিয়ে সোজা পার্কের দিকে চলে আসতে লাগল। হেড লাইটের চোখ-ধাঁধানো আলো সোজা তার ওপরে এসে পড়েছে।

সুমন্ত্র সভয়ে পার্কের মধ্যে ঢুকে পড়ার জন্য দু'হাতে চাড় দিয়ে রেলিং-এ উঠবার একটা অক্ষম চেষ্টা করতে গিয়ে হড়কে পড়ে গেল নিচে। আর এটা মোটা গলা চেঁচিয়ে একটা ধমক দিল তাকে, অ্যাই, খবদার নড়বে না!

সুমন্ত্র নড়ল না। এমন কী উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা পর্যন্ত করল না। জলকাদার ওপর অতিশয় স্থিরভাবে বসে দেখল, গাড়িটা পুলিশের জিপ। তিনজন বর্ষাতিঢাকা লোক নামল। সঙ্গে এক মহিলাও।

এ কী! তুমি এখানে বসে রয়েছো কেন? কী হল তোমার?

গলাটা বুলার।

এবার সুমন্ত্র উঠে বসল। কিছু বলার মতো অবস্থা নয়।

কাউকে দেখেছো?

সুমন্ত্র মাথা নেড়ে বলল, দুটো গাড়ি ওই দিকে দাঁড়িয়ে ছিল। কয়েক মিনিট হল চলে গেছে।

পুলিশের তিনজন লোকের একজন বুলার দিকে চেয়ে বলল, আপনার হাজব্যাণ্ড?

হ্যাঁ।

আপনারা জিপে উঠে বসুন, আমরা দেখছি।

সুমন্ত্র আর বুলা জিপে উঠে বসল। ড্রাইভারও পুলিশের লোক। মুখ ফিরিয়ে বলল, চিন্তা করবেন না। ওয়ারলেসে খবর চলে গেছে। সল্টলেক থেকে বেরোনোর রাস্তায় গাড়ি চেক করা হবে।

বুলা আর সুমন্ত্র কোনো কথা বলতে পারল না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনজন পুলিশ ফিরে এসে জিপে উঠল।

বুলা আর্তস্বরে বলল, কী হল?

বোঝা যাচ্ছে না কিছু। পার্কে কেউ নেই। যে-লোকটা ফোন করেছিল তাকে কোনোরকমে ট্রেস করা গেলে হত।

লোকটা যে নাম বলল না।

এই লোকটাই আপনার মাকে মাঝে মাঝে ফোন করে?

হ্যাঁ।

স্ট্রেঞ্জ!

জীপটা আবার চলতে লাগল।

সুমন্ত্র নিজেকে নিজেই মনে মনে প্রশ্ন করছিল, আমি কি ভীষণ কাপুরুষ? ভীষণ? বুলার চোখে এখন আমি কীরকম? পুলিশরা আমাকে কী ভাবছে?

৯

ডাইনিং টেবিলের দুটো চেয়ারে আসামীর ভঙ্গিতে বসে আছে সুবীর আর অর্চনা। সামনে দু পা দুদিকে ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আঙুল নেড়ে অনেকটা থিয়েটারী ভঙ্গিতে অবু চিৎকার করছিল, তোমরা! তোমরাই এরজন্য দায়ী। প্রশ্রয় দিয়ে দিয়ে মাথায় তুলেছো, এখন যা খুশি করছে। এই অসভ্য লোকটা সংসারের দায় ঘাড়ে নেয় না, কোনো রেসপনসিবিলিটি নেই। ছাদে বসে মদ খাওয়াই এই লোকটার এখন একমাত্র কাজ। লাথি মারতে মারতে বের করে দিতে হয় এসব লোককে বাড়ি থেকে...

অর্চনা চোখে আঁচল চাপা দিয়ে অশ্রু রোধ করল। বলল, তোর বন্ধুবান্ধবদের টেলিফোনে একটু খবর দে না। সবাইকে অ্যালার্ট করাটা ভীষণ দরকার। কোথায় গেছে তার তো ঠিক নেই।

অবু গলা আরও তুলে বলল, কার দায় পড়েছে এই ব্যাড ওয়েদারে তোমার মেয়েকে খুঁজতে বেরোবে? ঝুমা তো আর কচি খুকি নয়। যা করেছে ভেবেচিন্তেই করেছে।

ঝুমার জন্য কোনো দুশ্চিন্তাই করছিল না সুবীর। সেতো জানে পৃথিবীর সব সমস্যারই একটা না একটা সমাধান হয়ই। শুধু টাইম ফ্যাক্টর। সময়ই সব সমস্যার নিরসন করে দেয়। যে নিখোঁজ হয় সে যদি আর ফিরে নাও আসে তাহলেও একদিন সবাই তার কথা ভোলে। যে মরে যায় সে হয়তো কত অসহায় অবস্থায় ফেলে যায় তার পরিবার-পরিজনকে। কিন্তু মরে বেঁচে লড়াই করে সেই পরিবারটাও হয়তো টিকে যায় শেষ

পর্যন্ত, বা লোপাট হয়ে যায়। কিছু একটা হয়। কোনো কিছুই চিরকাল থাবা গেড়ে তো থাকতে পারে না। সুবীর তাই মনে মনে ঝুমাকে আজ পৃথিবীর হাতে সমর্পণ করেছে। তার আর কোনো চিন্তা নেই।

সামনে যে যুবকটি দাঁড়িয়ে ষাঁড়ের মতো চেঁচাচ্ছে তার দিকে কিছুটা বিস্ময়ভরে চেয়ে আছে সুবীর। এই যুবকটিও একটি টাইম ফ্যাক্টরের প্রোডাক্ট। যখন ছোটো ছিল তখন শিশু অবস্থায় যুবকটি ছিল খুবই নরম সরম মেয়েলি ধরনের, আর খুব ভীতু। পড়ত কো-এডুকেশনের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে। প্রচুর ফুটফুটে মেয়ের দঙ্গলে ছেলেটা একরকম হারিয়ে যেত। সুবীর একটু ভয় পেয়েছিল, ছেলেটার মধ্যে পৌরুষের অভাব দেখা দেবে না তো! তাই সুবীর শিশুটির মধ্যে পুরুষালী হাবভাব সঞ্চার করার জন্য রোজ সকালে নিয়ে যেত লেক-এর ধারে। ছেলে আর বাবা দৌড়োতো কেডস পরে। সাইকেল চালানো শেখাল ছেলেকে, সাঁতার শেখাল, তারপর ভর্তি করল একটা ফুটবল ক্লাবে। কিশোর বয়সে হাতে পায়ে রীতিমতো সবল ও রুক্ষ হয়ে উঠল অবু। ঠিক যেমনটি সুবীর চেয়েছিল। ওর গা থেকে পুরুষালী তাপ আর গন্ধ পেত সুবীর। খুশি হত। বাপের ন্যাওটা এবং বশবর্তী সেই শিশুটিই যখন আজ এই বিদ্রোহী যুবকের রূপ ধরে সামনে এসে দাঁড়ায় তখন সেটিকেও পৃথিবীর নিয়ম বলেই মেনে নেয় সুবীর। সে আজকাল সবকিছুই মেনে নিতে শিখেছে।

বুকে যে ব্যথাটা থাবা মেরে আছে সেই থেকে সেটাও কি নিয়ম?

অবু চিৎকার করেছিল,...আমাকে বলে কী লাভ? আমি কিছু করতে পারব না। রেলপনসিবিলিটি তোমাদের, তোমরা বোঝো গে।

অর্চনা নরম সুরে বলল, তুই অত রেগে যাচ্ছিস কেন? বিপদে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয়। ওরা সবাই গেছে, খবর একটা আসবেই। তুই শুধু একটু গিয়ে ঘুরে আয়। জামাই প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে গেল...

গেছে যাক। তোমার ননীর পুতুল জামাই আর একজন অপদার্থ। লোকটাকে দেখলেই ঘেন্না হয়...

শিশুটিকে বড় করতে অনেক খরচ হয়েছিল সুবীরের। দুইজন প্রাইভেট টিউটর, প্রচুর জামাকাপড়, সাইকেল, খেলনা, বিভিন্ন ক্লাবের খরচ। শিশুটি এখন বাস্তবিকই বড় হয়েছে। বাহবা দেওয়ার মতন, হাততালি দেওয়ার মত বড়।

বুকের ব্যথাটা আচমকা বেড়ে ফের একটু কমে গেল। সুবীর একটু ককিয়ে উঠল। হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে জলের জগটা নিল সুবীর। পেটে গ্যাস জমে গিয়ে থাকবে। হার্টে চেপে দিচ্ছে। ঠাণ্ডা জল খানিকটা খেয়ে নিল সুবীর। একটা ঢেঁকুর তুলবার চেষ্টা করল। কিন্তু উঠল না।

শরীরটা কেমন ঝিমঝিম করছে। এই অবস্থায় যুবকটি আরও চেঁচালে আরও অসুবিধে হবে।

চুপ! সুবীর হিংস্র গলায় যুবকটিকে বলল।

যুবকটি তার মাকে কিছু বলছিল। ভালো শুনতে পাচ্ছিল না সুবীর। সম্ভবত সুবীরের হিংস্র গলার 'চুপ' শব্দটাও যুবকটি শুনতে পায়নি। হাত পা নেড়ে চেঁচিয়ে যাচ্ছে।

চেঁচাল আইকও। অনেকক্ষণ সহ্য করেছে, আর পারল না।

আউফ! আউফ! আউফ!

একটা গাড়ির শব্দ হল কি? নাও হতে পারে। সুবীর উঠে দাঁড়ানোর একটা চেষ্টা করল।

গাড়িটা ফটকের সামনে থেমেছে।

বুলা! বুলা! মাসীমা!

সেই ডাকে অর্চনা, অবু, সুবালা, আইক সবাই ছুটে গেল বাইরে।

যেতে পারল না সুবীর। তার কাছে এই পদক্ষেপের দূরত্বও এখন অসীম। তবু সে বুকের প্রচণ্ড ব্যথাটাকে হাত দিয়ে ঘষে মিশিয়ে দেওয়ার একটা অক্ষম চেষ্টা করল। তারপর দেয়াল ধরে ধরে নিজের ঘরে এল সে। বাতিটা নেবালো। ভালোই।

হামাগুড়ি দিয়ে বিছানায় ঢুকল সুবীর। তারপর উপুড় হয়ে পড়ে রইল। ব্যথা! বড় ব্যথা! ঘাম দিচ্ছে কপালে। শিথিল হয়ে যাচ্ছে হাত পা।

সুবীর চোখ বুজল। তারপর একবার কাউকে ডাকবার চেষ্টা করল। কাকে ডাকল তা সে জানে না। এ বাড়িতে কে আছে তার?

সম্ভবত সে ডাকল, মা।

তারপরই চেতনা লুপ্ত হয়ে গেল তার।

ঝুমাকে যখন চড়া আলোর সামনে বাইরের ঘরের মাঝখানে এনে দাঁড় করানো হল তখনও সে ঘোর মাতাল। টলছে, পড়ো-পড়ো হয়েও দাঁড়াচ্ছে, বলছে, ছেড়ে দাও...ছেড়ে দাও...ছেড়ে দাও...

অর্চনা একটা থাপ্পড় তুলেছিল, শৌনক আটকাল, মারবেন না। বরং যদি পারেন খানিকটা তেঁতুলজল খাইয়ে দিন। বমি করলে নেশা কেটে যাবে। আর নইলে জাস্ট শুইয়ে দিন। ঘুমোক।

তোমরা যা করলে...

তৃতীয় যুবকটিকে ভালো লক্ষ্য করেনি অর্চনা। একটু পিছিয়ে আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল। শৌনক তাকে সামনে টেনে এনে বলল, একে তো বোধহয় চেনেন। জন্মেজয় দত্ত। আপনাদের প্রতিবেশী। ইন ফ্যাকট, ইনি না থাকলে কী যে হত। চেনেন না এঁকে? ইনিই তো ফোন করেছিলেন...

ফোন? আচমকা অর্চনা যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। ছিপছিপে লাজুক সুদর্শন এই যুবকটিই কি তাহলে...

কাতরস্বরে ঝুমা বলেছিল, ছেড়ে দাও না আমাকে...আমি ওদের সঙ্গে যাবো। কত আদর করছিল ওরা জানো? তোমাদের মতো পাষাণ তো নয়। পায়ে পড়ি...ছেড়ে দাও।

ঝুমা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। জন্মেজয় ওকে ধরে ফেলল পিছন দিকে। জরুরী গলায় বলল, ওর শোওয়ার ঘরটা কোন দিকে বলুন তো!

অর্চনা গলার স্বরটা শুনে আর একবার শিহরিত হল। এই তো সেই কণ্ঠস্বর! সে তাড়াতাড়ি মেয়ের অন্য হাতটা ধরে বলল, আসুন দেখিয়ে দিচ্ছি।

ঝুমার অন্ধকার ঘরে পা দিয়েই অর্চনা দরজাটা ভেজিয়ে দিল। ঘুম-আলোর সুইচ টিপতেই এক মায়াময় সবুজে ভরে গেল ঘর। ঝুমাকে বিছানায় শোওয়ানোর অপেক্ষা মাত্র। বালিশে মাথা রেখেই সে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল।

ধীরে মুখ তুলল অর্চনা। মুখোমুখি জন্মেজয়। চোখে চোখ।

আমি যাচ্ছি।

একটা কথা ছিল।

বলুন।

অপনার গলার স্বরটা আমার এত চেনা লাগছে কেন বলুন তো।

অ্যাঁ! ও!

আপনি আমাদের ফোন নম্বর জানলেন কী করে?

ড্রিম লাইটের মৃদু আভায় মুখের ভাব তো বোঝা যায় না। অর্চনাও বুঝতে পারল না। ছেলেটা চোখটা নামিয়ে নিল।

অর্চনা মৃদু স্বরে বলল, আমি কিন্তু রাগ করছি না।

জন্মেজয় হাঁফ-ধরা স্বরে বলল, দরজাটা খুলে দিন।

অর্চনা একটু হেসে বলল, এত ভয়! টেলিফোনে তো দেখি খুব সাহস!

অর্চনা আপনমনে একটু হেসে বলল, বেচারা!

ওরা চলে যাওয়ার পরও অনেকক্ষণ অর্চনার মনের মধ্যে একটা শব্দ ঘুরে ঘুরে টক্কর খেতে লাগল আর কতবার যে বিদ্যুৎ স্পর্শ করল তাকে। জন্মেজয়! জন্মেজয়! সে কি বয়ঃসন্ধিতে ফিরে গেল নাকি? শরীর ও

মনে এত পিপাসা জমা হয়ে ছিল তার সে তো কখনো টের পায়নি! ভিতরে যেন সেতার বেজে যাচ্ছে অবিরল।

তার এই ঘোরের মধ্যেই একটা জীপ এসে থামল। পিছনে তিনজন পুলিশের চালচিত্র নিয়ে ঘরে এসে দাঁড়াল বুলা আর সুমন্ত।

মা! ঝুমা!

ঘোরলাগা ভাবটা কাটেনি অর্চনার। পৃথিবীকে ভারি নতুন লাগছে তার। যেন এরকরম ছিলনা কিছুই এর আগে। আচমকা বিবর্ণ বসন ছেড়ে এক নতুন পৃথিবী জেগে উঠল চারধারে। কী রং, কত না জেল্লা তার!

জড়োসড়ো ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল অর্চনা, চিন্তা নেই। ঝুমা ফিরেছে। কিছু হয়নি, সব ঠিক আছে।

ক্লান্ত বুলা 'উঃ' বলে মুখ ঢেকে সোফায় বসে পড়ল।

অকারণে আইক বিষণ্ণ দীর্ঘ আওয়াজ তুলল, আউফ! আউফ! আউফ!

আইক আরও একবার ডাকল। মধ্যরাতে।

সেই শব্দে সুবীর চোখ মেলল। বড় ক্লান্তি, বড় ভার বুকে। কে যেন হারিয়ে গিয়েছিল! সে কি ফিরে এল, না কি এল না? কে যেন শিশু থেকে যুবক হল? টেলিফোনে কে প্রেম নিবেদন করেছিল কাকে? সুবীরের বড্ড তেষ্টা পেয়েছে। আজ কেউ জল রাখেনি তার ঘরে। বুকের ব্যথাটা থাবা গেড়ে অছে এখনো। তীব্র নয়, কিন্তু আছে।

দেয়াল ধরে ধরে সুবীর বসবার ঘরে এল। ফ্রিজ খুলে একটা ঠাণ্ডা বোতল বের করে সরসারি মুখে তুলতে গেল। তারপর হঠাৎ এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখে পাথর হয়ে গেল সে।

ঘরের মাঝখানে আইক। পিছনের দু'পায়ের ওপর ভর দিয়ে সামনে দুটো পা ওপরে তুলল। করজোড়? দীর্ঘ বিষণ্ণ একটিমাত্র আওয়াজ করল সে, আউফ!

এই পৃথিবীর প্রতি তার গভীর ধিক্কারের শব্দটা ঘরের মধ্যে অশরীরী হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

তারপর ধীরে ধীরে রোমশ শরীরটা ঢলে পড়ে গেল মেঝের ওপর।

আতঙ্কে কিছুক্ষণ বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইল সুবীর। হাত থেকে পড়ে ভেঙে গেল জলের বোতল।

সুবীর নিজের বুকটা চেপে ধরল। ব্যথা! ভীষণ ব্যথা!

তারপর ধীরে ধীরে আবার সহজ হল সে। টাইম ফ্যাক্টর। টাইম ফ্যাক্টর। পৃথিবীতে কিছুই নতুন করে ঘটে না। সব ঘটনাই পুনরাভিনীত হয় মাত্র।

আইকের মৃতদেহ সামনে রেখে ফের একটা বোতল বের করে হিম-ঠাণ্ডা জল ঢকঢক করে আকণ্ঠ পান করতে লাগল সুবীর।

তিন দিন বাদে টেলিফোন এল।

অর্চনা বলল, হ্যালো।

আমি বলছি।

অর্চনা উদ্ভাসিত হয়ে বলল, তুমি!

একটু ঝুমাকে ডেকে দেবেন?

ঝুমা! তাকে কেন বলো তো!

তাকেই দরকার।

খুব ধীরে ধীরে টেলিফোনটা কাত করে টেবিলে রাখল অর্চনা। ফ্যাকাসে মুখ ধীরে ধীরে গিয়ে ঝুমার দরজায় টোকা দিল।

ঝুমা!

কী বলছো?

তোর টেলিফোন।
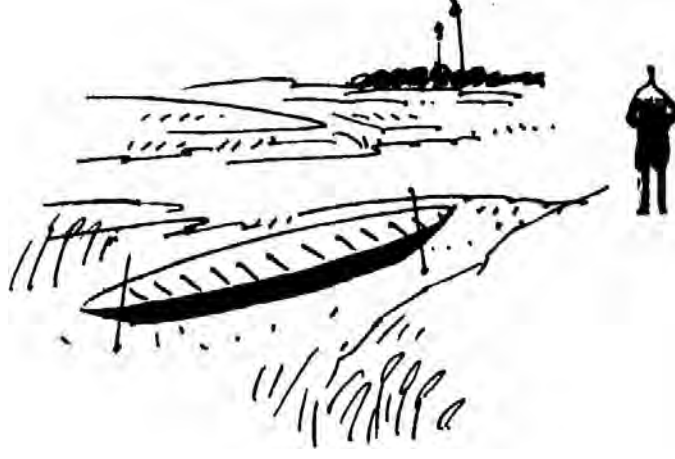
# অভিযান

তারা চারজন সাইকেলে ভারত পরিক্রমার বেরিয়েছিল। সুভদ্র, অমিত, দীপঙ্কর আর তীর্থঙ্কর। তিনজনের যাত্রা অব্যাহত আছে। পড়ে আছে অমিত। কলকাতা থেকে যখন যাত্রা শুরু করেছিল তখন তাদের ক্লাব থেকে একটা বিদায় সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছিল ঘটা করে। গলায় ফুলের মালা পরিয়ে ফটো তোলা হয়েছিল। একজন এম পি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। ভারতের যুবসমাজকে দুঃসাহসিক অভিযানে উদ্বুদ্ধ করতে তিনি অনেকগুলি বাক্য ব্যয় করেন। ফ্ল্যাগ অফ করার পর যখন চারজন সত্যিই যাত্রা শুরু করেছিল তখন স্বস্তি বোধ করেছিল অমিত।

পাশাপাশি সে আর সুভদ্র। একটু পিছনে দীপু আর তীর্থঙ্কর, ওরা খুব বন্ধু।

অমিত বলল, এসব বিদায় সম্বর্ধনা টনার কোনও মানে হয়?

সুভদ্র বুদ্ধিমান এবং টিমের ক্যাপ্টেন। বলল, মানে একটু হয়। আমরা যাচ্ছি পাবলিকের চাঁদার টাকায়। আমরা যে সত্যিই যাচ্ছি তার একটা প্রমাণ থাকা দরকার।

অমিত কথাটার জবাব দিতে পারল না। তবে সে লক্ষ্য করেছে, খবর দেওয়া সত্ত্বেও টিভির ক্যামেরাম্যান আসেনি। আসেনি খবরের কাগজের কোনও লোকও। বেহালার একটা অখ্যাত ক্লাবের চারজন সদস্যের এই অভিযানকে গুরুত্ব দেওয়ার কথাও নয় তাদের। তাহলে প্রচারটাই বা হবে কী করে? প্রচার মাধ্যমই যে অনুপস্থিত।

দিল্লি রোড ধরে তাদের প্রথম উত্তর ভারতের দিকে যাওয়ার কথা। বেশ যাচ্ছিল তারা, ঘটনাহীন মসৃণ গতিতে, একটু আগুপিছু হয়ে। সাইকেলের পিছনে মস্ত প্যাক, সামনের হ্যান্ডেলেও আর একটা ব্যাগ, প্রয়োজনীয় জিনিসের বহর তো কম নয়, ভাড়া করা স্লিপিং ব্যাগ থেকে শুরু করে ওষুধ-বিষুধ অবধি।

বর্ধমান পর্যন্ত চমৎকার চলে এল তারা, এখানে নাইট হল্ট। হোটেলে থাকার মতো বাড়তি পয়সা তাদের নেই। যা টাকা আছে তাতে খুব হিসেব করে না চললে অভিযান মাঝপথে বন্ধ করে দিতে হবে। বর্ধমানে সুভদ্রর কাকা থাকেন। তাঁর বাড়িতেই রাত্রিবাস। এর পর রানিগঞ্জ, যশিডি এবং পাটনায় তাদের এরকমই আত্মীয় বা বন্ধুর বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা আছে। বাদবাকি হল্ট-এ রাত্রিবাস করতে হবে পলিথিনের তাবুতে বা স্লিপিং ব্যাগে-এ। যদি অবশ্য আশ্রয় না মেলে।

ঘোর অনিশ্চয়তা। আর যে কোনও অভিযানের আসল মজাই তো এখানে। অনিশ্চয়তা না থাকলে মজাই বা কী?

অমিতকে অবশ্য অনিশ্চয়তার সন্ধান করতে হয় না। অনিশ্চয়তাই তাকে খোঁজে। তার বাপ মা নেই। তার উপর তারা উদ্বাস্তু। এই বাংলায় তাদের ঘরবাড়ি নেই। কিংবা বলা ভালো, এক উদ্বাস্তু পল্লীতে তাদের দুখানা ঘর আর জবর দখল আড়াইকাঠা জমি ছিল। সেটা বহুকাল বেহাত হয়েছে। শিশুকাল থেকেই সাত ঘাটের জল খেতে হয়েছে তাকে। এক পয়সাওলা মামা তাকে আশ্রয় না দিলেও মাসে মাসে ত্রিশটা করে টাকা দিতেন। অমিত ঠিকাদারের কুলি থেকে শুরু করে পুরুতগিরি সবই করেছে, লেখাপড়াটা তেমন হল না। তবে ভাগ্যক্রমে সে একটা মোটর গ্যারেজে কিছুদিন কাজ করেছিল। সেই বিদ্যে ভাঙিয়েই এখন খায়। বেহালার এই ক্লাবখানাই তার আশ্রয়। ক্লাবের সেক্রেটারি বলাইবাবু করুণাপরবশ হয়ে আশ্রয়টির ব্যবস্থা করেছেন। সে ক্লাবে থাকে, ঝাড়পোঁছ করে।

পাড়ার একটা গ্যারেজে সে কাজ করে। অবসর সময়ে ক্লাবে লাইব্রেরির অজস্র বই পড়ে। পড়ার সুবিধেও আছে। সে লাইব্রেরি ঘরেই রাত্রিবেলা শোয়। এক পাড়াতুতো বিধবা মাসিমার কাছে মাসিক বন্দোবস্তে দুবেলা খেয়ে আসে।

কলকব্জার ব্যাপারে তার মাথা আছে, এটা সে জানে। সে যদি ইনজিনিয়রিং পড়ার সুযোগ পেত তাহলে ফাটিয়ে দিত, কিন্তু কপাল খারাপ।

আবার অন্য দিকে তার কপাল ভালোই বলতে হবে। ক্লাবের শিক্ষিত এবং ভালো ঘরের যুবকদের সঙ্গে তার দিব্যি ভাব-সাব। যে কোনও কাজেই তাকে পাড়ার প্রয়োজন হয়। ডাক্তার ডাকা, শ্মশানে যাওয়া থেকে শুরু করে নানা কাজেই অমিতের ডাক পড়ে। অম্লানবদনে অমিত ফ্যাক খাটে। তার কোনও অহংবোধ নেই, আপনার জন নেই, পিছুটান নেই।

একদিক দিয়ে দেখতে গেলে, সে বেশ আছে। আবার নেইও। পাড়ার ক্লাবের অস্থায়ী আবাসে থাকা এবং পাঁচজনের কাজ করে বেড়ানোটা একটা ভাসমানতা। স্থায়ী ও গভীর নয় এরকম বেঁচে থাকা। এভাবে নিজেকে অনুভবও করা যায় না।

সুভদ্রর কাকার বাড়িতে যখন তারা পৌঁছোল তখন বেশ রাত হয়েছে। কাকা রামমোহন রাশভারী লোক। চারজন যাবে, খবর দেওয়া ছিল। হা-ক্লান্ত তারা যখন সাইকেল থেকে নেমে নেমে মস্ত চওড়া মার্বেল-বাঁধানো সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে বিশাল বৈঠকখানায় কাকার মুখোমুখি হল তখন কাকা তাঁর সেক্রেটারিকে কী একটা ডিকটেশন দিচ্ছেন। তাদের দিকে একবার তাকালেন, কিন্তু ডিকটেশন দেওয়া বন্ধ করলেন না।

অমিত ঘরের অনেকগুলো সোফার একটাতে বসতে যাচ্ছিল, সুভদ্র চাপা গলায় বলল, কাকার সামনে আমরা বসি না, বসতে বললে বসবি।

অমিত বুঝে গেল লোকটার প্রচণ্ড দাপট।

প্রায় মিনিট পনেরো অপেক্ষা করার পর কাকার সময় হল। একে একে তিনজন আগন্তুককে হেড টু ফুট খুব খুঁটিয়ে দেখলেন তিনি। হঠাৎ অমিতের দিকে চেয়ে বললেন, তুমি কী করো?

অমিত অপ্রতিভ হয়ে বলল, আমি?

সুভদ্র তাড়াতাড়ি বলল, কিছু করে না কাকা, বেকার।

কাকা অসন্তুষ্ট হয়ে কঠোর গলায় বললেন, ওকে বলতে দাও। তোমাকে তো জিগ্যেস করিনি।

অমিত একটু ভয় পেয়ে ঢোঁক গিলে বলল, কিছু না।

কাকা সবাইকে ছেড়ে তার দিকেই বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন, ও, ঠিক আছে, যাও তোমরা ডিনার সেরে বিশ্রাম করো।

অমিত হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

এ বাড়ির ব্যবস্থা এলাহি। ঠান্ডা আর গরম জলের ট্যাপ, নতুন সাবান, ধপধপে সাদা তোয়ালে। ডিনার টেবিলে থরে থরে খাবার সাজানো। মুর্গী, বিরিয়ানি, পায়েস, সবজি। তবে সার্ভ করল সব চাকরবাকর শ্রেণির লোক। যদিও তারা খুবই ধোপদুরস্ত এবং যথেষ্ট বিনয়ী, তবু বাড়ির লোক তো নয়।

অমিত একবার চাপা স্বরে বলল, তোর কাকিমা নেই?
আছে।
তাঁকে তো দেখলাম না।
উনি একটু অন্যরকম।
কেমন সেটা আর জিগ্যেস করল না অমিত।
তীর্থঙ্কর আর দীপঙ্করও এ বাড়ির ঐশ্বর্য আর জাঁকজমক দেখে একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। তারা সবাই মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। সুভদ্রর কাকা যে এত বড়লোক তা তাদের জানা ছিল না।
তীর্থঙ্কর বলল, মাইরি কেমন ভয় ভয় করছে।
সুভদ্র মৃদু হেসে বলে, ভয়ের কী, এক রাত্রির তো ব্যাপার। ভালো করে খা।
অমিতের খিদে প্রচণ্ড, সে ভালো করেই খাওয়ার চেষ্টা করছিল। কিন্তু কে জানে কেন, গলা দিয়ে খাবারগুলো তেমন নামল না। কয়েক গ্লাস ঠান্ডা জল খেয়ে খিদেটা আরও মরে গেল, তারপর এল অনিচ্ছে।
খাওয়ার চেয়েও তাদের বেশি দরকার ছিল ঘুম।
শোয়ার ব্যবস্থাও বাড়ির অন্যান্য ব্যাপারের মতো মানানসই। বিশাল একখানা ঘরের চার কোণে চারটে মহার্ঘ ঘাট। সাদা চাদর পাতা টান টান, নীল রঙের মশারি ফেলা, পায়ের কাছে ভাঁজ করা লেপ।
তারা পটপট লেপের তলায় ঢুকে পড়ল। ঘুমিয়ে পড়তেও দেরি হল না। সকালেই ফের যাত্রা।
কিন্তু লেপের তলায় ঢোকার পরই একটা অদ্ভুত শারীরিক অনুভূতি হতে লাগল অমিতের। তার প্রচণ্ড শীত করছে হঠাৎ। শরীর থরথর করে কাঁপছে। দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছে।
অমিতের অসুখটসুখ বড় একটা করে না। তার শরীর বিশেষ রকমের মজবুত। কাজেই সে একটু ভয় খেয়ে গেল। এরকম হচ্ছে কেন?
উঠে সে ফের জল খেল। কিন্তু বুঝতে পারল, তার টেম্পারেচার বাড়ছে। শ্বাস বেশ গরম। নাড়ী চলছে দ্রুত। মাথাটা ঘোর ঘোর লাগছে। সে প্রাণপণে দুহাত মুঠো করে বালিশে মাথা গুঁজে শক্ত হয়ে রইল, কিন্তু ঘুমোতে পারল না।
জ্বরের ঘোরে তার কেবলই মনে হচ্ছিল, সুভদ্রর কাকা চারজনের মধ্যে বেছে বেছে তাকেই কেন জিগ্যেস করলেন, সে কী করে। উনি কি তাকে দেখেই বুঝতে পেরেছেন যে এই চারজনের মধ্যে সেই সবচেয়ে গরিব এবং আলাদা শ্রেণির?
ঘরে একটা নীল আলো জ্বলছে। তিন জনেরই গভীর ঘুমের দ্রুত শ্বাসের শব্দ হচ্ছে। হঠাৎ অমিত জ্বরের ঘোরের মধ্যে দেখতে পেল, তার চোখের সোজাসুজি ঘরের দরজাটা ধীরে খুলে যাচ্ছে।
একটু অবাক হয়ে চেয়ে রইল অমিত। এত রাতে ঘরে কে ঢুকছে? নিশ্চয়ই চোর নয়। এবাড়িতে তিন চারটে বাঘা কুকুর আছে, বেশ কয়েকজন দারোয়ান আছে।
যে ঢুকল তাকে দেখে চমকে উঠল অমিত। একজন মধ্যবয়স্কা মহিলা। গায়ে একটা কালো শাল। মুখখানা দারুণ সুন্দর। ভদ্রমহিলা খুব ফর্সাও। ঢুকে চারদিকে চাইলেন। চারজনকেই দেখলেন। অমিতের দিকে চাইতেই অমিত চোখ বুজে ফেলল।
কিন্তু বেশিক্ষণ চোখ বুজেও থাকতে পারল না সে। খুব সাবধানে আবার চোখ খুলে সে দেখতে পেল তার পায়ের দিকে যে মস্ত লোহার আলমারিটা রয়েছে ভদ্রমহিলা সেটা খুলছেন। আলমারিটা জাতে নিশ্চয়ই খুব ভালো এবং কজ্জায় নিয়মিত তেল টেল দেওয়া হয়। কারণ পাল্লা খোলার কোনও শব্দ হল না, শুধু চাবির একটা মৃদু শব্দ ছাড়া। কী যেন বের করছেন মহিলা। ইনি বাড়ির মানুষ কিনা তা জানার উপায় নেই। সাড়াশব্দ করাটাও উচিত হবে কিনা তা বুঝতে পারছিল না অমিত। চুপ করে থাকাটাই তার বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে হল।

কিছু একটা বের করে নিয়ে ভদ্রমহিলা চলে গেলেন। যাওয়ার সময় দরজাটা নিঃশব্দে বন্ধ করে দিয়ে যেতে ভুললেন না। অমিত উঠল। ব্যাকপ্যাক খুলে প্যারাসিটামল ট্যাবলেট বের করে খেল। সঙ্গে খেল একটা ট্র্যাংকুইলাইজার। পরাতপক্ষে সে ওসুধ খায় না, কিন্তু অন্যের বাড়িতে এভাবে অসুস্থ হয়ে পড়াটা তার কাছে অস্বস্তিকর।

মিনিট পনেরোর মধ্যেই ওষুধের ক্রিয়া বুঝতে পারছিল সে। জ্বর নেমে যাচ্ছে, শীতভাবটা কেটে গেছে এবং ঘুম পাচ্ছে। সে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল।

খুব ভোরবেলায় ঘুম ভাঙল তার, অস্বস্তিতে। প্যারাসিটামলের ক্রিয়া কেটে গেছে। তার ফের প্রচণ্ড জ্বর এসেছে। ভয়ের কথা হল, পেটে প্রচণ্ড অস্বস্তি বোধ করছে সে। জ্বর নিয়ে টলতে টলতে সে বাথরুমে গেল। এবং বুঝতে পারল, তার পেটের গণ্ডগোলও শুরু হয়েছে।

তিনবার বাথরুম ঘুরে আসার পর সে সুভদ্রকে ডেকে তুলল, আমার ভীষণ জ্বর এসেছে! কী হবে বল তো!

সুভদ্র তার গা দেখে বলল, এ তো হাই টেম্পারেচার দেখছি। দাঁড়া থার্মোমিটার দিয়ে দেখি।

থার্মোমিটারে একশো চার উঠল।

সুভদ্র ভ্রু কুঁচকে বলল, কোয়াইট হাই।

উদ্বিগ্ন অমিত বলে, তাহলে কী হবে?

তোকে বেডরেস্ট নিতে হবে। ডাক্তার দেখাতে হবে।

মাথা নেড়ে অমিত বলল, আমাদের টুরটার কী হবে? আমি যেতে পারব না?

পাগল নাকি? এই জ্বর নিয়ে যাবি কোথায়?

করুণ গলায় অমিত বলে, তোরা তাহলে চলে যা। আমি কলকাতায় ফিরে যাই।

ফিরবিই বা কী করে? জ্বরের সঙ্গে ডায়ারিয়া আছে। ফেরা সহজ নয়। আগে ডাক্তার দেখাই, তারপর ডিসিশন নেওয়া যাবে। হঠাৎ এটা হল কী করে?

বুঝতে পারছি না। সারাদিন তো ভালোই ছিলাম। এতটা রাস্তা সাইকেল চালিয়ে এলাম। হঠাৎ রাত্রিবেলা টের পেলাম টেম্পারেচার।

সুভদ্র তীর্থ আর দীপুকে ঘুম থেকে তুলে বলল, আমাদের জরুরি বৈঠক আছে। অমিত সিক। কী করা যাবে?

সব শুনেটুনে দীপু বলল, লক্ষণটা টাইফয়েডের। তবে ভাইরাল ফিবারও হতে পারে। তোর ঠান্ডা লাগেনি তো অমিত?

না।

তাহলে কেসটা একটু সিরিয়াস। টুর ক্যানসেল করতে হবে।

অমিত বলল, আমার টুর তো অটোমেটিক্যালি ক্যানসেলড।

আমি আমাদের টুরের কথাও বলছি।

অমিত মাথা নেড়ে বলে, না, তোরা যা।

দীপু নিজে ডাক্তারি পড়ে, তার বাবাও বেহালার নামকরা ডাক্তার। সে একটু ভেবে বলল, আমাদের দু চারদিন অপেক্ষা করতে বাধা নেই। তোকে ঠেসে অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে যদি খাড়া করা যায় তাহলে খুব অসুবিধে হবে না। কিন্তু এন্টেরিক ফিবার হলে মুশকিল।

চট করে কেউই কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারল না।

অমিত আরও দুবার বাথরুম থেকে ঘুরে এসে বলল, হোপলেস। শোন সুভদ্র, আমাকে যদি থেকেই যেতে হয় তাহলে অন্তত হাসপাতালে পৌঁছে দে। এ বাড়িতে তো থাকা চলবে না। অসুখ হয়েছে বলে আমার ভীষণ লজ্জা করছে। বাড়ির লোক যেন জানতে না পারে।

সুভদ্র ঠান্ডা মাথার মানুষ। বলল, কাকা বড়লোক বটে, কিন্তু মানুষ খারাপ নয়। তোর লজ্জার কোনও কারণ নেই। ডাক্তার তো ডাকতেই হবে।

এই বলে সুভদ্র বেরিয়ে গেল।

অমিত শারীরিক অস্বস্তির সঙ্গে প্রবল মানসিক অস্বস্তিও ভোগ করতে লাগল। সে গরিব-দুঃখী মানুষ। জীবনে কখনও আরাম বিলাসে থাকেনি। পাড়ার লাইব্রেরির টেবিলে সে শোয়, পরের বাড়িতে খায়, সারাদিন তেল কালি মেখে গাড়ি মেরামত করে। সে এক কথায় নিম্নশ্রেণীভুক্ত মানুষ। এই বিশাল বড়লোকের বাড়িতে তার থাকাটা হবে বড়ই লজ্জাজনক।

দীপু, আমি কিন্তু কিছুতেই এ বাড়িতে থাকতে পারব না। তোরা আমার অন্য একটা ব্যবস্থা করে দে।

দীপু দাঁত ব্রাশ করছিল। বলল, এত অস্থির হচ্ছিস কেন? আগে ডাক্তার এসে দেখুক তারপর ভাবা যাবে। অনেক সময়ে পেটে গ্যাস হয়ে জ্বর হয়। সেটা হলে ভয়ের কিছু নেই।

মিনিট পেনেরো বাদে সুভদ্র একটু বিবর্ণ মুখে ফিরে এল। এসে বলল, একটু ঝামেলা হয়েছে। আমার মনে হয় অমিতকে হাসপাতালেই যেতে হবে।

তীর্থ ফ্রি হ্যান্ড ব্যায়াম করছিল। দীপু গেছে মুখ ধুতে। অমিত চোখ বুজে পড়ে ছিল। চোখ খুলে উদ্বেগের গলায় বলল, কী হয়েছে?

ভাবছি বলাটা উচিত হবে কিনা!

আমি যে টেনশনে আছি। বলবি না?

সুভদ্র চিন্তিত মুখে বলে, এ বাড়িতে বউ-পালানোর একটা পুরোনো ট্র্যাডিশন আছে। কাকার প্রথম বউ অর্থাৎ আমার কাকিমা পালিয়ে গেছে অনেকদিন আগে। কাকার ছেলে মলয়ের বউ তো ফুলশয্যার দু'দিন বাদেই চলে যায়। কাল রাতে কাকার সেকেন্ড ওয়াইফ অর্থাৎ আমার নতুন কাকিমাও নাকি চলে গেছেন। কাকা তো রেগে আগুন।

অমিত উত্তেজনায় উঠে বসে বলল, কাল অনেক রাতে এ ঘরে একজন মহিলা এসেছিলেন, মধ্যবয়স্কা। আলমারি থেকে কিছু একটা বের করে নিয়ে গেলেন। তিনিই কি?

সুভদ্র মাথা নেড়ে বলল, কাকিমার বয়স কম। বাইশ-টাইশ হবে। মধ্যবয়স্কা যাকে দেখেছিস সে বোধহয় কাকার শাশুড়ি। এরা কাকাকে খুব এক্সপ্লয়েট করছিল। মলয়দা তো মাতাল মানুষ, খুব ইমপ্র্যাকটিক্যাল। তাকে এরা ধর্তব্যের মধ্যেই ধরে না। তবে শুনেছি, নতুন কাকিমা আর তার মা এ বাড়িতেই থানা গেড়ে বসে নানা কাণ্ড করেছে। কাকাকে চাপ দিয়ে নাকি অনেক বিষয়-সম্পত্তি কাকিমার নামে লিখিয়েও নিয়েছে। পিছনে শাশুড়িটি আছে। ভদ্রমহিলা নাকি ক্যাবারেট্যাবারেতে নাচ গান করত, বাইজি টাইপের। ব্যাড ক্যারেকটার।

তীর্থ ব্যায়াম শেষ করে বলল, তাহলে পালাল কেন? এখানে থেকেই তো আরও এক্সপ্লয়েট করতে পারত।

সুভদ্র ম্লান মুখে বলে, বোধহয় কাকা একটু টাইট দিয়েছিল। ওরা বুঝতে পেরেছিল যে, আর এক্সপ্লয়েট করা যাবে না। তবে যা পেয়েছে তাও কম নয়। কাকার তিনটে কোল্ড স্টোরেজের মধ্যে দুটোই কাকিমার নামে। একটা ভিডিয়ো পারলার, চালকল, সবই হাতিয়ে নিয়েছে।

তীর্থ বিছানায় বসে অবাক হয়ে বলল, তোর কাকা তো বোকা লোক নয়। তাকে এক্সপ্লয়েট করল কী করে?

সুভদ্র ঠোঁট উল্টে বলে, তা কে জানে। ভদ্রমহিলা দারুণ চালাক। ব্ল্যাকমেল-এর ব্যাপারও থাকতে পারে।

তোর নতুন কাকিমা কেমন মানুষ?

জানি না, একবার দেখেছিলাম। দেখতে বেশ ভালোই। তবে কাকার সঙ্গে তো মানায় না। কাকার বয়স এখন চুয়ান্ন-পঞ্চান্ন হবে। মনে হয় বিয়েটা একটা চালাকি। কাকার টাকা-পয়সা হাতানোর কৌশল।

তীর্থ হতাশ হয়ে বলে, তাহলে তো বেজায় গণ্ডগোল। এ বাড়িতে আজ ব্রেকফাস্টও জুটবে না। রুগী নিয়ে পড়া গেছে, তারই বা কী হবে?

সুভদ্র মৃদু হেসে বলে, না না, হাউসহোল্ড ঠিকই আছে। এ বাড়িতে একজন সংসার দেখাশোনার লোক আছে। হরিপদদা। সেই সব ঠাকুর-চাকরকে চালায়। ওসব নিয়ে চিন্তা নেই। আর অমিতের ডাক্তারও এল বলে। খবর চলে গেছে। সবই ঠিক আছে, শুধু আমাদের যাত্রাভঙ্গ করতে হচ্ছে। আর কাকার মেজাজটা ভালো নেই।

তার ছেলে কোথায়?

ময়লদা? সে তো আউট হাউসে থাকে। অনেক রাতে ফেরে, বেলা অবধি ঘুমোয়। সে কাকার সঙ্গে সম্পর্কই রাখে না।

অমিত ধুঁকতে ধুঁকতে বলল, আমাদের কপালটাই খারাপ।

দীপু বাথরুম থেকে বেরিয়ে সব শুনল। তারপর বলল, এ তো বোম্বাই ছবির গল্প। ক্যাবারে ডান্সারের মেয়ে, ব্ল্যাকমেল, বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা। দারুণ ব্যাপার। তবে তোর কাকাকে অবশ্য বুড়ো বলে মনে হয় না। বেশ ফিট চেহারা।

সুভদ্র একটা শ্বাস ফেলে বলল, এখনও ব্যায়ামট্যায়াম করেন। যোগ অভ্যাস আছে।

দীপু তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছে বলল, গল্প জমে গেছে।

এদের বাড়ির সবকিছুই বড্ড উঁচুদরের। যে ডাক্তার অমিতকে দেখতে এলেন তিনি একজন বিলেতফেরত এবং এম আর সি পি। সুভদ্র চাপা গলায় বলল, ইনি ফ্যামিলি ফিজিসিয়ান। ভিজিট দুশো টাকা।

অমিত মিনমিন করে বলল, এত টাকা দিলে আমাদের থাকবে কী?

দূর বোকা, কাকার বাড়িতে আমরা টাকা শো করলে কাকার কি প্রেস্টিজ থাকবে?

ডাক্তারবাবুটির বয়স ত্রিশের কোঠায়। চেহারাটা সুন্দর এবং হাসিখুশি।

অমিতকে পরীক্ষা করলেন অনেকক্ষণ ধরে। তারপর বললেন, ভয়ের কিছু নেই। তবে ভোগাবে।

অমিত করুণ গলায় বলল, কিন্তু আমরা যে সাইকেলে ভারত ভ্রমণে বেরিয়েছি।

ডাক্তারবাবু হাসলেন, ভ্রমণটা আপাতত বিছানায় সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। আমার সাজেশন হল, বন্ধুরা চলে যাক। আপনি রেস্ট নিন।

সুভদ্র বলল, তা হয় না। আমরা চারজন বেরিয়েছি একসঙ্গে।

অমিত বলল, খুব হয়। তুই-ই তো পাবলিক মানির কথা বলছিলি। যারা চাঁদা দিয়েছে তাদের ঠকানো হবে।

সুভদ্র বলল, ওর কী হয়েছে ডাক্তারবাবু?

মনে তো হচ্ছে এন্টেরিক ফিবার। তবে সাত-আট দিন না গেলে বোঝা যাবে না। আপাতত অ্যান্টিবায়োটিক আর অন্য ওষুধ চলবে।

প্রেসক্রিপশন লিখে ডাক্তারবাবু চলে গেলেন। তারপর চারজনের আবার মিটিং বসল।

সুভদ্র বলল, অমিতকে এই অবস্থায় হাসপাতালে পাঠানোই হয়তো উচিত। কিন্ত সেখানে কেমন ব্যবস্থা তা জানি না। ওকে হাসপাতালে দিতে আমার ইচ্ছেও করছে না।

দীপু আর তীর্থ প্রায় একই নিশ্বাসে বলল, হাসপাতাল অতি জঘন্য জায়গা। মেরে ফেলবে।

তাহলে?

তিনজন ফের মিটিং করতে লাগল। অমিত টের পেল তার জ্বর আরও বাড়ছে। শরীর ঝিমঝিম করছে। পেটের মধ্যে কলকল শব্দ। সে চোখ বুঝল এবং একটা ঝিমুনি বা তন্দ্রার মধ্যে ডুবে গেল।

চোখ যখন মেলল তখন তাকে ঘিরে কয়েকজন লোক। একজন সুভদ্রর কাকা। বউ পালিয়ে যাওয়ার শকটা যেন ভদ্রলোক কাটিয়ে উঠেছেন। মুখ একটু গম্ভীর, এই যা।

কাকাই প্রশ্ন করলেন, কেমন আছ?

আজ্ঞে ভালো।

জ্বরে তো গা পুড়ে যাচ্ছে। ভালো কী করে আছ?

অমিত শুষ্ক মুখে বলল, কলকাতায় ফিরে যেতে আমার কোনও অসুবিধে হবে না।

কাকা মৃদু একটু হাসলেন, কলকাতাতেই বা তোমার দেখাশোনা কে করবে? সুভদ্রর কাছে শুনলাম তুমি নাকি লাইব্রেরিতে থাকো। আত্মীয়স্বজনও তো নেই।

অমিত সভয়ে ঢোঁক গিলে বলে, পাড়ার সবাই আমাকে চেনে। কোনও অসুবিধে হবে না।

কাকা একটু প্রগাঢ় গলায় বললেন, লজ্জা পেও না হে। অসুখ তো কেউ সাধ করে বাধায় না। তুমি জলেও পড়োনি। আমি বলি, তুমি এখানেই থাকো। আমাদের একটা সিক-রুম আছে, সেখানে সব ব্যবস্থাই করা থাকে। উঠে হেঁটে যেতে পারবে? নইলে ধরাধরি করে নিতে হবে।

অমিত তার প্রচণ্ড জ্বর নিয়েও টপ করে উঠে পড়ল। বলল, পারব।

সে উঠতেই আরও দুজন লোক এগিয়ে এসে তাকে দু'ধার থেকে ধরে ফেলল, এ বাড়ির লোকই হবে। একজন বলল, চলুন, ধরে ধরে নিয়ে যাচ্ছি।

কাকা বললেন, সুভদ্ররা তোমার ওষুধ আনতে গেল। এসে যাবে।

সিক-রুমটা একতলায়। মূল বাড়ি থেকে একটু তফাতে, কিন্তু লম্বা ঢাকা করিডোর দিয়ে যোগাযোগ করা হয়েছে। লাগোয়া বাথরুম। ঘরে হাসপাতালের বেড-এর মতোই ব্যবস্থা। ওষুধের ক্যাবিনেট, ড্রিপ দেওয়ার স্ট্যান্ড, অক্সিজেন সিলিন্ডার, জল গরম করার ইলেকট্রিক হিটার সব আছে।

কাকা তার সঙ্গে সঙ্গেই এলেন। বললেন, থাকতে পারবে এখানে?

অমিত কাতর স্বরে বলল, আমার জন্য কেন কষ্ট করছেন কাকা?

কষ্ট! কষ্ট কীসের? এ ঘর তো ফাঁকাই থাকে। শুয়ে পড়ো, কেউ তোমাকে ডিস্টার্ব করবে না। নার্স এলে মাথা ধুইয়ে গা স্পঞ্জ করে দেবে।

নার্স! বলে এমন হাঁ করে রইল অমিত যে মুখে একটা চড়াইপাখি ঢুকে যেতে পারে।

হ্যাঁ। এসে পড়বে। জাস্ট গো টু স্লিপ।

ঘর ফাঁকা হয়ে গেল। স্প্রিং দেওয়া জালের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল আপনা থেকেই। নার্স আসবে শুনে আতঙ্কে খানিকক্ষণ এপাশ ওপাশ করল অমিত। কিন্তু জ্বরটা এমন তুঙ্গে চড়ে আছে যে, সে বেশিক্ষণ চেতন থাকতে পারছে না। বড় জ্বরও একটা নেশার মতোই। সে ফের আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

যখন ফের জাগল তখনও নার্স আসেনি। সে বাথরুমে যেতে এবং আসতে গিয়ে বুঝতে পারছিল, সে টলছে। চোখে ধোঁয়া ধোঁয়া দেখছে। একটু হাঁপাচ্ছেও।

সুভদ্র, দীপু আর তীর্থ এল দুপুরের দিকে। সুভদ্রর হাতে ওষুধ। বলল, নে, ক্যাপসুলটা খা।

অমিত করুণ স্বরে বলল, তোর কাকা আমাকে এখানেই থাকতে বলেছে।

সুভদ্র গম্ভীর হয়ে বলল, জানি। এর চেয়ে ভালো ব্যবস্থা আর হয় না।

শুনছি নার্স আসবে।

এ বাড়ির এটাই নিয়ম।

তীর্থ একটু শিস দিয়ে বলে, নার্স! কেমন নার্স? ইয়ং অ্যান্ড বিউটিফুল নয় তো!

দীপু বলল, নার্সের সঙ্গে রুগীর প্রেম কিন্তু একটা কমন ব্যাপার।

অমিত রেগে গিয়ে বলে, গুলি মার প্রেমে। নার্স এসে নাকি মাথা ধোয়াবে, গা পোঁছাবে। জন্মে কোনও অনাত্মীয় মহিলাকে ছুঁইনি। এসব আমি পারব না।

সুভদ্র খুব উদাস গলায় বলে, অসুখ হলে মানুষ শিশুর মতো হয়ে যায়। তখন আর লজ্জা কীসের?

ওষুধ খেয়ে ফের তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল অমিত। যখন ঘুম ভাঙল তখন অল্পবয়সি একটি মেয়ে একটা থার্মোমিটার চোখের সামনে ধরে ভ্রূ কুঁচকে চেয়ে আছে।

সে চোখ চাইতেই মেয়েটি বলল, জেগেছেন! ভালোই হয়েছে। এখনই মাথায় জল ঢালতে হবে।

আপনি নার্স?

হ্যাঁ। আমার নাম সুপর্ণা বিশ্বাস। আপনার খুব হাই টেম্পারেচার। কেমন লাগছে বলুন তো!

কেমন তা বুঝতে পারছি না। মাথায় প্রচণ্ড ব্যথা। আর মনে হচ্ছে জলে ডুবে আছি। আমার কী হয়েছে?

মনে হচ্ছে টাইফয়েড। একটু ওপর দিকে উঠে শুয়ে পড়ুন তো।

ব্যবস্থা ভালোই। ট্যাপ থেকে রবারের নল টেনে বলাতির মুখে মাথা ধোয়ানোর বন্দোবস্ত। মেয়েটা প্রায় আধঘণ্টা ধরে তার মাথা ঠান্ডা জলে ধুইয়ে দিয়ে তোয়ালেতে মাথা মুছল। কপালে জলপট্টি দিল অডিকোলোন মিশিয়ে। অমিত এত রাজকীয়ভাবে থাকেনি কখনও। কিন্তু মাথা ধোয়ানো ও জলপট্টির ফলে তার শরীর শতকরা পঞ্চাশ ভাগ ভালো লাগতে লাগল।

খুব লজ্জার সঙ্গে সে হঠাৎ বলল, আমার জন্য এত ব্যবস্থা না করলেও চলত।

মেয়েটা ভ্রূ কুঁচকে বলল, কেন বলুন তো!

অভ্যাসই নেই। আমি খুব সামান্য মানুষ।

তাই নাকি?

হঠাৎ এসে উটকো ঝামেলা পাকিয়ে দিলাম।

মেয়েটা হাসল। মেয়েটাকে এই প্রথম লক্ষ্য করল অমিত। শ্যামলা, কিন্তু দেখতে খুব মিষ্টি।

ডাক্তারবাবুটি বিকেলের দিকে এলেন। সিরিঞ্জে কিছুটা রক্ত টেনে নিলেন পরীক্ষার জন্য। নিতে নিতেই বললেন, এন্টেরিক ফিবারের জার্ম আট-দশ দিনের আগে পাওয়া যায় না। তবু একটু টেস্ট করানো ভালো।

অমিত করুণ গলায় বলে, আমার কি টাইফয়েডই হয়েছে?

ডাক্তার হাসলেন, সেটাই তো মনে হচ্ছে। রেস্ট নিন আর খুব করে ফুড খান।

আমার যে পেট খারাপ।

ওতে কিছু হবে না। ভাতটাত সব খাবেন। ফুড চার্ট করে দেওয়া আছে। অপনারা একটা সাইকেল ট্যুরে যাচ্ছিলেন, না?

আজ্ঞে হ্যাঁ। আমরা যাওয়াটা খুব দরকার ছিল।

রোগের বিরুদ্ধে তো কিছু করার নেই।

অমিত সুগভীর হতাশায় ডুবে গেল।

রাত্রিবেলা যে নার্সটি এলেন তিনি বয়স্কা এবং খুবই হাসিখুশি। এসেই বললেন, বেশ রোগটি বাধিয়েছ, আগে এই রোগে মানুষ মারাও যেত। ওষুধ ছিল না। আমার আর আমার ভাইয়ের একসঙ্গে হয়েছিল। আমার ভাইয়ের তো একটা হাত পঙ্গু হয়ে গেল। আমার অবশ্য কিছু হয়নি। তবে প্রায় দু মাস ভুগে কঙ্কালসার হয়ে গিয়েছিলাম।

ও বাবা।

ভয় পেও না। এখন টাইফয়েড জলভাত। একটু ভোগান্তি আছে। তবে পনেরো দিনের বেশি নয়।

পনেরো দিন! সেও তো অনেক দিন।

অত ভাবছ কেন? শুয়ে থাকা ছাড়া আর তো কষ্ট কিছু নয়। ইয়ং ম্যান ভালো স্বাস্থ্য, সব ঠিক হয়ে যাবে।

ক্লান্তিতে চোখ বুজে ফেলল অমিত। পরদিন সকালে বন্ধুরা ফের জড়ো হল বিছানার ধারে।

সুভদ্র একটু সংকোচের সঙ্গে বলল, অমিত, আমরা ডিসিশন নিতে পারছি না। কী করব বল তো।

তোরা চলে যা। আজই চলে যা, আমার কপালটাই খারাপ, কিন্তু কী করা যাবে?

ভাবছিলাম, যদি মাসখানেক পিছিয়ে দেওয়া যায়।

অমিত মাথা নেড়ে বলে, তা হয় না। ফেয়ারওয়েল দিয়েছে, ফিরে গেলে লজ্জায় পড়তে হবে। তোরা যা।

বন্ধুরা নিজেদের মধ্যে একটু পরামর্শ করে নিল। তারপর সুভদ্র বলল, দেন দ্যটস দ্যাট। আমরা আজই রওনা হচ্ছি।

অমিত কুণ্ঠিত গলায় বলে, তোরা চলে গেলে এখানে থাকতে আমার খুব অস্বস্তি লাগবে।

কেন? এখানে তো তোফা আছিস।

তা আছি। কিন্তু তোর কাকার একটা বিচ্ছিরি ঘটনা ঘটে গেছে। ওঁর নিশ্চয়ই মন ভালো নেই। এই অবস্থায় তাঁর ঘাড়ে চেপে থাকাটা ঠিক হচ্ছে না।

সুভদ্র তার দিকে স্থির চোখে একটু চেয়ে থেকে বলল, তোর চিন্তার কিছু নেই। কি জানি কেন, তোকে দেখেই কাকা একটু ইমপ্রেসড। আমাকে বলেছেন, ছেলেটা তো বেশ কাজের বলে মনে হয়। মনে রাখিস, কাকা সহজে কারও প্রশংসা করে না। তোকে কোনও কারণে কাকার বেশ ভালো লেগেছে।

অমিত একটু উজ্জ্বল হয়ে বলে, সত্যি? কাউকে ইমপ্রেস করার কোনও ক্ষমতাই আমার আছে বলে তো মনে হয় না।

তোর ভিতরে কী আছে তা তুই কী করে বুঝবি? আর কাকিমার ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামানোর কিছু নেই। আমার কাকা হল এ ভেরি হার্ড নাট টু ক্র্যাক। এমনিতেই বোধহয় সম্পর্কটা টিকত না। কানাঘুষো শুনেছি, অনেকদিন থেকেই নাকি টাকাপয়সা আর সোনাদানা সরাচ্ছিল।

অমিত নানা মানসিক কারণে কিছু অস্থিরতা বোধ করছিল। বলল, তবু তোরা আমাকে হাসপাতালে দিলেই ভালো করতিস। যাক গে, আর তো কিছু করার নেই। শুধু ভাবছি, কাকার এই ঋণটা কী করে শোধ করব।

কাকার ঋণ শোধ করার কিছু নেই। তোর জন্য যা খরচ হচ্ছে কাকার কাছে নস্যিও নয়। আর সময় নষ্ট করে লাভ নেই। আমরা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়তে চাই।

অমিতের মনটা হঠাৎ খুব খারাপ লাগতে লাগল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, ঠিক আছে।

বন্ধুরা চলে গেল তৈরি হতে। এল সুপর্ণা।

কেমন আছেন আজ?

করুণ গলায় অমিত বলল, ভালো নেই। ওরা আজ চলে যাচ্ছে। আমি একা পড়ে রইলাম।

সুপর্ণা একটু মায়াভরে হাসল। দাঁতগুলো ঝকঝকে। বলল, ভাবছেন কেন? পরের বার আবার যাবেন।

আর কি এরকম সুযোগ আসবে?

খুব আসবে। এত হতাশ হওয়ার কিছু নেই। ব্রেকফাস্ট খেয়ে নিন তো।

আমার কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না।

করছে না, কিন্তু জোর করে খেতে হবে। আর আজ থেকে টয়লেটে যাওয়ার দরকার নেই। বেডপ্যান নেবেন।

অমিত লাল হয়ে গেল লজ্জায়। মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে বলল, মাপ করবেন। ওটা পারব না।

আপনি খুব ছেলেমানুষ। এত হাই টেম্পারেচার নিয়ে উঠে দাঁড়ানো বা হাঁটা কত বিপজ্জনক তা জানেন? মাথা ঘুরে পড়ে যেতে পারেন।

অমিত মৃদু স্বরে বলল, আমাকে খুব কষ্ট করে বড় হতে হয়েছে। আমার সব কিছু অভ্যেস আছে।

সুপর্ণা একটু গম্ভীর হয়ে বলল, তাহলে অন্তত টয়লেটে গিয়ে ছিটকিনিটা দেবেন না। মনে থাকবে?

ঠিক আছে।

আপনি কিন্তু খুব হেড স্ট্রং।

অমিত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, আপনি তো আমাকে জানেন না। আমি সামান্য মোটর মেকানিক, অনাথ, গরিব। থাকি পাড়ার একটা লাইব্রেরিতে। এত আরামের ব্যবস্থা আমার কল্পনাতেও আসে না।

আপনার সম্পর্কে এ সবই আমি জানি।

অমিত বলল, সেই লাইব্রেরিতে জ্বর হয়ে পড়ে থাকলে কী হত বলুন তো! সবই তো নিজেই করতে হত। কিংবা হাসপাতালে যেতে হত।

আপনি এখানে এত অস্বস্তি বোধ করছেন কেন? রামমোহনবাবুকে আমি চিনি। খুব রাগী আর ব্যক্তিত্ববান মানুষ। সবাই ভয় পায় কিন্তু ওঁর দয়ামায়াও খুব। সারা জেলায় ওঁর মতো দান ধ্যান খুব কম মানুষের আছে। আর সেই জন্যই তো অত হিংসে করে লোকে।

অমিত মাথা নেড়ে বলে, উনি যে দয়ালু লোক তা বুঝেছি।

ওঁর ছেলেকে চেনেন?

না, পরিচয় হয়নি।

নানা দোষ আছে ঠিকই, কিন্তু খুব উদার। অদ্ভুত ধরনের মানুষ।

সুপর্ণা বিশ্বাসকে অমিতের খুবই পছন্দ হতে লাগল। বেশ চেহারা, সপ্রতিভ, কথাবার্তায় চটপটে, কিন্তু মলয়ের প্রতি ভক্তিটা কি একটু বেশি?

অমিত বলল, আপনি কি হাসপাতালের নার্স?

সুপর্ণা বলল, না তো! আমি রামমোহনবাবুর নার্সিং হোমে কাজ করি, নার্সের ট্রেনিং আছে। যখন দরকার হয় তখন এ বাড়িতে নার্সিং করি। আপনি কিন্তু বড্ড বেশি কথা বলছেন। রুগীদের চুপ করে থাকাই নিয়ম।

আজ কথা না বললে আমার বড় কষ্ট হবে। ওরা এতক্ষণে তৈরি হয়ে গেছে। একটু বাদেই ওরা বেরিয়ে পড়বে, কোথায় কোথায় চলে যাবে, আর আমি! এই ঘরে পড়ে থাকব একা। আমার মনটা আজ ভীষণ খারাপ।

খারাপ হওয়ারই কথা। আচ্ছা, বরং গল্পই করা যাক। আমি বলব, আপনি শুনবেন। ঠিক আছে।

তাই হবে।

তার আগে ব্রেকফাস্ট।

আমার যে খিদে নেই।

ভয় নেই, আপনার যা ভালো লাগবে তাই খেতে বলেছেন ডাক্তারবাবু, কী খেতে ইচ্ছে করছে বলুন তো!

কিচ্ছু না।

আচ্ছা, একটু দুধ নিয়ে কর্নফ্লেক খান। তারপর টোস্ট। ঠিক আছে।

কর্নফ্লেক কী জিনিস?

খাননি? ভুট্টা থেকে হয়। খেয়েই দেখুন।

অমিত খেল। কিন্তু ভালো লাগল না। টোস্ট খেতে অবশ্য তার ভালোই লাগে। দুখানার বেশি পারল না।

এত কম খেলে কিন্তু দুর্বল লাগবে।

খিদেটা এখন নেই, কিন্তু পরে হয়তো হবে। আপনি তো জানেন না আমার খিদে খুব মারাত্মক।

তাই নাকি?

আমি ভীষণ খাই। বেহালায় এক পাতানো মাসির বাড়িতে খেতে হয় আমাকে। তিনি খুব ভালো মানুষ। যত্ন করে খাওয়ান। আমিও খুব খাই।

সুপর্ণা একটু হেসে বলল, তাই নাকি? সেই খাওয়াটা একটু দেখিয়ে দিন না।

সুপর্ণা চলে গেল এবং একটু বাদে আবার দুধ কর্নফ্লেক টোস্ট নিয়ে এল ট্রেতে সাজিয়ে।

মোটর মেকানিক অমিত তার স্বভাবসিদ্ধ লজ্জা ও অস্বস্তির সঙ্গে সেসব খেতে লাগল। তার এখনও দাস্ত হচ্ছে। এই খাওয়া কি তার সহ্য হবে? কে জানে বাবা! মস্ত ডাক্তার তার চিকিৎসা করছেন। তার ওপরে তো আর কথা নেই!

তার খাওয়া শেষ হতেই বন্ধুরা এল। প্রত্যেকের মুখেই একটু দুঃখের ভাব।

সুভদ্র তার হাতে চেপে ধরে বলল, তোকে ছেড়ে যেতে খারাপ লাগছে, কিন্তু বেটার লাক নেক্সট টাইম।

চোখে জল আসছিল অমিতের। কী করতে পারে সে।

তীর্থ আর দীপুও তাকে পিঠ চাপড়ে সান্ত্বনা দিল। অমিত ধরা গলায় বলল, সাবধানে যাস।

ওরা রওনা হয়ে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ চোখ বুজে পড়ে রইল অমিত। তার যাওয়া হল না। এরকম সুযোগ আর আসবে কিনা কে জানে। হয়তো আসবে না। সে অনাথ, গরিব, তার সুযোগ আসে অন্যের দয়ায়।

সুপর্ণা ঘরে ছিল না। হঠাৎ ঘরে এসে ঢুকেই বলল, এ কী! এঃ মা, ছেলেমানুষের মতো কাঁদছে দেখ! আচ্ছা লোক তো আপনি! পুরুষ মানুষকে একটু শক্ত হতে হয়।

অমিত চোখ খুলে একটু হাসল। বলল, জ্বরটা আমাকে বোধহয় মনের দিক দিয়েও দুর্বল করে ফেলেছে।

চোখটা মুছে ফেলুন। রামমোহনবাবু আপনাকে দেখতে আসছেন।

তোয়ালে দিয়ে চোখ মুছিয়ে দিল সুপর্ণাই। বিছানাটা একটু গুছিয়েও দিল দক্ষ হাতে। ঘরে স্প্রে করে একটা মৃদু সুবাস বা জীবাণুনাশক ছড়িয়ে দিল।

রামমোহনবাবু এলেন। রাশভারী, আত্মবিশ্বাসে ভরপুর চেহারা। কে বলবে যে এর বউ সবেমাত্র পালিয়ে গেছে!

রামমোহন একটা চেয়ার টেনে গুছিয়ে বসলেন। মনে হল, শুধু কুশলপ্রশ্ন করতে আসেননি। বললেন, কেমন লাগছে জায়গাটা?

খুব ভালো।

বন্ধুরা চলে গেল বলে মন খুব খারাপ তো!

আজ্ঞে, খুব খারাপ লাগছে। আপনাদেরও অসুবিধেয় ফেললাম।

রামমোহন একটু হেসে বললেন, গরিব হলেই একটা কী হয় জানো, লোকে অকারণে হীনমন্যতায় ভোগে। তোমার জন্য আমাদের কোনও অসুবিধেই হচ্ছে না। ইটস এ বিগ হাউজহোল্ড।

লজ্জিত অমিত চুপ করে রইল।

রামমোহন বললেন, তুমি তো মোটর মেকানিক। আচ্ছা বলতে পারো একটা মাঝারি গ্যারেজের মালিকের মাসে কত টাকা আয় হয়?

গ্যারেজের মালিকরা বেশিরভাগই যা খুশি মজুরি নেয়। কোনও রেট নেই। মোটরগাড়ির মালিকরা বেশিরভাগই অজ্ঞ। সুতরাং লাভ ভালোই হয়। চালু গ্যারেজ হলে মাসে দশ পনেরো বিশ হাজারও হতে পারে।

ব্যবসাটা খুবই ভালো, না?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

ধরো যদি একটা বেশ অল পারপাস বড় গ্যারেজ করা যায় তাহলে?

অল পারপাস মানে?

মানে সব পার্টস পাওয়া যাবে, সব রকম মেরামতি হবে।

একদম এ টু জেড?

হ্যাঁ হ্যাঁ, এমনকি সব পার্টস অবধি পাওয়া যাবে। এরকম করা যায় না?

কেন করা যাবে না?

আমাদের এখানে একটা মোটর গ্যারেজ করলে বোধহয় ভালোই চলবে। ট্রাক থেকে শুরু করে ছোট গাড়ি সব রকম ভেহিকেলের জন্যই ব্যবস্থা থাকবে। এমনকি ব্রেকডাউন গাড়ি তুলে আনার ব্যবস্থাও।

ইনিশিয়ালি অনেক টাকা লাগবে। তবে ভালোই হয়।

এখন আমার একটা প্রস্তাব আছে তোমার কাছে।

বলুন।

তোমাকে দেখে আমার খুব সৎ আর পরিশ্রমী বলে মনে হয়। আমি যদি তোমাকে আমার মোটর গ্যারেজের ভার দিই চালাতে পারবে?

খুবই অবাক হল অমিত। রোগের যন্ত্রণা প্রায় ভুলে গেল সে। বলল, আমাকে! আমাকে তো আপনি ভালো করে চেনেন না।

মানুষ চেনার একটা বিধিদত্ত ক্ষমতা আমার আছে। নইলে এত বড় কারবার করে উঠতে পারতাম না। তবে আমার আর একটা ব্ল্যাংক দিকও আছে। আমি মানুষ চিনি, কিন্তু মেয়েমানুষ একদম চিনতে পারি না।

অমিত লজ্জা পেয়ে চোখ নামিয়ে নিল।

রোমমোহন একটু শব্দ করে হাসলেন, ওই একটা জাতের কাছে আমি বারবার হেরে যাই। অনেক নাকাল হয়েও শিক্ষা হল না।

অমিত চুপ।

রামমোহন বললেন, তোমার মতটা আমাকে একসময়ে জানিয়ে দিও।

অমিত তাড়াতাড়ি বলল, এর আবার মতামত কী আছে কাকা? আমি খুব রাজি। এ তো আমার সৌভাগ্য।

রামমোহন একটু হেসে বললেন, ভালো মন্দ বিচার না করেই রাজী হয়ে গেলে?

অমিত করুণ গলায় বলল, আমি সামান্য কাজ করি, আমার যা অবস্থা তার চেয়ে খারাপ তো কিছু হতে পারে না।

রামমোহন একটু গম্ভীর চোখে তার দিকে চেয়ে থেকে বললেন, তোমার কখনও স্বাধীন ব্যবসা করতে ইচ্ছে হয়নি?

হয়েছে।

চেষ্টা করেছ?

না। মোটর গ্যারেজ করতে অনেক টাকার দরকার। কিছু টাকা জমাতে পারলে হয়তো করতাম।

শোনো, আমার গ্যারেজটা নিজের গ্যারেজ মনে করেই চালাবে। তোমার সঙ্গে একটা মাসিক লেনদেনের চুক্তি থাকবে। লাভের বাকিটা তোমার।

অমিত একটু ভেবে বলল, হিসেব-নিকেশের ব্যাপারে কি আমি ততটা বুঝব? আমি কলকব্জা বুঝি।

রামমোহনও একটু ভাবলেন, তারপর বললেন, সেও বটে। বড় কারবার চালাতে অভিজ্ঞতা দরকার। তুমি তো বাচ্চা ছেলে। আচ্ছা প্রথমে মাসিক বেতনেই কাজ শুরু করো। শুধু একটা কথা।

বলুন।

আমার ছেলের কথা শুনেছ তো!

মলয়বাবু? শুনেছি।

এ পৃথিবীতে শুধু একটা জিনিসের প্রতিই ওর আকর্ষণ দেখি। সেটা হল মোটর গাড়ি। মেকানিজমটা ভালো বোঝে। ও দেশি গাড়িকে নানারকম জিনিস ফিট করে অন্যরকম করে তুলতে পারে। খুব মাথা, ওকে তোমার কারবারে ইনভলভড করতে হবে।

কী যে বলেন! আপনার কারখানায় তো আপনার ছেলেরই অধিকার।

ব্যাপারটা অত সহজ নয়। মলয়কে কোনও কাজে এনগেজ করা খুব শক্ত। এ কাজটা তোমাকে করতে হবে। বুদ্ধি খাটিয়ে সাইকোলজিক্যাল ধাঁচ বুঝে সাবধানে করতে হবে।

চেষ্টা করব।

আমার ছেলে হট টেম্পারড। খেয়ালি এবং মাঝে মাঝে অ্যাগ্রেসিভ। যাদের জীবনসংগ্রাম করতে হয় না, যারা ছেলেবেলা থেকেই যা চায় তাই পায়, যাদের ওড়ানোর মতো যথেষ্ট টাকা এবং সময় থাকে এবং যারা আদরে মানুষ তারা বেশিরভাগই মানুষ হিসেবে সমাজ এবং পরিবারের বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। প্যারাসাইটস, আমি মলয়কে পছন্দ করি না, কিন্তু সে আমার ছেলে এবং একমাত্র ওয়ারিশ। সুতরাং যতদিন বাঁচব তার

প্রতি আমার কর্তব্য করতেই হবে। ও আমার মুখোমুখি হতে চায় না, হয়তো নানা কারণে আমাকে অপছন্দও করে। তুমি একটু চেষ্টা কোরো। আমি শুধু একটা জিনিস জানি, গাড়ির ওপর ফ্যাসিনেশন আছে।

জ্বরের ঘোরে এসব কথা শুনছে অমিত। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে ভুল শুনছে বা স্বপ্ন দেখছে। বর্ধমান জায়গাটা কি তার জীবনের টার্নিং পয়েন্ট?

রোমমোহন উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, তোমার টাইফয়েড হয়েছে বলেই ডাক্তারের ধারণা। কোনও চিন্তা নেই, টাইফয়েড আজকাল কোনও অসুখই নয়।

জানি।

তোমার অ্যাডভেঞ্চারটা হল না, এটা হয়তো দুঃখের ব্যাপার। তবে ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন।

রামমোহন চলে যাওয়ার পর সুপর্ণা তাকে প্যারাসিটামল খাইয়ে মাথা ধুইয়ে দিল। বলল, দুপুরে গা স্পঞ্জ করে দেব।

আতঙ্কিত অমিত বলল, তার দরকার নেই।

জ্বরে স্পঞ্জ করা ভালো। ফ্রেশ লাগবে।

আমি বেশ আছি।

না বেশ নেই। ডাক্তারের কথা শুনতে হয়।

অসহায় অমিত বলল, তাহলে আমি নিজেই স্পঞ্জ করে নেব।

সুপর্ণা মুখ টিপে একটু হেসে বলল, রুগী হল শিশুর মতো, লজ্জা পেতে নেই, বুঝলেন?

বুঝতে একটু সময় লাগবে।

সুপর্ণা তার জন্য একটা তরল খাবার তৈরি করে দিয়ে বলল, রামমোহনবাবু আপনাকে বিরাট অফার দিচ্ছেন, তাইনা?

অমিত মুখখানা করুণ করে বলল, হ্যাঁ, কিন্তু কেন বলুন তো? আমাকে কেন?

বাঃ, তার আমি কী জানি?

আমি একটু ভয় পাচ্ছি।

ভয় কীসের?

উনি যে মোটর গ্যারেজ করতে চাইছেন তা খুব বড় প্রোজেক্ট। অনেক টাকার ব্যাপার।

উনি যা করেন তা একটু বড় স্কেলেই করেন। উনি একটা মোটরগাড়ির কারখানাও করতে চেয়েছিলেন। সরকার পারমিশন দেয়নি। উনি খুব রেগে গিয়েছিলেন।

মোটর গ্যারেজ তো আর গাড়ি তৈরি করবে না।

তার আমি কী জানি।

অমিত চাপা গলায় বলল, মলয়বাবু কেমন লোক তা জানেন?

সুর্পণা মাথা নেড়ে বলে, সব কথা বলতে নেই। নিজেই জানতে পারবেন।

একটু বলুন না, আমি যে ভয় পাচ্ছি।

সুপর্ণা একটু গম্ভীর হয়ে বলল, বড়লোকের লুচ্ছা ছেলেরা যেরকম হয় ঠিক সেরকম। তফাতের মধ্যে মলয়বাবু একটু গম্ভীর প্রকৃতির।

শুনলাম অ্যাগ্রেসিভ।

ঠিকই শুনেছেন। মলয়বাবু একসময়ে শহরের পয়লা নম্বর গুণ্ডাও ছিলেন। বিরাট দল ছিল। এখন নিজে গুণ্ডামি করেন না। তবে দলটা আছে। তারা করে।

গুণ্ডা! বলে একটু ভাবিত হয়ে পড়ল অমিত।

গুণ্ডা বলে নয়, আসলে লোকটা খুব খেয়ালিও। কখন যে কী করবে তার ঠিক নেই। কেউ কেউ বলে ড্রাগ অ্যাডিক্ট।

সত্যি নাকি?

কী করে বলব? এত কথা তো আমার বলাও উচিত নয়। আপনার ভয় দেখে মায়া হল বলে বললাম।

আমি একটা মোটর গ্যারেজে কাজ করি সে তো বলেছি। আমার আয় খুব বেশি নয়। কিন্তু আমার বেশ চলে যায়। আমি ভাবছি রিস্ক নিয়ে এখানে আসা ঠিক হবে কিনা।

ও মা! কেন আসবেন না? মলয়বাবু যেমনই হোক ওঁর বাবা রামমোহনবাবুর মতো মানুষ হয় না। এক কথার লোক। যেমন রোখ তেমনি ব্রড মাইন্ডেড। রামমোহনবাবুর সুনজরে পড়া ভাগ্যের কথা।

কিন্তু মলয়বাবু যদি আমাকে পছন্দ না করেন?

উনি কাউকেই পছন্দ করেন না। এখন তো একদম একা থাকেন। সন্ধেবেলা কয়েকজন বন্ধু আসে, তাদের সঙ্গে বসে ড্রিংক করেন বলে শুনেছি। উনি আপনাকে পছন্দ করবেন না এটা ঠিক। কিন্তু রামমোহনবাবু আপনার পক্ষে থাকলে ভয় নেই।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে অমিত বলল, মুশকিলে পড়া গেল দেখছি।

কিছু মুশকিল নয়, ভালোই হবে। জ্বর গায়ে বেশি টেনশন কিন্তু ভালো নয়। একটু ঘুমোন তো। জ্বরটা ছাড়ছে?

হ্যাঁ, ওষুধ খেলে জ্বর ছেড়ে যায়।

হ্যাঁ, প্যারাসিটামলের তো ওইটেই কাজ। একটু ঘুমিয়ে নিন।

অমিত ঘুমোল। নানারকম অস্বস্তিকর স্বপ্ন দেখল। ঘণ্টা দুয়েক বাদে তাকে টেনে তুলে জোর করে গা স্পঞ্জ করিয়ে দিল সুপর্ণা। লজ্জায় মরে গেল অমিত।

তারপর সুরুয়া খেতে হল। তারপর ভাত এল।

জ্বরে আজকাল ডাক্তাররা ভাত দেয়, না?

নিশ্চয়ই। ভাতের সঙ্গে জ্বরের কোনও সম্পর্ক নেই। নিশ্চিন্তে খান।

অমিত খেল।

সুপর্ণা পাশে একটা চেয়ার টেনে বসে বলল, আপনার কেউ নেই তো, না?

না। কেউ নেই।

আপনি অদ্ভুত মানুষ। বেশ জীবন আপনার।

## দুই

দশ দিনের মাথায় জ্বর ছাড়ল অমিতের। বন্ধুরা এতদিনে অনেক দূর চলে গেছে। কোনও খবর অবশ্য পায়নি অমিত। মনটা তাই একটু খারাপ লাগছিল। কাল রাতে বন্ধুদের নিয়ে একটা খারাপ স্বপ্ন দেখেছে। স্বপ্নটা ছিল, হাইওয়ের ধারে তিনটে ভাঙাচোরা দোমড়ানো সাইকেল আর তিনটে ছিন্নভিন্ন দেহ ছিটকে ছড়িয়ে পড়ে আছে। ওরা কারা তা চেনা যাচ্ছে না। আর অমিত প্রাণপণে চিৎকার করছে বন্ধুদের নাম ধরে ডেকে। রাতের নার্স কণিকাদি তাকে ডেকে তুলে পাশ ফিরিয়ে শোওয়ালেন।

ভোরবেলা অমিত টের পেল তার শরীর ঠান্ডা আর ভীষণ দুর্বল। গলা শুকনো।

কণিকাদি কপালে হাত দিয়ে বললেন, এই তো সেরে গেছ!

শরীরটা ভীষণ দুর্বল।

তা তো হবেই। বিছানা ছেড়ে উঠতে এখনও দেরি আছে। তবে তোমার স্বাস্থ্যটি ভালো, তাড়াতাড়িই উঠে পড়বে।

কণিকাদি জানলার পর্দাগুলো সরিয়ে দিলেন। বাইরে ভোরের রোদ ঝলমল করছে।

কাল রাতে কীসের স্বপ্ন দেখেছিলে বলো তো! মনে হল ভয় পেয়েছ।

খুব ভয় কণিকাদি, একটা অ্যাকসিডেন্টের স্বপ্ন! মনে হল আমার বন্ধুদের একটা ট্রাক যেন চাপা দিয়ে চলে গেছে।

ও কিছু নয়, বন্ধুদের কথা খুব ভাবছ তো, তাই।

হ্যাঁ, খুব ভাবছি।

শুনলাম, তুমি রামমোহনবাবুর কাছেই চাকরি করবে। সত্যি নাকি?

সেরকম একটা কথা আছে।

দেখলে তো, ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্য। তোমার যাওয়া হল না বটে, কিন্তু মস্ত একটা সুযোগ তো পেলে।

মৃদু একটু হাসল অমিত।

কণিকাদি তার জন্য প্রোটিনের গুঁড়ো দুধে মেশাতে মেশাতে বললেন, বউটা খুব পাজি ছিল। শাস্তিও হল সেইরকম।

কী বলছেন কণিকাদি?

কাউকে বোলো না আবার। রামমোহনবাবুর পালানো বউটা তো খুন হয়েছে শুনছি।

একটু চমকে উঠে অমিত বলল, কবে?

কাল সন্ধেবেলা। জি টি রোডের ধারে লাশ পাওয়া গেছে। পুলিশ এসেছিল অনেক রাতে।

অমিত অস্বস্তি বোধ করে বলে, খুন?

খুনই। গলার নলি কাটা অবস্থায় পাওয়া গেছে।

সর্বনাশ!

কীসের সর্বনাশ? কী যে পাজি ছিল বললে বিশ্বাস করবে না। ওর মা-টা তো আরও পাজি।

অমিত কাউকে চেনে না, সে চুপ করে থাকল।

কণিকাদি দুধের গেলাসটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, কর্তাবাবুর কত টাকাপয়সা আর সোনাদানা যে সরিয়েছে তার হিসেব নেই। আদায় করত, আবার চুরিও করত।

অমিত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ঘটনাটা শুনে তার ভালো লাগছে না। মনে হচ্ছে রামমোহনবাবু বোধহয় ঝামেলায় পড়বেন।

খুন করল কে কণিকাদি?

যে-ই করুক একটা ভালো কাজ করেছে।

অমিত বলল, আপনি কাকিমাকে পছন্দ করতেন না, না?

কাকিমা! কাকিমা আবার কে? ওই বদমাশ মেয়েকে আর কাকিমা বলে আদিখ্যেতা কোরো না। বাইজীর মেয়ে, কত আর হবে! কর্তাবাবুকে তুক করে রেখেছিল। আপদ গেছে বাবা।

পুলিশ এ বাড়িতে কেন এসেছিল?

আসবে না? একটা খুন হলে খোঁজখবর তো করতে হয়।

অমিত দুধটা খেয়ে বিস্বাদে মুখটা বিকৃত করে বলল, তা বটে।

বিছানাটা টানটান করে দিয়ে কণিকাদি বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

একটু বাদেই সুপর্ণা এল। সুপর্ণা যখনই আসে তার মুখে একটা সুন্দর হাসি থাকে। চোখ দুটোও যেন কথা কয়। আজ সুপর্ণার মুখে হাসি ছিল না। চোখে উদ্বেগ। বোধহয় খবরটা শুনেছে।

অমিত বলল, আজ আপনি খুব গম্ভীর।

সুপর্ণা গায়ের চাদরটা ভাঁজ করে রেখে হাত মুখ ধুয়ে নিতে বাথরুমে গেল। জবাব দিল না।

ফিরে এসে বলল, ঘটনা ঘটেছে।

জানি। পুলিশ এসেছিল।

পুলিশ আজও এসেছে এবং আপনার কাছেও আসবে।

অমিত অবাক হয়ে বলে, আমার কাছে! আমার কাছে কেন?

রামমোহনবাবুর স্ত্রী যেদিন পালিয়ে যান সেদিন সেদিন আপনারা এ বাড়িতে ছিলেন।

হ্যাঁ, তাকে কী?

কে জানে কী! শুনে এলাম ওরা আপনাকেও জেরা করতে চায়।

অমিত জীবনে কখনও পুলিশের মুখোমুখি হয়নি। উদ্বেগের সঙ্গে বলল, আমি তো কিছুই জানি না।

সেটাই বলবেন, আজ সকালে আপনাকে ফলের রস খেতে হবে কিন্তু।

আর ফলের রস! কী ঝামেলা হল বলুন তো!

আপনার আবার ঝামেলা কীসের? যা জানতে চায় বলে দেবেন। আপনার তো লুকোনোর কিছুই নেই।

রামমোহনবাবু কোথায়?

পুলিশ তাঁকে জেরা করছে।

অমিত একটু চুপ করে থেকে বলল, পুলিশ জাতটা খুব সন্দেহপ্রবণ।

তাই নাকি? কী করে জানলেন?

আমি যে পাড়ায় থাকি সেখানে একটা বউ গায়ে আগুন দিয়ে পুড়ে মারা যায়। তাও তার বাপের বাড়িতে। তবু পুলিশ তার স্বামীকে খুব হ্যারাস করেছিল। তখনই শুনেছি বউ খুন হলেই নাকি স্বামীকে সন্দেহ করাই নিয়ম।

সুপর্ণা একটু হাসল, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাই হয় যে। পুরুষগুলো ভীষণ পাজি।

রামমোহনবাবুও কি পাজি?

তা মোটেই বলিনি। উনি ভীষণ ভালো। আপনি একটু দুষ্টু আছেন।

তাই নাকি?

একটা রস করার ঘূর্ণিকলে মুসুম্বির টুকরো ফেলে চালিয়ে দিল সুপর্ণা। চোখের পলকে রস হয়ে গেল। কল-কব্জার যুগই এটা বটে! অমিত দেখল মেশিনটার এক মুখ দিয়ে রস অন্য মুখ দিয়ে ছিবড়ে বেরিয়ে গেল।

রসটা ছেঁকে গেলাসটা তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে সুপর্ণা বলল। জ্বর তো ছেড়ে গেছে। এখন কী হবে?

কী আর হবে। বেহালায় ফিরে যাব।

ও মা! বেহালায় ফিরবেন কেন? রামমোহনবাবুর গ্যারেজের কী হবে?

অমিত মাথা নেড়ে বলল, ওটা আর হবে বলে মনে হয় না, ঝামেলা পাকিয়ে গেল যে।

রামমোহনবাবুর ঝামেলারই কপাল। চিরকাল ওঁকে ঝামেলা ঝঞ্ঝাট পুইয়ে বড় হতে হয়েছে। সহজে হার মানার পাত্র নন। এসব ঘটনা ওঁর কাছে কিছুই নয়।

তার মানে কি রামমোহনবাবুর জীবনে এরকম অনেক ঘটনা আছে?

তাও বলিনি। আমি বলেছি মানুষকে বড় হতে গেলে অনেক বাধা-বিপত্তি পার হয়েই হতে হয়।

ওঁর স্ত্রী কেমন মানুষ ছিলেন?

সুপর্ণা ভ্রু কুঁচকে বলল, তার আমি কী জানি?

অমিত ভয়ে আর সুপর্ণাকে কোনও প্রশ্ন করল না।

দু'তিন মিনিট দুজনেই চুপচাপ। সুপর্ণা রস করবার মেশিনটা পরিষ্কার করছিল। অমিত হাই তুলছিল। বাইরে দু'জোড়া বুটের শব্দ শোনা গেল। দরজায় নক। তারপরই দুজন পুলিশের পোশাক পরা লোক ঘরে ঢুকে দাঁড়াল।

সামনের জন লম্বা-চওড়া সুপুরুষ। পিছনের জনও তাগড়াই, তবে কালো এবং কর্কশ চেহারার।

সামনের জন তাকেই জিগ্যেস করল, আপনিই কি অমিত চৌধুরী?

আজ্ঞে হ্যাঁ, গলাটা একটু কেঁপে গেল অমিতের।
আপনি কতদিন অসুস্থ?
দশ-বারো দিন হবে।
রামমোহনবাবু আপনার কেউ হয়?
না। আমার বন্ধুর কাকা।
ও।
সুপর্ণা চেয়ার এগিয়ে দিলে ভদ্রলোক বসলেন। পিছনের জনকে একটা টুল এগিয়ে দিল সুপর্ণা, কিন্তু লোকটা বসল না।
নোটবই আর ডটপেন বাগিয়ে লোকটা বলল, যেদিন ঘটনাটা ঘটে আপনি সেদিন এ বাড়িতে ছিলেন?
কোন ঘটনাটা?
যেদিন রামমোহনবাবুর স্ত্রী এ বাড়ি থেকে চলে যান।
আমি ঘটনাটার কথা কিছু জানি না। তবে শুনেছি।
কী শুনেছেন?
শুনেছি উনি চলে গেছেন।
আপনারা কখন এ বাড়িতে পৌঁছোন?
সন্ধেবেলা।
কোনও ঝগড়া-ঝাঁটি বা চেঁচামেচি হয়েছিল?
না তো!
কোনও অস্বাভাবিক কিছু দেখেননি?
না।
কিচ্ছু না। মনে করে দেখুন।
একটু দ্বিধা করল অমিত। মাঝরাতে তাদের ঘরে মধ্যবয়স্কা একজন মহিলা ঢুকে আলমারি থেকে কিছু নিয়ে যান। কিন্তু কথাটা বলার মানেই হয় না।
সে বলল, না।
আপনি একটু ফলটার করলেন, কেন?
ভালো করে ভেবে দেখলাম।
রামমোহনবাবুর স্ত্রীকে আপনি দেখেছেন?
না। উনি আমাদের সামনে আসেননি।
সেটাও তো অস্বাভাবিক ব্যাপার। তাই না?
তা তো জানি না। আমরা বাইরের লোক, আমাদের সামনে নাও আসতে পারেন।
আপনার সেই রাতেই অসুখ করেছিল?
হ্যাঁ। খুব জ্বর হয়েছিল।
আপনি তো একজন মোটর মেকানিক?
আজ্ঞে হ্যাঁ।
রামমোহনবাবুর সঙ্গে সম্পর্কও নেই! তাহলে আপনাকে এত খাতির-যত্ন করা হচ্ছে কেন বলুন তো! এটা মুখ বন্ধ করার জন্য নয় তো! আপনি হয়তো সেই রাতে কিছু দেখেছিলেন বা শুনেছিলেন।
না। রামমোহনবাবু এত জ্বর দেখে আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন।
হাসপাতাল ছিল। ওঁর নার্সিং হোমও আছে। বাড়িতে রাখলেন কেন?
তা তো জানি না।

ব্যাপারটা খুবই অস্বাভাবিক। তাই না?
আমি কিছু বুঝতে পারছি না। ওরকম ভাবে ভাবিনি।
আচ্ছা, রেস্ট নিন। আবার দেখা হবে। একটা কথা বলে যাই, বর্ধমান ছাড়তে হলে আমাদের না জানিয়ে যাবেন না। তাহলে অ্যারেস্ট করতে হবে।
সে কী! আমি তো কিছু করিনি।
আপনাকে আমাদের দরকার। ভালো কথা, আপনি কি জানেন যে রামমোহনবাবুর স্ত্রী রিনি খুন হয়েছেন?
জানি।
কী করে জানলেন?
শুনেছি।
কার কাছে শুনলেন?
সবাই বলাবলি করছে।
কীভাবে খুন হয়েছেন তা জানেন?
শোনা কথা। গলা কাটা হয়েছিল।
বাঃ, সবই তো জানেন দেখছি।
পুলিশরা এর পর সুপর্ণার দিকে মনোযোগ দিল।
আপনি কে?
নার্স।
এই ছেলেটির নার্সিং করছেন?
হ্যাঁ।
বাঃ, বেশ ভালো ব্যবস্থা তো। সামান্য জ্বরের জন্য নার্সও লাগে নাকি?
এঁর টাইফয়েড হয়েছিল।
হলেই বা। টাইফয়েড তো কোনও মারাত্মক রোগ নয়। আপনার ট্রেনিং আছে?
হ্যাঁ। আমি রামমোহনবাবুর নার্সিং হোম-এ আছি।
বেশ বেশ। বলে অফিসারটি গা-জ্বালানো হাসি হাসলেন।
সুপর্ণার মুখটা একটু কঠিন হয়ে গেল। কিছু বলল না সে।
অফিসারটি একটু চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, আপনি কি এখানে নাইট ডিউটিও করছেন?
সুপর্ণা খুব নরম গলায় বলল, না। আমার ডিউটি সকালে।
রাতে কে থাকে?
আর একজন।
আপনি রামমোহনবাবুর নার্সিং হোমে কতদিন আছেন?
দু বছর।
বাড়ির ঠিকানা?
বড় নীলপুর। সুবিনয় বিশ্বাসের বাড়ি।
অফিসার একটু চমকালেন, সুবিনয় বিশ্বাস?
হ্যাঁ।
কোন সুবিনয়?
আমার বাবা কলকাতায় পুলিশের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার ছিলেন।
অফিসারটি সামান্য লজ্জিত হয়ে বললেন, আপনি সুবিনয়দার মেয়ে! কী আশ্চর্য!
সুপর্ণা কিছু বলল না, চুপ করে রইল।

অফিসারটি উঠে দাঁড়িয়ে সুপর্ণাকে বললেন, আপনার বাবা আমাকে চেনেন। গৌরাঙ্গ ঘোষ বললেই চিনবেন। আপনাকেও আমি ছোট দেখেছি।

আমার বাবা বেঁচে নেই।

আহা, কবে মারা গেছেন?

মাস ছয়েক হল।

হি ওয়াজ এ ভেরি অনেস্ট ম্যান। আচ্ছা, আজ যাচ্ছি। পরে দেখা হবে।

পুলিশ চলে যাওয়ার পর অমিত বলল, আপনি পুলিশের মেয়ে বলেই পুলিশকে ভয় পাচ্ছিলেন না। কিন্তু আমার এত নার্ভাস লাগছে। সত্যিই তো, আমার মতো একজন সামান্য মানুষকে রামমোহনবাবু এত খাতির করছেন কেন?

ওটা নিয়ে আপনি ভাববেন কেন?

পুলিশ বোধহয় আমাকে সন্দেহ করছে।

সন্দেহ করাই পুলিশের কাজ। গা-জ্বালানো প্রশ্ন করে ওরা লোককে নার্ভাস করে দিতে চায়। ঘাবড়াবেন না।

আমি কখনও এরকম পরিস্থিতিতে পড়িনি। তাই ভয় হচ্ছে। আমি একটা ঘটনা দেখেছিলাম। আপনাকে বলব?

বলুন না।

যেদিন রামমোহনবাবুর স্ত্রী পালিয়ে যান সেদিন অনেক রাতে জ্বরের জন্য আমার ঘুম ভেঙে যায়। একজন মধ্যবয়স্কা সুন্দরী মহিলা আমাদের ঘরে ঢুকেছিলেন। একটা আলমারি খুলে কিছু একটা বের করে নিয়ে চলে যান।

সুপর্ণা অবাক হয়ে বলে, এ কথাটা পুলিশকেও বলতে পারতেন।

ভয় করছিল। কোন ফ্যাকড়া বের করে ফেলে কে জানে।

আপনি সত্যিই ভীতু।

তাহলে কি বলব পুলিশকে?

সুপর্ণা একটু ভেবে বলল, বরং ঘটনাটা আপনি রামমোহনবাবুকে আগে বলুন। হয়তো মহিলা কিছু সরিয়ে নিয়ে গেছেন।

ভদ্রমহিলা কে জানেন?

আন্দাজ করা শক্ত নয়। রিনির মা।

উনি কি বাইজী ছিলেন?

এত খোঁজে আপনার দরকার কী?

সুপর্ণার গম্ভীর মুখ দেখে ভয় পেয়ে গেল অমিত। সুপর্ণা এমনিতে সাদামাটা কিন্তু মাঝে মাঝে মেয়েটার মধ্যে যেন ইস্পাত ঝলসে ওঠে।

সুপর্ণা কিছুক্ষণ আপনমনে টেবিলটা গোছাল। তারপর দু'মিনিটের জন্য বাইরে থেকে ঘুরে এল। তারপর বলল, কাল থেকে কিন্তু আমি আসব না।

অমিত অবাক হয়ে বলে, কেন?

সুপর্ণা ভ্রুভঙ্গি করে বলে, আমাকে আর কীসের দরকার। অসুখে নার্স লাগে। ভালো হয়ে গেলে তো আর লাগে না।

ওঃ, তাই তো। বলে অমিত হেসে ফেলল, আমি এমন বোকা।

তা বোকা একটু আছেন।

হ্যাঁ, আমি বেশ বোকা। আপনি এখন থেকে নার্সিংহোমে ডিউটি করবেন তো?

হ্যাঁ। কেন?
এমনিই। আমিও বোধহয় কাল বা পরশু চলে যাব।
কাল পরশু পারবেন না। শরীর কতটা দুর্বল তা কি টের পাচ্ছেন না?
পাচ্ছি। তবে আমি পারব।
ঠিক আছে। রামমোহনবাবুর সঙ্গে কথা বলে দেখবেন।
সুপর্ণা আজ একটু গম্ভীর হয়ে আছে। অন্য দিনের মতো মুখটা হাসিখুশি নয়। অমিতও আর ঘাঁটাল না।
রামমোহনবাবু এলেন বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ।
কেমন আছ আজ?
অমিত কৃতজ্ঞ গলায় বলল, ভালো আছি। জ্বর নেই।
বাঃ বেশ। পুলিশ একটু বিরক্ত করেছে তো তোমাকে?
না, বিরক্ত কিছু নয়।
রামমোহনবাবু একটু হেসে বললেন, বউ খুন হলেই স্বামীদের সন্দেহ করাটাই নিয়ম। রিনিকে খুন করার আরও কারণ তো আমার আছেই। কাজেই আমার খুব হয়রানি যাচ্ছে।
অমিত সমবেদনার সঙ্গে চুপ করে রইল।
রামমোহনবাবু ধীর গলায় বললেন, এসব নিয়ে ভেবো না বা ঘাবড়ে যেওনা। জীবনটা অনেক বড় এবং খুব বিচিত্র। বুঝলে?
আজ্ঞে।
সুপর্ণা, অমিত কবে ছুটি পেতে পারে বলো তো!
তিন-চার দিন লাগবে।
তাহলে ওকে রুগীর ঘরে ফেলে না রেখে অন্য ঘরে শিফট করে দিলেই তো হয়।
স্পঞ্জ করা বা মাথা ধোয়াতে এ ঘরেই সুবিধে। দু দিন এখানেই থাকুন।
তাই হোক তাহলে। অমিত, তুমি মনস্থির করেছ তো?
কীসের?
আমার গ্যারেজের ভার নেবে যে!
যে আজ্ঞে।
তাহলে তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে ওঠো। চিয়ার আপ।
রামমোহন চলে যাওয়ার পর অমিত একটু অন্যমনস্ক হয়ে রইল। একটা অল পারপাস গ্যারেজ করার পিছনে আর কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে? লোকটা নিশ্চয়ই কল্পানিবিলাসী নয়। কী মতলব তাহলে?
অত কী ভাবছেন?
অমিত মৃদু কণ্ঠে বলল, অনেক কিছু।
ভাবুন। আমি একটু ঘুরে আসছি।
সুপর্ণা চলে যাওয়ার পর অমিত সাহস করে তার খাট থেকে নামল। দুর্বল বটে, কিন্তু সাঙ্ঘাতিক কিছু নয়। সাবধানে পা ফেলে সে করিডোরে এসে দাঁড়াল। একদিকে ঘষা কাচের শার্সি, অন্য ধারে বন্ধ দরজার তিনটে ঘর। নির্জন করিডোরের মাঝামাঝি ডান ধারে একটা দরজা। হাতলটা ঘুরিয়ে ঠেলতেই খুলে গেল। সামনে খোলা বারান্দা, ফুরফুর করছে শীতের বাতাস আর রোদ। সামনে ফাঁকা জমি। জমি ঘিরে নিবিড় কয়েকটা গাছ। লন-এ নেমে একটু ঘোরাঘুরি করল অমিত। তার দাড়ি খুব বেড়েছে, কুটকুট করছে। চুলও বেশ লম্বা হয়েছে। সে কি আজ দাড়ি কাটতে অনুমতি পাবে? বোধহয় এরা আপত্তি করবে, থাকগে তাহলে?
ফটকের কাছ বরাবর আউটহাউসটা সে দেখতে পাচ্ছিল। আউটহাউস কেন বলা হয় তা সে জানে না। দিব্যি মাঝারি একটা দোতলা বাড়ি। বেশ অনেকটা ব্যারাকবাড়ির মতোই লম্বা। বাড়িটার মাঝখান দিয়ে

সদরের ফটক। অত বড় বাড়ির কী দরকার ছিল ফটকের দুপাশে কে জানে?

এই বাড়িটায় খেয়ালী রাজপুত্র থাকে। তার নাম মলয়। ওই মলয়ের মন বুঝেই তাকে চলতে হবে। পারবে কি অমিত?

তাকিয়ে থাকতে থাকতেই হঠাৎ দেখতে পেল ফটক দিয়ে একটা সাদা ফিয়াট গাড়ি সাঁ করে ভিতরে এসে বাড়িটার সামনে থামল। গাড়ি থেকে একজন কালো মোটাসোটা লোক নেমে এল। বাবরি চুল। পরনে গ্রে রঙের সুট। মুখে একটু গাম্ভীর্য বা বিরক্তি। লোকটা ধীর পায়ে ভিতরে ঢুকে গেল। উনিই কি মলয়?

একটু সাহস সঞ্চয় করে অমিত এগিয়ে গেল। লনটা পেরিয়ে ফিয়াট গাড়িটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। গাড়িটা খুব নতুন নয়, কিন্তু দারুণ রক্ষণাবেক্ষণে রয়েছে। বডি চকচক করছে। ড্যাশবোর্ডের প্যানেলটা বোধহয় পাল্টানো হয়েছে সম্প্রতি। কুলার লাগানো আছে। গদিটদি বেশ ভালো ভেলভেটে মোড়া।

ভুঁইভোড় একটা লোক কোথা থেকে সামনে উদয় হয়ে বলল, আপনি কে বলুন তো! এখানে কী করছেন?

অমিত দেখল, বেশ মস্তান টাইপের চেহারার ছিপছিপে কালো রঙের এক ছোকরা।

অমিত অন্যায় কিছু করেনি। শান্ত গলায় বলল, গাড়িটা একটু দেখছিলাম।

এ বাড়িতে তো আপনাকে আগে দেখিনি।

না। আমি কলকাতায় থাকি। এখানে এসে অসুখ হওয়ায় রামমোহনবাবু রেখে দিয়েছিলেন।

ছোকরা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, অ, সেই মোটর মেকানিক?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

খুব মজায় ছিলেন তো!

তা বটে।

লাকি ডগ। অসুখ কি সেরে গেল নাকি?

লোকটার কথাবার্তা চাঁছাছোলা হলেও অমিতের খুব একটা খারাপ লাগছিল না। সে একটু হেসে বলল, আপনি কি এ বাড়ির লোক?

এ বাড়ির লোক-ফোক নই। আসি যাই, আমার নাম স্বপন বণিক।

অমিত বলল, ও।

আপনি কোথাকার মোটর মেকানিক?

বেহালার একটা বড় গ্যারেজে কাজ করি।

ছোকরা তাকে একটু চোখে মেপে নিয়ে বলল, ভুখখা পার্টি নাকি?

অমিত ফের হাসল, তাই বটে। আমি নিতান্তই গরিব।

গ্যারেজে তো পয়সা আছে।

মালিকের কাছে। আমরা তো সামান্য মাইনে পাই।

দু নম্বরি নেই?

আমার ওসব নেই।

ছোকরা হঠাৎ গাড়ির ড্রাইভারের দিককার দরজাটা খুলে বলল, উঠুন।

অমিত অবাক হয়ে বলে, কেন?

আরে উঠে পড়ুন না।

না না, সে কী?

আরে মশাই মলয়দার গাড়ি মানে আমারও গাড়ি। উঠুন, কেউ কিছু বলবে না।

উঠে কী করব?

একটু চালাবেন। ভয় নেই, আমি সঙ্গে থাকব। চালিয়ে বলতে হবে গাড়িটার কি কি ডিফেক্ট আছে। পারবেন?

অমিত খুব অস্বস্তি বোধ করে বলল, আজই আমার জ্বর ছেড়েছে। আমি পারব চালাতে?

একটা রাউন্ড দেবেন। পরিশ্রম তো আর হবে না, উঠুন।

অগত্যা অমিত উঠল। ছোকরাটি উঠে পাশে বসে বলল, স্টার্ট দিন।

চাবি ড্যাশবোর্ডে লাগানোই ছিল। অমিত গাড়িটা স্টার্ট দিল। চমৎকার স্টার্ট নিল গাড়ি। ধীরে গাড়িটা ঘুরিয়ে ফটকের বাইরে এনে ফেলল অমিত। সামনে ঘিঞ্জি রাস্তা। রিকশা, মানুষ, সাইকেলের বিশ্রী ভিড়। সে সাবধানে গাড়িটা বাঁ ধারে চালিয়ে নিতে লাগল।

কেমন লাগছে?

ভালো। তবে ডিফারেনসিয়ালে একটা আওয়াজ আছে।

আর?

ইঞ্জিনটা হট আপ করা। পিক আপ ভালো, কিন্তু স্পিড বেশি।

আর?

আর সব ঠিকই আছে বোধহয়।

চালান।

বেশ অনেকটাই চালাতে হল অমিতকে। স্বপন রাস্তা বলে দিচ্ছিল। একবার হঠাৎ জিগ্যেস করল, সুপর্ণার সঙ্গে কেমন জমেছে?

অমিত অবাক হয়ে বলে, মানে?

মানে আর কী! বলে স্বপন একটু হাসল।

অমিত সামান্য অস্বস্তি বোধ করে বলল, আমি কিন্তু সামান্য একজন মোটর মেকানিক। আমার বিত্ত-বৈভব কিছু নেই। আমাকে ওরকম করে বলবেন না, প্লিজ!

ছিলেন তো পুঁটি মাছ, সে আমরা জানি, কিন্তু রামমোহনবাবু তো আপনাকে রাঘববোয়াল করে তুলেছেন।

সেটা ওঁর দয়া। তবে উনি আমাকে মেকানিক হিসেবেই চাকরি দিচ্ছেন। তার বেশি কিছু নই।

আরে মশাই, ঘাবড়াচ্ছেন কেন? সুপর্ণা এমন কিছু সাঙ্ঘাতিক মেয়ে নয়। ওর বাবা পুলিশের ভালো অফিসার ছিল বটে, কিন্তু টাকা করতে পারেনি।

অমিত করুণ গলায় বলল, এসব কথা কেন বলছেন?

বলছি, আপনাকে সাহস দেওয়ার জন্য।

জিটি রোডে উঠে শহরের বাইরের দিকে গাড়িটা কিছুক্ষণ চালিয়ে নিল অমিত। তারপর বলল, এবার কি ফিরব?

হ্যাঁ। আমি আপনার হাতটা একটু দেখলাম।

অমিত হাসল। বলল, মেকানিককে গাড়ি চালাতেই হয়।

ফেরার পথে স্বপন হঠাৎ বলল, মলয়দার সঙ্গে আলাপ হয়নি?

না, আমি তো জ্বরে পড়েছিলাম।

মলয়দা সম্পর্কে কিছু শোনেননি?

অমিত মিথ্যে করে বলল, না তো!

কেউ বলেনি আপনাকে যে, মলয়দা একটা বাজে টাইপের লোক। মাতাল, দুশ্চরিত্র, খেয়ালি!

না না। আমার কানে কিছু আসেনি।

না শুনে থাকলে এবার শুনবেন। অনেক কথা কানে আসবে।

আমার শুনে কী হবে?

শুনে রাখা ভালো। মলয়দাকে টার্গেট করেই তো গ্যারেজটা হচ্ছে। আপনাকে ওর সঙ্গেই কাজ করতে হবে হয়তো, যদি অবশ্য মলয়দা রাজি হয়।

সেরকম একটা কথা রামমোহনবাবু বলেছিলেন।

তাহলে তৈরি থাকুন। মলয়দাকে ম্যানেজ করা সোজা কাজ নয়।

অমিত ফের অস্বস্তি বোধ করে বলল, মোটর গ্যারেজে উনি কী করবেন? গ্যারেজ আর এমন কী একটা ভালো জায়গা?

আপনি কি ভাবছেন যে, রামমোহনবাবু একটা সাধারণ গাড়ি মেরামত করার দোকান করছেন? তা নয়। এ গ্যারেজে ভিন্টেজ কার থেকে শুরু করে নানারকম টেকনোলজি নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট হবে। মডার্ন টেকনোলজি নিয়ে গবেষণারও কথা আছে। রামমোহন শেষ অবধি একটা গাড়ি তৈরির কারখানা করতে চান।

ও বাবা!

অবাক হওয়ার কিছু নেই। উনি এরকম অনেক স্বপ্ন দেখেন। বেশির ভাগই ফলে না। তবে টাকা ওড়ে। কিছু কামিয়ে নিতে পারেন।

অমিত বলল, কামিয়ে নেবো?

তাইতো বলছি, রামমোহনের অনেক প্রজেক্ট উঠে গেছে, কিন্তু বেশ কিছু লোক গুছিয়ে নিয়েছে।

কিন্তু তাহলে উনি এখনও এত বড়লোক থাকেন কী করে?

কপাল। ওর একটা যায় তো আর একটা আসে। লোকটার বিজনেসের মাথা দারুণ। টাকার গন্ধ পায়।

অমিত একটু ভেবে বলল, উনি কি খুব খেয়ালি?

একটু আছেন।

একটা কথা জিগ্যেস করব?

করুন না!

আপনি কি মলয়বাবুর বন্ধু?

স্বপন একটু হাসল। বলল, বন্ধুর মতোই, বডিগার্ডও বলতে পারেন।

ওঁর কি বডিগার্ড দরকার হয়?

হয়, মলয়দার শত্রু বা বন্ধু কোনওটারই অভাব নেই।

স্বপনের দিকে আড়চোখে একটু তাকাল অমিত। ছেলেটা মস্তান টাইপের। বেশ চালাক-চতুর। সাহসও হয়তো আছে।

স্বপন বলল, খুনের খবরটা শুনেছেন?

শুনেছি।

পুলিশ তো আপনাকেও জেরা করেছে?

হ্যাঁ।

কী জিগ্যেস করল?

মামুলি সব কথা। আমি তো কিছুই জানি না। ভদ্রমহিলাকে চোখেই দেখেনি।

সত্যি বলছেন?

মিথ্যে বলতে যাব কেন? কী লাভ?

স্বপন একটু চুপ করে থেকে বলল, বহুৎ মাল খসিয়ে গেছে।

কী বললেন?

বলছি হারামি মেয়েছেলেটার কথা। ওর মা-টা আরও নষ্টা।

অমিত চুপ করে থাকে।

বাড়িতে এসে স্বপন বলল, ঠিক আছে। এবার ঘরে যান।

অমিতের দুর্বল লাগছিল। ঘরে এসেই সে শুয়ে পড়ল।
সুপর্ণা ঘরে ঢুকে গম্ভীর মুখে বলল, কোথায় গিয়েছিলেন?
একটু বাইরে।
স্বপন বণিকের সঙ্গে?
হ্যাঁ।
কেন? ওকে কি আপনি চেনেন?
না, চেনা হল?
কী রকম চেনা হল?
যেমন হয়।
সুপর্ণা যেন খুশি হল না। বলল, হুট করে গাড়ি চালানো ঠিক হয়নি। আপনার ব্যালান্স নেই। কতদিন শুয়ে আছেন বলুন তো!
ওই ছেলেটা কি একটু গুণ্ডা টাইপের? এমন হুকুম করে কথা বলছিল যে আমার একটু ভয় ভয় লাগছিল।
সুপর্ণা মুখটা বিকৃত করে বলল, ছেলেটা ভালো নয়। আপনাকে কি অপমান করছিল?
না, তা নয়, তবে একটু র‍্যালা নিচ্ছিল।
বেশি পাত্তা দেবেন না।
আপনাকে একটা কথা বলব?
বলুন না।
শুনলে আপনি রেগে যাবেন না তো!
রাগার মতো কথা বললে রাগব। কী কথা?
রাগলে বলার দরকার কী?
সুপর্ণা একটু হেসে বলল, আচ্ছা রাগব না। অন্তত রাগটা প্রকাশ করব না।
সেটাও খারাপ। আমার মনে হল স্বপন বণিক আপনার সম্পর্কে একটু ইন্টারেস্টেড।
সুপর্ণা একটু যেন চমকে এবং থতমত খেয়ে তার দিকে চেয়ে বলল, কী বলছিল?
ওর ভাষাজ্ঞান নেই, আমাকে জিগ্যেস করল, সুপর্ণার সঙ্গে কেমন জমেছে? আমি বললাম, আমি গরিব মোটর মেকানিক, পেটে বিদ্যে নেই, আমার কি ওসব সাজে?
সুপর্ণা একটু স্তব্ধ থেকে বলল, এত কথা হয়েছে?
হ্যাঁ, আপনি রাগ করলেন না তো!
রাগ করলে আপনার কী?
দোষটা তো আমার নয়। ও বলছিল, আমি সেটাই বললাম।
ঠিক আছে। রাগ করিনি। তবে সামান্য মোটর মেকানিক বলে ওসব লোকের কাছে হাত কচলানোটাও উচিত নয়।
হয়তো ভেবেছে আমি কোনও সুযোগ নিচ্ছি। কিন্তু আমার যে সে যোগ্যতাই নেই সেটা তো জানে না।
যোগ্যতা নেই বুঝি! বলে সুপর্ণা একটু হাসল। তারপর বলল, স্বপন খারাপ ছেলে। কিন্তু ওর দু-একটা গুণও আছে। সাঙ্ঘাতিক বুদ্ধি আর মলয়দার প্রতি ভালোবাসা। এ দুটোর জোরে টিঁকে আছে।
মনে হচ্ছে ছেলেটা আমাকে একটু ইনফ্লুয়েন্স করতে চায়। কেন তা বুঝতে পারছি না।
এখন ওসব নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই। খেয়ে একটু ঘুমোন।
আবার ঘুম! কত ঘুমোব বলুন তো! আমার যে শয্যাকণ্টকী হওয়ার অবস্থা।
সুপর্ণা একটু হেসে বলল, তা ঠিক, তবে এ সময়ে রেস্টও দরকার।
আমি কিন্তু কাজ করতে ভালোবাসি।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। কাজ ভালোবাসি বলে মোটরগাড়ির যন্ত্রপাতি আমি খুব ভালো চিনি। কাজ করতে করতেই আমার রেস্ট হয়। শুয়ে বসে থাকলে হয় না।

ভালোই তো, কিন্তু এখন তো আপনাকে আমি মোটরগাড়ির কাজ দিতে পারব না।

লজ্জা পেয়ে অমিত বলল, আমি কি তাই বললাম! আসলে আর শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে না। আমার বন্ধুদের কথা খুব মনে পড়ছে। এখন ওরা কত দূরে চলে গেছে বলুন তো।

সুপর্ণা মায়াভরা চোখে চেয়ে বলে, তা ঠিক।

## তিন

জি টি রোডের ওপর, শহরের বাইরে রামমোহনবাবুর মস্ত কোল্ড স্টোরেজ। তার পাশেই অনেকটা জমি। সেখানেই গ্যারেজ হওয়ার কথা। রামমোহন অমিতকে জায়গাটা দেখাতে নিয়ে গেলেন দিন দুই পর। গাড়ি থেকে নেমে কাঁটাতারে ঘেরা এবড়ো-খেবড়ো জমিতে ঢুকে অমিত দেখল জমির অর্ধেকটা জলে ডোবা। বাকি অর্ধেক জমিতে জঙ্গল। সে বলল, জায়গা তো ভালোই, কিন্তু—

রামমোহনবাবু গম্ভীর গলায় বলেন, কিন্তু কী?

এত বড় জমি তো লাগবে না।

রামমোহনবাবু একটু চুপ করে যেন কিছু ভাবলেন। তারপর বললেন, আমার প্ল্যানটা তোমাকে বলি। সরকারের কাছে অনেকদিন ধরে আমি একটা মোটরগাড়ি তৈরির কারখানা খোলার লাইসেন্স চাইছি। ফরেন কোলাবোরেশনেরও কথা অনেকদূর এগিয়েছে। কিন্তু সরকার লাইসেন্স দিতে চায় না। কেন চায় না তার অনেক কারণ আছে। আমি ঠিক করছি প্রাইভেটলি কিছু নতুন ধরনের গাড়ির নমুনা তৈরি করি।

অমিত মনে মনে প্রমাদ গুনল। এই সফল ব্যবসায়ী ধনী মানুষটির ভিতরে যে একটা পাগলামিও আছে তা সে টের পাচ্ছে।

মিনমিন করে সে বলল, সে তো ভালো কথা, কিন্তু তাতে আবার অনেক টাকা ঢালতে হবে। ম্যানুফ্যাকচারিং তো বিরাট ব্যাপার।

আমি সেই ব্যাপারটাই জানতে চাই তোমার কাছে। ধরো যদি দু-চারটে ফ্যান্সি কার তৈরি করা যায় তাহলে কেমন হয়?

গাড়ির ইঞ্জিন তো বাজার থেকেই কিনতে হবে। ইঞ্জিন তৈরি করা তো সহজ নয়।

তা বটে। যদি পুরোনো গাড়ি কিনে সেটা রিমডেলিং করা যায়?

সেটা হতে পারে।

ইঞ্জিনকে ফুয়েল এফিসিয়েন্ট আর ফুলপ্রুফ করার কাজটা যদি করা যায়, তাহলে পারবে সেটা?

অমিত মাথা চুলকে বলল, এসব অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়াররা বলতে পারবে। আমি সামান্য মেকানিক।

আমার তো ধারণা ছিল মেকানিকদেরই অভিজ্ঞতা বেশি।

আমরা চালু মডেলগুলো চিনি। মেরামতও পারি। কিন্তু ইঞ্জিন রিমডেলিং করা অন্য ব্যাপার।

একটু হতাশ হয়ে রামমোহন বললেন, তুমি তাহলে পারবে না।

মনে হচ্ছে পারব না।

রামমোহন শূন্য দৃষ্টিতে সামনের বিশাল জমিটার দিকে চেয়ে থেকে বললেন, আমার খুব শখ ছিল অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রি করি। সেটা সম্ভব নয় বলে নতুন একটা ভেনচারে যাওয়ার কথা ভাবছিলাম।

অমিত লজ্জিতভাবে চুপ করে রইল।

আরও একটু ভেবে দেখ।

ভাবব, তবে কাজটা কঠিন হবে।

রামমোহন আরও কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, চলো, ফেরা যাক।

ফেরার পথে রামমোহন একটিও কথা বললেন না। অমিত মনে মনে খুব দমে গেল। সে বুঝতে পারছিল, গ্যারেজটা হবে না। আর গ্যারেজ না হলে চাকরিও তার হওয়ার নয়।

রামমোহনবাবুর বাড়ির আউট হাউসে থাকার একটা ব্যবস্থা হয়েছে। সেই ঘরে একখানা নেয়ারের খাটিয়ায় চাদর পাতা। কম্বল অমিতের সঙ্গেই ছিল। ব্যাকপ্যাকে সব রকম ব্যবস্থাই থাকে। কিন্তু রামমোহনবাবুর অতিথি হয়ে আর থাকার কোনও মানেই খুঁজে পাচ্ছে না সে। চাকরির নিশ্চয়তা না থাকলে এখানে পড়ে থেকে অন্যের অন্ন ধ্বংস করে লাভ কী?

গভীর রাত অবধি জেগে থেকে সে অনেক ভাবল। তারপর ঘুমোলো। ঠিক করল, পরদিনই এক ফাঁকে কাউকে কিছু না জানিয়ে এখান থেকে চলে যাবে।

অসুখ সেরে যাওয়ার পর থেকে এ বাড়িতে তার আদর-যত্ন কিছু কমেছে। আউট হাউসের অন্যান্য ঘরে রামমোহনের এস্টেটের অনেক কর্মচারি থাকে। তাদের জন্য ঢালাও ব্যবস্থা আছে। সকালে পাঁউরুটি আর কলা, দুপুরে ভাত ডাল তরকারি, রাতে রুটি আর একটা তরকা। ঘরে ঘরে এসে কাজের লোকেরা পৌঁছে দিয়ে যায়।

সকালে অমিত যখন তার জলখাবার শেষ করে চা খাচ্ছিল তখন স্বপন বণিক এসে দরজায় দাঁড়াল।

এই যে অমিতবাবু, কী খবর?

অমিত একটু তটস্থ হয়ে বলল, ভালোই।

স্বপন একটু ফিচেল হাসি হেসে বলল, কীরকম ভালো?

মোটামুটি।

গ্যারেজের চাকরির কী হল?

কাঁচুমাচু হয়ে অমিত বল, বোধহয় হবে না।

হবে না! হবে না কেন?

অমিত দুঃখিত মুখে বলল, উনি যা চাইছেন তা অনেক বড় ব্যাপার। আমি তো সামান্য মেকানিক। ওসব আমার সাধ্যের বাইরে।

তাহলে কী করবেন? ব্যাক টু প্যাভিলিয়ন?

আজ্ঞে।

রামমোহনবাবুকে তাহলে জপাতে পারলেন না?

জপাতে চাইনি তো!

ওই হল। যাক গে, চা-টা খেয়ে একটু ওপরে আসুন।

ওপরে?

হ্যাঁ। মলয়দা আপনার সঙ্গে একটু কথা বলবেন।

অমিত অবাক হয়ে বলে, কিন্তু উনি তো আমাকে চেনেন না।

চিনতে চাইছেন। ভয় পাচ্ছেন কেন?

না, এমনি ভাবছিলাম, আমাকে দিয়ে ওঁর কী দরকার থাকতে পারে।

সেটা ওঁর কাছে গেলেই বুঝতে পারবেন।

আচ্ছা যাচ্ছি।

অমিত খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল স্বপন চলে যাওয়ার পর। মলয়দা ডাকছেন কেন?

সে নিজে মোটর মোকনিক হলেও তার অনেক ভদ্রলোক বন্ধু আছে। কিন্তু বন্ধুত্বটা সমানে সমানে নয়। ওরা টের পায় না, কিন্তু সে টের পায় ভদ্রলোক বন্ধুদের সঙ্গে তার একটু গ্যাপ থেকে যায়। হীনমন্যতাই হবে। এ বাড়িতে এসে সেই হীনমন্যতাটা সে খুব বেশি টের পাচ্ছে।

একটু বাদে একটু অস্বস্তি নিয়ে সে সরু সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠল। এই আউটহাউসে মলয়বাবু কেন থাকেন সেটাই একটা রহস্য। অত বড় বাড়ি থাকতে আমলা-কর্মচারিদের জন্য নির্দিষ্ট বাড়িতে উনি আছেন কেন? বাবার ওপর অভিমানে? নাকি অন্য কোনও কারণ? বোধহয় সৎমায়ের সঙ্গে থাকতে চান না। কে জানে কী!

দোতলায় উঠতেই স্বপন বণিকের সঙ্গে দেখা। বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল। তার জন্যই বোধহয়।

আরে আসুন, এদিকে। বলে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। দোতলাটা বোধহয় ফাঁকাই থাকে। দুটো ঘর পেরিয়ে তৃতীয় ঘরের পর্দা ঠেলে স্বপন ভিতরে ঢুকে পর্দাটা হাত দিয়ে সরিয়ে বলল, আসুন।

ভিতরে সোফাসেট সাজানো, একধারে ডিভান, অন্য ধারে একটা টিভি সেট, একটা দামি স্টিরিও আর অনেক বই দেখতে পেল অমিত। একখানা সিঙ্গল সোফায় মলয় বসে। পরনে পাজামা আর একটা সাদা টি শার্ট। কফি বা চা খাচ্ছিল। এক হাতে ধরা একটা ইংরিজি খবরের কাগজ।

খবরের কাগজ থেকে চোখ তুলে তার চোখে সোজাসুজি তাকায় মলয়। ঘরে ঢুকেই সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

মলয় খবরের কাগজটা রেখে বেশ শান্ত ভদ্র গলায় বলল, বসুন।

খুব সংকোচের সঙ্গে বসল অমিত।

মলয় দু চুমুক কফি খেল। তারপর স্বপনকে চোখের একটা আলতো ইশারা করতেই সে ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেল।

মলয় হেলান দিয়ে বসে দুটো হাত থুতনি বরাবর জড়ো করে তার দিকে চেয়ে বলল, আপনার পরিচয় আমি খানিকটা জানি। আর খানিকটা অনুমান করে নিতে পারছি। আপনি মোটার মেকানিক, বেহালার দিকে কোথাও থাকেন এবং আপনি সুভদ্রর বন্ধু। ঠিক তো!

যে আজ্ঞে।

এখানে এসে আপনার অসুখ করে এবং আপনার অ্যাডভেঞ্চারে যাওয়া হয়নি।

আজ্ঞে।

আপনার বোধহয় আপনজন কেউ নেই, না?

আজ্ঞে না।

বাবা আপনাকে দিয়ে একটা মেগা মোটর গ্যারেজ চালাতে চাইছেন। তাই তো!

আজ্ঞে হ্যাঁ। তবে সেটা বোধহয় হবে না।

আমি সে ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড নই। উনি ওঁর টাকা ইচ্ছে করলে জলেও ফেলে দিতে পারেন। আমার তাতে কিছু যায় আসে না। আমার একটা কৌতূহল, আপনি যে ঘরে প্রথম রাত কাটিয়েছেন সেই ঘরে ওই রাতে একটা ঘটনা ঘটেছিল। আপনি বা আপনার বন্ধুরা কি তা জানেন?

কী ঘটনা?

ওই ঘরে একটা স্টিলের আলমারি থেকে আমার মায়ের—অর্থাৎ আসল মায়ের কয়েকটা জিনিস চুরি যায়।

ও।

আপনি কিছু জানেন?

অমিত একটু ভাবল। তারপর ভাবল যা ঘটেছে তা বলে দিলে তার তো কোনও ক্ষতি নেই। গোপন করে লাভই বা কী? সে একটু গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, চুরি কিনা জানি না। তবে জ্বরের ঘোরের মধ্যেও আমি দেখেছিলাম একজন বয়স্কা সুন্দরী মহিলা আমাদের ঘরে ঢুকে একটা স্টিলের আলমারি খুলে কিছু বের করে নিয়ে গেলেন।

মলয় তার দিকে প্রায় পলকহীন চোখে চেয়ে থেকে বলে, ঠিক দেখেছেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

অন্য কেউ নয়?
না।
ঘটনাটার কথা কাকে কাকে বলেছেন?
কাউকে না।
মনে করে দেখুন।
পুলিশকে বলিনি।
সুপর্ণাকে?
অমিত একটু ভাবল। তারপর বলল, বোধহয় বলেছি। ঠিক মনে নেই। রিনি দেবী খুন হওয়ার খবর পেয়ে একটু নার্ভাস হয়ে যাই। তখন ঠিক নিজের ওপর রাশ ছিল না।
মলয় দুটো চোখ একটু বুঝে রইল। তারপর হঠাৎ চোখ খুলে তার দিকে চেয়ে বলল, সুপর্ণার সঙ্গে আপনার ভাব কেমন?
অমিত একটু হেসে বলল, ভাব বলতে আলাপ আছে। উনি নার্সিং করতেন তো।
কোনও সফট ব্যাপার ঘটেনি তো?
ছিঃ ছিঃ! আমি অতি সামান্য মানুষ।
মলয় তার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, আপনাকে একটা কাজ করতে হবে।
কী কাজ?
এ জায়গাটা ছাড়তে হবে। আর সেই রাতে যে ঘটনাটা আপনি দেখেছেন সেটা ভুলে যেতে হবে।
ভুলে যাব?
ঠিক ভুলতেও হবে না, ঘটনাটা অন্যভাবে সাজাতে হবে।
কীরকম ভাবে?
আপনি কোনও বয়স্কা মহিলাকে দেখেননি। দেখেছেন একজন অল্পবয়সী মেয়েকে। যে সুন্দরী নয়, অতি সাধারণ।
অমিত অস্বস্তিতে পড়ে বলল, কেন?
মলয় এবার খুব ধীর গলায় বলল, যা বলছি তাই সত্যি কথা। সে রাতে কোনও বয়স্কা মহিলা ও ঘরে ঢোকেনি। যে ঢুকেছে সে অল্পবয়সী। জ্বরের ঘোরে আপনি ভুল দেখেছেন। ঘরে কি জোরালো লাইট ছিল?
না। একটা ডিম সবুজ বা নীল আলো ছিল।
তাহলে তো ভুল দেখাই স্বাভাবিক। তাই না?
অমিত একটু ভাবল। তারপর বলল, আমার চোখ খুব ভালো।
আপনার তো তখন একশো চার-পাঁচ জ্বর ছিল। আই সাইট জ্বরের ঘোরে নানারকম উল্টোপাল্টা দেখায়।
আমি কি আবার ঘটনাটা ভেবে দেখব?
নিশ্চয়ই। তবে আমি যেমন বলছি তেমন করেই ভাববেন। অন্য ভাবে নয়।
অমিত কী বলবে ভেবে পেল না।

## চার

বর্ধমানে পড়ে থাকার আর মানে হয় না। অমিতের আর ভালোও লাগছে না। সে তার ব্যাগট্যাগ গুছিয়ে নিচ্ছিল। সাইকেলটা আছে। বর্ধমান থেকে কলকাতায় সাইকেলে ফিরতে দুর্বল শরীরে একটু কষ্ট হবে তার। তা হোক, কয়েকবার বিশ্রাম নিয়ে পেরে যাবে। খুব ভোরেই বেরিয়ে পড়লে সন্ধের মুখে পৌঁছে যেতে পারবে। নিজের ঠেক-এ ফিরে যাওয়াই ভালো। এখানে তার কোনও কাজ নেই, উপরন্তু সে একটা অলক্ষ্য ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে পড়েছে।

বিকেলে সে তার সাইকেলটা পরীক্ষা করে দেখছিল। পিছনের চাকায় হাওয়া নেই। হাওয়া দিয়ে নিতে হবে। সাইকেলটা ভালো জাতের। অমিত নিজের জমানো টাকায় কিনেছে। যে কাজে কিনেছে সে কাজটা হল না অবশ্য, বন্ধুরা কত দূর এগিয়ে গেছে।

রামমোহনবাবুর খাস চাকর নবীন এসে বলল, বাবু আপনাকে একবার ডাকছেন। জরুরি দরকার। এক্ষুনি আসুন।

অমিত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, বোধহয় গ্যারেজের কথাই বলবেন। লাভ নেই, ও গ্যারেজ হবে না। রামমোহনবাবু গ্যারেজের বকলমে কার ম্যানুফ্যাকচারিং করতে চাইছেন।

সে উঠল।

রামমোহনবাবু দোতলায় তাঁর কাজের ঘরেই বসে ছিলেন। স্টেনোগ্রাফার একটা মেয়ে ডিকটেশন নিচ্ছে। অমিতকে বসতে বলে ডিকটেশন শেষ করলেন। তারপর মেয়েটিকে বিদায় দিয়ে অমিতের দিকে ফিরে বললেন, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

বলুন।

তোমরা যেদিন এ বাড়িতে এলে সেদিন রাতে তোমাদের ঘরে কে ঢুকেছিল জানো?

একথা আপনাকে কে বলল?

কেউ বলেছে। মহিলাকে দেখেছ তো?

অমিত ফাঁপরে পড়ে গেল। আজই মলয় তাকে ডেকে সাবধান করে দিয়েছে যেন মহিলার কথা সে না বলে। এখন কী করবে অমিত? সে আমতা আমতা করে বলে, জ্বরের ঘোরে কাকে যে দেখেছি ভালো বুঝতে পারিনি। ঘরে তো জোরালো আলো ছিল না।

কিন্তু তুমি নাকি সুপর্ণাকে বলেছ একজন বয়স্কা সুন্দরমতো মহিলাকে ঘরে ঢুকে আলমারি থেকে কিছু বের করে নিতে দেখেছ।

অমিত একটু দ্বিধায় পড়ে বলল, বলেছিলাম, কিন্তু আমার একটু সংশয় আছে।

ব্যাপারটা খুলে বলো। ঘটনাটা ভীষণ জরুরি।

অমিত হঠাৎ পাল্টা প্রশ্ন করল, কেন জরুরি বলবেন?

রামমোহন প্রশ্ন শুনে হয়তো বিরক্ত হলেন, কিন্তু ধমক চমক করলেন না। একটু চুপ করে থেকে বললেন, পারিবারিক কেচ্ছার কথা প্রকাশ যত না হয় ততই ভালো। কিন্তু বোধহয় এখন সবই প্রকাশ হয়ে পড়বে। তোমাকে দেখে বিশ্বাসী লোক বলে মনে হয়, পারবে কথাগুলো গোপন রাখতে?

পারব।

যে মহিলা ঘরে ঢুকেছিলেন বলে তুমি বলছ তিনি রিনির মা। মহিলা খুব ভালো মানুষ ছিলেন না। রিনিকে বিয়ে করতে তিনি আমাকে বাধ্য করেছিলেন। ব্ল্যাকমেল। ওঁরা যেদিন পালিয়ে যান সেদিন আমার আলমারি থেকে যা নিয়ে গেছেন তা হল দুটো কোল্ড স্টোরেজের মালিকানা সংক্রান্ত কাগজপত্র। আমাকে বাধ্য করা হয়েছিল সেগুলো রিনির নামে ট্রান্সফার করতে। তবে ট্রান্সফার কাগজপত্রে হলেও বাস্তবে হয়নি। কাগজ আমার হেফাজতেই ছিল। আমার শর্ত ছিল রিনি কাগজপত্র পাবে আমার সত্তর বছর বয়স হলে। তার আগে নয়।

কোল্ড স্টোরেজ আপনি ওঁকে দিলেন কেন?

বলেছি তো, ব্ল্যাকমেল। আমার কিছু করার ছিল না।

ওঃ।

কিন্তু রিনি অপেক্ষা করেনি, পালিয়ে গিয়েছিল। কাগজপত্রগুলো চুরি করেছিল ওর মা। ফলে আমার চার কোটি টাকার ওপর ক্ষতি হয়ে যায়। বুঝেছ?

বুঝেছি।

পুলিশ আমাকে রিনির খুনের দায়ে অ্যারেস্ট করতে পারে। কারণ কী জানো?

কী?

যে রাতে রিনি খুন হয় সেই রাতে ওই কাগজপত্র নিয়ে সে উকিলের বাড়ি যাচ্ছিল। কী ভাবে কোল্ড স্টোরেজের পজেশন নিতে হবে তা জানতে। কিন্তু পথেই সে খুন হয়।

আজ কাগজপত্র?

সেগুলো তার কাছে পাওয়া যায়নি। স্বাভাবিক কারণেই সন্দেহটা আমার ওপর বর্তাবে।

কিন্তু কোর্টে এবং অফিসে তো কাগজপত্রের রেকর্ড থাকার কথা।

রামমোহন একটু হাসলেন। তারপর বললেন, রিনি আর তার বাঈজী মা যদি আমাকে ঘোল খাওয়াতে পারত তাহলে আমি এত বড় ব্যবসা করতে পারতাম কি? না হে, কাগজপত্র তৈরি হয়েছিল ঠিকই, অবার পরে চোরাপথে সব রেকর্ড পাল্টে দেওয়া হয়েছে।

তাহলে ভাবছেন কেন?

কেন যে ভাবছি তার কারণ গভীর। তুমি কি বুঝবে?

যদি বলতে না চান—

বলছি। রিনির বয়স পঁচিশ। একটু ব্যভিচারী ভাব তার রক্তেই আছে। সুতরাং আমার প্রতি বিশ্বস্ত থাকার কথা তার নয়। সে ছিলও না। কিন্তু যার সঙ্গে তার সম্পর্ক হয়েছিল সে আমারই ছেলে মলয়।

একটু শিহরিত হল অমিত।

ঘেন্না হল নাকি তোমার? জীবনে এর চেয়েও অদ্ভুত ঘটনা কত ঘটে।

আপনি জানতেন?

জানতাম। তবে গা করিনি। করে কী লাভ? পয়সা রোজগারের আনন্দে ডুবে ছিলাম। কিন্তু এখন সমস্যা হল কেউ আমাকে রিনির খুনের ব্যাপারে ফাঁসাতে চাইছে।

কী ভাবে?

কাহিনী অনেক জটিল। বুঝতে পারবে?

তা তো জানি না।

সুপর্ণাকে তো চেনো!

চিনি। উনি খুব ভালো মেয়ে।

সুপর্ণা আমার খুব বিশ্বাসী কর্মচারী। লোকে তাকে আর আমাকে জড়িয়ে অনেক রোমান্সগল্প করে থাকে।

অমিত ঠান্ডা মেরে গিয়ে বলল, তাই বুঝি?

ওসব রটনা। আমি কোনও মেয়েকে চাইলে পেতেই পারি। সেটা সমস্যা নয়। কিন্তু সকলকেই ভোগ করতে হবে এত ভোগী আমি নই।

তারপর?

কেউ রটাচ্ছে আলমারি থেকে কাগজপত্র সরিয়েছে সুপর্ণা, আমার এজেন্ট হয়ে। আরও রটাচ্ছে, সেই রাতে রিনি আর তার মাকে এই বাড়ি থেকে আমিই সরিয়ে দিই এবং অন্য কোথাও আটকে রাখি। কয়েক দিন বাদে রিনিকে খুন করিয়ে—যাকগে, এ মস্ত গল্প। কিন্তু পুলিশ আমার পেছনে লেগেছে।

আমাকে আপনি কী করতে বলেন?

আমাকে বিশ্বাস করতে বলি। শোনো, আজ বা কাল সকালে আমাকে পুলিশ তুলে নেবে। তারপর কী ঘটবে আমি জানি না। হ্যারাস করবে কিছুদিন। কিন্তু ফলস কেস-এ আমাকে কনভিক্ট করা সম্ভব নয়। আমার ভালো উকিল আছে। কিন্তু কিছুদিন আমাকে জামিন ওরা দেবে না। কারণ কেসটা খুব স্ট্রং। যা হওয়ার এই ফাঁকে হবে।

কী হবে?

আরও একটা খুন। এবং সম্পত্তির নয়-ছয়।
কে খুন হবে?
সম্ভবতঃ সুপর্ণা।
কেন?
কারণ আছে। অনেক কারণ। আপাতত তোমাকে একটা কাজ করতে বলি।
কী কাজ?
তুমি বোধহয় কলকাতায় ফিরে যেতে চাও? তাই না?
হ্যাঁ। আমার এখানে কোনও কাজ নেই।
শোনো, তুমি ভেবো না যে গ্যারেজটা আপাতত হবে না বলে তোমাকে আমি ঝেড়ে ফেলছি। তা নয়। বরং তোমাকে আমি মাস মাইনেয় বহাল করছি আজ থেকে। ম্যানেজার নন্দীকে সব বলা আছে। কিন্তু তোমার কাজটা হল সুপর্ণাকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া।
আমি!
তুমি ছাড়া আর কেউ নেই। তাছাড়া তোমার ওপর সন্দেহটা কম হবে।
পালাতে হবে?
হ্যাঁ। খুব সাবধানে। পারবে?
কিন্তু কোথায় নিয়ে যাব ওঁকে?
কলকাতার একটা ঠিকানা দিচ্ছি। একটা ফ্ল্যাট। সুপর্ণা সেখানে থাকতে পারবে। তুমি ওর খোঁজখবর নেবে নিয়মিত। মাস খানেক বাদে এসে আমার খবর নিও। ততদিন আমি হয়তো জামিন পেয়ে যাব।
কবে যেতে হবে আমাকে?
আজই।
ট্রেনে?
না। সাইকেলে।
সে কী?
রামমোহন হাসলেন, সুপর্ণা সাইকেল চালাতে পারে।
কিন্তু রাতে?
না। রাতে তোমরা বর্ধমান ছাড়বে। মাইল পাঁচেক দূরে আমার একটা খামার আছে। সেখানে আমার বিশ্বাসী লোক আছে। রাতটা কাটিয়ে ভোরবেলা বেরিয়ে পড়বে। তখন সাইকেলে নয় বাস-টাস ধরবে।
অমিতকে চুপ করে থাকতে দেখে রামমোহন বললেন, পারবে না?
আমি ভাবছি সুপর্ণা তো অ্যাডাল্ট। আমাকে সঙ্গে দিচ্ছেন কেন?
যদি রাস্তায় বিপদ ঘটে?
ওঃ।
পারবে?
পারব। কিছু শক্ত কাজ নয়।
কাজটা শক্তই হয়ে দাঁড়াল শেষ অবধি। কে জানে-কেন, সন্ধের পর থেকে মলয়ের ঘরে অনেক লোকজনের আনাগোনা শুরু হল। স্বপন এসে থানা গাড়ল তার ঘরে। আবোলতাবোল কথা।
ওদিকে বড় বাড়ির পেছনে রাত ন'টা নাগাদ সুপর্ণা তৈরি থাকবে। রামমোহন বলে দিয়েছেন।
স্বপন হঠাৎ জিগ্যেস করল, একটু চঞ্চল মনে হচ্ছে! কেন বলুন তো!
আমি একটু বাজারে যাব।
ও। তা যান না।

অমিত বুঝতে পারল জিনিসপত্র সাইকেলে চাপিয়ে বেরনোর বাসনা ত্যাগ করতে হবে। এগুলো পড়েই থাক। বরং তাতে সন্দেহ কম হবে।

অমিত উঠে পড়ল। বলল, আধঘণ্টার মধ্যেই আসছি। আপনি বসুন।

অমিত সাইকেল নিয়ে সদর দিয়ে বেরোল। তারপর অনেকটা ঘুরে পিছনের ফটকে। সুপর্ণা তখনও আসেনি। মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করার পর এল। নিঃশব্দে।

চলুন।

চলুন।

বর্ধমান ছেড়ে জি টি রোডের ধারে সাইকেল চালিয়ে হু হু করে দূরত্বটা পেরিয়ে গেল তারা। তারপর সুপর্ণাই পথ দেখিয়ে বড় রাস্তা থেকে ডান ধারে মোড় নিল। মাইল খানেক বাদে খামারবাড়ি।

সুপর্ণা এতক্ষণ একটাও কথা বলেনি। মুখ গম্ভীর। খামারবাড়িতে ঢুকে বাথরুমে গিয়ে অনেকক্ষণ সময় কাটিয়ে এল। তারপর বলল, অ্যাডভেঞ্চার কেমন হচ্ছে?

ভালোই তো।

সুপর্ণা একটু হাসল, শুনলাম চাকরি পেয়েছেন।

আমিও তাই শুনেছি।

এখন আর সামান্য মোটর মোকানিক বলে নিজের ওপর ঘেন্না নেই তো!

বুঝতে পারছি না। আমি অনেক কিছুই বুঝতে পারছি না। বুঝিয়ে দেবেন?

তাড়া কীসের? সময় আছে। বুঝিয়ে দেব।

প্রথম পর্ব সমাপ্ত

# ছোট গল্প

# ভূমিকা

## প্রথম গল্পের জন্মবৃত্তান্ত

১৯৫৭ সালে আমি বাংলা অর্নাস নিয়ে বি.এ পাশ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ ক্লাসে ভরতি হই। পড়াশুনোয় বরাবর মাঝারি। সারা বছর ফাঁকি দিয়ে পরীক্ষার সময়ে পড়ে পাশ করে যেতাম। কুচবিহারে স্কুলে আর কলেজে পড়ার সময় ম্যাগাজিনে দু-তিনটে গল্প লিখেছিলাম। আর একটা তৎকালীন, রূপাঞ্জলি নামে এক সিনেমা পত্রিকার পূজা সংখ্যায়। ব্যস, তখন পর্যন্ত আমার প্রকাশিত লেখা একটাই। ক্লাস টেন থেকেই আমার হোস্টেলে বাস। এম.এ পড়ার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানের হোস্টেলে আশ্রয় জুটেছিল। সেটা শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের এঁদো গলি তস্য গলির মধ্যে। একতলার অন্ধকার স্যাঁৎস্যাঁতে ঘর। বিশ্ববিদ্যালয়ে রেজিস্ট্রেশন বিভাগে চাকরি করত নির্মল চট্টোপাধ্যায়। তার সঙ্গে আর এক বন্ধুর মাধ্যমে চেনা হল। নির্মল তখন দেশ পত্রিকায় বোধ হয় তিন-চারটে গল্প লিখেছে। সুতরাং তার সঙ্গে পরিচয় হয়ে ভারি উত্তেজিত বোধ করেছিলাম। সে একটু পুরোনো ন্যারেশনের ধাঁচে গল্প লিখত, বিমল মিত্রের ছায়া ছিল তার লেখায়। কিন্তু ভালো লিখত, তার কাছেই শুনলাম 'দেশ' নতুন লেখকদের লেখা ছাপছে। বিমল কর গল্প নির্বাচন করেন। আর বিমল কর তখন আমাদের কাছে আইডল। খুব উৎসাহের চোটে গল্প লিখতে শুরু করলাম ফের, প্রায় বছর তিনেক পর। গল্প দিয়ে এলাম। বিমল কর গম্ভীরভাবে নিলেন। মাস খানেক বাদে খবর নিতে বললেন। দুবার হানা দিতে হল। গল্পটি অমনোনীত হল। দ্বিতীয় বারেও একই অভিজ্ঞতা। তিক্ততায় মনটা ভরে গেল। বুঝলাম আমার লেখক হওয়ার সম্ভাবনা নেই। ঠিক করলাম, বারবার তিন বার। এবারটি যদি মনোনীত না হয় তাহলে আর লেখালেখির চেষ্টা করব না। আমার ওই তখনকার অন্তিম চেষ্টারই ফসল 'জলতরঙ্গ'।

আমার একটা ব্যাপার ছিল, খুব সাধারণ সনাতন গল্প লিখে যাওয়া নয়, প্রথা ভেঙে যদি নতুন কিছু করা যায়। আমি তাই গল্পটা খুব মন দিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরে লিখলাম। ওপর চালাকির যে চেষ্টা অল্প বয়সে থাকে সেটা সযত্নে পরিহার করে বরং একটু অন্যভাবে নিজের চিন্তাভাবনাকে চালিত করলাম। সোজা কথায় যাকে ধ্যানস্থ হওয়া বলে। আমার সব গল্পই তখন আমার বন্ধু বিভূতিকে (লেখক অভ্র রায়) শোনাতাম। সে শুনে বলল, এটা ছাপা হবে, দেখিস। এবং সত্যি ছাপা হল।

জলতরঙ্গ কেমন গল্প তা এতদিন পর আমার আর ভালো করে মনেই পড়ে না। খুব প্রশংসিত হয়েছিল, এমনও নয়। তবে বড় কাগজে প্রথম প্রকাশিত গল্প বলে কথা! তার রোমাঞ্চই আলাদা। আর বিস্ময়ের কথা, জলতরঙ্গের পর দ্বিতীয় গল্প 'পুরোনো দেওয়াল' প্রকাশিত হওয়ার আগেই বিমল কর সেই বছরের পূজা

সংখ্যা দেশ পত্রিকার জন্য আমার গল্প চেয়ে নিয়েছিলেন। তা পূজা সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয়। সুতরাং জলতরঙ্গ একটা অপ্রত্যাশিত পথ খুলে দিয়েছিল আমার জন্য।

## জলতরঙ্গ

ঠিক ঘুম নয়, অনেকটা আচ্ছন্নতা। ঠিক যে অবস্থায় মনের চিন্তাগুলো হিজিবিজি স্বপ্নের মতো সামনে ঘুরে বেড়ায়। জেগে আছি বোঝা যায় অথচ চোখ খুলতে ইচ্ছে করে না। তবু একরকম জোর করেই চোখ দুটো খুলল মন্দিরা। উঠে বসল। লেপটা কাঁধের কাছ থেকে গড়িয়ে পড়ল হাঁটুর ওপর। লেপটা পড়ে যাওয়াতেই যেন চমকে উঠল সে, সামান্য একটু চমকানো আর তার সঙ্গে সঙ্গে গা শির শির করা একটু শীত। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তার মনে পড়ল যে, একটু আগে পাশের বাড়ির বুড়ো ভদ্রলোকটিকে সে স্বপ্নে দেখেছে। মনে পড়তেই একটু হাসি পেল তার।

তারপর ঠান্ডা মেঝেতে পা রাখা। ভাঁজ করা হাঁটু দুটো খুলতে গিয়ে একটু যেন আড়ষ্ট মনে হয়, একটু যেন ব্যথাও লাগে উরুতে, পায়ের ডিমে। তারপরই মেঝেতে পা দুটো রাখতে হয়। ঠান্ডা মেঝেটি পায়ের নীচে একটা হিলহিলে সা□□র মতো নড়ে উঠেই যেন স্থির হয়ে যায়।

উঠে দাঁড়াল মন্দিরা। দাঁড়িয়ে বিস্রস্ত শাড়িটাকে আগে ঠিক করল। গলাটা শুকিয়ে গেছে; জিভটা চটের মতো খস-খসে। কোণের টুলটার ওপর নকশা-কাটা কালো কুঁজোটা। সেদিকে এগিয়ে যাওয়ার আগে বিছানাটার দিকে একবার তাকাল মন্দিরা। শান্ত শুয়ে আছে; এদিকে মুখ ফেরানো। শান্ত ঘুমোচ্ছে। লেপটা পায়ের নীচে সরে গেছে। বেঁকেচুরে একটা দ'য়ের মতো শুয়ে আছে লোকটা। যে হাতদুটো এতক্ষণ মন্দিরার পিঠ আর ঘাড় জড়িয়ে ছিল, সে দুটো এখন অসহায়ভাবে বিছানায় পড়ে আছে।

শান্তর শোয়া বড্ড বিশ্রী। এমন যাচ্ছেতাই ভাবে শোয়। এগিয়ে গিয়ে লেপটা শান্তর গলা পর্যন্ত টেনে দিতে দিতে ভাবল মন্দিরা।

কুঁজোটা কাত করবার জন্য বাঁ হাতটা বাড়িয়ে ডান হাত দিয়ে এলোমেলো চুলগুলোকে পিঠের দিকে সরিয়ে দিতে গিয়ে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে এক পলক তাকাল মন্দিরা। বিকেল। বিবর্ণ হলুদ পাতার মতো বিকেল। জল গড়িয়ে নিয়ে জানালার কাছে দাঁড়াল মন্দিরা, মাথাটাকে পেছনের দিকে হেলিয়ে দিয়ে

আলতোভাবে জলটা খেল। ঠান্ডা জলের স্পর্শ থেকে দাঁতগুলোকে বাঁচাবার জন্যে। কিন্তু দাঁতগুলো চিন চিন করে উঠল। গলা দিয়ে পেটের মধ্যে একটা ঠান্ডা স্রোত একটা জ্বালাকে যেন ধুয়ে নিয়ে গেল। বিরক্তি লাগল মন্দিরার। গ্লাসটাকে কুঁজোর মুখের ওপর উপুড় করে রাখল সে।

তিনতলার ঘর। জানালা দিয়ে অনেকখানি দেখা যায়। জানালার কাছে কয়েক সেকেন্ড দাঁড়ায় মন্দিরা। নীচে বস্তি। খোলার চালগুলো যেন এ ওর ওপর ভর দিয়ে বেঁকেচুরে অতিকষ্টে দাঁড়িয়ে আছে।

নীচে কোথাও বোধ হয় উনুনে আগুন দিল। ধোঁয়ার গন্ধ, এক্ষুনি পাকানো ধোঁয়ার কুণ্ডলী এই ঘরে ঢুকবে। দম আটকাবে মন্দিরার। জানালার পাল্লা দুটোর দিকে শিকের মধ্যে দিয়ে দুটো হাত বাড়িয়ে দেয় মন্দিরা।

ড্রেসিং টেবিল। চৌকো লম্বাটে আয়নার মুখোমুখি মন্দিরা। এলোমেলো রুক্ষ চুল। আজ মাথায় সাবান দিয়েছে সে। চুলগুলো ফেঁপে আছে, ফুলে আছে। রোগা দেখাচ্ছে তাকে, শুকনো দেখাচ্ছে। মাথায় সবান দিলে এমনিই দেখায়। ঠোঁটদুটো শুকনো, মুখটা খসখসে। আয়নায় কোমর পর্যন্ত ছায়া পড়েছে। নিজের মুখটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল মন্দিরা। তারপর শরীর। ছিপছিপে পুষ্ট শরীর। মাজামাজা গায়ের রং, নিটোল চিবুক, হাত। দু হাতের তেলোয় মুখটাকে একবার ঘষে নিয়ে ক্রিমের শিশিটার দিকে হাত বাড়াল মন্দিরা।

শান্ত উঠবার আগেই ঠিকঠাক, ফিটফাট হয়ে নিতে হবে। শুধু শাড়িটা বদলানো বাকি থাকবে। তারপর চা। শান্ত বেরিয়ে যাবে। বাড়িটা নির্জন নিরিবিলি হবে। সন্ধ্যার মনোরম ছায়া পড়বে বাইরের ঝুলবারান্দায়, ঘরের ভেতর বিকেলের যাই-যাই আলোর একটু আভাস। তারপর শাড়ি বদলাবে মন্দিরা। যেমন খুশি তেমনই একটা শাড়ি পড়বে। এইসব ভাবনাগুলো যেন রুটিনবাঁধা হয়ে মন্দিরার চোখের সামনে দিয়ে ভেসে গেল। এর চেয়ে নতুন কোনো ভাবনা মনে আসেই না। মন্দিরা ক্রিমটাকে ঘষল গালে, কপালে, গলায়। পরে তেলেতেলে হাতের তেলোদুটো দুই হাতে ঘষে হাতটা শুকনো করে নিল।

শান্ত নড়ল; হাই তুলল। আড়মোড়া ভাঙল। শান্তর শরীরের হাড়গুলো কটকট করে শব্দ করল। শব্দটা মন্দিরা শুনল। তার বিশ্রী লাগে এই শব্দটা। শান্ত চোখ মেলল। পায়ের দিকে দেয়ালে একটা ক্যালেন্ডার। শান্ত সেদিকে তাকাল। আজকে ছুটির দিন ছিল। হাওয়া আর স্রোতের অনুকূলে পালতোলা নৌকোর মতো ছুটির দিনটা তরতর করে চলে গেল। শেষ হয়ে গেল। কাল সোমবার।

ক্যালেন্ডার থেকে দৃষ্টিটা পিছলে নীচে নামে। ঘুরে যায় মন্দিরার দিকে। আর একটি আগতপ্রায় হাইকে চাপতে চাপতে শান্ত জিগ্যেস করল, 'চায়ের কদ্দুর? সন্ধে হয়ে এল যে।'

'আহা, মোটে তো চারটে বাজে।' মন্দিরার উত্তর।

শান্ত শরীরটাকে ওলটাল। উপুড় হয়ে শুয়ে কনুইতে ভর দিয়ে মাথাটাকে উঁচু করল। লেপটাকে টেনে নিল কাঁধ পর্যন্ত। তারপর বলল, 'বুবুকে দেখছি না যে। কোথায় গেল মেয়েটা?'

'সুখিয়ার সঙ্গে খেলছে বোধ হয়, নয়তো পাশের ফ্ল্যাটে চন্দনাদের সঙ্গে নাচ-গান হচ্ছে। যা আড্ডাবাজ মেয়ে তোমার।' ঠিক ভ্রুর সংগমে ছোট্ট তিলের মতো কুমকুমের একটি ফোঁটা বসিয়ে দিতে দিতে বলল মন্দিরা। খুব আস্তে আস্তে বলল, ভেঙে ভেঙে।

বাঁ হাত দিয়ে বাঁ গালের ওপর একটি ব্রণকে অনুভব করছিল শান্ত। বিরক্তিকর একটু ব্যথা। শান্ত মুখ ফেরাল দেয়ালের দিকে। একটু লঘুসুরে বলল, 'একটিকেই সামলে রাখতে পারছ না।'

'তার মানে!' মন্দিরা একটু ঘুরে তির্যকভাবে শান্তর দিকে তাকাল। গলায় ঝাঁঝ। কয়েকটি সুস্পষ্ট ভাঁজ কপালে। শান্তও তার দিকে তাকাল। ড্রেসিং টেবিলের ওপাশের জানালাটা বন্ধ। শান্তর ডানপাশের বিছানার সঙ্গে লাগাও জানালাটা খোলা। শেষবেলার ম্লান রোদ সেই জানালাটা দিয়ে সোজাসুজি ঘরে ঢুকছে। আলোটা সোজাসুজি মন্দিরার গায়ে পড়ছে না, কিন্তু একটা আভা মন্দিরার দিকে তাকিয়ে রইল। মন্দিরা ভ্রু কোঁচকাল। শান্তর দিকে তাকিয়ে রইল।

মন্দিরা বলল, 'আহা।'

শান্ত নড়ল। লেপের তলায় তার শরীরটা সরীসৃপের মতো কয়েকবার পাক খেল। তারপর লেপের খোলস থেকে বেরিয়ে এল সে। মেজের ওপর সোজা হয়ে দাঁড়াল। সে অনেকটা লম্বা, শরীরটা পুষ্ট, বলশালী। রঙটা কালো। বেশ কালো। মুখটা ভালো নয়—দাঁতগুলো একটু উঁচু, নাকটা চাপা।

শান্ত কোমরে কাপড়টাকে ভালো করে জড়িয়ে নিল। তারপর মন্দিরার দিকে তাকাল, হাসল। মন্দিরা হাসল না। শান্ত বলল, 'তোমাকে আজ রানির মতো দেখাচ্ছে'। সে ড্রেসিং টেবিলটার দিকেই এগুচ্ছিল। মন্দিরার বেণী বাঁধা শেষ হয়েছিল। সে ঘুরে শান্তর দিকে তাকাল। শান্ত মাতালের মতো হাসছিল। মন্দিরা কী বলল। এত জোরে বলল যে, শান্ত থমকে দাঁড়াল। লজ্জা পেল। প্রসারিত হাতদুটি নামিয়ে ঘুরে দাঁড়াল।

'আমার তোয়ালে আর সাবানটা কোথায়?'

'সব বাথরুমে।' আয়নায় মুখ রেখে শান্তর দিকে না তাকিয়েই জবাব দেয় মন্দিরা। শান্ত ঝুল-বারান্দার দরজা দিয়ে মন্থর পায়ে বেরিয়ে যায়।

মন্দিরা ওঠে। সর্বশেষ কাঁটাটা খোঁপায় গুঁজে দিয়ে ঘরটার দিকে তাকায়। বিছানাটা এলোমেলো। বিছানার পাশে মাথার কাছে একটা নীচু ছোট টেবিল। লেসের ঢাকনা দেওয়া। তার ওপর সেদিনের পত্রিকাটা, দু-একটি ইংরিজি উপন্যাস, আর শান্তর হাতঘড়িটা। টেবিলটার পাশে জানালাটা খোলা। এটা পশ্চিম দিক। এদিকে এপাশের জানালাটার কাছে একটা টুলের ওপর কুঁজোটা আর তার পাশ ঘেঁষেই ড্রেসিং টেবিল। দুটো দরজা। একটি রান্নাঘরে যাওয়ার। এই দরজার পাশেই বারোয়ারি সিঁড়ি। অন্য পাশে দরজাটা দিয়ে ঝুল বারান্দায় যাওয়া যায়। এটুকু জায়গার সবটাই একটি জ্যামিতিক আকৃতিতে মন্দিরার মুখস্থ হয়ে গেছে। চোখ বেঁধে দিলেও যেদিকে খুশি ইচ্ছে মতো যাওয়া যায়। হোঁচট খেতে হবে না, হাতড়াতে হবে না।

মন্দিরা সিঁড়ির দরজার কাছে এগিয়ে গেল। দরজার কাছে যেতে যেতেই সে শব্দটা শুনল। জলের শব্দ। বাসনকোসনের ওপর জল পড়ার শব্দ। মৃদু, ধাতব, সুরেলা। একটা সুর বাজছে যেন। মন্থর বিষাদের সুর। বিকেলের সুর। শব্দটা মন্দিরার ভালোও লাগে আবার খারাপও লাগে। ভালো লাগে সুরটা আর খারাপ লাগে বিষাদটা।

মন্দিরা দরজা দিয়ে প্যাসেজে বেরিয়ে এল। তারপর রান্নাঘর। কিন্তু রান্নাঘরে ঢুকল না মন্দিরা। প্রায়ান্ধকার প্যাসেজটাতে দাঁড়াল।

পাশের ফ্ল্যাটে বাচ্চাদের হই চই হচ্ছে। মন্দিরা কান পেতে শোনার চেষ্টা করল। হ্যাঁ, বুবুর গলার স্বর শোনা যাচ্ছে; হাসি। মন্দিরা ডাকল, 'বুবু, বুবু-উ।' হইচইটা হঠাৎ থেমে গেল। একটা নিঃস্তব্ধতা, স্টোভের আওয়াজ হঠাৎ থেমে গেলে যেমনটা হয়।

পাশের ফ্ল্যাটটা চন্দনাদের। সিঁড়ির দিকে দরজাটা খোলা। সেই দরজা দিয়ে খুব ভয়ে বুবু বেরিয়ে এল। ববকরা চুলগুলো এলোমেলো, ঠোঁটের পাশে কালো দাগ, জামা-কাপড় নোংরা। মেয়ের দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল মন্দিরা। তারপর বলল, 'ঘরে যাও।'

নোংরামি তার একদম পছন্দ হয় না। তার রান্নাঘরটা ঝকঝকে তকতকে। তার শোয়ার ঘরের মতনই। মন্দিরা জলচৌকিটা টেনে নিয়ে বসল। ডান পাশে ছোট্ট একটা জানালা। জানালা দিয়ে চন্দনাদের ফ্ল্যাটের ঝুল বারান্দাটা দেখা যায়। সেদিকে তাকিয়েই একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল মন্দিরা। কয়েক দিন আগেও বুড়ো মানুষটা ওইখানে ইজি চেয়ারে বসে থাকত, কাশত, আর হাঁফাত। চন্দনার দাদু। বুড়ো আর ওখানে বসে না। কে জানে হয়তো অসুখটা বেড়েছে ভদ্রলোকের। আজ ভদ্রলোককে দুপুরে স্বপ্নে দেখেছে মন্দিরা। হিজিবিজি কী যেন দেখেছিল, তা এখন আর মনে নেই! কী যে সমস্ত স্বপ্ন। মাথামুণ্ডু নেই। মাঝেমাঝে ফরসা টকটকে রং আর প্রশান্ত, সৌম্য ভদ্রলোকটির কথা ভাবতে মন্দিরার ভালো লাগে।

ঝকঝকে কেটলিটা গনগনে উনুনের আঁচে বসানো। উনুনের আঁচটা মন্দিরার গায়ে লাগছে। গরমটা ভালো লাগছে মন্দিরার। ওপরের ফ্ল্যাটে একটা কুকুর ডাকছে আর তার সঙ্গে সঙ্গে চুড়ির আওয়াজের মতো শেকলের মৃদু শব্দ শোনা যাচ্ছে। কুকুর জীবটাকে বিশ্রী লাগে মন্দিরার। কিন্তু দূর থেকে কুকুরের ডাকটা

ভালো লাগে শুনতে। কেমন পৌরুষ আর গাম্ভীর্য মেশানো ডাক। বুকের ভেতরটা গুরগুর করে ডাকটা শুনলে, কিন্তু ভালো লাগে, রোমাঞ্চ হয়। ওপরের ফ্ল্যাটের কুকুরটাকে দেখেছে মন্দিরা; একটা বিদ্যুতের মতো গতি যেন সংহত হয়ে আছে শরীরটাতে। রোমশ, লোভী, হিংস্র। গলার স্বরটা ভারি গম্ভীর। দেখলে গা সির-সির করে, মনে হয় এক্ষুনি যেন লাফিয়ে পড়বে গায়ের ওপর। ভাগ্যিস শেকল দিয়ে বাঁধা থাকে।

চায়ের পাট চুকল। শান্ত বেরিয়ে গেল। তারপর বুবুকে নিয়ে পড়ল মন্দিরা। মেয়েকে সাজাতে মন্দিরার ভালো লাগে। কিন্তু যা নোংরা স্বভাব মেয়ের। মেয়ের স্বভাবের কথা চিন্তা করে আপন মনেই ভ্রু কোঁচকায় মন্দিরা।

সাজ শেষ। বুবুকে সুন্দর দেখাচ্ছে। বুবু এমনিতেই ফরসা, গোলগাল, সুন্দর। লাল সোয়েটার আর ক্রিম রঙের ফ্রকে তাকে আরও সুন্দর দেখাচ্ছে। তৃপ্ত চোখে বুবুর দিকে তাকিয়ে তারপর তাকে একটা চুমু খেল মন্দিরা। খুব আলতোভাবে চুমুটা খেল, পাউডারের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে। বুবু ভয়ে ভয়ে মার দিকে তাকাল, 'চন্দনাদের ওখানে যাই মা?'

'যাও, কিন্তু ওখানে ঘুমিয়ে পড়ো না যেন।'

ঘাড়টা অনেকখানি হেলিয়ে সম্মতি জানিয়ে বুবু ছুট লাগাল। মন্দিরা একা। ঘরটা নির্জন। শুধু রান্নাঘরে সুখিয়ার বাটনা বাটার শব্দ শোনা যাচ্ছে। একঘেযে বিশ্রী শব্দ। শব্দের তালে তালে ঘরটা যেন কাঁপছে।

মন্দিরা ঘরটার চারদিকে তাকাল। সবকিছু সাজানো, ঝকঝকে। ঘরটা বড়, বেশ বড়। হাত-পা খেলিয়ে থাকা যায়। পাশের ফ্ল্যাটে চন্দনাদের ঘরের সংখ্যা বেশি, কিন্তু জিনিসপত্রের এত ঠাসাঠাসি যে মন্দিরার দম আটকে আসে। তাদের আসবাব বেশি নেই, মন্দিরা তৃপ্ত চোখে ঘরটার চারদিকে তাকিয়ে দেখল। আসবাব বেশি নেই, কিন্তু পরিচ্ছন্নতা আছে। দুপুর বেলায় বন্ধ করে দেওয়া জানলাটা খুলে দিল মন্দিরা। তারপর ট্রাঙ্ক খুলে পছন্দ মতো একটা শাড়ি বের করল।

এখন এই নির্জন ঘরে একা একা সাজবে মন্দিরা। একা একা সাজবে। কাউকে দেখানোর জন্যে নয়। কেউ দেখবে না। সাজবে সে নিজের জন্যে। গুনগুন করে একটা আধচেনা গানের সুর গাইতে গাইতে আস্তে আস্তে নিজেকে সাজিয়ে তুলতে তার ভালো লাগে। তারপর একা নির্জন ঝুলবারান্দার প্রায়ান্ধকার রেলিঙে ভর দিয়ে সে দাঁড়িয়ে থাকবে আর একটা হালকা অন্ধকারের মুখোমুখি। সেই আধ-চেনা গানের সুরটা গলায় তুলতে তুলতে গানের কথাটাকে মনে আনবার চেষ্টা করবে সে। কিন্তু মনে আসবে না, কিছুতেই আসবে না। মন্দিরা জানে কথাটাকে মনে পড়লেই গানটাকে আর ভালো লাগবে না, পুরোনো মনে হবে।

ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়াল মন্দিরা। ঘি রঙের শাড়ি, মেরুন রং-এর ব্লাউজ। আয়নার দিকে মুগ্ধ চোখে তাকাল মন্দিরা। প্রথমটায় মুগ্ধতা, তারপর দৃষ্টিটা তীকণ্ন হল—খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিজেকে বার বার দেখল সে। কোনো ত্রুটি নেই। জোরালো ইলেকট্রিকের আলোয় তার মাজা-মাজা গায়ের রঙটাকে উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। কত বয়স হবে তার? পঁচিশ। কিন্তু তাকে দেখে কেউ কুড়ির বেশি বলবে না। না, কিছুতেই বলবে না।

টুলটা পেছন দিকে ঠেলে নিয়ে বসল মন্দিরা। স্কুল কলেজের দিনগুলোকে মনে পড়েছে। চোরা চাউনি আর ফিসফাস কথার দিনগুলোকে মনে পড়ছে। ক্লাসের ছেলেদের দিকে তাকাতে গিয়ে বুকটা ঢিপ ঢিপ করত, গলা শুকিয়ে কাঠ হত। তবু তাকাতে ইচ্ছে করত। তাকাত। অসীম সেনকে মনে পড়ছে। লোভী কিন্তু ভীরু। কোনো দিন কাছে আসেনি, কথা বলেনি, শুধু তার দিকে তাকিয়ে ক্লাসের আর সব কিছুকে ভুলে যেত ছেলেটা। আসলে সাহসের অভাব। 'সাহস' কথাটা কত ছোট, কিন্তু কত দুর্লভ। কিন্তু এসব কথা ভাবতে ইচ্ছে করছে না।

মন্দিরা উঠে দাঁড়াল। বারান্দার দিকে এগিয়ে গেল। দেয়ালে ঝোলানো ক্যালেন্ডারের দিকে একপলক তাকাল। একটা ফুল গাছ—বড় গাছ আর থোকা থোকা সাদা ফুলে ছেয়ে গেছে গাছটা। গাছটা মন্দিরার চেনা নয়। গাছের ওপাশে একটি হ্রদ, তার পেছনে পাহাড়, তুষারে ঢাকা সাদা পাহাড় আর নীল আকাশ। ছবিটাকে মন্দিরার ভালো লাগে।

ঘরের দরজায় টোকা। ঝুল-বারান্দা থেকে মন্দিরা ঘরে। দরজা খুলল। চন্দনাদের চাকরটা দাঁড়িয়ে আছে। কোলে ঘুমন্ত বুবু। ফ্রকের ভাঁজগুলো এলোমেলো হয়ে গেছে, কপালের ওপর চুলের ঘুরলি। হাত বাড়িয়ে বুবুকে কোলে নিলে মন্দিরা।

খুব আস্তে আস্তে সোয়েটারটা বুবুর গা থেকে খুলে নেয় মন্দিরা। বুবু ঘুমের ঘোরেই আপত্তি করে কী যেন বলল।

খুব সাবধানে বুবুকে বিছানায় শুইয়ে দিল মন্দিরা। তারপর লেপটা টেনে দিল তার গলা পর্যন্ত। বুবুকে একটা চুমু খেল সে খুব আলতো ভাবে। কিন্তু কেমন এক সন্দেহ হল। আবার নীচু হয়ে বুবুর মুখের ওপর বাতাসটা শুকল সে। বিড়ির গন্ধ। হঠাৎ যেন দম আটকে এল তার। নিশ্চয়ই ওদের চাকরটা আদর করছে বুবুকে, চুমু খেয়েছে। একটা ঘেন্না যেন পাকিয়ে উঠল তার শরীরে।

মন্দিরা বাথরুমে গেল। সাবান দিয়ে ভালো করে মুখটা ধুলো। কী বিশ্রী, মনে মনে ভাবল সে। সুখিয়া ডিম রাঁধছে। গরম মশলার গন্ধ। মন্দিরা নিশ্বাস টানল। জানালার কাছে এল। বাইরে কুয়াশা। ঘন কুয়াশা। হাত বাড়িয়ে যেন স্পর্শ করা যায়। কুয়াশা দেখতে তার ভালো লাগে না। কেমন যেন মন-খারাপ হয়ে যায়। সে জানলার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়াল।

এক্ষুনি শান্ত আসবে। মন্দিরা মনে মনে ভাবল। শান্ত এসে বিছানার একপাশে বসে পড়ে বুবুকে একটু আদর করবে। তারপর মন্দিরার দিকে তাকাবে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবে তাকে। চোখদুটো লোভী হয়ে উঠবে। মাতালের মতো অর্থহীন হাসবে, তারপর এগিয়ে আসবে। ভাবতেই যেন গাটা সির সির করে উঠল মন্দিরার। ভালো লাগবে না তার, একদম ভালো লাগবে না। আসলে শান্তকে তার কোনো সময়েই ভালো লাগে না, শান্ত তাকে দেখুক, মুগ্ধ হোক, প্রশংসা করুক—মন্দিরার খারাপ লাগবে না। বরং ভালো লাগবে। খুব ভালো লাগবে। কিন্তু শান্তর লোভটা কদর্য। ভয়ংকর কুৎসিত।

মন্দিরা একপা একপা করে দরজার কাছে এল। তারপর অন্ধকার প্যাসেজটাতে। ডানদিকে অন্ধকার সিঁড়ি। লাইটটা বোধ হয় ফিউজ হয়ে গেছে। বাঁদিকে প্যাসেজের শেষটাতে রান্নাঘর। রান্নাঘরে আলো জ্বলছে। সুখিয়াকে দেখা যাচ্ছে। সুখিয়া গান গাইছে, দেহাতি গান। প্যাসেজটা পার হয়ে চন্দনাদের দরজার সামনে দাঁড়াল মন্দিরা। দরজাটা খোলা। ভেতরটা অন্ধকার। সুখিয়া দেহাতি গান গাইছে। গানের সুরটা অদ্ভুত, কথাগুলো দুর্বোধ্য। কিন্তু তবু মন্দিরার ভালো লাগছে।

ওপরতলার কুকুরটা ডাকছে। কলের জলে একটানা ধাতব, সুরেলা শব্দ। মন্দিরা চন্দনাদের অন্ধকার ঘরটার চৌকাঠের ভেতর একটা পা বাড়িয়ে দিল। ঘরটা অন্ধকার। না, একেবারে অন্ধকার নয়, ওপাশের ঘরে আলো জ্বলছে তার আভা পড়েছে মেঝেতে। ঘরটাকে কুয়াশাচ্ছন্ন মনে হচ্ছে। মন্দিরা ভাবল, ওরা বোধ হয় কেউ নেই এখন। একবার পেছনদিকে তাকাল সে। খোলা দরজা দিয়ে খাটের একটা পাশ দেখা যাচ্ছে। ক্রিমরঙের ফ্রকের একটা অংশ আর বুবুর শান্ত নির্লিপ্ত, ঘুমন্ত মুখটাকে দেখা যাচ্ছে। সুখিয়া একমনে গান গাইছে। একটানা গান। সুরের কোথাও ভাঁজ নেই, মোচড় নেই। গানটার যেন শেষও নেই। মন্দিরা ভাবল, ফিরে যাই।

কিন্তু মন্দিরা ফিরল না। ঘরটা অন্ধকার। মন্দিরা ভাবল এ ঘরে কেউ নেই। পাশের ঘরটার আলো জ্বলছে। মৃদু আলো। সেদিকে এগিয়ে যাওয়ার আগে নিজের চারদিকে একবার তাকাল সে। কতকগুলো ট্রাঙ্ক বাক্স থাকে থাকে সাজানো। ডানপাশের দেয়ালের কোণে এটা গোটানো মাদুর দাঁড় করানো, হঠাৎ দেখলে একটা মানুষের মতো মনে হয়। কেন কে জানে মন্দিরার গাটা সির সির করল। মন্দিরা ডাকল, 'চন্দনা'। কেউ উত্তর দিল না।

জল পড়ার শব্দ হচ্ছে। মৃদু ধাতব, সুরেলা। বিষাদের সুর। মন্দিরার ভালো লাগছে না।

মৃদু আলো-জ্বলা ঘরটার দিকে এগোল মন্দিরা। চৌকাঠে দাঁড়াল। মৃদু আলো। ঘরটা নোংরা, ছোট, এলোমেলো। দেয়ালে বিশ্রী দাগ।

জানলাগুলো বন্ধ, ঘরটা গুমোট। ওরা কেউ নেই। মন্দিরা ঘরের ভেতর এসে দাঁড়াল।

ঘরের কোণে-কোণে ঝুল। ঘরটা ধোঁয়াটে। ওষুধের অস্বস্তিকর গন্ধ। এলোমেলো টেবিল-চেয়ার-খাটের কোণে-কোণে বাদুড়ের মতো অন্ধকার ঝুলছে। নীচু খাট। চন্দনার দাদু শুয়ে আছে। মন্দিরা সেদিকে তাকাল। একটা নকশা-কাঁথায় ভদ্রলোকের গলা পর্যন্ত ঢাকা। আলোটা এত কম যে, ভদ্রলোকের মুখটা মন্দিরা দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু আন্দাজ করতে পারছে। সেই প্রশান্ত, সুন্দর সৌম্য মুখ, সাদা ধবধবে চুল—লম্বা চওড়া কাঠামো, গায়ের রঙটা খুব ফরসা। সাহেবদের মতো।

কিন্তু হঠাৎ মন্দিরা চমকে উঠল। ভয় পেল। স্থির জলে ঢিল পড়ার মতো চমকে ওঠা। সে শুনল একটু শব্দ। অমানুষিক অস্বাভাবিক শব্দ। চন্দনার দাদু কিছু বলার চেষ্টা করছে। মন্দিরা খাটটার দিকে এগিয়ে গেল। ওর বুকটা ঢিপঢিপ করছে।

মন্দিরা খাটটার কাছে এসে ঝুঁকল! চন্দনার দাদু তাকিয়ে আছে। তার দিকে। চোখদুটো লাল, চোখের তারা দুটো ঘোলাটে। খুব বড় বড় করে তাকিয়ে আছে। কপালের চামড়া শুকনো, কোঁচকানো, শিরাবহুল। মুখটা এবড়ো খেবড়ো গর্তে ভরা। ছোট ছোট সাদা দাড়ি বিজবিজ করছে মুখটাতে। অস্বাভাবিক মুখ। ভয়ংকর। এত ভয়ংকর যে তাকানো যায় না। চমকে গিয়েও যেন অবশ হয়ে এল মন্দিরা। হাতদুটো দিয়ে বিছানায় ভর দিল। রান্নাঘরের জানলা দিয়ে দেখা মুখটার সঙ্গে এ মুখের কোনো মিল নেই।

মন্দিরা ঝুঁকল। ফিস ফিস করে বলল, 'কিছু বলবেন আমাকে? কাউকে ডেকে দেব? চন্দনাকে ডাকব? কিংবা ওদের কাউকে?'

ভদ্রলোক কিছু বলবার চেষ্টা করছেন। শব্দ হচ্ছে ঘর ঘর ঘর ঘর। শব্দটা যেন নিজের বুকে শুনতে পাচ্ছে মন্দিরা। ঠোঁট দুটো ফাঁক হল। নড়ল। গোঙানির মতো শব্দ হল। মন্দিরা চারদিকে তাকাল। কেউ নেই। সুখিয়ার গানের শব্দটা শোনা যাচ্ছে না। কল থেকে জল পড়ার একটানা মৃদু শব্দ শোনা যাচ্ছে। ওদের চাকরটা নিশ্চয়ই নেই। মন্দিরা আরও একটু ঝুঁকে বলল, 'জল দেব আপনাকে? জল? কী খুঁজছেন আপনি? বলুন না।' মন্দিরার গলাটা যেন আটকে আসছে।

হলদে পিঁচুটি পড়া চোখদুটোয় টলটল করছে জল। মন্দিরা একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। জল টলটল করা ভয়ংকর দুটো চোখ। যেন তাকে গিলে খাচ্ছে।

কাঁথাটা নড়ল। ভেতর থেকে একটা হাত বেরোল। ধীরে ধীরে হাতটা শূন্যে উঠল। মোটা হাড়ের হাত, চামড়ার ওয়ার পরানো। মোটা হাড়, লম্বা আঙুল। মন্দিরার হাত দুটো কাঁপছে। পা দুটো কাঁপছে। বুকটা কাঁপছে। মন্দিরা কথা বলতে গেল, গলাটা থরথর করে কাঁপল। ফিসফিস করে বলল, 'অমন করে তাকিয়ে আছেন কেন? কেন ভয় দেখাচ্ছেন আমায়? দোহাই আপনার, অমন করে তাকাবেন না।'

অস্বাভাবিক মুখটা বিকৃত হল। চোখ দুটো আরও বড় বড়। চোখের পলক পড়ছে না। শূন্যে ওঠা হাতটা হঠাৎ পড়ে গেল। ঠান্ডা একরাশ কিলবিলে সাপের মতো আঙুলগুলো মন্দিরার কবজিটায় জড়িয়ে গেল। মন্দিরা অস্ফুট একটা আওয়াজ করল।

মন্দিরার মনে হচ্ছে চোখদুটো তার ফেটে যাবে। হাত পা অবশ। ভারী। চুলের গোড়ার গোড়ায় যেন সরীসৃপ চলছে। গলা শুকিয়ে কাঠ। মন্দিরা নড়তে চাইছে। পারছে না। মন্দিরা ফিস ফিস করে বলতে চাইছে, ছাড়ো, ছেড়ে দাও আমার হাত। জানো, তোমাকে আমি শেষ করে ফেলতে পারি? ওরা কেউ এসে পড়বার আগে তোমার সব শেষ হয়ে যেতে পারে। একটু পরে তুমি একটা কাঠের মতো মরে পড়ে থাকবে। আমাকে ছেড়ে দাও। তুমি কি বেঁচে আছ? তুমি কি শুনতে পাচ্ছ? তোমার ভয় করে না?

একটা অন্ধকার যেন মন্দিরার চোখের সামনে এগিয়ে এল। আবার পিছিয়ে গেল। ঘরটার ভেতর কী ভীষণ কুয়াশা। এত শীত আজকে? এত শীত! সুখিয়া গান গাইছে না কেন? জলের কলটা কেউ বন্ধ করছে না কেন? মন্দিরা নিজেকেই নিজে বলল, আঃ, এই বাড়িতে কি কেউ বেঁচে নেই।

আর কোনো শব্দ নেই। সব চুপ। বিছানায় শোয়ানো দেহটা।

আমার শেষ শক্তি দিয়ে তোমাকে শেষ করে ফেলা যায়। তুমি কতটুকু? তুমি অথর্ব দুর্বল। আমার দিকে অমন করে তাকিও না। লোভী জানোয়ারের মতো তাকিও না। যদি—

মন্দিরার হাতদুটো কঠিন। ভয়ংকর কঠিন। চোয়াল দৃঢ়। দাঁতে দাঁত ঘষছে মন্দিরা। এখন এই ঘরে কেউ আসবে না। ঘরটা ভীষণ নির্জন। মন্দিরার বুক থেকে একটা তরল আগুনের স্রোত মাথায় উঠে আসছে। পা দুটো ঠান্ডা, অবশ। মন্দিরাকে মেঝের দিকে টেনে নিচ্ছে কেউ। মন্দিরার হাতদুটো ভয়ংকর কঠিন, আঙুলগুলো বাঁকা হুকের মতো।
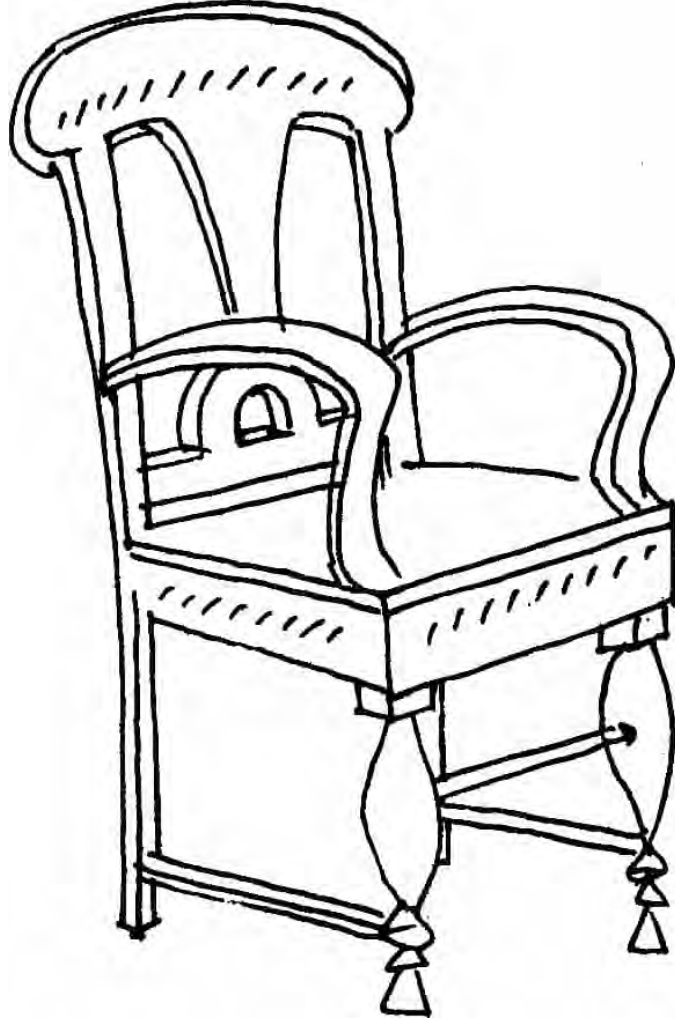
না, কেউ দেখেনি। অন্ধকার প্যাসেজটা প্রায় লাফিয়ে পার হয়ে এসেছে সে। আবার সেই শান্ত ঘর। উজ্জ্বল আলো। সবকিছু সাজানো গোছানো। ফিটফাট। বুবু ঘুমোচ্ছে। প্রশান্ত, নির্লিপ্ত, গভীর ঘুম।

সুখিয়া গান গাইছে। দেহাতি ধর্ম সংগীত।

ওপরতলার কুকুরটা ডাকছে। গম্ভীর, হিংস্র ডাক।

জলের কলে একটানা একঘেয়ে সুর। বিষাদের সুর।

ঝড়ের পর বিধ্বস্ত একটা গাছের মতো মন্দিরা ড্রেসিং টেবিলের চৌকো আয়নাটার সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে।

# দড়ি

মানুর টেবিল-ঘড়ির বড় কাঁটাটা খসে পড়ে গেছে। তবু চলে। ছোট কাঁটাটাই ঘুরে ঘুরে সময় দেয়। অত চুলচেরা সময়ের দরকার কি তার। মোটামুটি একটা সময়ের আন্দাজ ছোট কাঁটাটা থেকেই পাওয়া যায়। ঘড়ির কাচের মধ্যে, তলায় বড় কাঁটাটা পড়ে আছে। দোকানে নিয়ে গিয়ে সারাই করে আনা যায়, কিন্তু মানু গা করে না। অসুবিধে তো হচ্ছে না কিছু, সময়মতো অ্যালার্মও বাজছে।

কিন্তু ভেবে দেখলে, সময়টা বাস্তবিক খারাপই পড়েছে। যেমন সোমবার সকালে মোট ঊনত্রিশ কাপ চা বিক্রি হয়েছে। তার মধ্যে এগারোজন বাকি। চিনির দরটা ঝপ করে উঠে না গেলে প্রতি গেলাসে দু'পয়সা দাম বাড়াত না মানু। লোকে বলে—জল বেচে পয়সা। তা চায়ের বেশির ভাগটা জলই থাকে কিন্তু যা একটু ছিঁটেফোঁটা কেমিক্যাল মেশাতে হয় তার মধ্যে আড়াই টাকা সেরের দুধ ধরো, আট টাকা কিলোর চা, পাঁচ টাকার চিনি। লোকের আর কী! চিনি কম হলে মুখ তেতো করে গেলাস ফিরিয়ে দিয়ে বলবে—চিনি হয়নি, আরো এক চামচে দাও। লিকার কম হলে বলবে—লিকার মেশাও। চা যদি জলই হবে বাবু তবে এই বেশিকম কেন? পনেরো পয়সা থেকে সতেরো পয়সায় দর তুলতেই খদ্দের আদ্দেক হয়ে গেল। তা বলে

ভিড় কম নয়। যারা আসবার তারা আসে ঠিকই। মাগনা খবরের কাগজ, বিনাভাড়ার আড্ডার ঘাঁটি—যাবে কোথায়। এখন দু-তিন জন এলে এক গেলাস চা আর একটা ফলস, দু গেলাস হলে দুটো ফলস নিয়ে ভাগ করে খায়। ওষুধের গেলাসের চেয়ে এক কড় পরিমাণ বড় গেলাসে চা ধরে কতটুকু! তা আদ্দেক করলে থাকে কী, তা ভেবে পায় না মানু। কিন্তু তবু ওই চায়ের আমেজটুকু পেয়েই লোকে খুশি।

হপ্তা বাজারের মুখেই দোকান। জায়গা খারাপ না। হাটুরে আছে, বটতলার জুয়াড়িরা আছে, নিষ্কর্মা আছে। আর কিছু না জুটলেও লোক চা খায়—এই বিশ্বাসের জোরে মানু টিকে আছে এতকাল। সোমবারের বিক্রিবাটা দেখে একটু ভাবিত হয়ে পড়ল।

স্টেশনে কালও ছিনতাই হয়েছে। লোকে একটু গরম আছে তাই নিয়ে। জুটমিলের দেয়ালের পাশে খালধারে তিনদিন আগে একটা লাশ পাওয়া গেছে। গোস্বামীপাড়া যেতে রেল ব্রিজের তলার দিকে নিঃঝুম রাস্তাটায় সন্ধের পর লোক হাঁটে না। আর ওই যে বোম্বে রোড সি.সি. আর.-এ রেলবাঁধের পাশাপাশি যমজ ভাইবোনের মতো বহুদূর চলে গেছে, যার ওপর দিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা দূরপাল্লার বোঝাই ট্রাক হাতির মতো উঁচু হয়ে যাচ্ছে আসছে, সেদিকে থেকে রাতবিরেতে কয়েক বারই 'বাঁচাও, বাঁচাও' চিৎকার শোনা গেছে। কেউ অবশ্য বাঁচাতে যায় না। সকালে চায়ের দোকানে এসে আলোচনা করে।

দিনকাল বড় খারাপ পড়েছে। সন্ধেবেলা সাট্টার খবর আসে। খবরের জন্য বাচ্চা বাচ্চা ছেলেগুলো সব দাঁড়িয়ে থাকে স্টেশনে, কে খবর আনে কে জানে, শোনা যায় ছেলেগুলো হল্লাগুল্লা করতে করতে দৌড়ে আসে। কে হারে, কে জেতে বলা মুশকিল। কিন্তু রেললাইনের ওপারে তরকারিওয়ালা বিশে বেশ ব্যবসা করছিল এতকাল, তার কাল হল। হপ্তাবাজার বসে বিকেলের দিকে, বালি দুর্গাপুর তল্লাটে তাই সকালে বাজার করার রেওয়াজ নেই।

জুটমিলের আশেপাশে অবশ্য ধসা-লাগা আলু, ন্যাতানো পালং আর ময়লা মুলো, পেটফোলা আমেরিকান রুই, তেলাপিয়া আর মৃগেলের বাচ্চা নিয়ে বসে বটে কিছু লোক, কিন্তু দায় না ঠেকলে কেউ অতদূর যায় না। বিশে তক বুঝে দোকান দিয়েছিল। আলু-পেঁয়াজ, কপি-কড়াইশুটি, পালং-মুলো—সব নিয়ে বেশ দোকান। তারের ঝুড়িতে ডিমও রাখত। সকালে বালি-দুর্গাপুরের লোক মাছির মতো এসে পড়ত বিশের দোকানে। সে কী বিক্রি বাবা, দেড়া দাম হাঁকলেও ঘণ্টা দুয়েকে কিছু আলু ছাড়া সব মাল উবে যেত। তার বিক্রি দেখে পাশাপাশি আরো কয়েকজন দোকান দেওয়ার চেষ্টায় ছিল। কিছুদিনের মধ্যেই বিশের অবস্থা ফিরে যাওয়ার কথা। কিন্তু সে আর ফিরল না। ময়লা রঙের র‍্যাপার গায়ে, খোঁচা দাড়িওয়ালা ফর্সা বিশে তেমনই ম্লানমুখী দুখীরাম রয়ে গেল। ভিতরে সাট্টার পোকায় গোটা মানুষটাকে ঝুরঝুরে করে দিয়েছে। মানুর দোকানে সাত টাকা পঁয়ষট্টি পয়সার বাকি এখনো শোধ করতে পারেনি। গতমাসে পাকাপাকিভাবে দোকান তুলে দিল বিশে। এখন সে দোকানে সন্ধের পর সাট্টার দালালি করে লম্ফ জ্বেলে। রাজ্যের ছোটলোকের ভিড় সেখানে।

মানুর মুখোমুখি আবুর খাসির দোকান। গতবারের তুলনায় মাংসের দর কিলোপ্রতি দুটাকা করে বেড়েছে। চামড়া, খুর আর শিংটুকু বাদে সবই আবু নির্বিকার মুখে বিক্রি করে। দর বাড়াতে তার বিক্রি পড়েনি। সকালে এখানে মাছের আকাল, তাই মাংস খপাখপ বিক্রি হয়ে যায়।

মানু ওঠে খুব সকালে। তখন কাক-পক্ষীও জাগে না। দোকানঘরের পিছনে ছাইগাদায় জল ছাড়ে, চোখমুখ ধোয়। খাঁটা উনুনের পাশে গদাই পড়ে থাকে একটা ছেঁড়া শতরঞ্জীতে হাতকে বালিশ করে। তাকে পা দিয়ে ঠেলে বলে—ওঠ, ওঠ, শেষরাত থেকে ঠেলতে ঠেলতে গদাই অবশেষে উঠে যখন হাই ছাড়ে তখন এক কাঁটার ঘড়িতে সাড়ে চারটে পৌঁনে পাঁচটা।

দেরি হলে চলে না। উনুন ধরতে না হোক পনেরো মিনিট যায়ই। তা করতে সকালের খদ্দেররা এসে পড়তে থাকে। আছে জুটমিলের সকালের মজুর, রেলের বুড়ো কুলি, ঠিকাদারের লোক, হপ্তাবাজারের কিছু দোকানী। দোকানের ঝাঁপ খুলে তাঁতের সস্তা মশারি গুটিয়ে বিছানার শতরঞ্জী-বালিশ সব তাকের ওপর তুলে

ফেলে মানু। ফাঁকা জায়গায় বয়ম-টয়ম সাজিয়ে ফেলে। গদাই উনুন ধরিয়ে দিতেই কয়লার গন্ধ আর ধোঁয়ায় দোকানটা ভরে ওঠে। সেটা খারাপ লাগে না মানুর। কয়লার ধোঁয়ার গন্ধের মধ্যে একটা বেঁচে থাকার ভাব পায় সে।

গদাই-ই আসলে দোকানটা চালিয়ে নেয়। মানুর কোনো কাজ থাকে না। গদাই চায়ের জল করে, লিকার করে, দুধ চিনি মিশিয়ে ইঞ্জিনের মতো চামচে নেড়ে ছোট্ট গেলাসে চা ধরিয়ে দেয় হাতে হাতে। দরকার মতো আটার বিস্কুট, সস্তা কেক বয়ম থেকে নিজেই দেয়। এই একটু নিরালা সময় মানুর। এ সময়টায় সে কয়েকটা পাটের গুছি নিয়ে পায়ের বুড়ো আঙুলে আটকে দু হাতের তেলোয় পাকিয়ে দড়ি তৈরি করে। দড়ি তার কোনো কাজে লাগে না। জমে গেলে বিক্রি করে দেয়। কিন্তু ব্যবসার জন্য নয়, এ-ও অভ্যাস।

খরগোসকে বিস্কুটের টুকরো, কচি ঘাসপাতা গদাই-ই দেয়। টিয়াপাখির খাঁচার বাটিতে জল কিংবা ছাতুর গুলি বা দানা সব গদাই দেয়। মানু শুধু নজর রাখে। রাখতেই হয়। সে মালিক। এই ত্রিশের মধ্যে একটা বয়সে একটা দোকানের মালিক হওয়া সোজা কথা নয়। সে যেমন দোকানই হোক। একটা কিছুর মালিক হওয়ার দুরন্ত ইচ্ছে সেই কবে থেকে মানুর! এখন হয়েছে। এই দোকান তার, ওই গদাই তার কর্মচারী—এসব কি ভাবা যায়?

শীতের এই অন্ধকার ভোরবেলায় ঠ্যাং টান করে বসে পাটের সুতো পাকাতে পাকাতে মানু এইসব ভেবে খুব তৃপ্তি বোধ করে। সোমবার থেকে চায়ের বিক্রি ঝপ করে কমে গেল, চিনি গিয়ে সেঁধিয়েছে আঁধার বাজারে, দর চড়ছে ম্যালিরিয়ার জ্বরের মতো। গয়লা লালটেম প্রসাদ দুধ দিতে এসে রোজই গাঁইগুঁই করছে, আড়াই রুপিয়া সেরমে তার কুছু নাফা হচ্ছে না। পুরো তিন হলে হয়। মানু খ্যাঁক খ্যাঁক করে ওঠে বটে, কিন্তু মনে মনে বোঝে লালটেমও হক কথা বলছে। সে নিজে চায়ের দর গেলাস প্রতি দুই নয়া বাড়াতে পারে তো আর সবাই কি বসে থাকবে। বিকিকিনির জগৎটাই এরকম, একটার দর উঠল তো আর একটার দরও। ভাবে—আমিই বসে থাকি কেন? কাঁধ ধরাধরি করে তখন সবাই উঠবার চেষ্টা করে।

উনুনটা ধরে গেছে। ধোঁয়ার একটা ক্ষুদে মেঘ এখনো দোকানের চালের কাছে জমে আছে। ঢাউস কেটলিটা গরম খাচ্ছে। শীতকাল, এখন ফুটতে একটু সময় লাগে। একবুক চায়ের তেষ্টা নিয়ে জুলজুলে চোখে উনুনের দিকে চেয়ে বসে আছে জুটমিলের পরাণচন্দ্র। মাথা-গলা সব কম্ফর্টার আর ভূষকো চাদরে ঢেকে বুড়ো অনাদি দস্তিদার কাশছে। ও হচ্ছে চায়ের কাশি, গলায় গরমটুকু না গেলে কাশি থামবে না।

উনুনটা দিব্যি গনগনে হয়ে উঠে তাপ ছড়াচ্ছে। শীতের সকালে তাপটুকু ভারি ভালো। বাঙ্গুলুয়া একটা বিড়ি ধরিয়ে নিল উনুন থেকে। অনাদিচরণ দুটো রোগা হাত বাড়িয়ে তাপে সেঁকছে। গতবার হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি থেকে রিটায়ার করেছে। খুদকুঁড়ো কিছু প্রভিডেন্ট ফান্ডের যা পেয়েছিল সবই তার বউ হাতিয়ে নিয়েছে। ছেলেরা সেয়ানা। অনাদি দস্তিদার এখন সংসারের ফালতু মানুষ। যতক্ষণ বাড়িতে থাকে ততক্ষণ অশান্তি, তাই কাকভোরে একটু হাঁটাচলা করে এসে মানুর চায়ের দোকানে সেঁটে যায়। দু গেলাস চা খায়, বেলা দশটা পর্যন্ত খবরের কাগজটায় মাছির মতো লেগে থেকে সব রস শুষে নেয়। তারপর ওঠে। নিরীহ মানুষ, মাঝেমধ্যে মানু তাকে আধ পেয়ালা চা ফ্রি দেয়। ভারি খুশি হয় তাতে। প্রায় সময়েই বলে—'তোমার ব্যবসাবুদ্ধি বড় কম হে মানু। যদি এই সকালের দিকে সিঙ্গারা আর জিলিপি ভাজতে তো দুদিনে লাল হয়ে যেতে।'

বুড়োটার খিদে এই বয়সে চাগাড় দিয়েছে। নোলাটা এই বয়সে এসেই থকথক করতে থাকে। বুড়োমানুষ মানু কিছু কম দেখেনি। তার ওপর অনাদি দস্তিদার বাড়িতে যত্নআত্তি পায় না। বউ, ছেলের বউ খাওয়ার খোঁটা দেয়। মানু একটু অবহেলা ভরে বলে—'সিঙ্গারা জিলিপির বড় হ্যাঙ্গামা দাদা, ময়দা কোথা পাই! তার ওপর লোকজনও তো তাহালে বাড়াতে হয়। আমার ট্যাঁকের জোরই বা কী!'

অনাদি তাতে দমে না। বলে—'পয়সা না লাগালে কি পয়সা আসে! সেই জন্যই তো বলি তোমার ব্যবসাবুদ্ধি বড় কম। জগদম্বার নাম করে লাগিয়ে দাও, দেখবে কেমন হুড়মুড় করে পয়সা আসবে।'

মানু জানে, একবার ওসব শুরু করলে খদ্দেরের অভাব হবে না ঠিকই, কিন্তু নগদ ফেলে কেউ খাবে না। ওই অনাদি বুড়ো রোজ এসে খেয়ে খাতায় লিখিয়ে যাবে। তারপর পেট খারাপ হলে, বা মাসের শেষে বাকির পরিমাণ দেখে তার ছেলেরা এসে মানুকে চোখ রাঙিয়ে যাবে। তাই মানু হাঙ্গামা বাড়ায় না। চা-বিস্কুট, বিড়ি-সিগারেট, সস্তা কিছু সাবান, পাউডার, আলতা, আর পান—এই সবের বাকিবকেয়া উশুল করতেই জান বেরিয়ে যায়।

শীতের এই ভোরবেলাটি বড় চমৎকার। আবুর মাংসের দোকানের পিছন থেকে সূর্য উঠি-উঠি করছে। আলো ফুটতে গড়িমসি। চারধারে একটা আবছায়ার সর ফেলেছে কুয়াশা। চায়ের লিকারের গন্ধ ম-ম করছে। জুটমিলের করুণ ভোঁ বেজে উঠল ওই। একটা ডাউন গাড়ি কুয়াশা ভেদ করে কেমন ছিমছাম চলে এল। ফাঁকা গাড়ি, এত সকালে লোক হয় না। পোষা টিয়াটাকে হরেক কথা শেখানোর চেষ্টা হয়েছে, তবু বোল ফোটেনি। অবোধ একটা মিষ্টি শব্দ করে পাখিটা ডানা ঝাপটায়। খরগোশটা ভিতরের উঠোন থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে এসে মানুর কোলে উঠে বসল। খরগোশ জীবটা বড় অদ্ভুত, মুখে কোনো শব্দ নেই। একদম বোবা। এক কাঁটাওয়ালা ঘাড়িতে এখন পাঁচটা বেজে কিছু মিনিট হয়েছে। নিজের বড় একটা গেলাসে ঘন চা মেরে মানু ফের দড়ি পাকাতে বসে। মনে একটা সুখের ফুল সবসময় ফুটে থাকে আজকাল। গন্ধ ছড়ায়। ভারি সুন্দর।

ছেলেবেলাটা মানুর ভালো কাটেনি। এখান থেকে মাইল দুই আড়াই পশ্চিমে সাহেববাগানে তার তিন ভাই আর সাত বোন মিলে বাপের সংসারে মহা গন্ডগোল পাকাত। অভাবের সংসার। বাবা ছিল জি. টি রোডের কাঠের দোকানে ফুরনের মিস্তিরি। বড় দিদিদুটো পনেরো বছর বয়সেই পালায়। নানা কেচ্ছা কেলেঙ্কারীর পর এঁটো হয়ে ফিরে আসে। আবার কিছুদিন বাদে পালায়। তাদের ওই রকমই জীবন হয়ে গেল। এ যাবৎ দুজনেই দুবার তিনবার করে বিয়ে করেছে। পরের বোনেদের গতিও ভালো হয়নি। পরের দুজন স্বামীর ঘর করে না, বাপের ঘাড়ে বসে খায় এখনো। আর যা করে বেড়ায় তা মুখে আনা যায় না। ছোটটা এখনো ছোট, তার এখনো চোখ ফোটেনি। মাঝেমধ্যে এই সামনের রাস্তা দিয়ে কোথায় যেন যায়, তখন খুব মানুর দোকানের দিকে তাকিয়ে দেখে। কথাটথা বলে না।

মানুর আর দুটো ভাই আছে। মেজো জন কারখানায় ঢুকে গেছে, ছোটজন তাড়ির দোকান খুলেছে বেলানগরে। মানুই বড়। তা মানুও কিছু সুপুত্র ছিল না। প্রায় সময়েই বাপের সঙ্গে লাঠালাঠি লেগে যেত। বছর পনেরো বয়সে সে মায়ের গয়না চুরি করে সাতদিনের জন্য বোম্বে গিয়েছিল। সতেরো বছর বয়সে সে এক কিশোরীর সতীত্ব নাশ করে ফাঁকা ইস্কুলবাড়িতে টেনে নিয়ে গিয়ে। আঠারোতে একটা প্রায় খুন করে ফেলেছিল শীতলাবাড়ির পিছনের পুরোনো পুকুরপাড়ের জঙ্গলে। বাপ ভাই মিলে মানুকে তাড়াল। ছোট ভাই চানুটা ছিল হাড়ে বজ্জাত। পাড়ার লোকজনও ক্ষেপে গিয়ে একজোট হল তাকে মেরেধরে পুলিশে দেবে বলে। মানু পালাল।

পালিয়ে গেল আট কিলোমিটার দূরের হাওড়ায়। কাজকর্ম জোটে না তো জলের ট্যাঙ্কের কাছে এক বাড়িতে চাকরের কাজ পেয়ে গেল। কাজ কিছু না। স্বামী-স্ত্রী আর বাচ্চার সংসার। বউদি আনাড়ি মানুকে হাতে ধরে রাঁধতে শিখিয়েছিল। তা রাঁধত মানু, বাসনকোসন মাজত, ঘরদোর সাফ করত। বউদির তখন বাচ্চা হব-হব, মানু একদিন সকালে বসে দড়ি পাকাচ্ছে। দড়ি পাকানোর হাত ছিল বলে অবরে সবরে সে পাকাত। পাটের গুছি কিনে এনে পিঁজে, গুছি করে নিপুণ হাতে সরু মোটা নানা ধরনের দড়ি পাকাতে পারত সে। পঞ্চাননতলার গণেশের দোকানে মানু বিক্রির জন্য দিয়ে আসত। তাতে দু-চার টাকা ফালতু আসত হাতে। তা সেই সকালে দড়ি পাকাতে বসে মানু মজে গেছে। কাজের সময়ে জিব বের করে, চোখ দুটো ছোট আর ছুঁচের মতো সরু করে চেয়ে থাকে যেন বাহ্যজ্ঞান থাকে না। পাটের গুছির একধারে কাঠি বাঁধা, অন্য ধার দরজার কড়ায় লম্বা দড়ির পাক খেয়ে খেয়ে শক্ত হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ সেই লম্বা দড়িটার

দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে এক লহমার জন্য একটা বিভ্রম হয়ে গেল। হঠাৎ যেন দেখতে পেল—একটা হাসপাতালের বাড়ি, বাচ্চা ট্যাঁ ট্যাঁ করে কাঁদছে, একটা টেবিল-ঘড়িতে রাত সাড়ে আটটা বাজে।

তখন দাদাবাবু ভাত খেয়ে অফিসে বেরোবে, তার গোছগাছ করছে বউদি, টিফিনের বাক্স সাজিয়ে দিয়েছে, এক গেলাস জল গড়িয়ে রাখা আছে টেবিলে, তার ঢাকনা খুলে হাতে দেবে দাদাবাবুর। মস্ত পেটটা নিয়ে বউদি হাঁসফাঁস করতে করতে স্বামীর দেখাশোনা করছে। দাদাবাবু প্যান্টের বোতাম আঁটতে আঁটতে বলল—'কবে যে কখন হুট করে তোমার পেন উঠবে কে জানে! অফিসে গিয়ে দুশ্চিন্তায় কাজ করতে পারি না।'

বউদি সান্ত্বনা দিয়ে বলল—'হবে, অত চিন্তা কী! সকলেরই হয়। তা বলে অফিস কামাই করে বসে থাকবে নাকি!'

মানু দড়ি রেখে নিঃশব্দে উঠে এসে গম্ভীরভাবে বলল—'আজ রাত সাড়ে আটটায় তোমার মেয়ে হবে বউদি।'

সেই শুনে কর্তা-গিন্নি হেসে অস্থির। দাদাবাবু অবশ্য হাসি সামলে বলল—'কে জানে বাবা! ওরা গাঁয়ের লোক, জানতেও পারে অনেক গুহ্য কথা। ঠিক আছে মানু, তোর কথা যদি সত্যি ফলে তো তোকে একটা কিছু দেবো। আজ অফিস থেকে হাফ-ডে করে চলে আসছি।'

তাই এসেছিল দাদাবাবু। ঠিক সাড়ে তিনটেয় বউদির ব্যথা উঠল। ট্যাক্সি করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। রাত ঠিক সাড়ে আটটায় বউদির একটা ফুটফুটে মেয়ে হল। এমনভাবে মিলে গেল ঘটনাটা যে মানুর নিজেরই প্রথমটায় বিশ্বাস হয়নি। যেন স্বপ্ন দেখছে।

দাদাবাবু মেয়ে হওয়ার ঝামেলায় ছোটাছুটি করে ক্লান্ত হয়ে অনেক রাতে বাসায় ফিরে মানুর দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। হঠাৎ চোখে জল এসে গেল, ধরা গলায় বলল—'মানু, তুই কি ভগবান? কেমন করে বুঝলি বল তো, সব যে কাঁটায় কাঁটায় মিলে গেল! তুই না বললে আমি আজ পুরো অফিস করে সেই রাত সাতটায় এসে পৌঁছোতাম, তোর বউদির কী অবস্থা হত বল দেখি!'

মানু নিজেও এত অবাক হয়ে গিয়েছিল যে কথা বলতে পারেনি। দাদাবাবু মেয়ে হওয়ার পর খুশি হয়ে তাকে হাতের কাছে যা পেল তাই ধরে দিল। তার মধ্যে ছিল একটা টেরিলিনের দামি শার্ট, একটা সোনার আংটি আর ওই টেবিল-ঘড়িটা। এরপর থেকে দাদাবাবুর বন্ধু-বান্ধব আত্মীয় অনেকেই মানুর খোঁজে আসত। সকলেই ভবিষ্যৎ জিগ্যেস করে। কিন্তু মানু তার কী জানে! সে কিছু বলতে পারত না। দাদাবাবুর এক বন্ধু এসব বুজরুকী বিশ্বাস করত না, প্রায়ই এসে বলত—'কি হে মানু ভগবান, আর কী সব দেখছ বলো! অন্ধকারে একটা ঢিল খুব লাগিয়েছ, এবার আরো কিছু ছাড়ো।'

মানু মনে মনে উত্তেজিত হত। রোজই সকালে দড়ি পাকায় সে কিন্তু আর ওরকম ধারা হয় না। রোজই সে আশা করে আজও দড়ি পাকাতে বসলে কি না কি দেখতে পাবে। পায় না। তাই ঠাট্টা বিদ্রূপ দেখে রেগে যায়।

এইভাবে দিন যায়। বউদির বাচ্চাটা দুমাস বয়সে দিব্যি সেয়ানা হয়ে উঠল। মানুকে দেখলেই খুশী। কোলে উঠে বেড়াবে। বড্ড মায়া পড়ে গিয়েছিল মানুর। সেই সময়ে একদিন ফের সকালবেলায় অন্যমনস্ক হয়ে দড়ি পাকাতে পাকাতে মানু মজে আছে, লম্বা দড়িটার ওপর মনোযোগী চোখ। দেখছে যেন শূন্যের মাঝখানে একটা লম্বা পথ চলে গেছে কাঁহা-কাঁহা মুল্লুক। চেয়ে চেয়ে হঠাৎ মাথার মাঝখানটায় যেন একটা আলো জ্বলে উঠল। দেখতে পেল, হাওড়া ময়দানের মোড় থেকে একটা তিপান্ন নম্বর বাস পঞ্চাননতলা রোডে ঢুকে একটা কমবয়সী ছেলেকে বেমক্কা ধাক্কা মেরেছে। তাই হই-চই করে লোকজন ছুটছে বাসটাকে ধরতে। বাসওয়ালা প্রাণপণে বাস চালিয়ে দিয়েছে। সরু ভয়ঙ্কর রাস্তা, পদে পদে বিপদ। তবু প্রাণের ভয়ে পাগল ড্রাইভার দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে বোধহয় পঞ্চাশ মাইল স্পিডে বাস ছেড়ে দিয়েছে। বাসের মধ্যে শ'দুই লোক প্রাণভয়ে চেঁচাচ্ছে—কখন অ্যাকসিডেন্ট হয়। হলও। লক্ষ্মণদাস লেন পেরিয়ে পরের স্টপের কাছাকাছি বাসটা মুখোমুখি একটা লরির সঙ্গে ভিড়িয়ে দিল। এইসব যখনই দেখে মানু সেই সঙ্গে একটা ঘড়ির কাঁটাও কী

করে যেন দেখতে পায়। তখন ঠিক সন্ধে সাড়ে সাতটা বাজে। জখম বাস থেকে রাস্তার লোক ধরাধরি করে লোক নামাচ্ছে। তার মধ্যে দাদাবাবু। দাদাবাবুর পেটে একটা বড় রকমের জখম। চোখ চেয়ে বলছে—জল! জল!

মানু সেদিনও গিয়ে বলল—'দাদাবাবু আজ বেরিও না।'

দাদাবাবু বলে—'বেরোব না কী রে! অফিসে অডিট হচ্ছে।'

মানু আর কিছু বলেনি।

বউদি অবাক হয়ে জিগ্যেস করল—'বেরোতে বারণ করছিস কেন?'

মানু মাথা নেড়ে চলে এল। ভাঙল না। মনে মনে সে একটা মতলব ভেঁজেছিল, তার দেখাগুলো সত্যি হয় কিনা সেটা আবার যাচাই হওয়া দরকার। একবারেরটা মিলে গেছে বলেই যে পরের বারেরটাও মিলবে তার ঠিক কী? দাদাবাবু যদি না-ই বেরোয় তবে প্রমাণ হবে কী করে যে সে যা দেখেছে তা সত্যি!

মিলেছিল। ঠিক সন্ধে সাড়ে সাতটায় বেলিলিয়াস লেন-এর কাছে তিপ্পান্ন নম্বর বাস মুখোমুখি লেগে গেল একটা লরির সঙ্গে। ঠিক এখানে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা চোখের সামনে দেখল মানু। দাদাবাবুকে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে একবার এসে খবর দিল বউদিকে।

পরদিন সকালেই মানু সে বাড়ি থেকে কেটে এল।

হারাধন সাঁতরার লেদ মেশিন চালানোর কাজ যখন করত তখন কষ্ট ছিল বেশি। তার চেয়ে বাড়ির কাজ ছিল অনেক আরামের। দাদাবাবু, বউদি, বাচ্চাটা সবাই মিলে যে সংসার তার মধ্যে যেন ঢুকে গিয়েছিল সে। হারাধন ছিল লক্ষ্মণদাস লেনের হামবড়া মাস্তান। অবশ্য গুন্ডামি করবার মুরোদ ছিল না, কিন্তু ডাক-হাঁক খুব। কদমতলার দু স্টপ আগে তার লেদ মেশিনের কারখানা। কারখানা বলতে যা বোঝায় তা অবশ্য নয়। একখানা লেদ একটা ছোট্ট খুপড়ির মধ্যে। হারাধন বলত—কারখানা, প্রোজেক্ট, ইন্ডাস্ট্রি। সাইকেলে চেপে আসত, এসেই সাইকেলখানা বাইরে রেখে ভিতরে ঢুকে মানুকে মেজাজ নিয়ে বলত—'গাড়িটা তুলে রাখ তো।' সাইকেলকে বরাবর কেন যে গাড়ি বলত সে! তার হাতে মানু চড়টা চাপড়টা খেয়েছে, কিন্তু খুব যত্ন আর মনোযোগ দিয়ে ওই হারাধানের কাছেই লেদ মেশিনের কাজ খানিকটা শিখেছিল। খুপড়িতেই থাকত। সেখানেও সেই দড়ি পাকানোর অভ্যাসটা ছাড়তে পারেনি সে।

আগের দিন কৈলাশ ব্যানার্জি লেন-এর চিলতে জমিতে টেনিস বলের একটা ফুটবল ম্যাচ হচ্ছিল। তাইতে কে কাকে লেঙ্গি মারে। হারাধন তাই গিয়ে যে লেঙ্গি মেরেছিল তাকে ধরে এনে দুচার ঘা দেয়। খামোখা ওস্তাদি দেখানো। বোধহয় মনে মনে হারাধন গুন্ডা হওয়ার ইচ্ছে পুষে রেখেছিল। কিন্তু গা-জোয়ারিতেই তো আর সব হয় না। হারাধনকেও কেউ গুন্ডা বা মস্তান বলে স্বীকার করেনি কোনোকালে। ঘরে মা-ছেলে, বুড়ো বাপ, ভাই সব সামলে লেদ চালিয়ে গুন্ডা হওয়ার দরকারও পড়ত না তার। কিন্তু ওই মাঝে মাঝে ভিতরকার আধমরা ইচ্ছেটা চাগাড় দিত। তখনই খামোখা, প্রায় বিনাকারণে একে ওকে ধরে দু-চার ঘা লাগিয়ে দিল হয়তো। সেই ইচ্ছেপূরণের মারধর কিছু মানুর ওপর দিয়েও গেছে।

ফুটবল খেলার সেই ঘটনার পরদিন সকালে মানু দড়ি পাকাতে বসেই টের পেল, আজও একটা ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। সে দেখল, হারাধন যেন দুপুরে ভাত খেতে যাবে বলে সাইকেল বের করছে। রাস্তায় নামতেই একগাদা ছেলে এসে ঘিরে ফেলল। কারো মুখে রা নেই। হাতে রড আর ভোজালি। একটা শ্বাস ফেলার সময়ও না দিয়ে একজন রড দিয়ে হারাধনকে মারল, একজন সাইকেলটা সরিয়ে নিল টেনে। হারাধন পড়ে গিয়ে ফের উঠে দৌড়োচ্ছে। যে ছেলেটার হাতে ভোজালি সে একটা অশ্রাব্য গাল দিয়ে ঠিক সামনে থেকে পেটের মধ্যে ভরে দিল। হারাধন পড়ে গেছে হাঁটু গেড়ে, তার সামনেই রক্তমাখা নাড়ি-ভুঁড়ি বেরিয়ে পড়ে আছে রাস্তায়, তারই পেট থেকে। অবাক হারাধন তবু বাঁচবে বলে সেই নাড়ি-ভুঁড়ি কুড়িয়ে নিয়ে দু-হাতের আঁজলায় ধরবার চেষ্টা করছে। পারল না, কিন্তু শরীরটা ওই অবস্থাতেও অনেকখানি টেনে তুলেছিল। প্রাণশক্তি বটে। পিছন থেকে মাথায় আর এক ঘা রড বসাল একজন। তারপরই সব ভোঁ ভোঁ হয়ে গেল।

এটা দেখেই মানু বুঝল, আজ হারাধনের শেষ দিন। তাই মনে মনে তৈরি হল, আজই কেটে পড়তে হবে।

সেদিন হারাধন এল একটু বেলা করে। খুব টংয়ে ছিল সেদিন। দোকানে ঢুকেই ধমক টমক। কিন্তু বারবারই অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল। বার বার সিগারেট খাচ্ছে, আর জল। একবার বলল—'জানিস, আমাকে শালারা ওয়ার্নিং দিয়ে গেছে?'

অবাক হয়ে মানু বলে—'কারা?'

হারাধন গরম খেয়ে বলে—'তোর তাতে দরকার কী?'

মানু ফিক করে হেসে বলে—'দরকার আর কী?'

—'হাসছিস যে!'

মানু না ভেবেচিন্তে বলল—'হারাধনদা, তুমি তো ভাইদের সঙ্গে এজমালি বাড়িতে থাকো। নিজের হিস্যা বুঝে নাওনি? আজ যদি তোমার ভালোমন্দ কিছু হয় তো বউদির আর বাচ্চার কী হবে?'

হারাধন কিন্তু রেগে গেল না। একবার গরম চোখে তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিল।

মানু বলল—'আজ বরং আগেভাগে বাড়ি চলে যাও। কাজ যা দেখার আমিই দেখবখন।'

—'কেন, বাড়ি যাবো কেন?'

—'ওই যে কারা ভয় দেখিয়েছে বললে যে!'

—'এঃ ভয়! আমি তো কারো পরোয়া করি নাকি!'

—'তবুও যাও। কাজ তো তেমন কিছু নেই। আমি দেখবখন।'

হারাধন শিশ টিশ দিল, ঘুরল ফিরল একটু। অবশেষে বলল—'এ বেলাটা থাকি। ও বেলাটা না হয় তুই চালাস। দিনের বেলায় আর শালারা আসবে না। অত সাহস নেই।'

মানু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। সকালে ওই দৃশ্যটা দেখার পরই সে তার নিজের পোঁটলা সরিয়ে ভূষিওয়ালার কাছে রেখে এসেছিল। দুপুর হওয়ার অনেক আগেই সরে পড়বার মতলব ছিল। কিন্তু ভাবল, থাকগে, দেখেই যাই, ফলে কি না!

হারাধন দুপুরে বাড়ি যাওয়ার জন্য উঠতেই মানু বলল—'দাদা, একটা কথা বলি!'

চোখ পাকিয়ে হারাধন বলে—'খুব যে বোল ফুটেছে রে আজ!'

—'না। বলছিলাম রাস্তায় ঘাটে যদি হাঙ্গামায় পড়েই যাও তো তুমি ডাকাবুকো আছো ঠিক বেরিয়ে যাবে। কিন্তু টানা হ্যাঁচড়ায় হাতের ঘড়ি, পকেটের টাকা না চোট হয়ে যেতে পারে। বলছিলাম কি, ওসব রেখে খালি হাতে পকেটে যাও।'

হারাধন ভাবনায় পড়ল, তার ভয় ভাবনা ঢুকেছে তখন। বলল—'রেখে গেলে হাতাবি না তো!'

মানু সত্যি কথা বলে ফেলল—'তোমার ভালোমন্দ কিছু না হলে হাতাব না, বাক্য দিলাম। কিন্তু যদি তুমি টেঁসে-ফেঁসে যাও তো ওই দিয়ে আমার বকেয়া পাওনা মিটিয়ে নেবো।'

হারাধন ভাবল মানু ঠাট্টা করছে। তাই একটা মৃদু লাথি কষিয়ে বলল—'ইঃ। শালার পাওনাগণ্ডা! ক'পয়সা পাস শুনি!'

মানু তখন সময় দেখছে। আর মোটে দশ মিনিট। তারপরই হারাধন দুনিয়ার বেড়া ডিঙিয়ে যাবে। সে কেন নিজের পাওনাগণ্ডা ছাড়ে! অন্তত দু'মাসের পঁচাত্তর টাকা করে দেড়শো টাকা পাওনা।

শেষ পর্যন্ত হারাধন অবশ্য ঘড়ি আর টাকা গেঁজে রেখে গেল। সে বেরোতেই মেশিনঘরের দরজা বন্ধ করে মানু একটা ফোকর দিয়ে দৃশ্যটা দেখতে লাগল। হুবহু সকালে যা দেখেছিল।

পুলিশ যখন এল তখন মানু ভালোমানুষ। ঘড়ি আর টাকার গেঁজে লেদ মেশিনের তলায় চালান হয়ে গেছে। পরে গুনে দেখেছে, গেঁজেতে সাতশো টাকা, ঘড়িটা বেচে প্রায় শতখানেক পেয়েছিল। তা এই টাকা আর ঘড়ি হারাধানের বউকে ফেরত দেওয়ারই ইচ্ছে ছিল তার। কিন্তু ছোটলোক হওয়ার বিপদ এই যে,

ভালো কাজ করতে গেলে ফেঁসে যাওয়ার ভয় থাকে। ফেরত দিতে গেলে যদি চোর বলে সন্দেহ করে, যদি খুনের সঙ্গে জড়ানোর চেষ্টা করে? সেই ভয়ে দেয়নি মানু।

সেই টাকা পয়সা নিয়ে পালিয়ে এল বালি দুর্গাপুর। নিজের বাড়িতে আর গেল না। হপ্তা বাজারেই তখন নন্দদুলাল সা-র দোকান উঠে যাচ্ছে। নন্দদুলাল একটা মিষ্টির দোকান করত। তারকেশ্বরের জলছানা মেরে চালের গুঁড়ো কি ভুষিটুষি মিশিয়ে গুচ্ছের চিনির পাকে শক্ত শক্ত সন্দেশ রসগোল্লা পান্তুয়া সাজিয়ে বসত। কে কেনে? একে অখাদ্য, তার ওপর এখানকার হাঘরে লোকদের পকেটে অত পয়সা নেই। তবু টুকটাক চালাচ্ছিল নন্দদুলাল। বয়স হয়েছিল, একদিন বিনা নোটিশে হার্টফেল করে। তার ছেলেরা সব বাবুমানুষ। বাপের ব্যবসা ধরতে কেউ এল না। সেই অবস্থায় বাড়িওয়ালাকে পটিয়ে দোকানটা বন্দোবস্ত নেয় মানু।

বেশ আছে। মিষ্টির বদলে চা আর বিস্কুটের চাহিদা ঢের বেশি। রমরম করে দোকান চলে। কয়েক বছরে মানুর হাতে পয়সা কিছু কম জমেনি।

আবুর সাকরেদ কাশেম দুটো খাসি গোলাঘর থেকে টেনে এনে উঁচু দোকানঘরের থামে বেঁধে রাখল। প্রথম খাসিটা জবাই করার আগে আবু এক গেলাস চা খায়, আর একটা কোয়ার্টার রুটি। কাশেমও তাই। দুটো কোয়ার্টার রুটি আর দু গেলাস চা গদাই গিয়ে আবুর দোকানে পৌঁছে দিয়ে এল। আবু চায়ে ভিজিয়ে রুটির দলা গিলে ফেলছে কোঁৎ কোঁৎ করে। খাসি ডাকল—ম্যা।

খবরের কাগজওলা কাগজটা ভিতরবাগে ছুঁড়ে দিয়েই সাইকেলে হাওয়া হয়ে গেল। গোটা চারেক হাত কাগজটা ধরার জন্য বেড়ে আসে, মানু কাগজটা ছুঁয়েও দেখে না। একমনে দড়ি পাকায়। কিছুক্ষণ পর, এক কাঁটাওয়ালা ঘড়িতে যেই সাড়ে সাতটা বাজবে অমনি এসব কাজ বন্ধ করে মানু পুরো দোকানদার হয়ে যাবে। ওই সময়টায় কুঁচো কুঁচো ছেলেপুলেরা আসে লজেন্স টফি কিনতে। পানও বানাতে হয়।

হপ্তা বাজারের রাস্তা দিয়ে আজও বোনটা যাচ্ছে। সবচেয়ে ছোট, বয়স এখনো বোধহয় তেরো পূর্ণ হয়নি। রোগাটে, কালো চেহারা, অন্য বোনেদের মতো ছবুলে নয়। চোখ মুখ সুশ্রী খুব না হোক, নরম সরম আছে। চোখ দুটোয় এখনো শিশুর হাবভাব আছে। পরনের শাড়িটা খুব পরিষ্কার নয়, কম দামি তাঁতের। শাড়ি পরার বয়স নয়, বোধহয় ফ্রক তেমন ভালো লাগে না, না হয় তো নেই। দিদিদের কারো শাড়ি চেয়ে পরেছে। ব্লাউজের রং আলাদা। পায়ে একটা হাওয়াই চটি। এই শীতে আঁচলটাও গায়ে জড়ায়নি, গরমজামা তো দূরের কথা। আজও হাঁ করে তাকাতে তাকাতে যাচ্ছে।

বাপ ভাইয়ের সঙ্গে যেমন, তেমননি বোনদের সঙ্গেও মানুর কোনও সম্পর্ক নেই। ছোট ভাইটা তাড়ির দোকান করে পয়সা করেছে, চুরি ছিনতাই ওয়াগন ভাঙা সবই করে সেই সঙ্গে। এখানে ফিরে আসবার পর সেই সবচেয়ে বেশি হামলা করেছিল মানুর ওপর। বাবা তো তাকে দেখেই আঁৎকে উঠে যায় আর কী! বড় ভাই বিয়ে করেছে এক খেদানো বউকে, রেডিমেড এক বাচ্চা নিয়ে সে এসে স্বামীর ঘরে উঠতে চেয়েছিল পারেনি। ইদানীং বড় ভাই কারখানায় আস্তানা নিয়েছে। সংসার এখন ছোটজনই দেখে। সেই সকলের কর্তা। তবে তার সঙ্গে মানুর একদম বনে না। শাসিয়ে রেখেছে, সাহেববাগানের সীমা ডিঙোলে পুঁতে ফেলবে। তা মানুও যায়না, যাওয়ার কোনও ইচ্ছেও হয় না। সেই ভাই-বোনেদেরও বলে রেখেছে মানুর সঙ্গে মিশলে বা কথা বললে বাড়ি থেকে দূর করে দেবে। তার খুব সম্মানবোধ। মানু যে সেই এক বাড়িতে চাকরের কাজ করত—সেইটাই এখানে চাউর হয়ে যাওয়ায় আর মানুকে দেখতে পারে না চানু। তা না দেখতে পারলে কিছু যায় আসে না। তবু ওই চানু যে সংসার দেখছে এটাও তো কম নয়।

মাঝে মাঝে চানুকে দেখে মানু। পেল্লায় চেহারা হয়েছে। কিছুদিন লিলুয়ায় সিংজির কাছে তালিম নিয়েছিল। গাঙ্গুলিদের আখড়ায় ব্যায়াম-ট্যায়াম করত। সিংজির কাছে ডাকাতির মহড়াটাও ভালোই নেওয়া আছে। মাণিকরাম নামে এক পশ্চিমা এক সময়ে এখানে ওয়াগান ভাঙিয়েদের সর্দার ছিল, তার ঠাঁটবাটই ছিল আলাদা। তা তাকে কোণঠাসা করে চানুদেরই এখন রবরবা। অবশ্য ওয়াগান ভাঙা এখন আর তেমন সহজ নয়। তবু রাস্তারও তো শেষ নেই। চানু পাহাড়প্রমাণ শরীর নিয়ে দলবলের সঙ্গে এখানে সেখানে

রাজারাজড়ার মতো ঘুরে বেড়ায়। আর প্রাক্তন রাজা মাণিকরাম এখন বাঁধানো বটতলায় পুকুর ধারে তাড়ি আর তিন তাস নিয়ে বসে সাকরেদদের সঙ্গে। সেও কিছু খারাপ নেই। এককালে যা করেছে তাতেই চলে যায়। সমাদ্দাররা খানিক জমি ছেড়ে দিয়েছে, তাতে দোতলা হাঁকড়ে ভালোই আছে সে। কিছু তোলা আদায় হয় রেলধারের বিকেলের আনাজ ব্যাপারীদের কাছ থেকে, ইঁটখোলার ম্যানেজার দেয়, সাট্টাওয়ালারা দেয়, কুলিদের সর্দার দেয়, দুচার জন মহাজনও দেয়, সাকরেদরাও বসে থাকে না। বোম্বে রোডে তাদের দলবলও হামলা করে।

হপ্তাবাজারে বসে সবই দেখে মানু। দিনকাল খারাপ পড়েছে। কাউকে কিছু বলার নেই। যে যত চুপ করে থাকতে পারে সে তত বুদ্ধিমান। সে সকালে দড়ি পাকায়, সারাদিন চা ঘোটে, পান বানায়, সওদা বেচে পয়সা গোনে, চারধারের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামায় না।

বাপকে বহুকাল দেখা যায় না এদিকে। একসময়ে ভাবে, টেঁসে গেল নাকি। সমবায়পল্লীর বিপিন একদিন খবর দিয়ে গেল, স্ট্রোক হয়েছে। শয্যাশায়ী। মানু খুব গা করেনি। টাঁসলে টাঁসবে। বয়স তো হল।

গত সপ্তাহে হঠাৎ এই বাজারেই খপ করে দেখা হয়ে গেল। একটা বিপুল সাইজের বাঁধাকপি ওজন করাচ্ছে। খুব রোগা হয়ে গেছে। শার্টের কলারের ওপর দিয়ে গলার শুকনো নলীটা দেখা যাচ্ছে। চোখ কাচের মতো প্রাণহীন। মানু সামনে দিয়ে দু-একবার ঘোরাফেরা করল হাওয়া বুঝবার জন্য। তা বাপ তাকে চিনতে চাইল না। খুব বিরক্ত আর বিরস মুখটা ফিরিয়ে নিল।

মানু হাওয়া বুঝে গেছে। তাই পরিবারের লোকজন নিয়ে মাথা ঘামায় না। কিন্তু একটা খটকা থেকে যায়। রোজ সকালে বোনটা যায় কোথায়?

ডেকে জিগ্যেস করতে সাহস হয় না। হয়তো উত্তর দেবে না, নয়তো চানুকে গিয়ে বলে দেবে। চানু এসে হামলা করতে পারে।

আজ দড়ি পাকানো রেখে ঝাঁপের সুমুখদিকে এগিয়ে এসে একটু চেয়ে থাকল মানু। বোনটা হপ্তাবাজার পার হয়ে সোজা যাচ্ছে জি. টি. রোডের দিকে। একটু এগিয়েই পিছু ফিরে মানুকে দেখল। দাঁড়াল।

একটু ইতস্তত ভাব। কথা বলতে চায় নাকি!

মায়াদয়া নয়, ওই একটু কেমন করল মানুর। হাতছানি দিয়ে ডাকল। ওমা! তাইতে দিব্যি গুট গুট করে ঘুরে আসতে থাকল মেয়েটা। মুখে একটু লাজুক হাসি। চোখে ভয়।

কাছে আসতে জিগ্যেস করল—'চা খাবি একটু?'

মেয়েটা ভয়ের চোখে চেয়ে ঘাড় নাড়ল, খাবে না।

—'কোথায় যাচ্ছিস?'

মৃদুস্বরে বলে—'কাজে।'

—'কাজে?' বলে অবাক হয় মানু—'কাজ কীসের?'

মেয়েটা হাত তুলে জি.টি. রোডের দিকটা দেখিয়ে বলে—'ওইখানে একটা ইস্কুলে কাজ পেয়েছি।'

ইস্কুলের কাজ শুনে আরো অবাক হয় মানু। বলে—'কী কাজ? পড়াস নাকি?'

—'না।' বলে ভারি লজ্জিত হয়ে বলে—'এমনি কাজ।'

খদ্দেররা রয়েছে সব। দেখছে। সকলের সামনে আর জিজ্ঞাসাবাদ করে না মানু। তবে বুঝতে পারল, ইস্কুলে ঝাড়া মোছার কাজ বা ঝিয়ের কাজ পেয়েছে।

মানু বলল—'অনেক দূর থেকে হেঁটে আসছিস, একটু চা খেয়ে যা। ওই ভিতরের দিকে আলমারির পিছনে আড়ালে বসার জায়গা আছে। যা।'

তা বোনটা একটু ভেবেটেবে হুট করে ঢুকে গেল ভিতরে। বলল—'আরো আধঘণ্টা পর ইস্কুল বসে।'

অর্থাৎ এই আধঘণ্টা সে এখানে জিরোতে চায়, বুকের কিছু কথাও বোধ করি খালাস করার ইচ্ছে। এক গেলাস চা আর একটা কেক নিজের হাতেই নিয়ে গিয়ে আলমারির পিছনে লাজুকভাবে বসে-থাকা বাসন্তীর

পাশে বেঞ্চে বসে মাঝখানটায় রেখে বলল—'খা। চাকরি করছিস কেন?'

—'না করে কী করব? ছোড়দা বলেছে, নিজের রাস্তা দ্যাখ। বিয়ে করা বোনদের সব তাড়িয়ে দিয়েছে। বলেছে, এভাবে থাকতে পারবে না কেউ। যে যার স্বামী বা শ্বশুরঘরে চলে যেতে হবে। আমাকে তাড়ায়নি, কিন্তু বলেছে, ওর বিয়ের পর বেশি দিন রাখবে না। হয় বিয়ে দিয়ে দেবে, না হলে অন্য জায়গা দেখে নিতে হবে। মা-বাবা ছাড়া কাউকে রাখবে না।'

—'বিয়ে করছে নাকি? শুনিনি তো!'

বাসন্তী হাসল, বলল—'সিমলাগড়ের এক বড় ঘরের মেয়ে। অনেক দেবে থোবে। তারা বলেছে, ধুমসো ধুমসো বোন সব ঘাড়ে পড়ে থাকলে চলবে না। ফাল্গুনেই বিয়ে।'

—'তোর বিয়ের কী করেছে?'

—'কে জানে!' বলে ঠোঁট ওল্টায় বাসন্তী। বলে—'আমি বিয়ে করব না।'

—'তো কোথায় যাবি?'

—'ইস্কুলের বড়দিদিমণিকে বলেছি। যদি হয় তো তাঁর বাসায় থাকব।'

—'সে তো ঝিয়ের কাজ করাবে।'

—'করব।' নিপাট মুখে বলে বাসন্তী—'ইস্কুলেও তো ঝিগিরিই করি।'

একটা শ্বাস ফেলে মানু বলল—'খা। জুড়িয়ে যাবে।'

বলে উঠে চলে এল সামনের দিকে। খদ্দের এসেছে। একটু বাদে বাসন্তী উঠে চলে গেল, বলে গেল—'যাই দাদা।'

মানু মাথা নাড়ল কেবল। পাজি বোনগুলো বিদায় হয়েছে তাতে খুশিই হয়েছে মানু। সেগুলোর যে গতিই হোক, কিছু যায় আসে না। কিন্তু বাসন্তীটা এখনো বড্ড ছোট্ট। ওকে না তাড়ালেও পারে চানু।

সারাদিন নানা কাজের মধ্যেও মানু একটু অন্যমনস্ক থাকে। দুপুরে বড়বাজার থেকে সওদা করে আসে। বিকেলে খরগোশ কোলে করে বসে থাকে চড়া শীতের মধ্যে। হপ্তাবাজার গমগম করে এখন। বিস্তর খদ্দের। গদাই একা হিমসিম খায়। কিন্তু মানু নিজে খুব একটা হাত লাগায় না। এ বেলাটায় বাকির খদ্দেরের চেয়ে নগদের খদ্দেরই বেশি। সতেরো পয়সা দরেও না ঘাবড়ে খাওয়ার লোক আছে পৃথিবীতে। আজ বড়বাজারও তেজি গেছে। সামনের সপ্তাহে বিস্কুটের দামও বাড়বে, কেক-রুটির দামও। সবই বাড়াতে হবে।

মানুর নেশাটেশা নেই। ছেলেবেলায় ক'বার তাড়ি চোলাই খেয়েছিল। গলা জ্বালা করে বমি হয়ে গেছে তাই খায় না। বিড়ি-সিগারেটও ভালো লাগে না, ভসভসে ধোঁয়া গিলে ফালতু চোঁয়াল ব্যথা। সে কেবল গুড়াকু দিয়ে সকালে দাঁত মাজে। সেইটেই একমাত্র নেশা। আর মাঝে মাঝে শিউলাল রিক্সাওয়ালা খৈনি ডলে তাকে ভাগ দেয়, সেইটে ঠোঁটে ফেলে রেখে চিড়িক চিড়িক থুথু ফেলে।

দিন তিনেক কেটে গেল। ঘোষেদের আটাকলের পিছনে নন্দীদের একটেরে বাড়ি। ওদের অবস্থা এক সময়ে ভালো ছিল। ঘোষ, দত্ত এরা সব যে দোকান পসার আর বাড়িঘর করেছে সে সবই ওদেরই জমি কিনে। এখন বিধবা নন্দীগিন্নী দুই মেয়ে আর চার ছেলে নিয়ে থাকে। বড় ছেলে দুজন আর বড় মেয়ে সবাই চাকরি করে। ভালো চাকরি নয়। ছেলে দুজনের একজন লিলুয়ার এক লোহার কারখানায়, অন্যজন রেলের ক্লাস ফোর স্টাফ। মেয়েটাও লেখাপড়া তেমন শেখেনি বলে একটা ওষুধ কোম্পানির শিশি বোতল ধোয়ার কাজ করে।

সেই মেয়েটাই এখন ঝুলছে।

ঝুট-ঝামেলা আকজাল একদম পছন্দ নয় মানুর। এই বোবা খরগোশ, ওই ট্যাঁ ডাকা টিয়াটা, আর আধবুড়ো গদাই—এ হলেই তার চলে যায়। আর কাউকে লাগে না। এই দোকানটাই তার ঘরবাড়ি। নিজেকে দিব্যি এই দোকানে ফিট করে নিয়েছে মানু। কেউ যদি উটকো জোটে এসে, নন্দীদের মেয়ে বা আর

কেউ তো এসেই হুড়ো দেবে বাড়ি বাসা খোঁজা, খাট পালং আনো, রূপটান আয়না শাড়ি যোগান দাও। পরের মেয়ে এসে বুকে হাঁটু দিয়ে আদায় করবে।

কিন্তু নন্দীদের মেয়েটা ফ্যাঁকড়ায় ফেলেছে খুব। মেয়েছেলে, তায় অভিভাবক বলতে মা আর ভাইয়েরা। মা মেয়ে গছানোর জন্যে মুখিয়ে বসে আছে, ভাইয়েরাও গররাজি নয়। মানু হপ্তাবাজারে চালু দোকানের মালিক, পয়সা টয়সা করেছে, পাত্র খারাপ না। বরং নন্দীদের মেয়ে কুসুম কালো, স্বাস্থ্যখানা ভালো হলেও মুখশ্রী ভালো নয়। গোলপানা বেড়ালমুখী। তার ওপর খর-মেজাজ। বেহায়াও বটে একটু। তা সে বাড়ির ঢিলে ভাব দেখে মাঝে মাঝে ছিপ ফেলতে যেত মানু। বহুকালের চেনা সব। মেয়েছেলের সঙ্গ করলে মনটা তেমন খয়াটে মেরে যায় না। সেই লোভে যাওয়া।

তিন দিনের মধ্যেই বোধ করি মানুর হাত নিজের কোলে তুলে নিয়ে কুসুম খুব নরম সরম কথা বলতে শুরু করে। মাসখানেকের মধ্যেই মানু তাকে চুমো দেয়। তার বেশি কিছু নয়। কিন্তু আজকাল কুসুম বড় তেজি গলায় সেসব কথা পাড়া জানান দিয়ে শোনায় তাকে—'বিয়ে কবে করছ শুনি?'

—'বিয়ে?' বলে বড় দ্বিধায় পড়ে যায় মানু। লজ্জাও করে।

কুসুম ঝেঁঝে বলে—'বিয়ে না করলে আমার গতিটা কি হবে শুনি! আমার শরীর ছুঁয়েছ, বলতে গেলে আমার আর রইল কী! এঁটো করে ফেলে যাওয়ার মতলব নাকি? ওসব হবে না। কবে বিয়ে করবে বলো। তারিখ দাও।'

—'সে করলেও দেরি আছে।' মানুও একটু গরম খেয়ে বলে—'বিয়ে কি খেলনা নাকি!'

—'যদি গোলমাল করো তো চানুদাকে খরব দেব, বলে রাখলাম। সবাই জানে, তুমি এ বাড়িতে যাতায়াত করো। গরিব পেয়ে নষ্ট করে চলে যাবে, সে হবে না। এখনো ছোটলোক হয়ে যাইনি, বুঝলে!'

চানুর নামে একটু ভয় খায় মানু। চানুর সঙ্গে এখনো তার সরাসরি শত্রুতা ঘটেনি ঠিকই। চানু তার জগৎ নিয়ে আছে, মানু পড়ে আছে হপ্তাবাজারে। কিন্তু যদি চানুকে কেউ লাগিয়ে দেয় তো বিস্তর মুশকিল হবে। কেন হবে তা মানু জানে না। কিন্তু হবে।

আজ হঠাৎ ডেলি প্যাসেঞ্জার কুসুম স্টেশনে নেমে সন্ধে ছ'টার অন্ধকারে এসে দোকানের সামনে দাঁড়াল। ভিতরে লোক গিজগিজ করছে। দমদম অবস্থা। তার মধ্যেই মানু দেখতে পেল, হাতছানি দিয়ে কুসুম ডাকছে।

লোকলজ্জার ভয়ে মানু বেরিয়ে এল।

—'কী ব্যাপার?' মানু জিগ্যেস করে।

—'তোমার ব্যাপারখানা কী?'

—'কিছু না। বিক্রিবাটা মন্দা। ভাবছি দোকান তুলে দিয়ে বেনারস চলে যাব।'

একটু খরচোখে চেয়ে কুসুম বলে—'তা যাবে তো কী! কালিঘাটে নিয়ে গিয়ে আমার সিঁথেয় একটু সিঁদূর ছুঁইয়ে দাও কাল। তারপর যা হয় হোক।'

মানু বাজারের গা-ঘেষা লোকজনের মধ্যে দাঁড়িয়ে একথা শুনে শিউরে উঠল। বলল—'অত তাড়া কীসের?'

—'তাড়াহুড়োর কথা নয়। বয়স তো চলে যাচ্ছে।'

—'একদিন দুদিনে বয়স কী করবে?'

—'একদিন দুদিন মানে? তুমি কি দুদিন বাদে বিয়ে করবে নাকি? তোমাকে আমি চিনি।'

মানু বিরক্ত হয়ে বলে—'পাঁচজন শুনছে। এখন বাড়ি যাও।'

কুসুম বলল—'ধৈর্য থাকে না বুঝলে! রোজ সেই শিবপুর পর্যন্ত ঠেঙিয়ে শরীর মন দুই শুকিয়ে গেল। এরপর আর কবে বিয়ের সুখ করব বলো তো! থাকবে কি?' তারপর গলায় মিনতি ঢেলে বলে—'বিয়েটা

করেই দেখ। এখন যেমন চেহারা আর ঝগড়ুটে মনে হয় আমাকে, মোটেই তেমন নয়। আদর পেলে আমি তোমার খরগোশের চেয়েও ঠান্ডা। ঠকবে না। যা চাও সব আমি দিতে পারি।'

মেয়েছেলে মানু চেনে। তার ওপর কুসুম। এই একা থাকার সুখ কর্ড লাইন বেয়ে চলে যাবে।

হাঁটতে হাঁটতে কুসুমের সঙ্গে চালপট্টি পর্যন্ত গেল মানু। শিবের দোকানে উবু হয়ে বসে সাট্টার নম্বর বাছাই করেছে জুয়াড়িরা। মাতাল চলেছে টলতে টলতে। কেরোসিনের টেমির গন্ধে ম ম করছে চালপট্টি। ডাক্তারখানায় বুড়ো বুড়ো আড্ডাবাজরা বসে আছে। বড়বাজারের সওদা ভর্তি ব্যাগ নিয়ে দুর্গাপুর, সমবায়পল্লী, সাহেববাগানের ডেইলি প্যাসেঞ্জাররা ফিরছে।

মানু তোয়াজ করে বলল—'আজ যাও। পরে ভাবব'খন।'

—'তোমার ভাবনাকে বড় ভয় পাই। আর কত ভাববে গো? পাড়ার পাঁচজন আকথা কুকথা বলছে। কানে যায় না নাকি!' বলতে বলতে গলাটা ফের খর হয়ে ওঠে।

বোঝে মানু। তুইয়ে বুইয়ে যেমন করে হোক ওর একটা পুরুষ চাই। এখন যদি মানু ছাড়া অন্য কেউ ওকে বিয়ে করে তো এক্ষুণি বিয়ে বসবে। ওর মুখচোখে সেই খাই-খাই ভাব। মানুর বড় মনখারাপ হয়ে যায়। ভাবগতিক যা তাতে কুসুমই ঝুলছে কপালে।

কুসুমকে এগিয়ে দিয়ে ফিরে আসছিল মানু একটা সাট্টা খেলুড়ি ধরল তাকে। মানু সকালে বসে দড়ি পাকাবার সময়ে মাঝে মাঝে যে সব ভবিষ্যদ্বাণী করে তার কথা কিছু লোক জানে। অনেকে বিশ্বাস করে, অনেকে করে না।

সেলুনওয়ালা দ্বিজপদ বলল—'দাদা, দোকানে এসে বোসো খানিক। কথা আছে।'

দ্বিজপদর কি কথা তা মানু জানে। মাথা নেড়ে বলে—'সময় নেই।'

—'দু'মিনিট। তোমাকে দেখেই তেলেভাজা আর চা বলে দিয়েছি। এল বলে।'

হাত ধরে দ্বিজপদ তার সেলুনে নিয়ে গিয়ে বসাল। মাটির ভিতের ঘর, সামনে ঝাঁপ বাঁশ দিয়ে তোলা। ঘরের এককোণে স্তূপাকার করে কয়েক কেজি চুল জমানো আছে যত্ন করে। এই চুল মাসান্তে কিছু লোক এসে অল্প পয়সায় কিনে নিয়ে যায়। নিয়ে তারা কী করে তা দ্বিজপদও জানে না। তেলেভাজা চা খাইয়ে দ্বিজপদ জিগ্যেস করে—'কত লাগাবো দাদা? দুই আট দশ ধরেছি।'

মানু আজকাল কৌশল শিখেছে। বলল—'পাবি না।'

এসব বললেই কাজ হয়। তবে ফের পরে গিয়ে খ্যানর খ্যানর করবে। তা করুক, তখনো এমনি বলে কাটানো যাবে। বলে উঠে এল মানু। চালপট্টিতে চালের দর দেখল। কিলোয় চার আনা বেড়েছে।

বাঁকা কোমর সোজা করতেই এক মাতালের সঙ্গে ধাক্কা লাগল। মাতালটা টলে টলে পড়ে যেতে গিয়েও আঁকড়ে ধরল মানুকে। বলল—'তোর কাছ থেকেই আসছি। পাঁচটা টাকা দে।'

বাবা। মানু খুব অবাক হয় না। বাবা এক সময়ে খেত টেত। মাঝখানে অভাবের ঠেলায় ছেড়ে দিয়েছিল। এখন অবস্থা দেখে মানু ছোট চোখ করে তাকাল।

মানু বলল—'পাঁচটা টাকা কি মাগনা আসে নাকি?'

—'দে বাবা, বড় খিদে।'

মানু তবু তেড়িয়া হয়ে বলে—'খিদে কেন? ছোট ছেলে খাওয়ায় না?'

বাপটা কেঁদে ফেলে। গায়ে ময়লা পাঞ্জাবি, ধুতি কিছু ওপরে তোলা, কাঁধে র‍্যাপার। ছোটলোকের চেহারা নয়। হাতের পিঠে চোখ মুছে বলে—'তাড়িয়ে দিয়েছে।'

—'কোথা থেকে তাড়াল? বাড়ি তো ওর নয়।'

—'সে কে বলতে যাবে। ঘাড় ধরে বের করে দিলে।'

—'কী করেছিলে?'

—'সাট্টায় একটা কাঁসার বাটি বেচে লাগিয়েছিলাম। তা কী করব বাবা, ছেনি হাতুড়ি ধরতে পারি না, হাত-টাত ঠিক নেই, জোরবল পাই না। পয়সার জন্য ওসব খেলতে গিয়ে—'

—'চানু কি মারধর করে নাকি?'

—'করে। বড় তেজ হয়েছে আজকাল। শয়তান।'

—'তো মদের পয়সা জুটল কোত্থেকে?'

—'সে আমার পয়সায় নয়। মাণিকরাম খাওয়ালে।'

—'তুমি তার সঙ্গে জুটলে কী করে?'

বাবা মুখটা ভ্যাবাগঙ্গারামের মতো করে বলল—'জুটবো কী! সেই জোটে। রাস্তায় ঘাটে দেখলেই পায়ের ধুলো নেয়। আজকাল খুব খাতির করে। বাসন্তীকে বিয়ে করতে চায়।'

প্রায় হিম হয়ে যায় মানু। মাত্র তেরো বছরের মেয়ে হবে বাসন্তী। মাণিকরাম পঞ্চাশ পার। তার ওপর তার বউ ছেলেপুলে আছে দুপক্ষের।

—'বলো কী?' মানু ধমকে ওঠে।

—'আমি রাজি হইনি বাপ।'

—'তো ওর পয়সায় খেতে যাও কেন?'

—'জোর করে নিয়ে যায়। এখন নয়, সেই বিকেলে খাইয়েছিল। ঝালচানা আর এক নম্বর। নেশা কেটে গেছে।'

—'কেটে গেছে! তবে টলছিলে কেন?'

—'শরীরটা যুতের নেই। পেটটাও ফাঁকা।'

—'চলো, খাওয়াচ্ছি দোকানে। কিন্তু এ পাকা বন্দোবস্ত নয়। আজই খেয়ে কেটে পড়বে।'

বাবা ঘষা চোখে চেয়ে বলল—'থাকতে দিবি না?'

—'না।'

'তো কোথা যাব বাবা? চানু মারবে যে!'

—'মারবে তো কী করব? মার খাবে।'

বলে মানু হাঁটে, পিছু পিছু বাবা আসে।

কদিন আগে বাজারে দেখে চিনতে চায়নি। সে অবশ্য বুড়োর দোষ নয়, চানু সবাইকে শাসিয়ে রেখেছে। তবু বাপ হয়ে ছেলেকে একবার চোখের কোণ দিয়েও দেখবে না, এ কেমন কথা?'

ব্রিজের তলাকার অন্ধকারে একটু দাঁড়ায় মানু, বাপটা এই ঝুঁঝকো আঁধারে ঠিক ঠাহর পাবে না। কাছে এলে সে বলে—'মাণিরাম কী বলে?'

—'বললাম তো, বাসন্তীকে বিয়ে করতে চায়।'

আটটা আটান্নর ট্রেনটা মাথার ওপর দিয়ে গমগম করতে করতে স্টেশনে ঢুকছে। রেলব্রিজটা নীচু, হাত বাড়ালে ছোঁয়া যায় প্রায়। সেই কবে আদ্যিকালে তৈরি হয়েছিল।

ট্রেনটার শব্দ মিলিয়ে যেতে মানু বলে—'মাণিকরামের প্রস্তাবে রাজি হওনি তো!'

—'না। তবে চানু রাজি হয়েছে। তিনশো টাকা দেবে মাণিক।'

—'বলো কী!'

—'কী বলব মানু, ছোট বজ্জাতটা এখন সবাইকে বার করতে চায়, রক্তের সম্পর্ক মানে নাকি?'

—'সে তুমিও মানো না।'

বাবা নিজের কান মলে বলে—'সে ঘাট হয়েছে বাবা। তুমি আমার ভালো ছেলে, এতকাল চিনতে পারিনি।'

মানু হেসে বলে—'ছেলে চিনছ, না টাকা?'

বাবা এর উত্তর দেয় না। টলে টলে হাঁটে। মানু তাকে ধরে না। কিন্তু তাতে কিছু হয় না। মানুর দোকান পর্যন্ত বুড়ো চলে এল।

খদ্দের বেশির ভাগই সাফ হয়ে গেছে। শীতটাও পড়ল জোর। শুধু বুড়ো অনাদি বসে আছে এখনো। তার এক ছেলে এ সময়টায় ফেরে। ফেরার পথে বাপকে নিয়ে যায় রিক্সায় তুলে। ছেলের গা ঘেঁষে বসে এইটুকু পথ যেতে পারে বলে অনাদির খুব অহংকার। ছেলেরা এখনো তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করছে না তাকে, এই তার ধারণা।

মানুর পিছনে তার বুড়ো বাপকে দেখে অনাদিও হাঁ হয়ে গেল। বলল—'মানুর বাপ না?'

বাবা অমনি হাতজোড় করে বলে—'আজ্ঞে।'

—'বহুকাল বাদে, এদিকে?'

—'আজ্ঞে।'

—'মাণিকরামের সঙ্গে দেখি আজকাল।' বলে গলা খাঁকারি দেয় অনাদি। বলে—'বিয়ে ঠিক হয়ে গেল?'

—'না। থুঃ।' বলে বাবা বসে পড়ে বেঞ্চে।

—'হুঁ।' বলে অনাদি উঠে বলে—'মানুষ হয়েছে আসলে কাক বুঝলে হে প্রসন্নচন্দ্র। যত নোংরা ঘেঁটে তার খোরাক জোটে। দুনিয়াটা পচা গন্ধ ছাড়ছে আজকাল, আর তত কাকের আনন্দ। হরিবোল।'

কথাটা একটু ধোঁয়াটে। তাহলেও ওপরসা ওপরসা বোঝা যায়। অনাদি বেরিয়ে গেলে ঝাঁপ ফেলে দিল মানু। ভাত রাঁধল, মুশুরির ডাল, মাছের ঝোল আর ফুলকপি ভাজা। তাই দিয়ে বাবা প্রসন্নচন্দ্র গিলগিলে হাসিমুখে এত ভাত মাখল। অর্ধেক খেল অর্ধেক ফেলে উঠে পড়ল।

আঁচিয়ে এসে বসে পড়ল বেঞ্চখানায়। বলল—'তা এ বেঞ্চখানাই যথেষ্ট।'

মানু বড় চোখে চেয়ে বলল—'থাকার মতলব নাকি?'

—'তো বের করে দিবি? সাহেববাগান কত দূর তা ভেবে দ্যাখ। গেলেও ঘরে ঢোকা যাবে না।'

—'তোমারই ঘোরদোর।'

—'সেই কাঁসার বাটিটার কথা কি ভুলবে চানু? তারপর মাণিকরামের কথায় সায় দিচ্ছি না। হরেক ব্যাপার বাবা। সে বিয়ে করবে। তার আগে সব ঝুটঝামেলা সারতে চায়।'

—'তো আমি কী করব? আমার এখানে জায়গা হবে না। আজ রাতটা থাকো পড়ে, কাল সকালে গিয়ে চানুর সঙ্গে কাজিয়া মিটিয়ে নেবে। এখানে হবে না।'

—'মিটবে না বাপ। শেষ ক'টা দিন আর কাটে না।' এই বলে বুড়ো ঘুমোলো।

সকাল বেলাতে প্রসন্নচন্দ্র পিছনের উঠোনে বসে খুব আরামে ডাব্বাই একটা বড় গেলাসে চা খাচ্ছিল। ছোট্ট উঠোন, ছাইগাদা, কচুর ঝাড়, পিছনে বস্তি আর পুকুর। কিন্তু তাই দেখেই তার চোখ জুড়িয়ে গেল। যেন এমন একখানা জায়গাই সে খুঁজছিল এতকাল।

সমানের রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে ম্লানমুখী বাসন্তী আজ নিজের থেকেই এসে দাঁড়াল সামনে।

—'ও দাদা।'

মানু গম্ভীর হয়ে দড়ি পাকাচ্ছিল, বলল—'ও হুঁ।'

—'বাবা কাল বাসায় ফেরেনি।'

—'হুঁ।'

—'চানুদা বের করে দিয়েছিল।'

—'তো কী করব?'

—'মা খুব কাঁদছে। বলেছে, চানুদার ওখানে থাকবে না।'

—'তো কোথায় থাকবে? কানুর কাছে?'

—'না। তোমার কাছে। দুপুরেই চলে আসবে। বাবা যে কোথায় চলে গেল!'

বলতে বলতে মেয়েটা ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

—'ভালো লাগে না। কাঁদিস না তো!'

—'কী করব! বুড়ো মানুষটা কোথায় খাবি খেয়ে মরল।'

—'খাবি খাবে কেন? চা খাচ্ছে, ভিতরবাগে দেখগে যা।' বলে মানু দড়ির পাক খাওয়ায়।

—'সত্যি?' বলে দুই লাফে বাসন্তী ভিতরবাগে চলে গেল।

অনাদি বুড়ো বলল—'লোকজনের জন্য ভাবাইলে মানু! তা গতিক তো ভালোই দেখছি। সিঙ্গারা আর জিলিপির জন্য আর আলাদা লোক রাখতে হবে না।'

—'এই তাহলে ব্যাপার!' বলে মানু দড়িগাছটা রাখল। আজ দড়ি পাকাতে পাকাতে সে একটা জিনিস দেখেছে। দেখেছে, দোকানটা বিরাট বড় হয়েছে। বাপ ক্যাশবাক্স নিয়ে বসে। পিছনের উঠোনের ধার ঘেঁষে একটা পাকা বাড়ি। তাতে মা বাসন্তী কুটনো কোটে, কাপড় শুকোতে দেয়। সে ভারি ভরভরন্ত সংসার। তাতে টিয়াও আছে, খরগোশও ফেলা যায়নি। কিন্তু একটা খারাপ জিনিসও দেখেছে সে। কুসুম গর্ভবতী হয়ে রাস্তায় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কুমারী অবস্থা।

একটা শ্বাস ফেলল মানু। তাই বলো! নইলে এত বিয়ের তাড়া। পরের জিনিস মানুর ঘাড়ে না চাপালে চলছে না কি না!

বাসন্তী হাসি-হাসি মুখে বেরিয়ে আসছিল। মানু তাকে ডেকে বলল—'তুইও আর থাকিস কেন, চলে আয় এখানে!'

বাসন্তী হাঁ করে থেকে পরে বলল—'রাখবে আমাদের? ঠাট্টা করছ না তো!'

—'ঠাট্টার সম্পর্ক নাকি! পাকা কোথাকার। চাকরি-বাকরি করতে হবে না। চলে আয়।'

কাল বাবা এসে গেছে। দুপুরে মা আসবে। বাসন্তী আসবে। আজ কেবল মনটা আয়-আয় করছে। কে আসবি আয়। জায়গা আছে। অনেক জায়গা। বাড়িওয়ালা বহুকাল ধরে সাধছে। হাজার চারেক নগদ পেলে জায়গাটা লিখে দেবে। তাই হোক তাহলে। আজই বাড়িওয়ালার সঙ্গে দেখা করবে মানু। সময়টা খারাপই পড়েছে।

ছমাস বাদে চানু এল। গালে দাড়ি, চেহারা অর্ধেক হয়ে গেছে, চোখ আতঙ্কিত। বলল, 'দাদা, লুকিয়ে রাখো। নইলে মেরে ফেলবে।'

সেই ভোরবেলা। মানু দড়ি পাকাচ্ছে। বলল—'হুঁ।'

—'সত্যি বলছি। সাহেববাগান এখন ওদের কব্জায়। পেলেই কাটবে। কাল একজনকে কেটেছে। আমি বম্বে রোড ধরে মাইলখানেক দৌড়ে শেষ রাত তক লুকিয়ে ছিলাম একটা খড়-কাটা কলে।'

মানু দড়ি ধরে বসে আছে। দেখছে। ঈশ্বর তাকে একটা ক্ষমতা দিয়েছেন। মাঝে মাঝে ভবিষ্যতের দড়ি খুলে যায় তার সামনে। কিন্তু সবকিছু দেখা যায় না। কিছু অন্ধকার থাকে। এই অন্ধকারটুকুই হচ্ছে বড় পরীক্ষা। এইটুকু মানুষকে নিজের বুদ্ধি বিবেচনা আর ভালোবাসা দিয়ে পার হতে হয়।

দড়ি রেখে বোবা খোরগোশটাকে কোলে নিল মানু। বলল—'আয়।'

# কয়েকজন

## ১। স্বাধীনতা দিবস

আজ তার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা দিবস। তার কোনো পতাকা নেই, সংগীত নেই। তার বউ রাগ করে ছেলেকে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে গেছে। লোকটা একা ফাঁকা ঘরে বসে এই স্বাধনীতা দিবসকে উপভোগ করছিল। কিছুদিনের মধ্যেই ভাড়ার টাকার অভাবে তাকে এই বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে। মেটাতে হবে দুধ বা মুদির দোকানের মোটা পাওনা। নানা রকম পাওনাদারের হাত এগিয়ে আসবে তার দিকে। মাসের শেষে সে আর মাইনে পাবে না। লোকটা চাকরি ছেড়ে দিয়েছে।

একা ঘরে লোকটা আজ একা একা বসে আছে। ভারি ভালো লাগছিল তার। ব্যক্তিগত কোনও পতাকা থাকলে সে আজ ওড়াত। যদি থাকত তার কোনো ব্যক্তিগত সংগীত তবে সে তা গাইত। তার বদলে সে খুব হোঃ হোঃ করে হেসে উঠছিল মাঝে মাঝে। একা ঘরে সেই হাসি তার নিজের কাছেই ভুতুড়ে শোনাচ্ছিল।

পোশাক পরে এবং ঘরে তালা দিয়ে ও শেষ কিছু টাকা পকেটে নিয়ে লোকটা বেরিয়ে পড়ল। তার মনে হল দিনটাকে উপভোগ করা দরকার। এরকম স্বাধীনতা দিবস খুব কম লোকের ভাগ্যেই জোটে।

কলকাতার বিকেল। প্রতিটি রাস্তাই যেন মানুষের নদী। সেই নদী বয়ে চলেছে নানা শাখা-প্রশাখায়। এই নদীগুলির কোনো উৎস নেই, মোহনা নেই। বারবার নোংরা জল একই খাতে বয়ে বয়ে ঘোরে। লোকটার মনে হল, এরা কেউ স্বাধীন মানুষ নয়। শৃংখলিত, দণ্ডিত, অপরাধী, এদের মুখচোখে স্পষ্টই নিরানন্দের গভীর চিহ্ন।

লোকটা এক বন্ধুর বাড়িতে হানা দিল। তার মতে এই বন্ধুটি পরাধীন। মুখোমুখি বসে সে বন্ধুকে বলল, 'আজ আমার স্বাধীনতা দিবস।'

'আজ? এটা তো নভেম্বর মাস। আমাদের স্বাধীনতা দিবস তো আগস্টে।'

লোকটা মাথা নেড়ে বলল, 'আজ আমার, শুধু আমারই স্বাধীনতা দিবস। আমি চাকরি ছেড়ে দিয়েছি।'

বন্ধুটি বড় বড় চোখে নির্বাক চেয়ে রইল। লোকটার মনে হল, বন্ধুর চোখে ঈর্ষা, চোখে সম্ভ্রম, চোখে পরশ্রীকাতরতা।

লোকটা হাসল। বলল, 'বেশ চাকরিটা ছিল আমার, তাই না?'

'বেশ মানে? দারুণ চাকরি! বোধহয় দুই কি আড়াই হাজার টাকা মাইনে! ছাড়লি কেন?'

'কী জানিস! আমি শালা চাকর হয়ে যাচ্ছিলাম। খুব ধীরে ধীরে আমি নিজের অজান্তেই গোলাম হয়ে যাচ্ছিলাম। তার চেয়েও ভয়ংকর কথা, চাকরিটা আমার ভীষণ ভালো লাগছিল। আমি সহকর্মীদের হিংসে করতে শুরু করেছিলাম।'

'শুধু এই কারণ?'

'না, আরো আছে। আমি যখন প্রথম চাকরিতে ঢুকি তখন ভাবখানা ছিল বেপরোয়া। কাউকে বেশি খাতির টাতির করতাম না। একজন বুড়ো সহকর্মী ছিল প্রভাতবাবু। মালিক হেঁটে গেলে ব্যথা পেত। তাকে খুব ঘেন্না করতাম। কিন্তু ক্রমে ক্রমে আমার সুনাম বাড়তে থাকে। দশ বছরের মধ্যে আমি তিন তিনটে প্রোমোশন পাই। আর তখন চাকরিটাকে খুব গুরুত্ব দিতে শুরু করি। গুরুত্ব দিতে শুরু করি মালিককেও। তিনি আমার দিকে চেয়ে হাসলে দিনটা দারুণ উত্তেজনায় কাটে। ক্যানটিনে সবাইকে বড়াই করে বলি, উনি আমার দিকে তাকিয়ে খুব হাসছিলেন, জানো?'

'তাকে কী? ভালো তো।'

'হ্যাঁ। খুব ভালো। একজন মধ্যবিত্তের পক্ষে এসবই শুভ সংকেত। মালিক খুশি আছে। মালিক আমার কাজকর্মে সন্তুষ্ট। সম্ভবত আবার আমি আরও কয়েকজনকে ডিঙিয়ে প্রমোশন পাব। বহু লোক দীর্ঘশ্বাস ফেলবে, আমার দিকে চেয়ে হিংসেয় জ্বলে যাবে ভিতরে ভিতরে। একজন মধ্যবিত্তের কাছে এর চেয়ে সুখের ব্যাপার কী হতে পারে?'

'তাহলে তোর চাকরি ছাড়ার কী এমন কারণ ঘটল?'

'ওইটাই তো কারণ, আমার খুব সুখ হচ্ছিল। একদিন মালিক তার ঘরে ডেকে পাঠাল। টেবিলের ওপর জুতোশুদ্ধু পা তোলা, মুখে লম্বা সিগারেট। আমার দিকে চেয়ে একটু হেসে বলল, 'আপনার কাজে আমি খুশি, দারুণ খুশি, ইউ আর এ জেম। আমি এ কথাটা শুনে ভীষণ খুশি হচ্ছিলাম। হেঁ হেঁ করে হাসতে লাগলাম। বার বার চোখটা টেবিলের ওপর মালিকের জুতোর নড়ন্ত ডগাটায় আটকে যাচ্ছিলাম। কিন্তু খারাপ লাগছিল না। তবে আমার ভিতরে ভিতরে কী যেন একটা নড়ছিল মালিকের জুতোর ডগার তালে তালে।'

'কী সেটা?'

'কে জানে! কিন্তু নড়ছিল। ভারি সুখ হচ্ছিল। সেই সুখ মাখানো মুখেই বেরিয়ে এসে আমি টাইপরাইটারের সামনে বসে পড়লাম।'

'কী লিখলে?'

'দুটো চিঠি! প্রথমটা মালিককে। আপনার চাকরিতে আমি পেচ্ছাপ করি। দ্বিতীয়টা নিজেকে। তোমাকে স্বাধীনতা দিলাম। আজ থেকে তুমি মুক্ত, তুমি অবাধ, তুমি গভীর।'

বন্ধুটি হাসল না। বিদ্রুপ করল না। দোষারোপ করল না। হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

## ২। সোরাব-রুস্তম

বাবা।

কে?

আমি আদিনাথ।

কোন আদিনাথ?

আমি আদিনাথ, আপনার ছেলে। এই যে দেখুন, আপনার নাতি আর বউমাকে নিয়ে এসেছি। আর এই যে প্রাণহরা সন্দেশ। আপনি যে বড় ভালোবাসেন, খাবেন না একটু?

অ! সন্দেশ! খুব ভালো।

চোখ চাইবেন না?

চাইবো? ও, জ্বালালে। চেয়েই বা কী দেখব?
আমি যে চোখে ভালো দেখিনা।
তবু একটু চোখ মেলুন, মাথাটা একটু তুলুন। আপনার বউমা পায়ের ধুলো নেবে।
কী তুলব।
মাথা।
কে কী নেবে বললে যে!
নেবে পায়ের ধুলো।
তাই বলো। ভাবলাম, বালিশের তলায় আলমারির চাবি আছে, তাই নেবে বুঝি।
না না ওসব নয়!
নিলেও লাভ নেই। আলমারি ফাঁকা। গড়ের মাঠ। সকালে আর একজন এসেছিল। প্রিয়নাথ না কী যেন নাম বলল। চিনি না।
প্রিয়নাথকে চিনব না কেন? সে আপনার মেজো ছেলে।
কী জানি বাবু, যে আসে সেই বলে, আমি আপনার ছেলে। ভাবছি এত ছেলে কোত্থেকে এল!
আমরা পাঁচ ভাই। আপনার পাঁচ ছেলে।
তাই নাকি? ভালো। ওটি কে? লাল শাড়ি পরা।
আমি আপনার বড় বউমা বাবা!
অ। ভালো। হাতে ওটা কীসের বাক্স?
সন্দেশ বাবা। খুব ভালো সন্দেশ। অরডার দিয়ে তৈরি করানো।
ক' টাকার?
দশ টাকার। ভালো লাগলে আবার এনে দেব। একটু খেয়ে দেখুন।
খাবখন। রেখে দাও হাতের কাছে। তোমরা কোথায় থাকো?
মানিকতলায় বাবা। ভুলে গেছেন? সেই যে দু'বছর আগে আপনার ছেলে ফ্ল্যাট কিনল! মনে নেই?
ভালো ফ্ল্যাট?
ভালোই। দক্ষিণ পূর্ব খোলা, বারান্দা, দুটো শোওয়ার ঘর, ডাইনিং স্পেস।
এক লাখ টাকা।
সে কি অনেক টাকা?
অনেকই তো।
কী জানি। মাথাটা আজকাল ভালো খেলে না। প্রিয়নাথ না কে যেন এসেছিল আজ।
হ্যাঁ। আপনার মেজো ছেলে। সল্টলেকে বাড়ি করেছে।
অনেক টাকার বাড়ি নাকি?
সে তো আপনার ইনজিনিয়ার ছেলে, সে অনেক টাকার বাড়ি করবে না তো কে করবে?
কত টাকার বাড়ি?
দু আড়াই লাখ তো হবেই।
অ। তা সেও সন্দেশ দিয়ে গেছে।
তাই নাকি? খাননি?
বুড়ো মানুষ, কত খাব?
একটু হলেও খাবেন। ছেলেরা সাধ করে দিয়ে গেছে।
কত টাকার সন্দেশ বললে?
দশ টাকা।

সে কি অনেক টাকা?

## ৩। কুকুর ও বেলুনওয়ালা

বেলুনওয়ালা পাড়ায় ঢুকতেই পাড়ার একশ কুকুর চেঁচিয়ে উঠল, 'ভাগ! ভাগ'!

গলির মধ্যে পা বাড়িয়ে বেলুনওয়ালা একটু থমকায়। তারপর বেলুনে হাত ঘষে কর্কশ চ্যাচং চ্যাচং শব্দ তুলল সে। বেলুন কুকুরদের ধমক দিয়ে বলল, 'ভাগব কেন রে? তোদের বাবার রাস্তা?'

কুকুররা নিজেদের মধ্যে সমান্য আলাপ করে ফের চেঁচিয়ে ওঠে, 'এ আমাদের এলাকা। যাঃ যাঃ!'

বেলুন বলল, 'রাস্তা যেমন তোদের তেমনি ফেরিওয়ালাদেরও।'

কিন্তু কুকুররা ঝগড়ায় অতি পারদর্শী, তারা দাঁত মুখ খিঁচিয়ে তেড়ে যেতে লাগল বেলুনওয়ালার দিকে।

বেলুনওয়ালা বুড়ো মানুষ। পরণে লুঙ্গি, গায়ে খাকিরঙের ছেঁড়া জামা। মুখে রুক্ষ দাড়ি ও উপোসের ছাপ। কুকুরদের সে চেনে। চ্যাচাং চ্যাচাং শব্দ তুলতেই কুকুরেরা ভড়কে পিছোয়, তারপর দ্বিগুণ চেঁচাতে থাকে। ছুটে ছুটে কাছে আসে, আবার পেছিয়ে যায়। কিন্তু কামড়ায় না।

বেলুনওয়ালা গলির মধ্যে ঢোকে এবং চ্যাচং চ্যাচং শব্দ তুলে এগোয়। কুকুরেরা তার পিছু নেয়।

তার হাতের বেঙময় বেলুনটা বস্তির ভাষায় কুকুরদের ধমকাতে থাকে, 'নেমকহারাম, বেইমান, বেওয়ারিশ!'

কুকুরেরা বলে 'চোর! শয়তান! ছেলেধরা!' বেলুন বলে, 'এঁটোচাটা, লাথি-খাওয়া, ঘাটের মড়া।'

কুকুরেরা বলে, 'ঠকবাজ, জোচ্চোর, ঘরিয়াল!'

বেলুন বলে, 'বেজম্মা, কাপুরুষ, আওয়াজ সার।'

কুকুরেরা বলে, 'পুলিশের চর, নোংরা লোক, দেখলেই পিত্তি জ্বলে যায়।'

বেলুনওয়ালা এগোতে থাকে। বড় রোদ। গরম তেষ্টা। চারদিকে চেয়ে যেন দীন দরিদ্র বাড়িগুলিকে লক্ষ্য করে। বাচ্চাগুলো গেল কোথায়? স্কুলে!

না, বিক্রি নেই। কুত্তাগুলো ভারি খ্যাঁকাচ্ছে। বয়স হয়েছে। হাতে শুধু হাওয়াভরা বেলুন, আর কোনো সওদা নেই।

বেলুনওয়ালা নিজের কাঁধে বেলুনের বোঝার দিকে একবার তাকায়। দেখতে যেন কত! কিন্তু একরত্তি ওজন নেই। শুধু হাওয়া। একটু রং। একটু রবার। ব্যস।

একটা টিপকল দেখে বেলুনওয়ালা থামে। কলটায় জল আছে, মনে হয়।

পেট ভরে সে জল খায়। কুকুরগুলো টিপকল ঘিরে তাকে উদ্দেশ্য করে চেঁচাতেই থাকে। পরস্পরকে নানান নালিশ জানায় তার সম্পর্কে।

বেলুনওয়ালা মুখ ভিজিয়ে নেয়। ঘাড়ে জল দেয়। লুঙ্গিতে মুখ মুছে সে কাছেই একটা গাছতলায় গিয়ে বসে।

কুকুরেরা যে যার জায়গায় ফিরে যেতে থাকে একে একে। কিন্তু তাদের সন্দেহ থেকে যায়। তারা দূর থেকে অনেকক্ষণ ডাকাডাকি করতে থাকে।

বেলুনওয়ালা একটা বিড়ি ধরায় এবং নির্বিকারভাবে বসে থাকে। একটা দলছুট কুকুর খুব ভয়ে ভয়ে এসে টিপকলের শানের গর্তে বেলুনওয়ালার উচ্ছিষ্ট জল চেটে চেটে খায়।

পরদিন বেলুনওয়ালা ফের আসে। কুকুরগুলো ফের খা-খা করে আসে। বেলুনওয়ালার বেলুনের সঙ্গে তাদের তুমুল ঝগড়া হয় ফের। বেলুওয়ালা একটা দুটো কুকুরকে ডাকে, 'আ তু!'

তারা আসে না বটে, তাবে লেজ নাড়ে। পর পর সাতদিন পাড়াটা ঘুরে যায় বেলুনওয়ালা। একটা দুটো বেলুন বিক্রি হতে থাকে। কুকুরদের প্রতিরোধ কমতে থাকে। একদিন তারা আর একটিও শব্দ করে না। বরং বেলুনওয়ালাকে দেখে লেজ নাড়তে থাকে।

তারপর একদিন বেলুনওয়ালা আসে। তখন গভীর রাত। তার হাতে বেলুন নেই। চোখে ধক ধক করচে সন্ধানী দৃষ্টি। সে নিঃশব্দে একটা বাড়ির পাঁচিল ডিঙিয়ে ঢোকে। একটা কুকুর একবার 'ভুক' শব্দ করে। তারপর চেনা লোক দেখে লেজ নাড়ে।

বেলুনওয়ালা বলে, 'শালা বুরবক।'

# কলিকাল

বউ পালিয়ে গেলে যেমন যেমন হয় মানুষের, চিতি মণ্ডলের ঠিক তেমন তেমন হল না। সময়টা খারাপই পড়েছে তার। গোবিন্দ বিশ্বাস তিসি বাবদ টাকাটা দিলে না, ঝাড়ের বাঁশ লোক লাগিয়ে সব কাটিয়ে নিয়ে গেল কালী হাজরা, বড় ভাই কচি তাকে ভেন্ন করে দিল, এই সময় নানারকম আর কী। বলতে গেলে লিস্টি দাঁড়াবে দেড় গজ। তো তার মধ্যে বউ-পালানোটাও একটা। গেছে আপদ গেছে, একটা পেটও কমল, কিন্তু আবাগীর বেটি কোন আক্কেলে যে হামা-টানা ছেলেটাকে ফেলে গেল সেটাই বুঝতে পারে না চিতি।

কচির বউ লীলাময়ী হল খাণ্ডারস্য খাণ্ডার। চোখ দুখানা সর্বদাই তাড়াং তাড়াং করে চারদিকে নজর করছে। রাত পোয়াতে না পোয়াতেই তার গলা চারদিকে যেন ঝালনুন ছিটোতে শুরু করে। স্বামী, শাশুড়ি, নিজের পেটের সন্তান, পাড়াপড়শী থেকে শুরু করে কাক চিল কুকুর বেড়াল কার ওপর না ঝাল ঝাড়ে লীলাময়ী। আর এই গলার এমনই লীলা যে বাদবাকি সবাই যেন কেমন ভ্যাবলা হয়ে চুপ মেরে যায়।

দিন তিনেকে চিতি মণ্ডলের হাঁফ ধরে গেল ছেলে সামলাতে। আসলে সে হল বারমুখো লোক। খালধারে তার গাঁজার আড্ডা আছে। শিবুবাবুর হাটের পেছনে আছে তাড়ির আড্ডা। নয়াগঞ্জের খারাপ পাড়াতেও যাতায়াত ছিল। তার ওপর সারা দিনমান পেটের ধান্দায় নানা ফন্দিফিকির তো আছেই। তাই ছেলে নিয়ে মাথা ঘামায়নি কোনোদিন। তখন কচি তাকে ভেন্ন করেনি বলে ছেলে সামলানোর লোকও ছিল মেলা। মা, ভাইপো ভাইঝি, এমনকী ঝগড়ুটে লীলাময়ী অবধি। ভেন্ন হওয়ার পর চিতির বউ একটু অসুবিধেয় পড়ে গিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু চিতি এখন নিজে পড়েছে অগাধ জলে।

উঠোনের মাঝখানে নতুন বাঁশের বেড়া দিয়েছে কচি। এধারে ওধারে যাতায়াতই নেই। এমন কি মা অবধি লীলাময়ীর ভয়ে এধারে উঁকি মারে না।

সকালবেলায় চিতি দাওয়ায় বসে মাথায় হাত দিয়ে সাত পাঁচ ভাবছে। ছেলেটা হামা টেনে নিয়ে উঠোনে পড়ে থাকা উদুখল ধরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। কখন হাগে কখন মোতে তার ঠিক নেই, আর কখন যে

খিদে পায় বাপ। পুরোটাই ভারি ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার। বাপ হতে গেলে কিরকম কিরকম হতে হয় সেটাই মাথায় আসে না চিতির।

তার মতো লোকের যে বউ থাকবে না, এ তো জানা কথাই। বউটা বছর দুই ছিল এই ঢের। পালিয়েছে তো চিতি বেঁচেছে। বড় ঝঞ্ঝাট করত। কিন্তু যদি ছেলেটাকেও নিয়ে যেত তাহলে ঝাড়া হাত-পা হতে পারত চিতি। দিব্যি হেসে খেলে বেড়াতে পারত। কেন নিয়ে গেল না সেইটেই রহস্য।

বেড়ার ওপাশে কে যেন ঘোরাঘুরি করছে। সাদা কাপড়। মা না?

চিতি একটু গলা খাঁকারি দিল, মা নাকি গো?

মা প্রথমটায় জবাব দিল না। বোধহয় চারদিক দেখে নিল। লীলাময়ী বোধহয় কাছেপিঠে নেই। তাই নীচু গলায় বলল, ছেলেটা কী করছে?

খেলছে উঠোনে।

খাইয়েছিস?

মুড়ি খেল।

বিন্দুর কাছে নিয়ে যা। বলে রেখেছি। ঝিনুকে করে এক বাটি দুধ খাইয়ে দেবে খন।

খেলেই যে হাগবে। সেসব পরিষ্কার করবে কে?

তুই করবি। হাগবে বলে না খাইয়ে মারবি নাকি ছেলেটাকে পাগল। যা যা।

ঝঞ্ঝাট, চিতি উঠল। ছেলেটাকে হ্যাঁচকা টানে কোলে চড়িয়ে বেরিয়ে পড়ল। বিন্দুর বাড়ি পুকুরের ওধারে। তাদেরই জ্ঞাতি বোন। আত্মীয় জ্ঞাতি কেউই চিতিকে ভালো চোখে দেখে না। এমন কি পালা পার্বনে কারু বাড়ি থেকে একটা নেমন্তন্নও পায়না চিতি। বউ পালিয়ে যাওয়ার পর কেউ ছেলেটাকে যত্নআত্তি করার গরজ পর্যন্ত দেখায়নি।

পুকুরধারে দাঁড়িয়ে একটু নজর করল চিতি। বিন্দুদের বাড়ির বাইরে একটা খোলা দোচালা আছে। শানবাঁধানো। সেখানে এই সকালের দিকে গাঁয়ের পাঁচ সাতজন বুড়োসুড়ো মানুষ এসে জোটে। তাদের মধ্যমণি হল বিন্দুর শ্বশুর গোবিন্দ বুড়ো। অ্যায়সা তে-এঁটে খচ্চর লোক খুব কম দেখেছে চিতি। ঘটনাটা মনে করলে এখনো গোবিন্দর খড়মের ঘা চিতির মাথায় ঝিন ঝিন করে ওঠে।

হয়েছিল কি, বিন্দুর বর নারায়ণকে একটু ফূর্তির লাইন ধরিয়ে দিতে চেয়েছিল চিতি। পুরুষমানুষের জন্য দুনিয়ার চারদিকে কত যে আনন্দের হাট খুলে বসে আছে মানুষ। নারায়ণটা একেবারেই মাদিমার্কা পুরুষ। কিছুতেই মদ গাঁজা খাবে না, মদ ছোঁবে না, মেয়েছেলের নামে জিব কাটবে। চিতিও তেমনই ট্যাটন। একটু একটু করে সইয়ে সইয়ে, ভুলিয়ে ভালিয়ে সবই চাখালে। চাখতে তেমন খারাপও লাগছিল না শেষ দিকটায় নারায়ণের। তবে বড় ভয় পেত। বলত, বাবা টের পেলে পুঁতে ফেলবে।

টের পাওয়ার কথা নয়। ছেলে লায়েক হয়েছে, বাইরের দুনিয়ায় চরে বরে খায়, বুড়ো বাপের অত খতেন নেওয়ার দরকার কী? কিন্তু গোলমাল পাকালে বিন্দু। সেদিন একটু দিশি জিনিসের চাপান হয়েছিল বেশি রাত্তিরে। অন্যদিন যেমন এক ঢোঁক খেল কি না খেল, ঘণ্টা তিন চার পায়চারী করে, বার দুই চার পেচ্ছাপ করে, গুচ্ছের তুলসীপাতা চিবিয়ে, জর্দাপান খেয়ে, তারপর আবার দাঁতন করে ঘরে ফিরত নারায়ণ, সেদিন তেমনটি হয়নি। বিন্দু মাঝরাত্তিরে চেঁচামেচি করে উঠতেই নারায়ণ আহাম্মকটা ভ্যাড় ভ্যাড় করে সব গুপ্ত কথা কবুল করে দিলে। সেই রাত্তিরেই নারায়ণের দুই ভাই আর তাদের সাকরেদরা এসে চিতিকে তুলে নিয়ে গেল। তারপর মারের চোটে বৃন্দাবন দেখল চিতি। গোবিন্দবুড়োর রাগের আরও কারণ, তারা বোষ্টম, আর নারায়ণ ছেলেটাও ভালো। তাই তার খড়মের খটাখটি কিছু জোরদার হয়েছিল। আজও ভাবলে মাথাটা কেমন যেন ঝকাং ঝকাং করে ওঠে।

চাতালটায় বুড়ো আজ নেই। একটা ছাগল দাঁড়িয়ে নাদি ফেলছে ভুরভুর করে।

তবু সদর দিয়ে যেতে ভরসা পায় না চিতি। একটু ঘুরে গোয়াল ঘরের পিছন দিয়ে উঠোনে উঁকি দেয়। বিন্দু তার বছরটাকের ছেলেটাকে ট্যাঁকে নিয়ে একটা চট পা দিয়ে টেনে উঠোনের রোদে দিচ্ছে।

বিন্দু!

কে?

আমি। চিতি।

বিন্দু এগিয়ে এল। মুখখানা ভীষণ গম্ভীর।

চিতি বিগলিত মুখে বলল, মা এটাকে পাঠিয়ে দিল। বলে ছেলেটাকে দেখায় চিতি।

বিন্দু নিজের ছেলেকে উঠোনে নামিয়ে হাত বাড়িয়ে বাচ্চাটাকে নিয়ে একটুও না হেসে বলল, এখানেই দাঁড়িয়ে থাকো, দুধ খাইয়ে দিয়ে যাচ্ছি, একেবারে নিয়ে যেও।

ইচ্ছে হলে এবেলাটা রেখেও দিতে পারিস। মা-হারা ছেলে তো, তোর কাছে ভালো থাকবে।

মা-হারা মানে? ওর মা কি মরেছে নাকি?

না, তা নয়। তবে ওইরকমই আর কি।

তোমার মুখে আগুন। ছেলে আমাকে গছিয়ে ফুর্তি করতে যাবে সে হবে না। এখানে দাঁড়িয়ে থাকো, দুধ খাইয়ে নিয়ে যাবে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চিতি দাঁড়িয়ে থাকে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবে। এই যে চারদিকে সব ঘরপোষা গেরস্ত লোক এরা বোধহয় ভালোই আছে। এদের ধারাটা অন্যরকম। দিব্যি ছেলেপুলে বউ নিয়ে মেপেজুখে থাকে। এদের দিন আছে, রাত আছে, ভালো মন্দ আছে। এদের হিসেবে চিতি চলে না। তার দুনিয়াটাই অন্যরকম।

ওই যে তোটনবাবু তার বাইরের বারান্দায় বসে তার দিকে চেয়ে আছে ওই আর এক গেরস্ত। ভারি সুখী লোক। চিতি লোকটাকে অমন চেয়ে থাকতে দেখে কদম গাছটার পিছনে একটু আড়াল হল।

তোটনকে কেউ যদি বাবু ভাবে তো বাবু। আবার না যদি ভাবে তবে তাকেও দোষ দেওয়া যায় না। যে যেমন দেখে আর কি। তবে তাকে বাবু ভাববার একটা কারণ এই যে, সে বি ডি ও অফিসের কেরানী। সরকারি চাকরি। গাঁয়ে এ চাকরির খাতির আছে।

এমনিতে তোটন কিছু খারাপ নেই। একটু জমি জিরেত আছে, চাকরি আছে। তোটনের দুঃখ অন্য জায়গায়। সে তার মা বাপের একমাত্র সন্তান। আদরের বহরটা একটু বেশিই ছিল। তার ওপর এক জ্যোতিষ ভয় দেখিয়ে রেখেছিল, এ ছেলে সন্ন্যাসী হয়ে সংসার ছাড়বে। পাছে বংশরক্ষা না হয় সেই ভয়ে তার বাপ তাকে তিন বছর বয়সে বিয়ে দিয়ে এক বছরের কনে সন্ধ্যারাণীকে ঘরে এনে ফেলেন। তা মেয়েও মরুণে ঘরের। সন্ধ্যার আগে তার চার চারটি বোন হয়ে আঁতুরে বা বছরটাকের মধ্যেই মরে যায়। তাই এই মেয়ে নিয়ে বড় ভয় ছিল মা বাপের। তাই, তারা এক বছরের মেয়েকেই তড়িঘড়ি গোত্রান্তর করে পরের হাতে তুলে দেয়। তাতে যদি বাঁচে।

তা বেঁচে গেল সন্ধ্যারাণী। কিন্তু মুশকিল হল, ছেলেবেলা থেকেই তাকে শেখানো হয়েছিল, সন্ধ্যা হল তার বোন। সন্ধ্যা আর তোটন সেইভাবেই বড়সড় হল। পিঠোপিঠি ভাইবোনের মতো, চুলোচুলি ঝগড়া কাজিয়া, নালিশ লেগেই ছিল। তারা যে স্বামী স্ত্রী এটা বড় একটা কারোও বিশেষ খেয়াল থাকত না। তবে ভাইবোনের মতো বড় হলেও তাদের ভাইফোঁটা হত না, আর সেটাই রহস্য লাগত তোটনের কাছে।

সে সব রহস্য ভাঙল পনেরো ষোল বছর বয়সে, যখন সন্ধ্যাও ডাগর হয়েছে। দুজনকে ডেকে দুপক্ষের বাপ মা যখন সব বুঝিয়ে বলল তখন তারা অগাধ জলে। এ কী কাণ্ড! সন্ধ্যা কি না তার বউ? ঝগড়ুটে, কুঁদুলি, নালশেকুটি সন্ধ্যা? সন্ধ্যারও সেই ভাব।

লজ্জা! লজ্জা! দুজনে আর দুজনের দিকে চাইতে পারল না। দেখা হলেই ছুটে পালাত। ছেলেবেলা থেকেই দুজনের এক বিছানা। কিন্তু সেই বিছানা এখন দুজনেরই শয্যাকণ্টকী।

আজ তোটন আর সন্ধ্যা আরো বড় হয়েছে। তোটনের ত্রিশ বত্রিশ, সন্ধ্যারও ত্রিশের কাছেপিঠে। আজ তারা বোঝে যে তারা স্বামী স্ত্রী। কিন্তু বুঝেও তারা হয়ে উঠতে পারে না। তোটনের বাবা মা চায় ছেলে তাড়াতাড়ি বংশরক্ষা করুক, ছেলেপুলে দিয়ে ঘর ভরে দিক। কিন্তু বিছানায় যে দুজনের মধ্যে এক শক্ত আগড় খাড়া হয়ে আছে সেটা ভাঙবে কে? শিশু বয়স থেকে যে সম্পর্কটা গড়ে উঠেছিল তারা গত পনেরো ষোলো বছরেও সেটা ভাঙতে পারেনি। ভাঙতে চাইলে সে ভাঙা যায় না এমন নয়, আবার ভাঙলেই যে ভাঙা যায় এমনও নয়। কী একটা বাধা হয়ে আছে। দুজনেই নিশুত রাত অবধি জেগে থেকে বেড়াটা ভাঙার চেষ্টা করে দেখেছে, কী যেন একটা বাধা হচ্ছে।

আজ তোটনের ছুটি। বারান্দায় বসে সে একখানা উপন্যাস পড়ছে। উপন্যাস পড়তে তার খুব ভালো লাগে।

সন্ধ্যা এক বাটি মুড়ি আর তেলেভাজা এনেছিল। তোটন খানিক খেয়ে বাটি সরিয়ে রেখেছে। সন্ধ্যা চা নিয়ে এল। আগে এসব চল ছিল না তাদের বাড়িতে। মুড়ির পর আবার চা কীসের? আজকাল চল হয়েছে।

সন্ধ্যা, ওই লোকটাকে দেখছিস, ওই কদমগাছের আড়ালে?

ওমা, ও তো চিতি! কেন বল তো!

না, বলেছিলাম কী, ওর বউটা পালিয়েছে।

আহা, কে না জানে। পালাবে না তো কী? ওটা কি একটা মানুষ?

সে কথা বলছি না।

তবে কী বলছিস?

বউটা একটা বাচ্চা রেখে গেছে। বোধহয় সাত আট মাসের।

হ্যাঁ।

সেই বাচ্চাটা নিয়ে খুব বিপাকে পড়েছে চিতি।

পড়ুক। যেমন কর্ম তেমন ফল।

আহা, চিতি খারাপ বলে তো আর তার কুঁচোটা ফেলনা নয়।

একই রক্তের ধাত তো। একইরকম হবে।

তোর একদম মায়া দয়া নেই রে সন্ধ্যা।

থাকবে না কেন! তেমন লোকের জন্য আছে। ওর জন্যে নেই। বউটাকে একদিন ঘরের চালের বাঁশ থেকে হেঁটমুণ্ডু করে ঝুলিয়ে রেখেছিল তা জানিস?

সে জানি। লোকটাকে সবাই একঘরে করেছে তাও জানি। কিন্তু তাতে চিতির কিছু যাবে আসবে না, মাঝখান থেকে বাচ্চাটা মরবে।

সন্ধ্যা এ কথার কোনও জবাব দিল না। একটু এগিয়ে বারান্দার ধারে দাঁড়াল। চালটা নীচু, হাত বাড়ালেই ওপরে কাঠের কাঠামোটা ধরা যায়। দু'হাত উঁচু করে কাঠটা ধরে একটু শরীর ভেঙে আধো ছায়া আর আধো রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে আছে সন্ধ্যা। চমৎকার দীঘল শরীর। বাড়তি মেদ নেই, আবার খামতিও নেই কিছুর। খুব সুন্দরী না হলেও সন্ধ্যার চেহারায় একটা আলগা চটক আছে, লক্ষ্য করেছে তোটন। কিন্তু তবু তার কেন যেন বাধো-বাধো রয়ে গেল। আজও একদৃষ্টে চেয়ে রইল তোটন। সে জানে সন্ধ্যা তার বউ। শিশুকাল থেকে এক বিছানায় তারা শোয়।

সেটাই কি ভুল হয়েছিল? শিশুকাল থেকে যদি এক বিছানা না হত তাদের, যদি শেখানো না হত যে তারা ভাইবোন, যদি পিঠোপিঠি ভাইবোনের মতো একসঙ্গে না বড় হত তারা?

সন্ধ্যা ফিরে তাকিয়ে বলল, বিন্দুর কাছে এসেছে।

কে?

চিতি। ছেলেটাকে বিন্দু দুধ খাওয়াচ্ছে বারান্দায়। বড্ড মায়া হয়।

হবেই তো। তাই একটা কথা ভাবছিলাম।

কী ভাবছিলি?

ছেলেটাকে চেয়ে নেবো কিনা।

চেয়ে নিবি? কেন? সন্ধ্যা অবাক হয়ে তাকায়।

বাবা তো নাতিনাতনির জন্য অস্থির। তা বুঝলি, ভাবছিলাম চিতির ছেলেটাকে পুষ্যি নিলে কেমন হয়!

কথাটার মধ্যে কী ছিল কে জানে, সন্ধ্যা হঠাৎ কেমন যেন ছটফট করে উঠল, তারপর আঁচলে মুখটা আড়াল করে দুদ্দাড় বেগে পালাল ভিতরবাগে।

বজ্রাহতের মতো বসে থাকে তোটন। তাই তো! সন্ধ্যা বাঁজা কিনা তার পরীক্ষা আজও হয়নি। যেমন সে আজও জানে না সে নিজের উৎপাদনক্ষম কিনা। আজ অবধি কখনো সন্ধ্যাকে চুমুও খায়নি তোটন। দেখেনি ওর শরীর। এ জন্মে আর হবে না।

কিন্তু তবু পরীক্ষা না হলে পুষ্যিই বা নেওয়া যায় কী করে? তাছাড়া পুষ্যি নিলে বাড়িতে বাবা আর মা তাণ্ডব করবে। তারাও জানে এবং কী করে যেন টের পায় যে, ছেলে আর বউতে এখনো ভাইবোন। আর সে কথা ঠারেঠোরে প্রকাশ করে ঠেস দিতেও ছাড়ে না তারা। বাবা আজকাল বলে, কপালে সন্নিসি ছেলে ছিল, জুটল আবার বৈরিগী বউ। বয়সের দুটো মদ্দা মাদি এমন বরফ হয়ে জমে থাকে জন্মে দেখিনি বাবু। ঘোর কলি।

এর ওপর পুষ্যি নিলে রক্ষে আছে?

কলিকালটা যে বেশ জেঁকে বসেছে এটা জয়লালও টের পায়!

তিন মাইল ঠেঙিয়ে সাইকেলখানা আল থেকে তুলে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে জয়লাল গামছা দিয়ে মুখ আর গলার ঘুম মুছল। চাষাড়ে ঘাম, এ জিনিস ফিনফিনে রুমাল দিয়ে মোছবার নয়। গামছাখানা কোমরে বেঁধে সাদা শার্টের ঝুলে ঢাকা দিয়ে সাইকেলে ওঠার জন্য তৈরি হল জয়লাল। এতক্ষণ ঠেলে এনেছে। তোয়াজের শোধ এবার ঘাড়ে চেপে তুলবে।

কিন্তু সাইকেলখানার জন্য মায়াও হয় জয়লালের। মাডগার্ড সামনের চাকায় অর্ধেক নেই। পিছনের মাডগার্ডে শতেক ফুটো। ব্রেক চাপলেও অনেকটা ঘষটে গিয়ে থামে। দুটো চাকাই একটু একটু নড়ে। সিটখানা মাঝে মাঝে হেলে পড়ে। দুটো টায়ারে শতেক চামড়ার পট্টি। টিউবেও শতেক ফুটো রাবার সলিউশন দিয়ে ঠেকনো দেওয়া। বয়সও তো কম হল না। চলে যে এই ঢের। অবশ্য চলন খুবই ধীর। তা হোক। বেতো হাঁটু দুটো তো মাঝে মাঝে এই সাইকেলের সুবাদেই একটু জিরেন পায়।

মনসাপোতা আর বেশি দূরও নয়। মাইল পাঁচেক পিচরাস্তা ধরে গেলে বাঁয়ে ফের পাকা সরু রাস্তা। মাইলটাক গেলেই ডান ধারে বেশ বর্ধিষ্ণু গাঁ।

কিন্তু সাইকেলে চট করে চাপল না জয়লাল। সামনেই কতগুলো গাছের জড়ামড়ি, তার নীচে গুটি দুই চায়ের দোকান হয়েছে নতুন। হবেই। আপ ডাইন দুটো বাসই থামছে আজকাল পিপড়াইতে। দু-চারজন নামে ওঠে, একটু চা খেয়ে নিলে হয়।

চা খেয়ে ফুরফুরে হাওয়ায় বাইরের বেঞ্চিতে বসে জয়লাল গায়ের ঘাম শুকিয়ে নিল। সাদা দাড়ি গোঁফের জঙ্গলেও বড় ঘাম হয়। সেও হাওয়ায় শুকোয়। ভারি আরাম হতে থাকে, আরও আরাম হত যদি ঘাড়ে চিন্তাটা না থাকত।

ছেলে তার নয়। রামলালের। রামলাল ছিল তার বড় ভাই। মা-মরা ছেলেটাকে নিয়ে থাকত। তা তারও একদিন মরণ ঘনিয়ে আসায় ছেলেটাকে জয়লালের হাতে তুলে দিয়ে যায়। ফ্যাসাদ আর কাকে বলে। জয়লালের পিছুটান বলে কিছু ছিল না। সাধক জীবন। একটু হোমিওপ্যাথি করত, খানিক কবিরাজিও। একটু মন্দির মতো করে কালীসাধনাও চালিয়ে যাচ্ছিল। ঘাড়ে চাপল রামলালের ছেলে শিবলাল।

ফেলতে পারেনি জয়লাল। কোলেপিঠে করেও তেমন মানুষ করতে হয়নি। রামলাল মরার সময় শিবলালের বয়স আট নয়। ডাগর ছেলে। বেশ গান গাইতে পারত। আর সেই গানেই খেল ছোঁড়াকে।

জয়লাল গান ভালোবাসে না তা নয়। তবে গান সে তেমন বোঝে না, গলাতেও সুর খেলে না। কিন্তু শিবলালের যে খেলে তা জয়লাল বোঝে। চড়ায় উঠেও ছোঁড়া বেশ সুরে থাকতে পারে। গানে সেটাই তো বাহাদুরি। চড়ায় উঠে বহু কাপ্তানের গলা ফেঁসে যায়, অনেকে কাশতে থাকে, কিন্তু শিবলাল চড়ায় গিয়েও সুরে বসে থাকে গ্যাঁট হয়ে। শুধু তাই নয়, চড়া থেকে আরো চড়ায় ঠেলে উঠতে থাকে তার গলা।

এই কেরামতির জন্য আজকাল শিবলালের খুব কদর। এ-গাঁ সে-গাঁ দাপিয়ে গেয়ে বেড়ায়। বোম্বাইতে কে এক খান্না আছে, তার মতো না হয়েই সে ছাড়বে না বলে গোঁ ধরেছে।

ভালো কথা। জয়লালের তাতে বড় আপত্তিও নেই। শিবলাল লায়েক হয়েছে, যা খুশি করুক। শেষ বয়সটা জয়লাল সাধনভজন আর হোমিওপ্যাথি নিয়ে থাকতে পারলে বাঁচে।

কিন্তু ঘোর কলি যে। কোথাও কিছু না হঠাৎ শিবলাল কোথা থেকে একটা মেয়ে এনে ঘরে তুলল। বলল, আমার বউ।

সত্যি বটে, জয়লাল সংসারের ঘোরপ্যাঁচ তেমন জানে না। কিন্তু মেয়েটার সিঁথিতে বাসি সিঁদুরের দাগটা সে এড়ায় কী করে? তারপর আরও আছে। শিবলাল গাইতে যায়, মেয়েটা একা ঘরে ফুচ ফুচ করে কাঁদে। মুখখানা সর্বদা ভার ভার, সারাদিন আনমন উচাটন। জয়লালের উদাসী চোখেও এসব পড়ে। নতুন বিয়ের বউয়ের তো এমন হওয়ার কথা নয়। বেশ একটা তরতাজা ডগমগে ভাব থাকে তাদের। সাজগোজের দিকে নজর থাকে। বিয়ের জল বলে কথা।

একদিন নিতাই ঘরামী এসে গুহ্য কথা ফাঁস করে গেল গোপনে। মনসাপোতার চিতি মণ্ডলের বউকে ভাগিয়ে এনেছে তার গুণধর ভাইপো।

কলিকাল যে জেঁকে বসেছে তার সন্দেহ কী? মেয়েটা দেখতে শুনতে মোটেই ভালো কিছু নয়। ডবকা এই যা। তার ওপর পরের বউ, বাচ্চার মা। তা তুই কলির কেষ্ট চারধারে এত মেয়েমানুষ থাকতে একটা ঘর লক্ষ্মীছাড়া করলি কেন, একটা বাচ্চাকে মা-ছাড়া করলি, নিজের ঘরটাকেও আস্তাকুড় বানালি!

জয়লাল একদিন বউটাকে ডেকে একটু ভয় দেখাল, দেখ বাপু, কালটা কলিই বটে, দুষ্ট লোক উচ্চে বসবে, জ্ঞানী মানীর মাথা হেঁট হবে, বেশ্যা আর সতীলক্ষ্মীতে তফাৎ থাকবে না, তবু বলি দুটো কুল মজানো তোমার ঠিক হয়নি। শিবলালকে উচ্ছন্নে দিলে মা, কিন্তু নিজেই কোন সুখে আছো?

বউটা হাউমাউ করে কেঁদে পায়ে পড়ে বলল, আমাকে তাহলে সেখানেই রেখে আসুন। সে যমদূত যদি আমাকে কেটেও ফেলে তো মরব না হয়। মরার চেয়ে বেশি আর কী! এখনো তো মরেই আছি।

জয়লাল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। রেখে আসব বললেই তো আর রেখে আসা যায় না। ভাগা বউকে হুট করে নিয়ে তুললে ওপক্ষ না আবার ধুন্ধুমার লাগায়, চাইকি দুচার ঘা হয়তো বসিয়েই দিল বুড়ো বয়সে।

জয়লাল তাই সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে আজ। গিয়ে বুঝবে আবহাওয়াটা কেমন, মেজাজ মর্জি কেমন, বউ ফেরত নিতে গা করে কিনা। শিবলালকে নিয়ে চিন্তা নেই জয়লালের। বরাবরই কাকার বাধ্যের ছেলে। তাছাড়া মেয়েমানুষটাকে নিয়ে বোধকরি খুব সুখেও নেই। কাঁদুনে মেয়েছেলেকে নিয়ে ফুর্তিটাই বা হচ্ছে কী করে?

জয়লাল চাটুকু খেল বেশ সময় নিয়ে। বেঞ্চিতে পাশে আরও একজন বসা। বুড়োসুড়ো লোক। খুব নজর করছিল। ফস করে বলে উঠল, জয়লাল ডাক্তার না?

তা বটে। আপনি?

আমাকে কি আর চিনবে? কালীতলা চেনো?

চিনি। বটেশ্বর ঠাকুরের থান তো! সেই চৌধুরি পুকুরে মেলা কচ্ছপ?

হ্যাগো। কচ্ছপে কচ্ছপে ছয়লাপ। তা সেই গাঁয়ের গুরুচরণ হালদারের সাক্ষাৎ খুড়তুতো ভাই।

গুরুচরণকে চিনতুম খুব। খাইয়ে লোক বলে নাম ছিল।

খেয়েই তো মোলো। তোমাকে তার বাড়িতে আনাগোনা করতে দেখেছি।

যেতুম তখন। আমার এক বোনের বিয়ে হয়েছিল কালীতলায়। বেঁচে নেই।

জানি।

এক কথায় দু' কথায় আলাপ জমে গেল। বটেশ্বরের থানের পিছনেই মনসাপোতার মাঠ। গুরুচরণের ভাই মহেন্দ্র চিতি মণ্ডলের নাম শুনেই বলে উঠল, আরে রাম রাম, ঘোর পাপী। তার কাছেই যাচ্ছ নাকি? তা দরকারটা কীসের তাকে?

কথাটা ভাঙা যায় না। জয়লাল তাই আমতা আমরা করে বলল, না, ঠিক তার কাছে নয় বটে। ওদিকেই যাচ্ছিলাম অন্য কাজে, একজন বলল চিতি মণ্ডলকে একটা কথা বলে আসতে।

কথা বলবে। তাহলে তো শুঁড়িখানা বা খারাপ পাড়ায় যেতে হয়। অমন নষ্ট মানুষ দুটো নেই।

জিরেন নিয়ে উঠে পড়ল জয়লাল। সাইকেলে চেপে রওনা দিল। আশ্চর্য, এই আজকাল নষ্ট মানুষের সংখ্যা হু-হু করে বাড়ছে। ভালো মানুষ বড় একটা দেখা যাচ্ছে না। ক্রমে ক্রমে...

কুঁচোটা আজ চিতির মাথাটাই গরম করে দিল। পেট ঢাঁই করে দুধ খেয়ে এসেছে, কিন্তু ঘুমের নামটি নেই। খুব কিছুক্ষণ হামা দিল, ঘরে আর দাওয়ায়। একবার একটা মোড়া উল্টে ফেলে কিছুক্ষণ চেঁচাল। তারপর আবার হামা টানছে এধারওধার। ঘুম না এলে অবশ্য ওকে দোষ দেওয়া যায় না। বেড়ার ওপাশে আজ লীলাময়ী মাটি কাঁপিয়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে আর চিল-চেঁচানিতে পাড়া মাৎ করে হাজু পাকড়াশীর বিধবা বোন সৈন্ধবীর সঙ্গে ঝগড়া করছে। সৈন্ধবীও বড় কম যায় না। একটু তফাতে নিজেদের বাড়ির পাছদোরে দাঁড়িয়ে সেও আজ গঙ্গাজলে ধোয়াচ্ছে লীলাময়ীকে।

মেয়েছেলেদের এই এক ব্যাপারে আলিস্যি নেই, দেখেছে চিতি। ঝগড়ার গন্ধ পেল তো তুলোর বস্তা খাড়া হয়ে শিং নেড়ে ষাঁড় বনে গেল।

মানুষ কেন যে ঝগড়া কাজিয়া করে তা কিছুতেই বুঝতে পারে না চিতি। এত ঝগড়া কাজিয়ার কী আছে। ফুর্তি করতেই তো জন্মানো। ঝগড়া করলে ফুর্তিটা হয় কী করে? ঝগড়ার শব্দে চিতির মাথা ক্রমে গরম হচ্ছে। কিন্তু এই কুঁচোটাই বড় বিপাকে ফেলেছে।

চিতি দাওয়ায় বসে ছেলের কাণ্ডটা দেখছিল। হামা দিয়ে গিয়ে বারান্দার খুঁটি ধরে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে ধপাস করে পড়ে পাছায় ব্যথা পেয়ে কেঁদে উঠল। মরুকগে। কাঁদুক। কাঁদতে কাঁদতে আপনিই চুপ মারবে।

পরশু চিতি ছেলেকে নিয়েই খালধারে তাড়ির আড্ডায় গিয়ে বসেছিল সন্ধেবেলায়। দেখল, তার ছেলেও বেশ তৈরি জিনিস। কোলে বসে চিতির হাতের গেলাস ধরে টানাটানি। তা চিতিও তেমনি। আঙুল তাড়িতে ভিজিয়ে একটু একটু চাখাল। তাড়িপ্রাশনটা হয়ে থাক। আজ একটু নয়াগঞ্জের দিকেও যেতে ইচ্ছে চিতির। অনেককাল ওসব হয় টয় না বউ গিয়ে ইস্তক। ছেলেকে গছাবার কেউ নেই, তাই নিয়েই যাবে। চোখ ফুটুক ছোঁড়ার।

ভাবতে ভাবতে উঠে পড়ল চিতি। লীলাময়ী আজ আর তিষ্ঠোতে দেবে না। লুঙ্গির ওপর একটা জামা চড়িয়ে ছেলেটাকে ঘাড়ে ফেলে বেরিয়ে পড়ল। আজ আর রান্নার পাট দরকার নেই। নবীনদের বাড়ি দুটো ভেজা মুড়ি খেয়ে নেবে। দুপুরটা জিরিয়ে বিকেল-বিকেল বেরিয়ে পড়বে। সে-বাড়িতেও যে সবাই তাকে সুনজরে দেখে তা নয়। তবে কিনা নবীন হল সংসারের কর্তা, তার মাঞ্জাই আলাদা। পঞ্চ ম-কারে সেও কিছু কম যায় না। তবে কিনা তাকে সে কথা বলে এমন বুকের পাটা কার?

বেরোবার মুখেই লোকটাকে দেখে চিতি থেমে গেল। তোতনবাবু।

তবে চিতির মাথায় বুদ্ধি খেলে চিড়িক করে। সে বুঝল, আসার পিছনে মতলব আছে। আর মতলব মানেই দাঁও।

একগাল হাসল চিতি, কি খবর তো তোতনবাবু?

তোমার খোঁজেই এসেছিলাম।
কী ভাগ্যি! বসবেন নাকি?
বসতে বোধহয় একটু হবে। কথা আছে।
চিতি মাথা হেলিয়ে বেড়ার ওপাশটা ইশারায় দেখিয়ে বলল, ওদিকে যা চলছে, আপনি ভদ্রলোক বেশিক্ষণ সইতে পারবেন না। তার চেয়ে চণ্ডীমণ্ডপের দিকে চলুন। না হয় তো বটতলায়।
অত দূরে যাওয়ার দরকার নেই। কোথায় বেরোচ্ছিলে চলো, যেতে যেতে বলি। সংক্ষেপেই সারব।
তাই হোক।
তোমার ছেলেটাকে তো বোধহয় দেখার কেউ নেই।
না। বউটা পালাল জানেন তো!
জানি।
কার সঙ্গে গেছে, কোথায় গেছে সব জানি। গদাধরপুরের শিবলাল, চেনেন তো, সেই যে গান গায়!
জানি।
সে-ই। তা যাক। শিবলালের কাঁচা পয়সা, খুড়ো ডাক্তার। সেখানে সুখেই থাকবে। আমার তো অবস্থা একেবারে টাইট। তিন মণ তিসি বেচলাম, গোবিন্দ বিশ্বাস আজ দিচ্ছি কাল দিচ্ছি করে ঘোরাচ্ছে। পশ্চিমের বাঁশঝাড়টা আমার বলে সবাই জানে, কালী হাজরা লোক লাগিয়ে কেটে নিয়ে গেল। বাড়ির ভাগও দেখুন কেমন তে-কোনাচে করে নিয়েছে কচি। তা আমার দুঃখের সংসার, এখানে তার মন টিকত না। সব বুঝি। কিন্তু এই বাচ্চাটাকেও যদি নিয়ে যেত।
সেই কথা ভেবেই আসা। তোমাদের জন্য বাচ্চাটা কষ্ট পাচ্ছে।
কী করতে বলেন?
বাচ্চাটা আমাকে দাও।
দেবো মানে? পুষ্যি নেবেন নাকি?
পুষ্যিটুষ্যি নয়। তার অনেক ঝামেলা, এমনি রাখবো। যতদিন তোমার একটা ব্যবস্থা ট্যাবস্থা না হচ্ছে।
চিতি একটু সন্দিহান চোখে তাকায়, তাহলে মানেটা কী দাঁড়াচ্ছে?
ওর আর মানে নেই। বাচ্চাটা কষ্ট পাচ্ছে বলে আসা।
চিতি মাথা নেড়ে বলল, কথাটা পরিষ্কার হচ্ছে না। জ্ঞাতিগুষ্টি আমার কিছু কম নেই। তাদের ছেড়ে আপনার কাছে ছেলে গচ্ছিত রাখলে বড় নিন্দে হবে। পুষ্যি নিতে চাইলে অবশ্য অন্য কথা।
তাই যদি নিই?
চিতি মাথাটা চুলকোলো। বলল, তা সস্তা করে দেবোখন। হাজার খানেক যদি দেন তো হয়ে যায়।
টাকা চাও?
মূল্য ধরে না দিলে কি এসব হয়?
হাজার টাকা?
সেও আপনি বলে। বাজার ঘুরে এলেই বুঝবেন সস্তা কিনা। ঘরে ঘরে সব মেয়ে বিয়োচ্ছে মেয়েছেলেরা। আর এই ছেলেকেও দেখুন। রং ফর্সাই ধরতে পারেন। নাকমুখচোখ সব ঠিক আছে, কানাখোড়া পেঁচোয় পাওয়া নয়। না হয় দুশো কমই দিলেন।
তোটন একটু থতমত খেয়ে চেয়ে থাকে। চিতি খারাপ সে জানে। কিন্তু এতটাই খারাপ কি? সে দাঁড়িয়ে পড়েছিল বিস্ময়ে। তারপর সামলে নিয়ে বলল, ছেলে নিয়ে ব্যবসা করছ?
চিতি একটু বুকটা টান করে বলে, ব্যবসা কিসের? সকলের কি সব হয়? আপনার হলে বুঝতেন ছেলে বাপের কাছে কী জিনিস। তা সে কথা থাক, বিপদে আমি নানা দিক দিয়ে পড়েছি। তাই দিতে তেমন

আপত্তি করছি না। মরুনে ছেলেকে মা-বাপও তো এক কড়ি তিন কড়ি পাঁচ কড়িতে বেচে দেয়। তাতে দোষ ধরে কেউ?

তা বটে।

তাহলে? দুপুরবেলাটায় এসে পড়েছেন, বউনিই ধরা যায়। আপনি ভদ্রলোক বলে কথা, পাঁচশোই দেবেন না হয়। ছেলের দাম চাইছি না। ছেলের দাম কি টাকায় হয় তোটনবাবু? শুধু মূল্য ধরে দেওয়া আর কি।

তোটন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, দেব। কিন্তু একটা কথা। কথাটা যেন কেউ জানতে না পারে। বিশেষ করে আমার বাবা।

লেখাপড়া হবে না বলছেন?

না।

টাকাটা কি আজ পাব?

পঞ্চাশটা টাকা আমার পকেটে আছে, দিচ্ছি। বাকি টাকা পরে।

তাই দিন।

ছেলে কবে দেবে?

কবে মানে? ঘাড় থেকে নামাতে পারলে বাঁচি। নিন না নিন। হাত বাড়ান। এ ব্যাটা একেবারে বিশ্ববন্ধু, হনুমান কোলে নিতে চাইলেও লাফিয়ে চলে যায়।

কথাটা মিথ্যেও নয়। তোটন হাত বাড়াতেই ছেলেটা ঝাঁপ খেয়ে চলে এল। বাঁ হাতে পঞ্চাশটা টাকা বুকপকেটে থেকে বের করে দিল তোটন।

ভারী উজ্জ্বল দেখাল চিতির মুখ।

কলিকালে বিশ্বাস করত না তোটন। আজ করল।

পঞ্চাশটা টাকা গচ্চা গেল কিনা কে জানে। কারণ, ছেলেটাকে বাড়ি নিয়ে তুললে বাবা মার মেজাজ কেমনধারা হয়ে উঠবে তা আন্দাজ করতে পারছে না তোটন।

তোটন বড় বাচ্চাকাচ্চা ভালোবাসে। এই যে তারা ঘুরঘুর করে নানা উদ্ভুটে কাণ্ড করে, এটা ফেলে সেটা ভাঙে, অর্থহীন নানা শব্দ করে আহ্লাদ বা রাগ দেখায় এসব দেখতে দেখতে যেন বুকটা জুড়িয়ে যেতে থাকে, নেশা ধরে যায়। দুনিয়ায় শিশুর মতো এমন মজার জিনিস আর নেই। তোটনের কপালে সেই শিশুই জোটেনি।

বাচ্চাটাকে বুকে চেপে তোটনের গা শিরশির করছিল আনন্দে।

কাঁঠালতলা দিয়ে গেলে সদর এড়ানো যায়, বাপেরও চোখে পড়ে না। ঘরে ঢুকে খিল তুলে দিয়ে তোটন বলল, এই নে।

সন্ধ্যা বিছানায় বসে সরু কাঠের চিরুনী চালিয়ে মাথায় খুসকি ছড়াচ্ছিল। চেয়ে দেখল একটু। কিন্তু তেমন গা করল না। বাচ্চাটাকে মেঝেয় ছেড়ে দিয়ে তোটন বলল, একটু কিছু খাওয়াবি ছেলেটাকে? মনে হয় খিদে পেয়েছে।

সন্ধ্যা নিজের কাজ করতে করতে বলল, বাবা কুরুক্ষেত্র করবে দেখিস।

আহা, বিপদে পড়েছিল, অযত্নে মরতে বসেছিল তাই নিয়ে এসেছি। এতে রাগের কী?

চিরুনীটা খাটের বাজুতে বার দুই ঠুকে সন্ধ্যা উদাস গলায় বলে, তোর যে কী হয় মাঝে মাঝে। কেমন যেন পাগলাটে হচ্ছিস আজকাল।

পাগলাটে! কথাটা তোটন একটু হোঁচট খায়। একটু ভাবিত হয়। সন্ধ্যা কথাটা তেমন মিথ্যে বলেছে কি? তাকে সন্ধ্যার চেয়ে ভালো করে আর কেউ চেনে না। এমন কি বাপ মাও না। ছেলেবেলা থেকে তারা দুজনকে চিনেছে ঝগড়ায় মারপিটে, কান্নায় হাসিতে, ভাই বোনের মতো প্রথমটায়, তারপর খানিকটা স্বামী-স্ত্রীর মতোও। খানিকটাই। পুরোটা নয়। সন্ধ্যা তার মুখ দেখে মনের কথা টের পায়। কথাটা ঠিক। তাকে

আজকাল বোধহয় একটু পাগলামিতে পায় মাঝে মাঝে। জীবনটা ফুরিয়ে যাচ্ছে, কী যেন হয়ে উঠল না, আর হয়ে উঠবেও না, সময় হবে না। বড় বাধা। বড় বাধা চারদিকে। তার যেন আপনা থেকেই শ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে চায়।

চিতির ছেলে খুব হামা টানতে শিখেছে। সন্ধ্যা আর তোটনের এক লহমায় অন্যমনস্কতায় চৌকাঠ ডিঙিয়ে বারান্দায় গিয়ে পড়ল। তারপরেই একটা চিৎকার।

না, বাচ্চার নয়। তোটনের বাবার।

এটা কে রে? ওরে ও সন্ধ্যা, বলি তোর দাওয়ায় এটা কে রে?

সন্ধ্যা চমকে উঠে দৌড়ে বেরোয়, বাবা, ডাকছ?

ওই বাচ্চাটা কোথা থেকে এল?

সন্ধ্যা খুব খিলখিল করে হেসে বলল, ওই তো চিতি মণ্ডলের ছেলেটা গো। বিন্দুদির কাছে ছিল, একটু নিয়ে এলাম।

চিতির ছেলে! তা তোর পরের ছেলে আনার দরকার কী? ব্যথাট্যাথা লেগেটেগে যাবে কখন, তখন দুষবে। যা দিয়ে আয় গে।

না গো বাবা, দূষবার লোক কই? বাপটা মানুষ নাকি?

সন্ধ্যাকে একটু যেন বেশিই প্রশ্রয় দেয় তোটনের বাবা। তাই নরম গলায় বলল, তবু পরের ছেলে। চিতি লোকও তো ভালো নয়।

আমার তো ইচ্ছে বাচ্চাটাকে পালি পুষি।

একথায় বুড়ো খেঁকিয়ে উঠল, পুষ্যি নিবি নাকি? এখন বোধহয় সেইটেই বাকি আছে। যা যা এক্ষুনি গিয়ে দিয়ে আয়। নিজেদের হয় না, পরেরটা নিয়ে টানাটানি।

সন্ধ্যা বাচ্চাটাকে বুকে নিয়ে ঘরে এসে তোটনের দিকে চেয়ে বলল, হল তো!

তোটন একটু বিবর্ণ মুখে দাঁড়িয়ে ছিল। এরকমটা হবে সে তো জানত। তবু একটু আশাও ছিল।

সন্ধ্যা তোটনের দিকে চেয়ে ছিল। বলল, যা দিয়ে আয় গিয়ে।

কাকে দিয়ে আসব? চিতি কি আর বাড়িতে আছে?

তাহলে বিন্দুর কাছে দিয়ে আসি।

চিতিকে যে পঞ্চাশটা টাকা দিয়েছি।

দিলি! বলে চোখ কপালে তোলে সন্ধ্যা, আমাকে না বলে দিলি?

তোটন ভারি লজ্জা পায়। বাস্তবিক সন্ধ্যাকে না জানিয়ে সে কিছু করে না। স্বামী-স্ত্রীর মতো না হলেও তারা পরস্পরকে গভীরভাবে ভালোবাসে। আর ভালোবাসায় দুজনের মধ্যে বড় একটা গোপন কিছু থাকে না। অন্তত তাদের নেই।

তোটন তাই বলল, তুই বকবি ভয়ে বলিনি।

টাকা দিতেই বা গেলি কেন?

না হলে দিচ্ছিল না যে। টাকা ছাড়া চিতি মণ্ডল আর কিছু চেনে না যে। কষ্টের মধ্যেও পড়েছে।

সন্ধ্যা দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াল। তারপর বলল, ও টাকা আর আদায় হবে না। যা গেছে গেছে। আমাকে বললে দিতে দিতাম না।

সন্ধ্যা বকল না, রাগ করল না বলে ভারি ভালো লাগল তোটনের। সন্ধ্যার সঙ্গে ছেলেবেলায় তার চুলোচুলি ঝগড়া হত বটে, কিন্তু এখন হয় না। এখন তারা দুজনেই দুজনের মন বুঝে কথা বলে। তা বলে মন-রাখা কথা নয়।

সন্ধ্যা ছেলে কোলে নিয়ে কাঁঠালতলার দোর দিয়ে বেরিয়ে গেল।

জয়লাল বাড়ির সামনে এসে সাইকেল থেকে নেমে পড়ল। হাঁটু দুটো টাটাচ্ছে। পথ তো কম নয়। তেষ্টায় ছাতি কাঠ। তবে জয়লাল ধৈর্যশীল মানুষ, খিদে তেষ্টা রাগ দ্বেষ তাকে কাবু করতে পারে কমই।

এখন একটু সাবধানে এগোতে হবে। বাড়ির দুটো সদর দেখতে পাচ্ছে জয়লাল। চিতি মণ্ডলের বউ এরকমটাই বলেছিল। ডানহাতি অংশটাই চিতি মণ্ডলের।

সাইকেলের স্ট্যান্ডটা অনেকদিন ভেঙে গেছে। জয়লাল সেটা বেড়ার গায়ে ঠেস দিয়ে রেখে ভিতরে ঢুকল।

ইয়ে, চিতিবাবু আছেন নাকি, চিতিবাবু।

কেউ সাড়া দিল না। জয়লাল দু-কদম এগিয়ে বাড়ির ভিতরে উঁকি মেরে হাঁ করে রইল। উঠোন আগাছায় ভর্তি, ঝাঁটপাটের চিহ্ন নেই, মাটির দাওয়ায় লেপাপোঁছা হয় না বহুকাল। ঘরের দরজা হাট হয়ে খোলা।

চিতিবাবু!

সাড়া নেই। জয়লাল দাওয়ায় এসে ওঠে। ঘরে উঁকি দেয়। নাঃ, নেই। সব একেবারে ভোঁ-ভোঁ। তবে ঘরে দু-চারটে জিনিসপত্র আছে। ঘরে যে কেউ বাস করে তাও বোঝা যায়। আর বোঝা যায় যে, এ ঘরে লক্ষ্মী নেই।

জয়লাল বেরিয়ে এসে চিতির দাদার অংশে উঁকি দিল। খুব দজ্জাল চেহারার একটি সধবা একটা ঝাঁটা আছড়ে আছড়ে তাতে গোঁজা ভরছে। এ যে কচি মণ্ডলের বউ তা বুঝতে দেরি হয় না তার। জয়লাল গলাখাঁকারি দিতেই তাকাল।

কে ওখানে?

জয়লাল হাতটা কপালে ঠেকিয়ে বলল, মা, অনেক দূর থেকে আসছি।

নিরন্তর সৎচিন্তা করে বলে জয়লালের চেহারায় একটা সহজ সরল সাত্ত্বিক ভাব আছে। চট করে তাকে কেউ বড় একটা দূরছাই করে না। সেইটেই জয়লালের ভরসা।

লীলাময়ী এগিয়ে এল। ভালো করে আপাদমস্তক দেখল। তারপর বলল, কাকে চাইছেন?

জয়লাল দাড়ির ফাঁকে বিগলিত হাসি অবিরল ঝরাতে ঝরতে বলল, মামণি, একটু জল না খেলে যে বুড়োর স্বর বেরোবে না।

লীলাময়ী নরম পাত্রী নয়। তবে তারও মানুষের শরীর, আর এই বুড়ো লোকটাকে দেখে হঠাৎ তার মরা বাপের কথা মনে পড়ে গেল। এমনি দাড়ি, এমনি সর্বদা বিনয়ী ভাব।

দিচ্ছি। বলে নিজেই দৌড়-পায়ে গিয়ে এক ঘটি জল আর দুখানা মোয়া নিয়ে এল।

জয়লাল বলল, মোয়া থাক।

জল দিয়ে কণ্ঠা পর্যন্ত ভরিয়ে জয়লাল ঘটি ফিরিয়ে দিল। তারপর দাওয়ায় বসল। বলল, তোমাকে আমি আন্দাজে চিনি মা। কচি মণ্ডলের বউ। তা তুমি আমার এখন একমাত্র ভরসা।

লীলাময়ী ঘোমটা তুলে সামনেই দাঁড়িয়ে বলল, বলুন।

জয়লাল তার সাদামাটা গলায়, বিশেষ ভণিতা না করে সব বলে দিল। কিছু বাদ রাখল না। শুনতে শুনতে লীলাময়ীর চোখ দুখানা গোল থেকে গোলতর হচ্ছিল। তবে শব্দ করল না। নিঃশব্দে শুনল।

বৃত্তান্ত শেষ করে জয়লাল বলল, অসতী বললে অসতী। তবে আমি বলি কী মা, শরীরের তত দোষ নাই, যত দোষ মনের। বউটাকে যা বুঝলাম সে তার মনটা ওখানে দেয় নাই। অত্যাচারের চোটে গা বাঁচাতে পালিয়েছিল। গর্দভটাকে পেয়ে গিয়েছিল সঙ্গতি।

লীলাময়ী কথাটা অবিশ্বাস করল না। এই দাড়িওয়ালা সহজ সিধে মানুষটিকে অবিশ্বাস করার কিছুই নেই। তবে সে মৃদু স্বরে বলল, আমাকে কী করতে বলেন? চিতি মণ্ডলকে তো আমরা ভিন্ন করে দিয়েছি। ওই দেখুন বেড়া।

জয়লাল তাকাল, কোথায় বেড়া মা, কোন বেড়া? বাঁশের? বলে খুব হোঃ হোঃ করে হাসল জয়লাল। হাসতে হাসতে চোখে জল এসে গেল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, খুব বেড়া মা, জব্বর বেড়া। একেবারে

মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া এর কাছেতে যম ঘেঁষে না।
লীলাময়ী কী বলবে বুঝতে পারছিল না।
জয়লাল ধুতির খুঁটে মুখটা মুছে নিয়ে বলল, কত ভাগ করবে মা নিজেকে? এই যে আজ নিজের অংশে আছ এই বা ক'দিন? তোমার ছেলেপুলে বড় হবে, তারা আবার ভাগে বসবে। ভাগ করতে করতে কী থাকবে বলো তো!
লীলাময়ী পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে উঠোনে গর্ত খুঁড়তে খুঁড়তে বলল, ভাগ তো আর আমি করিনি। হয়েছে।
তা হোক মা। ভাগও থাক। আমার কিন্তু ভরসা তুমি। তুমি ইচ্ছে করলে চিতির বউকে ঘরে ফিরিয়ে আনতে বাধা হবে না। শুনেছি চিতি পাষণ্ড লোক, তবে তোমাকে খুব ভয় করে।
আমি আমার জাকে দুষছি না। সে যা করেছে প্রাণের ভয়ে করেছে। কিন্তু সমাজ আছে, পাঁচজনে পাঁচ কথা বলবে তো!
জয়লাল আবার খুব হাসে, এখন বুঝি বলছে না? চিতি মণ্ডলের কি খুব সুনাম মা?
তা নয়, তবে বাবা, পুরুষমানুষ বলে কথা। মেয়েমানুষ তো আর তা নয়।
সব জানি মা। তবে আমার যেন মনে হয় তুমি অভয় দিলে সব ঠিক হয়ে যাবে।
আমাকে কী করতে হবে বলুন!
জয়লাল দুলে দুলে মিটিমিটি হাসল অনেকক্ষণ। তারপর বলল, চিতির বউ আমাকে কী বলে জানো মা! বলে, আমার জা খুব দাপের মানুষ,তার হাঁকে ডাকে গগন ফাটে। আমি বলি, এরকমটাই তো চাই। শাস্ত্রে কি মায়ের একটা রূপ? কখনো নৃমুণ্ডমালিনী, কখনো দশপ্রহরণধারিণী। যখন যেমন দরকার তেমনটি হয়ে দাঁড়াতে না পারলে আর জগদ্ধাত্রী বলেছে কেন? রামপ্রসাদের বেড়া বেঁধে দেয়, আবার মহিষাসুরের ঝুঁটিও ধরে। তাই চিতির বউকে বললুম, তুমি যা বললে তোমার জা যদি তাই হয়ে থাকে তবে তোমার আর ভয় নেই। সে যদি তোমার পাশটায় দাঁড়ায় তবে চিতি মণ্ডল থেকে গাঁয়ের সব মুরুব্বির গলায় কানাই-বাঁশি বাজবে। আজ রওনা দেওয়ার কালে কালীবেটির কাছে কী বলে এসেছি জানো? বলেছি, মা গো, লীলাময়ী-মা যেন আমাকে ফিরিয়ে না দেয়, ওই বেটির মধ্যে তো তোরই অংশ আছে মা।
লীলাময়ী যেন কেমন অন্যধারা হয়ে যাচ্ছিল। তার এত রাগ, তার চণ্ডমূর্তি, তার খাপদাপ এসবও যে কারো কাজে লাগতে পারে এ সে কল্পনা করেনি তো কোনোদিন। সে জানে লোকে আড়ালে তাকে ঘেন্না করে, ভয় করে, কুচ্ছো গায়। তবে এ কী শুনছে সে?
নেশাটা আজ জমল না একদম। একটা বোতল ফাঁক করার পরই কেমন বমি-বমি লাগছে। বাঁ কোলটা খালি। ছেলেটাকে বেচে দিয়েছে। তা গেছে ভালো। বাঁচোয়া। কিন্তু নেশাটা জমছে না।
চিতি আজ একটু আগেভাগে উঠল।
পথে পড়ে নয়াগঞ্জের দিকে রওনাও দিল। বিকেল অবধি বেশ একটা ডগোমগো ভাব ছিল শরীরে। নয়াগঞ্জের মেয়েগুলো ছলাকলাও জানে মন্দ নয়।
কিন্তু খানিকটা হাঁটার পর তার মনে হতে লাগল, দুর বাবা, অনেকটা পথ! অতটা হেঁটে গিয়ে পোষাবে না। কাল হবে'খন।
বলে ফিরল চিতি। রাস্তাটা বেজায় অন্ধকার। ঘরে ফিরলেও ঠিক একইরকম জমাট অন্ধকার দেখবে। এ সময়ে ফেরার পথে ছেলেটা বাঁ কাঁধে মাথা রেখে নেতিয়ে ঘুমোয়। তার শ্বাস এসে মুখে লাগে, গালে লাগে। বিরক্তিকর, কিন্তু আজ নেই বলে একটু যেন অস্বস্তি হচ্ছে। বাড়িতেও ছেলেটা নেই।
চিতি জোর কদমে হাঁটতে লাগল।
বাদামতলায় এসে সে একটু দাঁড়াল। বাঁ দিকে একটু ঘুরে জেলেপাড়ার পথ দিয়ে গেলে তোটনবাবুদের বাড়িটা পড়ে। যাবে নাকি ও পথে?

দোনামোনা করে বাঁ দিকেই ফিরল চিতি।

একটু বাদে তোটনবাবুদের বাড়িটা ভেসে উঠল অন্ধকার ফুঁড়ে। যেন একখানা জাহাজ। অন্ধকারে সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে দূর থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। চিতির বুকপকেটে এখনো চল্লিশ টাকা।

ছেলেটার আজ অবধি কোনো নাম দেয়নি কেউ। চিতি ইচ্ছে করল একটা নাম দিতে। নাম না হলে মানুষের চলে!

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কিছু দেখার এবং শোনার চেষ্টা করল চিতি। কিন্তু তোটনবাবুদের জানলায় মোটা কাপড়ের পর্দা। কিছু দেখা গেল না, শব্দত্ব নেই কোনও, ছেলেটা বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে।

চিতি নিজের বাড়ির দিকে রওনা হল।

বাড়ি ঢুকতে গিয়ে ভূত দেখার মতো চমকে ওঠে চিতি। এ কী! আলো জ্বলছে যে! ভুল করে কচির অংশে ঢুকে পড়েনি তো। লীলাময়ী যা খাণ্ডার, ঢুকলে দু'খানা করে ফেলবে। চিতি তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে এসে ভালো করে দেখল। না, ঠিকই আছে। ডানধারেটাই তার অংশ। কোনো ভুল নেই।

চিতি ঢুকে চারদিকে চাইল। ঘর থেকে হ্যারিকেনের জোরালো আলো ছিটকে আসছে। তাতে দেখা যায়, বারান্দাটা যেন একটু সাফসুতরো।

চিতি অবাক হয়ে দাওয়ায় উঠল। তারপর ঘরে উঁকি দিয়ে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ঘরে লীলাময়ী। তার কোলে চিতির ছেলে। আর লীলাময়ী তাকে ঝিনুকে করে আষ্টেপৃষ্ঠে দুধ গেলাচ্ছে।

চিতির মাথাটা ঘুরে উঠল। ধপ করে বসে পড়ল সে।

লীলাময়ীর গলা ডাঙসের মতো এসে কানের পর্দায় লাগল, কে ওখানে?

চিতি কোনোরকমে বলল, আমি।

তোমার পকেটে কত টাকা আছে?

চল্লিশ।

ওটা তোটনবাবুকে ফেরত দিয়ে এসো। আর ফিরে ও-বাড়িতে ভাত খাবে।

আর কিছু?

কাল ছোট বউ আসছে। সকালে বাড়ি থেকো।

চিতি তবু বসে রইল। কোথায় একটা গোলমাল হচ্ছে। আজ তো নেশা হয়নি। তবে হলটা কী? স্বপ্ন দেখছে? ভাবতে ভাবতেও সে উঠল। বাঁ কোলটা খালি-খালি লাগছিল এতক্ষণ। এখন লাগছে না।

যখন আধো-ঘুমের মধ্যে চলে গিয়েছিল তোটন তখন ঘটনাটা ঘটল। অপ্রস্তুতের একশেষ। স্বপ্ন দেখছিল, চিতির বাচ্চাটা দাওয়া থেকে পড়ে যাচ্ছে। চিৎকার করে হাত বাড়িয়েছিল তোটন। হাতটা গিয়ে পড়ল বাচ্চার তুলতুলে গায়ে। চেপে ধরল সে বাচ্চাটাকে।

তখনই চমকে ঘুমের চটকা ভাঙল তার। হাতখানা সন্ধ্যার গায়ে। টেনে নিতে যাচ্ছিল। সন্ধ্যা বাধা দিল না। তবে সন্ধ্যা এপাশ ফিরল। পাশবালিশটা সরিয়ে দিয়ে বলল, তুমি ভেবেছোটা কী?

কী ভাবব?

পাগলামি করলেই চলবে?

তার মানে?

মানে তুমিই জানো। আমি তোমাকে পাগল হতে দেবো না। তুমি ছাড়া আমার যে কিচ্ছুটি নেই।

সন্ধ্যা।

বাতি নিবিয়ে দিচ্ছি। অন্ধকারে আর আমার মুখ দেখতে পাবে না। বলে সন্ধ্যা কল ঘুরিয়ে বাতি নিবিয়ে দিল।

তারপর বলল, এসো।

সন্ধ্যা।

আমি তোমাকে পাগল হতে দেবো না। এসো।

অন্ধকারে ভেসে গেল জামাকাপড়। মুচকি হেসে অন্ধকারে এক দেবতা সেগুলো কুড়িয়ে বুকে নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। অপেক্ষা করতে লাগল পৃথিবী, অপেক্ষা করতে লাগল চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র।

অপেক্ষা করছিল চিতিও। বাইরের অন্ধকার দাওয়ায় হাতে চারখানা দশ টাকার নোট নিয়ে সে ভাবছিল তোটনবাবুকে ডাকা ঠিক হবে কিনা। তারপর ঘরের বেড়ার ফাঁক দিয়ে কতগুলো অদ্ভুত শব্দ শুনল সে। চেনা শব্দ। স্বামী-স্ত্রীর শব্দ। নাঃ, ডাকাটা ঠিক হবে না।

চিতি মণ্ডল ফের নেমে এল পথে। টাকা কাল ফেরত দিলেই হবে। কাল চিতি মণ্ডলেরও বউ আসবে।

## লুল্লুর কপাল

লুল্লুর দোষ হয়েছিল, ঘটিটা দেখতে পায়নি।

লুল্লু যখন চেতন মাস্টারের ঘরে ঢুকল তখন অবশ্য মাঝরাত। বাইরে মাঘমাসের ঝড়বৃষ্টি শীত নামাচ্ছে। ভিতরে চেতনমাস্টার আর তার বউ লেপমুড়ি দিয়ে ঘুমে ঘোর। কাজ সারবার পক্ষে একেবারে সোনায় বাঁধানো মওকা। খিড়কির দোর সকলেরই দুবলা থাকে। আহাম্মক গেরস্তরা দুটো পয়সা বেশি লাগবে ভয়ে কোনওদিন বাথরুমের জানলাটায় ভালো করে শিক বা গ্রিল লাগায় না। রান্নাঘরেও কিছু না কিছু রন্ধ্র থাকবেই। আর এসব থাকে বলেই এই ঘোর কলিতে লুল্লুর মতো লোকেরা খেয়ে পরে বেঁচে আছে। তোমার আছে, আমার নেই। তো তোমারটা যদি কিছু আমার ট্যাঁকে চলে আসে, উধারকা মাল যদি কিছু ইধার হয় তো ব্যস, সিজিল মিছিল হয়ে গেল। যদি বেশি চিল্লামিল্লি না করো, মাথা ঠান্ডা করে যদি ভাবো, তো দেখবে, দুনিয়ায় এইভাবেও ভুখখা আর মালদারের একটা সমঝোতা হতে পারে। ভগবান চেতনমাস্টারকে হাত উপুড় করে দিয়েছেন। মালক্ষ্মী একেবারে খলবল করে হেসে বেড়াচ্ছেন চারধারে। চেতন মাস্টার যখন মাস্টারি করত তখন তার হাঁড়ির হাল যা ছিল তা ভদ্রলোককে কহতব্য নয়। বউয়ের গঞ্জনায় সাধু হয়ে বেরিয়ে একদিন শহরের বাইরে গিয়ে গোঁ ধরে বসে রইল চেতন। একখানা মস্ত নিম গাছের তলায়। বসে থেকে থেকে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখল, তার চারপারে কে যেন ইটের পর ইট গেঁথে তুলছে। দমবন্ধ হয়ে আসার জোগাড়। আতঙ্কে ঘুম ভেঙে গেলে চেতন মাস্টার স্বপ্নটা নিয়ে খুব ভাবল। তার মাথায় সেই যে ইঁট ঢুকল তা আজও বেরোয়নি। এখন সে দু দুটো ইটখোলার মালিক। হু হু শব্দে পয়সা আসে। স্বপ্নান্য ওরকম একখানা নিদান যদি লুল্লুও পেত তাহলে সেও আজ গদির বিছানায় গ্যাঁট হয়ে লেপচাপা দিয়ে ঘুমোতে পারত। এই মাঘের শীতে যখন বাঘ পালায়, তখন তাকে নাকের জলে চোখের জলে হয়ে শীতে হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে পরের বাড়ির হুড়কো খুলে এত পেরাসনি পোহাতে হত না।

মাথার দিকে স্টিলের আলমারি। অন্ধকারেও দিব্যি দেখতে পাচ্ছে লুল্লু। রহিম ওস্তাদ পৈ-পৈ করে বলে দিয়েছে, আর কোথাও হাত দেওয়ার দরকার নেই। আসল মাল আলমারিতে আছে। পয়লা পাল্লাটা খুলতে গা ঘামাতে হবে না। তবে ভিতরে একটা জামাই-ঠকানো লকার আছে। সাফ হাতে কাজ করলে ওটাও জলের মতো কাজ।

তা বলতে নেই, লুল্লুর হাত খুব সাফ, মগজও পরিষ্কার। খারাপ শুধু কপালটা। শেষ অবদি কিছুতেই কাজটা গুছিয়ে উঠতে পারে না। রহিম ওস্তাদও বলে, তোর সব থেকেও যেন কী নেই। হতে হতেও তোর কেন যে হয় না।

লুল্লুও সে কথা ভাবে। ভেবে ভেবে কুলকিনারা পায় না।

আলমারির দিকে এগোতে গিয়ে তার মনে পড়ল, মাঠ গোসাঁইয়ের বাড়িতে সেবার একটা আঁতুড়ে বাচ্চা ট্যাঁ ট্যাঁ করে চেঁচাতে না লাগলে জমির বাবদ অগাম পাওয়া মাধবের চার হাজার টাকায় আজ সে কতই মজা লুটতে পারত। তারপর, সাতকড়ি যে কুকুর পুষেছে সেটাই বা কে জানত? মাসটাক আগে সাতকড়ির দোতলায় উঠে সে কী ফ্যাঁসাদ। লাফ মেরে পালাতে গিয়ে পা মচকে কেলেঙ্কারি। ভানু শা-এর দোকানে এই তো সেদিন লুল্লুর হাত গিয়ে পড়বি তো পড় ইঁদুর-ধরা কলে। কপালটা কি আর তার ভালো বলা যায়! চমৎকার পরিস্থিতি। বাইরে ঝড়জল। হাড়-কাঁপানো শীত। লেপের ওম-এর মধ্যে চেতন মাস্টার আর তার বউ। কে জানে, চেতন মাস্টার হয়তো এখন দুধের সর আর পাটালি গুড় দিয়ে পাঁউরুটি খাওয়ার স্বপ্ন দেখছে। আর তার বউ স্বপ্নে বেয়ানকে নিজের গয়নার গল্প বলছে। কারোই এখানে জাগার কথা নয়। চেতন মাস্টারের নাক ভালোই ডাকে। তার বউয়ের শ্বাসটাও বেশ গাঢ়।

ভগবান কি তবে আজ লুল্লুর কপাল থেকে পাথরখানা টেনে তুললেন? মালক্ষ্মী কি তবে লুল্লুর বাড়ি যাওয়ার জন্য পা-তোড়া বেঁধে তৈরি হচ্ছেন? সিদ্ধিদাতা গণেশবাবার শুঁড় কি একটু সুরসুর করতে লেগেছে?

'জয় মা, জয় বাবা সিদ্ধিনাথ, জয় মাকালী' বলে লুল্লু এক পা এগোলো। দু পা। তারপরই ঘটাং করে একটা শব্দ। তারপর ছলাৎ আর কলকল।

লুল্লু খুব অবাক হয়ে দেখল একটা ঘটি শুধু উল্টেই পড়েনি, শুধু জলই ছড়ায়নি, হাজরামজাদা ঘটিটা কাত হয়ে পড়ে শুড়শুড় করে দিব্যি গড়িয়ে বেড়াচ্ছে মেঝেয়।

কপালে থাকলে এই ঘটনাতেও গেরস্তর ঘুম ভাঙে না। সেবার ঘণ্টুর হাত লেগে কাচের গেলাস পড়ে ভেঙে খান খান হল, গেরস্ত লক্ষ্মী ছেলের মতো তার পরেও ঘুমোলো। গদাধর গামলা সমেত আছাড় খেয়েছিল রান্নাঘরে, তবু ননীগোপালবাবুর বাড়িশুদ্ধ লোকের কারও ঘুম কেন ভাঙল না? আর যদুর কাণ্ড তো আরও সরেস। সেবার পরেশনাথের বাড়িতে ঢুকে সবে কাজে হাত দিয়েছে, এমন সময় বাড়ি কাঁপিয়ে ঘড়ির অ্যালার্ম বেজে উঠল। পরেশনাথের সেজো ছেলে কানু রাত তিনটের ট্রেন ধরবে বলে অ্যালার্ম দিয়ে রেখেছিল। কিন্তু কপাল এমনই ভালো যদুর যে, সেই অ্যালার্মের শব্দে না কানু না আর কেউ চোখের পাতাটিও কাঁপাল। বরং পাশ ফিরে আরও আয়েস করে পাশবালিশ আঁকড়ে ভালো করে ঘুমোতে লাগল। আর যদু হাসতে হাসতে কাজ হাসিল করে বেরিয়ে এল।

লুল্লুর কপাল তো আর অন্য সকলের মতো নয়। হারামজাদা ঘটি কি শুধু গড়াল? গড়িয়ে গড়িয়ে নিব্বংশের পো গিয়ে খাটের তলায় একটা লোহার তোরঙ্গে ঘটাং করে লেগে তবে থামল।

ততক্ষণে যা হওয়ার হয়ে গেছে।

আঁতকে বিছানায় উঠে বসল চেতন। তারপর 'আঁ আঁ' করে তারস্বরে চেঁচাতে লাগল। আর তার বউ একখানা জোরালো টর্চ ফটাস করে জ্বেলে চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, কে রে? কী হয়েছে? ওগো...

লুল্লু চোখ বুজে ফেলল নিজের ওপর লজ্জায় আর ঘেন্নায়।

ভেবেছিল, ইহজন্মে চোখ আর খুলবেই না। চোখ বুজেই পিছু হটে চৌকাঠ ডিঙিয়ে দরদালানে পড়ল লুল্লু। তারপর যে পথে ঢুকেছিল সেই পথেই বেরোবার উদ্যোগ করেছিল। পালানোটা সোজা। এই ঝড়জলের রাতে কেউ পিছু নেবে না।

কিন্তু ঘর থেকে গোঁ গোঁ শব্দ আসছিল একটা। আর চেতন মাস্টারের বউ 'ওগো আমার কী হবে! কর্তা এমন করছে কেন? ওরে তোরা...' বলতে বলতে একেবারে তীরের মতো বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

বস্তাটা দিয়ে লুল্লু ফের নিজের গা ঢেকে তখন বেরোনোর জন্য পা বাড়িয়েছে। কিন্তু কপাল খারাপ হলে যা হয়। চেতন মাস্টারের বউ ধেয়ে এসে বস্তার কোনাটা চেপে ধরে বলল, এই এই ছেলেটা! শিগগির আয়! কর্তা কেমন করছে। আয় তো একটু বাবা!

লুল্লু এমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল যে আর বলার নয়। এমন অবস্থায় তো সে আর কখনও পড়েনি।

তা বলে লুল্লু যে পালাতে পারত না তা নয়। বস্তার কোনাটা চেতন মাস্টারের বউয়ের হাত থেকে ঝটকা মেরে ছাড়িয়ে নিতে পারত। চাইকি বস্তাটা গা থেকে ফেলে দিলেও হত। কিন্তু সেই সময় তার মনে হল, চেতন মাস্টার যে কেমন করছে তার নিমিত্তের ভাগী তো সে নিজেই। এখন যদি চেতন মাস্টার অক্কা পায় তবে সারা জীবন বিবেকটা তাকে ছারপোকার মতো অহরহ দংশাবে।

আয় আয়। বলে চেতন মাস্টারের বউ টানছে।

লুল্লু বিরক্ত হয়ে বলল, টানাটানি করবেন না। যাচ্ছি।

গিয়ে দেখল, অবস্থা সত্যিই গুরুচরণ। চেতন মাস্টার যাকে বলে খাবি খাচ্ছে। চোখ দুটো বড় বড়, হাঁ করে শ্বাস টানছে, দু হাতে চেপে ধরে আছে বাঁ দিকের পাঁজর। অবস্থা দেখে লুল্লুর হাত পা হিম হয়ে গেল। খুনটা সে নিজের হাতে করেনি বটে, ভালো করে বিচার করলে এটা হয়তো খুনও নয়, তবে ভগবানের খাতায় কী লেখা হবে তাতো বোঝা যাচ্ছে না।

সেখানে হয়তো লুল্লুর নামের পাশে আজকের তারিখে একটা খুন জমা পড়ে যাবে।

ওগো, কী হল গো...বলে মাস্টারকে দুহাতে ধরে ঝাঁকাচ্ছিল তার বউ আর চেঁচিয়ে কাঁদছিল।

লুল্লু সভয়ে বলল, চেঁচাবেন না। লোকজন এসে পড়বে।

চেতন মাস্টারের হবু বিধবা তার দিকে অ্যাই বড় বড় চোখে চেয়ে বলল, কে আসবে রে ড্যাকরা? বাড়িতে আছেটা কে? দুই ছেলে গেছে মাছ ধরতে মুরারীপুর। মেয়ে গিয়ে বসে আছে তার মামার বাড়ি। চাকর গেছে বাবার অসুখ গেয়ে। আমার আর আছেটা কে এই বিপদে?

হক কথা। জিগ্যেস করাটাই ভুল। লুল্লুও জানে বাড়িতে কেউ নেই। খবর নিয়েই আজ হানা দিয়েছে কিনা।

চেতন মাস্টারকে খাবি খেতে দেখে লুল্লুর চোখ আপনা থেকেই ফের বুজে এল। যত নষ্টের গোড়া ওই ঘটিটাকে এখন পায়ের কাছে পেলে খুব একচোট লাথালাথি করে নিত সে। চোখ বুজলেই সে ফের দেখতে পেল, ভগবানের খাতাটা তার চোখের সামনে খোলা। একটা সাদা পাতায় পরিষ্কার গোটা গোটা অক্ষরে লেখা : লুল্লু—একটা খুন।

নাঃ, চেতন মাস্টারকে মরতে দেওয়া চলে না। সারাটা জীবন একটা ছারপোকা কুটকুট করে কামড়ে খাবে।

নিশাপতি কবরেজের কাছে কিছুদিন সাকরেদি করেছিল লুল্লু। তবে তার হয়নি। কোনও কিছুই হয়নি লুল্লুর। লেখাপড়া না, ব্যবসা না, কবরেজি না। এমন কি সব ছেড়েছুড়ে এই যে রহিম ওস্তাদের দলে ভিড়েছে তাতেও তার সুবিধে হচ্ছে না।

তবে নিশাপতি একবার বলাইবাবুর একটা মোক্ষম চিকিৎসা করেছিলেন। লুল্লুর নিজের চোখে দেখা। বলাইবাবুর এখন তখন অবস্থা। বুকের মধ্যে কলজে ডানা ঝাপটাচ্ছে। নিশাপতি বলাইবাবুর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে চোখের ডিম দুটো দু'হাতের বুড়ো আঙুলে আলতো টিপে ধরেছিলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বলাইবাবুর একটু আরাম হল।

ঘটনাটা মনে পড়তেই লুল্লু তাড়াতাড়ি বিছানায় উঠে বসে চেতন মাস্টারের হয় হয় বিধবাকে বলল, একটু সরুন তো।

চেতনের বউ তড়িঘড়ি সরে বসল। মানুষের আশার তো শেষ নেই।

যতদূর ভঙ্গিটা মনে পড়ল ততদূর, নিশাপতি কবিরাজের নকল করে হাঁটু গেড়ে বসে লুল্লু দুই বুড়ো আঙুলে চেতনের দুই চোখের ডিম চেপে ধরল। আর ভগবানের যত নাম তার মনে পড়ল সব বিড় বিড় করে আউড়ে যেতে লাগল।

আর আশ্চর্যের ওপর আশ্চর্য, মিনিট দুই যেতে না যেতেই চেতন মাস্টারের গোঙানি থামল। শ্বাসটা সহজ হয়ে এল। বুক থেকে হাত দুটোও নামল। চেতন মাস্টার অস্ফুট স্বরে বলল, উঃ বাবা।

মন্দের ভালো। মুখে বোল ফুটেছে।

চেতনের বউ এতক্ষণ হাঁ করে দেখছিল। এবার বলল, এখন কী?

লুল্লু খুব বিচক্ষণ কবিরাজের মতোই মাথা নেড়ে বলল, একটু সেঁক তাপ দিতে হবে। আর ডাক্তার ডাকলে ভালো হয়।

দিবি বাবা অক্ষয় ডাক্তারকে একটু ডেকে? দুটো ছাতা নিয়ে যা। খবর পেলেই আসবে। যা বাবা লক্ষ্মীসোনা আমার। আমি ততক্ষণে মালসায় একটু আগুন করে আনি।

তা কপাল খারাপ থাকলে কত কী করতে হয়। লুল্লুকে গিয়ে অক্ষয় ডাক্তারকে খবর দিয়ে আনতে হল। তারপর ফের ছুটতে হল ওষুধের দোকানে। পরাণ ঘোষ চেনা লোক বলে রাতবিরেতে ডিসপেনসারি খুলে ওষুধ দিল। চেতনও বেঁচে গেল দিব্যি।

সকালবেলায় লুল্লু যখন বাড়ি ফিরল তখন নিজের মুখ দেখতে তার ইচ্ছে করছে না। ছিঃ ছিঃ। তবে একটা ভরসার কথা, ভগবানের খাতায় তার নামের পাশে যে খুনটা প্রায় লেখা হয়ে গিয়েছিল সেটায় ঢেড়া পড়ে গেছে। খুব বাঁচোয়া।

সদর দিয়ে বাড়িতে ঢোকায় মুশকিল আছে।

সকালের দিকটায় তার বাপ বারান্দায় বসে পাটের দড়ি পাকায় আর বিড়বিড় করে সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করে। লোকটার গলার মধ্যে গীতা, ভাগবৎ সব সেঁধিয়ে বসে আছে। নামকরা পুরুত ছিল। বড় দুটো ছেলে ভালো কাজ বাজ করে। ছোটো লুল্লুই হচ্ছে বংশের কুড়াল। তাই বাপ আজকাল লুল্লুর মুখ দেখে না। কখনও দেখে ফেললে স্নান করে শুদ্ধ হয়। লুল্লুর গমনাগমন তাই খিড়কি দিয়ে।

তার মুখখানা যে কেউই দেখতে চায় না তা লুল্লু জানে। আজও এ সংসারে সে একটি পয়সাও উপুড়হস্ত করেনি। তার ওপর বদনাম তো আর একটা নয়। তবু এসে হাজির হলে গর্ভধারিণী মা তো আর ফেলতে পারবে না। বাড়ির বেড়ালটাকে কুকুরটাকেও তো এঁটোকাঁটা দিতে হয়। তাকেও দেয়।

চারখানা গরম রুটি আর কুমড়োর ছেঁচকি লঙ্কা ঘষে যখন খুব তারিয়ে খাচ্ছিল সে তখন মা একবার আলগোছে জিগ্যেস করল, হ্যাঁ রে, রাতবিরেতে যে বাড়ি ফিরিস-টিরিস না, চুরি-টুরি করতে যাস না তো?

কী যে বলো মা।

তোর বন্ধুগুলো তো সব ছোটলোক।

তা বটে। তবে কিনা—

তাড়াতাড়ি খেয়ে বেরিয়ে পড়। আজ আবার বাড়িতে কুটুম আসবে। তোর থাকার দরকার নেই।

যাচ্ছি যাচ্ছি। পুকুরে দুটো ডুব দিয়ে যাই। একটু তেল দেবে?

স্নান করে বেশ হালকা লাগল লুল্লুর।

ধোয়া জামাকাপড় পরে বেরোনোর সময় একটা কথা মনে হল লুল্লুর। চেতন মাস্টারের বউ তাকে চিনে রেখেছে। কথাটা চট করে এ বাড়িতে হেঁটে চলে আসবে যে, লুল্লু কাল রাতে চেতনের বাড়িতে চুরি করতে ঢুকেছিল। আর শুধু তা-ই নয়, চেতন মাস্টারকে প্রায় যমের পাছ দুয়ার ঘুরিয়ে এনেছে সে। এ বাড়িতে এখনও লুল্লুর জন্য খিড়কির দোরটা খোলা থাকে। সেটাও তাহলে ঠাস করে বন্ধ হয়ে যাবে নাকের ওপর।

সমস্যাটার কথা রহিম ওস্তাদকে না জানালেই নয়।

সকালের দিকটায় রহিম ওস্তাদের মেজাজটা খুশ থাকে। খুদাতালার দুনিয়াটা যে কত ভালো তা এই ফজরের নমাজের পরই রহিমের চোখের সামনে ফুটে ওঠে। সত্য বটে, দুনিয়া পাপে ভরে গেছে। দুনিয়ায় খুন খারাপি আছে, চুরি বাটপাড়ি আছে, মিছে কথা বিশ্বাসঘাতকতা আছে, বাঁদরামি ত্যাঁদড়ামি আছে, জুয়া সাট্টা মেয়েমানুষের কারবার নেশাভাঙ ভেজাল কী নেই! তবু খুদাতালার ওই ফিরোজা আশমান আর তার একধারে অলৌকিক সূর্যোদয়, পাখি পাখালির ডাক এই বেহানবেলায় রহিমকে যে কোথায় নিয়ে যায় তার ঠিকানা নেই। উঠোনে একটা চারপাইতে কম্বলমুড়ি দিয়ে বসে এই সময়টায় রহিম গেলাসে গেলাসে চা খায় এক হাতে। অন্য হাতে একটি বাটি থেকে মুঠো মুঠো দানা তুলে সামনে ছড়িয়ে দেয় আর তার একুশটা

মোরগ ও মুর্গী মহানন্দে ঠুকরে ঠুকরে খায়। রহিমের তিনটে বউয়ের একজন ঘর ঝাড়ে, একজন নাস্তা বানায়, একজন ছেলেপুলে সামাল দেয়। রহিমের আঠারোটা ছেলেপুলে কেউ পড়ার বই পড়ে, কেউ খেলে, কেউ কাঁদে। রহিমের কোনও দিকে দৃষ্টি নেই, মন নেই, সারা সকাল বসে বসে সে সংসারের সীমানার বাইরে খুদাতালার দুনিয়াদারির কথা ভাবে আর মনটা ভারি সন্ত হয়ে যায় তার।

মুর্গীকে দানা, গরুকে জাবনা, বেড়াল বা কুকুরকে নাস্তার অবশেষ খাওয়াতে বড় ভালোবাসে রহিম।

তার চেহারাখানা ছিপছিপে, জোরালো, তার চোখদুটো সাঙ্ঘাতিক তীক্ষ্ন। দাড়িতে মেহেদী, চোখে সুর্মা, কানে আতরের তুলো। আর মুখে এক চমৎকার হাসি সর্বদাই লেগে থাকে তার। ফজর যে সংসার-চিন্তার সময় নয়, ফজরে যে কোনও পাপ-চিন্তা করতে নেই তা রহিম অন্তরে অন্তরে টের পায়। কিন্তু তারপর যখন বেলা হতে থাকে, যখন মানুষ পেটের চিন্তা করতে শুরু করে, দিনটা যখন ঘুলিয়ে ওঠে, তখন মানুষকে কাজে নামতেই হয়। খুদাতালার আশমান থেকে ঝম করে নেমে দাঁড়াতে হয় শক্ত মাটিতে, প্রতিপক্ষময় দুনিয়ায়, একটা বাঘা হাঁক ছাড়ল রহিম, হল রে ফতিমা?

হচ্ছে জী!

হোক, তাড়া নেই রহিমের। খিদেটা চড়ে গেলেই মুশকিল। খিদেটা যখনই পায়, যখনই নাস্তাটা চাপান পড়ে তখনই রহিম খুদার হাত ছেড়ে মাটিতে নামে। ততক্ষণ এই এক স্বর্গীয় সুসময় সে সমস্ত দেহমন দিয়ে উপভোগ করে। এ সময় কেউ তাকে ঘাঁটায় না।

বাগানের বাঁশের বেড়ার ওপাশে বাসক ঝোপটার আড়ালে দাঁড়িয়ে একটা লোক সাবধানে উঁকি ঝুঁকি মারছে, ভিতরে আসতে সাহস পাচ্ছে না। লোকটা কে তা রহিম ওস্তাদ জানে। তার দলের সবচেয়ে অপদার্থ, সবচেয়ে বেওকুফ লুল্লু। কাজ বিলা করে এসেছে নিশ্চয়, দেখেও না দেখার ভান করল রহিম। আল্লার দুনিয়াটা যতক্ষণ ভালো লাগে লাগুক। তারপর পাপের দুনিয়ায় তো নামতেই হবে, ঘাঁটতে হবে নরকের পাঁক।

হল রে ফতিমা?

হল জী।

ফতিমার হাতটি বড় চমৎকার। রান্নাটি করে যেন বাঁধিয়ে রাখার মতো। আর খাবারটি যে বেড়ে দেয় তাও ভারি পরিষ্কার হাতে। ময়দার পরোটা, ঝাল গরগরে একটা চচ্চড়ি আর বাদাম কিসমিস দেওয়া হালুয়া।

খেয়ে বদনার জলে হাত ধুয়ে গামছায় মুখ পুঁছে রহিম পাপে ভরা দুনিয়াটার দিকে চেয়ে তার বাঘা গলায় হাঁক দিল, আয় রে!

মুখে অপরাধী হাসি, কোলকুঁজো হয়ে অপদার্থটা সামনে এসে হেঁ হেঁ করতে লাগল। রহিমের ইচ্ছে হল একটা থাবড়া কষায়। কিন্তু জফরটা এখনও পুরো কাটেনি বলে ক্ষমা করে দিল।

কি রে গেঁড়ে, এবারও হল না তো!

কথা আছে ওস্তাদ। সবটা আগে শোনো।

মেলা বকবি তো থাবড়া খাবি। দু-চার কথায় বল।

লুল্লু শেষে বলল, একটা ঘটি—বুঝলে ওস্তাদ, একটা ঘটিই আমার ঘাট হল। ঘটিটা যদি না থাকত—

রহিম ঘটির কথায় কাত হল না। গম্ভীর চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে বলল, তুই বাঁউনের ছেলে না?

ব্রাহ্মণ তো কী? এইবার দেখবে—

চোপ!

লুল্লু একটু চমকে উঠে চুপ মেরে গেল।

রহিম মাথা নেড়ে বলল, ও তোর ধাতে নেই। হবে না।

লুল্লু মলিন মুখ করে মোড়ায় বসে রইল। রহিম পাপে ভরা দুনিয়াটার কথা ভাবতে ভাবতে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, যা, বাড়ি যা। তোর হবে না।

আমার কপালটাই খারাপ ওস্তাদ।

রহিম একটা হুংকার ছেড়ে বলল, খুদাতালার দুনিয়ায় কোনটা খারাপ কোনটা ভালো কে বলতে পারে রে বেওকুফ? তাঁর ইচ্ছে ছাড়া গাছের পাতাটাও নড়ে না। সবই তাঁর মেহেরবানী।

লুল্লু মলিন মুখ করে চলে গেল।

বেলা বেড়েছে। রোদ চড়া হয়েছে। সংসার এসে রহিমের হাত ধরে টানাটানি করছে। রহিম গা থেকে কম্বল নামিয়ে খাড়া হল।

জমিলা! এই জামিলা!

তার দু নম্বর বিবি জামিলা দৌড়ে এল।

রহিম তার দিকে চেয়ে বলল, আমি ফজরের নমাজ পড়েছি?

জী।

মুর্গীকে দানা দিয়েছি?

জী।

গাইকে জাবনা খাইয়েছি?

জী।

কাউকে তুঙ্গ করেছি?

জী না।

আমাকে পাপী বলে মনে হচ্ছে?

জী না।

আমি বিবি বাচ্চা সব ঠিক মতো দেখভাল করি তো?

জী।

আমি লোকটা কেমন?

ভালো জী।

যা মন্দ কাজ করি তা কিসের জন্য?

জী পেটের জন্য।

বহোৎ আচ্ছা, খুদা মেহেরবান।

খুদা মেহেরবান।

রহিম ওস্তাদ কাজে নামল। এখনই তার দলের লোকেরা রাতের রোজগারের ভাগা ওস্তাদের নজরানা নিয়ে আসতে শুরু করবে। সময় নেই।

তবে প্রতি দিন শুতে যাওয়ার সময় রাতে, আর কাজ শুরু করার সময় সকালবেলায় দু নম্বর বিবির কাছে সে সব পাপ ও পুণ্যের কথা, খুদার কথা বলে নেয়।

বারান্দা পেরোনোর সময় রহিমের চোখে পড়ল, জল ভরা একখানা ঘটি, ঘটিটা দেখে লুল্লুর কথা মনে পড়ে গেল বলে রহিম খুব হোঃ হোঃ করে হাসল। বুদ্ধুটা ভাবে, ঘটিটাই যত নষ্টের গোড়া ছিল। আল্লা কি অত বোকা রে। যেখানে যেটা রাখার সেখানেই সেটা রাখেন। কেউ দেখতে পায়, কেউ পায় না।

হাসতে হাসতে রহিম ঘটিটাকে পেরিয়ে গেল।

লুল্লুর মায়ের এক গাল মাছি। গালে হাত দিয়ে বলে উঠল, বল কী গো মাস্টারবউ, লুল্লু?

হ্যাঁ গো, লুল্লুই।

ওম্মা, কোথায় যাবো? সেটা কি মানুষ? কর্তা যে তার মুখদর্শন করেন না।

তা তোমরা তার মুখের দিকে না তাকাবে তো তাকিও না, আমি কিন্তু তার মুখে ভগবানকে দেখেছি।

বোলো না গো মাস্টারবউ, ভগবান পাপ দেবে। পেটে ধরেছি বলে ফেলতে পারি না বটে, কিন্তু সে যে আমার কী গর্ভযন্ত্রণা।

তুমি মা হয়ে চিনতে পারো না, আশ্চর্য! আমি যে স্পষ্ট দেখলুম? কর্তার প্রাণটা ভোমরার মতো দেহ ছেড়ে বেরিয়ে উড়ে যাচ্ছে। আর তোমার ছেলে সেই প্রাণটাকে ধরে আবার আমার কর্তার শরীরে ঢুকিয়ে দিল।

লুল্লুর মা ভাবতে বসল। মায়ের প্রাণ, ছেলের দিকে টেনেই ভাবতে লাগল, ভাবতে ভাবতে মনে হল, লুল্লু বোধহয় ততটাই খারাপ নয়, যতটা ওর বাপ বলে বেড়ায়। নেশা ভাঙ নেই, তর্জন গর্জন নেই। পছন্দ অপছন্দ নেই, সর্বদা হাসিমুখ! মনটাও ভারি নরম।

তবু বলি মাস্টারবউ, আবার ভেবে দেখ। তোমরা স্বজাতি স্বঘর, লুল্লুকে জামাই করবে সে তো হতেই পারে। কিন্তু আমার যে এ স্বপ্নেও বিশ্বেস হয় না।

আমি ঠিক করে ফেলেছি দিদি। আর কথা নয়। ছেলেটি আমায় দাও, আমি ঠিক মানুষ করে দেবো। আমি জানি ওর মধ্যে ভগবান আছে।

লুল্লুর মায়েরও কথাটা অবিশ্বাস হল না। মাথা নেড়ে বলল, কী জানো কথাটা আমারও মনে হয়। লুল্লুর মধ্যে কী যেন একটা আছে। চুরিটুরি তো কেষ্টঠাকুরও কত করেছেন, তা বলে কি তিনি ভগবান নন?

তবে?

# বিচ্ছেদ

দিন দিন বিজয়ের কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে যাচ্ছে, গাল বসে যাচ্ছে, চোখ ঢুকে যাচ্ছে গর্তে, মেজাজ হয়ে উঠছে তিরিক্ষি, তার ওপর অন্যমনস্ক। এ সবের অবশ্য গূঢ় কারণ আছে। প্রতিদিন বিজয় অপেক্ষা করছে সেই ঘটনার। ট্যাঁপার হাতে চন্দনার খুন হওয়ার। কিন্তু বছর ঘুরে গেল, ধর্মের কল বাতাসে নড়ল না। কর্মফল ফলল না।

বিজয় অনেককাল আগেই এ পাড়া ছেড়ে চলে যেতে পারত। যাওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু যায়নি শুধু এ কারণেই যে, ঘটনাটা ঘটলে সে চট করে খবরটা পাবে। চন্দনাকে খুন তার নিজের হাতেই করা হয়তো উচিত ছিল। কিন্তু খুন-জখমের ধাত নিয়ে তো সবাই জন্মায় না। চন্দনা বুক পেতে দাঁড়ালে এবং বিজয়ের হাতে ছোরা বা রিভলভার থাকলেও ঘটনাটা ঘটিয়ে তুলতে পারবেনা বিজয়। কোন ছেলেবেলায় একবার গুলতিতে পাখি মেরেছিল বলে আজও তার কষ্ট হয়।

আইনসঙ্গতভাবে ডিভোর্স হয়নি বলে চন্দনা আজও বিজয়ের বউ। যদি বিজয় আজ আচমকা মারা যায় তাহলে চন্দনা তার বিষয়-সম্পত্তি বলতে যা আছে তা তো পাবেই, এমন কি চাকরি পর্যন্ত পেয়ে যাবে। ডিভোর্সের মামলা বিজয় করেনি কেলেংকারির ভয়ে। যা কেলেংকারি হয়ে গেছে তাও কিছু কম নয়। আরও হলে ক্ষতি কী? কিন্তু বিজয়ের জীবনদর্শন হল, তোমার হাতে যা নেই তা তুমি ঠেকাতে না পারো, যা আছে তা তো ঠেকাতে পারবে। চন্দনার এই ট্যাঁপার সঙ্গে পালিয়ে যাওয়াটা ঠেকানোর সাধ্য ছিল না বিজয়ের। কিন্তু ঢিঢিক্কার সে খানিকটা ঠেকিয়ে রেখেছে। তবে কানাঘুষোয় ঘটনাটা ছড়িয়ে যাচ্ছে ক্রমে।

ট্যাঁপার নামে অন্তত এক ডজন খুনের মামলা আছে। না, মামলা অবশ্য কেউ করেনি বা পুলিশেও কখনও ধরেনি তাকে। ট্যাঁপার কোমরের জোর সাংঘাতিক। তার পেছনে বড় বড় নেতা এবং পুরো দলের মদত আছে। ট্যাঁপার টাকার জোরও ইদানীং কম নয়। সে গোটা দশেক লরি এবং ততোধিক ট্যাক্সির মালিক। ঠিকাদারি থেকে প্রচণ্ড আয়। তিনতলা একখানা বাড়ি সে দখল করে আছে।

চন্দনা পালিয়ে গেছে, এ কথাটা ঠিক নয়। পালানো মানে আত্মগোপন করা। চন্দনা বা ট্যাঁপা তা করেনি। প্রায় প্রকাশ্যেই বিজয়ের ঘর ছেড়ে গিয়ে ট্যাঁপার বাড়িতে উঠেছে চন্দনা। বুক ফুলিয়ে এবং জানান দিয়ে দিয়ে। তখনও বিয়ের পর দেড় বছরও হয়নি। আনকোরা বউ নিয়ে সবে নতুন পাড়ায় নতুন বাসায় এসে সংসার পেতেছে বিজয়। ভালো করে চন্দনাকে আবিষ্কারই করা হয়নি তখনও, নিত্যনতুন দিক খুলে যাচ্ছে দুজনের মধ্যে। তৃতীয় জনের ছায়াপাত ঘটবার অবকাশই ছিল না। বিজয় আজও ভেবে পায় না, তাদের ওই নিরন্ধ্র ভালোবাসার মধ্যে যে কেউ কালসাপ হয়ে ঢুকতে পারে এটা সম্ভব ছিল বলে আজও বিশ্বাস হয় না বিজয়ের, কিন্তু রন্ধ্র ছিল। নইলে ট্যাঁপা ঢুকল কী করে?

নিজের সঙ্গে ট্যাঁপাকে মিলিয়ে দেখেছে বিজয়। ট্যাঁপা অবশ্যই এক ধরনের সুপুরুষ। বাঙালিদের যেটা একান্ত অভাব, ট্যাঁপার মধ্যে তা আছে। টান টান মেদহীন একটু রুক্ষ ধরনের জোরালো চেহারা। রং একেবারে তপ্তকাঞ্চনবর্ণ। নীলচে চোখ। মস্তান হলেও স্বভাবে ভারি বিনয়ী এবং গম্ভীর। ফচকে নয়। উপরন্তু সে পাড়ায় কখনও কোনও গোলমাল করেনি। তার সম্পর্কে মহিলাঘটিত কোনও দুর্নাম নেই।

অন্যদিকে, চন্দনা আরও অদ্ভুত। সুন্দরী তাকে বলা যায় না। দারুণ মেধাবিনী ছাত্রী ছিল, এম এস-সি-তে ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে রিসার্চ করছিল। একটু অগোছালো পোশাক পরত। স্বভাবটি ছিল ঠান্ডা। কথা কম। চেহারা একটু ভারীর দিকে, তার মতো সুশীলা মেয়ে যে এরকম কাণ্ড করতে পারে সেটাই অবিশ্বাস্য।

ট্যাঁপার সঙ্গে তাদের পরিচয় হয়েছিল এ পাড়ায় আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। মধ্য কলকাতার এই নিম্নবিত্তদের পাড়ায় বিজয় এবং চন্দনা প্রায় আকাশের চাঁদ। দুজনেই উচ্চশিক্ষিত এবং বিজয় সরকারি চাকরি করে। একটি রিসার্চ সেন্টারের সে মেজো কর্তা। তার সামনে কুসুমাস্তীর্ণ ভবিষ্যৎ।

চন্দনা কবে ট্যাঁপার প্রেমে পড়ল এবং কীভাবে তা বিজয় জানে না। তিন দিনের ট্যুরে রাঁচি যেতে হয়েছিল তাকে। ফিরল রাত বারোটায়, তখন তার শোওয়ার ঘরে ট্যাঁপা এবং চন্দনা।

ব্যাপারটা বুঝতে এবং বিশ্বাস করতে অনেকক্ষণ সময় লেগেছিল তার।

ট্যাঁপা শুধু বলল, যা হওয়ার তা হয়ে গেছে, এ নিয়ে হাঙ্গামা করবেন না।

বিজয় কথা খুঁজে পায়নি। আসলে কোনও মনুষ্যভাষা তার মনেও পড়ছিল না। ট্যাঁপা বেরিয়ে গেল এবং চন্দনা গিয়ে পাশের ঘরে দরজা বন্ধ করল।

পরদিন সকালে চন্দনার সঙ্গে দেখা হল ফের।

চন্দনা বেশ স্তিমিত গলায় বলল, এটা ঠেকানো যাচ্ছে না। তুমি এটা মেনে নাও।

কোনটা?

ওর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা।

তুমি বেরিয়ে যাও, এ বাড়ি থেকে।

যাচ্ছি, কিন্তু চেঁচিও না।

চন্দনা বেরিয়ে গেল। এত সহজে এবং অনায়াসে একজনকে ছেড়ে যে আর একজনের সঙ্গে গিয়ে জোটা যায়, এত সহজেই যে সংসার বদলানো সম্ভব তা এ ঘটনা চোখে না দেখলে বিজয়ের বিশ্বাস হত না।

এ কথা ঠিক যে, প্রথম কয়েকটা দিন রাগে, আক্রোশে, অপমানে, পরাজয়ের গ্লানিতে পাগল হয়ে গিয়েছিল বিজয়। খাওয়া গেল, ঘুম গেল, লেখাপড়া গেল, চাকরিও লাটে উঠবার জোগাড়। সাত দিন সে ঘরে বসে শুধু ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করল।

সাতদিন পর একদিন ট্যাঁপা এল। তখন রাত দশটা কি সাড়ে দশটা। ট্যাঁপার মুখ গম্ভীর। তাকে দেখেই লাফিয়ে টুঁপি টিপে ধরবার একটা ইচ্ছে হয়েছিল বিজয়ের, কিন্তু এ ধরনের শরীরী কাজকর্ম করার অভ্যাস বিজয়ের কোনওকালে নেই। সে জীবনে কখনও মারপিট করেনি, কখনও মারধর খায়নি। সে শুধু লেখাপড়া করেছে আর ভালো রেজাল্ট করেছে। এমন কি খেলাধুলো অবধি সে কখনও করেনি।

ট্যাঁপা অতিশয় ভদ্র ও বিনয়ী গলায় বলল, আমার দোষ বলে ভাববেন না। আমি চন্দনাকে ভাগাইনি। সে নিজেই আমাকে ডেকে এনেছিল।

কিন্তু কেন?

এ কথাটার জবাব দেবো না। শুধু বলল, মেনে নিন।

কিন্তু আমার মান, সম্মান? আমার আত্মীয়স্বজন! বন্ধু-বান্ধব!

ট্যাঁপা চুপ করে থেকে সত্যিকারের দুঃখিত গলায় বলল, এ সবই আমি ওকে বুঝিয়েছিলাম। যদি আমার সম্পর্কে একটু খোঁজ নেন তো দেখবেন, আমার কোনও দিন মেয়েছেলে নিয়ে বদনাম নেই। কারও বউকে ভাগিয়ে নেব সেরকম রুচিও আমার নেই। কিন্তু চন্দনা আমাকে একরকম জোরজবরদস্তি করে এরকম করল। আমার কিছু করার ছিল না। যদি চান তাহলে ওর সঙ্গে দেখাও করতে পারেন।

না দেখা করে লাভ নেই। আমি ওকে ফিরিয়ে নেব না।

ট্যাঁপা চলে গেল। বিজয় আরও ভাবল, অনেক কিছু ভাবল, কোথাও পৌঁছলো না।

সয়ে গেল কি তারপর? ঠিক সয়েও গেল না। মনটা সবসময় ক্ষতবিক্ষত হয়, রক্তক্ষরণ হতে থাকে। ওই দগদগে মানসিক ক্ষতই শুকিয়ে ফেলল শরীরটাকে। কেমন যেন পাগল-পাগল হয়ে যেতে লাগল মাথা। মাঝে মাঝেই তার মনে হতে লাগল, ট্যাঁপা নিশ্চয়ই একদিন চন্দনাকে খুন করবে। ভেবে ভারি একটা আশা হল তার।

এই খুনের চিন্তাটা কী করে এল কে জানে! কিন্তু এল। কাগজ খুললেই আজকাল বউ খুনের খবর পাওয়া যায়, বোধ হয় সেই থেকেই হয়েছে। কে জানে কী!

নানা চিন্তায় এখন ভারি চুপসে অকালে বুড়িয়ে যাচ্ছে বিজয়। কিন্তু সে এ পাড়া ছাড়তে পারে না। ডির্ভোস করতে পারে না।

আজ সকালে উঠে অন্য সব সকালের মতো শুষ্ক শরীরে আধশোয়া হয়ে জানলা দিয়ে সামনের বদ্ধ গলিটার দিকে চেয়েছিল বিজয়। উঠতে ইচ্ছে হয় না, কিছু করতে ইচ্ছে হয় না। ভিতরে ধিকিধিকি একটা দাহ। সে পুড়ে যাচ্ছে। ছাই হয়ে যাচ্ছে তার জীবন।

আজকাল এক মহিলা তার রান্নাবান্না করে ঘরদোর সেরে যায়। মতির মা। তাকে গলি দিয়ে আসতে দেখে বিজয় উঠল, দরজা খুলে দিল।

মতির মা বুড়োসুড়ো মানুষ। কম কথা বলে। নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে ঝাঁটাগাছ নিয়ে কাজে লেগে গেল। ওই ঝাঁটার শব্দটা ভারি অসহ্য লাগে। সে গিয়ে বাথরুমে ঢুকে পড়ল।

চিঠিটা পেল বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে। একটা সাদা মুখ-আঁটা খাম। বিছানায় পড়ে আছে।

মতির মা চিঠিটা কোত্থেকে এল?

মেঝের ওপর পড়েছিল বাবা, তুলে রেখেছি বিছানায়।

কে দিয়ে গেল চিঠিটা?

তা তো জানি না বাবা।

খামের ওপর বাংলায় তার নাম লেখা। ঠিকানা নেই। হাত-চিঠি, কিন্তু দিয়ে গেল কে? একটু উত্তেজিত আঙুলে খামটা ছিঁড়তে গিয়ে প্রায় অর্ধেক চিঠিও ছিঁড়ে ফেলল সে। হালকা নীল রুলটানা প্যাডের কাগজে মাত্র কয়েকটা সুছাঁদ লাইন আপনার কেউ নেই নাকি? বউ ছাড়া আরও তো কত আপনজন আছে!

নাম-টাম কিছু নেই, তবে মেয়েলি হস্তাক্ষর।

এটা প্রেমপত্র বলে মনে করারও কোনও কারণ নেই। তবে যে-ই হোক সে মনোযোগ দিয়ে তাকে লক্ষ্য করছে, হয়তো দুঃখ পাচ্ছে তার জন্য।

চিঠিটা টেবিলে রেখে দিল বিজয়। তারপর সে দাড়ি কামাল, স্নান করল, চা খেল, খবরের কাগজ পড়ল। রোজ যা যা করে তার সবই করল, কিন্তু সারাক্ষণ কেমন আনমনা রইল সে। বারবার চিঠিটা পড়ল, কোনও মানে হয় না।

গলিতে ভদ্রলোক নেই এমন নয়। তাতে বেশির ভাগই কেমন যেন ঘরকুনো, কৃপণ, অমিশুক ভীতু ধরনের সব লোক। দারিদ্রের ছাপ প্রতিটি বাড়িরই দেয়ালে গভীরভাবে বসে আছে। তারই মাঝে মধ্যে এক আধটা ঝলমলে বাড়ি আছে। পুরোনো বাসিন্দাদের হাটিয়ে পয়সাওলারা এসে জেঁকে বসছে। কলকাতায় নিদারুণ স্থানাভাব, আর এ জায়গাটার গুরুত্ব সাঙ্ঘাতিক। মধ্য কলকাতার এই জায়গার কাছেপিঠে নানা ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান, অফিস, কারখানা!

কিন্তু চিঠিটা কে দিয়ে গেল? কেনই বা!

বিজয়ের সম্প্রতি একটা প্রমোশন হয়েছে। শোনা যাচ্ছে, তাকে কর্তৃপক্ষ দিল্লিতে বদলি করতে চায়। বিজয় চায় না। সে কলকাতায় এবং এই পাড়াতেই থাকতে চায়। সে অপেক্ষা করছে।

কিন্তু কোনও মানে হয় না। ট্যাঁপা হয়তো কোনোদিনই খুন করবে না চন্দনাকে। কেনই বা করবে? যুক্তিসঙ্গত কোনও কারণ তো নেই।

অফিসেও আজ সারাক্ষণ আনমনা রইল বিজয়। বারবার চিঠিটার কথা মনে পড়ল। কেমন যেন, অনেকদিন বাদে, একটু ভালো লাগতে লাগল তার। নিজেকে সে মুছে ফেলছিল জীবন থেকে। হঠাৎ মনে হল, সে মুছে ফেললেও অন্যরা তাকে মুছে ফেলছে না। এটুকুও তো কম নয়।

দ্বিতীয় চিঠিটা এল সাত দিন বাদে। দরজায় চিঠি ফেলার ফোকর আছে, তাই দিয়ে কেউ ফেলে গেছে। সেই সাদা খাম, সেই নীল রুলটানা কাগজ।

লেখা : চন্দনার মতোই সবাইকে ভাববেন না যেন। নিজেকে কেন নষ্ট করছেন একটা খারাপ মেয়ের কথা ভেবে? নিজের দিকে নজর দিন।

এবারও নাম নেই। কিন্তু বহুকাল পরে বিজয়ের ঠোঁটে একটু হাসি দেখা দিল। চিঠিটা সযত্নে রেখে দিল সে। প্রথমটার পাশেই, ড্রয়ারে।

তিরিক্ষি মেজাজ, অগোছালো, বিভ্রান্ত বিজয়ের যেন সূক্ষ্ম একটা পরিবর্তন শুরু হল নিজের অজান্তে। বেনামা চিঠির লেখিকা তাকে লক্ষ্য করছে, নজরে রাখছে। কাজেই নিজের ওপর স্বাভাবিকভাবেই নজর পড়ল তার। আজ আয়নায় নিজের মুখখানা একটু বেশিক্ষণ দেখল সে। সত্যিই সুপুরুষ ছিল। একসময়ে ছিল। এখন কেমন রুক্ষ শুষ্ক হয়ে গেছে।

তৃতীয় চিঠিটা এল আরও সাত দিন পর। লাইন বেড়েছে : যাক বাবা বাঁচালেন, যা ছিরি হচ্ছিল দিন দিন। পায়ে পড়ি লক্ষ্মীটি, একটু ভালো খাবার খাবেন তো রোজ! আর এই রাক্ষুসীটাকে এবার দয়া করে তালাক দিন। মাথায় বুদ্ধিশুদ্ধি কিচ্ছু নেই হাঁদা গঙ্গারাম কোথাকার! এ মানুষকে নিয়ে যে কী করি!

চিঠিটা তাকে প্রায় দু দিন সম্মোহিত করে রাখল।

চতুর্থ চিঠিটা এল আরও দিন চারেক বাদে : খুব কৌতূহলে রেখেছি তো! আচ্ছা, ক্ষমা চাইছি। আর বেশিদিন দগ্ধে মারব না। আমারই কি তর সয় গো! কিন্তু তোমার মনটাকে বুঝতে একটু সময় নিলুম। তোমাকে 'তুমি' বললাম, কিছু মনে করো না, তুমি ছাড়া কী বলব বলো তো!

ভারি অস্থিরতা। ভারি চাঞ্চল্য। ধৈর্যহীনতা। কে এ? কী চায়? সত্যিই কি তাকে ভালোবাসে?

অপেক্ষা করতে লাগল সে। রাত্রিবেলা জেগে বসে থাকে। সবসময় নজর রাখে দরজার ফোকরে।

কিন্তু ধরতে পারল না। পরের চিঠি এল তার অনুপস্থিতিতে।

আর কয়েকটা দিন সময় দাও লক্ষ্মীটি। কেন যেন সাহস পাচ্ছি না। তবে মাত্র কয়েকটা দিন।

ডিভোর্সের নোটিশ গেল চন্দনার কাছে। সে নোটিশ নিল। মামলা লড়ল না। একতরফা বিচ্ছেদ পেয়ে গেল বিজয়। মাঝখানে কয়েকটা মাস কেটে গেল। আর চিঠি জমে উঠল প্রায় গোটা পঁচিশ। সময় চায়। সাহস পাচ্ছে না।

হঠাৎই চিঠি বন্ধ হয়ে গেল।

রোজ অপেক্ষা করে বিজয়। রোজ উঠে মেঝেময় খুঁজে দেখে। না, মাসের পর মাস গেল, চিঠি এল না।

আর একটা প্রমোশন পেয়ে দিল্লি বদলি হল বিজয়, বিনা আপত্তিতে রওনা হয়ে গেল।

বছর টাক বাদে দেখেশুনে একটা বিয়েও করল। তারপর একদিন চিঠিগুলো পার্সেল করে ফেরত পাঠাল চন্দনার ঠিকানায়।
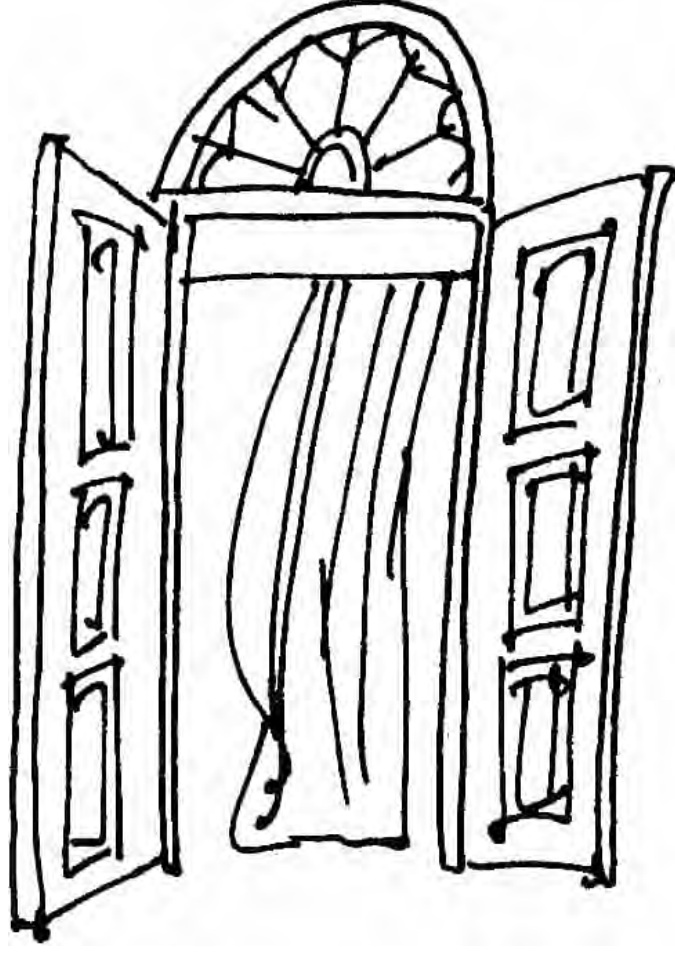
# বহিরাগত

'হ্যালো মিস। হ্যালো মিস।' বলে অষ্টমী পুজোর ভিড়ের মধ্যে একটা কালো মেয়ের সঙ্গে একটু ফস্টিনষ্টি করতে গিয়েছিল পরাণ। তিনটে মেয়ে একসঙ্গে ছিল, খুব হাসাহাসি করছিল নিজেদের মধ্যে। পরাণ একটু ইন হতে গিয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ কালো মেয়েটা তার দিকে ফিরে এমন তুড়ে ইংরেজি বলতে লাগল যেন তপ্ত বালিতে ভুট্টার খই ফুটছে। কাণ্ড দেখে লোক দাঁড়িয়ে গেল চারদিকে। পরাণ পালাতে পারলে বাঁচে, চকচকে টেরিলিনের নতুন প্যান্ট, লাল জামা, মাথায় চুলের বাহার, হাতে ঘড়ি, সব মিলিয়ে বেশ একটা রংবাজের চেহারা ধরেছিল বটে, কিন্তু প্রেস্টিজ ঢিলে হয়ে গেল। ইংরিজি শুনে প্রথমেই গৌর আর লম্বু গা ঢাকা দিয়েছিল। পরাণ কিন্তু সাহসী বলে পালায়নি বটে, কিন্তু এমন ভ্যাবাচাকা খেয়েছিল যে বলার নয়। আসল কথা হল, মেয়েটাকে দেখে মনেও হয় না যে, পেটে ইংরেজি আছে। চেহারা বস্তিমার্কা, পোশাক-টোশাকও তেমন হাই ক্লাস নয়। আজকাল ইংলিশ মিডিয়মে পড়ে পড়ে ছোঁড়াছুঁড়িগুলোর যে কী হচ্ছে বাবা!

বে-পাড়া বলে রক্ষে। তেমন চেনা কেউ দেখেনি। শুধু গৌর আর লম্বু। চড়চাপড় খেলে প্রেস্টিজ আরও ঢিলে হত, তবে ততদূর গড়ায়নি। পুজোর দিন, সবাই বউ-বাচ্চা নিয়ে ঠাকুর দেখতে বেরিয়েছে, কেউ আর

তাই এ নিয়ে জড়িয়ে পড়তে চায়নি। আর মেয়ে তিনটেও তার জন্য বেশি সময় নষ্ট করেনি। ইংরিজিওয়ালি ছুঁড়ি তো, তার মতো রংবাজের পেছনে সময়ে নষ্ট করবে কেন?

মেয়েটা যখন মুখে ঝামা দিয়ে চলে গেল তখন একা একা ঠাকুর দেখা আর হয়ে উঠল না পরাণের। নতুন জুতোজোড়া খুব ঘষাচ্ছিল পায়ে। উঁচু হিলের জুতো, কষ্ট তো প্রথম প্রথম হয়ই। মেয়েটা অপমান করায় জুতোর কষ্টটা যেন দুনো হল। প্যান্ট জামা চুল সব মনে হতে লাগল ফালতু জিনিস। পরাণ ভিড় ছেড়ে একটু লেংচে ঢাকুরিয়া ব্রিজের তলা দিয়ে গিয়ে সুনসান লেক-এর ধারটায় বসে জুতো মোজা খুলে পায়ে হাওয়া লাগাল। শার্টটা খুলে জড়ো করে রাখল পাশে। তারপর ভাবল, এ লাইফটার কোনও মানে আছে? শালা এটা কি একটা লাইফ?

লেক-এর ধারেই মনের দুঃখে ঘুমিয়ে পড়েছিল পরাণ। সকালে যখন মুখের ওপর একটা নচ্ছার পাখি হেগে দিল তখন জেগে উঠেই আগে জামা জুতোর খবর নিল। আছে। তবে দুঃখটা আর তেমন নেই। দুঃখটা একেবারেই উবে গেল, বিশ্বনাথ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের গরম কচুরি আর জিলিপি খেয়ে।

সারা রাত ঠাকুর দেখে লম্বা ঘুম দিয়েছিল গৌর আর লম্বু। দেখা হল পড়ন্ত বেলায়। পরাণের বাপের ঘুগনির দোকান। পুজোর ক'টা দিন তার বাপের নাওয়া খাওয়া লাটে উঠেছে, দিনরাত কেনাবেচা, নিরামিষ ঘুগনি আর মাংসের ঘুগনি দুরকমই আছে। তার জন্য সারা সকাল মাংস কুচোনো, মশলা তৈরি করা এসব কাজ পরাণকে করতে হয়। বাপের দোকানটা ভালো জায়গায়, পাশেই দিশি মদের ঠেক। ঝাল গরগরে মাংসের ঘুগনিটা টপাটপ উঠে যায়। আর পুজোর বাজারে তো কথাই নেই। যা পাচ্ছে লোকে তাই গিলছে। বাপ মাংসটা কোত্থেকে আনে তা পরাণ জানে না, তবে এ যে নির্যস পাঁঠা খাসি নয় তা সে জানে। তবে লোকে আজকাল অত বাছে গোছে না। সবই হজম করে দিচ্ছে। হজম না হলেই বা দেখতে যাচ্ছে কে?

বাপ রাগী লোক। সময়মতো মালের সাপ্লাই না হলে দা নিয়ে কাটতে আসে। তবে পরাণের কপাল ভালো, যে এখনও লেখাপড়ার লাইনে একটু লেগে আছে বলে বাপের দোকানে তাকে বসতে হয় না। পারণের দুই দাদা আছে, তারাই বসে।

পেঁয়াজ কুচিয়ে পাহাড় করছিল পরাণ, কাঠের জ্বালে তার মা ঘুগনি কষছে। এই চড়ার ঘুগনিটা দোকানে বয়ে নিয়ে দিতে পারলেই ছুটি। এমন সময় লম্বু আর গৌর এসে জানালায় দাঁড়াল। ফোলা মুখ, ভারি লাজুক ভাব করে হাসছে। লজ্জা হওয়ারই কথা। কাল বিপদে ফেলে পালিয়েছিল।

পরাণ বেরিয়ে এসে বলল, কউকে বলেছিস তো কেটে আমার বাপের ঘুগনিতে ভরে দেবো তোদের।

জিব কেটে লম্বু বলল, মা কালীর দিব্যি কাউকে বলিনি। জানতুম না রে, দেখি ভিড়ের মধ্যে আমার জ্যাঠা ঢ্যামনা দাঁড়িয়ে মজা দেখছে। পাছে চোখাচোখি হয়ে যায়, মেয়েছেলের কেস, বুঝতে পারছিস, তাই সরে পড়লুম।

গৌর একটু চুপচাপ লোক। বেশি কথাটথা কয় না, বয়সে লম্বু বা পরাণের হলেও লম্বায় দেড় মাথা উঁচু। গায়ের রং বেজায় ফর্সা, তার মাথায় চুলও কেমন যেন বাদামী রঙের। আসল নাম গ্রেগরি হপকিনস। মুসৌরির এক অনাথ আশ্রম থেকে পালিয়ে এসে এইখানে কেমন করে জুটে গেছে। ঘুঁটেউলি তুলসীবুড়ির কাছে থাকে, নিজের কথা সে বিশেষ জানে টানে না, শুধু জানে তার বাপ ছিল পেল্লায় চেহারার এক সাহেব, আর মা ছিল খুব সুন্দর এক মেমসাহেব। বাপ মায়ে খুব ঝগড়া হত। বাপ বেজায় মদ খেত, দিল্লির কাছাকাছি কোথাও থাকত তারা, কী হয়েছিল তা আর মনে নেই তার। হয়তো মেমসাহেব ঝগড়া করে বাড়ি থেকে চলে যায়, আর সাহেব মদে চুর হয়ে থাকে, এমন অবস্থায় বাচ্চা গ্রেগরি বাড়ি থেকে খিদের জ্বালায় বেরিয়ে পড়ে থাকতে পারে। মুসৌরির অনাথ আশ্রমের কথা অবশ্য গ্রেগরির মনে আছে। বাঁধা জীবন, শাসন আর লেখাপড়া এসব ভালো লাগত না বলে সে পালায়। বিস্তর ঠোক্কর খেয়ে অবশেষে এখানে এসে থিতু হয়েছে সে। নামটা মনে আছে, কারণ মেম-মা তাকে পাখি-পড়া করে শেখাত, হোয়াটস ইওর নেম? মাই নেম ইজ গ্রেগরি হপকিনস। সেই গ্রেগরি থেকেই গৌর।

লোকে জিগ্যেস করে, তোর বাপ-মায়ের খোঁজটোজ হয়নি?

গৌর বলে, হয়েছিল, ডেট্রয়েট না কোথায় যেন থাকে লোকটা, অনাথ আশ্রম থেকে অনেক চিঠিচাপাটি চালাচালি হয়। বাবা নাকি লিখেছিল টু হেল উইথ হিম।

তবে গৌর এখন আর সাহেব নেই, লম্বু বা পরাণের মতোই একজন মাত্র।

পরাণ গৌরকে বলল, আর তুই শালা গা-ঢাকা দিলি কেন? মেয়েটা ইংরেজি ঝাড়ছিল, তুই গিয়ে বুক চিতিয়ে দাঁড়ালে চেহারা দেখেই ফুটে যেত।

গৌর একটু হেসে বলল, ও মেয়ে ফোটার নয়, চোখ দুখানা টর্চবাতির মতো জ্বলছিল। বাপ রে!

তুই শালা নকলি সাহেব।

গৌর কথাটা মেনে নেয়। সাহেবিয়ানা তার আর কীই বা আছে? সাহেব হওয়ার জন্য তার কিছু আকুলি ব্যাকুলিও নেই। সে দিব্যি আছে।

তুলসীবুড়ির গোবর নিয়ে আসে খাটাল থেকে, ঘুঁটে বয়ে এ বাড়ি ওবাড়ি দিয়ে আসে, বদলে বুড়ি তাকে দুবেলা খাওয়ায়। হাত খরচের পয়সা এদিক ওদিক থেকে কিছু জুটে যায়ই। তবে তার শত্রু হল তার চেহারাখানা। ঘোষদের বাড়িতে গিয়েছিল শিলিং ফ্যান আর জানলার কাচ পরিষ্কার করতে। ঘোষবুড়ি আঁতকে উঠে বলেছিল তোর শ্বেতী আছে নাকি? শ্বেতী নেই—এ কথাটা কিছুতেই বিশ্বাসও করছিল না। তারপর যখন শুনল সাহেব তখন চোখ কপালে তুলে বলল, ও বাবা সে তো আরও খারাপ। খেরেস্তানি কারবার, না বাবা ঘরে-দোরে তোমার আর ছোঁয়াছানির দরকার নেই, গরুমোষ খাও, তোমাদের আচার-বিচায় নেই।

গৌর করুণ গলায় বলল, আমি যে এই সেদিনও শেতলা পুজোয় কাঁসি বাজিয়েছি।

চাটুজ্যেদের বাড়িতেও মজার কাণ্ড হয়েছিল। যোগেন মিস্ত্রি চাটুজ্যেদের ফ্ল্যাটে রং করার কাজ পেল। গৌর রং-এর কাজ শিখত তখন। দেয়াল ঘষাঘষি করার সময় চাটুজ্যে এসে অবাক হয়ে বলে, এ কে?

যোগেন মিস্ত্রি নিজের নাম বাজানোর জন্য বলল, আজ্ঞে ও হল গড়গড়ি হপকিন, খাঁটি সাহেব।

বৃত্তান্তটা সংক্ষেপে বলতেও হল তারপর। কিন্তু চাটুজ্যে আর কিছুতেই তার সঙ্গে বাংলা কথা বলতে চায় না। যতবার দেখা হয় ইংরিজিতে কথা কয়, আর গৌর গরুর মতো চেয়ে থাকে।

তার অবস্থাটা একটু ভজখট্ট তা সে জানে। নানারকম গণ্ডগোলে পড়ে যেতে হয়।

ঘুগনির হাঁড়ি দুটো তিন বন্ধু মিলে ধরাধরি করে দোকানে পৌঁছে দিল, দোকান বলতে তেমন কিছু নয়। গলির মুখে একটু ত্রিপলের ছাউনি, যে কোনও সময় পুলিশ এসে তুলে দিতে পারে। ছাউনির নীচে একখানা কেরোসিন স্টোভে মাল গরম হচ্ছে, একখানা কাচের বাক্সে কোয়ার্টার রুটি সাজানো। ঘুগনি আর রুটি ঝপাঝপ কলাই করা প্লেটে বিকিয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে কাঁচা পেঁয়াজ আর একখানা করে সবুজ লঙ্কা। পরশু বৃষ্টির দরুণ বাজার খারাপ হয়ে গেছে। আজ মনে হল উশুল হয়ে যাবে।

বাপকে কমলের দোকান থেকে বিড়ি এনে দিতে হল।

বাপ গগন বিশ্বাস দুই ছেলের ওপর দোকানটা ছেড়ে ফাঁকে দাঁড়িয়ে একটা বিড়ি ধরিয়ে পরাণের দিকে চেয়ে বলল, তেল এনে রাখতে বলেছিলুম, এনেছিস?

পরাণ ভয় খেয়ে বলে, কাল অষ্টমী পুজো ছিল, তেল দেয়নি।

গগন কসাইয়ের মতো চোখে চেয়ে বলে, সারাদিন করছিলি কী? আজ তেল না হলে চলবে না। টিন নিয়ে যা।

কেরোসিনের লাইন মানে নবমী পুজোটা গেল। শুকনো মুখে টিন আর টাকা নিয়ে পরাণ রওনা হল।

লম্বু বলল, তোর বাপটা খচ্চর আছে।

বহুৎ খচ্চর, দিল সন্ধেটা বিলা করে।

তোর বাপের ঘুগনিতে নাকি কবে যেন মানুষের আঙুল পাওয়া গিয়েছিল, তাতে একটা রুপোর আংটিও ছিল। সত্যি?

দূর শালা! মানুষ নয়, তবে ভেজাল মাল থাকে ভাই। মিছে কথা বলে কী হবে? না হলে মাংসের ঘুগনি দেড় টাকা প্লেট হয়। সস্তা খেতে হলে নাক সিঁটকোলে চলে না, ঘুগনির সঙ্গে মাংস পাচ্ছো, খেয়ে লাও, এটা তো আর গ্র্যান্ড হোটেল নয়।

সীতারাম বলেছে, তোর বাপ চিড়িয়াখানা থেকেও বন্দোবস্তে মাংস আনে। ওই যে মাংস বাঘ সিংহকে দেওয়া হয় সেগুলোই। বাঘের এঁটো মাংস।

তা হবে। বাজার এখন খুব টাইট। পেঁয়াজ কত করে কেজি যাচ্ছে জানিস? দেড় টাকায় মাংসের ঘুগনি দিয়ে পোষায় নাকি?

কেরোসিনের লাইন আঁকাবাঁকা হয়ে বহু দূর চলে গেছে। খুব কাজিয়া আর ঠেলাঠেলি হচ্ছে লাইনে। লাইনের মাথায় ফেয়ার প্রাইস শপ লেখা সাইন বোর্ডের তলায় খালি গায়ে সবুজ লুঙ্গি পরে পল্টু বসা। দশাসই মিশমিশে কালো চেহারা, ইদানীং ভুঁড়ি বেড়েছে। আশে পাশে তার কয়েকজন সাকরেদ। এ পাড়া পল্টুর কব্জায়। বছর দুয়েক আগে বাজারের কাছে দিনে-দুপুরে কানু পালকে খুন করেছিল পল্টু। তারপর থেকে আর খুন খারাপি করেনি। কানু পাল বোধহয় তার দশ নম্বর খুন। পল্টু এখন ভদ্রলোক হওয়ার তালে আছে। দুটো অটো রিক্সা, একটা লরি, একটা ট্যাক্সি কিনে ফেলেছে। লোহা সাপ্লাই দেয়। কেরোসিনের দোকানটা এই হালে হল। লাল হয়ে যাচ্ছে পল্টু। তার বাপ ঘুগনির দোকানের জন্য পল্টুকে তোলা দেয়। সে হিসেবে পল্টুদা চেনা লোক। তবে পল্টুর কারও সঙ্গেই খাতির নেই বিশেষ।

পল্টুর চারদিকে অনেক লোক। সবাই ভয় খায়, দেঁতো হাসি হেসে সেলাম বাজায়, গা ঘষাঘষির চেষ্টা করে। এমন কি এ পাড়ায় যে সব নতুন ফ্ল্যাটবাড়ি হচ্ছে তাতে যে সব ভদ্রলোকরা থাকে তারা অবধি পল্টুকে সমঝে চলে। ফলে পল্টুর সঙ্গে সবসময়ে কিছু লোক আঠা হয়ে লেগে থাকে।

পরাণ গলা খাঁকারি দিয়ে একবার উঁচু গলায় ডাকল, পল্টুদা!

কিন্তু এমন চেঁচামেচি, সে ডাক পল্টুর কানে গেল না। তার ওপর লাইনের একটা ব্যাদড়া ছেলে একটু আগু হতে গিয়ে লাইন ভেঙে ফেলায় পল্টু উঠে এসে হাওয়াই চটিপরা পা তুলে তাকে একখানা লাথি কষাল। ছোঁড়াটা ছিটকে গিয়ে পড়ল দেয়ালের নীচে। তারপর ফের নির্লজ্জের মতো কোমরে হাত বোলাতে বোলাতে উঠে এল লাইনে।

তবে পল্টুকে আর ডাকতে সাহস পেল না পরাণ। খাতির করতে গেলে হিতে বিপরীত হতে পারে। পল্টুর ওপর তো কথা নেই। ওই যে লিটারের মাপের মগ দিয়ে ঝপাঝপ কেরোসিন ভরে দিচ্ছে গোবিন্দ, সেটার মাপ মোটেই ঠিক নেই। সবাই জানে, ওই মগ নিজের ইচ্ছেমতো তৈরি করিয়ে নিয়েছে পল্টু। আরও মজা হল, মগের গলাটা খুব সরু। গোবিন্দ উপুড় করে দিয়েই মগটা এমনভাবে তুলে নেয় যাতে ভিতরে বেশ খানিকটা কেরোসিন থেকে যায়। কিন্তু এসব নিয়ে কথা তুলবে কে? কার ঘাড়ে একের বেশি মাথা?

ন্যাড়ার মা লাইনের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে। শুকনো মুখ। পরাণকে দেখে বলল, ও বাপ পরাণ, দিচ্ছে তো! অ্যাদ্দুর থেকে কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

দিচ্ছে মাসি।

দিলেই বা কী হবে? যা লাইন পড়েছে, যেতে যেতে ফুরিয়ে যাবে আজও। পরশুও পাইনি। আজ যে কী হবে।

কথাটা সত্যি, পরাণও জানে। যখন তখন তেল দেওয়া বন্ধ করে দেয় পল্টু। তার ইচ্ছেমতো।

লাইনের শেষে বিরসমুখে দাঁড়িয়ে পরাণ বলল, তোরা বরং চলে যা। আজ আর আমার ঠাকুর দেখা হবে না।

লম্বু খ্যাচ করে হেসে বলে, ঠাকুর না মেয়েছেলে?

ওই হল বে। যা ফোট।

কেরোসিনের লাইন যেখানে ঠেকেছে তার পিছনেই পাড়ার পুজোর বাঁশের বেড়া। লাইন বড় হতে থাকলে এখান থেকেই ফের ইংরিজির ইউ অক্ষরের মতো বাঁক নেবে।

পরাণ দেখল, খিচুড়িভোগ খেতে বসেছে মেলা ছেলেমেয়ে। বাঁশের বেড়ার ওপিঠেই সার সার বসে গেছে থালা আর কলাপাতা নিয়ে। চিল্লামিল্লি হচ্ছে বেজায়। গৌর আর লম্বু গিয়ে দিব্যি মাঝখানে বসে গেল।

পরাণ আপনমনেই নিজের কপালটাকে গাল দিল, শালা...

সামনেই তিন বউওয়ালা শ্যামাপদ দাঁড়িয়ে। পরণে লুঙ্গি, গায়ে একখানা গামছা জড়ানো। শ্যামাপদ ভারি নিরীহ লোক। কেউ কখনও তাকে রাগতে দেখেনি, চেঁচামেচি করতে শোনেনি। শ্যামাপদ ঘোর মাতাল লোক। তিন বউ সত্ত্বেও তার খারাপ পাড়ায় যাতায়াত আছে। বাজারে দোকানে সর্বত্র তার ধারবাকি। এমন কী পরাণের বাপ গগন বিশ্বাসও তার কাছে অন্তত ত্রিশ চল্লিশ টাকা পাবে। তবু শ্যামাপদর মতো নিরুদ্বেগ নির্বিকার লোক দেখা যায় না। পুজোমণ্ডপের যে সব বাচ্চা কাচ্চা খিচুড়ি খেতে বসেছে তাদের মধ্যে না হোক শ্যামাপদর গুটি চার পাঁচ বাচ্চা আছেই। পরাণের দিকে চেয়ে শ্যামাপদ খুব হেসে বলল, খিচুড়িটায় আজ ভাজা মশলা পড়েছিল। ঝালও হয়েছে। খুব জমেছিল। কিন্তু কুমড়োভাজাটা ব্যাটারা গাপ করেছে।

পরাণও অবাক হয়ে বলে, দেয়নি?

নাঃ। দেওয়ার কথা ছিল, রবীনবাবু বলল, কুমড়োভাজা হচ্ছে না। সব নাকি খিচুড়িতে দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ছিল?

পড়েছিল একটা টুকরো আমার পাতে।

খিচুড়িটার দারুণ গন্ধ পরাণও পাচ্ছিল। টানছে গন্ধটা। মাইকে একটা ডগমগে হিন্দি গান বাজছে। বসে গেলে হত।

শ্যামাপদ বলল, কাল তোমার বাবার ঘুগনিটাও বেশ হয়েছিল। জিবে লেগে আছে এখনও। মালের মুখে আরও ভালো লাগে।

টাকাটা দেবেন না?

শ্যামাপদ খুব ভালোমানুষের মতো মুখ করে বলে, দিয়ে দেব। পুজোর মাসটা গেল জান তো! দেশের বাড়ি থেকে কিছু আসার কথা ছিল, তা ফুলুর মা জানিয়েছে এবার পারবে না। এদিকেও ঝুপড়ির ভাড়া একটি পয়সা আদায় নেই। বড় সংসার তো।

পরাণ অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল।

শ্যামাপদ বলল, যাও না, খিচুড়িটা খেয়ে এসো না একটু। দুগ্□□ মায়ের প্রসাদ। যাও। লাইন আমি দেখছি।

না, আমার ইচ্ছে করছে না।

শ্যামাপদ একটু চুপ থেকে থুতনি চুলকোলো। তারপর গলাটা একটু খাটো করে বলল, লিটারে এক টাকা করে বেশি দিতে পারবে? পাঁচ লিটার দশ লিটার তাহলে এখনই বের করে দিতে পারি।

কোত্থেকে?

আছে রে বাপু, সব ব্যবস্থা আছে।

তাহলে আপনি নিচ্ছেন না কেন?

শ্যামাপদ চোখ কপালে তুলে বলে, ব্ল্যাকে নেবো! দু লিটারের পয়সা যোগাড় করতেই আমার ল্যাজ বেরিয়ে গেছে। ঝণ্টুর মা আমাকে পয়সা দিয়ে মোটে বিশ্বাস করে না। রোজগেরে বউ, কিছু বলতেও পারি না। বোঝোই তো সব। ওদেরই দিন পড়েছে। ব্ল্যাকের টাকা চাইলেই তেড়ে আসবে, বলবে, সারাদিন তো গজকচ্ছপের মতো হাত পা গুটিয়ে বসে থাকো, কেরোসিনের লাইনটা দিতে কোন গতর ক্ষয় হচ্ছে?

আমার কাছে বাড়তি টাকা নেই।

শ্যামাপদ ফিচেলের মতো একটু হেসে বলে, শোনো কথা। তুমি হচ্ছো গগন বিশ্বাসের ছেলে, তোমার টাকা নেই তো এ তল্লাটে কার আছে? ঘুগনি বেচে গগন তো টাকার বিছানায় গড়াগড়ি খাচ্ছে।

লাইন বাড়ছে। পরানের পিছনে চৌধুরিবাবুদের ঝি মালতী এসে দাঁড়াল। চোখে কাজল। কালো মুখে গুচ্ছের পাউডার ঘষে ছাইরঙা হয়েছে। মাথায় লাল রিবন। বুক যেন গোলাপী ফ্রক ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইছে। বেঁটে মাগুরের মতো চেহারা। পরাণকে দেখে মুখখানা গোমড়া করে খুব ঠেকার নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

পরাণ মাতীর দিকে আর তাকাল না। তাকানোর মতো নয়। পাড়ার ছেলে-ছোকরাদের দিকে মালতী এমনভাবে তাকায় যেন কেউ একটু আওয়াজ দিলেই তাকে ছিঁড়ে ফেলবে। তা মালতীর চেহারাখানাই এমন যে, তাকে কারও আওয়াজ দিতে ইচ্ছেই করে না।

মালতী নাকি রে? বলে শ্যামাপদ এক গাল হাসল। তোকেও লাইন দিতে হয়? বল না যেয়ে পল্টুকে, বাড়িতে ঘাড়ে করে তেল পৌঁছে দিয়ে আসবে। ক'টাই বা বেশি টাকা বল! নিবি ব্ল্যাকে?

মালতী গম্ভীর গলায় বলল, না।

শ্যামাপদর একটা বন্দোবস্ত আছে, বুঝতে পারছে পরাণ। মুশকিল হল, এই সব লোক ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইন দেবে, কিন্তু বাড়তি পয়সা দিয়ে কেরাসিন কেনার ফুটানি দেখাবে না। তত রেস্ত কারও নেই।

খিচুড়ি মেরে কলের জলে হাত মুখ ধুয়ে লম্বু আর গৌর এসে বলল, এ কী রে এগোসনি তো একটুও! এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছিস!

শ্যামাপদ আলটপকা বলল, এগোবে কী? সামনে যে সব পুঁটুলি পাকানো ভিড়। গিট পড়ে গেছে জায়গায় জায়গায়। আমি তো আধঘণ্টাটাক দাঁড়িয়ে দেখছি কাণ্ডখানা।

মালতী আড়চোখে গৌরকে দেখছে। সবাই দেখে। এইসব কালো ময়লা ছোটখাটো রোগাভোগা মানুষের মধ্যে হঠাৎ একখানা লম্বা চওড়া ফর্সা লোক এসে দাঁড়ালে চোখে পড়ারই কথা। এ পাড়ার মেয়েরা গৌরকে তাই খুব দেখে। কিন্তু গৌরটা কেমন যেন ম্যাদামারা। কেমন যেন ভীতু ধরনের।

মালতীর পিছনে এসে পরপর আরও তিনটে মেয়ে দাঁড়িয়েছে। তার মধ্যে দুজন দু বাড়ির কাজের মেয়ে, একজন ঘোষালবাড়ির মেয়ে মিতুন। মিতুনরা ভদ্রলোক। তবে ইদানীং পড়তি অবস্থা যাচ্ছে। বাপটা হঠাৎ মরে গেল তো। রোদে জলে দাঁড়িয়ে থেকে মিস্তিরি খাটিয়ে বাড়িখানা শেষ করল বটে, কিন্তু ভোগ করতে পারল না। বাড়ি করার হ্যাপা আর ধারে কর্জে এমন ডুবে গেল যে শরীরটা আর সইল না। গৃহপ্রবেশের পর বছর না ঘুরতেই টেঁসে গেল।

শ্যামাপদ মিতুনকে দেখে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে বলল, আহাহা, তুমি আবার লাইনে কেন দিদি? এ ছোটলোকদের লাইন, নানারকম হয় এখানে। টাকাটা আর টিনটা দিয়ে বাড়ি চলে যাও, আমি পৌঁছে দিয়ে আসবখন।

মিতুন যেন অকূলে কূল পেয়ে বলল, দেবেন? তাহলে খুব ভালো হয়।

আরে, ওটা কোনও কাজ নাকি? তবে লাইনটাও তো দেখছ! লাইনে তেল পেতে রাত পুইয়ে যাবে। কত লিটার চাই?

দশ হলে ভালো হয়।

মাকে বোলো টাকা বেশি পড়বে। চেনা লোক ছাড়া ব্ল্যাকেও দেয় না কিনা। চারদিকে ধড়পাকড় হচ্ছে খুব।

হ্যাঁ, ঠিক আছে। আমাদের ব্ল্যাকেও কেনার লোক নেই।

মিতুন টাকা আর টিন দিয়ে চলে যতেই এক গাল হাসে শ্যামাপদ, পরাণের দিকে চেয়ে বলল, তোমার নবমী পুজোটা মাটি হল। তা এই আমার জায়গাটায় এসে দাঁড়াও। আমি লাইন ছেড়ে দিচ্ছি। এক টাকা!

তার মানে?

শ্যামাপদ ভারি মিঠে গলায় বলে, ওরে বাবা, লাইন বিক্রি বলেও তো একটা কথা আছে, নাকি? আমার জায়গায় আর একজনকে যদি দাঁড় করাই তো কী বলার আছে বলো। পরশুও একটাকা দু টাকায় লাইন বিক্রি হয়েছে।

পরাণ রুখে উঠে বলল, দাঁড় করান তো কাউকে এনে আপনি। ইয়ার্কি পেয়েছেন? এখনই এমন হাল্লাক দেবো যে পালানোর পথ পাবেন না।

শ্যামাপদ বিন্দুমাত্র উত্তেজিত না হয়ে মিঠে গলায় বলল, ঠিক আছে বাবা, এগিয়ে দাঁড়াও। আমি ওদিকে তেলটা ম্যানেজ করি গিয়ে।

শ্যামাপদ চলে যাওয়ার দু পা এগোলো বটে পরাণ কিন্তু আশা যে নেই তা বেশ বুঝতে পারছিল। পল্টু যদি এখন তেল দেওয়া মাঝপথে বন্ধ করে দেয় তাহলে বেঁচে যায় পরাণ। টাকা আর টিন বাপকে ফেরত দিয়ে কেটে পড়তে পারে।

লাইনে একটা গণ্ডগোল পাকাতে পারিস? চাপা গলায় পরান লম্বুকে বলে।

পাগল! পল্টুদা জল ভরে দেবে তাহলে।

টের পেলে তো। একটা ঝগড়া ঝাড়পিট লাগিয়ে দিলেই হয়। লাইন ভেঙে যাবে।

অত সোজা নয়। যতীন আর ট্যাপা লাইন দেখছে ঘুরে ঘুরে।

ওরা সামনের দিকে আছে।

না ভাই, ওসবের মধ্যে আমি নেই।

এই গৌর! এত বড় চেহারাটা নিয়ে কী করিস বল তো। একটা কিছু লাগা না।

গৌর ম্লান হাসল, ও পারব না ভাই। আমার ওসব আসে না।

তা আসবে কেন ঢ্যামনা! সাহেবের ছেলে হয়ে নাম ডোবালি।

শেষ অবধি আচমকাই গণ্ডগোলটা লাগিয়ে দিল মালতী। হয়তো তাদের কথা শুনতে পেয়েছিল। হঠাৎ লোকজনকে ডেকে সে চেঁচাতে লাগল, এই যে দেখুন, দেখুন, ছেলেগুলো কী বলছে। লাইন ভেঙে দেবে, গণ্ডগোল পাকাবে...

কেরোসিনের জন্য লোকের এখন জান কবুল। প্রত্যেকের মাথাতেই খানিক খুন চেপে আছে। দেখতে না দেখতে কিছু তেরিয়া লোক জড়ো হয়ে গেল। খোকা, জীবন, পঞ্চা সব মারকুট্টেরাও পুজো প্যান্ডেল থেকে দৌড়ে এল এদিকে।

পঞ্চা ভিড় ঠেলে এসে খিস্তি দিয়ে বলল, কোন শালা...এর বাচ্চা লাইন ভাঙছে রে? কোন...এর এত সাহস?

মালতী তাদের তিনজনকে দেখিয়ে দিয়ে ভারি ন্যাকা গলায় বলে উঠল, সেই কখন থেকে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, আর দেখুন এরা বলছে ঝগড়া পাকিয়ে লাইন ভেঙে দেবে...

পঞ্চা গলার কাছে জামাটা চেপে ধরে হিড়হিড় করে টেনে বের করে আনল পরাণকে। খোকা পিছন থেকে কলার ধরল লম্বুর।

কী রে, লাইন ভাঙছিস? খুব ঠান্ডা গলায় জিগ্যেস করে পঞ্চা।

না, পঞ্চাদা, ইয়ার্কি মারছিলুম।

ঘুগনিওলার ছেলে না তুই!

হ্যাঁ, আমি পরাণ।

চটাস করে গালে একখানা চড় এসে পড়ল। ফালতু রুস্তমি। মারধরের মতো কাণ্ডই নয়। লম্বুকেও চুল ধরে ঝাঁকাচ্ছে খোকা। পাট করা শখের চুল লম্বুর। আধঘণ্টা লাগে বেরোনোর আগে চুল ঠিক করতে। সেই চুলের দুর্দশা দেখে কান্না পায়।

লাইন ভেঙে লোক চলে এল মজা দেখতে। কেউ তাদের পক্ষ নিচ্ছে না।

পরাণ দুখানা চড় খাওয়ার পর বলল, মারছেন কেন? মারবার মতো কিছু করিনি।

খিচুড়ি খেতে বসা বাচ্চাগুলো সব উঠে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে। রই রই ব্যাপার।

পল্টুর রুস্তম চ্যালা ট্যাপা এসে ভিড় সরিয়ে একবার পরাণকে আগাপাশতলা দেখে নিয়ে পঞ্চাকে বলল, তেল দেওয়া বন্ধ করে দিচ্ছি। মালে টান আছে। এটাকে রগড়ে ছেড়ে দে।

ব্যাপারটা বুঝে গেল পরাণ। তেল দেওয়া বন্ধ করার ফিকির খুজছিল ট্যাঁপা। পেয়ে গেছে।

দুটো ঝাঁকুনি দিয়ে তাকে ছেড়ে দিল পঞ্চা। বলল, যা...এর বাচ্চা। ফের ট্যান্ডাই ম্যান্ডাই দেখলে পাড়া থেকে তুলে দেবো।

লম্বু খামোখা ঝাড় খেয়ে রেগে আছে পরাণের ওপর। পকেট থেকে চিরুনি বের করে লম্বা চুল সটান করতে করতে বলল, তোর সঙ্গে বেরোলেই ঝঞ্ঝাট হয়। ওই শালীর বেটি শালী মেয়েটা কোথায় গেল বল তো! ন্যাকা...কোথাকার। ফালতু ঝামেলা পাকিয়ে দিল!

কাল একটা ইংরিজি জানা মেয়ে বেপাড়ায় ঝেড়েছিল তাকে। সেটা তবু সয়ে গিয়েছিল। কিন্তু নিজের পাড়ায় এরকম বেহদ্দ মার খেয়ে কেমন ভোম্বল হয়ে গেছে পরাণ।

শুধু গৌর বেঁচে গেছে। তাকে কেউ কিছু বলেনি।

লম্বু বলল, তোর গায়ের রংটা ফর্সা বলে বেঁচে গেছিস। এ হচ্ছে শালা চাকরবাকরের দেশ, সাহেবদের গায়ে এখনও হাত তুলতে সাহস পায় না। একসময়ে পা চাটত তো।

গৌর করুণ মুখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করছিল। বলল, আজ তো আমি পালাইনি।

বললুম তো। দুশো বছর তোদের পা চেটেছিল না! তাই তোকে কিছু বলতে সাহস পায়নি।

পরাণের জামার বোতাম ছিঁড়েছে। জামা পাল্টাতে হবে।

তিনজন ফের ফিরে চলল। হাঁটায় তেমন জোর নেই। মনে আনন্দ নেই। পাড়ার পাঁচজনের চোখের সামনে—। ওই মালতীকে পেলে এখন—

গলির মুখে পুলিশের জিপ দাঁড়িয়ে। দুজন পুলিশ নেমে গগন বিশ্বাসকে কী যেন জিজ্ঞাসাবাদ করছে। গগন তাদের দেখতে পেয়েই চেঁচিয়ে উঠল, ওই তো! ওই লম্বা ছেলেটা।

পুলিশ অফিসার ফিরে গৌরকে দেখতে পেল। চোখে একটু অবাক দৃষ্টি।

গৌর থমকে গেছে। ভারি ভীতু ছেলে।

পুলিশ অফিসার এগিয়ে এল। পা থেকে মাথা পর্যন্ত গৌরকে দেখে নিয়ে বলল, তোমার নাম কী?

গৌর।

ভালো নাম?

গ্রেগরি হপকিনস।

পুলিশ অফিসার হাতের একটা ফাইল খুলে কী যেন দেখে নিয়ে বলল, সন অফ জন হপকিনস। ডেট্রয়েট। আমেরিকান সিটিজেন। তুমি এখানে কতদিন আছ?

চার পাঁচ বছর হবে।

তুমি কি জানো যে, এদেশে তোমার থাকাটা বে-আইনি হচ্ছে?

গৌর সভয়ে মাথা নেড়ে বলল, না তো!

একটা ছোট বইয়ের মতো বের করে অফিসার বলল, এটা তোমার পাসপোর্ট। আমেরিকান পাসপোর্ট। তোমার দু বছর বয়সের সময় করা।

গৌর হাত বাড়াল না। ভয়ে সিঁটিয়ে চেয়ে রইল।

অফিসার বলল, তোমার জেল হওয়া উচিত।

গৌর কাঠ।

আবার চারদিকে ভিড় জমছে।

অফিসার গৌরের দিকে কিছুক্ষণ কঠিন চোখে চেয়ে বলে, আমেরিকা থেকে তোমার খোঁজখবর হচ্ছে। তোমার বাবা মারা গেছেন। তোমাকে খুঁজে বের করার জন্য হোম ডিপার্টমেন্ট তোলপাড়। অর্ডার এসেছে, ডিপোর্টেশন উইথ ইমিডিয়েট এফেক্ট।

গৌর ইংরিজি বোঝে না। জুলজুলে চোখে অফিসারের দিকে চেয়ে থাকে। একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে, একটা সাঙ্ঘাতিক কিছু। তাকে নিয়ে পুলিশ মেলা হজ্জুত করবে মনে হচ্ছে।

তুমি আমার কথা সব বুঝতে পারছ?

গৌর শুকনো মুখে ঢোঁক গিলে বলল, আমি কিছু করিনি।

অফিসার-এবার একটু হাসে। তারপর বলে, কে করেছে তা তো বাপু আমরা জানি না। তবে বাঘের বাচ্চা হয়ে শেয়ালদের সঙ্গে বাস করছ, এটাও খুব খারাপ। এবার ঘরের ছেলে মানে মানে ঘরে ফিরে যাও। তোমার রাহাখরচ তোমার বাপের অ্যাটর্নি আমেরিকা থেকে পাঠাবে।

গৌর তবু কিছু বুঝতে পারে না।

অফিসার বলে, ওঠো, জিপে ওঠো।

কোথায় যেতে হবে স্যার?

আপাতত একটা মিশনে। খ্রিস্টান মিশন। তোমার দেশের লোক পাবে। তারপর প্রিলিমিনারিজ হয়ে গেলে সোজা আমেরিকা।

ওরে বাবা! সে আমি যেতে পারব না।

বলেই গৌর পিছু ফিরে ভিড় কেটে বেরিয়ে পড়ার একটা চেষ্টা করে। কিন্তু ভিড়টা বড্ড জমাট, আর পুলিশও সেয়ানা। টপ করে ধরে ফেলল।

ওঠো, ওঠো, জিপে উঠে পড়ো। আচ্ছা আহাম্মক তুমি হে। এই নোংরা বস্তিতে সব সাব হিউম্যানদের সঙ্গে থাকা কি তোমার পোষায় বাপু? তোমার বাপের না হোক কয়েক লক্ষ ডলারের সম্পত্তি আছে। বাড়ি আছে, গাড়ি আছে। এখানে পড়ে থেকে তোমার কোন হাত পা গজাবে? তাছাড়া কাজটা বে-আইনি হচ্ছে।

দুটো ভুঁড়িদার সেপাইয়ের মাঝখানে সেঁটে চোরের মতো জিপে বসল গৌর। ভিড়ের ভিতর থেকে ঘুঁটেবুড়ি একবার খনখনে গলায় চেঁচিয়ে উঠল, নিয়ে যাচ্ছে যে! তোমার কিছু বলছ না! এ কি মগের মুলুক?

কে যেন বুড়িকে দাবড়াল, চুপ বুড়ি, চুপ! কাকে ঘরে রেখেছিলে জানো! রাজার ছেলে। রাজার জাতের লোক। যদি পুলিশ টের পায় যে, ওকে দিয়ে ঘুঁটে বিক্রি করিয়েছ তাহলে কোমরে দড়ি বেঁধে তোমায় নিয়ে হাজতে পুরবে।

ঘুঁটেবুড়ি ভয়ে আর রা কাড়ল না।

জিপটা ভিড় কেটে খানাখন্দে ভরা রাস্তায় টাল খেতে খেতে বেরিয়ে গেল।

পরাণ আর লম্বু এত অবাক হয়ে গিয়েছিল যে মুখ দিয়ে কোনও কথাই বেরোলো না প্রথমে।

জিপটা চলে যাওয়ার অনেকক্ষণ বাদে লম্বু বলল, ব্যাপারটা কিছু বুঝলি?

বুঝব না কেন? সাহেবের ছেলে ফের সাহেব হয়ে গেল।

পারবে শালা ইংরিজি বলতে?

শিখে নেবে। কেলেকিষ্টি বাঙালি মেয়েটা যদি ওরকম ইংরিজি ঝাড়তে পারে তাহলে ফর্সা গৌর পারবে না?

লম্বু তার সতেরো বছর বয়সের মাথায় কী ভাবল কে জানে। হঠাৎ চারদিকটাকে তার ভারি নোংরা বিচ্ছিরি আর নিঘিন্নে লাগতে লাগল। বলল, শুনেছি আমেরিকায় একটা পাহাড়ের মতো উঁচু বাড়ি আছে, পাঁচশো তলা। সত্যি?

আমিও শুনেছি।
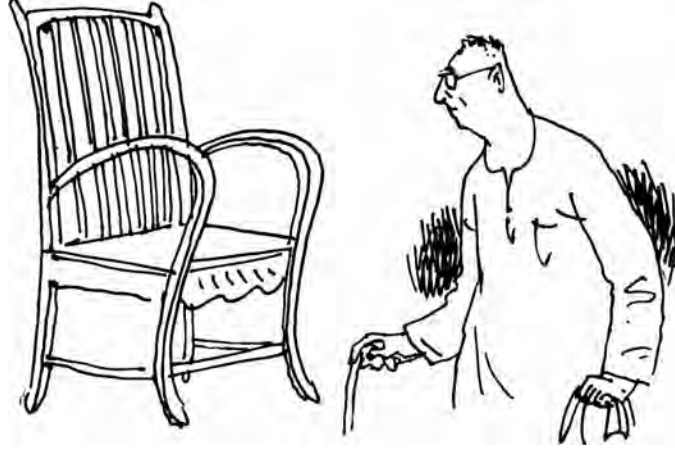
কালার টিভি তো থাকবেই। না?

ধুস, ওসব আমেরিকার গরিবদের ঘরে থাকে।

লম্বু মাথা নাড়ল।

পরাণ কালকে একটা কেলে মেয়ের কাছে ইংরিজিতে ঝাড় খেয়েছে, একটু আগে পাড়ার দশজনের সামনে পঞ্চার হাতে মার খেয়েছে তবু তার কেন যেন মনে হচ্ছিল গৌর তাকে আরও বেশি অপমান করে গেল। বড্ড জ্বালা করছে।

দাঁতে দাঁত পিষে পরাণ বলল, শালা সাহেব।

# প্রিয়ম

সামনে ট্রাফিক পুলিশের আইল্যান্ডটা দেখতে পেয়ে গাড়িটা থামিয়ে দিল শুভব্রত। একটু ঝুঁকে দেখল, মোটাসোটা আহ্লাদী চেহারার লোকটি তার দিকেই চেয়ে মৃদু মৃদু হাসছে।

শুভব্রতও হাসল। ট্রাফিক পুলিশের কাজটা বড় নিরস। বড্ড একঘেয়ে। সে জিগ্যেস করল, আচ্ছা, অমরির রাস্তাটা কোনদিকে বলতে পারেন।

পুলিশটা খুব আহ্লাদী গলায় বলে, এই তো ডানহাতি চলে যান। চারের ঘ ট্র্যাকটা ধরে চলে গেলে কাছেই।

কতটা দূর হবে?

বেশি নয়। তিন-চার মিনিটের বেশি লাগবে না।

কী রকম গ্রহ?

খুব ভালো। তবে অমরিতে কিন্তু পার্কিং নেই। এদিক দিয়ে গেলে অমরির প্রথম চাঁদ বুন আপনার রুটে পড়বে। ওখানেই গাড়ি পার্ক করবেন। ওখান থেকে খেয়া ধরে নেবেন, সবসময় চলছে।

জায়গাটা কেমন?

বেশ বড় গ্রহ। পৃথিবীর সতেরো গুণ। সেই তুলনায় মাধ্যাকর্ষণ কম। পাহাড় পাবেন, জঙ্গল পাবেন, গোটা পঁচিশেক সমুদ্র আছে। মাটির তলায় মার্কেট আছে। সবচেয়ে বড় কথা ও রকম স্বাস্থ্যকর জায়গা তো আর নেই। বিশ ত্রিশ হাজার বছর থাকুন না, জ্বর, সর্দি, পেট খারাপ, ক্যান্সার, এইডস কিছু হবে না, একটা হাঁচি অবধি নয়। ক'দিন থাকবেন?

বেশিক্ষণ নয়, কাজে যাচ্ছি।

হোটেল বুক করা আছে তো? খুব ভিড় হচ্ছে আজকাল।

হোটেলে থাকার মুরোদ তার নেই, সে থাকবেও না। শুভব্রত প্রশ্নটা এড়িয়ে জিগ্যেস করে, সবুজ গ্রহ কি অমরি ছাড়িয়ে?

না না, ওদিকে নয়। বাঁহাতি চৌষট্টি চ রুট ধরে গেলে তা আরও আধঘণ্টার পথ।

সেটা কি খুব বড়?

আজ্ঞে, সে বিরাট ব্যাপার। আমাদের সূর্যের সমান তো হবেই। একটু বড়ও হতে পারে। গ্র্যাভিটি বেশি, তাই অ্যান্টি গ্র্যাভিটি স্যুট পরে থাকতে হয়। যাবেন নাকি?

ফেরার পথে একবার ঢুঁ মেরে যাওয়ার ইচ্ছে। ওখানে থাকার ব্যবস্থা কী?

সবুজ গ্রহে তো থাকার ব্যবস্থা নেই। তবে সেখানে দেড় হাজার চাঁদ আছে। সব ক'টাতেই শহর-টহর আছে। আমি বলি কি সতাতন নামে একখানা দারুণ চাঁদ পাবেন উত্তর মেরুর ওপরে। বড় ভালো জায়গা। ওখান থেকে সবুজ গ্রহে যাওয়ার রাস্তাটাও কম।

খেয়া আছে তো।

সেকেন্ডে সেকেন্ডে। হাজার হাজার খেয়া ট্রিপ মারছে।

সবুজ গ্রহে কী দেখার আছে?

কী নেই বলুন। চারশো মাইল উঁচু-পাহাড়, লক্ষ মাইল লম্বা হ্রদ, এক মাইল উঁচু ডায়ানোসর, হাজার ফুট ডানাওয়ালা পাখি, পাহাড়ের সাইজের হাতি, দেড় মাইল লম্বা পাইথন, দু মাইল তিন মাইল লম্বা সব গাছ, সে একটা বিরাট ব্যাপার।

আপনার বাড়ি কোথায়?

আমি ঝাঁকি নক্ষত্রপুঞ্জের পেট্রো প্ল্যানেটের লোক।

সেটা কেমন?

সেটা শুধু তেলের জায়গা। মাটি খুঁড়লেই তেল।

শুভব্রত আবার গাড়ি চালু করতে করতে বলল, তা হলে দু-তিন মিনিটে অমরিতে পৌঁছে যাব তো?

যে আজ্ঞে। একটু ডাইনে চেপে যাবেন। বাঁ ধারে একটা পাজি ব্ল্যাক হোল আছে। গত বছর দুটো গাড়ি ওর টানে পড়ে গিয়েছিল।

ও বাবা।

না না ভয় খাবেন না। ব্ল্যাক হোলটা বেশ দূরেই আছে। খুব বেশি বাঁয়ে ঘেঁষে না গেলেই হল। তাছাড়া আপনার সেনসর তো আছে। সেনসরের দিকে একটু নজর রেখে গাড়ি চালাবেন।

শুভব্রতর দুশ্চিন্তাটা তবু গেল না। নিকষ কালো মহাকাশের দিকে সে হতাশ চোখে একটু চাইল। মহাকাশ এখনও যথেষ্ট নিরাপদ নয়। ব্ল্যাক হোল আছে, অ্যাস্টরয়েড আছে, আকাশ-দস্যুরা আছে।

ট্র্যাফিক পুলিশটা তার সবুজ ও অতি সুন্দর ভাসমান আইল্যান্ডে নিশ্চিন্তে বসেবসে খড়কে দিয়ে দাঁত খোঁচাচ্ছে। এদের চাকরিটা বেশ ঘটনাহীন। মহাকাশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় এরকম ট্র্যাফিক পুলিশ লাখো লাখো রয়েছে। বিপদ আপদ জানান দেওয়া, রুট ঠিক করে দেওয়া, পথভ্রষ্ট গাড়িকে আবার পথে স্থাপন করা, বিপন্ন মহাকাশযাত্রীকে আশ্রয় দেওয়া ইত্যাদি। হাজারো কাজ আছে এদের। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এদের বিশেষ কিছু করতে হয় না। অনেক ঘণ্টায় হয়তো একটা বা দুটো গাড়ি যায়। তারা পুলিশের তোয়াক্কা বিশেষ করে না। তবে আকাশ-দস্যুদের কাছ থেকে ট্র্যাফিক পুলিশরা যে বাঁ হাতে কিছু রোজগার করে এটা শুভব্রত শুনেছে।

শুভব্রত গলাখাঁকারি দিয়ে তার বেতারযন্ত্রের মারফত জিগ্যেস করল, আচ্ছা, এদিকে আকাশ-দস্যুদের উৎপাত কেমন?

ট্র্যাফিক পুলিশ বলে, এদিকে বিশেষ নেই। তবে অমরির রাস্তায় মাঝে মাঝে ডাকাতি হয় বটে। অমরি তো বড়লোকদের জায়গা। পয়সাওয়ালারা জীবনটাকে আরও ভোগ করতে আর ফূর্তি লুটতে আসে। তাই ডাকাতদেরও পোয়াবারো। দুশ্চিন্তা করবেন না, ভি আই পি-দের যাতায়াত আছে বলে আজকাল প্রচুর পুলিশ দেওয়া হয়েছে। অমরির রাস্তায় অন্তত চার পাঁচটা থানা পাবেন। পুলিশের গাড়ি টহল দেয়।

শুভব্রত বড়লোক নয়, অমরিতে সে ফূর্তি লুটতেও যাচ্ছে না। সে অবশ্য শুনেছে অমরি খুব বড়লোকদের জায়গা, জিনিসপত্রের দামও আগুন। অমরিতে বিরাট বিরাট স্বাস্থ্যকেন্দ্র হয়েছে। যেসব স্বাস্থ্যকেন্দ্রে মানুষের ইচ্ছেমতো আয়ু বাড়িয়ে দেওয়া হয়। তাতে প্রচুর খরচ। বড়লোকরা ছাড়া সেই খরচ সামাল দেওয়া যার-তার কর্ম নয়।

শুভব্রত নিস্তান্তই ছা-পোষা কেরানি। তার জন্মগ্রহ পৃথিবীর একটি ছোটখাটো শহরে। মধ্যবিত্ত ঘরে তার জন্ম। লেখাপড়া শিখে সে চাকরি করছে। প্রথমে পৃথিবীতেই চাকরি করতে হত। পরে সৌরলোকের অন্যান্য গ্রহে তাকে বদলি করা হয়। সৌরলোকের বাইরে প্রায় চার লাইটইয়ার দূরের নক্ষত্র নবীনার কুড়িটা গ্রহের একটা পঞ্চশর-এ সে এসেছে বছর পাঁচেক। চাকরিতে উন্নতিও হয়েছে। সে এখন সেকশন ইনচার্জ। তার কাজ হল, মহাকাশে বিভিন্ন যে-সব গ্রহে মানুষের বসতি রয়েছে সে সব গ্রহের খনিজ সম্পদের হিসাব রক্ষা করা। পঞ্চশর একটি চমৎকার গ্রহ। পৃথিবীর চেয়ে পাঁচগুণ বড়। প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য অবশ্য খুব বেশি নেই। তবে গোটা গ্রহটাই সবুজে সবুজ। প্রচুর গাছপালা হয়। গোটা গ্রহেই শরৎকালের মতো একটা আবহাওয়া বিরাজ করে সবসময়ে। গ্রহটাতে সবসময়েই একটা অখণ্ড শান্তি। পঞ্চাশরের সমুদ্রও শান্ত, ঝড় বা ভূমিকম্প হয় না। যথাসময়ে বৃষ্টি হয়। পঞ্চশরের মাধ্যাকর্ষণ পৃথিবীর চেয়ে সামান্য কম। শরীর তাই অনেক হালকা লাগে। সেখানকার স্বাস্থ্য চমৎকার। খুব খিদে পায়। পঞ্চশরে নানারকমের সুস্বাদু ফল হয় যা পৃথিবীর মাটিতে কখনও ফলেনি। পৃথিবীর তিন দিনে পঞ্চশরের এক দিন। বছরের হিসেবও তাই আলাদা। শুভব্রতর খুব ইচ্ছে, পঞ্চশরেই স্থায়ীভাবে থেকে যায়। কিন্তু পঞ্চশরে কিছু গোলমাল দেখা দিয়েছে সম্প্রতি। গ্রহটি এতই চমৎকার যে, যারা আসে তারা আর এ গ্রহ ছাড়তে চায় না। বেশিরভাগই বাঙালিদের বসবাস। কিন্তু পঞ্চশর পাছে বাঙালিদের গ্রহ হয়ে ওঠে সেই জন্য আন্তর্গ্রহ নিয়ন্ত্রক সমিতি সেখান থেকে পাইকারি হারে বাঙালিদের বদলি করার কর্মসূচী নিয়েছেন। ফলে, পঞ্চশরের বাঙালিরা প্রচণ্ড গণ-আন্দোলন শুরু করেছে। তাদের গোটা দুই গগন-মিছিলও বেরিয়ে প্রায় পাঁচ লাইট ইয়ার পরিক্রমা করে ক্ষোভের কথা জানিয়েছে। ধর্মঘটেরও হুমকি দেওয়া হয়েছে। নিয়ন্ত্রক সমিতি পুলিশ-টুলিশ পাঠিয়েছিল। আন্দোলন তাতে থামেনি। এরপর একটা রফা হয়েছে যে, বিবাহিত ও সংসারী বাঙালিদের অন্য কোথাও বদলি করা হবে না। কিন্তু যারা বিবাহিত নয় তাদের বদলি করা হবে।

শুভব্রতর সমস্যাটা এখানেই। সে বিবাহিত নয়। রাতারাতি বিয়ে করে ফেলার উপায়ও নেই। যেমন তেমন বিয়ে করে বহুকাল আগে এত অপজাতক সৃষ্টি করা হয়েছিল, যার ফলে পৃথিবী যেতে বসেছিল গোল্লায়। অপমানুষের আমদানীতে গোটা পৃথিবীতে দেখা দিয়েছিল সঙ্কট, যা মানুষ্যত্বের বনিয়াদ ও সভ্যতার শিকড়ে আঘাত করেছিল। দয়া, মায়া, মমতা, সমব্যথা, বিশ্বস্ততা লোপাট হয়ে গিয়েছিল। আড়াই হাজার খ্রিস্টাব্দে পৃথিবীকে রক্ষা করতে বিয়ে ব্যাপারটাকে আমূল সংস্কার করা হয়। তৈরি হয় বিবাহ সংবিধান। নিষিদ্ধ হয় লিভিং টুগেদার এবং বিবাহ বহির্ভূত যৌনাচার। প্রথমে প্রবল প্রতিরোধ দেখা দিয়েছিল বটে, কিন্তু কঠোরভাবে সেই প্রতিরোধ ভাঙা হয়।

ফলটা খারাপ হয়নি। তিন হাজার তিনশো তেত্রিশ খ্রিস্টাব্দে এসে বোঝা যাচ্ছে, অপমানুষ এবং তাদের বংশধারার প্রভাব বিলীয়মান।

কিন্তু হুট বলতে বিয়ে করা এখন আর সম্ভব নয়। কমপিউটারের মাধ্যমে পাত্র-পাত্রী নির্বাচিত হয়। দু তরফের সম্মতি এবং আগ্রহ প্রয়োজন। কারণ একবার বিয়ে করলে বিবাহ বিচ্ছেদ আর সম্ভব নয়।

আর মুশকিল, ছেলেদের এবং মেয়েদের গ্রহও আলাদা হয়ে গেছে। অবাধ মেলামেশা বন্ধ করার জন্যই প্রথম এ ব্যবস্থা চালু হয়। মেয়েরাও পুরুষশাসিত সমাজে থাকতে পছন্দ করছিল না। ফলে অন্তত দশ-বারোটি ছোটো, বড়, মাঝারি গ্রহে মেয়েরা আলাদা সমাজ গড়ে নিতে শুরু করে প্রায় সাতশো বছর আগে থেকেই। তবে বিয়ে হলে তারা স্বামীর গ্রহে চলে আসে বা দুজনে মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে কোথায় থাকবে তা ঠিক করে।

শুভব্রত বিয়ের উমেদার। তার সব তথ্য কমপিউটারে দেওয়া আছে। ম্যাচমেকিং কমপিউটার আন্তর্মহাজগতে খোঁজখবরও বিস্তর নিয়েছে, কিন্তু তার উপযুক্ত পাত্রীর সন্ধান দিতে পারেনি। এদিকে দিন সাতেক আগে শুভব্রতর বদলির হুকুম এসেছে। মনটা খুবই খারাপ শুভব্রতর।

তার ওপরওয়ালা খনিজ বিভাগের অধিকর্তা স্যামসন সাহেব অমরিতেই থাকেন। ষাট বছর বয়স হয়ে গেলে গ্রহ বেছে থাকার অধিকার জন্মায়। স্যামসন সাহেব অমরিকেই বেছেছেন। শোনা যাচ্ছে তিনি মোটা টাকায় পাঁচ হাজার বছরের আয়ু কিনে ফেলেছেন। অমরি থেকে তাঁর আর নড়ার কথা নয়।

সেদিন অফিসের ফুটু চৌধুরী বললেন, ওরে, বদলি রদ করতে চাস তো দু বোতল সোমরাজ নিয়ে গিয়ে অমরিতে স্যামসন সাহেবকে ধর। যতদূর জানি স্যামসন ওই একটা জিনিস সাংঘাতিক ভালোবাসে। তবে সাবধান! অমরিতে সোমরাজ বারণ। কাস্টমস ধরতে পারলে তোর জেল হবে।

সোমরাজ হল মানুষের তৈরি করা অমৃত। আগেকার দিনে কিংবদন্তীর অমৃত কেমন ছিল তা কে জানে! কিন্তু বিস্তর গবেষণা করে মানুষ নানা গ্রহের ফল, মধুজাতীয় বিভিন্ন রস, নানারকম গাছের শেকড়, ছাল আর পাতার নির্যাস মিশিয়ে তৈরি করেছে। খুবই সুস্বাদু, বলপ্রদ জিনিস। কিন্তু দাম শুনলে মুর্ছা যেতে হয়। সরবরাহও খুব কম। অনেক মাথাকুটে পাওয়া যায়। প্রায় দু মাসের মাইনের টাকা এক করে দু বোতল জোগাড় করেছে শুভব্রত। ছুটির দরখাস্ত মঞ্জুর করিয়েছে। তারপর বেরিয়ে পড়েছে অমরির উদ্দেশ্যে।

ট্র্যাফিক পুলিশটা বলছে, তিন চার মিনিট লাগবে। সেটা বড় কথা নয়। রাস্তায় ব্ল্যাক হোল, আকাশ-দস্যু আর কাস্টমসে কতটা সময় যাবে কে জানে। সোমরাজের বোতলের জন্য আকাশ-দস্যুরা হামলা করতে পারে।

শুভব্রত ট্র্যাফিক আইল্যান্ডটা ঘুরে ডানদিকে তার গাড়ি চালিয়ে দিল। যা হওয়ার হবে।

আকাশ ঘুটঘুট্টি অন্ধকার। শুধু কালো আকাশে নক্ষত্রের আলো দেখা যাচ্ছে। আবহমণ্ডল নেই বলে আলোর কোনও প্রতিফলন নেই। গ্যালাকটিক মিসাইল গাড়ি মসৃণভাবে আলোর বহু বহু গুণ বেশি গতিবেগে চলেছে। এ গাড়ি তার নয়। প্রতিবেশী সমুদ্র সেনের। এত দামি গাড়ি কেনার সাধ্য তার নেই। সমুদ্র সেন পয়সাওয়ালা মানুষ। গাড়িটা ধার দিলেন। বললেন, আপনার গলায় রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনে আপনার খুব ভক্ত হয়ে গেছি মশাই। নিন গাড়িটা, বদলিটা বন্ধ করে আসুন। শুধু জ্বালানির খরচ আপনার। সমুদ্র সেন মানুষটা একটু কবি-কবি স্বভাবের, বেশ ভাবুক। তার বউটিও চমৎকার হাসিখুশি মানুষ, প্রায়ই শুভব্রতকে এটা ওটা রান্না করে খাওয়ান। রবীন্দ্রসঙ্গীতের তিনিও ভারি ভক্ত। দেড় হাজার বছর হতে চলল, এখনও রবীন্দ্রসঙ্গীত অনেকের কাছেই পুরোনো হল না।

সমুদ্র সেনের বউ শুক্তি মহিলা-গ্রহ ম্যাডামের বাসিন্দা। ম্যাডামে তার ছোট আরও দুটি বোনও আছে। শুভব্রতও বদ্যি শুনে বউদি তার ছোট বোনের সঙ্গে শুভব্রতর বিয়ের প্রস্তাব তুলেছিলেন। ম্যারেজ কমপিউটার সেটা অনুমোদন করেনি।

এক দেড় কোটি মাইলের মাথায় হঠাৎ বাঁয়ের টানটা টের পেল শুভব্রত। ট্র্যাজেকটরি বদলে যাচ্ছে এটা সেনসর দেখে বুঝতে পেরেই প্রমাদ গুনল সে। পুলিশটা বলেছিল ডাইনে ঘেঁষে যেতে। বাঁয়ের আকাশটা ভিউ ফাইন্ডারে দেখে নিল সে। অনেকটা জায়গা জুড়ে একটা অন্ধকার বিকট শূন্যতা যেন। গ্রহ নক্ষত্র কিছু নেই। একটা অতিকায় ব্ল্যাক হোল ওত পেতে আছে। টানছে। ভীষণ টানছে। শুভব্রতর এ অভিজ্ঞতা নতুন। সে ভয়ে ঘামতে লাগল। একটা এস ও এস পাঠাবে কিনা স্থির করতে পারছিল না।

কন্ট্রোল প্যানেলে একটা অ্যান্টি-গ্রাভিটেশন প্রোজেকশন সুইচ দেখতে পেল সে। অজানা গ্যাজেট। সে সুইচটা টিপল, তারপর গাড়িটাকে ডানধারে ঘোরানোর চেষ্টা করতে লাগল। ব্যাঙের মতো একটা অতিকায় লাফ মাল গাড়িটা। তারপর একটা বেমক্কা ঘুরপাক খেয়ে কিছুক্ষণ চরকির মতো ঘুরতে লাগল। তারপর অতি ধীরে ধীরে ব্ল্যাক হোলের ক্ষীণ ক্ষেত্রটি থেকে বেরিয়ে এল। আর একটু হলেই হয়েছিল আর কি।

হঠাৎ প্যানেলের ছোট পর্দায় একটা মুখ ভেসে উঠল।পুলিশের রাগি মুখ। পেল্লায় গোঁফ, কটমটে চোখ। লোকটা ধমকে উঠল, কী করছেন আপনি বলুন তো! রাস্তাঘাটের নিয়ম মেনে চলছেন না কেন?

শুভব্রত আমতা আমতা করে বলল, ব্ল্যাক হোলটা খেয়াল করিনি।

এ রাস্তায় সব সময় অন্তত এক কোটি মাইল ডাইনে চেপে চলতে হয়। আর একটু হলেই খরচা হয়ে গিয়েছিলেন মশাই। এই ব্ল্যাক হোলটা বহুৎ খতরনাক আছে।

শুভব্রত একটা কম্পিত শ্বাস ফেলে বলল, এখন নিরাপদ তো?

আর একটু ডাইনে চেপে যান। হ্যাঁ, হয়েছে। ওই ব্ল্যাক হোলটার টান আটকানোর জন্য এদিক দিয়ে একটা বেড়া দেওয়া হয়েছে। শব্দ দিয়ে তৈরি বেড়াটা হয়ে গেলে আর কোনও ভয় থাকবে না।

শুভব্রত আরও এক কোটি মাইল সরে গেল। ডাইনে চেপে থাকাই ভালো।

মুখটা এখন আর পর্দায় নেই। কিন্তু তার বদলে একটা লম্বা ছিপনৌকোর মতো কালো জিনিসকে তার গাড়ির দিকে তীব্রভাবে এগিয়ে আসতে দেখা যাচ্ছিল। আকাশ-দস্যু নাকি? সে শুনেছে, আকাশ-দস্যুদের যান এরকম চেহারারই হয়ে থাকে। শুভব্রত আবার ঘামতে লাগল। দু বোতল সোমরাজ রয়েছে তার কাছে। ব্যাটারা না কেড়ে নেয়। শুভব্রত কন্ট্রোল প্যানেলটা ভালো করে দেখল। সব সুইচ বা কন্ট্রোল তার চেনা নয়। এত অত্যাধুনিক গাড়ি সে কখনও চালায়নি। দেখল একটা সুইচের গায়ে লেখা আছে, ক্যামোফ্লোজ। সে কিছু না ভেবেই সুইচটা টিপে দিল।

কী যে হল তা বুঝতে পারল না শুভব্রত। তবে হঠাৎ তার গাড়ির চারধারে যেন ধোঁয়ার মতো কিছু একটা ঘনিয়ে উঠল। মনিটরে দেখা গেল ছিপনৌকো-যানটি হঠাৎ থমকে, তারপর একটু ইতস্তত করে হঠাৎ দিক পাল্টে অন্যদিকে ছুটতে লাগল।

অমরির মুখে একটা থানা আছে। গ্রহটার নাম প্রহরী। সেইখানে কয়েক মিনিটের জন্য থাকতে হল তাকে। চারশো তলা উঁচু, দশ মাইল লম্বা একটা বাড়ির হাজার হাজার ঘরে মহাকাশের সব রকম খবরাখবর নেওয়া হচ্ছে। একজন ব্যস্ত পুলিশ অফিসার তাকে একবার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বললেন, আপনি তো একজন বড়বাবু? অমরিতে যাচ্ছেন কেন? ওটা তো বড়লোকদের জায়গা।

একটা কাজে যাচ্ছি।

অ। বলে তার কাগজপত্র ফেরত দিয়ে বললেন, কাস্টমস চেক আছে কিন্তু। বাইপাস করলে অ্যারেস্ট হয়ে যাবেন। অমরিতে কোনও খাদ্য বা পানীয়ের প্রবেশ নিষেধ। কিছু নেই তো সঙ্গে?

আজ্ঞে না।

শুভব্রত ফের গাড়ি ছাড়ল। স্ক্যানারের সুইচ অন করে দিল। সামনের আকাশের সব কিছু খুঁটিয়ে দেখে নিতে হবে। শুভব্রত দেখতে পেল, অমরির আকাশে বিচিত্র সুন্দর সব শাম্পান, ভেলা, বজরা আর জাহাজের মতো প্রমোদতরণী ভেসে বেড়াচ্ছে। বড়লোকদের যানবাহন। সামনেই কাস্টমস বেরিয়ার। একটা অতিকায় কৃত্রিম উপগ্রহ, তার ভিতর দিয়ে একটা দীর্ঘ টানেল চলে গেছে।

টানেলে ঢুকলে চারপাশ থেকে হাতির শুঁড়ের মতো যান্ত্রিক হাত বেরিয়ে এসে মহাকাশযানগুলোকে পরীক্ষা করতে থাকে।

শুভব্রত ফের ঘামতে লাগল। দু বোতল সোমরাজ অনেক খরচ করে জোগাড় করতে হয়েছে।

কিন্তু তার ভাগ্য আজ সুপ্রসন্ন। টানেলে আজ অনেক অনেক গাড়ি। জ্যাম হয়ে আছে। শুঁড়গুলো ভারি ব্যস্ত। তার ডিসপ্লেতে একটা সন্দেহকুটিল মুখ ভেসে উঠল, কী মশাই, কিছু এনেছেন নাকি?

কাঁপা গলায় শুভব্রত বলে, আজ্ঞে না।

খাবারদাবার বা পানীয় কিছু।

আজ্ঞে না। আমার নিজের জন্য খাবার আর জল ছিল, তা খেয়ে ফেলেছি। একটু জল আছে।

খুব সাবধান। অমরিতে বাইরের খাদ্য-পানীয় ঢোকা একদম বারণ। যান চলে যান। সামনেই বুন নামে যে গ্রহটা আছে সেখানেই গাড়ি পার্ক করবেন।

হাফ ছেড়ে বাঁচল শুভব্রত। সাবধানে জ্যাম কাটিয়ে বেরোতে বেরোতে দেখতে পেল, অনেকগুলো গাড়ি স্মাগলিং-এর দায়ে ধরা পড়েছে। শুঁড়গুলো সেগুলোকে পাকড়াও করে বড় বড় দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকিয়ে

নিচ্ছে।

সামনে হঠাৎ অন্ধকার কেটে নীলাভ আকাশের বিকীরণ দেখা গেল। সত্যিই অমরির আকাশের কোনও তুলনা নেই। নীল রংটার ওপর দিয়ে যেন একটা আবছা ময়ূরকণ্ঠীর প্রলেপ বোলানো হয়েছে। তাতে আকাশটা হয়েছে ভারি চিত্রল, ভারি সুন্দর।

অমরির পার্কিং লট হল বুন। এ গ্রহটির ফান্ডা দেখেই তাক লেগে যায়। কী ঝকমকে স্ফটিকে তৈরি রাস্তাঘাট, কী অসাধারণ সব নির্মাণ। লক্ষ লক্ষ স্লট চারদিকে সাজানো। নামবার আগেই বুন থেকে তার স্লট নম্বর বলে দিল এবং একটা চৌম্বক রশ্মি তার গাড়িটাকে লুফে নিয়ে ধীরে ধীরে একটা স্লটে পুরে দিল। গাড়ি থেকে বেরোতেই চলমান রাস্তা। সেটা ধরে মাইলটাক একটা হলঘরের ভিতর দিয়ে বয়ে গেলে খেয়া স্টেশন। বহু মানুষ জড়ো হয়ে আছে। বেশ একটা অভিজাত নীরবতা বিরাজ করছে। খেয়ায় উঠবার জন্য লাইন দিতে হল। প্রথমটায় উঠবার সুযোগ হল না। দ্বিতীয়টায় উঠতে পারল শুভব্রত। লম্বা রকেটের মতো জিনিস। বসবার জায়গা চমৎকার। কিন্তু বসার সিট ভর্তি থাকায় শুভব্রতকে দাঁড়িয়েই থাকতে হল। তবে মাত্র দু মিনিটের ব্যাপার। রকেটটা সোঁ করে বুন থেকে ছেড়ে ঝম করে অমরিতে নেমে পড়ল।

বাইরে এসে মুগ্ধ হয়ে গেল। এ যে ধনীর দেশ তো এক পলকেই বোঝা যায়। সামনেই একটা হীরে আর মুক্তোর ফোয়ারা। দুটো ফোয়ারার একটা দিয়ে লক্ষ লক্ষ হীরের টুকরো, অন্যটা দিয়ে মুক্তোর দানা উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে। তাদের ওপর ফেলা হচ্ছে বিচিত্র আলোর বর্ণালী। চোখ ধাঁধিয়ে যায়। সোনার মসৃণ পাতে মোড়া হলঘরের মেঝে। দেয়ালে দেয়ালে বিশ্ববিখ্যাত সব তৈলচিত্র। দোয়ালগুলো কীসের তৈরি তা সে জানে না। কিন্তু দেয়ালগুলো থেকে একটা বিচ্ছুরণ হচ্ছে।

বাইরে এসে কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়াল শুভব্রত। বাতাস এত পরিষ্কার, এত সুঘ্রাণ হয়! একবার শ্বাস নিতেই যেন ভিতরটা পরিষ্কার হয়ে গেল। অমরিতে চারদিকে ফুল আর ফুল। ফুলবনের ভিতর লাল মোরামের রাস্তা শালবনের গভীরে চলে গেছে। টিলা, উপত্যকা, রঙিন মেঘ, বর্ণালির আকাশ, নানা চাঁদের বিচিত্র আলো, বিম নামক নক্ষত্রের মণ্ডলে এই গ্রহটি সত্যিই তুলনাহীন। উঁচু বাড়ি নেই, কারখানা, শব্দের দূষণ নেই। যেন এক ছবির জগৎ। শান্ত, সমাহিত।

অমরির হোটেল এতই দামি যে, এক রাত্তিরও সেখানে বসবাস করার ক্ষমতা নেই শুভব্রতর। সে কাজ সেরে চটপট ফিরে যাবে।

স্যামসন সাহেব থাকেন দক্ষিণ সমুদ্রের ধারে একটি কুটিরে। মাটির শব্দহীন সুড়ঙ্গপথে নিঃশব্দে চলে কাচের তৈরি রেলগাড়ি। সেই গাড়িতে চড়ে কয়েক মিনিটের মধ্যে যথাস্থানে পৌঁছে গেল সে।

কুটিরখানা অবাক হয়ে দেখার মতো। একটু পুরোনো ধাঁচে তৈরি, কিন্তু এত নিখুঁত আটচালা দেখাই যায় না আজকাল। কুটিরের চাল অবশ্যই কাচতন্তু ও মহার্ঘ ধাতুর মিশ্রণ। চারদিকে গাছপালার বাগান। একটা পরিখা ঘিরে আছে চারদিকে।

স্যামসন সাহব সামনের লন-এ বসে আছেন। পেল্লায় চেহারা। এখন একশো বারো বছর বয়স চলছে। তাকে দেখে খটোমটো ইংরিজিতে ধমকে উঠলেন, কী চাই এখানে?

পেটকোঁচর থেকে বোতল দুটো বের করে শুভব্রত বলল, আমি পঞ্চশর সেকশন ইনচার্জ শুভব্রত গুপ্ত।

অ। তুমি তো বদলি হয়েছ!

আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু বদলিটা আমি চাই না।

সাহেব তার হাতের বোতল দুটোর দিকে চেয়ে ভ্রু কুঁচকে বললেন, কোথায় পেলে?

আপনার জন্যই এনেছি।

সাহেব চারদিকটা দেখে নিয়ে চটপট বোতল দুটো ঢুকিয়ে ফেললেন চেয়ারের তলায়। একগাল হেসে বললেন, অমরিতে মানুষ থাকে না, বুঝলে! শুধু বড়লোক থাকে। পাঁচ হাজার বছরের আয়ু কিনে বসে আছি, কিন্তু এতগুলো বছর কাটাবো কী করে বলো তো! ব্যাটারা সব হেলথ ফুড খাওয়ায়।

কেন স্যার, নাচ-গান নেই? নাটক সিনেমা?

সব আছে। কিন্তু বড্ড একঘেয়ে। এখন ভাবছি পাঁচ হাজার বছরের আয়ু না কিনে পাঁচশ বছরের কিনলেই হত। যাকগে, তুমি তা হলে বদলি চাও না?

আজ্ঞে না।

কেন, বাঙালি ইউনিয়ন করবে নাকি? পঞ্চশরটাকে তো প্রায় বাংলাদেশ বানিয়ে ছেড়েছ।

ও জায়গা ছাড়তে ইচ্ছে করছে না।

তা হলে বিয়ে কর।

কমপিউটারে পাত্রী পাওয়া যাচ্ছে না।

তাহলে বদলি আটকাবে কী করে?

সেইজন্যই আপনার কাছে আসা।

দাঁড়াও। পাত্রী পাওয়া যাচ্ছে না এটা কোনও কথাই নয়। তার ওপর তুমি বাঙালি। ইতিহাসে বলে যে বাঙালি খুব বিবাহ-প্রবণ জাতি। ঠিক আছে, আমার সঙ্গে এসো।

স্যামসন তাকে ঘরে নিয়ে এলেন। বিশাল হলঘর। সেখানে একটা মস্ত পিয়ানোর মতো দেখতে সুপ্রিম কমপিউটার। এই যন্ত্র জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সবই করতে পারে।

স্যামসন কমপিউটার চালু করে বললেন, কমপিউটাররা গাধা। বুঝলে?

না।

কমপিউটার মস্তিষ্কবান, কিন্তু হৃদয়বান নয়। আমি এগুলোর ওপর নির্ভর করি না। তবু দেখছি তোমার জন্য সত্যিই কেন কোনও পাত্রী নেই।

অনেকক্ষণ ধরে কমপিউটার পরীক্ষা করে স্যামসন বললেন, তোমার কপালটাই খারাপ দেখছি। কিন্তু কমপিউটারে সব পাত্রীর খবর থাকে না। অনেক মেয়ে নিজের খবর কমপিউটারকে দেয় না। কারণ তারা বিবাহে আগ্রহী নয়। দাঁড়াও, সেসব মেয়ের খোঁজ নিচ্ছি।

খানিকক্ষণ তথ্যাবলী বিশ্লেষণ করে স্যামসন বললেন, একটা মেয়ের খোঁজ পাচ্ছি। কমপ্যাটিবল। নাম জুলিয়া সেনগুপ্ত।

শুভব্রত নিরাসক্ত গলায় বলে, ও।

স্যামসন একটা চাবি টিপতেই ঝম করে জুলিয়া সেনের চেহারা ভেসে উঠল পর্দায়। সে চেহারা দেখে আর নিরাসক্ত থাকতে পারল না শুভব্রত। দেখতে ভারি মিষ্টি।

স্যামসন আবার একটা চাবি টিপলেন এবং নানারকম হিসেব কষতে লাগলেন।

কী দেখছেন স্যার?

স্যামসন একটা শ্বাস ছেড়ে বললেন, হবে।

কী হবে?

জুলিয়া সেনগুপ্ত তোমার কমপ্যাটিবল। কিন্তু বিয়েতে আগ্রহী নয় বলে তাকে কমপিউটারের পাত্রীর গ্রুপে ফেলা হয়নি।

তা হলে আর কী হবে!

বলছি তো হবে। মেয়েটা কাছাকাছি থাকে। অমরির দক্ষিণ আকাশে প্রিয়ম নামে যে চাঁদটা আছে, দেখেছ? ওই চাঁদে থাকে। ঠিকানা দিচ্ছি। চলে যাও।

শুভব্রত ভয় পেয়ে বলে, না স্যার। আমি পারব না।

তা হলে বদলি আটকাবে কী করে? ঘাবড়াচ্ছ কেন? যদি মেয়েটা তোমাকে দেখে রাজি হয় তা হলে বাকিটা সহজ। যাও। চাঁদটার নাম প্রিয়ম, মনে রেখো। ঠিকানাটা টুকে নাও।

অমরিতে দিন আর রাতের বিশেষ তফাত নেই, সবসময়েই দিন, আবার সবসময়েই রাত্রি। চার-পাঁচ ঘণ্টা দিন, তারপরই চাঁদে চাঁদে প্লাবিত আকাশে রাত্রি আসে। বোঝা যায় না। এখানে দিন রাতে লোকে রুটিন মেনে চলে না। যে যখন খুশি খায়, ঘুমোয় বা মর্নিং ওয়াক করে।

স্যামসনের তাড়া খেয়ে শুভব্রত যখন প্রিয়মে এল তখন চমৎকার একটা গোধূলি চলছে। প্রিয়ম গ্রামীণ গ্রহ। এখান থেকে অমরিতে দুধ আর দুগ্ধজাত যাবতীয় জিনিস সরবরাহ হয়। চারদিকে গোশালা। মেঠো পথ, বনজঙ্গল, ডোবা, গরুর গাড়ি সবই আছে। ইচ্ছে করেই চাঁদটিকে সুসভ্য করা হয়নি। বড়লোকদের তো গ্রামেও বেড়াতে ইচ্ছে হয়।

গ্রামের নাম সুতানুটি। অমরি থেকে ভাড়া করা যে ভেলাটি এনেছিল শুভব্রত সেইটে করে গ্রামটি খুঁজে পেতে দেরি হল না। বাড়ির সামনে হাজির হয়ে দেখল, মাটির একটি স্নিগ্ধ ফুলের গন্ধ। ঝিঁঝিঁ ডাকছে। সন্ধে হয়ে গেছে।

সে দরজার কাছে এসে দাঁড়াল।

একটি মিষ্টি গলায় কে যেন বলল, কে?

শুভব্রতর বুক ঢিবঢিব করছে। সে জবাব দিল না।

একটি মেয়ে একটি মাটির প্রদীপ হাতে ধীরে ধীরে এগিয়ে এল। তারপর ধীর হাতে প্রদীপটি তুলে ধরে তাকে দেখল। কী অপরূপা মায়াময় দুখানা গভীর চোখ! যেন বহু জন্মের অপরিচয় আর বিস্মৃতি মুছে ফেলে হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠল। যেন চোখ দু'খানা বলে উঠল, এতদিন কোথায় ছিলেন? পরমুহূর্তেই প্রদীপটি তার কম্পিত হাত থেকে পড়ে নিবে গেল। যুবতীটি ত্রস্ত পায়ে পালিয়ে গেল ভিতরে।

শুভব্রত একটা শ্বাস ছাড়ল। সে ঠিক জায়গাতেই এসেছে।

# কুসুমপুর

লোকটিকে সুবল চৌধুরী চেনে না। লোকটা পরিচয়ও দিতে চায় না, কিন্তু রোজই সকালের দিকে আসছে।

সুবলের অবস্থা ভালো নয়। চাকরি-বাকরি পায়নি, বেকার বসে বসে দাদার অন্ন ধ্বংস করছে। দাদা আর বউদি তাকে মোটেই ভালো চোখে দেখে না। বউদি তো দিনরাত নানারকম ঠেস দিয়ে কথা বলে। বিধবা মা আছেন বটে, কিন্তু মায়ের অবস্থাও সুবলের মতোই। এ সংসারে সুবল বা তার মা কেউই অভিপ্রেত নয়।

সুবল ভোরবেলা ওঠে, ব্যায়াম করে, দৌড়োয়। খেলাধুলোয় সে বেশ ভালো। কলেজের টিমে ফুটবল আর ক্রিকেট খেলত। কিন্তু এই মফঃস্বল কুচবিহার শহরে থেকে খেলাধুলোর জোরে চাকরি পাওয়াও খুবই কঠিন। একটা যেমন-তেমন চাকরির জন্য সে যে-কোনও জায়গায় যেতে প্রস্তুত। কিন্তু কেউ তো ইনটারভিউতেও ডাকে না। বি.এ পাশের সার্টিফিকেটটা বাজে কাগজের পর্যায়ে নেমে গেছে।

ভোর রাতে সে যখন দৌড়োয় তখন ফেরার পথে রথতলার কাছে লোকটাকে দেখতে পায়। গত আট-দশ দিন যাবৎ দেখছে। র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে লম্বা রোগা চেহারার লোকটা দাঁড়িয়ে থাকে। মাথায় একটা কান-ঢাকা টুপি, হাতে একটা বাক্সের মতো জিনিস। তাকে খুব লক্ষ্য করে। লোকটার এই আচরণ একটু সন্দেহজনক।

একদিন সে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল লোকটার সামনে। বলল, ও মশাই, আপনি রোজ ভোরবেলায় এখানে দাঁড়িয়ে থাকেন কেন বলুন তো?

লোকটা যেন একটু থতমত খেয়ে খরখরে গলায় বলল, এমনি দাঁড়িয়ে থাকি।

আপনাকে তো এ পাড়ায় আগে কখনও দেখিনি। কোন বাড়িতে থাকেন?

লোকটা বড় বড় দাঁত দেখিয়ে একটু হেসে বলে, এই নীলুদের বাড়িতে এসেছি। সম্পর্কে নীলুর কাকা হই।

বাড়ি কোথায়?

কুসুমপুরে।

সেটা আবার কোথায়?

তা দূর আছে।

দুপুরবেলা নীলুর সঙ্গে দেখা হওয়ায় সুবল বলল, হ্যাঁ রে, তোর কে এক কাকা এসেছে, তার কি মাথায় একটু ছিট আছে?

নীলু অবাক হয়ে বলল, কাকা আবার কে?

আজ সকালেই তো দেখা হল। বলল, কুসুমপরে বাড়ি, তোর কাকা।

কুসুমপুর নাম এই প্রথম শুনলাম। কেউ তোকে গুল ঝেড়েছে। আমার কাকাই নেই। পাঁচটা জ্যাঠা।

রোগা, খুব লম্বা চেহারা।

দূর! ওরকম কাউকে চিনি না।

সুবল একটু ধন্ধে পড়ে গেল। লোকটা মিথ্যে কথা বলল কেন? পাজি লোক তো!

টুপু নামে একটি মেয়েকে সুবলের খুব পছন্দ। টুপু স্কুলে পড়ে, মাত্র পনেরো বছর বয়স। বড়লোকের মেয়ে এবং খুব দেমাক। সুবলের দিকে ফিরেও চায় না। সুবল টুপুর স্কুলের যাতায়াতের পথে একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে টুপুকে দেখে। কী সুন্দর দেখতে টুপু! ফর্সা, দীঘল চেহারার মুখখানা খুব মিষ্টি, কিন্তু টুপুর কাছাকাছি যেতেও তার ভয় করে। একবার কথা বলতে গিয়েছিল, টুপু এমন কঠিন চোখে তাকিয়েছিল যে ভয়ে তাকে পালিয়ে আসতে হয়।

আজও একটা ঝোপের আড়াল থেকে বিকেলে সুবল টুপুকে দেখছিল। মুগ্ধ চোখ, মুগ্ধ মন। বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। নাঃ, টুপুকে নিয়ে স্বপ্ন দেখার অধিকারও তার নেই।

হঠাৎ কাঁধে একটা টোকা পড়তে চমকে ওঠে সুবল। তাকিয়ে দেখে পিছনে সেই মিথ্যেবাদী লোকটা দাঁড়িয়ে আছে। গায়ে র‍্যাপার, মাথায় কান-ঢাকা টুপি, হাতে বাক্স। বড় বড় দাঁত বের করে হাসছে।

সুবল বলল, আপনি তো নীলুর কাকা নন! তবে মিথ্যে কথা বলেছিলেন কেন?

লোকটা সে কথার জবাব না দিয়ে বলল, ওই সুন্দরপানা মেয়েটার নামই বুঝি টুপু?

হ্যাঁ। তাতে আপনার কী?

না, এমনি তোমাদের দুটিতে বেশ মানায়।

সুবল লজ্জা পেয়ে বলল, ওসব কথা থাক। আমি বেকার। আপনার মতলবটা কী বলুন তো?

এই তোমাদের জায়গাটা ঘুরে ফিরে দেখছি। বড্ড নোংরা জায়গা, বাতাসে অনেক ময়লা।

তাহলে আমেরিকায় গিয়ে থাকুন গে, এদেশে থাকতে বলেছে কে?

আমেরিকা? সেখানেও গিয়েছিলুম। গোটা পৃথিবীই ঘুরে দেখেছি। সব জায়গাই নোংরা।

লোকটা ফের গুল মারছে। সুবল শুধু বলল, হুঁঃ, যত্ত সব!

সুবল চলে যায় দেখে লোকটা হঠাৎ সরু হাত বাড়িয়ে খপ করে সুবলের ডান হাতটা চেপে ধরে বলল, ওহে, আমাদের দেশে যাবে? খুব ভালো দেশ।

সুবল অবাক হয়ে দেখল, লোকটা রোগা এবং বয়স্ক হলে কি হয়, গায়ে হাতির মতো জোর। তার হাতটা আলতোর ওপর ধরেছে বটে, কিন্তু মুঠো থেকে হাতটা সে নড়াতে পর্যন্ত পারল না। অথচ সে একজন নাম-করা স্পোর্টসম্যান।

সুবল অবাক হয়ে বলল, আপনার গায়ে তো দারুণ জোর।

লোকটা লজ্জা পেয়ে হাতটা ছেড়ে দিয়ে বলল, তা বটে। তোমার লাগেনি তো!

না। কিন্তু কোথায় যাওয়ার কথা বলছেন? কুসুমপুরে?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব ভালো জায়গা।

চাকরি দেবেন?

চাকরি? কেন চাকরি কেন?

চাকরি পেলে আমার দুঃখী মাকে নিয়ে সব জায়গায় যেতে পারি।

শুধু মা! টুপু নয়?

কী যে বলেন! কোথায় টুপু, কোথায় আমি!

কাল খুব ভোরে রোদ ফোটার আগে নীলকুঠির মাঠে আসতে পারবে মাকে নিয়ে?

সেখানে কেন?

তোমাকে কুসুমপুরে নিয়ে যাবো। কোনও অভাব থাকবে না, দেখো।

কিন্তু আপনি তো গুলবাজ।

না হে না, কখনও কখনও নিরাপত্তার জন্য সত্য গোপন করতে হয়। এখন যা বলছি তা নির্যস সত্যি।

আমাকে নিয়ে গিয়ে কী হবে? কাজ করাবেন?

লোকটা ভ্রূ কুঁচকে বলল, কাজ মানে সে ভারি মজার কাজ। খাবে দাবে ফূর্তি করবে। কোনও অভাব থাকবে না।

আপনার কথা আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।

একবার বিশ্বাস করেই দেখ না কী হয়। তাহলে ওই কথাই রইল, কাল ভোর হওয়ার আগেই নীলকুঠিতে চলে আসছ মাকে নিয়ে। আর শোনো, জিনিসপত্র আনার দরকার নেই। জিনিসপত্র সব আমরা দেব।

সুবলের খুবই ধাঁধা লাগছিল। লোকটা গুলবাজ সন্দেহ নেই, হয়তো পাগলও। তবু একবার দেখতে ক্ষতি কী?

কঠিন হল মাকে রাজী করানো। একটু ভেবে বলল, বেশ। কিন্তু এবার যদি গুল মেরে থাকেন তাহলে কিন্তু মুশকিল আছে।

লোকটা হাসল, বলল, ভয় নেই, গুল মারছি না।

সুবল মাকে ভুজুং-ভাজুং দিয়ে রাজী করাল। বলল, নীলকুঠির কাছে এক তান্ত্রিক এসেছে, ভোরবেলা মাকে সঙ্গে নিয়ে গেলে সেই তান্ত্রিক ধুলোপড়া দিয়ে ভাগ্য ফিরিয়ে দেবে। মা কথা শুনে রাজী হল।

পরদিন ভোরবেলা মায়ে-পোয়ে নীলকুঠির মাঠে হাজির হয়ে দেখল লোকটা সত্যি দাঁড়িয়ে আছে। মুখে হাসি। এমনকি লোকটার পিছনে একখানা পুরনো মডেলের মোটরগাড়িও রয়েছে। লোকটা পিছনের দরজা খুলে বলল, উঠে পড়ো। আর সময় নেই।

সুবল মাকে নিয়ে গাড়িতে উঠে পড়তেই লোকটা গাড়ি ছেড়ে দিল। তারপর যে কী হল তা আর সুবলের মনে নেই। গাড়িটা একটা ঝাঁকুনি দিয়ে চলতে শুরু করতেই তার চোখ অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল।

যখন চোখ মেলল তখন সুবল ভীষণ অবাক। একখানা চমৎকার মাটির দাওয়ায় খাটিয়ার ওপর সে শুয়ে আছে। চারদিকে ভোরের আলোয় কত গাছপালা, লতাপাতায় ছাওয়া বাগান দেখা যাচ্ছে। গাছে গাছে ফল আর ধরে না, অজস্র পাখি ডাকছে। আর আবহাওয়া অতি মনোরম, শীতও না গ্রীষ্মও না।

উঠোনের অন্য ধারে আর একটা কুটিরের দাওয়ায় সুবলের মাও উঠে বসে চারদিকে হাঁ করে চেয়ে দেখছে।

ও সুবল, এ কোথায় এলুম রে বাবা?

কি জানি মা! লোকটা তো বলল কুসুমপুর।

তা না হয় হল, কিন্তু এসব গাছপালা যে জন্মেও দেখিনি। এসব কী গাছ বল তো?

জানি না তো!

পাখি যে এমন সুরেলা গলায় ডাকতে পারে তাও জানা ছিল না। এমন পাখির ডাক শুনিনি তো কখনও।

সুবলও শোনেনি। সে উঠোনে নেমে চারদিকটা ঘুরে দেখল। মখমলের মতো ঘাস, আকাশে কী সুন্দর সব সোনালী রুপোলী মেঘ। একটু দূরে দূরে একখানা করে কুটির আর গাছপালা। চোখ জুড়িয়ে যায়। সামান্য দূরে ছোট্ট একটা পাহাড়। পাহাড়ের তলা দিয়ে কুলকুল করে নদী বয়ে যাচ্ছে।

সুবল কুটিরের ভিতরে ঢুকে তাজ্জব হয়ে গেল। কী সুন্দর করে সব গুছিয়ে রাখা! পরিপাটি বিছানা, ওয়ার্ডরোব, আলমারি, রেডিয়ো, টিভি সেট, ওয়ার্ডরোবে থরে থরে জামাকাপড় সাজিয়ে রাখা, একখানা ফ্রিজের মতো জিনিসও রয়েছে। খুলে দেখল তাতে নানারকম খাবার আর পানীয় দ্রব্য রয়েছে।

ও মা! এ আমরা কোথায় এলুম।

সে তো জানি না বাছা। তান্ত্রিকের কাজ। কে জানে কী হবে!

লোকটা আরও ঘণ্টাখানেক পরে এল। মুখে তেমনি হাসি, কী, কেমন লাগছে?

সুবল বড় বড় চোখে চেয়ে বলল, মশাই, এটা কেমন জায়গা বলুন তো! গাছপালাগুলো তো চেনা লাগছে না।

লোকটা খুব হাসল। হেসে বলল, লাগার কথাও নয় কিনা। কিন্তু কুসুমপুর অপছন্দের জায়গা নয় তো?

না। খুবই পছন্দের জায়গা। তবে অদ্ভুত।

লোকটা মাথা নেড়ে বলে, আমাদের কুসুমপুরের মতো জায়গা কমই পাবে। তোমাদের পৃথিবী থেকে দশ আলোবছর দূরে এই জায়গা, বুঝলে?

সুবল হাঁ হয়ে গেল। বলে কী লোকটা? পাগল নাকি?

লোকটা মাথা নেড়ে বলে, বিশ্বাস হচ্ছে না তো! ক'দিন থাকো, তখন বুঝতে পারবে।

সুবল বলল, তার মানে কি গ্রহান্তরে চলে এসেছি আমরা?

বটেই তো! তবে তোমাদের একটা সূর্যকে ঘিরে মাত্র কয়েকটাই গ্রহ। আমাদের সূর্য কিন্তু অনেক বড়। আমাদের সূর্যের নাম কুসুম, তার পাঁচ হাজার গ্রহ আছে। এই পাঁচ হাজার গ্রহের মধ্যে চার হাজার গ্রহেই প্রাণ আছে। বাকি এক হাজার গ্রহে আমরা প্রাণের চাষ করিনি। নানারকম খনিজ পদার্থের জন্য রাখা আছে। কয়েকটা গ্রহকে আমরা গুদাম হিসেবে ব্যবহার করি।

আমার যে মাথা ঘুরছে এসব শুনে। আমার মা যদি শুনতে পায় তো হার্টফেল করবে।

মা অবশ্য শুনতে পেল না। বাগানে ঘুরে ঘুরে নানা শাকসব্জি আর ফল-পাকুড় দেখছিল।

লোকটা বলল, কোনও ভয় নেই। আমাদের আবহাওয়া খুব ভালো, তাছাড়া আমাদের হাতে এমন সব ওষুধ আছে যাতে কেউ মরে না।

সত্যি?

লোকটা মাথা নেড়ে বলল, আমার বয়সই তো ধরো না কেন ত্রিশ হাজার পাঁচশো এক বছর।

ফের গুল?

না হে না, গুল নয়। সত্যিই তাই। তবে কি জানো আমরা সব অমর হয়ে রয়েছি বলেই আমাদের আর সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা নেই। যারা আছি তারাই আছি। কেউ মরেও না, কেউ জন্মায়ও না। বড় একঘেয়ে। সেইজন্যই তো তোমাকে আনা।

তার মানে?

তুমি নতুন মানুষ, মরণশীল। তোমার সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা আছে। তুমি আমাদের এই গ্রহে শিশুর কান্না শোনাবে।

বলেন কী?

সেইজন্যই তোমাকে এনেছি। অনেক হিসেব-নিকেশ করেই এনেছি। তোমার বংশলতিকা, স্বাস্থ্য, স্বভাব সব ক'দিন ধরে যন্ত্র দিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখে তবেই এনেছি।

আমার মাকে আনলেন কেন?

মাকে না আনলে তুমি উদ্বেগে থাকতে। তোমার দাদার কাছে মা তো আদর-যত্ন পেত না। যাতে তুমি নিশ্চিন্ত হতে পারো সেইজন্যই মাকে আনা। তোমরা এখানে সুখেই থাকবে।

আর আমার চাকরি?

এখানে কাউকে চাকরি করতে হয় না। আমাদের এত আছে যে কিছুই ফুরোয় না। অভাব বলে কিছু নেই। তবে সবাইকেই কিছু কিছু কাজ করতে হয়।

আপনারা কি আমার বিয়ে দেবেন?

অবশ্যই। খুব ধুমধাম করে বিয়ে হবে।

কিন্তু আপনাদের এখানে মেয়েদেরও তো অনেক বয়েস।

তা বটে। তবে তারা দেখতে একদম যুবতীর মতো। এখানে বয়স হয়, কিন্তু কেউ বুড়ো হয় না। তবে তোমার ভয় নেই। এই গ্রহের মেয়েদেরও সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা নেই। তুমি তাদের বিয়ে করলেও কোনও লাভ হবে না।

তাহলে?

পাত্রীও আনা হয়েছে।

সুবল হাঁ করে চেয়ে রইল। বলল, কে পাত্রী?

কেন, টুপু!

সুবল প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু হল না, কারণ এই গ্রহে অক্সিজেন এত বেশি যে অজ্ঞান হওয়া কঠিন।

সুবল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, টুপু আমাকে পছন্দ করে না।

লোকটা ফিচিক করে হেসে বলে, তাড়া নেই। রোজ দেখাদেখি, মেশামেশি হতে হতে পছন্দ করে ফেলবে। এই গ্রহের বুড়োদের কথা সেও শুনেছে। তোমার মতো জোয়ান ছেলে এখানে কোথায় পাবে?

সুবল একটা নিশ্বাস ফেলে বলে, কাজটা খারাপ করলেন। এভাবে জোর করে—

লোকটা বলল, অত ভেবো না। মেয়েদের মনের খবর স্বয়ং ভগবানও জানেন না।

তা বটে। বলে সুবল কিছুক্ষণ ঝুম হয়ে বসে রইল। তার মন আর তেমন খারাপ লাগছিল না।

# নির্জন স্টেশনে

রূপনগর স্টেশনটা এমনিতেই ছোট্টো। ব্রাঞ্চ লাইন বলে লোকজনেরও বিশেষ গতায়াত নেই। সন্ধের পর ছোট্ট স্টেশনঘরে কেরোসিনের বাতি জ্বলে। প্ল্যাটফর্মে সে বালাইও নেই। ঝুপসি ঝুপসি গাছে আচ্ছন্ন প্ল্যাটফর্মটায় অন্ধকার যেন ঝুলে ঝুলে দোল খায়। হেমন্তের কুয়াশার ভিতর দিয়ে দূরে সিগন্যালের লাল আলো আকাশপ্রদীপের মতো জ্বলে থাকে। একজোড়া রেললাইন তেপান্তর থেকে তেপান্তরের দিকে উধাও হয়ে গেছে।

হেমন্তেই এই অঞ্চলে শীত পড়ে গেছে। কুয়াশাও যেন গাঢ়।

পিয়াল টিকিট কাটতে গিয়ে দেখল, কাউন্টারে লোক নেই। অনেক ডাকাডাকির পর একজন রোগা বুড়ো মানুষ এসে টিকিট দিল।

পিয়াল শুনেছে, কুসুমপুর যাওয়ার গাড়ি সাতটা কুড়িতে। যটাতেই হোক, পিয়ালের কিছু যায় আসে না। আজকাল সে উদভ্রান্তের মতো কোথায় যাচ্ছে, কী করছে তার কিছুরই ঠিক নেই।

পিয়াল নির্জন অন্ধকার শীতার্ত কুয়াশাছন্ন প্ল্যাটফর্মের একটা বেঞ্চে এসে বসল, সে যে কতখানি ক্লান্ত তা বসবার পরই যেন টের পেল। সারাদিন রোদে রোদে, ধুলোয়,মাঠে ঘাটে কত মাইল ঘুরেছে যে তার হিসেব নেই। মউলি বলে একটা জায়গায় একটা ছোট্ট হোটেলে দুপুরে ভাত খেয়েছিল। এখন সে পেটে খিদের কষ্টও অনুভব করছে। কিন্তু এ সব কষ্ট এখন তার কাছে কিছুই নয়। গত দিন দশেক যাবৎ সে এইরকমভাবেই সাত সকালে কোনও অচেনা জায়গার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ে। তারপর উদভ্রান্তের মতো সারাদিন ঘোরে। রাতে কুসুমপুরে ফিরে যায়। বাড়ির লোকজন, বন্ধুবান্ধব বা পরিচিতদের কাছে মুখ দেখাতেও তার লজ্জা করে।

ঘটনাটা তার পক্ষে লজ্জাজনকই। দিন কুড়ি আগে নীপা নামে একটি মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। মা-বাবার সম্বন্ধ করা মেয়ে। নীপা দেখতে ভারি সুন্দর, ঢলঢলে এবং নম্র স্বভাবের। তাকে ফুলশয্যার রাতে ভারি পছন্দও হয়ে গেল পিয়ালের। কিন্তু মুশকিল হল কেন যেন বড্ড কাঁটা হয়ে থাকছিল নীপা। শরীর ছুঁতে দিচ্ছিল না। কিছু মেয়েলি অজুহাত দেখাল। মিশ খেতে চাইছিল না তার সঙ্গে। মেয়েদের ব্যাপারে পিয়ালের কোনও অভিজ্ঞতাই নেই। সে চিরকাল লেখাপড়া আর খেলাধুলা দিয়ে থেকেছে। মেয়েদের সে একটু এড়িয়েই চলত। ভাবল, মেয়েরা বুঝি এরকমই হয়। থাক, হয়তো সময় লাগবে। দিন দশেক আগে এক রাতে নীপা শোওয়ার ঘরে হঠাৎ কান্নায় ভেঙে পড়ে যা বলল তার মর্মাথ হল, সে একটি ছেলেকে ছেলেবেলা থেকে ভালোবাসে, তাকে ছাড়া...ইত্যাদি।

মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল পিয়ালের। কাউকে ভালোই যদি বাসে তা হলে আর একজনকে বিয়ে করল কেন?

দীপা যা বলল তার অর্থ দাঁড়ায়, ছেলেটা বেকার এবং পাড়ায় সুনাম নেই বলে তার কথা উত্থাপনই করতে পারেনি সে। বাবা আর মায়ের ভয়ে বিয়ে করেছে বটে, কিন্তু এখন বিষ খাওয়া ছাড়া তার উপায় নেই। পিয়াল কি তাকে একটু বিষ জোগাড় করে দিতে পারে? পিয়াল পারেনি, বিষের খবর সে রাখে না, রাখলেও সে নীপাকে মরবার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারত না।

তা হলে উপায়?

উপায় একটাই। পিয়াল তাকে বলল, ওই ছেলেটির সঙ্গেই গিয়ে সে ঘর বাঁধুক, তার আপত্তি হবে না।

প্রদীপ নামে সেই ছেলেটির কাছ অবধি দীপাকে পৌঁছে দিয়ে ফিরে এল পিয়াল। কষ্টে মনটা ভরা, তার চেয়েও বড় কথা নীপাকে তার বড় ভালো লেগেছিল। ব্যাপারটা জানাজানি হতে দেরি হল না। পিয়াল তেমন প্যাঁচালো বুদ্ধির মানুষ নয়। সাজিয়ে বানিয়ে মিথ্যে কথা বলতেও পারে না। কী হয়েছে তা বুঝে বাড়ির লোক তুমুল একটা হই-হট্টগোল বাধিয়ে তুলল। পিয়ালের শ্বশুরবাড়িতেও পড়ে গেল হুলস্থুল।

উদভ্রান্ত পিয়াল তাই গত দশ দিন যাবৎ বাড়ি থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। কী করা উচিত ছিল তার, তা সে জানে না। যা উচিত বলে মনে হয়েছে তাই করেছে। কিন্তু লোকে বলছে অত সহজে নীপাকে ছেড়ে দেওয়া উচিত হয়নি তার। এমনকি নীপার বাবা এসে অবধি বলে গেছে, ওকে জুতোপেটা করনি কেন? জলবিছুটি দাওনি কেন? বিষ চেয়েছিল, তো তাই দিলে না কেন? মরলে আমার হাড় জুড়তো।

বিভ্রান্তিটা আজও পিয়ালের মাথায় ভর করে আছে। গত দশ দিন যাবৎ সে তার মনোহারী দোকানটা খোলেনি। গত দশদিন সে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মেলামেশা করেনি। গত দশ দিন যাবৎ সে শুধু ভোর থেকে গভীর রাত অবধি চেনা জানা পরিবেশ ছেড়ে অচেনা জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

রূপনগর জায়গাটাতেও সে এই প্রথম এল। সারাদিন ঘুরেছে, তবু সে বলতে পারবে না জায়গাটা কেমন। সে কিছুই দেখেনি। সে কিছুই ভালো করে বুঝতে পারছে না আজকাল। স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে কয়েকটা বেঞ্চ রয়েছে। রেলের মজবুত বেঞ্চ। কেউ নেই। তবু প্ল্যাটফর্মের এক প্রান্তে একেবারে অন্ধকার ঝুপসি একটা গাছের নীচে একটা বেঞ্চে ক্লান্ত শরীরে বসে রইল সে। পৌনে সাতটা বাজে, সাতটা কুড়ির ট্রেন আসতে দেরি আছে। না এলেও ক্ষতি নেই। সে বেঞ্চে সারা রাত বসে থাকতে পারবে।

চোখ বুজে ভাবছিল পিয়াল। ভাবনার যেন শেষ নেই, বুকে একটা দাউ দহন যেন সবসময়ে রাবণের চিতার মতো জ্বলছে। লজ্জাটা যেন তারই। তার কোনও দোষ নেই, তবু সবসময়ে নিজেকেই তার অপরাধী বলে মনে হয়। সে আসলে নিজের কাছ থেকেই পালানোর চেষ্টা করছে। পেরে উঠছে কি? বেঞ্চের অন্য প্রান্তে যে আর একটা লোক বসে আছে সেটা সে লক্ষই করেনি। ঘড়ি দেখতে গিয়ে আচমকা নজরে পড়ল। না, পিয়াল চমকাল না, ভয় পেল না, কোনও প্রতিক্রিয়াও হল না। সে বরং মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে ফের চোখ বুজে ভাবতে লাগল। ভাবা মানে মাথার ভিতর যেন এক দীর্ঘস্থায়ী ঘূর্ণিঝড়। তাতে নানা কথা, নানা ঘটনা ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তন্দ্রার মতো এসেছিল। চটকা ভেঙে প্রথমেই লোকটাকে দেখল। অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না। শুধু বোঝা যাচ্ছে, একজন বসে আছে। সে চুপচাপ, লোকটাও চুপচাপ। দুজনেই পাথরের মূর্তির মতো বসে আছে বেঞ্চের দু ধারে। কারও সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করে না পিয়ালের। নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া অচেনা মানুষের সঙ্গে গত দশ দিন কথাই বলেনি সে। কিন্তু মুখে কথা না বললেও তার মনে কিন্তু সর্বদাই নানা কথার বুদ্বুদ তৈরি হচ্ছে, ভেসে আসছে কাল্পনিক সংলাপ, উঠে আসছে নানা বিতর্ক। এ সব কথার বেশিরভাগইটাই হচ্ছে নীপার সঙ্গে। নীপা—যাকে সে ঘটনা না জেনেই খুব ভালোবেসে ফেলেছিল, সেই ভালোবাসা প্রত্যাহার করে নিতে হল বোকার মতো। সম্পূর্ণ প্রত্যাহৃত হলও না সে। সাত সাতটা ঘোড়ার লাগাম টেনে টেনে ফেরানোর চেষ্টা করছে পিয়াল।

যে অন্ধকারে আমাকে ফেলে গিয়েছ, সেই অন্ধকারই কি একদিন গ্রাস করবে না তোমাকেও?

নিজের কণ্ঠস্বর শুনে নিজেই চমকে উঠল পিয়াল। এ কী? সে যে আপনমনে কথা বলছে! পাগলামির লক্ষণ নয় তো? চকিতে সে একবার লোকটির দিকে তাকাল। শুনেছে নাকি? শুনলে খুবই লজ্জার কথা। আর একবার ঘড়ি দেখল পিয়াল। ঘড়ির কাঁটা যেন এক জায়গাতেই থেমে আছে! মাঝে মাঝে সময় কেন যে এত ধীরে চলে কে জানে?

ঘড়ি দেখে ফের চোখ বুজল পিয়াল। সারা দিনের ক্লান্তি ঘুম হয়ে নেমে আসছে চোখে। মেয়েরা তো পৃথিবীর ফুল। নীপা, তুমিই শেখালে আমাকে মেয়েদের ঘেন্না করতে, ভয় করতে। আর কোনও মেয়েকেই কখনও বিশ্বাস হবে না আমার।

ফের চমকে ওঠে পিয়াল! এ কী! এ যে তার নিজের পরিষ্কার কণ্ঠস্বর শুনল সে! হ্যাঁ, সে কথা বলছে, আপনমনে কথা বলছে! লোকটার দিকে ফের তাকাল পিয়াল। পাথরের মূর্তির মতো বসে আছে। বড্ড আবছা দেখাচ্ছে লোকটাকে। এত আবছা যে মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে, ওখানে কেউ নেই, সে ভুল দেখছে। লোকটা কি শুনল তার কথা? ছিঃ ছিঃ, কী লজ্জার কথা!

পিয়াল উঠে পড়ল এবং প্ল্যাটফর্মের আর এক প্রান্তে আরও অন্ধকার একটা কোণে কুয়াশায় ভেজা বেঞ্চে বসল এসে। তার একা থাকা দরকার। জনসমাজে লোকসমক্ষে তার থাকা উচিত নয়। সে একা একা কথা বলছে। লোকে তাকে পাগল ভাববে।

ফিরেই যাবে যদি তবে কেন উন্মোচন করেছিলে এ হৃদয়? কেন ভালোবাসায় ভেসে গিয়েছিল বুক! তুমিই তো! তুমিই তো জিয়নকাঠি ছুঁইয়ে দিয়েছিলে! খুলে দিলে বন্ধ দরজা। অন্য লগ্না, তোমার এ অপরাধ কে ক্ষমা করবে বলো!

আধোঘুম থেকে ফের ধড়মড় করে উঠে বসল পিয়াল। এ সব কী হচ্ছে? কেন কথা কইছে সে?

চট করে বেঞ্চের অন্য প্রান্তে চেয়ে দেখল। দেখে থ হয়ে গেল সে।

কুয়াশায় মাখা প্রগাঢ় অন্ধকারে আবছায়ায় বসে আছে লোকটা! আশ্চর্য! আশ্চর্য! ভালো বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু মনে হচ্ছে, সেই লোকটাই। কালো র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে জড়সড় হয়ে বসে আছে। অবিকল একই রকম দেখাচ্ছে।

মাথাটা বড্ড পাগল পাগল লাগছে পিয়ালের। সে উঠে পড়ল এবং বেঞ্চ বদল করে আর একটা বেঞ্চে গিয়ে বসল। তারপর ক্লান্তিতে চোখ বুজে ঘুমে ঢুকে পড়ল।

আমি আর কোথাও যাই না, কোথাও ফিরি না, আমার রাত নেই, দিন নেই। সময় থেমে আছে, ভিতরে দেখ, ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত যতেক নির্মাণ, ঝড়ে ভেঙে যাওয়া এক জাহাজ যেন অসহায় ভেসে যাচ্ছে স্রোতে। পৃথিবীর সব আলো নিবে গেলে নাকি? উৎসবের শেষে লন্ডভণ্ড বাড়িটাকে দেখেছ, এঁটোকাঁটা নিয়ে নেড়ি কুকুরের খেয়োখেয়ি। আমার ভিতরটা তেমনি এক উৎসব শেষের মণ্ডপ।

তটস্থ হয়ে সোজা হল পিয়াল। স্পষ্টই তার কণ্ঠস্বর। কেন সে কথা বলছে? কেন বলছে? কাকে বলছে?

চকিতে বেঞ্চের অন্য প্রান্তে দৃষ্টিক্ষেপ করল পিয়াল এবং তার শীত করে উঠল, লোকটা বসে আছে নাকি? আছেই তো মনে হচ্ছে! কালো র‍্যাপারে মুড়িসুড়ি দিয়ে ওই তো! লোকটা কি বার বার তার সঙ্গেই বেঞ্চ বদল করে এসে কাছে বসে থাকছে! একটাই লোক! নাকি আলাদা আলাদা?

কে জানে! পিয়ালের মনে হল একা একা কথা বলার চেয়ে বরং কারও সঙ্গে কথা বলাই ভালো। তার ইচ্ছে হচ্ছে না বটে, কিন্তু নিজের কাছ থেকে রেহাই পেতে হলে এটাই একমাত্র পথ।

পিয়াল লোকটার দিকে চেয়ে বলল, আপনি কি রূপনগরের লোক?

খবরটা এল খানিকক্ষণ পরে। ঠিক গলার স্বরও নয়, যেন বাতাসের একটা কম্পনের ভিতরে খুব ফিনফিনে শব্দের আভাষ মাত্র।

লোকটা যেন বলল, না।

তবে আপনি কোথাকার লোক?

তেমনি সংকেতের মতো, বাতাসের ঘনীভূত একটা কম্পনের মতো জবাব এল অনেক দূরের।
এই জায়গায় বুঝি কাজে এসেছেন, নাকি বেড়াতে!
ডিউটি করছি।
ডিউটি! ওঃ, তাই বলুন। কীসের ডিউটি? রেলের?
না।
তা হলে?
নজর রাখছি।
নজর রাখছেন? কী আশ্চর্য! নজর রাখছেন?
হ্যাঁ।
কার ওপর? এখানে তো কেউ নেই?
আপনি আছেন।
আমি! আ-আমি! আপনি কি আমার ওপর নজর রাখছেন?
হ্যাঁ।
কিন্তু কেন?
ওটাই আমার ডিউটি।
আপনি কে?
চিনবেন না।
কে আপনাকে আমার ওপর নজর রাখতে বলেছে?
ডিউটি।
ডিউটি! ডিউটি কথাটার তো মানেই হয় না। কীসের ডিউটি? কার ডিউটি?
ডিউটি শুধু ডিউটিই।
আপনি বললেন নজর রাখছেন। ভালো কথা। তার মানে আমি বিপদে পড়লে বা আত্মহত্যা করার চেষ্টা করলের আপনি আমাকে বাঁচাবেন? নাকি আপনি নজর রাখছেন আমাকে ফাঁসিয়ে দেবেন বলে।
তা জানি না, আমাকে শুধু নজর রাখতে বলা হয়েছে।
কে বলেছে?
জানি না!
জানেন না? না বলতে চাইছেন না?
জানলে বলতে পারতাম।
কবে থেকে নজর রাখছেন?
প্রথম থেকে।
প্রথম বলতে?
জন্ম থেকে।
জন্ম! সে কী!
আমি আর আপনি একই সঙ্গে জন্মেছি।
আপনি আসলে কে?
চিনবেন না।
দম ধরে খানিকক্ষণ বসে থাকে পিয়াল। তারপর বলে, আপনি কি আমাকে চেনেন?
চিনি।
আমি কে?

পিয়াল রায়।
আশ্চর্য! আমার বাড়ি কোথায়?
কুসুমপুর।
আমার বাবার নাম?
হরিবল্লভ রায়।
আপনি কি আমার স্ত্রীর নাম জানেন?
জানি। নীপা রায়।
আপনি কি জানেন আমার স্ত্রী আমাকে ভালোবাসে না। প্রদীপকে বাসে!
জানি।
একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, আপনি সবই জানেন। কিন্তু আমি যে আপনার কিছুই জানি না।
জানবার কিছু নেই।
আপনি আমার সঙ্গেই জন্মেছিলেন?
হ্যাঁ।
আপনার বাড়ি কোথায়?
কোথাও নয়। আপনি যেখানে আমিও সেখানে।
বাঃ বেশ কথা। কিন্তু আমি যে আজই আপনাকে প্রথম দেখলাম।
দেখলেন?
হ্যাঁ তো! এই যে দেখছি!
দেখছেন না। অনুমান করছেন।
আপনি কি বাস্তব নন?
বাস্তব।
রিয়েল?
রিয়েল।
আমি আপনাকে ছুঁয়ে দেখতে পারি?
না।
কেন?
ছোঁওয়া যায় না বলে।
হঠাৎ দূরের ফাঁকা মাঠঘাট থেকে হাহাকারের মতো একটা বাতাস বয়ে গেল। তার ভিতরে বিরহের হু হু শব্দ, প্রেতিনীর দীর্ঘশ্বাসের মতো, আর জলজ উদ্ভিদের গন্ধ, আর চোরা শীত।
আপনি জাদুকর নন তো?
না।
গোয়েন্দা?
না।
আপনি কি আমার ভারাক্রান্ত হৃদয়ের কথা জানেন?
জানি।
তাহলে আপনার কাছে সব কথা বলা যায়, যায় না?
ইচ্ছে হলে।
বড় গ্লানি, বড় অপমান। এত পালিয়ে বেড়াচ্ছি, ঘুরে মরছি, কই একটুও তো ভুলতে পারি না। শুনেছি সময়ের প্রলেপে সব ঢাকা পড়ে যায়, যাচ্ছে না তো!

কী ভুলবেন?
গ্লানি, অনুশোচনা, সব ভুলতে চাই। পারছি না, বুকে এত জ্বালা!
জানি।
কী করব?
জানি না।
যদি মরতে চাই?
একটা মেয়ের জন্য?
হ্যাঁ।
একটা তুচ্ছ মেয়ের জন্য?
ধরুন, তাই।
একটা দীর্ঘশ্বাস ভেসে এল।
শুনছেন?
শুনছি।
আজ রাতটি বড্ড মনোরম, অন্ধকার, রহস্যময় কুয়াশা, ভুতুড়ে একটা স্টেশন, আর প্রেতলোক থেকে আসা কারও মতো আপনি। এইসব আমাকে প্ররোচিত করছে মরার জন্য। মরলে সব শেষ, সব শান্তি, সব সমাধান।
আবার একটা দীর্ঘশ্বাস।
সাতটা কুড়ির ট্রেন এত দেরি করছে কেন বলুন তো!
ট্রেন আসবে।
ওই ট্রেনের চাকায় যদি নিজেকে সমর্পণ করে দিই?
কোনও জবাব নেই।
আপনি আছেন?
আছি!
আপনি কি সবসময়ে আমার সঙ্গে থাকেন?
থাকি।
আচ্ছা, লাইনের ওপর দিয়ে ওটা কী আসছে বলুন তো!
একটা ট্রলি।
ট্রলি! ট্রলি কেন আসছে?
আপনার জন্য।
আমার জন্য? ট্রলি করে আমি কোথায় যাব?
দু বছর পর।
দুর? কী যে বলেন!
ট্রলি সামনে এসে দাঁড়াল, লোকটা বলল, উঠে পড়ুন।
ভারি মজা পেল পিয়াল। ট্রলিতে সে জীবনে কখনও ওঠেনি, উঠবে? খুবই অদ্ভুত ঘটনা এটা। তবু পিয়াল হঠাৎ ট্রলিতে উঠে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে ধুন্ধুমার বেগে ট্রলিটা ছুটতে শুরু করল।
কোথায় যাচ্ছি মশাই, অ্যাঁ। কোথাও যাচ্ছি সত্যিকারের।
দু বছর পর, লোকটা পেছন থেকে বলল।
এর কোনও মানেই হয় না, কী হচ্ছে এ সব? দেখা যাক।

ট্রলি লাইন ছেড়ে কোথা দিয়ে যে কোথায় চলল তা বুঝতেই পারছিল না পিয়াল। কিন্তু সে একটা ঘরে পৌঁছে গেল, তার নিজেরই ঘর। ঘরে আলো জ্বলছে। ভারি সুন্দর মুখশ্রীর একটা মেয়ে খাটে বিছানা পাতছে, বালিশ সাজাচ্ছে। তাকে দেখে খুশির হাসি হেসে বলল, ও মা তুমি এসে গেছ?

নীপা!

দেরি দেখে যা ভাবনা হচ্ছিল?

কিন্তু প্রদীপের কী হল নীপা?

নীপা ভ্রূ কুঁচকে অভিমানী মুখ করে বলল, আচ্ছা, হঠাৎ আবার ও কথা কেন বলো তো! কত বার তো বলেছি, ও আসলে আমাকে চায়নি, চেয়েছিল দুদিন ফূর্তি করে কেটে পড়তে। আমি তাই ওকে আমার শরীর ছুঁতে দিইনি, পালিয়ে গেছি মামাবাড়িতে। মামাও তো বলেছে তোমাকে! বলেনি? তবে কেন আজও বিশ্বাস করো না আমাকে? কেন করো না?

আবেগভরে কী একটা বলতে যাচ্ছিল পিয়াল। কিন্তু আচমকা ছবিটা মুছে গেল। জলার দিক থেকে প্রেতিনীর শ্বাসের মতো একটা বাতাস বয়ে এল। তাতে হাহাকারের শব্দ। অন্ধকার প্ল্যাটফর্মে বসে আছে পিয়াল।

এটা কি সত্যি?

কে জানে?

তবে দেখলাম কেন?

হতেও পারে তো! জীবনে কত সম্ভাবনা থাকে!

মিথ্যেও হতে পারে তো!

পারে।

কোনটা সত্যি, কোনটা মিথ্যে বুঝব কী করে?

অপেক্ষা করা যাক।

অপেক্ষা?

অপেক্ষা।

দূর থেকে একটা আলো এসে পড়ল রেললাইনের ওপর। চকিত উদ্ভাস, প্ল্যাটফর্মে ছড়িয়ে পড়ল সেই আলো। পিয়াল চেয়ে দেখল বেঞ্চের কোণে কেউ নেই। কেউ হয়তো কিছুই না। বিভ্রম।

পিয়াল ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল, ট্রেন আসছে।

# বাসা

লড়াইটা লাগল চড়াইপাখি নিয়ে। জানলা-দরজা দিয়ে সারা দিন অজস্র চড়াই মুখে করে খড়কুটো নিয়ে আসছে আর তাকে, আলমারির মাথায়, খাঁজে-খোঁজে বাসা বেঁধে ফেলছে। সারা দিন তাদের কিচিরমিচিরে অঞ্জনার মাথা ধরে যায়। আর ঘরদোর বিছানাপত্র এমন নোংরা হচ্ছে যে বলার নয়। আর পাখিগুলো নিয়েও আসে সব অজানা জিনিস। অডিয়ো ক্যাসেটের ফিতে থেকে শুরু করে প্লাস্টিক অবধি।

বাসা ভেঙে তাদের তাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছিল অঞ্জনা, কিন্তু মানস হাঁ হাঁ করে উঠল, না না, বাসা ভাঙলে ওরা যাবে কোথায়?

তার মানে! যাবে কোথায় তা কি আমাদের জানার কথা? গাছপালায় গিয়ে বাসা করুক।

মানস মাথা নেড়ে বলে, কলকাতায় আর গাছপালা আছে নাকি? তাছাড়া চড়াইপাখি কখনও গাছে বাসা বাঁধে না, সব সময়ে ঘরদোরেই বাঁধে।

তোমাকে বলেছে! পাখিরা তো গাছেই বাসা করে বলে জানি।

এই বিতর্ক চলাকালীনই আর একটা ঘটনা ঘটল। যদিও চড়াইপাখি সহজাত সংস্কারবশে ঘুরন্ত সিলিং ফ্যানকে সহজেই এড়াতে পারে এবং ফ্যানের তলা দিয়েই যাতায়াত করে, তবু বোকা পাখিও তো থাকে। তাদেরই একটা একদিন সকালে সিলিং ফ্যানে ফটাং করে লেগে ছিটকে পড়ল এবং মরল। মানসের তাতে শোকটা হল দেখার মতো। মৃতপ্রায় পাখিটাকে করপুটে নিয়ে জলটল দিয়ে বাঁচানোর একটা অক্ষম চেষ্টা করল সে। পারল না। পাখিটাকে সে ফুটপাথে একটা বকুল গাছের তলায় কবর দিল। সারাদিন সে শোকে গোমড়া মুখ করে রইল। এবং তারপর যে কাণ্ডটা করল তা অভাবনীয়। একসঙ্গে দু'দুটো টেবিল পাখা কিনে আনল সে এবং সিলিং ফ্যান চালানো নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করল। দরদের এই বাড়াবাড়ি এবং অপব্যয় কোন সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ সহ্য করতে পারে? সুতরাং অঞ্জনার সঙ্গে তার তুমুল বিবাদের সৃষ্টি হল।

আর এই বিবাদের পরিণামেই বোধহয় অঞ্জনা রেগে গিয়ে দুপুরবেলা তার কাজের মেয়ে বাসন্তী আর ফ্ল্যাটবাড়ির দারোয়ান নয়নকে নিয়ে পাখির বাসা ভাঙল। কিন্তু ভাঙতে গিয়েই হল বিপত্তি। বাসায় ডিম ছিল। সেইসব ডিম ভেঙে যখন ছয়ছত্রখান হল তখন অঞ্জনারও মনে হল, কাজটা ঠিক হয়নি। কতগুলো প্রাণের সম্ভাবনা নষ্ট করে দিল সে?

নয়ন বলল, মন খরাপের কী আছে বউদি? আমরা তো হাঁস-মুর্গীর ডিমও কিনে এনে খাচ্ছি। তাতে দোষ না হলে এতেই বা দোষ হবে কেন?

অঞ্জনার বিয়ে হয়েছে মোটে আট মাস। তারও একদিন বাচ্চা হবে তো! তাই কষ্টটা বুকের মধ্যে রইল সারা দিন। কিন্তু সেই কষ্টই ফের রাগ হয়ে ফুঁসে উঠল যখন মানস তার ব্যাঙ্কের চাকরি সেরে একটু রাত করে ফিরল এবং শুনল যে, পাখির বাসা ভেঙে সাফ করা হয়েছে।

মানস ঝাগড়ায় পটু নয়, কিন্তু প্রচণ্ড আবেগপ্রবণ।

অভিমান তার এমনই গভীর হল যে সে রাতে তো কিছু খেলই না, পরদিনও না খেয়ে অফিসে চলে গেল। একটাও কথা বলল না অঞ্জনার সঙ্গে। অঞ্জনা তাকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করল যে, পাখির বাসা ভাঙা তার অন্যায় হয়েছে এবং সে দুঃখিত। মানস শুনল কিন্তু অ্যাপোলজিটা গ্রহণ করল না।

মানস অফিস থেকে ফেরার সময় বাইরে থেকে খেয়ে এল। বাইরের ঘরে একা শুতে লাগল এবং অঞ্জনার সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ করে দিল।

অঞ্জনা কত সহ্য করবে! পরদিন সে সকালে উঠে গোছগাছ করে নিয়ে তার এক বান্ধবীর বাড়ি ডোভার লেনে চলে গেল। বলে গেল, ওখান থেকেই সে তার বাপের বাড়ি জলপাইগুড়িতে চলে যাবে।

চড়াইয়ের বাসা ভাঙার খেসারত চড়াইপাখিরা কি এভাবেই নিচ্ছে অঞ্জনার বাসা ভেঙে? বান্ধবী মধুরার কাছে কাঁদতে কাঁদতে এসব কথাই বলছিল অঞ্জনা।

মধুরা বলল, চড়াইয়ের উৎপাত কি আমার বাড়িতেই কম? তবে আমার খারাপ লাগে না। সারাদিন তো একা একা থাকি, ওগুলো আমাকে সঙ্গ দেয়।

কিন্তু ঘরদোর নোংরা করে যে!

তা তো করবেই। একটু খাটুনি বাড়ে। ওটুকু সয়ে নিলেই হয়।

অঞ্জনা সয়ে নেওয়ার কথা ভেবেছে, কিন্তু মানসের সঙ্গে তার অভিমানটা না মিটলে তো আর তা হবে না।

ওদিকে মানসেরও মন ভালো নেই। অঞ্জনা বাপের বাড়ি চলে যেতে চাইছে। চড়াইপাখিই যদি অশান্তির কারণ হয় তাহলে তো মুশকিল। মানস মিস্ত্রি ডেকে জানলায় জানলায় জাল লাগিয়ে দিল। আর চড়াইপাখির উৎপাত থাকবে না। অশান্তিও হবে না।

তিন দিন বাদে সে অঞ্জনাকে নিয়ে এল। আসার জন্য মুখিয়েই ছিল, বেশি সাধতেও হল না।

কিন্তু এসেই অঞ্জনা অবাক, এ কী! জানলায় জাল লাগালে কেন?

চড়াইয়ের পথ বন্ধ করলাম।

না, না, কালই জাল খুলে দিতে হবে।

সে কী?

হ্যাঁ। আসুক চড়াই, করুক বাসা।

কিন্তু—

পরদিনই জাল খুলে দেওয়া হল। চড়াইয়ের আনাগোনাও শুরু হল। মানস বলল, এখন চড়াইকে সহ্য করছ কী করে?

মৃদু হেসে অঞ্জনা বলল, তোমার জন্য। তুমি যে পছন্দ করো। অ্যান্ড মিস্টার, দ্যাট ইজ লাভ। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড?

# চাঁদের চা

হবে নাকি বটুবাবু?

চা! আজ্ঞে সত্যি কথা বলতে কি, ওই চা খেতেই তো আমি আপনার ডেরায়।

বটে!

চা সবাই করতে পারে না। তেমন ভালো কোয়ালিটির চা-ই বা এখন কোথায়? আপনার বাড়ির চায়ের গুণমাণ অতি ভালো। ঘরের লক্ষ্মী চা-টি করেনও বড়ই সুন্দর।

আমি আপনার মতো চায়ের রসিক নই। বাড়িতে থাকলে সকালের দিকে এক কাপ। তারপর তো সারাদিন কাঁহা কাঁহা মুলুক খেপ মারা।

তা বটে! তবে চায়ের রসিক শুধু নয়, আপনার রসকষ সব ব্যাপারেই একটু কম, অথচ আপনার নাম যে কেন রসিক হল কে জানে বাবা।

যা বলেছেন। আমার বউ নীহারিকাও সেই কথাই বলে। আমি নাকি বেজায় গোমড়ামুখো, হাসিটাসি পছন্দ করি না।

তা নয়, আসলে আপনি কাজ-পাগল লোক। সর্বদাই কাজের ঘোরের মধ্যে থাকেন।

সেটা কি খারাপ মশাই!

ছি ছি, খারাপ কেন হবে! আপনার মতো সৃষ্টিশীল বিজ্ঞানীরাই তো বিশ্ব দুনিয়ায় সত্যিকারের কাজের কাজ করছেন রসিকবাবু। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্য পড়াই, তাও কবিতা।

তা সেটাও নিশ্চয়ই কাজ।

ছাই কাজ। গতবারে সাকুল্যে তিনটে ছেলে আর দুটো মেয়ে ভর্তি হয়েছিল। বছর না ঘুরতেই তিনজন কেটে পড়ল। এ বছর হাল আরও খারাপ। একজন মেয়ে ভর্তি হয়েছে।

বলেন কি? সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ এত কমে যাচ্ছে নাকি?

যাবে না কেন? তার জন্য তো আপনারাই দায়ী। বিজ্ঞানের এখন ভেলকি দেখাচ্ছেন যে ছেলে-মেয়েগুলো ওদিকে ঝুঁকে পড়ছে।

কথাটাও মিথ্যেও নয় বটুবাবু।

অতি কঠোর সত্য। ভাবছি এরপর আর যদি ছাত্রছাত্রী না আসে তাহলে করবটা কী? ফাঁকা ক্লাসে গিয়ে বসতে হবে নাকি?

হুঁ। ভাবিয়ে তুললেন।

ভাববার কিছু নেই। চাকরি যাবে না। আর ক্লাসে বসে ঘুমোতে আমার বেশ ভালেই লাগে। তা মা-লক্ষ্মীকে কি চায়ের কথাটা বলে দিয়েছেন?

ইন্টারকমে বলে দিচ্ছি।

শুনুন, ভালো করে বুঝিয়ে বলবেন যে যন্ত্রচালিকার হাতের চা নয় কিন্তু। ওঁর নিজের হাতের চা।

তাই হবে। কিন্তু যন্ত্রচালিকাদের ওপর আপনার রাগ কেন বলুন তো বটুবাবু! তারা তো আরও নিখুঁতভাবে সব কাজ করে। যেমন প্রোগ্রাম করে দেবেন ঠিক তেমনটি করবে। এতটুকু কম-বেশি হওয়ার জো নেই।

সে যাই বলুন মশাই, আমরা হলুম পুরোনো আমলের লোক। আমরা মানুষের হাতের স্পর্শ আর যত্নটুকু না হলে কেমন যেন খুশি হই না।

এটা কিন্তু একটু কুসংস্কার বটুবাবু।

তাই হবে হয়তো। আপনাদের দুনিয়ায় আমি যে বেমানান তা খুব ভালো করেই জানি। কথাটা হয়তো একটু সেন্টিমেন্টাল হয়ে গেল, কিন্তু মিথ্যে তো নয়।

বেমানান একটু লাগতে পারে, তবে সেটা আপনার কাছে। আমাদের কাছে নয়। আমরা তো আপনাকে স্বাভাবিক বলেই ভাবি।

দূর! তাই কখনও হয়? আমি আপনাদের গিনিপিগ বই তো নয়।

আহা, ওরকম ভাবেন কেন? ঘটনাটা অন্যভাবে তো দেখা যায়। ওই যে আপনার বউমা চা নিয়ে এসে গেছেন। নিন, চা খান।

এসো বউমা, এসো। তোমার হাতের চাটুকু খাবো বলেই মাঝে মাঝে এসে উৎপাত করি।

ছিঃ, ছিঃ, কী যে বলেন! উৎপাত হবেন কেন? আপনি এলে আমি সত্যিই খুশি হই। যখন খুশি আসবেন, একটুও বিরক্ত হব না।

তোমরা কাজের মানুষ। রসিকবাবু যেমন ব্যস্ত মানুষ, তুমিও তো প্রায় তেমনই ব্যস্ত। তুমি তো আবার কিসের যেন ডাক্তার, না?

আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি মেন্টাল ফিজিসিস্ট।

সেটা কী মা?

আসলে ব্যাপারটা জটিল। মানুষের মনোরোগের সঙ্গে ফিজিক্সের যেটুকু যোগ আছে আমি সেটুকুর ডাক্তার।

ও বাবা! ওসব বুঝবার মতো মস্তিষ্ক আমার নেই। বাঃ, চা-টা তোফা হয়েছে।

আপনার জন্য সবসময়ই আমি নিজের হাতে চা করি।

শিখলে কোথায়? আজকালকার মেয়েরা তো এসব জানেই না। সবই কম্পিউটারে হয়ে যাচ্ছে। হাসছ কেন মা?

কম্পিউটার কথাটা শুনে। আজকাল আর কম্পিউটার বলে কিছু নেই। আমরা বলি ব্রেন।

ওঃ হ্যাঁ, তাও বটে। কম্পিউটারের কেরামতি ছিল আমাদের আমলে। আমরা সব তাজ্জব হয়ে যেতাম তখন। তা সে সব যন্ত্র এখন আর দেখতে পাই না। এখন দেখি হেলমেটের মতো কী সব মাথায় পরে বসে থাকে।

হ্যাঁ, এখন সব মিনিমাইজেশনের যুগ। তাছাড়া ব্রেন মানুষের সিস্টেমের মধ্যে কাজ করে। আগেকার কম্পিউটার ডিসপ্লে হত মনিটারে, আজকাল ওসব নেই। মানুষের মাথার ভিতরেই কাজ করতে পারে ব্রেন।

উরেব্বাস, শুনলে মাথা ঝিমঝিম করে।

এসব ভাববার দরকার কী আপনার? আপনি যেমন আছেন তেমন থাকুন।

তা কি আর থাকার চেষ্টা করি না মা? কিন্তু চারদিকে যা সব কাণ্ডমাণ্ড দেখছি তাতে না ভেবেও পারি না।

আচ্ছা আমি একটু যাই?

এসো মা।

চা লাগলে বলে পাঠাবেন। দিয়ে যাব।

আচ্ছা মা। এসো গিয়ে। তা ইয়ে রসিকবাবু, আপনি আমার দিকে ওরকম তাকিয়ে আছেন কেন?

ভাবছি।

কী ভাবছেন?

আপনাদের আমলে মানুষেরা নিজেরা বিব্রত বোধ করত। লজ্জা, সংকোচ অকারণ সৌজন্য, বিনয় এই সব হল প্রত্যাহার ব্যক্তিত্ব।

তার মানে?

উইথড্রন পারসোনালিটি।

না রসিকবাবু, কথাটা ঠিক নয়। কিছু কিছু লোক আবার বেশ লড়াকুও ছিল, আত্মবিশ্বাস ছিল প্রবল।

মানছি। তবু দেখুন, মাত্র পাঁচশো ত্রিশ বছরে মানুষের ব্যক্তিত্বের কেমন আবর্তন ঘটে গেছে। আপনি এই পরিবেশে বিব্রত বোধ করছেন, কিন্তু আপনি আপনার আমলেও অচেনা পরিবেশে বিব্রত বোধ করতেন, তাই না?

কথাটা ঠিকই বলেছেন।

কিন্তু এখন দেখবেন, ওরকম লোক একটাও খুঁজে পাবেন না। এখনকার মানুষ যে-কোনও পরিবেশের জন্য তৈরি।

তাই দেখছি। তা মশাই, পাঁচশো ত্রিশ বছর আগে যখন আমাকে ঘুম পাড়িয়ে হিমায়িত করে রাখা হল তখন আমার ব্যক্তিত্বটারও পরিবর্তন ঘটানো হল না কেন?

সারা পৃথিবীতে তিন হাজার সাতশো পঞ্চান্ন জনকে ঘুম পাড়ানো হয়েছিল। আমি যতদূর জানি, এরা প্রত্যেকেই ছিল আলাদা রকমের স্বভাব-চরিত্রের মানুষ। পাঁচশো বছর পর ঘুম ভাঙিয়ে নতুন পরিবেশে কে কেমন প্রতিক্রিয়ায় আক্রান্ত হয় সেটাও দেখায় বিষয় ছিল।

সেই জন্যই তো বলি আমি আপনাদের একজন গিনিপিগ।

তা নয় বটুবাবু, আমাদের হয়তো আপনাদের কাছে কিছু শেখারও ছিল।

হাসালেন মশাই, আমরা শেখাবো আপনাদের? আপনারা যে প্রবল মেধা আর উদ্ভাবনশক্তির অধিকারী, তার কাছে তো আমরা নস্যি।

মেধা ছাড়া কি আর কিছু শেখার নেই?

কী আছেন বলুন তো? পাঁচশো বছর পর যখন আপনাদের এই আধুনিক পৃথিবীতে ঘুম ভেঙে চৈতন্য ফিরে পেলাম তখন তো এক গাল মাছি। কী করলাম জানেন?

কী করলেন?

হতভম্ব ভাবটা কাটিয়ে উঠে নিজের বংশধরদের খোঁজ করতে লাগলাম। ভাবলাম তাদের হয়তো আমার ওপর একটা মায়া হবে।

খুঁজে পেলেন কাউকে?

খুব পেলাম। তবে পাঁচশো বছর মানে প্রায় কুড়ি জেনারেশন, তাই নয়?

হ্যাঁ, ওরকমই।

এখন কুড়ি জেনারেশন পরেকার উত্তরপুরুষরা আমাকে দেখে যে আহ্লাদে মূর্ছা যাবে এমন তো নয়। তবে খুঁজে বের করতে অসুবিধে হয়নি। কম্পিউটারে যে ধারাবাহিক বংশ-পরিচয় ফিট করা ছিল তার দৌলতে

দেখলাম পাঁচশো বছরে লতায়-পাতায় বংশ বিস্তার হয়েছে বিশাল রকমের। কাছাকাছি এই কলকাতাতেই এক ব্যাটাকে ধরলাম। তার নাম মনসিজ বসু। বিশেষ পাত্তা দিতে চাইছিল না। তবে তার কাছেই আরও কয়েকজনের পাত্তা পেয়ে গেলাম। কিন্তু তাদেরও দেখলাম গা-ছাড়া ভাব। মনটা দমে গেল। মনে হল, এই দুনিয়ায় আমার আপনজন বিশেষ কেউ নেই। হাসছেন যে!

হাসি কি আর সাধে! ভালো করে ভেবে দেখলে বুঝবেন যে, সেই পাঁচশো ত্রিশ বছর আগেও রাগ বা অভিমান হলে মানুষের মনে হত দুনিয়ায় তার কেউ নেই। হত না?

হ্যাঁ, তা অবশ্য হত। আবার সে ভাবটা কেটেও যেত।

আপনার অভিমানটা উপড়ে ফেলুন, দেখবেন আমরাও তেমন পর নাই।

আপনার কথা আলদা।

আলদা নয়, আলাদা নয়, আমিও একটু নির্বিকার, একটু আবেগহীন ঠিকই, কিন্তু আমাদের জীবনধারাই এরকম করেছে আমাদের। বাহুল্য বলে কিছু থাকে না। কাজ আর কাজ আমাদের সব বাড়তি আবেগ কেড়ে নিয়েছে।

হ্যাঁ, শুনেছি আপনার কাজটাও বেশ শক্ত। চাঁদের মাটির নীচে আপনারা ক্ষেতখামার করছেন। সত্যি নাকি?

সত্যি। কারণ চাঁদের ওপরে কিছু করা সম্ভব নয়। চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ কম বলে আবহমণ্ডল তৈরি করা যাচ্ছে না। আমরা চাঁদের ভূগর্ভে সেটা তৈরি করেছি।

অন্ধকারে কি গাছ হয়?

হয়। তবে অন্যরকমের হয়। আমরা সূর্যের আলো দিতে পারি না বটে, কিন্তু সূর্যের আলোর গুণগুলি কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি করে ভূগর্ভের খামারে তো প্রক্ষেপ করি।

কাজ হয়?

অন্যকরমের হয়। যে চা খেতে আপনি এত ভালোবাসেন, যার টানে আমার বাড়িতে ছুটে আসেন তা ওই চাঁদের চা।

বলেন কী মশাই?

অনেক কষ্টে করেছি।

চাঁদের চা?

হ্যাঁ, এ চাঁদেরই চা। চা গাছ বহুদিন বাঁচে এবং বেশি লতাও হয় না, তাই এটাই ছিল চাঁদের আমার প্রথম চাষ।

বাঃ, শুনে ভারি ভালো লাগছে।

লাগবেই তো। ধীরে ধীরে সব ভালো লাগবে। পাঁচশো বছর পরেও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজির অধ্যাপকের চাকরি যে আপনার বজায় রাখা হয়েছে তা আপনার নস্টালজিয়ার প্রতি সম্মানবশত।

তার মানে?

মানে, ইংরাজি সাহিত্য পড়ার জন্য আর ক্লাসে যাওয়ার দরকার নেই। আমার বউ যে ব্রেনের কথা বলল সেটাই প্রয়োজনে ইংরাজি সাহিত্য সম্পর্কে আমাদের জানিয়ে দিতে পারে।

তাহলে কি মশাই, আমাকে চুষিকাঠি দিয়ে ভুলিয়ে রাখা হচ্ছে?

আমরা আশা করছি আপনি একদিন চুষিকাঠি ফেলে দিয়ে সাবালক হয়ে উঠবেন। এখন চলুন আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

বটুবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে বসে থেকে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, চলুন।

রসিকবাবু তাঁর একশো পঞ্চান্ন তলার ফ্ল্যাটের একটি জানালা খুলে দিলেন। তারপর দুজনে একটি করে বেল্ট বেঁধে নিলেন কোমরে। বেল্টের পেছনে ছোট ছোট সব জেট লাগানো। জেট চালু হতেই দুজনে ভেসে

পড়লেন শূন্যে।

বটুবাবু বললেন, গিনিপিগ ভাবটা আমার যাচ্ছে না।

কে জানে বটুবাবু, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে আমিও একদিন গিনিপিগ হয়ে চোখ মেলবো কিনা।

তা বটে। সবই সম্ভব।

হ্যাঁ, সবই সম্ভব।
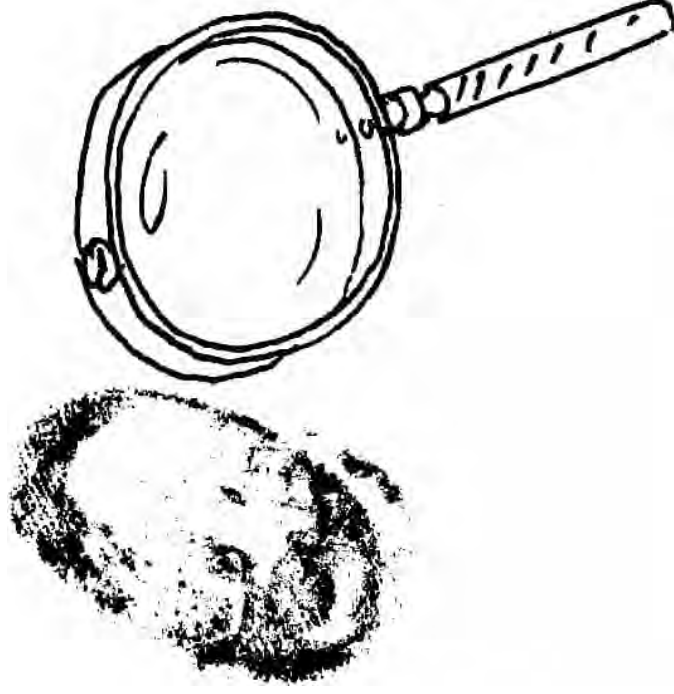
# ভুল প্রতিবিম্ব

লোকটাকে দেখা যায় শুধু আয়নায়। আর কোথাও নয়। যতবারই, গত পরশু থেকে আয়নায় নিজেকে দেখতে চেষ্টা করেছে অভিলাষ, ততবারই দাড়িওয়ালা সামান্য বয়স্ক যুবকের মুখ আর স্থির চোখে তাকিয়ে থাকা দেখছে সে। পরশু সকাল ছ'টায় ঘুম থেকে উঠে সে—অর্থাৎ অভিলাষ—রোজকার মতোই আয়নায় মুখ দেখতে গিয়ে এই অচেনা, গম্ভীর, ব্যক্তিত্ববান, একটু নিষ্ঠুর মুখটা দেখে আঁতকে উঠে চেঁচিয়েছিল, কে? আয়না থেকে কোনও জবাব আসেনি। শুধু দুটি অপলক, দয়াহীন, তীক্ষ্ন চোখ তার দিকে চেয়ে থেকেছে, তার পর থেকে আয়নায়—যে কোনও আয়নায়—ওই পোর্ট্রেট ছাড়া আর কিছু দেখেনি অভিলাষ। তার মুখটাই কি পাল্টে গেল? কিন্তু তার দাড়ি গোঁফ নেই। বয়েস মাত্র সাতাশ। তবু জনে জনে নিজের চেহারা সম্পর্কে প্রশ্ন করে যত দূর জানতে পেরেছে, সে অভিলাষই আছে, পাল্টে যায়নি। তাহলে আয়নায় ও কে? অভিলাষ কি পাগল হয়ে যাচ্ছে? নাকি এ কোনও ভূতুড়ে ঘটনা?

আজ মধ্য রাতে সে উঠে বসেছে বিছানায়। তার ঘুম নেই। বুকে অস্বস্তি। মাথায় অবিরল চিন্তার ঘূর্ণি। এ সব কী হচ্ছে? কেন হচ্ছে? আয়না এখন তার নিত্যসঙ্গী। বালিশের পাশ থেকে আয়নাটা তুলে সে মুখের সামনে ধরল। ঘর অন্ধকার, আয়নার কোনও ছায়া পড়ল না। তবু সে জিগ্যেস করল, আপনি কে? আমি কেন আপনার ছায়া দেখছি?

কোনও জবাব নেই।

অনেকক্ষণ অন্ধকার আয়নার দিকে চেয়ে থাকল অভিলাষ।

অভিলাষ একটি মেয়েকে একতরফা ভালোবাসে। মেয়েটি তাকে বাসে না। আসলে মেয়েটা অভিলাষকে চেনেও না। যদিও তার বাড়ির সামনে দিয়েই মেয়েটি রোজ মর্নিং কলেজে পড়তে যায়। দুই বেণী, লালপেড়ে সাদা শাড়ি, ভ্রূমধ্যে কুমকুমের টিপ। মরি-মরি রূপ। অভিলাষ জানে মেয়েটি তত রূপসী হয়তো নয় যতটা তার চোখে। সাতাশ বছরের চোখে অনেক বিভ্রম থাকে। তবু ওই বিভ্রমও তো সাময়িক সত্য। মুখোমুখি কথা

বলবার সাহস নেই অভিলাষের। মেয়েদের সম্পর্কে তার আজন্ম ভীতি, সঙ্কোচ। নিজের সম্পর্কে তার ধারণা খুবই খারাপ। তার চেহারা সাধারণ, চালাক-চতুর নয়, সফল যুবকও নয়। একটা প্রাইভেট ফার্মে সামান্য কম্পিউটার ডাটা এন্ট্রির চাকরি। তার কি প্রেমট্রেম সাজে? অবিরল হীনম্মন্যতায় ভুগে সে জড়সড়। নিজের ভবিষ্যৎ সে অন্ধকার বলেই ধরে নিয়েছে।

আজ মধ্যরাতে জেগে থেকে তার কথা মনে হল। আয়নাটা রেখে সে অন্ধকারে চোখ বুঝল। ঘুম এল না।

অভিলাষ দাড়ি কাটা ছেড়ে দিল, আয়নায় মুখ দেখা ছেড়ে দিল, এমন কি রোজ সকালে মেয়েটিকে দেখার জন্য রাস্তায় গিয়ে লেটার বক্সের আড়ালে লুকিয়ে দাঁড়ানোও ছেড়ে দিল। এবং সমস্যাটার কথা সে কাউকে বললও না, তার কথা তো কেউ বিশ্বাস করবে না। বরং নিজেকে ব্যস্ত রাখার জন্য সে নানা রকম পড়াশোনা শুরু করল। নিবদ্ধ রইল তাতেই।

এক বন্ধু তাকে একদিন বলল, তোমাকে অন্য রকম দেখাচ্ছে।

হ্যাঁ। দাড়ি রাখছি তো।

তার জন্য নয়।

তবে?

অন্য রকম। বেশ অন্য রকম।

অভিলাষ আর কিছু জিগ্যেস করল না। তবে বাড়ি ফিরে সে আয়নায় মুখ দেখল। এবং চমকে উঠল। আয়নায় সেই মুখ নয়। লোকটার দাড়ি ছোট হয়ে গেছে। চোখে সেই ব্যক্তিত্ব নেই। দেখে ভয়-ভয় করল না।

একটা বড় কম্পানিতে একটা চাকরির জন্য দরখাস্ত করেছিল অভিলাষ। ডাকার কথাই নয়। কিন্তু ডাক এল এবং বরাতজোরে চাকরিটা পেয়েও গেল। হীনম্মন্যতার ভাবটা একটু কমল অভিলাষের। ব্যস্ততায় ভরা তার জীবন।

বছর দুই বাদে মেয়েটির সঙ্গে পথে মুখোমুখি দেখা। অভিলাষ হঠাৎ বলে উঠল, শুনুন।

মেয়েটি থমকে দাঁড়াল, কিছু বলছেন?

অভিলাষের বুক কাঁপল না। সে অনায়াসে বলল, আমি কেমন?

মেয়েটি হঠাৎ লাল হয়ে মাথা নীচু করে বলল, যাঃ।

বলেই পালিয়ে গেল।

সেই দিন বাড়ি ফিরে আয়নাটা তুলে অভিলাষ অবাক। এই তো সে! এই তো তার আসল প্রতিবিম্ব! গোঁফ দাড়ি কামানো, ভীতু-ভীতু চোখ, আত্মবিশ্বাসহীন মুখশ্রী!

কিন্তু সে কী করে হবে? তার তো দাড়ি গোঁফ আছে। সে তো আর তত ভীতু নেই!

অভিলাষ অবাক হয়ে বলল, তুমি তো আমি নও!

তাকে অবাক করে দিয়ে তার ভুল প্রতিবিম্বও বলে উঠল, তুমি তো আমি নও!

# দিগম্বর

চাঁদমোহনবাবু সন্ধেবেলায় তাঁর ডিসপেনসারিতে বসে আছেন। সাহাগঞ্জের বাজারের ধারেই তাঁর হোমিওপ্যাথি ডিসপেনসারি। রুগি-টুগী বিশেষ আসে না তাঁর কাছে। বাজারের পশ্চিমে রসিকচাঁদের ডিসপেনসারিতে রুগির খুব ভিড়। রসিকচাঁদের নামডাকও খুব। তাছাড়া অ্যালোপ্যাথ ডাক্তার ব্রজেশ্বর তো আছেই। রুগিরা সব ওদের কাছেই যায়। চাঁদমোহন ডিসপেনসারি খুলে দু'বেলাই ধৈর্যসহকারে বসে থাকেন। সারাদিন দু-চারজনের বেশি রুগি হয় না। বাবার সামান্য কিছু বিষয়-সম্পত্তি ছিল বলে সংসারটা কোনওক্রমে চলে যাচ্ছে। নিজের রোজগারে চালাতে গেলে মুশকিল ছিল।

দোকানে বসে সময় কাটে না বলে তিনি বসে বসে গল্পের বই পড়েন। তাও বড়দের বই নয়, তাঁর ছেলে আর মেয়ে স্কুল বা পাড়ার লাইব্রেরি থেকে যেসব বাচ্চাদের গল্পের বই নিয়ে আসে সেগুলিই এনে পড়েন। বেশ লাগে। ভূতের গল্প, রূপকথা, ডিটেকটিভ, ভ্রমণকাহিনী যা-ই হোক চাঁদমোহনের কোনও অরুচি নেই।

মাঘ মাস। সাহাগঞ্জে এবার শীতটাও পড়েছে খুব চেপে। চাঁদমোহনবাবু র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে বসে কেরোসিনের টেবিলল্যাম্পের আলোয় মন দিয়ে একটা ভূতের গল্প পড়ছিলেন। এমন সময় একটা সুড়ুঙ্গে চেহারার লোক এসে ডিসপেনসারিতে ঢুকল। সরু গলায় বলল, ডাক্তারবাবু কি আপনিই?

চাঁদমোহনবাবু বইটা রেখে লোকটার দিকে তাকালেন। সাহাগঞ্জের লোক নয়। এখানকার প্রায় সবাইকেই তিনি চেনেন। লোকটা বেশ লম্বা, ছ'ফুটের ওপরে আরও দু-চার ইঞ্চি হবে। বয়স পঞ্চাশের আশেপাশে। মাথায় বাঁদুরে টুপি, গলায় মাফলার, গায়ে নস্যি রঙের র‍্যাপার, পরনে ধুতি, মোজা, ফিতে বাঁধা শু।

একজোড়া বেশ তাগড়াই কাঁচাপাকা গোঁফ আছে। লোকটাকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে চাঁদমোহন বললেন, হ্যাঁ, আমিই ডাক্তার।

লোকটা একটু হেসে বলল, তা আপনার রুগি-টুগী তো কেউ নেই দেখছি।

নাঃ, আমার তেমন পশার নেই। তা আপনার প্রয়োজনটা কি জানতে পারি?

লোকটা একখানা চেয়ারে বসে বলল, আমার নাম দিগম্বর সেন। পেশায় আমিও হোমিওপ্যাথ ছিলুম। এখন আর চিকিৎসা করি না। নানা জায়গায় ঘুরেটুরে বেড়াই আর কি। মহেশতলার নাম শুনেছেন তো?

হ্যাঁ। মহেশতলা হল গিয়ে বিখ্যাত গুড়ের জায়গা। অমন এখো গুড় আর কোথাও হয় না।

যথার্থই বলেছেন। সেই মহেশতলাতেই আমার আদিপুরুষের নিবাস।

ডাক্তারি ছেড়ে দিলেন কেন?

না ছেড়ে কী করব? আমারও তেমন পশার ছিল না। ফলে ঘরে গঞ্জনা সইতে হত। সংসারে নিত্যি অভাব, নিত্যি খিটিমিটি। তাই একদিন ধুত্তোর বলে সব ছেড়েছুড়ে বেরিয়ে পড়লুম। আর বাড়িমুখো হইনি। ঘুরে ঘুরেই বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেব ভাবছি।

চাঁদমোহনবাবু একটু হাসলেন, বললেন, তা বেশ করেছেন। তা এখন কি এই সাহাগঞ্জেই প্র্যাকটিস করার ইচ্ছে নাকি?

মাথা নেড়ে লোকটা বলে, না মশাই, নিজে প্র্যাকটিস করার আর ইচ্ছে নেই। বয়সও হচ্ছে, নতুন করে জীবন শুরু করার কথা ভাবছি না আর।

শুধু ঘুরে ঘুরে জীবনটা কাটিয়ে দেবেন?

সেইরকমই ইচ্ছে। ঘরের বাঁধন কেটে একবার বেরিয়ে পড়তে পারলে কিন্তু ভারি আনন্দ। কষ্টও আছে অবশ্য। খাওয়া-পরার কষ্ট, মাথা গোঁজার কষ্ট, কিন্তু আনন্দও কম নয়।

লোকটা কী মতলবে এসেছে তা বুঝতে না পেরে একটু অস্বস্তি বোধ করছেন চাঁদমোহনবাবু। টাকাপয়সা চাইতে পারে, বা তাঁর বাড়িতে আশ্রয়ও চেয়ে বসতে পারে। চালচুলো যাদের নেই তাদের আবার চক্ষুলজ্জাটাও থাকে না কিনা। চাঁদমোহন মিনমিন করে বললেন, তা বেশ ভালোই তো। আনন্দে থাকাটাই আসল কথা।

দিগম্বরের গোঁফের ফাঁকে সর্বদাই হাসি। ভদ্রলোকের দাঁতগুলো বেশ ঝকঝকে। হাসিটা ধরে রেখেই বললেন, কিন্তু আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি আনন্দে নেই। আমি আবার লোককে আনন্দে থাকতে না দেখলে ভারি মুষড়ে পড়ি।

চাঁদমোহন বললেন, না না, আমি আনন্দেই আছি তো!

দিগম্বর মাথা নেড়ে বললেন, বললেই তো আর হল না। আপনি ভাবছেন, আমার মতলবটা কী, সাহায্য চাইব কিনা, খেতে বা শুতে চেয়ে বসব কিনা, আর এসব ভেবে ভারি অস্বস্তি বোধ করছেন। আনন্দটা হবে কী করে?

লজ্জা পেয়ে চাঁদমোহন বললেন, না—ইয়ে—ঠিক তা নয়। তবে—

থাক মশাই লজ্জা পাবেন না। আমি মানুষের মনের কথা বুঝতে পারি। তবে বলতে সংকোচ নেই, আমার একটা আশ্রয়ও দরকার বটে। আমি ঠিক করেছি কিছুদিন আপনার এই ডিসপেনসারিতেই থাকব।

চাঁদমোহন চমকে উঠে বলেন, এখানে থাকবেন? এখানে বিছানাপত্তর নেই, চৌকি নেই, থাকবেন কী করে?

ওসব নিয়ে ভাববেন না। আমার বিছানা লাগে না। কিন্তু এখন আপনি কথা কইবেন না, একজন সিরিয়াস রুগি আসছে। যে রোগই হয়ে থাক আপনি তাকে নাক্স ভমিকা থার্টি দেবেন। আমি একটু আড়ালে যাচ্ছি।

বলেই লোকটা উঠে পিছন দিককার ছোট স্টোররুমটায় গিয়ে ঢুকে পড়ল। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একজন অসুস্থ লোককে ধরাধরি করে দুজন লোক এনে ডিসপেনসারিতে ঢুকল। সাহাগঞ্জেরই লোক, চাঁদমোহন

চেনেন। অসুস্থ ভদ্রলোক মস্ত ভূষিমালের মহাজন প্রাণগোপাল ঘোষ, অন্য দুজন তাঁরই কর্মচারী।

প্রাণগোপাল ঘোষ কাতরকণ্ঠে বললেন, ডাক্তারবাবু, পেটে বড় যন্ত্রণা। অনেক ডাক্তার দেখিয়েছি, কিছু হয়নি। এখন আপনি যদি কিছু করতে পারেন।

চাঁদমোহন খুবই অবাক হলেন। দিগম্বরের কথা মিলে যাচ্ছে। চাঁদমোহন প্রাণগোপালকে একটু পরীক্ষা করলেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নানা কথা জিগ্যেস করলেন। তারপর নাক্স ভমিকা দিয়ে তাঁকে বিদেয় করলেন। দুটি টাকা রোজগার হল।

দিগম্বর বেরিয়ে এসে হাসিমুখে বললেন, এবার খেল শুরু হল।

তার মানে?

ক'দিন সবুর করুন, টের পাবেন।

চাঁদমোহন বললেন, রুগির যা লক্ষণ দেখলুম তাতে নাক্স ভমিকা কোনও কাজই করবে না। শুধু আপনার কথাতেই দিলুম। লোকটা বড় আশা করে এসেছিল।

দিগম্বর হেসে বললেন, আবার আসবে। যাকগে, আপনি আজ বাড়ি যান।

চাঁদমোহন একটু সংকোচের সঙ্গে বললেন, আপনি কি সত্যিই এই ডিসপেনসারিতে থাকবেন?

হ্যাঁ। আপনি নিশ্চিন্তে বাড়ি যান। বাইরে থেকে তালা দিয়েই যান।

চাঁদমোহন চিন্তিত মুখে বললেন, তালা দিয়ে যাব?

হ্যাঁ মশাই। আমার তো আর বাইরে বেরোবার দরকার নেই!

চাঁদমোহন তাই করলেন। পরদিন সকালে দশটা নাগাদ এসে তালা খুলে দেখেন, দিগম্বরের টিকিরও পাত্তা নেই। বন্ধ ঘর থেকে লোকটা বেরোলো কী করে? ভাবতে ভাবতে চাঁদমোহন গল্পের বই খুলে বসলেন। দুপুরে বাড়িতে খেতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত দিগম্বর এলেন না।

সন্ধেবেলায় ডিসপেনসারিতে এসে তালা খুলেই চাঁদমোহন দেখেন, দিগম্বর দিব্যি হাসি হাসি মুখ করে অন্ধকারে বসে আছেন। চাঁদমোহন হ্যারিকেনটা ধরিয়ে বললেন, সারাদিন কোথায় ছিলেন মশাই? তালাবদ্ধ ঘর থেকে বেরোলেনই বা কী করে?

সে অনেক কায়দা আছে। পিছনের খুপরিটার জানালার একটা গরাদ একটু আলগা আছে। ও পথেই বেরিয়ে একটু ঘুরেটুরে এলুম। কিন্তু আপনি তৈরি থাকুন, আজও এক সিরিয়াস রুগী আসছে। অ্যাকেসিস মাদার টিংচার দেবেন।

এই বলেই দিগম্বর খুপরিতে ঢুকে পড়লেন। এবং আশ্চর্যের বিষয় একটু বাদেই একজন লোককে প্রায় চ্যাংদোলা করে নিয়ে আসা হল। লোকটিকে খুবই চেনেন চাঁদমোহন। রাসমণি বিদ্যাপীঠের হেডমাস্টার ভুবন বাঁড়ুজ্যে। জ্ঞান নেই। চোখ উল্টে গোঁ গাঁ করছেন। রোগলক্ষণ দেখে অন্য সব ওষুধের কথাই মনে আসছিল চাঁদমোহনবাবুর। কিন্তু তবু তিনি অ্যাকেসিসই দিলেন।

আরও দিন দুই কেটে গেল। দিগম্বরের সঙ্গে সন্ধেবেলাতেই দেখা হয় চাঁদমোহনবাবুর। দিনের বেলায় নয়। চাঁদমোহন একদিন বলেই ফেললেন, ব্যাপারটা একটু খোলসা করে বলবেন?

দিগম্বর শুধু হাসেন।

দু'দিন পর ফের সিরিয়াস রুগি এল। ফের দিগম্বরের কথামতো ওষুধ দিলেন চাঁদমোহন। কিন্তু কাজ কী হচ্ছে তা বুঝতে পারছেন না। রুগীরাও কেউ আসছে না ফিরে, তিনিও ভয়ে উদ্বেগে খবর নিতে পারছেন না। তবে ভালো ফল হয়ে থাকলে খবর একটা পেতেন ঠিকই। সাহাগঞ্জ ছোট জায়গা, খবর রটতে দেরি হয় না।

একদিন চাঁদমোহন বলেই ফেললেন, দেখুন দিগম্বরবাবু, আপনি আমার উপকার করতে গিয়ে অপকারই করেছেন। কী সব উল্টোপাল্টা ওষুধ বললেন, আমিও বোকার মতো তাই দিলুম। কোনও কাজই হয়নি, বরং হয়তো ক্ষতিই হয়েছে।

দিগম্বরের মুখে আজ হাসি ফুটল না। ভ্রূ কুঁচকে খানিকক্ষণ ভেবে নিয়ে বললেন, কাজ হচ্ছে না?

হলে খবর পেতুম। আপনি দয়া করে উল্টোপাল্টা যা খুশি ওষুধের নাম বলবেন না। হোমিওপ্যাথি আপনি কিছুই শেখেননি।

দিগম্বর খুব মুষড়ে পড়ে বললেন, তাই তো! আমি যে ভালো হবে ভেবেই দিয়েছিলুম। খুব ভুল হয়ে গেছে মশাই। আচ্ছা মশাই, চলি তাহলে। আপনার একটু উপকার করতেই এসেছিলুম, তা সেটাই যদি না পেরে থাকি তাহলে এখানে বসে থেকে লাভ কী?

বলতে বলতেই দিগম্বর যেন হঠাৎ আবছা হয়ে বাতাসে মিলিয়ে গেলেন।

ভারি অবাক হয়ে বসে রইলেন চাঁদমোহন। ব্যাপারটা কী হল বুঝতে পারলেন না। দিগম্বর কি ভূত নাকি? তিনি তাড়াতাড়ি দোকান বন্ধ করে বাড়ি-মুখো রওনা হয়ে পড়লেন। সারা রাত ঘুম হল না।

পরদিন গিয়ে ডিসপেনসারি খুলতে না খুলতেই অবাক হয়ে দেখলেন তাঁর ডিসপেনসারিতে একজন-দু'জন করে রুগি আসছে। বেলা বাড়ে, রুগীও বাড়ে। টাকায় টাকায় পকেট ভারী হতে লাগল। সন্ধেবেলায় এত রুগি এল যে রাত দশটা পর্যন্ত দম ফেলার সময় রইল না। পরদিন থেকে তাঁর নাওয়া-খাওয়া মাথায় উঠে গেল রুগির ভিড়ে। এমন কি বাড়িতেও রুগি আসতে শুরু করল। রুগীর লাইন পড়তে লাগল। চাঁদমোহন প্রমাদ গুনলেন।

লোকের মুখে মুখে রটে গেছে যে, চাঁদমোহন প্রাণগোপাল ঘোষ আর ভুবন বাঁড়ুজ্যেকে যমের দোর থেকে ফিরিয়ে এনেছেন। কিন্তু একমাত্র চাঁদমোহনই জানেন, তিনি নন, ওই দু'জনকে অদ্ভুত রকমের ওষুধ দিয়ে ভালো করেছেন দিগম্বর। এখন আর দিগম্বর নেই, চাঁদমোহন নিজের বিদ্যে অনুযায়ী ওষুধ দিতে লাগলেন।

মাস দুয়েক বেশ ভালোই কাটল। রোজগারপাতিও মন্দ হল না। ফি বাড়িয়ে দু-টাকার জায়গায় কুড়ি টাকা করে ফেলেছেন চাঁদমোহন। কিন্তু দু'মাস পর থেকেই রুগির স্রোত ভাঁটা পড়তে লাগল। গুঞ্জন শোনা যেতে লাগল, চাঁদমোহনের ওষুধে আর তেমন কাজ হচ্ছে না। রসিকচাঁদ আর ব্রজেশ্বরের মন্দা যাচ্ছিল, আবার রুগীরা তাদের কাছেই গিয়ে ভিড় করতে লাগল। ধীরে ধীরে চাঁদমোহনের পুনর্মূষিক অবস্থা।

ভারি অনুতাপ হল চাঁদমোহনের। দিগম্বরকে ওরকমভাবে বিদেয় করা বড্ড ভুল হয়েছিল। একটু ক্ষ্যাপা গোছের মানুষ বটে, কিন্তু ওষুধ দিত অব্যর্থ। কিন্তু এখন আর কী করা যাবে!

মনের কষ্ট মনে চেপে চাঁদমোহন ফের গল্পের বই খুলে বসেন আজকাল। এক-আধটা রুগি কখনও-সখনও আসে। চাঁদমোহনের সময় কাটতে চায় না। দুটো মাস যখন রুগির ভিড় হয়েছিল তখন ভারি ভালো কেটেছিল সময়টা। কাজের স্বাদ পেয়ে চাঁদমোহনও বেশ চনমনে ছিলেন। এখন যেন দ্বিগুণ ঝিমিয়ে পড়েছেন। গল্পের বইতেও মন নেই। প্রায়ই বই খুলে আনমন হয়ে বসে থাকেন। মনটা বিষন্নতায় ভরে যায়।

একদিন একখানা ভূতের বই খুলে সন্ধেবেলা ডিসপেনসারিতে বসে পড়ছেন। হঠাৎ ডানদিকের পাতায় একটা ছবি দেখে অবাক হলেন। ছবিটা যেন হুবহু দিগম্বর। অবাক হয়ে চেয়ে আছেন, হঠাৎ ছবিতেই মুখটা যেন জীয়ন্ত হয়ে উঠে চোখের পাতা পিটপিট করতে লাগল। তাগড়াই গোঁফের ফাঁকে একটু হাসি। তারপর ছবি থেকেই দিগম্বর বলে উঠলেন, কী খবর চাঁদমোহনবাবু?

চাঁদমোহন দুঃখে কেঁদে ফেলে বললেন, দাদা, বড্ড অপরাধ করে ফেলেছি আপনার কাছে। আপনি যে কত বড় ধন্বন্তরি তা বুঝতে পারিনি। আমাকে ক্ষমা করে দিন। আপনি ধন্বন্তরি।

দিগম্বর ছবিতেই খুব ফিক ফিক করে হেসে বললেন, যখন জীয়ন্তে ডাক্তারি করতুম তখন কেউ পাত্তা দিত না। বলত পাগলা ডাক্তার। মরার পরও সেই দুঃখটা ছিল বলে আপনার আশ্রয়ে গিয়েছিলুম। দেখলুম, আমি একেবারে ফ্যালনা ডাক্তার নই।

চাঁদমোহন হাতজোড় করে বললেন, আজ্ঞে না। আপনার জোরেই বরাতটা আমার ফিরেছিল। এখন আবার সময় খারাপ যাচ্ছে।

দিগম্বর খুব হাসলেন। তারপর বললেন, আচ্ছা মশাই, আর চোখের জল ফেলবেন না। যখন দরকার পড়বে এই বইখানার এই পাতাটা খুলবেন। আমি ছবি হয়ে এখানেই ঘাপটি মেরে থাকব।

পেন্নাম হই দাদা। বাঁচালেন।

কিছুদিনের মধ্যেই আবার চাঁদমোহনের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। রুগির গাদি লেগে গেল। চাঁদমোহন অকৃতজ্ঞ নন। দোকানের নাম হ্যানিমান হোমিও হোম পাল্টে দিগম্বর হোমিও হোম করে ফেললেন। ভূতের বইটা এখন তাঁর সবসময়ের সঙ্গী।

# বাড়ি বদল

নিরাপদ ভড় যখন খোকসা-গাজিপুরে একখানা পুরোনো বাড়ি কিনে ফেলল তখন তার শুভাকাঙ্ক্ষীরা বলল, নিরাপদর মাথাটাই গেছে। মরতে কেউ ওই ধাধধারা গোবিন্দপুরে যায়?

নিরাপদও কথাটা স্বীকার করে। খোকসা-গাজিপুরে বাড়ি আহাম্মকরা ছাড়া কেউ কেনে না। সেখানে যাও বা লোকবসতি ছিল তাও উঠে যাচ্ছে ক্রমে। গ্রামটাই হেজেমেজে যাওয়ার মুখে। কুল্যে সতেরোটি পরিবারের বাস।

বন্ধু নয়নকিশোর তালেবর লোক। পীরগঞ্জে তার বড় কারবার। দুঃখ করে বলল, শেষে সস্তা বলেই বাড়িটা কিনে ফেললে হে নিরাপদ! সস্তার তিন অবস্থা—কথাটা তো জানো?

—তা আর জানি না। সস্তাটা একটু বড় রকমেরই পাওয়া গেল কিনা। হারাধনবাবু মাত্র পাঁচশোটি টাকা নিলেন বাড়িটার জন্য।

—হারাধনবাবু যে দাঁও মারলেন হে! পাঁচশো টাকায় ক-দিন পর গোটা খোকসা-গাজিপুরই কিনে ফেলতে পারতে। গ্রাম তো হেজেমেজে যাচ্ছে।

—তা ভাই যা-ই বলো, একটু নিরিবিলিতে তো থাকা যাবে।

নিরাপদর এখন নিরিবিলিটাই বড্ড দরকার। তার বউ কাত্যায়নী হল গিয়ে সাঙ্ঘাতিক ঝগড়াটে। পীরগঞ্জে পাড়া-প্রতিবেশী এমন কেউ নেই যার সঙ্গে কাত্যায়নীর ঝগড়া নেই। রোজ সকাল থেকে শুরু হয়, রাত অবধি চলে। লোকে বলে, মানুষ না পেলে কাত্যায়নী কাক-কুকুর-বেড়ালের সঙ্গেও নাকি ঝগড়া বাঁধিয়ে নেয়। ঝগড়াটে কাত্যায়নীর জন্য নিরাপদর জীবনে শান্তি নেই। খোকসা-গাজিপুরে লোকাভাব। সুতরাং সেখানে ঝগড়াড়ঝাঁটিটা কিছু কম পড়বে এই আশায় বাড়িটা কেনা।

মাঘ মাসে পুজো-টুজো দিয়ে বাড়িতে ঢুকে পড়ল নিরাপদ।

পাঁচশো টাকায় আজকাল একটা ভালো খাসি অবধি হয় না তো বাড়ি! হারাধন একরকম দানই করেছে তাকে বলা যায়। আর একটু পুরোনো হলেও তেমন খারাপ নয় বাড়িখানা। গুটি চারেক ঘর, রান্নাঘর, উঠোন, পাতকুয়ো—সবই আছে। মেঝেয় ফাটল, দেয়ালে নোনা, ছাদে ফুটো-ফাটা থাকলেও এ যে বড্ড সস্তায় পাওয়া গেছে তাতে সন্দেহ নেই। নিরাপদ বেশ খুশি। তবে কাত্যায়নী একটু ব্যাজার। খানিকক্ষণ মুখভার করে থেকে বলল, তা এখানে আশেপাশে লোকজন কোথা?

—লোকজন! লোকজন নেই বলেই তো কেনা! বেশ নিরিবিলি।

—আহা! বলি, দুটো কথা কওয়ার লোকও তো চাই, নাকি! তুমি তো সারাদিন পীরগঞ্জে ভুসিমালের দোকান সামলাবে। আমার সময়টা কাটে কী করে বলো তো!

নিরাপদ বুঝতে পারল, ঝগড়া করার লোক পাচ্ছে না বলেই কাত্যায়নীর মেজাজ ঠিক নেই। তবে সেটা আর মুখে বলল না। কাত্যায়নীর মুখের সামনে সে কস্মিনকালেও দাঁড়াতে পারে না। খুবই ভয়ে ভয়ে থাকতে হয় তাকে।

তবে কাত্যায়নী কথা বাড়াল না। বাড়িটা যে প্রায় বিনিমাগনা পাওয়া গেছে সেটা তার অজানা নয়।

সন্ধেবেলা পীরগঞ্জের দোকান বন্ধ করে সাইকেলে চার মাইল ঠেঙিয়ে বাড়ি ফিরে নিরাপদ দেখল, কাত্যায়নী বেজার হলেও সারাদিন খেটেখুটে বাড়িটা বেশ গুছিয়ে তুলেছে। দেখে খুশিই হল নিরাপদ। কিন্তু কাত্যায়নীর মুখখানা বড্ড ভার।

খেতে বসে নিরাপদ খুব ভয়ে ভয়ে জিগ্যেস করে, তুমি খুশি হওনি?

ফোঁস করে একটা শ্বাস ছেড়ে কাত্যায়নী বলে, চুপ করে থাকতে থাকতে যে আমার পেটে বায়ু হচ্ছে সে খেয়াল আছে? লোকজন তো দূরের কথা, সারাদিন একটা কুকুর-বেড়াল অবধি এধার মাড়ায়নি। এমনকি কাকপক্ষীও না। এভাবে থাকা যায়?

মনে মনে খুশি হলেও নিরাপদ মুখে একটু দুঃখ-দুঃখ ভাব ফুটিয়ে বলল, দ্যাখো ক-দিন, হয়তো সয়ে যাবে।

—না বাপু, আমার পীরগঞ্জই ভালো ছিল। সারাদিন পাঁচটা লোকের মুখ দেখা যেত। এ তো দেখছি ভূতুড়ে জায়গা।

নিরাপদ আর কথা বাড়াল না। শুধু বলল, আচ্ছা, দেখছি কী করা যায়।

কিন্তু নিরাপদর যে কিছু করার নেই তা সে নিজেও জানে। বিপদ হল, ঝগড়ার লোক পাওয়া না গেলে কাত্যায়নী তার সঙ্গেই ঝগড়া বাঁধিয়ে বসবে। নিরাপদ অবশ্য 'রা' কাড়ে না। রা কাড়ে না বলেই তার সঙ্গে ঝগড়া করতে গিয়ে কাত্যায়নী হাঁফিয়ে ওঠে। মাঝে মাঝে বলেও, ওঃ, তোমার সঙ্গে বসবাস করাই কঠিন। বলি, মুখে কুলুপ এঁটে থাকো কেন? দু-চারটে কথাও কি তোমার মুখে আসতে চায় না?

নিরাপদ জানে বোবার শত্রু নেই। সে শুধু মিটিমিটি হাসে।

কাত্যায়নী বলল, আজ একটু ফাঁক পেয়ে গ্রামটা একটু ঘুরে ফিরে দেখে আসতে গিয়েছিলাম। যে কয়েকঘর লোক আছে তারাও যেন কেমনধারা।

—কেমনধারা বলো তো?

—সব কেমন ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে। একজন মাঝবয়সি মেয়েমানুষ পুকুরে কাপড় কাচছিল। তার জল ছিটকে এসে আমার গায় লাগায় দিলাম দু-পাঁচ কথা শুনিয়ে। কিন্তু, মেয়েমানুষটা একটা জবাব পর্যন্ত দিল না, তা জানো?

—বাঃ, বাঃ, এ তো ভালো খবর।

গোমড়ামুখে কাত্যায়নী বলে, ছাই ভালো। একতরফা কথা কয়ে কি সুখ হয় বাপু? কাটে কাটে কথা না হলে কি পেটের বায়ু নামে? আমার তো বাপু কথা না কয়ে কয়ে সারাদিন উদগার হচ্ছে।

নিরাপদ মনে মনে প্রমাদ গুনল। কাত্যায়নীর পেটের বায়ু না নামলে তাকে না আবার খোকসা-গাজিপুরের বাস তুলে দিতে হয়।

যাই হোক, খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ল নিরাপদ। নিরিবিলি জায়গায় লেপমুড়ি দিতেই ঘুমটাও চলে এল চট করে।

মাঝরাতে হঠাৎ কাত্যায়নী তাকে ঠেলে জাগিয়ে দিয়ে বলল, ওগো ঘরের ভিতর দিয়ে কে একটা হেঁটে গেল বলো তো?

নিরাপদ লাফিয়ে উঠল, চোর নাকি?

কাত্যায়নী বড় বড় চোখ করে বলল, চোরই হবে হয়তো। কিন্তু তার পরনে সাদা থান।

—মেয়েছেলে?

—আবছামতো সেরকমই যেন দেখলুম। আমার বড় ভয় করছে।

নিরাপদ উঠে টর্চ জ্বেলে চারদিক ভালো করে দেখে এল। না, কেউ কোথাও নেই।

—ঠিকই দেখেছি। পেটে বায়ু হচ্ছে বলে ঘুম আসছিল না।

নিরাপদ একটু চিন্তিত হয়ে পড়ল।

—শেষে ভূতের বাড়ি কিনলে নাকি গো?

—রাম রাম। ইয়ে, তা ভূতের বাড়ি হলে তো এখানে থাকা যাবে না।

—তাই তো বলছি। পীরগঞ্জেই ফিরে যাই চলো।

—দেখা যাক।

পরের দিন রাতে শুয়ে কাত্যায়নী নিরাপদর কাছে কাবুল করে ফেলল, সত্যি কথা বলতে কী, একটু ঝগড়াঝাঁটি না করলে আমার ভাত হজম হতে চায় না। তা এখানে তো ভালো ঝগড়া করার লোকই নেই। আজও ঝগড়াটে খুঁজতে বেরিয়েছিলুম, তা দেখলুম এখানে সবকটা কেমন ম্যান্তামারা। কথাই কইতে চায় না। পীরগঞ্জে কেমন ভালো ভালো ঝগড়াটে ছিল বলো—পল্টুর মা, হাবুলের পিসি, নিভাননী, আলতাবুড়ি—সেরকম এখানে কোথায়?

হঠাৎ অন্ধকারে একটা খোনা গলা শোনা গেল, এঃ, বড্ড যে গুমোর!

নিরাপদ চেঁচিয়ে উঠল—কে? কে?

আর কোনো শব্দ হল না।

কাত্যায়নী উঠে বসল। তারপর অন্ধকারকে উদ্দেশ্য করে বলল, গুণ থাকলেই গুমোর হয়, বুঝলে! ক্ষমতা থাকলে গুমোর ভাঙো এসে, তবে বুঝবে।

অন্ধকার থেকে খোনা গলাটা ফের বলে উঠল, পীরগঞ্জে সব বিদ্যেধরীরা রয়েছেন, আর এখানে বুঝি কেউ নেই? আবার ঠ্যাকার দেখানো হচ্ছে! দেব যখন থোঁতা মুখ ভোঁতা করে তখন বুঝবে। খোকসা-গাজিপুর তার পছন্দ হচ্ছে না! ইঃ, বড়ো নাক-উঁচু বিবি এসে হাজির হয়ে কৃতার্থ করলেন আমাদের। রামু বামনির জিবের ধার তো দ্যাখোনি।

কাত্যায়নী আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে নিয়ে জুত করে বসে বলে উঠল, অনেক রামু বামনি পার হয়ে এসেছি, আমাকে আর রামু বামনি চেনাতে হবে না। বলি অত অহংকারে কাজ কী? সামনে এসে দেখাও না কার কত তেজ!

—এঃ, তেজ দেখবেন! পীরগঞ্জের হ্যাতান্যাতা মেয়েছেলে পেয়েছ নাকি বাপু? খোকসা-গাজিপুরে মনসা পাল, গেনু হালদার, ময়না গায়েনের নাম শুনেছ কখনও? কুরুক্ষেত্তর করে ছাড়ত তারা। এক চোপাটে তোমার মতো আনাড়িকে উড়িয়ে দেবে।

আসুক দিকি, আসুক! কাতু ভড় এখনও মরে যায়নি। বিষদাঁত কেমন করে ওপরাতে হয় তা সে ভালোই জানে।

নিরাপদর বুকটা প্রথমে ধড়ধড় করে কাঁপছিল বটে, কিন্তু একটু বাদেই বুকটা স্বাভাবিক হয়ে এল। কাত্যয়নী আর রামু বামনির তুমুল ঝগড়ার মধ্যেই সে শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন সকালে উঠে দেখল, তার বউ কাত্যায়নীর মুখে হাসি, পেটের বায়ু নেমে গেছে।

নিরাপদ বলল, ইয়ে, তা পীরগঞ্জে বাড়ি দেখব নাকি?

কাত্যায়নী একগাল হেসে বলল, না না, থাক, খোকসা-গাজিপুর বেশ ভালো জায়গা বলেই মনে হচ্ছে।

নিরাপদ নিশ্চিন্ত মনে বেরিয়ে পড়ল।

# বাহুবল

বৃদ্ধ রাজা বীরভদ্রের মৃত্যু হয়েছে। তরুণ যুবরাজ বাহুবল অভিষিক্ত হয়েছেন সিংহাসনে। বাহুবলের বয়স মাত্র সপ্তবিংশতি বর্ষ। সুকুমার, সুদর্শন বাহুবল দীর্ঘকায় ও সবল হলেও তাঁর সুকুমার চিত্ত সম্পর্কে রাজ্যবাসী অবহিত। বাহুবলের বীরত্বের খ্যাতি নেই, বিচক্ষণতারও নয়।

পিতার অন্ত্যেষ্টি ও পারলৌকিক কার্যাদির পর সিংহাসনে আরোহণ করার পরেই রাজার একবার মৃগয়ায় যাওয়ার প্রথা আছে। কালপ্রাচীন প্রথা। কিন্তু বাহুবল সম্মত হলেন না। মহামাত্যকে বললেন, নিরীহ পশুপাখি হত্যার মধ্যে আমি কোনও আনন্দ পাই না। এই প্রথা বন্ধ হোক।

বিস্মিত বৃদ্ধ মহামাত্য বললেন, মহারাজ, এ যে আপনাদের কৌলিক সংস্কার, মৃগয়ায় না গেলে প্রজারা ধিক্কার দেবে।

প্রজারা সংস্কারবশে চলে, প্রজানুরঞ্জন রাজার কর্তব্য বটে, কিন্তু রাজা তো প্রজার আজ্ঞাবাহী নয়। আপনি মৃগয়া রদের কথা ঘোষণা করে দিন।

মহামাত্য দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে বললেন, মৃগয়ার এখনও পক্ষকাল বিলম্ব আছে। এখনই ঘোষণার প্রয়োজন কী? ইতিমধ্যে আপনি বরং বিষয়টা পুনর্বার বিবেচনা করুন।

বিবেচনার কিছু নেই। পশুবধ আমার পছন্দ নয়।

মহারাজ, মৃগয়া শুধু পশুমেধ তো নয়, একটা আনন্দানুষ্ঠান। আপনি মৃগয়ায় গিয়ে পশুবধ না করলেও ক্ষতি নেই। আপনার কয়েক সহস্র রাজকর্মচারী ও প্রজা অনুগমন করবে। তারা বহুদিন ধরে এই দিনটির প্রত্যাশায় বসে আছে।

বাহুবল একটু হাসলেন, কিছু বললেন না।

কথাটা রটনা হল, পল্লবিত হল, প্রজারা বলাবলি করতে লাগল, নতুন রাজা কাপুরুষ নন তো।

বাহুবল কাপুরুষ হয়ে থাকলে আশঙ্কার কথা। কারণ উত্তরের অঙ্গদ রাজ্যের ভয়ংকর রাজা মকর রাজ্যবিস্তারের সুযোগ খুঁজছে। যে কোনও সময়ে সে আক্রমণ করতে পারে।

রাজমাতা বিশালাক্ষীর কানেও কথাটা উঠল। পুত্রের সুকুমার ও ভাবুক স্বভাব সম্পর্কে তিনি অবহিত। বাহুবল অন্তর্মুখি এবং হিংস্রতাবিমুখ। পুত্রকে নিয়ে রাজমাতার কিছু উদ্বেগ আছে।

তিনি বাহুবলকে নিজের কক্ষে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, বৎস। কুলগত সংস্কার ও প্রথার অবলোপ পিতৃপুরুষের প্রতি অবমাননা। তুমি এ কাজে বিরত হও। মৃগয়া রাজধর্ম। তুমি ধর্মাচরণ করছ বলেই ধরে নাও।

পশুবধ ধর্ম নয় মা। তবু তোমার আদেশ আমি বিবেচনা করব।

ওদিকে রাজা মকরের কানেও কথাটা পৌঁছেছে। বাহুবল এক দুর্বল-চিত্ত রাজা। প্রজা বা রাজকর্মচারীরা তাঁকে পছন্দ করছে না। মকর এক দুর্দান্ত যুদ্ধপ্রিয় রাজা। রাজ্যবিস্তারেও তাঁর প্রবল আসক্তি। বিশেষ করে পার্শ্বের রাজ্য সুফলার প্রতি তাঁর লোভ বহু দিনের। সুফলা সার্থকনামা রাজ্য। উর্বর মৃত্তিকা ও খনিজ দ্রবের জন্য বিখ্যাত। অরণ্য অঞ্চলেও নানা উদ্ভিজ্জ উৎপাদন হয়ে থাকে। পশুদের প্রিয় বিচরণভূমি।

মকর যুদ্ধপ্রিয় হলেও হঠকারী নন। হঠাৎ পুরোদস্তুর আক্রমণে না গিয়ে তিনি চরদের সংবাদ সংগ্রহে নিয়োগ করলেন। আর সুফলা রাজ্যের উত্তর ভাগের তিনটি অরক্ষিত গ্রাম দখল করে বাহুবলের প্রতিক্রিয়ার প্রতি লক্ষ্য রাখলেন।

খবর যথাসময়ে বাহুবলের কানে পৌঁছোলো।

বৃদ্ধ মহামাত্য বললেন, মহারাজ, এ কিন্তু অশুভ সংকেত। রাজা মকর আপনার প্রতিক্রিয়ার প্রতি লক্ষ্য রাখছেন। তিনটি গ্রাম দখল করে তিনি আপনাকে অপমান করার উদ্যোগ নিয়েছেন।

বাহুবল একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, রক্তপাত ঘটেছে কি?

না মহারাজ। প্রতিরোধ করা হয়নি, যুদ্ধ হয়নি, গ্রামের নিরীহ প্রজারা নিরস্ত্র গ্রামবাসী মাত্র।

তাহলে ওই তিনটি গ্রামের জন্য শোকের কিছু দেখি না।

কিন্তু মহারাজ, এ তো সবে শুরু। মকর তিনটি গ্রাম নিয়েই ক্ষান্ত হবে না। তার লক্ষ্য সুফলা রাজ্যের সমগ্র ভূখণ্ড। আপনার পিতার আমলে সে সাহস করেনি বটে, কিন্তু এখন সে স্পর্ধা প্রদর্শন করতে শুরু করেছে।

বাহুবলকে চিন্তিত বা বিচলিত মনে হচ্ছিল না। মুখশ্রী খুব স্বাভাবিক। বাহুবল শুধু বললেন, আপাতত তিনটি গ্রাম পুনরুদ্ধারের জন্য সৈন্যসজ্জার প্রয়োজন নেই। মকর রাজ্য আক্রমণ করলে ভাবা যাবে।

মহামাত্য সন্তুষ্ট হলেন না। রাজকর্মচারীরা বিশেষ রকমের ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। প্রজাদের মধ্যে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

রাজমাতা পুনরায় পুত্রকে আহ্বান করে বললেন, বৎস, তুমি কি যুদ্ধ করতে কুণ্ঠা বোধ করো?

হ্যাঁ, মা, করি। রক্তপাত আমার অনভিপ্রেত।

কিন্তু বাবা, রক্তপাত যেখানে অনিবার্য সেখানে তো তা করতেই হবে। তুমি প্রজারক্ষক, তাদের নিরাপত্তার ভার যদি না নাও তাহলে তারা যে নিরাপত্তার অভাব বোধ করবে।

তিনটি গ্রামের প্রজারা তেমন দুঃখে নেই। রাজ্য যে বদল হয়েছে তাও তারা ভালো করে বুঝতে পারেনি। সুফলা রাজ্য অনেক বড়, তিনটি গ্রামের জন্য আমাদের তেমন ক্ষতি হবে না।

এটা কথা নয় বাবা। রাজা হল প্রজার পিতার মতো। পিতার ভূমিকা যদি পালন না কর তাহলে প্রজারা তোমার প্রতি রুষ্ট হবে।

জানি মা, তারা রুষ্ট হচ্ছে। আমাকে একটু ভাবতে দাও।

ইতিমধ্যে পক্ষকাল অতিবাহিত হল। মৃগয়ার দিন সমাতগত হল। চারদিকে সাজো-সাজো রব। বাহুবল মৃগয়ায় যেতে রাজী হয়েছেন।

সকালবেলাতে অশ্ব, হস্তি, রথ সজ্জিত হল। পদব্রজে অগ্রসর হতে লাগল বহু প্রজা। বাদ্য-বাজনার কোনও অভাব নেই। উত্তরের মৃগদাবতেই আজ মৃগয়ার আয়োজন।

রাজধানী থেকে দুই ক্রোশ দূরবর্তী মৃগদাবে পৌঁছে বিশাল বাহিনী চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল বধযোগ্য পশুপক্ষীর সন্ধানে। শিকারীদের হাতে তীর-ধনুক, বর্শা, খড়্গ ইত্যাদি।

রাজা বাহুবল অশ্বারোহণে এসেছেন। তাঁর অঙ্গেও অস্ত্রসজ্জার অভাব নেই। কোষে বদ্ধ তরবারি, স্কন্ধে তূণীর ও ধনুক, হাতে বর্শা। কিন্তু শিকারে তাঁর মন নেই। অশ্বারোহণে তিনি অরণ্যের মধ্যে ইতস্তত বিচরণ করতে লাগলেন।

তারপর হঠাৎ তাঁর খেয়াল হল, সঙ্গীসাথীদের কোলাহল আর শোনা যাচ্ছে না, অনুচরেরা পিছিয়ে পড়েছে এবং তিনি একা। দ্বিপ্রহরের সূর্য মাথার ওপর। তিনি পথের সন্ধান করে ব্যর্থ হলেন। অগত্যা অশ্বকে যথা ইচ্ছা গমনের জন্য নিয়ন্ত্রণ শিথিল করলেন।

ক্রমশ গভীর থেকে গভীরতর অরণ্যের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছিলেন বাহুবল। কিন্তু অকস্মাৎ ভিনরাজ্যের যোদ্ধা তাঁকে ঘিরে ফেলল। তাদের সর্দার বলল, মহারাজ, আমরা আপনাকে চিনি। আমরা অঙ্গরাজ্যের সৈন্য। আপনাকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়ার আদেশ আছে। আত্মসমর্পণ করুন।

বাহুবল বিনা প্রতিরোধে আত্মসমর্পণ করলেন।

দিনান্তে তিনি রাজা মকরের সভাকক্ষে নীত হলেন। রাজা মকর বিশালদেহী পুরুষ। অবয়বে প্রবল নিষ্ঠুরতা, দৃষ্টি ক্রুর। বাহুবলের দিকে নেত্রপাত করে মকর বললেন, তুমি সিংহাসনের অযোগ্য এক কাপুরুষ। যদি নিজের প্রাণরক্ষা করতের চাও তবে দাসখত লিখে দাও।

বাহুবল পরিশ্রান্ত, ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত। মকরের চোখে চোখ রেখে বললেন, রাজা মকর, অন্যের প্রাণ নিতে আমার কুণ্ঠা আছে বটে, কিন্তু নিজের প্রাণের মায়া আমার নেই। আপনি আমাকে বধ করতে পারেন।

মকর কিছুক্ষণ বাহুবলের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। রাজা মকরের চোখে কেউ কয়েক পলকের বেশি চোখ রাখতে পারে না। কিন্তু বাহুবলের চোখ বিন্দুমাত্র কম্পিত হল না দেখে মকর বিস্মিত হলেন। বললেন তুমি সুকুমারমতি, অনভিজ্ঞ, রাজকার্যের অনুপযুক্ত। তুমি তোমার রাজ্য আমার নামে লিখে মহামাত্যকে একটি পত্র দাও। আমার দূত তা এখনই নিয়ে যাবে। আমি তোমার প্রাণ ভিক্ষা দেব।

রাজা মকর, আমি তো বলেইছি আমার প্রাণের ভয় নেই।

মকর হাসলেন, তুমি লিখে না দিলেও কাল সকালেই আমার সেনাবাহিনী সুফলা রাজ্য দখল করবে। সেক্ষেত্রে তোমার সেনাবাহিনী প্রতিরোধ করবে এবং রক্তপাত হবে। তুমি কি তা চাও?

না, আমি তা চাই না।

তবে লেখো।

রাজা বাহুবল তাই লিখে দিলেন।

সকালবেলায় প্রহরীরা বাহুবলকে নিয়ে গিয়ে রাজ্যের সীমানা পার করে ছেড়ে দিল।

রাজা বাহুবল নিতান্তই সাধারণ বেশভূষায় অচেনা অজানা ভূখণ্ডের উদ্দেশে লক্ষ্যহীন পায়ে রওনা দিলেন।

সারাদিন তিনি পদব্রজে বহু জনপদ আর নগর আর অরণ্য অতিক্রম করলেন। সামন্য কিছু মুদ্রা সঙ্গে ছিল। তাই দিয়ে দ্বিপ্রহরে এক জনপদে সামান্য আহার্য গ্রহণ করলেন। রাত্রি সমাগমে তিনি উপস্থিত হলেন এক জনপদে। গ্রামের নাম মঙ্গলপুর।

এক গৃহস্থের দরজায় উপস্থিত হয়ে বললেন, আমি নিরাশ্রয়, একটু আশ্রয়প্রার্থী।

গৃহস্থ বিস্মিত লোচনে তাঁকে নীরক্ষণ করে বললেন, আপনার বেশভূষা সাধারণ হলেও আপনার মুখশ্রী ও শরীরের গঠন রাজকীয়। আসুন, এই গৃহে আপনার আশ্রয় হবে।

রাজা বাহুবল নিজের পরিচয় দিলেন না। শুধু বললেন তিনি এক শ্রেষ্ঠীপুত্র। ভাগ্য বিপর্যয়ে এই দশা। গৃহস্থ বিশেষ প্রশ্ন করলেন না। বললেন, এই রাজ্যের নাম কনকপুরী। রাজা বিন্ধ্যেশ্বর প্রজাপালক ও দয়ালু। আপনি তার কাছে গেলে উপার্জনের ব্যবস্থা হতে পারে।

আমি কাজকর্ম কিছুই জানি না। বিদ্যাশিক্ষা কিছু আছে। তা কাজের নয়।

বাহুবলকে গৃহস্থ এবং তার স্ত্রী উভয়েই বড় ভালোবেসে ফেললেন। ঘরের ছেলের মতোই রয়ে গেলেন বাহুবল।

বাহুবল সেই গ্রামের বিভিন্ন গুণীজনের কাছ থেকে কৃষিবিদ্যা, রসায়ন, চিকিৎসাবিদ্যা, দ্রব্যগুণ ইত্যাদি শিক্ষা করতে লাগলেন। সকলেরই স্নেহের পাত্র তিনি।

শ্রেষ্ঠীকন্যা মালবিকা যথানিয়মে তাঁর প্রণয়াসক্ত হয়ে পড়ল। কন্যা অতীব সুন্দরী এবং বুদ্ধিমতী।

বাহুবল শঙ্কিত হলেন। মালবিকাকে বললেন, আমার পূর্ব ইতিহাস তুমি জানো না। অজ্ঞাতকুলশীলকে প্রণয় নিবেদন করা বিধেয় নয়, হঠকারিতা।

আমার হৃদয় আপনাকে জানে।

ওটা ভাবের কথা।

মালবিকা বাহুবলকে সর্বদাই অনুসরণ করে। সে জানে বাহুবলের চিত্তে দুর্বল দিক হল তাঁর মায়া, মমতা, করুণা। একদিন মালবিকা কৌশলে তাঁকে মাধ্বী পান করিয়ে তাঁর আসল পরিচয় জেনে নিল। বুঝতে পারল বাহুবলকে যোগ্য করে তুলতে হলে তাঁর দুর্বলতা কাটিয়ে তুলতে হবে।

মালবিকা একদিন একটি মৃত বৃশ্চিক সংগ্রহ করে সেটি পাদমূলে রেখে আর্তনাদ করতে লাগল, রক্ষা কর। আমাকে বৃশ্চিক দংশন করতে আসছে!

বাহুবল ছুটে এলেন।

মালবিকা বলল, রক্ষা করুন বাহুবল, ওই দেখুন কালান্তক বৃশ্চিক।

বাহুবল ক্ষণেক বিভ্রান্ত বোধ করলেন।

মারুন বাহুবল, মারুন।

আর্তনাদ ও উপরোধে বাহুবল মৃত বৃশ্চিককেই পদাঘাতে ছিন্নভিন্ন করলেন।

এইমতো নানা কৌশলে মালবিকা তাঁকে দিয়ে নানা কীটপতঙ্গ, সর্প ও ক্রমে ক্রমে ব্যাঘ্র, ভল্লুক ইত্যাদি বধে উদ্যোজিত করতে লাগল।

বৎসরান্তে, মালবিকা দেখল, বাহুবল দুর্বলতা কাটিয়ে উঠেছেন।

জনান্তিকে মালবিকা একদিন বলল, মহারাজ, রাজ্য পুনরুদ্ধার করতে হবে। আপনার মাতা ও প্রিয়জনেরা শত্রুর হাতে বন্দী, প্রজারা অন্য রাজার অধীন এবং অত্যাচারিত। এই অন্যায় আপনি কেন সহ্য করবেন? মকরকে বিতাড়িত করতেই হবে। যুদ্ধে আমি আপনার সঙ্গী হব।

বাহুবল দ্বিধায় পড়লেন। চিন্তা করলেন। কিন্তু মালবিকা গোপনে এক দূত পাঠিয়ে সুফলা রাজ্যে বাহুবলের অনুগত সোনাবাহিনীকে খবর পাঠাল। সেই সেনাবাহিনীর সৈন্যরা এসে জুটল বাহুবলের কাছে।

অগত্যা বাহুবল যুদ্ধযাত্রা করলেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করতে করতেই বাহুবল বুঝতে পারলেন, তাঁর ভিতরে কী ভয়ংকর বীরত্ব ও নিষ্ঠুরতা লুকিয়ে আছে। স্বল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়েও তিনি মকরের বাহিনীকে ছিন্নভিন্ন করে দিলেন। স্বয়ং মকর নিহত হলেন বাহুবলের হাতে। রাজ্য পুনরুদ্ধার হল। বন্দীদশা থেকে রাজমাতা ও পরিবারের অন্যান্যরা মুক্তি পেলেন। প্রজারা রাজা বাহুবলকে দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করল।

রাজা বাহুবল ও মালবিকার বিবাহ বেশ সাড়ম্বরে সম্পন্ন হল।

কিন্তু রাজা বাহুবল মাঝে মাঝে নির্জনে বিরলে বসে নিজের দু'খানি সবল হাতের দিকে চেয়ে থাকেন। তাঁর কেবলই কেন যেন মনে হয়, তিনি ঠিক তিনি নন। অন্য কেউ। তাঁর ভিতর থেকে সুগন্ধ চলে গেছে, সৌন্দর্য চলে গেছে, সূক্ষ্ম ভাব চলে গেছে। তিনি যেন এক পাথরের রাজা।

# কে

টেলিফোনটা এল বেলা বারটার পর, সেসময় সিদ্ধিনাথ সাঙ্ঘাতিক ব্যস্ত। কোম্পানির ডিরেক্টরদের জরুরি মিটিঙের মাইনুটস ভালো করে দেখে ঝালিয়ে নিচ্ছে। ভুল টুল থাকলে বা কিছু বাদ গেলে কোপ পড়বে তার ওপর। দায়িত্বের কাজ। কিন্তু গত পাঁচ বছর যাবৎ এ কাজ করে আসা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত যে আত্মবিশ্বাস অর্জন করেনি। তার বস বা দণ্ডমুণ্ডের কর্তা দয়াবান মেহেতা অতি খুঁতখুঁতে লোক। সামান্য ত্রুটিবিচ্যুতিও সহ্য করেন না। বেসরকারি অফিসে চাকরির স্থিরতা আলগা বলেই ভয়টাও বেশি।

একটু বিরক্ত হয়েই লাইনটা তুলে সে বলল, ইয়েস?

ওপাশ থেকে একটা গমগমে পুরুষ গলা বলে, সিদ্ধিনাথ রায় আছেন?

বলছি?

আপনার দ্বারা কিছু হবে না মশাই।

ভীষণ অবাক হয়ে সিদ্ধিনাথ বলে, তার মানে? কে আপনি?

আমি কে নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। আমার চেয়ে আমার কথাগুলো জরুরি।

ব্যাপারটা কী তা একটু খুলে বলবেন?

আপনাদের ডিরেক্টরদের মিটিং কবে?

কেন?

প্রশ্ন করবেন না। শুধু জবাব দিয়ে যান।

হুকুম নাকি?

মশাই, হুকুম টুকুম নয়। আমি যতদূর জানি মিটিং আগামীকাল, বেলা তিনটের সময়। ঠিক।

হুম!

মিটিং-এ কী হবে তা জানেন?

জানি। কিন্তু সেটা বলতে পারব না।

আরে, মশাই আপনি মিস্টার মেহেতার সেক্রেটারি হিসেবে যা জানেন তা আমারও জানা নয়। মাইনুটসে কী আছে তা আমিও জানি। কিন্তু ওর মধ্যে একটা মারাত্মক জিনিসও আছে যা আপনি জানেন না।

সিদ্ধিনাথ স্বভাবে ভিতু মানুষ। ভয় খেয়ে বলে, এতে কী আছে?

এজেন্ডার শেষে একটা মিলেনিয়াম ডিসকাসন আছে। দেখেছেন?

দেখব না কেন? এজেন্ডা তো আমার হাতেই তৈরি। ইন ফ্যাক্ট ওটা নিয়েই তো আমি বসে আছি।

ধুর মশাই, আপনি কাজের লোক নন। আপনার কোম্পানি এখন দুঃসময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। তাই ওটি বেচে দেওয়া হচ্ছে ময়ূর ইন্ডাস্ট্রির কাছে। ডিসকাশনটা ওই ট্রানজাকশন নিয়েই।

বলেন কী?

ঠিকই বলছি। ময়ূর ইন্ডাস্ট্রির ক্ষমতা অনেক বেশি। তারা কোম্পানি কিনে নিয়েই ড্রাস্টিক ছাঁটাই করবে। অর্থাৎ আগামী মাসে আপনার চাকরিটি না থাকারই সম্ভাবনা।

আপনি মিথ্যে ভয় দেখাচ্ছেন না তো?

না। আমি ময়ূর ইন্ডাস্ট্রির একজন কর্মচারী। খবর রাখি।

আপনি আমাকে কী করে চিনলেন?

আপনি মেহেতার সেক্রেটারি, আপনাকে চেনা সহজ।

মেহেতার এক গন্ডা সেক্রেটারি আছে। আমি তো চুনোপুঁটি।

তা বটে, কিন্তু মেহেতার পারসোনাল ফাইলে আপনার অ্যাকসেস আছে।

দূর মশাই, ফাইল টাইলের যুগ আর আছে নাকি? ওসব কেরানিদের কাছে থাকে। মেহেতার ফাইল তার কম্পিউটারে লোড করা। আমার কেন, কারোরই অ্যাকসেস নেই।

আমি মেহেতার পারসোনাল ফাইল নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না। তাতে আমার কোনও প্রয়োজনও নেই। কিন্তু পারসোনাল ফাইলটিতে আপনার প্রয়োজন আছে।

কী প্রয়োজন বলুন তো?

মেহেতা এই ফাইলে তার কর্মচারীদের স্বার্থে একটা অ্যাসেসমেন্ট করে রেখেছে। কে ভালো কে কাজের লোক এবং কে অপদার্থ, বুঝেছেন?

হ্যাঁ।

মেহেতার ওই অ্যাসেসমেন্টের ওপরেই ছাঁটাই করা হবে। সম্ভবত আপনার সম্পর্কে মেহেতার অ্যাসেসমেন্ট খুব একটা ভালো নয়।

ওঃ!

আপনাকে একটা পাসওয়ার্ড দিচ্ছি। নোট করে নিন। মেহেতা যখন আজ বিকেলে অফিস থেকে বেরিয়ে যাবে তখন আপনি ওর কম্পিউটার ট্যাপ করুন।

ও বাবা।

ভয় পাবেন না। আপনার সম্পর্কে যা লেখা আছে তার একটা প্রিন্ট আউট বের করে নিন। তারপর ওই অংশটা ডিলিট করে দিয়ে একটু সংশোধন করে ফের লোড করে দেবেন।

সর্বনাশ। তাহলে ধরা পড়ে যাব যে!

এই জন্যই তো বলি, আপনি কাজের লোক নন।

কাজটা অন্যায় হবে না?

না, মেহেতা আপনার সম্পর্কে যা লিখেছে সেটাও হয়তো আপনার প্রতি অবিচার। আপনি তেমন কাজের না হলেও খুব সিনসিয়ার লোক। বিশ্বস্তও বটে। আপনার চাকরি যাওয়া উচিত নয়।

ধরা পড়লে আমার চাকরি কালই যাবে।

ধরা পড়ার ভয় নেই। মেহেতা তার ফাইল রিচেক করবে না। করার কারণও নেই। একটা কথা মনে রাখবেন। যা করার আজই করতে হবে। মেহেতা ওই কপি আগামীকালই ময়ূর ইন্ডাস্ট্রির মিস্টার সিংকে হ্যান্ডওভার করবেন। মনে রাখবেন। বি এ ম্যান।

আচ্ছা দেখছি।

ঘাবড়ে যাচ্ছেন নাকি মশাই?

ভাবছি, আপনি এত কথা জানলেন কী করে।

জানাই আমার কাজ। জানার জন্যই আমি মোটা বেতন পাই।

কিন্তু আমাকে বাঁচানর চেষ্টাই বা কেন করছেন?

ওই যে বললাম, আপনি কাজের লোক না হলেও ভালো লোক, আমি চাইনা আপনার এই যৌবনকালেই চাকরিটা যাক।

শুধু এই কারণ?

কারণ আরও কিছু থাকতে পারে। সেটা আপাতত উহ্য থাক। এখন মেহেতার ফাইলে আপনার সম্পর্কে যা লেখা আছে তা থেকে কী কী বাক্য বাদ দিয়ে কোন কোন বাক্য বসাতে হবে তা নোট করে নিন।

ফাইলে কী আছে তা আপনি জানলেন কী করে?

ফের ছেলেমানুষী প্রশ্ন। বললাম তো জানাই আমার কাজ।

আচ্ছা বলুন। আমি নোট করছি।

সিদ্ধিনাথ যন্ত্রচালিতের মতো তার প্যাডে নোট নিল।

আর কিছু বলবেন?

না। ওতেই হবে। এখন মাথা ঠান্ডা রেখে কাজটা করুন। মেহেতা আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই বেরিয়ে যাবে। পাঁচটার সময় গ্র্যান্ড হোটেলে মিস্টার সিং-এর সঙ্গে তার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।

কেউ যদি আমাকে দেখে ফেলে মেহেতার ঘরে?

দূর মশাই, দেখলেই কী? মেহেতার ঘরে তো আপনি যেতেই পারেন।

তা পারি। কিন্তু ওঁর কম্পিউটারে হাত দেওয়ার নিয়ম নেই।

রিস্কটা তো নিতেই হবে। আপনি বরং কাজের ছুতোয় একটু ওভার স্টে করুন। লেট ইভিনিং-এ অফিস ফাঁকা হয়ে গেলে কাজটা করবেন।

আপনি যে কেন আমাকে এই ঝামেলায় ফেললেন কে জানে?

ঝামেলা। বলেন কী মশাই? এর চেয়ে অনেক বেশি ঝামেলায় যে মেহেতা আপনাকে ফেলেছে?

তা ঠিক। তবে এসব আমার ভালো লাগছে না।

আত্মরক্ষার অধিকার সকলেরই আছে। ময়ূর ইন্ডাস্ট্রির আওতায় এলে আপনার ভ্যালুয়েশন হবে। মিস্টার সিং, মিস্টার রেড্ডি বা মিস্টার পিল্লাই লোক খারাপ নন। এখানে আপনার উন্নতি হবে।

আপনি তো নিজের পরিচয় দিলেন না?

না। আপনার জানার দরকারও নেই।

এনি কনট্যাক্ট নাম্বার?

না মশাই। ওসবের দরকার নেই। আমি সময়মতো ঠিক যোগাযোগ করব। বাই।

কাঁপা হাতে ফোনটা রেখে দিল সিদ্ধিনাথ। লোকটা ডেনজারাস। সে রুমালে মুখের ঘাম মুছল। যাকে ড্যাশিং পুশিং বলে তা সে নয় ঠিকই। কিন্তু সে যে ভালো লোক এটা সে নিজেও জানে। কিন্তু এই অচেনা লোকটা তা জানল কী করে? এমন কি হতে পারে যে, লোকটা আসলে অচেনা নয়? কিন্তু অনেক ভেবেও সে গলার স্বরটা কার তা অনুমান করতে পারল না।

অফিসে তার মাঝে মাঝেই দেরি হয়। কাজেই কেউ কোনও সন্দেহ করবে এমন ভয়ের কারণ নেই। মেহেতা সাড়ে চারটেয় বেরিয়ে যাওয়ার পর বেয়ারা মেহেতার ঘর লক করে দিয়ে গেল। তাতে অবশ্য চিন্তার কারণ নেই। বিভিন্ন কাজে মেহেতার ঘরে তাকে ঢুকতে হয় বলে তার কাছে ডুপ্লিকেট চাবি থাকে।

সন্ধে সাড়ে ছ'টার পর সে মেহেতার ঘরে ঢুকল। বুকটা ধড়াস ধড়াস করছিল। সিদ্ধিনাথ এই বলে মনকে প্রবোধ দিল, এমনিতেই তো গেছি, ওমনিতেও না হয় যাব।

কম্পিউটারে সে সিদ্ধহস্ত, ঝটপট যন্ত্র চালু করে অচেনা লোকটার দেওয়া পাসওয়ার্ড ক্লিক করে—আশ্চর্যের বিষয়—পারসোনাল ফাইল উন্মোচন করে ফেলতে পারল। আরও অবাক কাণ্ড—লোকটা যা যা বলেছিল সব সত্যি। তার সম্পর্কে রিপোর্ট বিপজ্জনক। রিট্রেঞ্চমেন্ট হওয়া অবশ্যসম্ভাবী।

হাতের নোট প্যাডটা দেখে হুবহু লোকটা যা বলেছিল তা করে গেল সে। রিপোর্টটা উড়িয়ে নতুন রিপোর্ট ভরে দিতে তার বেশি সময়ও লাগল না।

একটা নীতিবোধ খরখর করছিল বটে, কিন্তু এই দুষ্টু দুনিয়ায় কিছুটা খল না হয়েও বোধহয় উপায় নেই।

পরদিন দুপুরে যখন ডিরেক্টরদের মিটিং চলছে সেই সময়ে ফোনটা এল।

কী মশাই, পারলেন?

সিদ্ধিনাথ হেসে বলল, হ্যাঁ। আশ্চর্যের কথা, আপনি যা বলেছিলেন সব সত্যি।

খুব বেঁচে গেছেন মশাই। কিন্তু ভবিষ্যতে এত ক্যাবলা হয়ে থাকবেন না। নিজের জীবনের রাশ নিজের হাতে শক্ত করে ধরুন।

আপনি কে?

বললাম তো, আমি কে সেটা বড় কথা নয়।

সেটাই বড় কথা।

ময়ূর ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে অ্যামালগেমেশান হলে হয়তো পরিচয় হয়ে যাবে।

উপকারটা যে কেন করলেন জানি না। একটা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ তো দেবেন।

ঠিক আছে। যথাসময়ে সুযোগ পাবেন। আজ ছাড়ছি।

বাস্তবিকই দিন সাতেকের মাথায় কোম্পানি হস্তান্তর এবং ব্যাপক রদবদল আর ছাঁটাই শুরু হয়ে গেল। শুরু হল কর্মচারীদের বিক্ষোভ, ধর্মঘট এবং অশান্তি। সিদ্ধিনাথ বাদে মেহেতার বাকি তিনজন সেক্রেটারিরই চাকরি গেছে। চাকরি গেছে আরও অনেকেরই।

যথারীতি মাস দুই অশান্তি আর বিক্ষোভ চলার পর কর্মচারী আর নতুন মালিকদের মধ্যে সমঝোতা হল। ক্ষতিপূরণ, ভি আর এস এবং কিছু কর্মীকে পুনর্বহাল করে কোম্পানি আবার চালু হল। আর এই নতুন ব্যবস্থায় সিদ্ধিনাথকে রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টে বদলি করা হল প্রোমোশন দিয়ে।

একদিন আবার ফোন।

কী মশাই?

আরে আপনি? এখনও তো পরিচয় হল না আপনার সঙ্গে।

কেন, ফোনের পরিচয় কি পরিচয় নয়?

এখনও তো আপনার নামই জানা হল না?

নামে কি আসে যায়?

নাঃ, আপনি দেখছি প্রহেলিকা হয়েই রইলেন?

আচ্ছা, আপনার একটা বিয়ের কথা চলছিল না?
হ্যাঁ, আমার মা খুব খুঁতখুঁতে, পাত্রী পছন্দ হচ্ছে না।
অনেক পাত্রীপক্ষ আসছে নাকি?
বোধহয়। আমি ও ব্যাপারে বিশেষ খোঁজখবর রাখি না।
আমি রাখি।
আপনি রাখেন! কী আশ্চর্য!
এখন ভালো করে শুনুন।
কী শুনব বলুন।
আপনার মা অনেক ঝাড়াই বাছাইয়ের পর চারজন পাত্রী নির্বাচন করেছেন। এখন মনস্থির করতে পারছেন না।
তাই হবে বোধহয়।
আপনি মাকে বলুন শ্যামবাজারের পাত্রীটিকে আপনার পছন্দ।
সে কী?
তার নাম সুচেতনা।
আপনি বলছেন? আশ্চর্য। শ্যামবাজারেও যে একটা পাত্রী আছে এবং তার নাম যে সুচেতনা এটা তো আমিই জানি না।
আপনি একটু ক্যাবলা টাইপের তো আছেনই।
তা বোধহয় ঠিকই। আমি একটু বোকা।
বোকা নন, অপদার্থ নন, তবে উদ্যোগের অভাব আছে। মনে হয় উপযুক্ত একটি বউ পেলে আপনি এসব ড্র ব্যাক কাটিয়ে উঠতে পারবেন।
সুচেতনাকেই বিয়ে করব বলছেন?
হ্যাঁ। তাতে আপনার ভালোই হবে।
মনে হচ্ছে আপনি যা বলেন সেটা শুনে চলাই উচিত।
তাতে আপনার ভালোই হবে।
সিদ্ধিনাথ বাড়ি ফিরে মাকে জানিয়ে দিল, সুচেতনাকে বিয়ে করবে। মার একটু মনস্থিরতার অভাব ছিল। সিদ্ধিনাথের কথায় সেটা কেটে গেল। বলল, হ্যাঁ, মেয়েটা তো ভালোই।
বিয়ে হয়ে গেল সিদ্ধিনাথের। দেখা গেল সুচেতনা খুবই ভালো মেয়ে। সিদ্ধিনাথের স্বভাবের নানাবিধ দুর্বলতা ও আলস্য এবং সাহসের অভাব কেটে যেতে লাগল। সিদ্ধিনাথ নিজেকে সুখী একজন মানুষ হিসেবে টের পেতে লাগল। ফের একদিন ফোন।
যা বলেছিলাম মিলেছে কিনা মশাই।
খুব মিলেছে। এবার ছাড়ব না, আপনি কে বলুন?
কে বলে আপনার মনে হয়?
ভগবান।
দূর। এতটা নয়। মাটিতে নামুন।
তাহলে বোধহয় আমার বিবেক।
মন্দ বলেননি, আপাতত ওইটেই চলুক।
না না, প্লিজ। একদিন আসুন বাড়িতে, পরিচয় হোক।
পরিচয় আছে মশাই। শুধু আইডেন্টিফিকেশনটা করতে পারেননি।
আর ধন্ধে মারবেন না, বলে ফেলুন।

বলব মশাই, একদিন বলেই ফেলব।

কী বলে ডাকব আপনাকে?

রাম শ্যাম যদু মধু যা খুশি। ওসব নিয়ে ভাববেন না।

কী যে মুস্কিলে ফেললেন?

সব পর্দাই কি ছিঁড়ে ফেলতে হয় মশাই? রহস্যটা থাক না। রহস্য মোচন হয়ে গেলে যে ব্যাপারটা আলুনি হয়ে যাবে। তাই নয়?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সিদ্ধিনাথ বলে, তাই হবে বোধহয়।

# রাজার গল্প

রাজা চিন্তিত ভাবে বললেন, মহামাত্য, রাজপুত্রের মতিগতি আমি ভালো বুঝছি না। তার কাজকর্মে মন নেই। মাঝে মাঝেই কোথায় যে উধাও হয়ে যায় জানি না। সংসারে সে আসক্ত নয়। বিলাস ব্যসনে তার প্রলোভন নেই, সুন্দরী, নৃত্যগীত পটিয়সী যে সব রমনী তার বিনোদনের জন্য সর্বদা নিয়োজিত তাদের দিকে সে ফিরেও তাকায় না। মাত্র দ্বাবিংশতি বছর বয়সে তার এই বৈরাগ্য কেন যে বিষয়ে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

বৃদ্ধ মহামাত্য আভূমি অভিবাদ করে বললেন, শ্রীমন্মহারাজ, যুবরাজ অসিচালনায় নিপুণ, অতি দক্ষ ধনুর্ধর, দয়ালু এবং বিচক্ষণ। তাঁর চরিত্র নিষ্কলুষ। তাঁকে নিয়ে দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই।

ওইটেই দুশ্চিন্তার কারণ। দক্ষ অসিচালক বা দুরন্ত ধনুর্ধর হয়েও সে যুদ্ধবিশারদ হতে পারেনি। রাজপুত্র হয়েও ব্রহ্মচারীর মতো জীবনযাপন মোটেই সুলক্ষণ নয়, বরং পুরুষত্বের অভাব বলে প্রতীয়মান হয়। দয়ার্ধম ভালো বটে কিন্তু মানসিক দুর্বলতার লক্ষণ। তুমি বাপু, তার পিছনে তোমার সবচেয়ে ভালো গুপ্তচরকে নিয়োগ কর। সে কোথায় যায়, কী করে, কোনও কু-লোকের সংসর্গে পতিত হয়েছে কিনা সব সংবাদ সংগ্রহ কর। আমি তার ভবিষ্যৎ নিয়ে অতীব চিন্তিত।

যথা আজ্ঞা মহারাজ, আমার সর্বোত্তম গুপ্তচর পঞ্চমুখকেই আমি এ কার্যে নিয়োগ করছি। তার পদক্ষেপ মার্জারের মতো, দৃষ্টি ঈগলের ন্যায়, সে চিতাবাঘের মতো ক্ষিপ্র এবং সিংহের সমতুল সাহসী।

চমৎকার। দু'দিন সময় দিচ্ছি। কালক্ষেপের অবকাশ নেই। আমার তিন মহিষীর গর্ভে জাত চৌদ্দটি পুত্রকন্যা এবং উপপত্নীদের গর্ভে জাত আরও একুশটি সন্তানের সকলেই স্বাভাবিক আচরণশীল। শুধু যুবরাজের মধ্যেই কিছু বৈকল্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তুমি তৎপর হও।

প্রৌঢ় মহারাজ চিন্তান্বিত মুখে আসন ছেড়ে উঠে অন্দরমহলের দিকে যাত্রা করলেন। তাঁর মন ভারাক্রান্ত। সন্নিহিত রাজ্য বিক্রমগড়ের রাজকন্যা বৈশালীর সঙ্গে যুবরাজের বিয়ের কথা প্রায় পাকা। বিক্রমগড়ের রাজা বৈশ্বানরের ওই একটিই কন্যা। বিবাহ সংঘটিত হলে কালক্রমে ওই রাজ্যটি এ রাজ্যের অধীনস্থ হবে। এ

ছাড়াও যুবরাজের জন্য আরও তিন-চারটি পাত্রী প্রস্তুত। শৈলপুরের রাজকন্যা কুশলা, জয়নগরে রাজকন্যা মধুরা, নন্দনকাননের শ্রেষ্ঠীকন্যা মুদ্রিতা। যুবরাজের সঙ্গে এদের সকলের বিয়েই হবে অতীব লাভজনক। শৈলপুরের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক উন্নীত হবে, জয়নগরের সঙ্গে হবে দীর্ঘকালের বিবাদের অবসান, শ্রেষ্ঠী অযুত স্বর্ণমুদ্রা যৌতুক দেবেন। কিন্তু যুবরাজের আচরণ দেখে মনে হয় সে বিবাহে আগ্রহী নয়।

পুত্রকে মহারাজ খুব ভালো করে চেনেন, এমন নয়। তাঁর পুত্রকন্যার সংখ্যা অনেক, তাছাড়া আমোদ-প্রমোদ, রাজকার্য, যুদ্ধযাত্রা ইত্যাদিতে ব্যাপৃত থাকতে হয় বলে পুত্রকন্যা নিয়ে আদিখ্যেতা করার সময় তাঁর নেই। জ্যেষ্ঠা মহিষী মহারানী ইন্দিরার গর্ভে ওই একটি সন্তান জন্মেছিল। অন্যান্য মহিষী ও উপপত্নীরা উর্বরা হলেও ইন্দিরা নন। মহরানী ইন্দিরার প্রতি তাই একটু মৃদু বিদ্বেষ আছে মহারাজের। তবে তীকষ্ন ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী ইন্দিরাকে মহারাজ একটু সমঝে চলেন। বিশেষ ঘাঁটান না।

আজ মধ্যাহ্নভোজনের সময় মহরানী ইন্দিরা মহারাজের উপনিষদ হলে মহারাজ মৃদু স্বরে বললেন, যুবরাজ আদিত্য কোথায় তা কি জানো?

সে কয়েকদিনের জন্য একটু বেড়াতে গেছে।

কোথায় গেছে তা কি বলে যায়নি?

নির্দিষ্ট কোনও স্থান নেই। যে ইতস্তত ভ্রমণ করতে ভালোবাসে।

সে কি সঙ্গে নিরাপত্তারক্ষীদের নিয়ে গেছে?

না। সে কখনও নিরাপত্তারক্ষী নেয় না। সাধারণ ভ্রমণকারীর মতো ঘুরে বেড়ায়।

সেটা তো বিপজ্জনক, তাকে রাজপুত্র বলে সনাক্ত করতে পারলে দুষ্কৃতিরা তাকে অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায় করতে পারে। শত্রুভাবাপন্ন লোকেরা তাকে হত্যা করতে পারে। কু-লোকে তাকে বিপথে চালিত করতে পারে। বিদ্রোহী ও সন্ত্রাসবাদীরা তার মগজ ধোলাই করতে পারে। সুতরাং যুবরাজের এবম্বিধ আচরণ সমর্থনযোগ্য নয়।

মহারাণী মৃদুস্বরে বললেন, যুবরাজ রাজাবরোধে থাকা পছন্দ করে না।

বিরক্ত মহারাজ বললেন, কেন, এখানে তার কি কোনও অসুবিধে হচ্ছে? আমোদ-প্রমোদ, বিলাস-ব্যসন, গীতবাদ্য, নারী বা সুরা কোন কিছুই তো অলভ্য নয়। তার আর কী চাই?

জানি না মহারাজ।

বিরক্ত মহারাজ অর্ধভুক্ত অন্নব্যঞ্জন ফেলে রেখে উঠে পড়লেন। তিনি নিজে রাজপ্রাসাদের বাইরে কদাচিৎ যান। যাওয়ার প্রয়োজন ও ইচ্ছে দুটিরই অভাব। কখনও কখনও নিসর্গ নিরীক্ষণ বা মৃগয়া বা যুদ্ধযাত্রা বা তীর্থ দর্শনে গেছেন বটে, কিন্তু সেপাই-শান্ত্রী নিয়ে। যৌবনকালে ছদ্মবেশে রাজ্যের অবস্থা দেখতে কয়েকবার বেরিয়েছেন বটে, কিন্তু অমাত্যরা আগেভাগেই চারদিকে সতর্কবার্তা পাঠিয়ে দিত, ফলে রাস্তাঘাট মলমুক্ত থাকত, কাঙাল ভিখারিদের পাঠানো হত গোপন আস্তানায়, প্রজাবর্গ সুবেশ পরিধান করে প্রস্তুত থাকত। যুবরাজ তাঁর সন্তান এবং সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হয়েও এসব কী করে বেড়াচ্ছে? এ যে ঘোরতর অরাজকীয়তা!

পরদিন সকালে পঞ্চমুখ এসে একান্তে মহারাজের সকাশে উপস্থিত হয়ে বলল, জয় হোক মহারাজ! যুবরাজের খবর এনেছি।

মহরাজ ভ্রূ কুঞ্চিত করে বললেন, কী সংবাদ গুপ্তচর?

উত্তরখণ্ডে সপ্তগ্রাম নামে একটি তুচ্ছ পল্লীতে যুবরাজ এক সামান্য চাষীর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। দিনে তিনি নিজ হস্তে চাষবাস করেন, নদীতে বাঁধ বাঁধতে গ্রামবাসীদের সমবেত করে স্বেচ্ছাশ্রমে নিয়োজিত করেন, আলস্য ও মূঢ়তা ত্যাগ করে মানুষকে কর্মতৎপর করে তুলতে চেষ্টা করেন। তার চেষ্টায় গ্রামটির শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে।

মহারাজের মুখমণ্ডল ক্রোধে রক্তবর্ণ ধারণ করল, যুবরাজ চাষী হয়েছে? আমার সম্মান তাহলে ধূল্যবলুণ্ঠিত! ছিঃ ছিঃ, নিজের বংশ-পরিচয়ও কি সে বিস্মৃত হয়েছে?

ক্রোধ সংবরণ করুন মহারাজ, যুবরাজকে সেখানে কেউ চেনে না। সপ্তাগ্রামের লোকেরা এদেশের রাজার নামও জানে না। রাজা কেমন হয় সে ধারণাও তাদের নেই। পথ দুর্গম এবং পল্লীটি অরণ্যবেষ্টিত বলে সেখানে রাজপুরুষরা কেউ কখনও যায় না। আধুনিক বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, চিকিৎসা কিছুরই খবর তারা রাখে না। যুবরাজ গিয়ে তাদের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার ঘটিয়েছেন।

চুপ করো মুর্খ! রাজপুত্রেরা সামান্য কাজের জন্য জন্মগ্রহণ করে না। তাদের বৃহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই ঈশ্বর পৃথিবীতে প্রেরণ করেন।

পঞ্চমুখ আভূমি অভিবাদন করে বলল, যে আজ্ঞে মহারাজ!

রাজা আসন ত্যাগ করে বললেন, আমি আজই সপ্তগ্রামে যাব। সেপাই-সান্ত্রীদের প্রস্তুত হতে বলো। তুমি হবে আমাদের পথপ্রদর্শক।

চারদিকে সাজো-সাজো রব পড়ে গেল। রটে গেল যে, যুবরাজকে ধরে বেঁধে বন্দী করে আনতে রাজা সসৈন্যে রাজ্যের উত্তরখণ্ডে রওনা হচ্ছেন। সকলে হায়-হায় করতে লাগল। রাজ্যবাসী ক্ষ্যাপাটে ও সরল চরিত্রের যুবরাজকে বড়ই স্নেহের চোখে দেখে।

বেশ বড়সড় বাহিনী নিয়ে মহারাজ রওনা হলেন। অগ্রে পঞ্চমুখ। ক্রমে রাজপথ শেষ হয়ে সংকীর্ণ অরণ্যসংকুল গিরিপথ শুরু হল। ফলে অগ্রগমনের গতি শ্লথ হয়ে এল। পথশ্রম বাড়তে লাগল। ক্রমে সন্ধ্যাসমাগম ঘটল।

মহারাজ বিরক্ত হয়ে বললেন, আর কত দূর হে পঞ্চমুখ? এত কালক্ষেপ হচ্ছে কেন? তুমি তো অষ্টপ্রহরের মধ্যেই সেই স্থান থেকে ঘুরে এসেছিলে!

করজোড়ে পঞ্চমুখ বলে, মহারাজ, আমি ক্ষিপ্রগতি। উপরন্তু আপনি চলেছেন লোকলস্কর নিয়ে, প্রচুর তৈজসপত্রাদিও সঙ্গে চলেছে। গীতবাদ্যপটিয়সী রমণীরাও রয়েছেন। সুতরাং বিলম্ব হচ্ছে। এই গতিতে চললে সপ্তগ্রাম পৌঁছোতে আমাদের আরও দুদিন লাগবে।

রাজা ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, তাহলে আমি একাই যাব। আজ এখানেই শিবির স্থাপন করা যাক। কাল ভোরবেলা তুমি আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

যথা আজ্ঞা মহারাজ।

পরদিন ভোরের আলো ফোটার আগেই কাউকে কিছু না বলে মহারাজা আর পঞ্চমুখ রওনা হল। পথ দুর্গম, প্রচুর চড়াই-উতরাই, মহারাজা ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। তবে থামলেন না। দৃঢ় সংকল্প নিয়ে চলতে লাগলেন।

দ্বিপ্রহরে যে ক্ষুদ্র জনপদটিতে রাজা উপস্থিত হলেন তার নৈসর্গিক সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে মহারাজ বললেন, বাঃ, এ তো নন্দনকানন।

মহারাজ, এই হল সপ্তগ্রাম।

মহারাজের ঝলমলে রাজকীয় পোশাক, মাথায় সোনার মুকুট এবং দিব্যকান্তি দেখে বিস্মিত গ্রামবাসী এসে জড়ো হল চারধারে। এক প্রবীণ এগিয়ে এসে সাহস করে বলল, মহারাজ, আমরা কখনও রাজা দেখিনি। কি করে রাজাকে আপ্যায়ন করতে হয় তাও আমাদের জানা নেই। আমরা শুধু আমাদের যা সাধ্য তা করতে পারি।

পথক্লান্ত মহারাজ বললেন, আমি ক্ষুধার্ত, পিপাসার্ত। খাদ্য ও পানীয় যা আছে নিয়ে এসো। পঞ্চমুখ, তুমি যুবরাজকে ডেকে আনো। আমি তাকে নিয়ে আজই ফিরে যাব।

এই গ্রামে স্নানাগার নেই। মহারাজকে তাই নদীতে স্নান করতে হল। রাজপ্রাসাদের রাজকীয় স্নানাগারের সুগন্ধী জল নয় বটে, কিন্তু স্ফটিকস্বচ্ছ জলে অবগাহন করে মহরাজের শরীর স্নিগ্ধ হয়ে গেল। আহারে বসে

দেখলেন, রাজকীয় পাকশালার ঘৃত-মশলা-চর্চিত অন্নব্যঞ্জনাদি নয় বটে, কিন্তু এদের প্রস্তুত করা অন্নব্যঞ্জনে যেন ধরিত্রীর স্নেহ সঞ্চারিত হয়েছে। এখানকার ফলমূলাদিতেও যেন নূতনতর স্বাদ ও গন্ধ। মহারাজ পরিতৃপ্ত হলেন। এবং প্রত্যাবর্তনের কথা বিস্মৃত হয়ে বৃক্ষতলে মৃদু মন্দ মলয় পবনে একটি তুচ্ছ খট্টাঙ্গের ওপর শুয়ে নিদ্রাভিভূত হলেন। একটি ভারি সুমিষ্ট মুখশ্রীর কিশোরী তাঁকে ব্যজন করতে লাগল। যুবরাজ তাঁর পদসেবা করতে এলে মহারাজ তাঁকে নিরস্ত করে বললেন, ওসবের দরকার নেই। আজ অন্যরকম হোক।

একদিন কাটল, দু'দিন কাটল, মহারাজ রাজধানীতে প্রত্যাবর্তনের কথা যেন ভুলেই গেছেন। মহানন্দে তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন, চাষবাস দেখছেন, মানুষের সঙ্গে সহজভাবে মিশছেন। এক অদ্ভুত মুক্তির স্বাদ তাঁর অন্তরকে ভরে দিচ্ছে। সেই কিশোরী সর্বদাই তাঁর দেখাশোনা করছে। তার নাম আত্রেয়ী। মহারাজ বড় স্নেহ করতে লাগলেন তাকে।

সাতদিন পর যুবরাজকে ডেকে বললেন, বাপু হে, আমি আর রাজাবরোধে যেতে ইচ্ছুক নই। কিন্তু রাজা না থাকলে রাজ্য অচল। সতুরাং আমার মুখ চেয়ে তুমি ফিরে যাও। তোমার মতো করে রাজ্য শাসন কর। এটা পিতৃ-আদেশ।

যুবরাজ স্মিত হাসলেন, যথা আজ্ঞা।

আর আমি যদি আত্রেয়ীকে পুত্রবধূ করতে চাই তাহলে তোমার আপত্তি নেই তো?

না মহারাজ। কিন্তু আপনার তাতে বিপুল ক্ষতি।

মহারাজ মৃদু স্বরে বললেন, লাভক্ষতির হিসেব বদলে গেছে।

# হার কিংবা জিৎ

আপনার কি মনে হয় বিজয় ঘোষ সত্যিই মেয়েটাকে রেপ করেছিল? আপনি তো বিজয়ের বন্ধু। বলুন না।

কী করে বলব মশাই? রেপটা যখন হয় বলে কেস ডায়েরিতে বলা হয়েছে সেই সময়ে আমি ছিলাম অফিসের কাজে দিল্লিতে। রেপ তো আর সামনে হয়নি!

আহা, রেপ-টেপ কি আর সাক্ষীসাবুদ রেখে হয়! আমি বলছিলাম বিজয় ঘোষ কি রেপ করতে পারে বলে আপনার বিশ্বাস হয়? বন্ধুর স্বভাবচরিত্র সম্পর্কে আপনার তো একটা ধারণা নিশ্চয়ই আছে।

তা আছে।

আপনি বলতে গেলে বিজয় ঘোষের বাল্যবন্ধু, তাই না?

তা তো বটেই। শ্যামাকান্ত ইনস্টিউশনের আমি যখন ক্লাস সিক্সে পড়ি তখন বিজয় এসে ওই ক্লাসে ভর্তি হয়। আগে তারা আম্বালায় ছিল। তার বাবা বদলি হয়ে কলকাতায় আসে।

ক্লাস সিক্স? ও বাবা, তাহলে তো বাল্যবন্ধুই।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

বিজয় ঘোষ কিরকম ছেলে ছিল?

ভীষণ ব্রাইট, পড়াশুনোয় কিন্তু অ্যাভারেজ।

তাহলে ব্রাইটি বলছেন যে?

মানুষের ব্রাইটনেস কি শুধু লেখাপড়ায় প্রকাশ পায়? বিজয় ফুটবল, ক্রিকেট ইত্যাদিতে ছিল ভীষণ ভালো! খুব বুদ্ধিমান, চটপটে, স্মার্ট এবং ওই বয়সেই খুব ভালো ইংরিজি বলতে পারত। গানের গলাও ছিল অসাধারণ। সে স্কুলে ভর্তি হয়েই বেশ হই-চই ফেলে দেয়।

বটে!

হ্যাঁ। তবে বিজয় ছিল চাইল্ড প্রডিজি। অনেকে ছেলেবেলায় খুব ব্রাইট থাকে, দেখলে মনে হয় বড় হয়ে একটা কেউকেটা হবে। কিন্তু চাইল্ড প্রডিজিরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বড় হলে নিবে যায়, সাধারণ হয়ে যায়।

বিজয়ও কি তাই?

হ্যাঁ। নইলে বিজয়ের ভিতরে যে সম্ভাবনা ছিল তাতে ওর আজ একজন বিরাট মানুষ হওয়ার কথা। হয়নি। আর হয়নি বলেই ও ফ্রাস্ট্রেশনে ভোগে।

রেপটা কি সেই কারণেই? ফ্রাস্ট্রেশন থেকে?

বারবার আপনি রেপ শব্দটা ব্যবহার করছেন কেন বলুন তো? কেস ফাইলে কিন্তু রেপ কথাটা নেই। আছে সেকসুয়াল হ্যারাসমেন্ট।

ওই হল মশাই। কথার হেরফের ছাড়া আর কিছু তো নয়। সেক্স কথাটা তো আর উড়িয়ে দিতে পারবেন না। আসলে রেপই হয়েছিল, লোকলজ্জার ভয়ে মেয়েটা রেখেঢেকে বলছে।

আপনি হয়তো খুব ভুল বলেননি। প্রথমে রেপ বলেই এফ আই আর করা হয়েছিল।

ডাক্তারি পরীক্ষাও তো হয়েছিল, তাই না?

ডাক্তারি পরীক্ষার যখন তোড়জোর চলছে তখনই বয়ানটা পালটে ফেলা হয়। হ্যাঁ, আপনি হয়তো খুব ভুল বলেননি। ডাক্তারি পরীক্ষা এড়ানোর জন্যই বোধহয় এটা করা হয়েছে।

মেয়েটিকে কি আপনি চেনেন?

না। বিজয়ের সঙ্গে আমার মাস ছয়েক কোনও যোগাযোগ নেই। আমার চাকরিটা একটু বদখত। বিস্তর দৌড়ঝাঁপ, টুর, মিটিং ইত্যাদিতে কণ্টকিত। দম ফেলার সময় হয় না। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হয়েই ওঠে না। কাজেই বিজয়ের রিসেন্ট ডেভেলাপমেন্টগুলো আমার জানা ছিল না।

সে তো হতেই পারে। আপনার চাকরিটাও তো বড় মাপের।

আরে না মশাই, বড় মাপটাপ কিছু নয়। তবে মাইনে যেমন দেয়, তেমনি খাটিয়ে মারে।

তা তো জানিই। আমাদের পাড়া-প্রতিবেশীদের মধ্যে আপনাকে নিয়ে খুব কথা হয়।

কেন, কথা হয় কেন?

হবে না? ধরুন এই পাড়ায় সবাই প্রায় মধ্যবিত্ত, ছাপোষা। ব্রাইট ক্যারিয়ার বলতে মাত্র কয়েকজন। সেদিন কুঞ্জবিহারীবাবু বলছিলেন, সদাশিববাবুর ছেলে রাতুল এ পাড়ার বেস্ট বয়।

আরে না না, কুঞ্জবাবু বাড়িয়ে বলেছেন। বড্ড স্নেহ করেন তো।

স্নেহ তো আর এমনি করেন না। ট্যারা মেয়েটিকে গছাতে চান কিনা তাই অত স্নেহ।

ওঁর অবিবাহিতা মেয়ে রীনার কথা বলছেন?

হ্যাঁ মশাই, ভালো করে লক্ষ্য করবেন, ট্যারা।

তা হতে পারে। আমি ভালো করে দেখিনি।

আমাকে অনেকে বলে আমি নাকি পাড়ার ইনফর্মার। তা সত্যি কথা বলতে কী ইনফর্মেশন কালেক্ট করা আমার একটা হবি। তাতে মানুষের ভালো ছাড়া মন্দ হয় না।

ইনফর্মেশন কালেক্ট করার হবি থাকলে আপনি তো একজন রিপোর্টার হতে পারতেন।

আমার তো সেইটেই জীবনের লক্ষ্য ছিল। চেষ্টাও করেছি। কিন্তু এই পোড়া দেশে সুযোগ পাওয়াই তো কঠিন ব্যাপার। শেষ অবধি সরকারি চাকরিতে ঘষটাচ্ছি।

আপনিও তো বেশ ভালো চাকরি করেন শুনেছি।

বাংলায় এম এ, সুতরাং খুব বেশি উচ্চাশা করার কিছু ছিল না। তাই যে চাকরি জুটল তাইতেই লেগে পড়লাম। দশ বছর কেরানীগিরি করার পর হালে একটা প্রমোশন হয়েছে। এটাকে ভালো চাকরি বললে বড্ড বাড়াবাড়ি হবে।

সরকারি চাকরির সিকিউরিটি অনেক বেশি।

তা আছে। চাকরি যায় না ঠিকই, কিন্তু আর কিছু নেই। তা যাকগে মশাই, নিজের দুঃখের কথা শুনিয়ে কী হবে। বরং বিজয়বাবুর কথাই বলুন।

বলার কিছু নেই, ঘটনাটার মধ্যে কিছু গোলমাল আছে বলেই মনে হচ্ছে।

গোলমাল! কীরকম গোলমাল?

সেসব কেস আদালতে উঠলে প্রকাশ পাবে।

আচ্ছা, শুনেছি, রেপ কেস নাকি আদালতে প্রমাণ করা খুব শক্ত। সত্যি নাকি?

আমিও শুনেছি, রেপটা তো আর লোকের চোখের সামনে হয় না। তার ওপর অনেক মেয়ে আছে বলতে লজ্জা পায়। এরকমও শুনেছি, দেশে যত রেপ হয় তার বেশির ভাগই চেপে যাওয়া হয়। লোকলজ্জা বলে একটা ব্যাপার তো আছেই।

কিন্তু এটা উচিত নয়। রেপ-এর জন্য মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থাও তো হচ্ছে।

হ্যাঁ, কিন্তু সেটাও বাড়াবাড়ি হবে। ধরুন একটি মেয়ে যদি একটি ছেলেকে ফাঁসাতে চায় তাহলে সে ছেলেটির সঙ্গে ইচ্ছাকৃত সেকসুয়্যালি এনগেজড হওয়ার পর তার বিরুদ্ধে রেপ-এর অভিযোগ করতে পারে। বলাৎকার না ইচ্ছাকৃত মিলন তার বিচার হবে কী করে?

তাই তো! এ তো দেখছি বিরাট গাড্ডা।

হ্যাঁ, রেপ ব্যাপারটা একটু সেনসিটিভ। ইচ্ছেয় না অনিচ্ছেয়, বল প্রয়োগ করা হয়েছে কি হয়নি, এসব সূক্ষ্ম প্রশ্নে ব্যাপারটা ঝুলে থাকে।

আপনি কি বিজয়বাবুর সঙ্গে দেখা করেছিলেন?

চেষ্টা করেছি, দেখা হয়নি।

উনি কি পালিয়ে আছেন?

জামিন পাওয়ার পরে কাউকে কিছু না বলে অজ্ঞাতবাসে গেছে।

বিজয়বাবুর বাড়িতে কে কে আছে বলুন তো?

মা আর ভাই। ওর বাবা মারা গেছে গত বছর।

উনি তো ইচ্ছে করলে মেয়েটিকে বিয়েই করে ফেলতে পারতেন। তাহলে এই স্ক্যান্ডালটা হত না।

হুঁ, সেই অ্যাঙ্গেলটাও ভেবে দেখেছি, কিন্তু মেয়েটার বিয়ে নাকি অনেক আগে থেকেই অন্যত্র ঠিক হয়ে আছে।

এই স্ক্যান্ডালের পর বিয়েটা কেঁচে যাবে না তো!

উদারচেতা ছেলে হলে সে ভয় নেই, তবে—

তবে?

তবে কিছু বলাও যায় না।

তাহলে তো মুস্কিল। মেয়েটার হয়তো বিয়েই হবে না।

হ্যাঁ, সে সম্ভাবনা তো আছেই।

আপনি নেগোশিয়েট করে বিয়েটা দিতে পারেন না?

মেয়েটা আমার কথা শুনবে কেন?

চেষ্টা করে দেখুন না, শুনতেও তো পারে। বিজয়বাবুর বাড়ির কাছাকাছিই তো থাকে বলে শুনেছি।

হ্যাঁ, খবরের কাগজে তাই লিখেছিল বটে। হ্যাঁ মশাই, এর মধ্যে আবার রাজনীতি নেই তো! বিজয়বাবু তো আবার পার্টি করতেন। লোকাল কমিটির সেক্রেটারি না কী যেন ছিলেন?

হ্যাঁ, বিজয় ছাত্রজীবনেও রাজনীতি করত। এম এ-টা কোনওরকমে পাশ করেই হোলটাইম পার্টি ওয়ার্কার হয়ে যায়।

খুব আদর্শবাদী মানুষ ছিলেন নাকি?

আদর্শবাদী কিনা জানি না, তবে পার্টি নিয়ে মেতে থাকত। আমার মনে হত জীবনে নানা অসফলতা ভুলতে খানিকটা ফ্রাস্ট্রেশন থেকেই ও রাজনীতি করতে শুরু করে। ওটা ওর পলায়ন মনোবৃত্তির ব্যাপার। আর কিছু হতে পারিনি, রাজনীতি নিয়ে ডুবে থাকি।

বুঝেছি, ওই আজকাল যে সব ন্যাতাকে দেখি আর কী।

না, তাও নয়। বিজয় করাপটেড ছিল না, রাজনীতি থেকে বিশেষ কিছু গুছিয়ে নিতে পারেনি। হয়তো মতলবও ছিল না। জীবনটা একটা নেশার বস্তু ধরে কোনওরকমে কাটিয়ে দিতে চেয়েছিল। নেগেটিভ অ্যাটিচুড। আদর্শবাদীও ছিল না, করাপটেডও ছিল না। ও আর একরকম টাইপ। জীবনে সব আশা-ভরসা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, অনুপ্রেরণা শেষ হয়ে গিয়েছিল বলেই রাজনীতির ভেলা আঁকড়ে ধরে ভেসে থাকার চেষ্টা করছিল আর কী।

তা হবে মশাই, কিন্তু কথা হল এরকম লোক রেপ করতে গেল কেন?

ঠিকই বলেছেন। বিজয় রেপ করতে পারে বলে আমারও মনে হয় না। মেয়েবাজ ছিল না কখনও। প্রেমট্রেমও করেনি কখনও। খুব নিস্পৃহ ছিল মেয়েদের ব্যাপারে। তবে কিনা মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।

হ্যাঁ, ইমপালসিভ ক্রাইম বলেও একটা ব্যাপার আছে।

হ্যাঁ, আচমকা হঠাৎ মনের একটা ক্ষণিক অধঃপাত ঘটে যেতে পারে।

ব্যাপারটা নিয়ে তো আপনারও কিছু ভাবা উচিত। বিজয়বাবু একজন মানি লোক। আমরা সবাই ব্যাপারটা নিয়ে বেশ ধন্দে পড়ে গেছি।

মানুষ তো স্ক্যান্ডাল ভালোই বাসে, তাই না? বিজয়ের কেসটা নিয়ে এখন কিছুদিন শহর বেশ সরগরম।

তা যা বলেছেন। কলকাতার লাগোয়া হলেও আমাদের এই শহরে একটু মফস্বলি ব্যাপার আছে।

মানুষ সব জায়গাতে একইরকম। ঘোঁট পাকানো ব্যাপারটা আমাদের স্বভাবের মধ্যেই আছে। তবে চিন্তা করবেন না, বিজয় ঘোষের কেসটা নিয়ে আমি ভেবেছি! খোঁজখবরও যে করিনি তা নয়।

আসলে ব্যাপারটা কী জানেন, বিজয়বাবুকে চিনলেও মেয়েটি সম্পর্কে আমরা তেমন কিছুই জানি না। শুনেছি শান্তিনিকেতনে পড়ত।

আপনাদের দোষ নেই। বিজয়ের পাড়ার মেয়ে হলেও সে এখানে থাকত না। মেয়েটি ভালো। নাচ, গান, লেখাপড়া সব কিছুতেই চৌখোস। দেখতেও রীতিমতো ভালো। কোয়াইট অ্যাট্রাকটিভ।

আপনি চেনেন নাকি?

আগে চিনতাম না। ঘটনার পর খুব সম্প্রতি আমি মেয়েটির বাড়ি যাই।

বলেন কী? ওরা তো কাউকে অ্যালাউ করছে না।

আমাকেও করেনি।

তাহলে কী করে বাড়িতে ঢুকলেন?

ঢোকার চেষ্টাই করিনি। আমি ওদের বক্সে মেয়েটির নামে একটা চিঠি ফেলে দিয়ে আসি। চিঠিতে আমার নাম-ধাম-পরিচয় দিয়ে মেয়েটির সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলাম।

তাতে কাজ হল?

হল। পরদিন মেয়েটি আমার অফিসে ফোন করে।

বলেন কী মশাই! আপনি তো সাঙঘাতিক লোক! মেয়েটা কি দেখা করল নাকি?

কেন করবে না?

কখন? কোথায়? ওই দেখুন, আমি বড্ড বেশি কৌতূহল প্রকাশ করে ফেলছি।

সেটা স্বাভাবিক। এরকম একটা ঘটনা ঘটলে সকলেরই কৌতূহলী হওয়ার কথা।

মেয়েটা কী বলল?

শুনবেন?

বলতে বাধা না থাকলে শুনতে বাধা কিসের?

পরদিন মেয়েটি আমার অফিসের রিসেপশনে আসে। সেরকমই কথা ছিল। পরে আমরা একটা পশ রেস্তোরাঁয় গিয়ে বসি, পার্ক স্ট্রিটে।

দারুণ ব্যাপার।
দারুণ না নিদারুণ সেটা বোঝা মুশকিল।
মেয়েটিকে কেমন মনে হল?
সাধারণ বাঙালি মেয়েরা যেমন হয়, ওপর-চালাক নয়, বেশ স্মার্ট, আবার যথেষ্ট নম্র স্বভাব।
তারপর?
মেয়েটি আমাকে অকপটেই সব বলেছে।
কী বলেছে? ওয়াজ ইট রেপ?
না।
না! তাহলে?
তবে বিজয় ওকে নিয়ে দীঘা যাওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল।
দীঘা?
হ্যাঁ। দীঘা এখন লাভ বার্ডদের তীর্থক্ষেত্র। স্বভাবতই মেয়েটি রেগে গিয়ে কিছু অপমানসূচক কথা বলেছিল। বিজয়ও রি-অ্যাক্ট করে এবং এইভাবেই দুজনের মধ্যে একটা ধস্তাধস্তি হয়। মেয়েটির শাড়িটাড়ি খুলে গিয়েছিল। কোনও অনিচ্ছুক মেয়েকে রেপ করা শক্ত কাজ। প্রায় অসম্ভব কাজ। বিজয় তেমন বলবান পুরুষও নয়। কাজেই রেপ বিজয় করেনি। কিন্তু শ্লীলতাহানি বলেও একটা ব্যাপার আছে, যা ঠিক রেপ নয়, তবে গায়ে হাত দেওয়া, চুমু খাওয়ার চেষ্টা করা বা জামাকাপড় খুলে দেওয়া ইত্যাদি। এসবও আইনের চোখে অপরাধ।
জানি। তাহলে মেয়েটা প্রথমে রেপড হওয়ার অভিযোগ করেছিল কেন?
মেয়েটি কিছুই করেনি। বাড়িতে এসে ও ঘটনাটা বলে দেয়। থানায় গিয়েছিল ওর মামা, তিনি ওই থানারই সার্কেল ইনসপেকটর। তিনি আবার রাজনীতি করেন এবং বিজয়ের পার্টিরই মেম্বার। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি বিজয়কে ব্যক্তিগত কারণে একদম পছন্দ করেন না। কেস ফাইল করেন তিনিই।
হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনেছি বটে, মেয়েটির এক আত্মীয় পুলিশের লোক।
ঘটনাটা তাই একটু আগলি টার্ন নেয়।
কিন্তু বিজয়বাবুর বক্তব্য কী?
খুবই আশ্চর্যের কথা, গতকাল গভীর রাতে বিজয় আমাকে হঠাৎ ফোন করে।
বটে!
হ্যাঁ, বিজয় কী করে যেন খবর পেয়েছে যে আমি মেয়েটির সঙ্গে দেখা করেছি। বিজয়ের বক্তব্য খুব সোজা। সে বলেছে মেয়েটিকে দেখে তার একটা তীব্র আকর্ষণ জন্মেছিল কিছুদিন ধরে। ঘটনার দিন সন্ধেবেলা মেয়েটি তাদের বাড়িতে আসে। বিজয়ের ভাইয়ের সঙ্গে বোধহয় লেখাপড়াঘটিত একটা সম্পর্ক ছিল তার, তাই প্রায়ই আসত। সেদিন সন্ধেবেলা বাড়িতে কেউ ছিল না। বিজয় মেয়েটিকে বিনা ভূমিকায় বিয়ের প্রস্তাব দেয়। মেয়েটি না বলে দেওয়ায় সে এরপর যা করেছে তা স্বাভাবিক মস্তিষ্কে করেনি। সে বেহেড হয়ে গিয়েছিল।
ঘটনা কি এইটুকুই?
আপনার কি মনে হয় এটার ভিতরে আরও কিছু আছে?
না না, ঘটনা এটুকু হতেই বা বাধা কী? সব ঘটনাই কি আমাদের ফরমাশ মতো ঘটবে?
তাহলে ঘটনা এটুকুই।
রাতুলবাবু, একটা কথা।
কী কথা?
আমাকে পাড়ার লোকে ইনফর্মার বলে।

হ্যাঁ, সে তো বলেছেন।
আমারও একটা ইনফর্মেশন আছে। বলব?
সেটা আবার কী?
আপনি অনুমতি করলে বলতে পারি।
বলুন না।
বিজয়বাবু চাইল্ড প্রডিজি ছিলেন, একথা ঠিক। কিন্তু বড় হয়ে ওঁর প্রতিভা নষ্ট হয়ে যায় একথা ঠিক নয়। আসলে উনি শেষ হয়েছিলেন একজনের প্রতিহিংসেয়।
তাই নাকি?
হ্যাঁ, বাইরে তাঁদের বন্ধুত্ব থাকলেও বিজয়বাবু ভিতরে ভিতরে তাঁর ওই সুদর্শন, স্মার্ট বন্ধুকে টেক্কা দিতে পারতেন না। আর ওই যন্ত্রণা ওঁকে কুরে কুরে খেত। বিজয়বাবুর অনেক গুণ ছিল ঠিকই, কিন্তু খুব সহজেই অন্যান্য বিষয়ে আকৃষ্ট হয়ে পড়তেন বলে তাঁর বুদ্ধিটা ছিল তরল। একরোখা, জেদি ছিলেন না। সহজেই হতাশ হয়ে পড়তেন। ফলে এই হতাশাই তাঁর ভিতরটা ফোঁপরা করে দিল। নেতিবাচক মনোভব হয়ে উঠল প্রবল। আত্মবিশ্বাস নষ্ট হয়ে গেল। সেই বন্ধুরই ছোট বোনের প্রেমে পড়েছিলেন তিনি। সেখানেও ধাক্কা খান।
ও বাবা, আপনি যে আমার চেয়েও বেশি জানেন দেখছি।
আমি যে ইনফর্মার।
ঠিক আছে, বলুন।
আর বিশেষ কিছু বলার নেই। বিজয়বাবুর বন্ধু যখন ধাপে ধাপে উন্নতি করতে লাগলেন, আই টি এম সিএ হয়ে রিসার্চ করে আরও অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠলেন তখন বিজয়বাবু মনের অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছেন।
তারপর?
বিজয়বাবুর সেই বন্ধুটির সম্প্রতি বিয়ে ঠিক হয়। চমৎকার মেয়ে। যেমন চেহারা, তেমনি গুণ। লাখে একটা পাওয়া যায় না। মেয়েটি শান্তিনিকেতনের ছাত্রী। বিয়ে ঠিক হওয়ার পর বন্ধুটির সঙ্গে তার ভাবী স্ত্রীর শান্তিনিকেতনেই দেখা হয়। পরস্পরকে তাদের খুবই ভালো লেগে যায়। দেখা-সাক্ষাৎ মাঝে মাঝেই তারা করত, তবে গোপনে। বিয়ের আগেই দুজনের মধ্যে ভালোবাসাও তৈরি হয়ে যায়। আমি কি সব ঠিকঠাক বলছি?
বলে যান না, শুনতে খারাপ লাগছে না।
লাগার কথাও নয়। দুর্ভাগ্যের কথা হল মেয়েটি বিজয়বাবুর প্রতিবেশী এবং একথাও ঠিক যে, মেয়েটি বিজয়বাবুর ভাই অজয়বাবুর কাছ থেকে বইপত্র আনতে যেত। আর একথাও ঠিক যে বিজয়বাবু মেয়েটিকে দেখে মুগ্ধ হন। কিন্তু কপাল খারাপ, সেই মেয়েটি তাঁর বন্ধুর বাগদত্তা। ফলে ব্যর্থ ও হতাশাগ্রস্ত বিজয়বাবু অক্ষমভাবেই মেয়েটিকে আক্রমণ করে বসেন। উদ্দেশ্য বন্ধুর ওপর শেষ একটা প্রতিশোধ নেওয়া। তাতে তাঁর নিজের বদনাম হয় হোক। তিনি তো সবই খুইয়ে বসেছেন। বিজয়বাবুর পক্ষে মেয়েটিকে রেপ করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু যতটা পারেন তার পবিত্রতা নষ্ট করে বদনাম ছড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন। ভেবেছিলেন, এর ফলে বিয়েটা ভেঙে যাবে। ঠিক বলছি কি?
বলে যান।
বিজয়বাবু পারলেন না। বদনাম হল, পার্টি হয়তো তাঁকে তাড়িয়ে দেবে। বিজয়বাবু একেবারেই ছন্নছাড়া হয়ে পড়বেন। তাই না?
কী করা যাবে বলুন।
একটা জিনিস কিন্তু করা যায়।
কী বলুন তো।
বন্ধুটি তাঁর বিয়েতে বিজয়বাবুকে নিমন্ত্রণ করতে পারেন।

তথাস্তু।

# গাড়ির সংলাপ

মশাইকে খুব চেনা-চেনা লাগছে! কোথায় দেখেছি বলুন তো।

তা এই ট্রেনেই দেখে থাকবেন। এই পাঁচটা পঁয়তাল্লিশের লোকালেই আমি রোজ যাই কিনা।

কিন্তু আমি তো মশাই, এই লোকালে আজই প্রথম চড়ছি।

অ। আপনি তাহলে ডেইলি প্যাসেঞ্জার নন!

কস্মিনকালেও নই। কলকাতায় চার পুরুষের বাস।

বেঁচে গেছেন দাদা। রোজ সাতসকালে দু'মাইল সাইকেল চালিয়ে এসে ট্রেন ধরার যে কী যন্ত্রণা!

তা যা বলেছেন! আজ সকালে ট্রেন ধরতে আসতে গিয়েই তা টের পেয়েছি। এত ভোরে ওঠার অভ্যাসই নেই আমার। তার ওপর আমাশার ধাত, সকালের দিকে কোষ্ঠ পরিষ্কার হতে চায় না। ভোরবেলা বেরোনোর নামে গায়ে জ্বর আসে।

আপনি সুখী লোক। ডেইলি প্যাসেঞ্জারির ঠেলায় আমাদের ধাত-টাত সব পাল্টে গেছে। তবে কিনা শরীরের নাম মহাশয়, যা সওয়াবে তাই সয়। ভোর চারটের সময় কোনও ভদ্রলোক ভাত খায়, শুনেছেন?

ভোর চারটেয় ভাত? ও বাবা!

তবেই বুঝুন আমাদের জীবনটা কিরকম। আমার মায়ের তো বয়স হয়েছে, শরীরও ভালো নয়, তবু রাত তিনটেয় উঠে ছেলের জন্য ভাত, ডাল, মাছের ঝোল রান্না করে দেন।

কেন মশাই, আজকাল তো অফিসে অফিসে ক্যান্টিন হয়েছে, দিব্যি খাওয়ায় তারা।

সে চেষ্টা কি আর করিনি! তবে আমার এসব সহ্য হয় না। তিন দিন খেয়েই পেটের গড়বড় শুরু হয়ে গেল। তখন মা বলল, আর বাইরে খেয়ে কাজ নেই, যা হয় দুটো বাড়ি থেকেই খেয়ে যাস। মায়ের মতো জিনিস হয় না, বুঝলেন। ছেলের জন্য পারে না হেন কাজ নেই।

ওঃ, যা বলেছেন। আমার মা তো এই গত বছর গত হয়েছে। এখনও মনটা বড় আনচান করে। বেঁচে থাকতে তো আর মাকে মায়ের মর্যাদা দিইনি। আজ মায়ের মর্ম হাড়ে হাড়ে টের পাই। তা আপনি বিয়ে করেননি বুঝি?

না, ফুরসৎ হচ্ছে না। কথাবার্তা চলছে পাত্রীপক্ষদের সঙ্গে।

বয়স কত হল?

এই বত্রিশ চলছে।

ছেলেমানুষ।

ওটা বলবেন না। বত্রিশ বছর বয়সে বাঙালি তো বুড়ো। তবে আজকাল সবাই একটু রয়েসয়েই বিয়ের পিঁড়িতে বসছে। রোজগারপাতি ভদ্রস্থ না হলে বিয়ে করাটা রিস্কি।

তা আপনার চাকরিটা কীসের?

বিদেশি ব্যাংক, কাঁটায় কাঁটায় হাজিরা দিতে হয়। দম ফেলার সময় নেই। দায়িত্ব সাংঘাতিক। ছুটিছাটা বলতে কিছু নেই। আজকাল ব্যাংকের পরিষেবা যত বাড়ছে তত আমরা পেষাই হচ্ছি।

কিন্তু বিদেশি ব্যাংকে বেতনও তো অনেক।

সেটাই তো একমাত্র প্লাস পয়েন্ট। কিন্তু এত খাটতে হয় যে, টাকা রোজগার করাটাও যেন আলুনি লাগে।

এত কষ্ট না করে কলকাতায় একটা বাসা করে নিলেই তো হয়।

কলকাতা! না মশাই, চিরকাল খোলামেলা জায়গায় বড় হয়েছি। কলকাতায় থাকতে দম বন্ধ হয়ে আসবে। তাছাড়া, গাঁয়ে আমার মা-বাবা একরকম একা। তাদের দেখে কে বলুন। বিষয়-সম্পত্তি ছেড়ে তারা কলকাতায় আসবেও না কখনও।

কিন্তু পাল্লাটা তো অনেক পড়ে যাচ্ছে। এখান থেকে কলকাতা তো ঘণ্টা তিনেকের রাস্তা।

ট্রেন ঠিকঠাক চললে পৌনে তিন ঘণ্টা।

তার ওপর লেট আছে, অবরোধ আছে।

সেইজন্যই তো এত ভোরের ট্রেন ধরি। ওইসব অবরোধ-টবরোধ একটু বেলার দিকে হয়। এই ট্রেনটা গ্যালপিংও বটে। নইলে এর পরের ট্রেনটায় গেলেও আমার হত। কিন্তু আমি রিস্কটা নিই না।

নাঃ, চাকরির জন্য আপনাকে বেশ কষ্ট করতে হয় দেখছি।

হয়, তবে গা-সাওয়া হয়ে গেছে। এখন বরং ছুটির দিনেই যেন কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে, সময় কাটতে চায় না। তা আপনি এখানে কোথায় এসেছিলেন?

এক আত্মীয়বাড়িতে। সম্পর্কে খুড়শ্বশুর, সম্প্রতি গত হয়েছেন। তাঁদের আবার ছেলেপুলে নেই। ওয়ারিশান দাঁড়ালেন আমার গিন্নী। বিষয়-সম্পত্তি তেমন কিছু নেই। একখানা ইটের বাড়ি, টিনের চাল, বিঘে চারেক জমি। অবস্থা মোটেই ভালো ছিল না, তবু এই বিষয়-সম্পত্তির জন্যই আসতে হল।

বিলি-ব্যবস্থা করে দিলেন বুঝি?

হ্যাঁ, পাশের বাড়ির পরেশবাবুই সব কিনে নেবেন। দরদাম সব ঠিক হয়ে গেল।

বেচে দিয়ে ভালোই করেছেন, গাঁয়ে বিষয়-সম্পত্তি রক্ষা করা আজকাল বড় দায়।

হ্যাঁ। আর আমাদেরও তো গাঁয়ে এসে থানা গাড়ার উপায় নেই কিনা। তবে আমার মেয়ের খুব আপত্তি ছিল। বার বার বলছিল, থাক না বাবা, গাঁয়ের বাড়িটা। মাঝে মাঝে আমরা উইক এন্ডে বেড়াতে যাব। তা আমি বললুম, বেড়াতে গেলেই তো হবে না। ঠিকমতো দেখাশোনা, পরিচর্যা না করলে বাড়িতে জঙ্গল হবে, সাপখোপের বাসা হবে। চোর ডাকাতের আস্তানা হতেই বা বাধা কোথায়। এই তো গিয়ে শুনলুম, ও বাড়িতে নাকি অলরেডি কে একটা চোলাইয়ের ঠেক খুলে বসবার ফিকিরে ছিল। বেচে দিয়ে ভালো করিনি, বলুন তো!

ভালোই করেছেন। বিক্রি না করলেও রাখতে পারতেন না। ভালো জায়গায় হলে বেদখল হয়ে যেত।

তা মেয়ে মানতে চায় না। কান্নাকাটিও করছিল। বলতে নেই, ওই একটাই সন্তান আমাদের। আবদার করলে ফেলতে পারি না।

বাচ্চা মেয়ে বুঝি?

না, না, উনিশ বছরে পড়ল। ওই যে দেখুন না, রাগ করে আমার পাশে অবধি বসেনি, ওই উল্টোধারে জানলার ধার ঘেঁষে মায়ের পাশে বসে আছে। কথাই বলছে না। আমারও তাই মনে হচ্ছে, তুচ্ছ ক'টা টাকার জন্য না বেচলেই পারতাম।

কত পেলেন?

এখনও পাইনি। কথাবার্তা মোটামুটি পাকা হয়েছে। পৌষ মাসটা গেলে তারপর রেজিস্ট্রি হবে। মেয়ে বেঁকে বসলে আবার কী হয় কে জানে।

গাঁয়ের নাম কী বলুন তো।

শিবপুর। স্টেশন থেকে দু'মাইল।

বলেন কি, শিবপুর তো আমারও গ্রাম। আপনি কি নরেন ঘোষের বাড়ির কথা বলছেন নাকি?

আরে হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই বাড়িই তো।

কী আশ্চর্য! নরেন ঘোষ তো আমাদেরও জ্ঞাতি।

বাঃ, বেশ যোগাযোগ তো!

নরেন দাদু কিন্তু খুব ভালো লোক ছিলেন।

তা আর বলতে। প্রায়ই তো আমাদের বাড়িতে আসতেন। সর্বদা হাসিমুখ, সর্বদা প্রসন্ন, সবসময়ে মুখে সৎকথা শোনা যেত।

আমি নরেন দাদুর কাছে অঙ্ক শিখেছি। ইংরিজিও খুব ভালো পড়াতেন।

বটে! তাহলে তো আপনিও আমাদের কাছের লোক।

আমাকে আর আপনি-আজ্ঞে করবেন না।

তা বাপু, তোমার নামটি কী?

আজ্ঞে আমার নাম সমর বসু।

তোমার মুখের মতো নামটাও যেন চেনা-চেনা ঠেকছে। কেন বলো তো।

নামটার কথা বলতে পারি না, তবে মুখটা চেনা ঠেকার একটা কারণ আছে। তার আগে জিগ্যেস করি, আপনি কি চ্যবনপ্রাশ খান?

চ্যবনপ্রাশ! হ্যাঁ, তা খাই বটে। গতবার আমার খুব সর্দিকাশি গেছে। সেই থেকে কার পরামর্শে যেন আমার গিন্নি আমাকে রোজ চ্যবনপ্রাশ খাওয়ায় বটে।

সেটা যদি আয়ুর্বেদ ভবনের স্বর্ণভস্ম সম্বলিত চ্যবনপ্রাশ হয়ে থাকে তাহলে আমার মুখটা আপনার চেনা-চেনা ঠেকতেই পারে।

কেন বলো তো?

বিশাল আয়ুর্বেদ ভবনের মালিক বিপুল সামন্ত আমার বিশেষ বন্ধু, তার হঠাৎ একদিন মনে হল আমাকে বিজ্ঞাপনের মডেল হিসেবে ব্যবহার করবে। যেই মনে হওয়া অমনি ধরে নিয়ে গিয়ে একটা স্টুডিয়োতে বিস্তর ছবিটবি তোলাল, ভিডিয়ো ক্লিপিংও নিয়েছিল। সেই থেকে ওই চ্যবনপ্রাশের কৌটোর গায়ে আমার মুখের ছবি ছাপা হয়ে আসছে। টিভি-র চ্যানেলেও ওই চ্যাবনপ্রাশের বিজ্ঞাপনে আমাকে দেখা যায়।

দেখ কাণ্ড! আমি তো ওই চ্যবনপ্রাশই খাই। তাই তো হে, তোমার মুখটা তো রোজই দুবেলা চ্যবনপ্রাশ খাওয়ার সময়ে আমার চোখে পড়ে।

হেঃ হেঃ, খুবই লজ্জার কথা।

কেন বাপু, লজ্জা কীসের? তোমার চেহারাখানা তো ভারি ভালো।

আজ্ঞে চেহারার গভীরতা তো চামড়ার বেশি নয়। গুণ আর চরিত্রই মানুষের আসল পরিচয়।

আচ্ছা বাপু সমর, তোমার কি একটা ডাকনাম আছে?

আছে, তবে বড্ড বিচ্ছিরি নাম।

সে নামটা কি জল?

কী আশ্চর্য! আপনি জানলেন কী করে?

নরেনকাকা যে আমাদের কাছে তোমার খুব গল্প করত। বলত জলের মতো ছেলে হয় না। কলিযুগে জন্মেছে বলে লোকে চিনল না।

নরেন দাদুর এ বড্ড বাড়াবাড়ি। তবে তোমার নাম জলই বটে। ছেলেবেলায় আমার বড্ড ঘাম হত বলে মা বলত, ছেলে আমার ঘেমে জল। সেই থেকে নামটাই হয়ে গেল জল।

নরেনকাকার কাছেই তোমার সমর নামটা শুনেছিলাম বটে। মাধ্যমিকে স্ট্যান্ড করেছিলে না?

তাও জানেন? কী আশ্চর্য!

আহা এটা তো গৌরবের ব্যাপার। লুকোনোর কী আছে বাবা?

বলার মতোও কিছু নয়।

তুমি বোধহয় কম্পিউটার নিয়ে পড়াশোনা করেছ, তাই না?

আজ্ঞে হ্যাঁ। তারপর এই ব্যাংকে চাকরি পাই। নেটওয়ার্ক ম্যানেজার।

তোমাকে একটা কথা বলতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু বলাটা ঠিক হবে কিনা বলতে পারছি না।

কী বলুন তো!

তার আগে শুনি, নরেনকাকা কি কখনও তোমাকে আমাদের কথা কিছু বলেছেন?

আপনার নাম যদি পীযূষ মিত্র হয়ে থাকে তবে বলব, হ্যাঁ, বলেছেন।

আমার নাম পীযূষ মিত্রই বটে।

অনুমান করছিলাম।

তা বাবা, নরেনকাকা তোমার কাছে আমাদের কথা কী বলেছেন?

সেটা বলা আমার পক্ষে উচিত হবে না। ছোট মুখে বড় কথা হয়ে যাবে।

আহা, নিজেকে অত ছোট ভাবছ কেন? স্বীকার করছি আমরা একটু বড়লোক। কিন্তু সেটাই তো আর কারও পরিচয় নয়। স্বীকার করছি আমার মেয়ে ডাকসাইটে সুন্দরী এবং তার জন্য মেলা ভালো ভালো পাত্রের বাড়ি থেকে বিয়ের প্রস্তাব আসে। তা বলে তো আমাদের আর পায়াভারী হয়ে যায়নি। আর এটাও কবুল করছি, সমর বসু নামে একজন গেঁয়ো পাত্রের সঙ্গে আমার মেয়ে মধুরার বিয়ের প্রস্তাব আনায় আমরা নরেনকাকার ওপর একটু অসন্তুষ্টই হয়েছিলাম। কিন্তু তখনও তো তোমাকে দেখিনি বাবা। তখন নাক সিঁটকেছিলাম বলে ভেবো না যে সেই ভাবটা এখনও আছে। আরও একটা কথা।

বলুন।

আমরা গাঁয়ের বাড়িটা বিক্রি করে দেব বলে মনস্থ করায় মধুরা ধনুকভাঙা পণ করে বসেছে সে যদি কখনও বিয়ে করে তাহলে কোনও গাঁয়ের পাত্রকেই বিয়ে করবে।

এটা হয়তো রাগের কথা। রাগ পড়লেই সিদ্ধান্ত বদলে ফেলবেন।

আমার মেয়েকে তুমি চেনো না। যা বলে তাই করে। বড্ড একরোখা মেয়ে।

তাই বুঝি?

আমার মেয়েকে তো দেখছ, কেমন মনে হচ্ছে?

কী আর বলব!

ভেঙে বলতে যদি লজ্জা হয় তবে সাঁটে বললেও হবে।

কী যে বলেন, আপনার মেয়ে অত্যন্ত সুন্দরী।

তোমার পছন্দ তো বাবা? না হলে স্পষ্ট বলে দাও।

কী যে বলেন কাকা, ওঁকে কার অপছন্দ হবে?

যাক, বাঁচা গেল। মেয়ের ধনুকভাঙা পণ শুনে বড্ড ভয় হয়েছিল। তোমার যদি অপছন্দ না হয় তাহালে আমরা কাল পরশুই এসে তোমার মা-বাবার সঙ্গে দেখা করব। নরেনকাকার আত্মাও শান্তি পাবে।

যে আজ্ঞে, কিন্তু একটা কথা।

কী কথা বাবা?

পছন্দটা একতরফা হলেই তো হবে না। ওঁরও তো মতামত আছে।

শুভস্য শীঘ্রম। এক্ষুনি জেনে আসছি।

আসুন।

জেনে এলাম।

এত তাড়াহুড়োর কিছু ছিল না।

ছিল। এই পাঁচটা পঁয়তাল্লিশের গাড়িটা দেখছি বড্ড পয়া।

তাই বুঝি?

হ্যাঁ বাবা। আমি চোরা চোখে অনেকক্ষণ ধরে দেখছিলাম আমার মেয়ে তোমাকে আড়ে আড়ে দেখছে। গিয়ে বিয়ের কথা বলতেই লজ্জায় লাল হয়ে গেল। ওই দেখ জানালার বাইরে মুখ ঘুরিয়ে শক্ত হয়ে বসে আছে।

এ ভাবে লজ্জায় না ফেললেও পারতেন।

আহা, বললাম না এই গাড়িটা বড্ড পয়া!

তা বটে।

আমরা ঠিক করে ফেললাম নরেনকাকার বাড়িটা পরেশবাবুকে আর বিক্রি করব না। কী বলো।

আজ্ঞে ঠিকই বলেছেন।

ওটা এখন তোমাদের দুজনের সম্পত্তি।
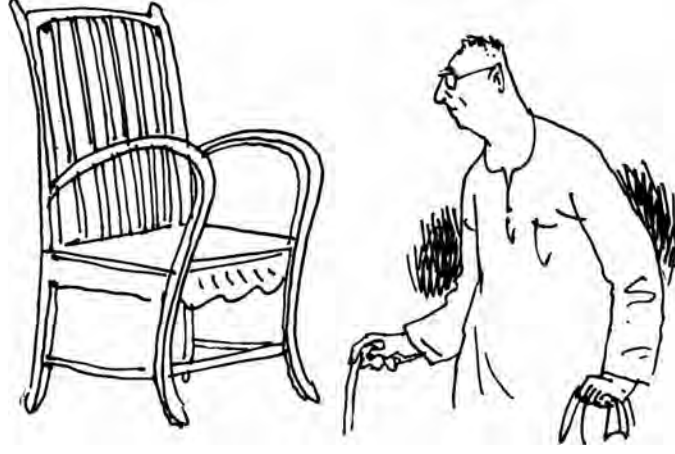
# বদল

আচ্ছা মশাই, কিছু যদি মনে না করেন, একটা কথা জিগ্যেস করতে পারি কি?

পারেন।

আমি অনেকক্ষণ ধরে দেখছি আপনি একটা ক্যালকুলেটরে কী যেন হিসেব-নিকেষ করে যাচ্ছেন। বোধহয় হিসেবটা মিলছে না, না?

আজ্ঞে ঠিক তাই।

আমি একজন অ্যাকাউন্ট্যান্ট। সারাজীবন ওইসব হিসেব-নিকেষ করেই কেটেছে। যদি আপত্তি না থাকে তবে আমি আপনাকে হেল্প করতে পারি।

করবেন?

করব, তার কারণ এমন একটা সুন্দর পাহাড়ি জায়গায় বেড়াতে এসে এই চমৎকার ঝকঝকে একটা সকালে, সামনে মেঘ-রোদ-পাহাড়ের অনবদ্য দৃশ্যকে উপেক্ষা করে আপনার মতো একজন হ্যান্ডসাম ইয়ংম্যান ক্যালকুলেটরে মুখ গুঁজে শুকনো মুখে বসে থাকলে খারাপ লাগে। বলুন আপনার প্রবলেমটা কী?

আমার প্রবলেমটা খুব গভীর।

তাই বুঝি? তা হোক না গভীর, তা বলে তো হাল ছেড়ে দিলে হবে না।

হাল ছেড়ে না দিয়েও উপায় নেই।

কেন বলুন তো!

আমি কলকাতা থেকে মাত্র সাতশো টাকা পকেটে নিয়ে হুটপাট করে বের হয়ে পড়েছিলাম। সঙ্গে একটা গরমজামা অবধি আনতে পারিনি, এখানে এসে খুব সস্তায় একটা ফুটফুটে পুলওভার কিনেছি বটে, কিন্তু এক্সট্রা জামাপ্যান্ট কিছুই না থাকায় চেঞ্জও করতে পারছি না। সবচেয়ে সস্তা হোটেলে উঠেছি, কিন্তু সেখানে দুদিনের ঘরভাড়া দেওয়ার পরই আমার পুঁজি রেড সিগন্যাল দিয়েছে। অথচ আরো দিন তিনেক এখানে না থাকলে আমার ভবিষ্যৎ অত্যন্ত অন্ধকার।

মাত্র সাতশো টাকায় আপনি তো বিরাট রিস্ক নিয়ে নিয়েছেন মশাই। টাকা এত কম নিয়ে বেরোলেন কেন?

কী করব বলুন, টাকা তুলবার সময় ছিল না যে!

আর জামাকাপড় বা সোয়েটার! সেগুলোই বা আনলেন না কেন?

তাহলে আপনাকে পুরো ব্যাপারটা খুলে বলতে হয়।

তা বলুন না! আমার সময়ের অভাব নেই। এখানে এসে হাতে একটু সময়ও পাচ্ছি। আমার বউ আর মেয়েরা আজ কেনাকাটা করতে গেছে, আমি খরচের ব্যাপারে একটু খিটখিট করি বলে আমাকে বর্জন করেই গেছে। তাই দিব্বি বসে বসে নির্ঝঞ্ঝাট সময় কাটাচ্ছি।

কিন্তু বলতে আমার খুবই লজ্জা করবে।

লজ্জা! লজ্জা কীসের? সকলের জীবনেই নানারকম ভুলভ্রান্তি ঘটে, আমি একজন প্রবীণ এবং বিচক্ষণ মানুষ। যদি আপনাকে বুদ্ধি ধার দিতে পারি। ফ্রি অব কস্ট।

ব্যাপারটা হল আমি বছর খানেক আগে একটি মেয়ের প্রেমে পড়ি।

বেশ বেশ। প্রেম তো ভালো জিনিস, বয়োধর্ম।

মেয়েটি খুব সুন্দরী, ইংলিশ মিডিয়াম, বড়লোকের মেয়ে, স্মার্ট, তার ওপর খুব ভালো রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়, ওড়িশি নাচে, নাটক করে। এক কথায় দারুণ মেয়ে।

তাহলে প্রবলেম কীসের?

আমি মেয়েটার প্রেমে পড়লেও মেয়েটা আমার প্রেমে পড়েনি।

কী বলছেন?

তার সঙ্গে আমার আলাপই হয়নি।

কেন, আলাপ হয়নি কেন?

এর জন্য দায়ী আমার বাবা।

সে কী! বাবা আবার কী করলেন?

প্রত্যক্ষভাবে কিছু করেননি, কিন্তু তিনি আমাকে খুব রক্ষণশীল পদ্ধতিতে বড় করেছেন।

বটে?

আমাদের পরিবারটিই খুব রক্ষণশীল। আমরা ছেলেরা কখনো মেয়েদের সঙ্গে খোলামেলা মেলামেশা করতে পারি না। আমাদের বাড়ির ছেলেরা কখনো কো-এডুকেশন স্কুল বা কলেজে পড়াশুনা করে না। বড়রা সবসময় বলেন, ছেলেরা মেয়েদের সঙ্গে সম্মানজনক দূরত্ব বজায় রাখবে।

আহা, শুনে বুকটা জুড়িয়ে গেল মশাই। আপনি তো মহাভাগ্যবান যে এমন একটা ভালো পরিবারে জন্মেছেন। এসব পরিবার এখনো আছে বলেই তো দেশটা পুরোপুরি উচ্ছন্নে যায়নি।

আপনি কি আমার পারিবারিক অনুশাসনকে সমর্থন করছেন?

করছি বইকি। খুব করছি। আমার তো আনন্দে চোখে জল আসছে।

তাহলে আপনি আমাকে কীভাবে সাহায্য করবেন?

আগে পুরোটা শোনা যাক।

আমি বলছিলাম যে, আমি মেয়েটার প্রেমে পড়লেও মেয়েটা আমার প্রেমে পড়েনি।

সেটা তো বলেছেন। কিন্তু আপনার প্রেমের খবরটা তো মেয়েটার কাছে পৌঁছানো দরকার।

মেয়েটার কাছে গাদা গাদা ছেলের প্রেমবার্তা রোজই পৌঁছে যাচ্ছে। ফলে ই-মেইল, ফ্যাক্স বা টেলিফোন করে লাভ নেই। আমি উত্তর কলকাতার যে পাড়ায় থাকি তার গলির মুখেই বড় রাস্তার ওপর মেয়েটার বিরাট বাড়ি। নতুন আধুনিক ডিজাইনের বাড়ি। খুব ফান্ডা। সেখানে টক করে ঢুকে পড়াও কঠিন। তাছাড়া আমি মুখচোরা, লাজুক এবং স্বভাবে বেশ ভীতু।

বেশ তো। এসব সমস্যার সমাধান অসম্ভব নয়। কিন্তু এসব সমস্যা আপনি ক্যালকুলেটর দিয়ে কী করে মেটাবেন?

ক্যালকুলেটর দিয়ে আমি হিসেব করছিলাম যে, আর ক'দিন আমার পক্ষে কালিম্পঙে থাকা সম্ভব।

প্রেমের সঙ্গে কালিম্পঙের সম্পর্কটা কী বলুন তো!

সম্পর্ক খুব গভীর।

বটে!

হ্যাঁ। অদিতি, মানে সেই মেয়েটার সঙ্গে আলাপ করার কোনো সুযোগ না করতে পেরে আমি যখন খুবই মুষড়ে পড়েছি তখনই একদিন হঠাৎ দেখলাম অদিতিরা স্যুটকেস ইত্যাদি নিয়ে কোথায় যেন যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হল আমিও যদি ওদের ফলো করি তাহলে কলকাতার বাইরে কোনো নির্জন জায়গায় অদিতির সঙ্গে ভাব করার সুযোগ অবধারিত পাওয়া যাবে। হাতে একদম সময় ছিল না বলে আমি আমার এক বন্ধুর কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে বেরিয়ে পড়ি এবং অদিতিকে ফলো করে দার্জিলিং মেলে উঠে পড়ি।

একই কামরায় নাকি?

পাগল! ওরা উঠল রিজার্ভ করা এসি ফার্স্ট ক্লাসে। আর আমি ঠেলে গুঁতিয়ে সেকেন্ড ক্লাসের জঙ্গল কামরায়। বসার জায়গা পাইনি। সঙ্গে টাকাও ছিল না কি না।

তারপর?

ওরা কোথায় যাবে তা আমার জানা ছিল না। নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে ওরা ট্যাক্সি ভাড়া নিল। আমি সাহস করে একটু কাছে এগিয়ে গিয়ে শুনতে পেলাম ওরা কালিম্পঙ যাওয়ার কথা ড্রাইভারকে বলছে।

মেয়েটির সঙ্গে কে কে আছে?

ওর মা বাবা, ছোট ভাই, একজন বয়স্কা বিধবা, বোধহয় পিসি, একজন কাকা গোছের লোক, একজন চাকর এবং একজন ঝি, কোয়াইট এ ক্রাউড।

তারপর?

ওরা রওনা হওয়ার পর আমিও একটা শেয়ারের গাড়িতে কালিম্পঙ রওনা হয়ে পড়লাম।

এখানে এসে কি কিছু সুবিধে হল?

নাহ। ওদের ঠিকানা বের করতেই একটা দিন কেটে গেল। ওরা উঠেছে শহরের সবচেয়ে দামি হোটেলে। আমি আছি একটা অখাদ্য জায়গায়। যাকগে প্রবলেমটা যেখানে ছিল সেখানেই আছে।

আপনি যে কলকাতা থেকে ওদের ফলো করছেন এটা কি ওরা কেউ লক্ষ্য করেনি?

সেটাই আশ্চর্যের বিষয়। আমি পাড়ার ছেলে। তার ওপর এতদিন ধরে মেয়েটিকে লক্ষ্য করছি, ফলো করে এতদূর এসেছি, কিন্তু মনে হয়েছে ওরা আমাকে মোটেই লক্ষ্য করেনি। আমি যেন এক অদৃশ্য মানুষ।

খুবই বিস্ময়ের কথা।

হ্যাঁ। আমার মনে হয় ওদের নজর এতই উঁচু যে নীচুতলার মানুষের দিকে ওরা তাকিয়েও দেখে না।

ইয়ে, হ্যাঁ, সেটাও একটা কথা বটে। যদি কিছু মনে না করেন, তাহলে একটা কথা জিগ্যেস করি।

করুন না।

মেয়েটির সম্পর্কে তো শুনলাম। কিন্তু এখন কথা হচ্ছে যে, মেয়েটির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের মতো সামর্থ্য আপনার আছে তো! ধরুন, যদি আপনার কোয়ালিফিকেশন সম্পর্কে জানতে চাই তাইলে কি আপনি অপমানিত বোধ করবেন?

হ্যাঁ, সেটা একটা জ্বলন্ত প্রশ্ন বটে। অদিতির উপযুক্ত ছেলে কেউ জন্মেছে বলে আমার তো মনে হয় না। আমিও ওর উপযুক্ত নই। তবে আমি একজন কোয়ালিফায়েড, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট।

অ্যাঁ। সর্বনাশ! আপনি চার্টাড অ্যাকাউন্ট্যান্ট।

অবাক হচ্ছেন কেন? দুনিয়ায় লক্ষ লক্ষ সিএ আছে। আমি তাদেরই হতভাগ্য একজন। একটা বেশ বড় কোম্পানিতে চাকরি করি। বেতন খুব একটা খারাপ নয়।

হাজার পঞ্চাশেক বেতন তো!

ওই রকমই। পার্টটাইম নিয়ে আরো কিছু হয়।

বাপ রে! আপনি তো দারুণ ছাত্র। আর বাড়ির অবস্থা?

আমরা উত্তর কলকাতার বনেদি পরিবার। আগে আমাদের গুণচট আর চামড়ার ব্যবসা ছিল। সেই ব্যবসা তুলে নিয়ে এখন বাবা-কাকারা আলাদা আলাদা ব্যবসা করে। আমাদের বাড়িটা পুরোনো এবং বিরাট। বাবারা চার ভাই একসঙ্গেই থাকেন। তবে হাঁড়ি আলাদা। বলতে নেই আমাদের পারিবারিক অবস্থা বেশ ভালোই।

অর্থাৎ আপনারাও ধনী।

তা হয়তো হবে। তবে আমাদের ফান্ডা নেই। আমাদের বাড়িতে এখনো ফ্রিজ বা টিভি ঢুকতে দেওয়া হয়নি। অনেক বলে কয়ে আমার ঘরে সম্প্রতি একটা কম্পিউটার বসাতে পেরেছি মাত্র। আমাদের ঠাকুরদালানে প্রতি বছর দুর্গাপুজো হয়। বাড়ির মেয়েরা হরেক রকম ব্রত

পার্বণ করেন। দেবদ্বিজে খুব ভক্তি। আধুনিকতার বাতাসটা আমাদের বাড়িতে ঢুকতে পারেনি এখনো।

বাঃ বাঃ, শুনে তো মশাই ইচ্ছে করছে আপনাদের বাড়িটাকে একটা প্রণাম করে আসি।

কেন বলুন তো। এসব রক্ষণশীলতা আঁকড়ে থাকা কি ভালো? কী জানি মশাই, আমার তো ব্যাপারটা তেমন পছন্দ হয় না, তবে মেনে নিতে হয়।

আমাকে বলতেই হবে অদিতির আপনার মতো পাত্র জুটলে সেটা ওর সৌভাগ্যই হবে।

কী যে বলেন! আমরা অদিতিদের ধারেকাছেও নই।

কীসে?

তা জানি না। তবে ওরকমই মনে হয়।

আপনি হীনম্মন্যতায় ভুগছেন। সাদা চোখে দেখলে আপনি অদিতির তুলনায় বেশ উঁচুদরের পাত্র। তা হ্যাঁ মশাই, আপনাদের বর্ণ-টর্ণ এক তো!

না। ওরা বদ্যি। আমরা কায়েত।

তাহলে তো মুশকিল।

হ্যাঁ। খুবই মুশকিল। আমাদের বাড়িতে অসবর্ণ বিয়ে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। ছেলেপুলেদের অল্প বয়স থেকেই হুঁশিয়ার করে দেওয়া হয়। অসবর্ণ না হলেও একটা দুটো প্রেমজ বিয়ে অবশ্য হয়েছে। বড়রা তেমন আপত্তি করেন না।

ধরুন, আপনার সঙ্গে অদিতির যদি বিয়ের মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি করা যায় তাহলে কী হবে?

আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হবে এবং বাবা আমাকে অবশ্যই ত্যাজ্যপুত্র করবেন।

আপনার বাবা কি খুব রিজার্ভ?

ভীষণ। বাবাকে সবাই ভয় পায়।

এই যে আপনি হুট করে পালিয়ে এলেন এতে বাড়িতে তুলকালাম হবে না?

না। অফিসের কাজে আমাকে প্রায়ই বাইরে যেতে হয়। বিদেশেও! আমি দার্জিলিং মেল-এ ওঠার আগে বাড়িতে ফোন করে জানিয়ে দিয়েছি যে, আমি জরুরি কাজে বাইরে যাচ্ছি। অফিসে জানিয়েছি, আমি অসুস্থ। ডবল মিথ্যাচার করতে হয়েছে।

আপনার প্রেম দেখছি খুবই গভীর।

হ্যাঁ, জীবন-মরণের প্রশ্ন।

কিন্তু মুশকিল কী জানেন, প্রেমটা বড় একতরফা। ওদিক থেকে আগ্রহ জাগাতে না পারলে এ প্রেম তো মাঠে মারা যাবে।

প্রেম মাঠে মারা গেলে আমার পক্ষে বেঁচে থাকাই মুশকিল। আমার ধারণা ছিল প্রেম গভীর হলে তা উদ্দিষ্ট মেয়েটি একদিন ঠিকই টের পায়। আপনার কী মনে হয়? আপনি তো একজন বয়স্ক অভিজ্ঞ মানুষ।

দূর মশাই, প্রেমের ব্যাপারে আমি নিতান্তই অগা। সংসারের অবস্থা ছিল খুবই খারাপ, ভাতের পাতে নুনই জুটত না। অতি কষ্টে বিকম পাস করেই চাকরির জন্য হন্যে হয়ে ঘুরতাম। সম্বল ছিল টিউশানির সামান্য

ক'টা টাকা। বাবা ছিলেন চিররুগ্ন মানুষ, কোনো কাজই করতে পারতেন না। মা একটু আধটু সেলাইটেলাই করে রোজগারের চেষ্টা করতেন। চার ভাইবোন বড় কষ্টে বড় হয়েছি। তারপর বিস্তর চেষ্টায় একটি সামান্য চাকরি জুটে যায়। অবশ্য চাকরির ভাগ্যটা আমার ভালোই। কাজে নিষ্ঠা ছিল বলেই কিনা জানি না, টপাটপ প্রমোশন পেয়ে যাই, ক্রমে দু-তিনটে কোম্পানি বদল করে একটা বড় কোম্পানিতে চিফ অ্যাকাউন্ট্যান্ট হিসেবে জয়েন করি। তারই ফাঁকে দুই বোনের বিয়ে দিই। একটু বেশি বয়সে আমারও বিয়ে হয়। প্রেম কাকে বলে কে জানে! ওসব সিনেমা, থিয়েটারে দেখতেই ভালো লাগে। তবে আপনার সমস্যাটা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। ভালো কথা, আদিতিরা যে হোটেলে আছে তার নাম আর অদিতির বাবার নামটা আমাকে লিখে দিন।

আপনি কি ওঁদের কাছে আমার কথা বলবেন?

চেষ্টা করে দেখতে পারি।

তাতে কি উল্টো ফল হবে না?

কেন হবে? আপনি তো উজ্জ্বল পাত্র। ওঁরা হয়তো প্রস্তাব লুফে নেবেন।

সেটা আমার পরাজয়ও তো বটে।

হ্যাঁ, সেটাও একটা কথা।

বিয়েটা বড় কথা নয়। ইচ্ছে করলে তো পছন্দের মেয়েকে অপহরণ করা যায়, বা ঘটকের সাহায্য নেওয়া যায়। কিন্তু তাতে অদিতিকে দখল করা হবে। পাওয়া হবে না।

ও বাবা, ওসব যে খুব শক্ত কথা মশাই।

শক্ত কেন হবে? সহজ কথাই তো। আমি একজন পুরুষ, পৌরুষের একটু অহঙ্কার থাকবে না?

শুনতে তো কথাটা ভালোই লাগছে। তবে কী জানেন, আমিও তো একটা নেগোশিয়েটেড করেছি কি না। বিয়ের পর ভাবসাব হতে কিন্তু বাধা হয়নি। পূর্বরাগের অভাব তেমন টের পাইনি। আর পৌরুষের অহঙ্কার, ওসব কবে অভাবের ঠেলায় পালিয়ে গেছে।

আপনার অভিজ্ঞতা অন্যরকম। তাছাড়া আপনি অন্য জেনারেশনের মানুষ।

তা হলেও আপনার সমস্যাটা বুঝতে পারছি। আপনি এ যুগের মানুষ হলেও বড় হয়েছেন প্রাচীনপন্থী পিউরিটান পরিবারে। ফলে আপনি একজন সেকেলে ইয়ংম্যান হয়ে আছেন। ট্রাডিশন ভাঙতে চান, কিন্তু ভাঙতে সাহসে কুলোচ্ছে না। তাই তো?

বোধহয় আপনি ঠিকই বলেছেন। প্রবেলমটা অদিতি নয়, আমার প্রবলেম আমিই। সেকেলে মানসিকতার একেলে যুবক। একেই বোধহয় গজকচ্ছপ বলা হয়। কিংবা হাঁসজারু।

আরে না না, নিজেকে অত তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করার দরকার নেই। শান্ত হয়ে একটু ভাবুন। এনজয় দি সিনারি। আমিও বরং একটু ভাবি।

থ্যাংক ইউ। আমার একজন সহৃদয় বন্ধুর দরকার ছিল।

ভালো কথা, আমার তিন মেয়ের মধ্যে বড় দুটির লাভ আফেয়ার আছে বলে গিন্নির কাছে শুনেছি। ছোটটি বিবাহ-বিরোধী এবং খুব স্বাধীনচেতা। সে ঘোষণা করেছে, সংসারধর্ম পালন না করে সমাজসেবা করবে। অথচ তিন মেয়ের মধ্যে ওটিই সবচেয়ে সুন্দর এবং লেখাপড়াতেও ভীষণ ভালো। হলে কী হবে, সে পুরুষ মানুষকে একদম বিশ্বাস করে না।

তাই বুঝি?

হ্যাঁ মশাই, পৃথিবী বিচিত্র জায়গা। কেউ প্রেমে পাগল, কেউ বা ঘোরতর প্রেমবিরোধী।

তা তো বটেই। আমিও কোনোদিন কল্পনা করি নি যে, কখনো কোনো মেয়ের প্রেমে পড়ে যাব। বারবার মেয়েদের থেকে শতহস্ত দূরে থেকেছি। কেন যে অদিতিকে দেখলাম! মাথায় যেন বজ্রঘাত হল। আমার একজন বিধবা পিসি আছেন। তিনি আমাকে এতই ভালোবাসেন যে আমার গায়ে আঁচটি লাগতে দেন না।

বলতে গেলে আমার সব অন্যায় আবদার তিনিই পূরণ করেন। তাঁকে আমি সব কথাই বলি, এটাও একদিন বলে ফেলেছিলাম। পিসি জীবনে এই প্রথম আমার বায়না মানলেন না। মাকে বলে দিলেন, ওরে, ওসব কথা স্বপ্নেও ভাববি না, অনর্থ হবে।

উনি খুব ভুল কথা বলেননি বোধহয়। ফ্যামিলি ট্র্যাডিশন ভাঙা খুব বিপজ্জনক কাজ। তবে যদি নিতান্তই অদিতির ব্যাপারে ফয়সালা করতে চান তাহলে আমি আমার মেয়েদের কাছে আপনার জন্য সাহায্য চাইতে পারি, ওরা হয়তো অদিতির মুখ আপনার দিকে ঘুরিয়ে দিতে পারবে। আমার মেয়েরা ইন্টেলিজেন্ট। বিশেষ করে আমার ছোট মেয়ে। আজ বিকেলে এখানেই থাকবেন। আমি ওদের নিয়ে আসব।

বাঁচালেন।

আরে না না। এরকম সুন্দর জায়গায় এসে আপনি এরকম শুকনো মুখে ঘুরে বেড়াবেন তাই কি হয়? আমার নাম নয়ন বসু। আপনার নাম?

দেবর্ষি মিত্র।

হ্যাঁ ভালো কথা, আপনার তো একটা ফিনানসিয়াল প্রবলেমও রয়েছে।

হ্যাঁ, তবে আমার ডান হাতে এই যে আংটিটা দেখছেন এটা হীরের অংটি। বেচে দিলে বেশ কিছু টাকা পেয়ে যাব বোধহয়।

কী যে বলেন! ওসব জিনিস বেচতে আছে? অপনার এখন বুদ্ধি বিবেচনা কাজ করছে না, স্যাকরা ঠকিয়ে দেবে। বরং আমি আপনাকে কিছু টাকা ধার দেবখন। ভয় নেই, আমি এখন বেশ সচ্ছল লোক।

দেবেন! তা দিতে পারেন। কত দিন থাকতে হবে তা তো বুঝতে পারছি না।

তিনদিন পর

এই যে দেবর্ষিবাবু, শুনলাম আপনি নাকি অসাধ্য সাধন করেছেন!

তাই নাকি? কে বলল?

কেন, আমার ছোট মেয়ে কলমির কাছেই শুনলাম।

কী শুনলেন?

সে তো আপনারই গল্প। কলমি আপনার অদিতির সঙ্গে ভাব করার পর আপনার সঙ্গে কোনো রেস্তোরাঁয় নাকি আলাপ করিয়ে দেয়। এবং অদিতি নাকি আপনাকে দেখে এবং পরিচয় পেয়ে ভীষণ ইমপ্রেসড। কলমির কাছে বলেছে, এরকম ছেলে নাকি বেশি দেখেনি। কিছু ভুল বললাম নাকি মশাই, আপনার মুখ যে আগের চেয়েও শুকনো। না, আপনার তো অস্থিরতাটা কাটেনি দেখছি।

আপনি কি জানেন যে, অদিতির দাঁতের সেটিং ভীষণ খারাপ।

যাচ্চলে! দাঁতের সেটিং খারাপ, সেটা কি কোনো পয়েন্ট হল?

আপনি হয়তো জানেন না, অদিতি অত্যন্ত টকেটিভ।

ও বাবা, এই তো তিনদিন আগেও অন্যরকম কথা বলছিলেন মশাই।

শুধু তাই নয়, অদিতির কথার মধ্যে একটা দম্ভ আর অহঙ্কার ফুটে বেরোয়, একটু বোধহয় বোকাও। আর বোধহয় মায়াদয়াও খুব কম। একটা পাহাড়ি মেয়ে ভিক্ষে চাইছিল বলে এমন বিচ্ছিরিভাবে ধমকে উঠল।

এ তো দেখছি উলটো পুরাণ শুনছি। তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াল? প্রেমটা কি কেঁচেই গেছে নাকি? দীর্ঘশ্বাস ফেললেন যে!

এতদিনের অত দৌড়ঝাপ, রিস্ক নিয়ে এতদূর আসা, এগুলো এখন ভারি হাস্যকর লাগছে। কী যে বোকার মতো অবসেসড হয়ে পড়েছিলাম, কাছ থেকে না দেখলে আরো কতদিন ঘুরিয়ে মারত কে জানে। যত ভাবছি ততই নিজেকে ভীষণ বোকা-বোকা লাগছে।

কিন্তু অদিতির যে আপনার ওপর ভীষণ টান হয়েছে বলে কলমি বলছিল। তার কী হবে?

বড়লোকের মেয়ে, ওদের টান গভীর কোনো ব্যাপার নয়। গাড়ি পাল্টানোর মতো পুরুষ-বন্ধু পাল্টায়। সারাক্ষণ তো বয়ফ্রেন্ডদের গল্পই করল। আরো একটা কথা।

কী কথা?

অদিতি ভোরেশিয়াস ইটার। ভীষণ খায়। কিছুদিনের মধ্যেই ফ্যাট গ্যাদার করতে শুরু করবে, দেখবেন।

না মশাই, আপনি তো চিন্তায় ফেলে দিলেন দেখছি। এখন তাহলে কী হবে?

আমি কালই কলকাতায় ফিরে যাচ্ছি।

সে তো খুবই ভালো কথা। কাল আমরাও ফিরছি। এক সঙ্গেই যাওয়া যাবে।

আপনি বয়স্ক মানুষ। আপনার কাছে হৃদয় দৌর্বল্যের কথা বলে ফেলেছিলাম বলে আমার এখন খুব লজ্জা করছে।

আরে না না, লজ্জার কী?

আপনারা বোধহয় আমাকে নিয়ে নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করেন।

হাসাহাসি! আরে রামোঃ! বরং ঠিক উল্টো। আপনার কেসটা নিয়ে আমার মেয়েরা বরং বেশ টেনশনেই ছিল। কলমি তো খুবই সিরিয়াস। এমন কী আমার গিন্নি পর্যন্ত ব্যাপারটায় খানিকটা ইনভলভড হয়ে পড়ে। বিশ্বাস করুন, উই ওয়্যার ভেরি সিমপ্যাথেটিক।

আপনাদের আমি খুবই হ্যারাস করেছি, আপনাদের বেড়ানো আমার জন্যই মাটি হয়েছে। কী করে যে আপনাদের কাছে আর মুখ দেখাব তাই ভাবছি।

মশাই, কেন যে উল্টো বুঝছেন কে জানে। তাহলে শুনুন বলছি। আপনার এত আত্মগ্লানি আর আত্মধিক্কারের কোনো প্রয়োজনই নেই। বরং আপনি আমার একটা পরম উপকার করেছেন।

আমি! উপকার! সে আবার কী?

আমার ছোট মেয়ে কলমি এতকাল ঘোরতর পুরুষবিরোধী ছিল কিন্তু আপনার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার দুদিন পর, কাল রাতেই বলছিল কোনো পুরুষ যে এত ভদ্র, শালীন আর এত ভালো হতে পারে তা আমার জানাই ছিল না।

বলেছেন উনি!

শুধু তাই নয়। এমন কথাও বলেছে, পুরুষেরা যদি সবাই এরকম হত তাহলে মেয়েদের কোনো প্রবলেম থাকত না। ওর মা তখন হুট করে জিগ্যেস করল, এরকম ছেলে পেলে বিয়ে করবি?

উনি কী বললেন?

কিছু বলল না। শুধু ফিক করে একটু হাসল। আরে আরে মশাই, আপনি ওরকম লজ্জা পাচ্ছেন কেন বলুন তো!

আমার ভীষণ লজ্জা করছে যে!

## আনন্দ

রাত সাড়ে বারোটায় প্যাসেঞ্জার ট্রেনটা যে স্টেশনে তাকে নামিয়ে দিয়ে গেল সেটা ইউ পি-র একটি অখ্যাত জায়গা। স্টেশনটা নিতান্তই ছোট। হাড়-হিম-করা ঠান্ডায় আর নিরেট অন্ধকারে টিমটিমে বিজলি বাতির আলোয় স্টেশনটা যেন নিজেই নিজেকে হারিয়ে বসে আছে। কী ঘন কুয়াশা চারদিকে!

অরিন্দম তার ব্যাগটা নিয়ে নেমে একটু দিশাহারা বোধ করছিল। এত রাতে মনোহরবাবুর বাড়ি খুঁজে বের করার চেষ্টা করা বৃথা। জায়গাটা ছোটই হবে, কিন্তু এই ঘুমন্ত গঞ্জে সে বাড়ি খুঁজে পাবে কী করে?

স্টেশনটায় একটি বুকিং অফিস এবং স্টেশন মাস্টারের ঘর আছে। আর বুকিং অফিসের লাগোয়া একটা অ্যাসবেস্টসের শেডের তলায় চারখানা বেঞ্চ। এইটেই বোধহয় ওয়েটিং রুম। চারটে বেঞ্চেই গোটাকয়েক লোক গুটিসুটি মেরে ঘুমোচ্ছে। মেঝেতে চট পেতে জনা দুই। এই চাষাড়ে ঠান্ডায় তারা মুণ্ডুসুদ্ধু ঢেকে রেখেছে যথাসম্ভব।

অরিন্দম একটা বেঞ্চে একটুখানি জায়গা পেয়ে ব্যাগটা রাখল। তারপর গিয়ে উঁকি দিলে বুকিং কাউন্টারে। ভিতরে একজন লোক মাথা নীচু করে বোধহয় হিসেব-টিসেব করছিল। তার মাথা-মুখ বাঁদুরে টুপিতে ঢাকা।

ভাইসাব, আপ ক্যা মনোহর ঘোষ সাহাবকো পহচানতে হেঁ?

লোকটা তার দিকে চেয়ে নম্রভাবেই বলল, জী।

মুঝকো মনোহরবাবুকা কোঠি যানা হ্যায়।

ইতনি রাত মে?

দূর হ্যায় ক্যা?

কম সে কম এক মিল তো হোগা।

অরিন্দম দমে গেল। অচেনা জায়গায় মধ্যরাতে ভারী একটা ব্যাগ টেনে এক মাইল হাঁটা কষ্টকরও বটে, বিপজ্জনকও। কারণ পথে কুকুর ধরতে পারে, চোর সন্দেহ করে লোকে হামলা করতে পারে।

আপ জারা বৈঠ যাইয়ে। সবেরেমে যাইয়েগা। রাস্তা খারাপ হ্যায়।

অরিন্দমের আরও একটি সমস্যা হল, তার সঙ্গে কোনও খাবার নেই। প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। সে চারদিকে তাকিয়ে দেখল কোথাও কোনও দোকান-টোকান দেখা যায় কিনা। না, ঘন কুয়াশায় সেরকম কিছুই দেখা গেল না। দোকান থাকলেও এত রাতে দূর মফঃস্বলে কে দোকান খোলা রাখবে?

খিদের সঙ্গে যোগ হয়েছে ঠান্ডা। এত ঠান্ডা সহ্য করার অভ্যাস নেই তার। প্রায় খোলা চাতালে যে লোকগুলো অকাতরে ঘুমোচ্ছে তারা নিতান্তই গরিব মানুষ, গায়ে চাপা দিয়েছে ছেঁড়া কম্বল বা কাঁথাকানির মতো জিনিস। এই প্রচণ্ড শীত তাতে আটকানোর কথা নয়, এ দেশের গরিবদের সহ্যশক্তি অপরিসীম।

মনোহর ঘোষকে সে চেনে না। বেঞ্চে বসে সে মনোহর ঘোষ নামক রহস্যময় লোকটির কথা ভাবছিল। মনোহর ঘোষ একজন ভাগ্যন্বেষী মানুষ, বাঙালি হলেও বাংলার লোক নন। এলাহাবাদে জন্ম, এম এ এবং ল পাশ। একসময়ে এলাহাবাদ হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করতেন। প্রবাসী একজন বাঙালি মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন, সুখী মানুষ। তারপর হঠাৎ এক দুর্ঘটনায় তাঁর স্ত্রী মারা যান। সেই থেকে বৈরাগ্য। এলাহাবাদের বিরাট পৈতৃক বাড়ি, বিষয়সম্পত্তি হেলায় ফেলে রেখে এই গ্রামে চলে এসেছেন। বহুকাল তাঁর কোনও খবর ছিল না। তাঁর এক বন্ধু তাঁর বিষয়সম্পত্তি আগলে রেখেছেন। প্রকৃত ওয়ারিশনের সন্ধান পেলে হস্তান্তর করবেন। মনোহর ঘোষকে লোকে ভুলেই গিয়েছিল। হঠাৎ এলাহাবাদের একটি ইংরিজি কাগজে একটা খবর বেরোল যে, মনোহর ঘোষের নবজন্ম ঘটেছে। তিনি গত কয়েক বছর ধরে অসাধারণ ছবি এঁকেছেন।

শুধু এটাই খবর নয়, দিল্লির এক পাঁচতারা হোটেলে মনোহরের একশো বাইশখানা ছবির একটা এগজিবিশন হয়। তাতে প্রত্যেকটা ছবিই ভালো দামে বিক্রি হয়ে যায়। আর্ট ক্রিটিকরা তাঁর ছবির ভূয়সী প্রশংসাও করেছেন। অরিন্দম এলাহাবাদের একটি ইংরিজি পত্রিকার সাংবাদিক। এডিটর তাকে একদিন ডেকে বলল, মনোহর ঘোষের পাত্তা লাগাও, নইলে প্রেস্টিজ থাকবে না।

পাত্তা লাগানো বড় সহজ ছিল না। প্রথম কথা দিল্লিতে প্রদর্শনী হলেও মনোহর সেখানে যাননি। প্রদর্শনীর আয়োজকরা মনোহরের হাল হকিকৎ জানাতে নারাজ। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে এবং গোয়েন্দাগিরি করে এই এত দূর আসা। অরিন্দম ঝানু সাংবাদিক নয়। মাত্র উনত্রিশ বছর বয়সি অত্যুৎসাহী যুবা মাত্র। মনোহর ঘোষকে আবিষ্কার করতে এসেছে।

অরিন্দম ঘড়ি দেখল। রাত একটা পাঁচ। বুকিং ক্লার্ক ঝাঁপ বন্ধ করে দিয়েছে। বোধহয় অফিসে ঘুমোনার বন্দোবস্ত আছে। একখানা ওমওয়ালা বিছানার জন্য শরীরটা আঁকপাঁক করছে অরিন্দমের। আর খিদেটা পেট থেকে ব্রহ্মতালু অবধি বিস্তার লাভ করেছে। খাবার না থাকলেও জলের বোতল আছে ব্যাগে। খিদে মারতে বোতল বের করে জল খেতে গিয়ে দেখল, জল এত ঠান্ডা মেরে গেছে যে, গলায় যেন ছুরি চালানোর মতো লাগছে। অগত্যা ক্ষান্ত দিল সে। চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া কী আর করতে পারে সে?

অরিন্দমের ঢুলুনি এল। বসা অবস্থাতেই ঘাড়টা ভেতরে করে চোখ বুজে ফেলল সে। তারপর হিজিবিজি স্বপ্ন। কিন্তু খিদে আর ঠান্ডায় ঘুমটারও বারবার চটকা ভেঙে যাচ্ছে। এলাহাবাদ থেকে ট্রেনটা অস্বাভাবিক দেরি না করলে তার আজ বিকেলেই পৌঁছে যাওয়ার কথা ছিল। জংশন স্টেশন থেকে গাড়ি বদলে প্যাসেঞ্জার ট্রেন পেতেও ঘণ্টা দুয়েক বসে থাকতে হল। সময়মতো ট্রেন পেলে সে কাজ সেরে এতক্ষণে ফেরার ট্রেনে চেপে বসে থাকতে পারত। এদেশে কি ইচ্ছেমতো সব হয়?

রাত দেড়টায় হঠাৎ চারদিক প্রকম্পিত করে একটা ট্রেন এসে দাঁড়াল প্ল্যাটফর্মে, প্যাসেঞ্জার ট্রেনই হবে। নিশ্চয়ই প্রচুর লেট করে এসেছে। আশ্চর্যের বিষয়, ট্রেন থেকে জনা দশবারো লোকও নামল। বেশির ভাগই দেহাতী গরিব মানুষ। শীতে জবুথবু। কিন্তু তারা ছাড়াও জনা চারেক মেয়ে-পুরুষের একটা দল। তাদের চেহারা রীতিমতো সম্ভ্রান্ত। পুরুষ দুজনের পরনে গরম পাতলুন, প্রিন্স কোট, মাথায় কাশ্মীরি টুপি, দুই মহিলার গায়েও মহার্ঘ কোট, স্কার্ফ, শাড়ি এবং চুড়িদার।

ভারি অবাক হয়ে চেয়ে ছিল অরিন্দম। এরা এত রাতে এই গাঁ-গঞ্জে কোথায় যাবে।

তাকে ভারি অবাক করে দিয়ে প্রৌঢ় পুরুষটি পরিষ্কার বাংলায় বললেন, দেখেছ, ভোলা গাড়ি নিয়ে আসেনি।

বয়স্কা মহিলা বললেন, খবর পেয়েছে কিনা দেখ। এখন কী হবে?

পুরুষটি বিরক্ত হয়ে বললেন, কী আর হবে! কাছেই বীরেন সিং-এর বাড়ি, ওখানেই রাতটা কাটিয়ে দিতে হবে আর কি।

অল্পবয়সী ছেলেমেয়ে দুটি কোনও কথা কইল না। মুখে বিরক্তির ভাব।

ভদ্রলোক জিগ্যেস করলেন, মুংলি, কী বলিস?

মেয়েটি ভারি মিঠে গলায় বলল, বীরেনচাচার মুশকিল কী জানো? একবার আমাদের পেলে কাল সারাদিন আটকে রাখবে। কিছুতেই যেতে দেবে না।

ছেলেটা এগিয়ে গিয়ে কী যেন দেখছিল। হঠাৎ ফিরে বলল, বাবা, কী যেন একটা আসছে। গাড়ি বলেই মনে হচ্ছে। ওই যে! সাতপুরার মোড় থেকে টার্ন নিল মনে হয়।

এই কুয়াশায় দেখছিস কী করে? আমি তো দেখছি না।

আমি পাচ্ছি বাবা, দুটো হেডলাইট খুব আবছা দেখা যাচ্ছে।

এলে তো ভালোই। পাঁচ মিনিট দেখা যাক।

অরিন্দমের খুব লোভ হচ্ছিল, এদের সঙ্গে কথা বলার। তবে চেহারা আর হাবভাব দেখে মনে হয় এরা রইস লোক। বড়লোকরা উটকো অচেনা লোককে পছন্দ করে না। গাল বাড়িয়ে থাপ্পড় খাওয়ার মানে হয় না।

পরিবারটা ধারে দাঁড়িয়ে খুব উদ্বিগ্নভাবে চেয়ে রইল। একটু বাদে একটা বিরাট ঝকঝকে গাড়ি এসে ঘ্যাঁচ করে থামল সামনে। উর্দি পরা ড্রাইভার লাফিয়ে নেমে এসে সেলাম ঠুকে দরজা খুলে ধরল।

ভদ্রলোক বিরক্ত হয়ে বললেন, দের কিয়া কিঁউ রে?

হুজুর, টায়ার পাংচার হুয়া থা।

ওরা যখন গাড়িতে উঠতে যাচ্ছে তখন একটা চকিত তাগিদে অরিন্দম উঠে গিয়ে ভদ্রলোককে জিগ্যেস করল, আচ্ছা, এখানে মনোহর ঘোষের বাড়িটা কোথায় তা জানেন?

ভদ্রলোক অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে বললেন, বাঙালি নাকি?

আজ্ঞে হ্যাঁ, অরিন্দম মিত্র। এলাহাবাদ থেকে আসছি। রিপোর্টার।

তা এত রাতে কেন?

ট্রেনটা লেট ছিল, তাই ফেঁসে গেছি।

স্টেশনে বসে রাত কাটাবেন নাকি? মনোহর ঘোষের বাড়ি অনেক দূর। সাতপুরা ছাড়িয়ে জঙ্গলগড়ের রাস্তায়।

সকালে রিক্সা-টিক্সা পাওয়া যাবে না?

তা যাবে। মনোহর ঘোষের কাছে কেন? কোনও খবরের জন্যে?

হ্যাঁ, উনি তো এখন খুব বিখ্যাত লোক, তাই একটা ইন্টারভিউ নিতে আসা।

এই শীতে ঠান্ডায় স্টেশনে বসে থাকবেন কেন, বরং আমার বাড়িতে চলুন। রাতটা কাটিয়ে সকালে ঘোষমহাশয়ের বাড়িতে যাবেন। আমার বাড়ি থেকে বেশি দূরও নয়। আসুন, উঠে পড়ুন।

আমি আপনাদের অসুবিধেয় ফেলছি না তো?

না, অসুবিধে কীসের? তার ওপর আপনি বাঙালি, দেশের মানুষ। উঠুন।

অগত্যা উঠে পড়ল অরিন্দম। সামনের সিটে, ভদ্রলোক এবং ড্রাইভারের মধবর্তী জায়গায়। গাড়িটা পুরোনো আমলের বুইক বা ওই জাতীয় বড় গাড়ি। ভারি আরাম বসে।

কথায় কথায় জানা গেল, ভদ্রলোকের বিরাট কাঠের কারবার আছে এখানে। ডিজাইনার ফার্নিচার তৈরির বড় বড় কন্ট্র্যাক্ট পান। এখানেই তার কারবার। তবে এলাহাবাদ আর লখনউতে শো রুম আছে। দিল্লিতে শিগগিরই খুলবেন। নাম অনিমেষ রায়।

দশ মিনিট পরে যখন অনিমেষ রায়ের বাড়ি পৌঁছালো তখন হকচকিয়ে গেল অরিন্দম।

অন্ধকার এবং কুয়াশার মধ্যে বাড়িটা যেন জাহাজের মতো প্রতিভাত হচ্ছে। চারদিকে বিশাল বাগান, মাঝখানে বিরাট বাড়ি। বিজলী বাতির বহর দেখে অরিন্দম অনুমান করল, ডায়নামো চলছে। নইলে এই দূর প্রান্তরে বিজলীবাতির এত বাড়াবাড়ি সম্ভব নয়।

ভদ্রলোক আলাপি আর মিশুকে হলে কি হয়, অনিমেষ রায়ের বউ বা ছেলেমেয়ে তার সঙ্গে একটি কথাও বলল না। গাড়ি থেকে নেমে চটপট ভিতরে, বোধহয় যে যার ঘরে চলে গেল।

অনিমেষের মেলা চাকরবাকর এসে মালপত্র নামাচ্ছিল। তাদের একজনকে ডেকে অনিমেষ বললেন, সাবকো গেস্ট রুমমে লে যাও।

একতলায় বেশ সাজানো-গোছানো একটা ঘরে চাকর তাকে পৌঁছে দিল। বিরাট ঘর। বিছানার ঢাকনাটা তুলে চাকরটাই বালিশ লেপ সব বের করে চটপট সাজিয়ে দিল। বলল, কুছ চাইয়ে সাব?

অরিন্দম খিদেয় কহিল। সসঙ্কোচে বলল, একঠো রোটি মিলেগা?

চারকটা হেসে ফেলল, একঠো কিঁউ বাবু? খানা লাগা দেতা হ্যায়। কোই দিককত নেই।

জেয়াদা কুছ নেহি চাহিয়ে।

আরাম কিজিয়ে, তুরন্ত খানা লাতা হ্যায়।

এত আরাম কল্পনাতেও করেনি অরিন্দম, গরম জলে হাত-মুখ ধুয়ে এসে দেখে গরম তরকারি, ডাল, রুটি নিয়ে চাকর হাজির।

খেয়ে লেপের তলায় ঢুকতেই ঘুম।

রাত সাড়ে তিনটে নাগাদ শুয়েছে, দেরিতে ঘুম ভাঙবার কথা, কিন্তু অরিন্দম সকাল সাড়ে ছ'টাতেই উঠে পড়ল। কুয়াশা খানিকটা এখনও জমে আছে বটে, কিন্তু জানালা দিয়ে রাঙা রোদের আভাসও পাওয়া যাচ্ছে। অচেনা বাড়িতে রাতটা কেটেছে মন্দ নয়। বাড়ির মালিককে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বেরিয়ে পড়া দরকার। আজই এলাহাবাদ ফিরতে হবে। তাছাড়া অনিমেষ রায় তাকে শীত ও খিদে থেকে রক্ষা করলেও তাঁর পরিবার-পরিজনরা তাকে যে মোটেই আমল দেয়নি এই অপমানটাও সে ভুলতে পারছে না। হয়তো ওঁরা খুব অহঙ্কারী।

মুখটুখ ধুয়ে সে যখন পোশাক পরতে যাচ্ছিল তখনই রাতের সেই চাকরটি চা নিয়ে এল, মুখে এক গাল হাসি! অবাক হয়ে বলল, কাঁহা যা রহেঁ সাহাব?

তুমহারা নাম ক্যা হ্যায়?

রামুয়া জী।

রামুয়া, ম্যায় কাম পর যা রহা হ্যায়।

যাইয়ে গা সাহাব। নাস্তা তো লে লিজিয়ে।

নাস্তা! একটু ভাবল অরিন্দম। না, ব্রেকফাস্টের দরকার তার নেই। কাজটা সেরে দোকান-টোকানে কিছু খেয়ে নেবে। দেহাতে আর কিছু পাওয়া না গেলেও দৈ-চিঁড়ের অভাব হবে না। নয়তো ছাতু।

দেরি হয়ে যাবে বলে সে আপত্তি তুলতেই রামুয়া বলল, মেমসাহাব নে বোলা, আট বাজে আপকো অন্দর লে যানে হোগা।

একটু অবাক হল অরিন্দম। মেমসাহেব মানে তো অনিমেষ রায়ের স্ত্রী। তিনি কেন আমন্ত্রণ জানাবেন?

আগুপিছু ভেবে অরিন্দম যাত্রাভঙ্গ করল। সে যতদূর জানে, বেলা তিনটেতে এখান থেকে জংশনে যাওয়ার ট্রেন মিলবে। রাত্রে এলাহাবাদ পৌঁছোতে অসুবিধে নেই।

সে স্নান করে নিল। তারপর রেডি হয়ে বসে রইল। ঠিক আটটায় রামুয়া এসে ডেকে নিয়ে গেল তাকে। বিশাল বাড়ি। নানা মহার্ঘ জিনিসে সাজানো একটা হলঘর পেরিয়ে সূক্ষ্ম পর্দার আড়ালে বিশাল ডাইনিং রুম। চারদিকে হিটার ফিট করে রাখায় এ ঘরে ঠান্ডা নেই।

ডাইনিং টেবিলে আজ সবাই উপস্থিত। অনিমেষ রায়, তাঁর স্ত্রী, মেয়ে এবং ছেলে।

অনিমেষ রায় বললেন, আসুন অরিন্দমবাবু, রাতে ঘুম হয়েছিল তো!

লাজুক হেসে অরিন্দম বলল, আপনার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। আশ্রয়টুকু না পেলে কষ্ট পেতে হত।

আরে, এ তো আমার কর্তব্য। বিদেশ-বিভুঁয়ে বাঙালি হয়ে বাঙালিকে দেখব না? সঙ্কোচ করবেন না, বসুন।

আজ সবাই তার দিকে চেয়ে দেখছিল। অরিন্দমের চেহারা ভালো। সে ছ'ফুট লম্বা, ছিপছিপে, ফর্সা এবং সুপুরুষ। একসময়ে সে সিনেমায় নামার কথাও ভাবত। ঘটনাচক্রে হয়ে ওঠেনি।

সে বসার পর আচমকাই ভদ্রমহিলা তাকে সরাসরি জিগ্যেস করলেন, সতু নামে আপনার কোনও মাসি আছেন, যিনি জব্বলপুরে থাকেন?

অবাক হয়ে অরিন্দম বলল, হ্যাঁ, আমি তো সতু মাসির কাছে প্রায়ই যাই। আপনি মাসিকে চেনেন?

খুব চিনি, সতুদির পাড়াতেই আমার বাপের বাড়ি। আপনাকে দেখেই কাল চেনা চেনা লাগছিল।

মুহূর্তের মধ্যেই ভাব হয়ে গেল। জব্বলপুরের মাসির সূত্রেই ব্যবধান ঘুচে গেল লহমায়। অনুপস্থিত একজন মানুষও কত নতুন সম্পর্ক রচনা করে দিতে পারে!

মুংলি আর মিতুলের সঙ্গেও দিব্যি ভাব হয়ে গেল এবং পরিবারটিকে মোটেই অহংকারী লাগল না আর। সম্বোধনটাও নেমে এল 'তুমি'তে। অনিমেষ রায় আর তাঁর স্ত্রী হয়ে গেলেন মেসোমশাই আর মাসিমা। যেরকমটা হয়ে থাকে আর কি।

মাসিমা বললেন, মনোহরবাবুর কাছ থেকে ঘুরে এসো, তারপর দুপুরে এখানেই খাবে। আমাদের গাড়ি করেই যাবে আসবে। তিনটের ট্রেনও ঠিক ধরিয়ে দেব, চিন্তা কোরো না।

মুংলি বলল, আমিও আপনার সঙ্গে যেতে পারতাম, কিন্তু আজ আমাদের একটা পিকনিক আছে। আমি সোশ্যাল কিছু কাজ করি। দেহাতী মেয়েদের লেখাপড়া, হাতের কাজ আর ফার্স্ট এইড শেখাই। ওদের নিয়েই আজ পিকনিক।

মিতুল বলল, আমাকে আজই লক্ষ্ণৌ যেতে হবে ব্যবসার কাজে।

অরিন্দম বলল, আরে ঠিক আছে। তোমরা যে যেতে চেয়েছ এটাই তো যথেষ্ট।

মাসিমা বললেন, যাও বাবা, ঘুরে এসো। মনোহর ঘোষ খুব খটমটে লোক। সাবধানে কথা কয়ো, একটুতেই ফোঁস করেন।

মনোহর ঘোষ যে খটোমটো লোক তাকে সন্দেহ নেই। অনিমেষ রায়ের একটা জিপ গাড়িতে সে যখন একটা ছোট জঙ্গল পেরিয়ে মনোহরের বাড়ির সামনে এসে নামল তখন রোদ উঠেছে এবং মনোহর ঘোষ উঠোনে একটা খাটিয়া পেতে রোদ পোয়াচ্ছেন। অবাক হয়ে তাকে দেখে বলে উঠলেন, ক্যায়া মাংতা?

মনোহরের বেশ বয়স হয়েছে, মুখ দাড়ি-গোঁফে সমাচ্ছন্ন। উঠোনে মুরগি দৌড়ে বেড়াচ্ছে, কয়েকটকা ছাগল বসে আছে। দেহাতী সংসার যেমন হয়।

আমি এলাহাবাদ থেকে আসছি, রিপোর্টার।

বাঙালি।

হ্যাঁ।

কী চাও?

আপনার পেইন্টিং নিয়ে ইদানীং খুব কথা হচ্ছে।—তাই—

দূর দূর! ও নিয়ে কথা বলার কী আছে? পেইন্টিং নিজেই নিজের কথা বলবে।

সে তো ঠিকই স্যার, তবে আপনি তো ওরিজিন্যাল পেইন্টার ছিলেন না। তাছাড়া, আপনি বিষয়সম্পত্তি ছেড়ে দিয়ে নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন।

দেখ বাপু, প্রত্যেকেরই নিজস্ব জীবনযাপনের অধিকার আছে। তাছাড়া আমার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কথা কইতে আমি যাবই বা কেন?

অরিন্দম প্রমাদ গুনে বলল, তা তো ঠিকই, কিন্তু স্যার, আপনার সম্পর্কে যে মানুষের খুব কৌতূহল!

কৌতূহল থাকলেই যে আমাকে মেটাতে হবে তার কোনও মানে নেই।

অরিন্দম লাইন পালটে বলল, স্যার, আপনি এখন কী পেন্টিং করছেন যদি একটু বলেন।

দেখ বাপু, আমি ধরাবাঁধা ট্রেনিং নেওয়া আর্টিস্ট নই। যখন যা খুশি আঁকি ইচ্ছে মতো। রুটিন করে আঁকি না। ও ব্যাপারে কিছু বলার নেই আমার।

অন্তত যদি একটা মেসেজও দেন।

একটা মেসেজ নেওয়ার জন্য গাড়ি হাঁকিয়ে এসেছ। বলিহারি তোমাদের হুজুগের।

ওটা আমার গাড়ি নয়, অনিমেষ রায়ের গাড়ি, দয়া করে ধার দিয়েছেন।

অনিমেষ রায়ের নামে হঠাৎ তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠেন মনোহর, অনিমেষ! ওই লোকটকাই তোমাকে পাঠিয়েছে নাকি?

না, আমি কাল রাতে স্টেশনে আটকা পড়েছিলাম। উনি আশ্রয় না দিলে—

গোটা মহালের গাছপালা মুড়িয়ে কাটছে—ওতো একটা ভিলেন। ওকে ফাঁসি দেওয়া উচিত।

আজ সকালেই শুনছিলাম, উনি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কাছ থেকে নিলামে কাঠ কেনেন।

তাতে কী? ওকে খুশি করতেই তো ওরা কাঠ কেটে বন সাফ করেছে। যার ট্যাঁকে টাকা আছে সে না পারে কী?

স্যার একটা কথা বলবেন?

কী?

স্ত্রীর মৃত্যুতে আপনি গৃহত্যাগ করেন। পরে কি আপনি আর বিয়ে করেছেন?

রোখা চোখা ভাবটা হঠাৎ উধাও হল, মনোহর জুলজুলে চোখে তার দিকে চেয়ে বললেন, বউ মরে গিয়ে আমার খুব ভূতের ভয় হত, বুঝলে? ও ভয় আমার চিরদিন। তাই বাড়ি ছেড়ে চলে আসি। এখানে এক বন্ধু ছিল। বিহারী বন্ধু। তার সঙ্গে থাকতাম। বিষয়স্পৃহা ছিল না। বন্ধুটিই জোর করে তার বোনের সঙ্গে আমার বিয়ে দেয়। ক্ষেতি গেরস্তিও দেয়। তবে এলাহাবাদের সম্পত্তিও আমার আছে।

এখন তো আপনি বেশ ধনী মানুষ।

মনোহর পিছন ফিরে কাকে হাঁক মেরে বললেন, এক চারপাই তো লাগা দে। বোসো বাপু।

একটা বছর বারো-তেরোর ছেলে দৌড়ে এসে একটা চারপাই পেতে দিতে গেল। অরিন্দম বসল।

মনোহর একটু চুপ করে থেকে বললেন, আমি অ্যাডভোকেট ছিলাম। বিষয়সম্পত্তিও ছিল যা আছে। কিন্তু মন তাতে ভরেনি। ভিতরটা বড্ড খাঁ খাঁ ছিল। হঠাৎ একদিন ছবি আঁকা ধরলাম, বুঝলে! হয়তো আঁকার একটা ক্ষমতা ভিতরে ছিল, বুঝতে পারিনি। যে-ই আঁকতে শুরু করলাম অমনি ভেতরের শূন্যতাটা উধাও হল, আনন্দ এল, মনঃসংযোগ এল, তাগিদ এল। গত দশ-পনেরো বছর ধরে শুধু এঁকে যাচ্ছি।

আপনার ছবির প্রচণ্ড প্রশংসা হচ্ছে, জানেন কি?

জানি, জানি, বিক্রিও হয়েছে মেলা। অনেক টাকাও পেয়েছি। কিন্তু এখন ভয় হচ্ছে।

কীসের ভয়?

যেটা ছিল আমার নিভৃতের আনন্দ সেটা যখন মার্কেটিং-এর খপ্পরে গিয়ে পড়ল তখন আর আনন্দটা থাকবে কি? খ্যাতির লোভ, অর্থের স্পৃহা এসে আনন্দটাকে মাটি করে দেবে। বুঝেছো? আমি এখন খুব

দোটানায় আছি।

প্রকৃত শিল্পীর তো এরকমই হওয়ার কথা। কিন্তু আপনি নির্বিকার থাকলে কে কী করবে?

না হে না, নির্বিকার থাকা এত সহজ নয়। হোলি খেলা নিয়ে আমার একটা ছবি দেড় লাখ টাকায় বিক্রি হয়েছে, ভাবতে পারো? এরকম রাক্ষুসে দাম কেউ দেয়? যাক গে, কী খাবে বলো!

কিছু না, আমি ব্রেকফাস্ট খেয়ে এসেছি। আপনার স্টুডিয়োটা কি একটু দেখতে পারি?

হাঃ হাঃ করে হাসলেন মনোহর। বললেন, আমি কি পিকাসো না মাইকেল অ্যাঞ্জেলো? ওই নিম গাছটার তলায়, নয় তো মকাই ক্ষেতে, নয় তো ইঁদারার ধারে, যখন যেখানে মন চায়, ইজেল পেতে আঁকতে বসে যাই। স্টুডিয়ো-ফুডিয়ো নেই। গাদা গাদা ছবি পড়ে আছে। কয়েকখানা আমার এক বন্ধু নিয়ে গিয়েছিল কাকে দেখাবে বলে। তারপর কী থেকে কী যে হয়ে গেল! আমাকে এখন নানা জায়গা থেকে ডাকছে।

যাবেন না?

দূর দূর! এই তো বেশ আছি। ঝুট ঝামেলা থেকে দূরে, দেহাতে, আপনমনে। আনন্দই সব বুঝলে! আনন্দ যদি মাটি হয় তাহলে কিছু দিয়েই তা ফেরানো যায় না। বুঝেছ?

বুঝেছি।

এইসব কথাই গিয়ে লিখো তোমার কাগজে। লিখো, আমি আনন্দে ভরে থাকতে চাই। আর কিছু চাই না।

যে আজ্ঞে, বলে অরিন্দম উঠে পড়ল।

# সুখ

এই সময়টায় ছাদে ভেজা জামাকাপড় মেলতে ওঠে চম্পাকলি। আর এই সময়টাতেই ছোকরাটা একটা সাইকেলে বাড়ির চারপাশে চক্কর খায়। চোখ প্রায় সর্বদাই ছাদের দিকে। কবে হুড়মুড় করে নর্দমায় পড়ে, কী ল্যাম্পপোস্টে ধাক্কা খায়, কে বলতে পারে! এ সময়টায় চম্পাকলির সাজগোজ থাকে না, মাথার খোঁপা ভেঙে পড়ে আছে ঘাড়ে, শাড়ি গাছকোমর করে পরা, মুখে কোনও রূপটান নেই। এ হল হাড়ভাঙা কাজের সময়। এখন কি সাজতে আছে! কিন্তু ছোঁড়াটা তাকেই দেখতে আসে রোজ, এটা বুঝতে বিএ-এমএ পাশ করতে হয় না।

চম্পার যে ব্যাপারটা খুব খারাপ লাগে, এমন নয়। যদিও সে বিবাহিতা এবং মোটামুটি সুখী একজন বউ, তবু বাড়তি পাওনা তো কখনও ফ্যালনা হয় না। দেখছে তো দেখুক না, বাড়াবাড়ি না করলেই হল।

কাপড় মেলে ক্লিপ লাগিয়ে একটু রেলিংয়ের ধারে দাঁড়াল চম্পা। আহা বেচারা রোজ এত কষ্ট করে, তাকে একটু প্রসাদ না দিলে হয়? তবে নীচের দিকে তাকায় না সে। যেন উদাস দৃষ্টিতে দিগন্তের শোভা দেখছে এমনভাবে রেলিংয়ে কনুই রেখে চেয়ে থাকে। দুমিনিটের বেশি নয়। ফের নীচে নেমে কত কাজ।

চম্পাকলি দেখতে কেমন? নিজের মুখে চম্পা তা বলে কেমন করে? তবে ছেলেবেলায় তাকে সবাই ফুটফুটে বলত। বড় হয়ে শুনতে পায়, অ্যাট্রাকটিভ, সেক্সি, রোম্যান্টিক, লাবণ্যময়ী। হয়তো খুব সুন্দরীর পর্যায়ে সে নয়, কিন্তু রাস্তাঘাটে পুরুষরা বেশ তাকায়। ল্যা-ল্যা করেই তাকায়।

ছোকরা বোধহয় সাইকেলে তাকে সাত পাকের জায়গায় সতেরো পাক দিয়ে ফেলল। হ্যাংলাও হয় বটে পুরুষগুলো। মনে মনে হেসে চম্পাকলি ছাদ থেকে দোতলায় নেমে এল। এই তার সংসার। তিনখানা বড় বেডরুম, বেশ বড়সড় হলঘরের মতো, তার অর্ধেকটা বুককেস দিয়ে আড়াল করা আলাদা বৈঠকখানা, বাকিটা লিভিংরুম। শ্বশুর, শাশুড়ি আর তারা দুজন। ননদের বিয়ে হয়ে এখন ইন্দোনেশিয়ায়। চম্পাকলির রাজত্ব মোটামুটি বিঘ্নহীন।

লিভিংরুমে চল্লিশ ইঞ্চির এলসিডি টিভি খোলা। একটু তফাতে চেয়ারে বসে আছেন শাশুড়ি। সারাদিন টিভি দেখার নেশা। সঙ্গে পান আর স্পেশাল দোক্তা। একটু ভারভাস্তিক মানুষ, বেশ পুরু করে সিঁদুর পরেন সিঁথিতে, কপালে বড় সিঁদুরের ফোঁটা। পরনে পাটভাঙা শাড়ি, যেন এখনই বেরোবেন। কিন্তু বেরোতে বিশেষ পছন্দ করেন না। সিরিয়াল দেখতেই বেশি ভালোবাসেন। সন্ধেবেলা দেখা সিরিয়ালের পুনরাবৃত্তি এই দিনের

বেলাতেও দেখতেই হবে তাঁকে। চম্পাকলির তাতে আপত্তি নেই। কারণ, ওই খেলনায় মজে থাকেন বলে সংসারের ভালোমন্দে বিশেষ নাক গলান না।

শ্বশুরমশাই বাজারে। আর বাজার মানেই তাঁর মুক্তি। সকাল আটটায় বেরিয়ে বাড়ি ফিরতে সেই এগোরাটা। পথে একটা চায়ের দোকানের আড্ডা আছে, একটা কাপড়ের দোকানেও খানিক সময় কাটান। মাছ বাজার, সবজি বাজারেও বিস্তর পুরোনো চেনাজানা লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। নিষ্কর্মা লোক, আর করারই বা কী আছে?

চম্পাকলির এত কী কাজ? আসলে চম্পার কাজ বলতে কিছুই নেই। রান্নার একজন আছে, বাসন মাজা, ঘর পরিষ্কার করার একজন আছে এবং সবসময়ের একজন আছে। সুতরাং চম্পাকলির সারাদিন ছুটি। কিন্তু চম্পাকলি ছুটিটা বিশেষ পছন্দ করছে না। বেশি সুখেরও কিন্তু ফল-আউট থাকে। এই যে বেশ বড় বড় ঘর, আলোবাতাসের রূপকথায় ভরা ফ্ল্যাট, এ তার শ্বশুরমশাইয়ের করা। নীচের তলায় ব্যাঙ্ককে ভাড়া বসিয়েছেন তিনি। বিচক্ষণ, দূরদর্শী লোক আর কাকে বলে! মেয়েকেও সমপরিমাণ টাকা দিয়ে দিয়েছেন যাতে বাড়ির ভাগাভাগি নিয়ে কখনও ঝগড়াঝাঁটি না হয়।

চম্পাকলির সুখ এখন সর্বত্র পাখির ডাক ডাকে, প্রজাপতির মতো ওড়ে, সুগন্ধের মতো ভেসে থাকে।

এই যে বারান্দায় দাঁড়িয়ে চম্পা এখন চা খাচ্ছে, এটার মধ্যেও সুখের উঁকিঝুঁকি। দামি দার্জিলিং পাতার চা, সামান্য চিনি আর এক চিমটি হোয়াইটনার দেওয়া। ফরসা পোর্সেলিনের কাপে সুগন্ধী চা সুখের শিহরণে তার দম বন্ধ করে দিতে চায়। আর ওই যে ছেলেটা, উল্টোদিকের ইস্তিরিওয়ালার গুমটিতে সাইকেল কেতরে পায়ের ঠেক রেখে দাঁড়িয়ে আছে, ওরও কিছু উপচার আছে। রোজ ছেলেটা তাকে পুজো দিয়ে যায়। বারান্দায় চায়ের সময়টায় যে চম্পাকলি তার একমাত্র ভক্তটিকে দর্শন দেয় মাত্র।

চম্পার আরও ভক্ত ছিল। সেই বারো-তেরো বছর বয়স থেকেই তার উদ্দেশে কত হৃদয়ের বারিধারা বর্ষিত হয়েছে, তার হিসেব নেই। অঙ্কের মাস্টার, পিসতুতো দাদা, পাড়ার মস্তান, দাদার বন্ধু, এবং বিপজ্জনক নিখিলেশ। নিখিলেশ আসলে দু'জন। একজন সোবার নিখিলেশ, অন্যজন মাতাল। আর নিখিলেশ তাদের বাড়িতে আসত মাতাল হয়েই, রাত বারোটার পর এবং পাড়া কাঁপিয়ে তর্জন-গর্জন করতে করতে। আসলে সে চম্পার উদ্দেশে উচ্চকণ্ঠে প্রেমই নিবেদন করত, তবে মাত্রাজ্ঞান না থাকায় দু'-চারটে অশ্লীল শব্দও বেরিয়ে আসত মুখ থেকে। অন্তত বার চার-পাঁচ পাড়ার ছেলেদের হাতে এবং দাদার বন্ধুদের হাতে মার খেয়েছে সে। তবু আসত। সোবার নিখিলেশ একদম অন্যরকম। যেমন ভদ্রলোক, তেমনই স্মার্ট, তেমন সহৃদয়। সোবার নিখিলেশ কখনও প্রেম নিবেদন করেনি চম্পাকলিকে। সোবার নিখিলেশ ছিল চম্পার বাবার শিষ্য, এস্রাজ শিখতে আসত। এস্রাজ বাজাতও ভালো। বাবা বলতেন, বড় তৈরি হাত ছিল নিখিলেশের, কিন্তু মদই ওর প্রতিভাকে খেয়ে নিল।

আশ্চর্যের বিষয় এই, চম্পাকলি আজ অবধি কারও জন্যই পাগল হল না। কারও জন্যই নয়। এই যে তার দিব্যি কৃতী বর পারিজাত, একে তার একটুও অপছন্দ নয়। মালা পরাল, সাত পাকে বাঁধল, এক বিছানায় শুয়ে পড়ল, সব মসৃণভাবে হল। তার বেশি কিছু হল না। একটা বিস্ফোরণের অভাব হল কি?

সুখ, সুখ আর সুখ...চারদিকে সুখের জাল তাকে ঘিরে রেখেছে। এই সুখের হাত থেকে তার আর রেহাই নেই। সুখে সুখে জর্জরিত জীবন। মাঝে মাঝে শ্বাস রোধ হয়ে আসে। মাঝে মাঝে নেশার মতো মনে হয়।

তার বিয়ের পর সে শুনেছে নিখিলেশ মদ আর এস্রাজ দুইয়ের মধ্যে কোনটা ছাড়বে তাই নিয়ে লটারি করেছিল। লটারিতে মদ হেরে যায়। নিখিলেশ এখন দিন-রাত এস্রাজ নিয়ে পড়ে থাকে। মদ ছোঁয় না। এ খবরটা তো কম সুখকর নয়। তার জন্য একটা মানুষের জীবনে অনেক ওলটপালট ঘটে গেছে। এখনও ঘটে চলেছে। তার প্রমাণ ওই ছেলেটা। সাইকেলারোহী, লম্বা, রোগা, দাড়িয়াল এবং বাবরিচুলো এক উদভ্রান্ত পুরুষ কেবল সাইকেল চালিয়ে চালিয়ে আয়ুক্ষয় করে দিচ্ছে। দোতলায় নিষিদ্ধ ফলের জন্য হৃদয়ের ব্যর্থ ক্ষরণ।

ঘরে ঢুকতেই ফের এক ঝলক সুখের মুখোমুখি চম্পাকলি। আয়না। লম্বা তিন খণ্ড আয়না যেন তিন সখী। চম্পাকে দেখলেই তারা যেন আনন্দে উল্লাসে শিউরে ওঠে। সে চেয়ারে বসার সময় টের পায়, চেয়ারটাও যেন একটা তৃপ্তির শ্বাস ফেলে। সে যখন বিছানায় শোয়, তখন বিছানাও যেন প্রেমিকের মতো তাকে বুকে টেনে নেয়। স্নানের সময় শাওয়ারের জলকণা পর্যন্ত তার জয়ধ্বনি দিতে দিতে তার সর্বাঙ্গ লেহন করতে থাকে।

সুখের সঙ্গে একটু লুকোচুরি খেলবে বলেই সে অকাজের কাজ টেনে নেয় নিজের ঘাড়ে। ওয়াশিং মেশিন চালায়, ওটিজিতে পাঁউরুটি টোস্ট করে, ফল কাটে, ডাস্টিং করে, ঘর গোছায়। কখনও-সখনও শখের রান্নাও সে করে। আর মন ভালো রাখতে এস্রাজ বাজায়।

নীচে একটু বাগান। রুমালের মতো ছোট। কিন্তু সেখানে সবুজের কার্পেট পাতা, আর ফুলের অকৃপণ চাষ। দক্ষিণের জানালার ফ্রেমটা তাই যেন একটা ল্যান্ডস্কেপ। ওই কোণে একটা ঝিরঝিরে নিমগাছ বাইরেটা আড়াল করে আছে। এই জানালাটা দিয়েই মাঝে মাঝে গোপন প্রেমিকের মতো হাওয়া আসে, রোদ আসে, আর আসে চোরা হাসি নিয়ে তার সুখ। তখন সুখের সঙ্গেও কথা হয় তার।

সুখ, আমার এত সুখ কেন বলো তো!

আমি যখন দিই, নিজেকে উজাড় করে দিই।

মাঝেমধ্যে একটু বিরহ-যাতনা থাকবে না তা বলে। ঝালনুন, লঙ্কার গুঁড়ো, তেঁতুলের টক না হলে কি হয়।

তা কী করব বলো, তোমার বিরহের মনই তো নেই। পরিজাত যে গত মাসে পনেরো দিনের জন্য কুয়ালালামপুর গেল, তোমার ক'ফোটা চোখের জল পড়েছে বলো!

তা অবিশ্যি ঠিক। আমার চোখে-হারাই ভাবটা নেই। আচ্ছা, তাহলে বিরহ ব্যাপারটা কেমন হয় আমাকে একটু বুঝিয়ে দাও তো।

মাখা ময়দার লেচি দেখনি? একটা বড় লেচি ছিঁড়ে দুটো আলাদা লেচি করতে যাও, দেখবে একটা অন্যটাকে ছাড়তে চায় না। গদের আঠা কেমন হয় জানোই তো!

বড্ড ভাবনায় ফেললে সুখ!

ইস্তিরি করা এক পাঁজা জামা-প্যান্ট-শাড়ি ধুতি গুছিয়ে রাখবে বলে ঘরে এসেছিল সবিতা। সবসময়ে মুখখানা হাঁড়ি। কোনও সময়ে ওকে হাসতে দেখে না চম্পা। কথাও বড্ড কম। কাজে অবশ্য ভীষণ ভালো, আর চোর-টোরও নয়।

'হ্যাঁ রে, তুই হাসিস না কেন বল তো!' একদিন জিগ্যেস করেছিল চম্পা।

এ কথায় সেদিন ঠোঁটে একফালি চাঁদ দেখা দিয়েছিল। বলল, 'শুধু শুধু হাসব কেন?'

'লোকে হাসির কথায় হাসে, মনে আনন্দ হলে হাসে, নইলে অন্তত মুখটা হাসি-হাসি তো থাকে। তোকে যে সেদিন দুটো শাড়ি দিলুম, আঁশটে মুখ করে নিলি, যেন মরা ইঁদুর ফেলতে যাচ্ছিস!'

'যাঃ, তাই বুঝি! কী সুন্দর শাড়ি।'

'বরকে বলেছিস?'

'বলিনি আবার। শুনে বলল, বউদি খুব ভালো।'

আজও সবিতার মুখ সেইরকম হাঁড়ি।

চম্পা বলল, 'হ্যাঁ রে, রোজ দেখি একটা দাড়িওয়ালা ছেলে সাইকেলে ঘুরে বেড়ায়। লম্বা, রোগা চেহারা। চিনিস?'

সবিতা আলমারি খুলে কাপড়-জামা খুব যত্ন করে সাজিয়ে রাখছিল। মুখ না ফিরিয়েই বলল, 'কে জানে, কত লোকই ঘোরে।'

চিনেই বা কী হবে চম্পাকলির! জাস্ট কৌতূহল বই তো নয়। ভুলে যেতে তার দু'মিনিটও লাগে না। তার মনটা কি জলের মতো? যতই দাগ কাটো, কোনও চিহ্নই থাকে না?

মুচমুচে সুখ, টক-ঝাল সুখ, মিষ্টি সুখ, গরমে শীতলতার মতো, শীতে উষ্ণতার মতো সুখ ঘিরে আছে তাকে। কোকিলের মতো ডাকে, দোয়েলের মতো শিস দেয়, ফিঙের মতো লেজ নাচিয়ে পিরিক-পিরিক লাফিয়ে বেড়ায়।

'তোর বর কী করে রে সবিতা?'

'গাড়ি চলায়। অ্যাম্বুলেন্স।'

'অ্যাম্বুলেস! এ মা, অ্যাম্বুলেন্স চালায় কেন?'

'তা কী করবে বলো! যা জুটেছে তাই তো করতে হবে।'

'অ্যাম্বুলেন্স' শব্দটাই বিচ্ছিরি। কানে গেলেই যেন একটা করুণ সাইরেনের শব্দ শোনা যায়। আর বুকটা ধকধক করে।

'অনেক মাইনে পায়, না রে?'

'কে জানে কত পায়। আমাকে কি বলবে নাকি? আর যা পায় তার তো প্রায় সবটাই মদ গিলে উড়িয়ে দেয়।'

'ও বাবা, খুব মদ খায় বুঝি?'

'আমাদের ঘরে যত অশান্তি তো ওই নিয়ে। পুরুষ মানুষের রোজগারে সংসার চলে না, আমি রোজগার করি বলে ছেলেপুলে দুটো খেতে পায়।'

অনেকে আছে, দুঃখের সাতকাহন ফেঁদে বসে। সবিতা ঠিক সে রকম নয় বলে বাঁচোয়া। চম্পাকলির হাই উঠছিল।

'অ্যাম্বুলেন্স' শব্দটা বুকে নিয়েই সে সারা ঘর এলোমেলো পায়ে খানিক ঘুরল। মধ্যরাতে মাঝে মাঝে যখন অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেন শুনতে পায়, তখন সে হাত মুঠো পাকিয়ে ফেলে।

## দুই

নানকুর কোথাও পৌঁছনোর নেই। তার সাইকেলখানা শুধু যায় আর ঘুরে ফিরে একই জায়গায় ফিরে আসে। এই লক্ষ্যহীন সাইকেল চালিয়ে তার কোনও আনন্দ নেই। শুধু অভ্যাস আছে। একটা গতি তো। তার বেশি কিছু নয়।

নানকুর পরনের ময়লা জিনস, গায়ে একখানা হাফহাতা কামিজ, পায়ে চপ্পল। সমাজে নানকুর যে-স্তরে বাস তা দারিদ্রসীমার লেভেল ঘেঁষে। বাবা ভুতনাথ একজন ভূতপূর্ব সরকারি কর্মচারী। পিওন থেকে কেরানি পর্যন্ত উঠতে পেরেছিলেন, তারপরই অবসরের চিঠি এসে যায়। দুটো মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে ভারি গরিব হয়ে গেছেন বেচারা। ছেলেকেও পড়াতে হয়েছে। বৃথা-বিদ্যা বলে একটা কথা আছে কি? অনেক বিদ্যে আছে যেগুলো থাকলেও যা, না থাকলেও তা। নানকুর যেমন। সে বি কম। তিনবার তিনটে চাকরি পেয়েছিল। একটা ক্যুরিয়ার সার্ভিসে। একটা খবরের কাগজে। আর একটা কোম্পানির সেলসম্যান। কোনওটাই টেকেনি। ক্যুরিয়র সার্ভিসটা উঠে গেল। খবরের কাগজটাও চলল না। তৃতীয় কোম্পানিটা মেয়েদের রূপচর্চার জিনিস বানাত। পুলিশ-কেস হয়ে মালিক এখন হাজতে, কোম্পানিতে তালা।

নানকু দাড়ি রাখতে শুরু করে উনিশ বছর বয়সে। এখন সে ঊনত্রিশ। তিনটে টিউশনি সম্বল।

নিজের সাইকেলখানাকে নানকু গভীরভাবে ভালোবাসে। কবে থেকে সওয়ার হয়ে আছে তা ঠিকঠাক বলা সম্ভব নয়, তবে সাইকেল আর নানকু প্রায় অবিভাজ্য। পাড়ার লোক তাকে সাইকেলবাজ বলেই জানে।

প্রথম শুরু হয়েছিল আটচল্লিশ ঘণ্টা অবিরাম সাইকেল চালনা দিয়ে। খিদিরপুরের একটা ক্লাবের উদ্যোগে। এমএলএ, কাউন্সিলর এবং শেষ দিনে মেয়র অবধি এসেছিলেন। সেই অমানুষিক পরিশ্রমের পর বারো হাজার টাকার তোড়া পেয়েছিল সে। এ বাজারে এমন কিছু নয়। তবু সেটাই ছিল তার প্রথম পুরস্কার। এর

পর হাওড়ার শিবপুরে বাহাত্তর ঘণ্টা। তাতে উঠেছিল প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা। কিন্তু বাহাত্তর ঘণ্টার ওই অমানুষিক পরিশ্রমের পর নানকুর আর টাকা পাওয়ার আনন্দটা উপভোগ করার মতো অবস্থা ছিল না। এখন বছরে একবার-দু'বার ডাক আসে। আর কিছু করার নেই বলে নানকুকে যেতেই হয়।

নানকুর চাকরি নেই, রূপ বা গুণ নেই, প্রেমিকা নেই, আছে শুধু সাইকেল। তা সাইকেলই তাকে যা হোক কিছু তো দিয়েছে। আজও কলকাতার বিপজ্জনক রাস্তায় রাস্তায় সাইকেল চালিয়েই নানকুর দিন কেটে যায়। কোথাও পৌঁছয় না, কোথাও কারও অপেক্ষা নেই তার জন্য।

মানিক চক্রবর্তীর স্টেশনারি দোকানের সামনে একখানা টুল আছে। বলতে কি, ওই টুলখানাই তার সারাদিনের ঠিকানা। লোকে তাকে ওখানেই এসে খোঁজে এবং পায়।

বেলা দশটায় লোকটা এল। বুড়ো মানুষ। পরনে ঢলঢলে প্যান্ট আর প্যান্টে গোঁজা একখানা সাদা শার্ট, পায়ে কেডস। রোগাভোগা চেহারা। মুখে একটু ভিতু হাসি।

'আপনিই নানকুবাবু?'

'হ্যাঁ।'

'একটু দেখা করতে এলুম।'

নিয়মিত রোজগার না থাকলে স্বভাব খারাপ হয়ে যায়। টাকার জন্য মনটা ছোঁক-ছোঁক করে। হাতের চায়ের খালি ভাঁড়টা ফেলে দিয়ে নানকু বলল, 'অ। তা কী দরকার বলুন তো?'

'আপনার সাইকেলটা কোথায়?'

'কেন?' ওই তো দোকানের পাশের ঘুপচিতে ঢোকানো রয়েছে।'

'হাত দিয়ে একটু দেখতুম মশাই। যা খেল দেখালেন সেবার।'

নানকু জানে সে কোনওমতেই স্পোর্টসম্যানের মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য নয়, সে কোনও অর্থেই হিরো নয়, কোনও গ্ল্যামারও নেই তার। বড় জোর তাকে একজন শ্রমিক বলে ধরা যায়। যে-শ্রমিক ঘাম আর ক্লান্তি ছাড়া কিছুই উৎপাদন করে না।

বুড়ো মানুষটি ভারি গদগদ হয়ে গিয়ে সাইকেলটা একটু ছুঁয়ে এলেন। ফিরে এসে পকেট থেকে কিছু টাকা বের করে তার হাতে দিয়ে বললেন, 'এই দু'হাজার টাকা আগাম। একটা রসিদ কেটে দিন।'

'কোথায় হবে? কবে?

'সামনের শুক্কুরবার। আমাদের ফাউন্ডার্স ডে। সকাল সাতটায় শুরু। রিয়্যালিটি ক্লাবের মাঠ।'

'চিনি। তা কত দিচ্ছেন আপনারা?'

'বাহাত্তর ঘণ্টায় পঞ্চাশ হাজার।'

'ঠিক আছে।' বলে একটা কাঁচা রসিদ কেটে দিল নানকু।

বুড়ো লোকটা চলে যাওয়ার পরই মালিক বলল, 'পারবি? গত মাসেই তোর জন্ডিস হয়েছিল।'

'পেরে যাব। আর তো কিছু পারি না। সাইকেল আজ অবধি ট্রেচারি করেনি।'

'একদিন করবে। দেখিস।'

একটা মেয়ে এসে মানিককে বলল, 'দু'মিটার লাল রিবন দেবেন?'

মানিক বলল, 'কালই তো নিয়ে গেলি রিবন।'

'সে তো হলুদ রিবন।'

'এত রিবন দিয়ে কী করিস?'

'গলায় দেব তো, তাই।' বলে আড়চোখে একবার নানকুকে দেখে নিল মেয়েটা।

নানকু ওকে মুখ-চেনে। হরিবল্লভ বিশ্বাসের মেয়ে শিবানী। কেন এ সময়ে কিছু না-কিছু কিনতে আসে তাও নানকু জানে। ওটা ছুতো। নানকুর লেটার বক্সে একবার একটা বেনামা চিঠিও ফেলে এসেছিল। কাঁচা প্রেমপত্র। কিন্তু হায়, শিবানীর সেই সাধ্য নেই যে, নানকুকে আকর্ষণ করে। আর পাঁচটা মেয়ের মতোই

উঠতি বয়সের একটা লাবণ্য আছে হয়তো, তার বেশি কিছু নয়। নানকু ভালো করে তাকিয়েও দেখেনি কোনওদিন। যাকে ঘিরে তার এত অবিরাম পরিক্রমা, সে আকাশের চাঁদের মতো, মেরুশিখার মতো, রূপকথার মতোই অপ্রাপ্য বস্তু।

নিজেকে অনেক বুঝিয়েছে নানকু। পরস্ত্রী মাতৃবৎ। কাজ হয়নি। টের পেলে পারিজাত পাড়ার ছেলেদের ডেকে ঠ্যাঙাবে। উঁহু, তাতেও চিঁড়ে ভেজেনি। বউটা এর পর তোকে ঘেন্না করবে যে! করবে সে তো জানি। খুব খারাপ খারাপ কথা বলেও নিজেকে নিরস্ত করার চেষ্টা করেছে নানকু। ওরে ওই চম্পাকলিও তো রক্তমাংসের একটা ডেলা ছাড়া কিছু নয়। তারও বাহ্যি-পেচ্ছাপ আছে, দাদ-হাজা-চুলকানি আছে, বুড়ো বয়সের ঝুলে পড়া দেহযন্ত্র আছে। কিন্তু ভবি ভোলেনি। ভোলেও না। কোনও মুদগরই এই মোহের পক্ষে যথেষ্ট নয়।

তা বলে পাইপ বেয়ে দোতলায় কোনওদিন উঠবে না নানকু। উঠে লাভও নেই। সে তো ধর্ষণকারী নয়। প্রেমিক মাত্র। দৃষ্টিপ্রসাদের ভিক্ষুক। একবার তাকালেই ভিতরকার ফণা ধরা সাপ মাথা নুইয়ে ফেলে।

শিবানী তার দু'খানা মদিরতায় ভরা চোখ হেনে চলে গেল। বেচারা। আরও কত রিবন আর টিপের পাতা কিনতে হবে ওকে! পড়া নষ্ট হবে, ঘুম নষ্ট হবে, চোখের জল ফেলবে। কিন্তু নানকুর কী করার আছে?

একখানা লজঝরে দেশি সাইকেল আর প্রাণান্তকর আটচল্লিশ বা বাহাত্তর ঘণ্টার প্রাণক্ষয় করে সে একটি বা দুটি মাত্র হৃদয় জয় করেছে। তার বেশি কিছু নয়।

সে কোনওদিন দুনিয়ার সেরা সাইক্লিস্টদের সঙ্গে রেসিং সাইকেলে চেপে টক্কর দেবে না, এটা জেনে যাওয়ার পর সে একবার ঠিক করল, আর কিছু না হোক গোটা ভারতটা তো একটা চক্কর দিয়ে আসা যায়। হয়তো তাতেও কিছু নামডাক হতে পারে। কয়েকটা অভিযাত্রী ক্লাবের পরামর্শ নিয়ে একটা রোডম্যাপ তৈরি করে বছর তিনেক আগে এক শীতকালের শুরুতে বেরিয়েও পড়েছিল। ইয়ুথ হস্টেলের মেম্বারশিপ ছিল। ছিল সামনা কিছু টাকা।

কিছু একটা করার রোখ থেকেই সে বিহার প্রায় চষে ফেলেছিল। তারপর মধ্যপ্রদেশ। ছোটখাটো বিপন্নতা তাকে তেমন দমাতে পারেনি। ধানবাদে কিছু গুণ্ডা ছেলে তার টাকাপয়সা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল, টুরিস্ট বলে অনেক বোঝানোর পর কী ভেবে ছেড়ে দেয়। ডাকাতে ধরেছিল হাজারিবাগের কাছে। তেমন কিছুই নেই দেখে গাট্টা মেরেছিল শুধু। বিলাসপুরে ফুড পয়জনিং হয়ে দিন তিনেক পড়ে থাকতে হয়েছিল এক ধর্মশালায়।

বড় বিপদটা হল পাঁচমারি যেতে গিয়ে। নির্জন রাস্তার পথের হদিশ না পেয়ে আঘাটায় চলে গিয়েছিল সন্ধের মুখে। একটা ভাঙা ব্রিজের জন্য ডাইভারশন ছিল সামনে। দেখতে পায়নি ভালো করে। যখন দেখতে পেল, তখন ড্রাইভারশনের একেবারে মুখে। গতি কমাতে গিয়ে ব্রেক চাপতেই ঢালুতে উল্টে পড়ে গেল সাইকেল সমেত সে। কিছুক্ষণ জ্ঞান ছিল না। জ্ঞান হল এক মলিন, অতি দীনদরিদ্র এক হাসপাতালে। রুগির ভিড়ে ছয়লাপ। ডাক্তার নার্সদের দেখা নেই। তার বেডও জোটেনি, প্যাসেজে একটা ময়লা কম্বলের ওপর শোয়ানো অবস্থায় চোখ চেয়ে সে প্রমাদ গুনল। বাঁ কাঁধে প্রচণ্ড ব্যথা। নড়ার উপায় নেই। প্রায় ঘণ্টা দেড়েক ডাকাডাকির পর একজন চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী তাকে জানাল যে, তার কাঁধের হাড় সরে গেছে। কিন্তু হাড়ের ডাক্তার আসবে আরও দু'দিন পর।

সেই দুটো দিন কীভাবে কেটেছিল তা বলার নয়। জঘন্য আর জঘন্যতম পরিবেশ। তবে কিনা এসব তার আন্দাজেই ছিল।

অস্থিবিশারদ ডাক্তারটি বাঙালি। তাই বলে সে নানকুকে পেয়ে খুব আহ্লাদিত হলেন তা নয়। তবে হাড়টা সেট করে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিলেন যত্ন করেই। বললেন, একদম নড়াচড়া করবেন না। অন্তত দিন সাতেক।

নানকুর মাথায় বজ্রাঘাত। ওই হাসপাতালের চেয়ে তার কাছে তখন গাছতলাও ভালো।

বারণ সত্ত্বেও পরদিনই সে বেরিয়ে খোঁজখবর নিয়ে জানল তার সাইকেলটা থানায় জমা আছে। ব্যথার বড়ি খেয়ে সে হাসপাতাল থেকে পালিয়ে থানায় গিয়ে সাইকেলটা উদ্ধার করল। দোমড়ানো সাইকেলটার জন্য পুলিশ বিশেষ ঝামেলা করল না।

সাইকেলটা সারিয়েও নিল একটা দোকান থেকে। কিন্তু ব্যথা লাগা কাঁধে সাইকেলের ঝাঁকুনি সইবে না বলে সে ট্রেন ধরল। ভিড়ের ট্রেনে অনভিপ্রেত সাইকেল এবং ভাঙা কাঁধের ব্যথা নিয়ে সে দু'দিনও নরকবাস।

তার অ্যাডভেঞ্চারের ইতি সেখানেই। কারা যেন সাইকেলে বিশ্বভ্রমণ করেছিলেন। সেইসব মহাপুরুষকে সামনে পেলে প্রণাম করত নানকু।

চম্পাকলির একটা রুটিন আছে। সকালে ভেজা জামাকাপড় মেলতে ছাদে ওঠা, কিছুক্ষণ দূরের দিকে উদাস নয়নে চেয়ে থাকা। আধঘণ্টা বাদে বারান্দায় দাঁড়িয়ে চা খাওয়া। তার দিকে না তাকিয়েও বুঝিয়ে দেওয়া, পুরুষ, আমি জানি তুমি আমাকে উপভোগ করছ। করো। তোমার পুষ্পাঞ্জলি আমি গ্রহণ করছি।

চম্পাকলির একজন বিশেষ পুরুষ আছে। আবার নির্বিশেষরাও আছে। বিশেষ পুরুষটি তাকে পায় বটে, কিন্তু ধীরে ধীরে তৃষ্ণা কমতে থাকে। নির্বিশেষদের কাছে চম্পাকলি সহজে ফুরোয় না। তাদের তৃষ্ণা দীর্ঘস্থায়ী হয়। তৃষ্ণা দীর্ঘজীবী হোক।

শুক্রবার ভোরবেলা রিয়্যালিটি ক্লাবের মাঠে জনারণ্য। ব্যান্ড বাজছে, মাইকে ঘোষণা চলছে। এমএলএ, কাউন্সিলর আর পাড়ার বিশিষ্টজনেরা একটা ছোটখাটো সভা করলেন। অল্পসল্প বক্তৃতা। যুব সমাজের কাছে তেজস্বী ও বীর হয়ে ওঠার আবেদন। পাড়ার একদল মেয়ে গানও গাইল। গাঁদার মালা পরানো হল নানকুকে। নানকুর মাথায় টুপি, চোখে রোদচশমা, গায়ে টি-শার্ট, পরনে হাফপ্যান্ট আর পায়ে কেডস। এমএলএ সাহেব ফ্ল্যাগ অফ করলেন। নানকুর সঙ্গে পাড়ার আরও প্রায় সাত-আটজন সাইকেলে পরিক্রমা শুরু করল। বাকিরা অবশ্য এক-দেড় ঘণ্টা পরেই একে একে বসে যাবে। থাকবে শুধু নানকু আর তার সাইকেল। নানকু জানে, অবিরাম সাইকেল চালানোয় কোনও মজা নেই, লড়াই নেই, রেস নেই, ফার্স্ট-সেকেন্ড হওয়া নেই। বড় একঘেয়ে এই ঘুরে ঘুরে চক্কর কাটা। কোথাও পৌঁছনোর নেই, কোথাও যাওয়ার নেই। প্রথমটায় লোকেরা কিছুক্ষণ কৌতূহল নিয়ে দেখে, তারপর একে একে কেটে পড়তে থাকে।

দুপুরের মধ্যেই মাঠ ফাঁকা হয়ে গেল। দু-চারজন গা এলিয়ে ফোল্ডিং চেয়ারে বসে গল্পগাছা করছে। রাতে আরও ফাঁকা হবে। তা বলে নজরদারি থাকবে না, তা কিন্তু নয়। নজর রাখা হয় ঠিকই। কোনও নিয়মভঙ্গ হল কিনা, লোকটা ফাঁকি দিল কিনা ঠিকই ধরে ফেলা হয়। যে-ডায়াবেটিক বৃদ্ধটি রাতে বারবার ছোট বাইরে করতে ওঠেন তিনিও বাথরুমে আসা-যাওয়ার পথে জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখেন। হ্যাঁ, ওই তো ঘুরছে!

প্রথম দিনটা পার করা তেমন কঠিন নয়। অভ্যাসে হয়ে যায়। মাঝে মধ্যে নিয়মমাফিক বড় বাইরে, ছোট বাইরে কিংবা খাওয়ার একটু অবকাশ পাওয়া যায়, তখন লুটিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে।

আর কোনও খেলা শিখল না কেন নানকু? কেন এটাই তার বরাতে জুটল?

শনিবার সকালেও কিছু লোক দেখতে এল। নানকুর পছন্দমতো গান চলছিল মাইকে। কখনও তীক্ষ্ণ হিন্দি কখনও মোলায়েম বাংলা। সঙ্গে নানা ঘোষণা। পঞ্চাশ হাজার প্রাইজ মানি ছাড়াও কেউ কেউ হাজার বা দু-হাজার টাকা পুরস্কার দেবে ঘোষণাও হচ্ছিল। টাকা বাড়লে হাঁটুর জোরও একটু একটু বাড়ে।

ঘটনাটা ঘটল রাতের দিকে। পেটটা বিকেল থেকেই সামান্য চিনচিন করছিল। বেলা চারটে নাগাদ একটা ঠান্ডা পানীয় খাওয়ার পরেই ব্যথাটা বাড়ল। এবং বেশ বাড়তে লাগল। একের পর এক উদগার উঠছে। সঙ্গে একটা মৃদু বমির ভাব। মনের জোরে শরীরকে শাসন করে খানিকক্ষণ সাইকেলের স্পিড বাড়িয়ে দিল নানকু। যদি এই ব্যায়ামে পেটের বায়ু বেরিয়ে যায়। কিন্তু তাতে বিশেষ কাজ হল না। তার পা কাঁপছে, তাতে ধরা সাইকেলের হ্যান্ডেল এঁকেবেঁকে যাচ্ছে, চোখ ঝাপসা হচ্ছে বারবার। আর বুকে একটা কষ্ট।

আরও আধঘণ্টা দাঁতে দাঁত চেপে সাইকেল চালু রেখেছিল নানকু। প্রাইজ মানি তো কম নয়, ফসকে যাবে?

ফস্কাল। রাত বারোটা নাগাদ এক ঝলক বমি উলটে এল পেট থেকে। তারপরই আকাশ থেকে যেন নিঃশব্দে প্রকাণ্ড কালো বাদুর নেমে এল তার মাথায়।

সাইকেলটা ছিটকে গেল তলা থেকে। নানকু ডান কাত হয়ে পড়ল মাটিতে। সাইকেলের নিরালম্ব দু'খানা চাকা কিড়কিড় করে ঘুরে যেতে লাগল শুধু।

হইহই করে ছুটে এল লোকজন। ধরাধরি করে তোলা হল নানকুকে। জ্ঞান নেই। পাড়ার ডাক্তার এসে দেখেই গম্ভীর হয়ে বললেন, হসপিটালইজ করো।

সাইরেন বাজাতে বাজাতে অ্যাম্বুলেন্স যখন নানকুকে নিয়ে যাচ্ছে তখনও তার অসহায় সওয়ারিহীন সাইকেলখানা পড়ে ছিল মাঠে। নিষ্প্রাণ।

## তিন

শিবানী জানে, তার দিকে মন নেই নানকুদার। কিন্তু ওই লম্বা, ছিপছিপে, সাইকেলবাজ দাড়িওয়ালা পুরুষটির মধ্যে সে এক বন্য প্রেমিকের রূপ দেখতে পায়। এক কঠোর, জেদি, নাছোড় পুরুষ। যেসব ছেলেরা মেয়েদের মন ভোলানোর জন্য বোকামি করে বেড়ায়, ও তাদের দলে নয়। একদম অন্যরকম।

শিবানীর বুকের ভিতরে তার হৃদয় রক্তের স্রোতে ভেসে যায়, যতবার সে নানকুর কথা ভাবে। আর দিনের মধ্যে কতবার যে ভাবে, কখনও কখনও সারাদিন ধরে ভাবে। মায়ের ডাক কানে পৌঁছয় না, বইয়ের পড়া ঢুকতে চায় না মাথায়, কেমন যেন উদাসী বাতাসের মতো বিরহ বয়ে যায়।

শিবানী তেমন সুন্দরী নয়, আবার হেলাফেলা করার মতোও নয়। তার গানের গলার প্রশংসা আছে। তার হাসির গুণগান সে অনেকের কাছে শুনেছে। আর তার নাকি পুকুরের মতো গভীর চোখ।

এসব কেন যে নানকু দেখতে পায় না! কেন যে পায় না। ভারি রাগ হয় শিবানীর। একটু তাকাবে তো চারদিকে। আর কতবার রিবন কিনতে মানিকদার দোকানে যাবে শিবানী? আরও কত পাতা টিপ কিনতে হবে তাকে?

পাড়ার মাঠে সেই যে বাহাত্তর ঘণ্টা সাইকেল চালিয়েছিল নানকু, লোক বিশ্বাস করবে না, শিবানী ওই তিন দিন ঠায় জেগে ছিল। কখনও মাঠের ধারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থেকেছে, কখনও রাত জেগে জানালায় বসে থেকেছে, যেখান থেকে মাঠটা দেখা যায় না, কিন্তু আলো দেখা যায়। খুব বড় বড় সার্চ লাইটের মতো আলো জ্বলেছিল মাঠে।

যদি সে কোনওদিন নানকুর বউ হয়, কিছুতেই তাকে আর সাইকেল চালিয়ে অত কষ্ট করতে দেবে না। কী ভয়ঙ্কর কষ্টের খেলা ওটা! পা চলতে চায় না, চোখ ঢুলে আসে ঘুমে, শরীর ভেঙে পড়তে চায়, তবু কত কষ্টে সাইকেল কেবল চালিয়েই যেতে হয় লোকটাকে। কান্না পায় শিবানীর।

রাতে শুয়ে আজ বড্ড নানকুর কথা মনে পড়ছে তার। ভালোবাসায় ভরে উঠছে বুক। তার লতিয়ে উঠতে ইচ্ছে করে ওই পুরুষকে ঘিরে। নানকু বৃক্ষ হোক সে লতা।

অনেক রাতে হঠাৎ একটা হাহাকার দিগন্ত থেকে দিগন্তে ছুটে যাচ্ছিল, ওঁয়া ওঁয়া ওঁয়া। অ্যাম্বুলেন্সের আর্তনাদ। বুকটা ধক করে উঠল তার। এত রাতে কার কী সর্বনাশ হল কে জানে! হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে শিবানী বিড়বিড় করে বলল, লোকটিকে বাঁচিয়ে দাও ঠাকুর।

অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেন মধ্যরাতে আর একজনও শুনতে পেল। 'অ্যাম্বুলেন্স' শব্দটাই ভারি বিচ্ছিরি। মন খারাপ হয়ে যায়। আর ওই সাইরেন! কী ভয়ঙ্কর আর্তনাদ ওটা! কোন ব্যথা থেকে উঠে আসছে!

দু'হাত মুঠো করে দাঁতে দাঁত চেপে রইল চম্পাকলি। তারপর হঠাৎ ঢেউয়ের মতো তার বিশেষ পুরুষটির বুকের মধ্যে মাথাটা গুঁজে দিল।

সকালে আজ ছাদে ভেজা কাপড় মেলতে মেলতে চম্পাকলি লক্ষ করল, আজ সেই চলমান সাইকেলটার কোনও পরিক্রমা নেই। বারবার ঝুঁকে ঝুঁকে দেখল সে চারদিকটা। কোথাও নেই। আধঘণ্টা বাদে বারান্দায় দাঁড়িয়ে চা খেল আস্তে আস্তে।

না নেই। বুকটা একটু ফাঁকা লাগল চম্পাকলির। একে কি বিরহ বলে? হবেও বা।
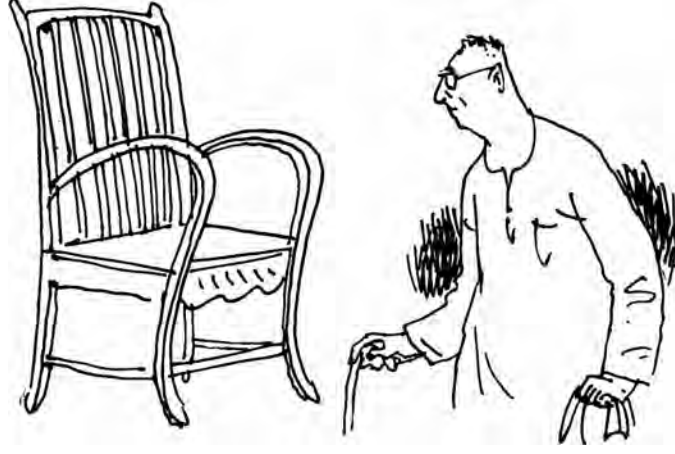
# নেপথ্যচারিণী

আশা করি আমি আপনাকে ডিস্টার্ব করছি না! বেঞ্চটার এই কোণ ঘেঁষে আমি একটু বসতে পারি কি?
স্বচ্ছন্দে। বেঞ্চটা তো আমার পৈত্রিক সম্পত্তি নয়। যে কেউ বসতে পারে, অনুমতি নেওয়ারও দরকার নেই।
ধন্যবাদ। আমি আসলে খুব ভীতু মানুষ। এত রাতে, এই শীতে, জলের ধারে একা আপনাকে বসে থাকতে দেখে মনে হল, ভূত-প্রেত কিনা তা একটু যাচাই করে নেওয়া ভালো!
কী বুঝলেন! ভূত-প্রেত নই তো!
না। এই তো দিব্যি কথা বললেন!
ভূতের কি কথা কওয়া বারণ নাকি?
তা অবশ্য জানি না। গল্পে পড়েছি, ভূতেরা কথাটথাও কয়। আচ্ছা মশাই, বাগযন্ত্র না থাকা সত্ত্বেও কি কথা কওয়া সম্ভব?
ভূত সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা নেই, কী করে বলি বলুন?
অভিজ্ঞতা আমারও নেই। কিন্তু ভূতের ভয় আছে খুব। যাক গে, আপনি ভূত নয় জেনে নিশ্চিন্ত হলাম। নইলে এত রাতে গা ছমছম করত।
ভয় যখন আছে, তখন রাত এগারোটায় এই নির্জন জায়গায় আসবার দরকারই বা কী?
আর বলবেন না মশাই, আমি থাকি সাউথ গড়িয়ায়। গেছেন কখনও?
না, ওদিকে আমার যাওয়া হয়নি কখনও। গড়িয়া জায়গাটা তো ভালোই শুনি।
এটা যে গড়িয়া নয়, আরও অনেক দূর। বর্ধিষ্ণু একটা গ্রাম। সেখানে তিন পুরুষের বাস। বিরাট জয়েন্ট ফ্যামিলি। বাড়িও পেল্লায়। কাজেকর্মে রোজই কলকাতায় আসতে হয়। ফিরতে প্রতিদিনই রাত হয়ে যায়। তবে গাড়ি থাকায় তেমন অসুবিধেয় পড়তে হয় না। তা আজ হঠাৎ গাড়িটা বিগড়ে গেছে। তাই বড্ড ফেঁসে গেছি। কাছেই একটা চেনা গ্যারেজ আছে। তাদের কাছে গাড়িটা সারাতে দিয়ে একটু ফাঁকায় এসে বসেছি। বলেছে ঘণ্টা খানেক লাগবে। তাই সময় কাটাতে এখানে আসা। সারাটা দিন তো আর ফাঁক পাই না। কাজ আর কাজ। তাই ভাবলাম, আজ রাত্রে কিছুক্ষণ একা বসে কাটাই।
একাই যখন কাটাতে চান তখন আরও তো ফাঁকা বেঞ্চ ছিল! সব বেঞ্চই তো ফাঁকা।

আরে মশাই, অতটা ফাঁকা কি ভালো? একেবারে কেউই না থাকলে যে বড্ড গা ছমছম করে। আমি আপনাকে ডিস্টার্ব করছি কি?

আরে না। ডিস্টার্ব করার কী আছে? আমার রাতে ঘুম হয় না। কনফার্মড ইনসোমনিয়ার রুগি। সন্ধে থেকে রাত বারোটা অবধি বাড়িতে গাঁক গাঁক করে টিভি চলে। আমার পুরো পরিবার সন্ধে থেকে একটার পর একটা বাংলা আর হিন্দি সিরিয়াল দেখে যায়। রাত বারোটা-একটা অবধি এই অত্যাচার। আমার আবার ও সব একেবারে সহ্য হয় না। রাত আটটা ন'টায় রাতের খাবার খেয়ে নিয়ে এসে ফাঁকায় বসে থাকি। কাছেই আমার আস্তানা, সাড়ে এগারোটায় বাড়ি ফিরে শুয়ে পড়ি।

ইনসোমনিয়া পাজি রোগ।

সে আর বলবেন না। ঝিমুনি আসে মাঝে মাঝে, কিন্তু সামান্য একটু শব্দ হলেই চটকা ভেঙে যায়। বাইরে কুকুর বেড়াল ডাকল, কি জোরে বাতাস দিল, কি কেউ জানলা বন্ধ করল, অমনি চটকা ভাঙে।

তা ওষুধ খেলেই তো পারেন।

ও বাবা, ওষুধ আমি জন্মে খাই না।

কেন বলুন তো!

কী জানি, ওষুধ খেতে আমার বড্ড ভয়। বিশেষ করে অ্যালোপ্যাথি। বাড়ির লোক, ডাক্তার, বন্ধুবান্ধব কম তাড়না করেনি। কিন্তু অসুখের চেয়ে আমার ওষুধকেই ভয় বেশি।

ওষুধ না খাওয়া কি ভালো? তেমন শক্ত অসুখ হলে তো মুস্কিলে পড়বেন।

হয়নি নাকি? বছরটাক আগে জন্ডিস, মাস ছয়েক আগে ম্যালেরিয়া।

ম্যালেরিয়া! ম্যালেরিয়ায় ওষুধ খাননি?

হোমিওপ্যাথি করিয়েছি।

তাতে কি ম্যালেরিয়া সারে?

দিন পনেরো ভুগে তো খাড়া হয়ে গেলাম মশাই।

আপনার কপাল ভালো। আমারও বছর খানেক আগে ম্যালেরিয়া হয়েছিল। ডাক্তাররা এমন সব ওষুধ দিয়েছিল যে, শরীর বড্ড দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

তবেই বুঝুন। আমাদের ছেলেবেলায় ম্যালেরিয়া খুব হত। তখন এত মারাত্মক সব ওষুধ বেরোয়নি। সাদামাটা কুইনাইন, মেপাক্রিন এইসব ওষুধ ছিল। তাতেই রুগি ভালো হয়ে যেত।

বোধহয় ঠিকই বলেছেন। তবে আপনি সাহসী লোক।

ঠিক উল্টো। আমি ওষুধকে ভয় পাই। তা আপনি তো বেশ সম্পন্ন মানুষ। গাড়িটাড়ি আছে। কী করা হয়?

ব্যবসা।

কীসের ব্যবসা মশাই?

রং আর বিল্ডিং মেটেরিয়ালসের। বিবেকানন্দ রোডের কাছে আমাদের মেইন দোকান। তাছাড়া টালিগঞ্জ আর বেহালাতেও দুটো আড়ৎ আছে। ব্যবসাটা পৈত্রিক, তবে আমি কো-অর্ডিনেট করি।

ভাইবোন ক'জন?

আমি আর দিদি। দিদির সবে বিয়ে হয়ে গেল। আমেরিকার পাত্র।

সাহেব নাকি।

না না। নিকষ্যি বাঙালি, হিন্দু, পাল্টি ঘর।

আপনার হয়নি এখনও?

না। বিয়েফিয়ের ইচ্ছে নেই। বেশ আছি।

তা কলকাতায় যখন কারবার, তখন এখানে একটা থাকবার ঠেক করে নিলেই তো হয়। রোজ তেল পুড়িয়ে এত দূরে ফেরার দরকারটাই বা কী?

ঠিক আছে। কাঁকুড়গাছির বাড়িতেই বাবা থাকেন। তবে মা কলকাতায় থাকতে চান না। দেশের বাড়ি বলে কথা। মা আবার আমাকে ছাড়া থাকতেই পারে না। তাই ফিরে যেতেই হয়।

বাবা এখানে একাই থাকেন?

না, ঠিক একা নয়। কর্মচারী, কাজের লোক সব আছে। আমার এক পিসতুতো দাদা আমাদের কারবারে চাকরি করেন। তিনি আর বউদি থাকেন। বাবা সপ্তাহের শেষে দেশে যান। তবে আমাকে রোজই ফিরতে হয়।

আপনি খুব মাতৃভক্ত তাই না।

তা বলে মায়ের সঙ্গে যে আমার লাগে না তা নয়। মা বড্ড আগলে রাখতে চায় তো, আর তাই নিয়েই খিটিমিটি বাঁধে। আমি যে বড় হয়েছি তা মায়ের খেয়ালই থাকে না।

মায়েরা সবে এক জাত, বুঝলেন? আমার মা এখনও বেঁচে আছেন। পঁচাশির কাছাকাছি বয়স। শক্ত সমর্থ আছেন। আর এখনও সবসময়ে কেবল খোকা আর খোকা। খোকা আমার ডাক নাম।

আপনিও বুঝি খুব মাতৃভক্ত?

তা বলতে পারলে খুশিই হতাম। কিন্তু মায়ের জন্য কী আর করতে পারলাম বলুন। তিন ছেলের মা তো, এ নিয়েই ঠেলাঠেলি। ছেলেরা হয়তো মাকে রাখতেই চায়। কিন্তু বউরা চায় না। বছর দুই আগে তো আমরা ভাইরা মিলে ঠিক করে ফেললাম, সাংসারিক অশান্তির চেয়ে মাকে বরং ভালো একটা বৃদ্ধাশ্রমেই চাঁদা করে রাখা যাক।

ইস!

আমাকে ঘেন্না হচ্ছে বুঝি? তা হওয়ারই কথা। সিদ্ধান্ত নিয়ে আমারও বড় আত্মগ্লানি হয়েছিল। ঠিক সেই সময়ে আমার ছোট মেয়ে বকুল রুখে দাঁড়াল। সে তার ঠাম্মার বড় ভক্ত। বলল, তোমরা যদি ঠাম্মাকে বৃদ্ধাশ্রমে দাও তাহলে আমিও ঠাম্মার সঙ্গে চলে যাব। সেটা শুধু কথার কথা নয়। ওর মা তো ওকে বকে থামল না, চড়াচাপড়ও দিয়েছিল। কিন্তু মেয়ের ধনুকভাঙা পণ। বলল, ঠাম্মার জন্য তোমাদের কিছু করতে হবে না, আমিই সব করব। তোমরা শুধু ঠাম্মার জন্য টাকা দিও।

খুব স্পিরিটেড মেয়ে তো।

হ্যাঁ। স্পিরিটেড শুধু নয়। অমন মায়াদয়া আজকাল দেখা যায় না। রাস্তার কুকুরগুলোকে অবধি কী ভালোই না বাসে। ও রাস্তায় বেরোলে দেখবেন রাজ্যের কুকুর ওর পিছু পিছু গিয়ে বড় রাস্তা অবধি এগিয়ে দিয়ে আসে। কিন্তু এসব গুণ কেউ ভালো চোখে দেখে না তো। তাই বড্ড বকুনি খায়। তবে যাই হোক, ওর জেদেই শেষ অবধি মা আমার কাছেই রয়ে গেছে। চিলেকোঠায় একটেরে থাকে। বকুল তার ঠাম্মার কাছেই থাকে। প্রথম প্রথম বাড়িতে এই নিয়ে খুব অশান্তি হয়েছিল। আমার বউ আবার রাগী মানুষ। কিন্তু এখন সবাই মেনে নিয়েছে।

মাকে বৃদ্ধাশ্রমে দেওয়ার কথা আমি তো ভাবতেই পারি না।

ভাবা উচিতও নয়। আমিই কি কখনও ভেবেছিলাম? তবে কিনা জীবনটা এক বিচিত্র প্রবাহ, ক্ষণে ক্ষণে পরিস্থিতি পাল্টায়, রং পাল্টায়, কত সাধু চোর, কত চোর সাধু হয়ে যায়। আমিই যে এরকম হব তাই কি কখনও ভেবেছি?

কেন, আপনার কি অন্য রকম হওয়ার সাধ ছিল?

ছিল না! কিশোর বেলায় ছিলাম বিবেকানন্দের শিষ্য, ব্রহ্মচর্য পালন করতাম। যৌবনে মোহনবাগানে ফুটবল খেলতাম।

মোহনবাগানে?

আলবাৎ।

আপনার নামটি কি বলুন তো।

দিব্যেশ ঘোষ। ফিফটিতে এরিয়ান থেকে মোহনবাগানে আসি।

দিব্যেশ ঘোষ? আরে, আপনার নামটা চেনা চেনা লাগছে।

না মশাই, আমি বিখ্যাত হতে পারিনি। দু' সিজন খেলেই চোট পেয়ে বসে যাই।

আমার বাবা অমল মিত্র খেলতেন এরিয়ানে।

অমল। বাপু হে, তুমি কি অমলের ছেলে?

আজ্ঞে হ্যাঁ। বাবার মুখে এক আধবার আপনার নাম শুনেছি।

কী আশ্চর্য যোগাযোগ! এই রাত বিরেতে লেকের ধারে অমলের ছেলের সঙ্গে দেখা! কী আশ্চর্য! অমল খুব বন্ধু ছিল আমার। তার পর অবশ্য আমি চাকরি নিয়ে নাগপুরে চলে যাই। যোগাযোগ ছিঁড়ে গেল।

আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে ভারি ভালো লাগল। বাবাকে বলবখন আপনার কথা।

বলবে মানে। শুধু বললেই হবে নাকি? সম্পর্কটা ফের ঝালিয়ে নিতে হবে না? ফোন নম্বর টম্বর দাও তো। এ যুগের ছেলেদের বিশ্বাস নেই, নানা কাজে শেষে ভুলেই যাবে।

এই যে আমার কার্ডটা রেখে দিন। ওতে সব নম্বর ছাপা আছে। তবে আপনার কথা আমি ভুলব না।

ওঃ, কী সব দিনই গেছে হে, জান দিয়ে ফুটবল খেলতাম। কিন্তু বুঝলে, মাঝে মাঝে ভাবি, এত তো খেলতাম, কিন্তু জীবনের খেলার স্পোর্টসম্যান স্পিরিট তো দেখাতে পারলাম না! যেন সব দিক দিয়েই হেরে বসে আছি।

অভাবের কষ্ট নাকি?

আরে না। টাকাপয়সা রোজগার কিছু কম করিনি। সাউথ এন্ড পার্কে বাড়িও করেছি। সে সব নয়। আসলে কী জানো, সংসারে কখনও উঁচু গলায় হক-কথা বা উচিত-কথা কইতেই পারলাম না। ওই যে মায়ের কথা বলছিলাম, জানি বৃদ্ধাশ্রমে দেওয়া উচিত হবে না, মনও দিচ্ছে না, তবু বলতে পারলাম কই? বকুল রুখে না দাঁড়ালে কত বড় একটা অন্যায় হয়ে যেত বলো দেখি!

ঠিকই তো!

ওইটেই তো স্পোর্টম্যান স্পিরিটের অভাব। বিবেকানন্দের চেলা হয়ে শেষে ইনসোমনিয়ার রুগি হয়ে বসে আছি। সংসারে কারও চোখে চোখ রেখে কথা কইবার সাহস নেই। কী হলাম বলো তো?

আহা, ওসব তো মাইনর ব্যাপর। সংসারে তো অ্যাডজাস্ট করতেই হয়। আমার বাবাও খুব আর্ত বৎসল। বহু গরিব গুর্বোদের সাহায্য করেন। বিস্তর দ্যানধ্যান। আর আমার বাবা আর আমি দুজনেই খুব অ্যানিম্যাল লাভার। কুকুর গরু তো আছেই, সাউথ গড়িয়ায় আমাদের বাড়িতে শতখানেক পায়রাও পোষা হয়। অ্যানিম্যাল লাভার বলে আমি আবার ভেজিটেরিয়ানও। বাবাও তাই।

বলো কী?

অবাক হচ্ছেন কেন?

এত মিল! আমার বকুলও তো তাই। মাছ মাংস ছোঁয় না। অ্যানিম্যাল লাভার বলেও, আর ঠাম্মার জন্যেও। বাঃ, তোমার কথা জেনে বড্ড ভালো লাগছে বাবা। কাছেই তো আমার বাড়ি, চলো, এক কাপ কফি খেয়ে যাবে।

না কাকাবাবু, এত রাতে বাড়ির লোকের ওপর অত্যাচার করা হবে। তবে আপনার বাড়িতে বোধ হয় আমাকে এর পর আসতেই হবে।

আমারও তাই মনে হচ্ছে। তা ইয়ে, তোমাকে আশ্বাস জানিয়ে রাখি, আমার মেয়েটা দেখতেও বেজায় সুন্দরী। বাপ বলে বলছি না, সাজলে একেবারে লক্ষ্মী প্রতিমা, তবে সাজগোজ করেই না। সাদামাঠা ভাবে থাকে।

আজ যে উঠতে হবে কাকাবাবু!

চলো, তোমাকে একটু এগিয়ে দিই।

# ভূতের বাড়ি

আচ্ছা, এ-বাড়িতে ঢুকতেই আমার গাটা ছমছম করে উঠল কেন বলুন তো!

এ-বাড়িতে কি ভূতটুত আছে? না মশাই, না। সেরকম কিছু নয়। শুধু আমার মেজোদাদু। তা তিনি ওই উত্তরের ঘরখানায় থাকেন। ব্যাচেলর মানুষ ছিলেন। কারও সাতে পাঁচে থাকতেন না। ভূত হলেও খুব নির্বিরোধী মানুষ।

তবে কি উত্তরের ঘরখানা ব্যবহার করা চলবে না?

আহা, তা কেন? খুব চলবে। উনি যে আছেন তা আপনি টেরই পাবেন না। খুব বেশি হলে হয়তো একটু কাশির আওয়াজ, একটু হাই তোলার শব্দ, খড়মের খটাং খটাং কিংবা ধরুন স্তবপাঠ শোনা যায়। ওসব গায়ে না মাখলেই হল।

দেখাটেখা দেন নাকি?

আরে না। ওই মাঝেমধ্যে হয়তো ফস করে একটু ঘনীভূত হয়ে পড়লেন আর কী। তখন একটু আবছামতো দেখা গেলেও যেতে পারে।

না মশাই, তা হলে এ-বাড়ি কিনে আমার কাজ নেই।

আহা হা, ঘাবড়াচ্ছেন কেন? মেজোদাদু লোক অত্যন্ত ভালো। নিজের ঘরের বাইরে কদাচিৎ যান। চিরটা কাল ধর্মকর্ম নিয়ে থেকেছেন। অতি সজ্জন। আর আপনি তো একাই থাকবেন, মাঝে মাঝে একঘেয়ে লাগলে একজন সঙ্গীও তো পাচ্ছেন। সেটা কি কম কথা হল?

আমার যে বড্ড ভূতের ভয়।

ভূত বলে ভাববার দরকারটাই বা কী বলুন তো! ধরে নিন না, উনি আপনার বাড়িতে ভাড়াটে হিসেবে আছেন। তাহলেই তো ল্যাঠা চুকে গেল। আমি না হয় আর হাজার পাঁচেক টাকা কম দামই নেব। দু'লাখের জায়গায় আপনি ওই এক লাখ পঁচান্নব্বই দেবেন।

পয়সা খরচ করে কেউ ভূতের বাড়ি কেনে? আপনি বরং আপনার মেজোদাদুকে অন্যত্র যেতে বলুন।

সেটা কি খুবই খারাপ দেখাবে না?

কেন বলুন তো, খারাপ দেখাবে কেন?

বাড়িটা যে ওঁরই। ওঁর তো কেউ ছিল না, তাই আমার ওপর বাড়িটা বর্তায়। তা ওঁর নিজের বাড়ি থেকে ওঁকে উচ্ছেদ করা কি ঠিক? আর আমি বললেই বা উনি শুনবেন কেন? তা ছাড়া আরও একটু কথা আছে।

কী কথা?

মেজোদাদু খুব কিপটে মানুষ ছিলেন। টিপে টিপে টাকা জমাতেন। সেই জমানো টাকা এ-বাড়িরই কোথাও লুকোনো আছে। আমি অবশ্য বিস্তর খুঁজেও গুপ্তধন উদ্ধার করতে পারিনি। কিন্তু বরাত থাকলে আপনিই হয়তো পেয়ে গেলেন।

বটে!

তবে আর বলছি কী?

মেজোদাদুর ভূত ছাড়া আর ভূত নেই তো!

না মশাই, না। থাকলে দেখবেন, বাড়ি খুব পয়া।

তবে বাড়িটা এতদিন বিক্রি হয়নি কেন?

ওটাই তো লোকের দোষ। খদ্দের এলেই পাড়ার লোক কানমন্তর দেয় যে! বলে কিনা ভূতের বাড়ি। আসল কথা ওই বগলা স্পোর্টিং ক্লাবের মতলব হল বাড়িটা হাতিয়ে ক্লাবঘর করবে। তা দখল করার চেষ্টাও করেছিল। নিশুত রাতে বড়বাবার লাঠি খেয়ে পালায় বাপ বাপ বলে।

বড়বাবা! তিনি আবার কে?

সে আর আপনার জেনে কাজ নেই। ছোঁড়াগুলোর মতলব খারাপ না হলে বড়বাবা মোটেই দেখা দিতেন না। গত দেড়শো বছরে কেউ তাঁকে দেখেছে বলতে পারবে?

তিনিও কি ভূত?

আরে না মশাই, ভূত হতে যাবেন কোন দুঃখে? তিনি আমার দাদুর বাবা। দেড়শো বছর আগেই মৌত হয়েছেন। মেলা তীর্থভ্রমণ, দানধ্যান, নিত্য চণ্ডীপাঠ এইসব করে স্বর্গের রাস্তা খুলেই রেখেছিলেন। শেষ নিঃশ্বাস ছেড়েই সোজা বৈকুণ্ঠলোকে চলে গেছেন। তবে অধর্মের কল নড়ায় নেমে এসেছিলেন আর কী! তা বলে আপনার কোনও ভয় নাই।

এ যে ডবল ভূত! না পটলবাবু, এ-বাড়ি কিনে আমি নিজেকে বিপদে ফেলতে চাই না। লেঠেল ভূত অতিশয় বিপজ্জনক।

ভয় পাবেন না, লোকেনবাবু। বড়বাবা আর ভূত নেই। পাকা খবর আছে, তিনি নিজের গুণে স্বর্গে তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর মধ্যে ঢুকে পড়েছেন। তাঁকে প্রমোশন দিয়ে দেবত্বে তুলে দেওয়া হয়েছে। তাই এখন হিন্দুদের দেবদেবীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে তেত্রিশ কোটি এক।

সে যাই হোক পটলবাবু, বাড়ি কিনলে সেটা বেশ রিস্ক হয়ে যাবে।

আচ্ছা, আচ্ছা, আমি না হয় আরও পাঁচ ছেড়ে দিচ্ছি। ওই এক লাখ নব্বই হাজারই দেবেন। আমার খানিকটা লোকশান হবে, তা হোক। তবু বাড়িখানা একজন সজ্জনের হাতে যাচ্ছে এটাও একটা সান্ত্বনা।

ঠিক আছে পটলবাবু, কিন্তু বুকে হাত দিয়ে বলুন তো এ-দুজন ছাড়া আর কেউ নেই তো!

পাগল! আর কে থাকবে! পুঁটির কথা ধরবেন না, সে নিতান্তই পুঁচকে মেয়ে। তাকে ভূত বললে ভূতের অপমান হয়। কোনও বায়নাক্কাই নেই তার। ওই শিউলি ঝোপটার পাশে রাতবিরেতে একটু এক্কাদোক্কা খেলে আর কী।

পুঁটি! সে আবার কে?

পুঁটি বলাটা আমার উচিত হয়নি। শত হলেও গুরুজন। সম্পর্কে আমার ছোটঠাকুমা, দাদুদেরই ছোটবোন। দশ বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের এক বছর যেতে না যেতেই কলেরায়...তা সে যাক গে, পুঁটিঠাকুমা

হিসেবের মধ্যেই আসে না।
ওরে বাবা! দাদু, বড়বাবা, পুঁটি এ তো ত্র্যহস্পর্শ!
কী যে বলেন! আচ্ছা না হয় পুঁটির বাবদে আমি আরও আড়াই হাজার ছেড়ে দিচ্ছি। একেবারে জলের দরই হয়ে গেল। তা হোক, আপনি ওই এক লাখ সাড়ে সাতশি হাজার ফেলে বাড়িতে এসে বসুন তো দেখি।
বড্ড ভাবনায় ফেলে দিলেন মশাই। সস্তা বলে বাড়িটা কিনে ফেলব আর তিনজন ভূত এসে আমার ঘাড় মটকাবে, এটা তো কাজের কথা নয়। কে জানে আরও দু-চারজন বেরোবে কি না। তা হ্যাঁ পটলবাবু, এই তিনজনেই শেষ তো! না আরও কেউ আছে! মা কালীর দিব্যি, বলুন তো আরও কেউ আছে কি না।
কী বলেন লোকেনবাবু, আপনি একজন ব্রাইট ইয়ংম্যান, আপনি ভূতের ভয় পেলে আমরা যাবো কোথায়? সায়েন্স তো ভূত টূত মানছে না। আপনারই বা মানবার কী দরকার? ভূত আছে থাক, আপনি কোন দুঃখে তাদের মানতে যাবেন?
কথা ঘোরাবেন না পটলবাবু, আরও কেউ আছে কী না বলুন। মা কালীর দিব্যি দিয়েছি কিন্তু!
হাঃ হাঃ হাঃ, খুব হাসালেন মশাই। তুচ্ছ ত্রিপর্বে শান্তিপ্রিয়, নিরীহ ভূতকে এত ভয় আপনার। লোকে যে শুনলে আপনাকে কাপুরুষ বলবে! আর বলি, যদি সাহস করে এই তিনজনকে আমল না দিয়ে থাকতে পারেন তা হলে আর ভয়টা কীসের? আর ভয়ই যদি না পাবেন তা হলে রাঙাকাকিমাকে আপনার মা-মাসির মতোই মনে হবে। ভারি স্নেহশীলা, ভারি নরম মনের মানুষ ছিলেন তো, তাই। দেখতেও লক্ষ্মী প্রতিমা।
তিনিও আছেন নাকি?
না-থাকার মতোই। দেখা সাক্ষাৎ বিশেষ দেন না। তবে ধরুন, আপনার ভাত উথলে উঠে গ্যাস নিবে যাওয়ার যোগাড় হয়েছে, কিংবা রাতে হঠাৎ পেটে ব্যথা হল, কিংবা বর্ষার রাতে ঘরে সাপ কি জোঁক ঢুকল তখন দেখবেন রাঙাকাকিমা ঠিক আলুথালু হয়ে ছুটে এসে আপনাকে সজাগ করে দেবেন। তাঁর গলায় রামপ্রসাদী গানটাও খুলত ভালো। তা সেই গান হয়তো কখনও সখনও শোনা যায়, তার বেশি কিছু নয়।
আচ্ছা পটলবাবু, নমস্কার। আমি আসি।
আহা, রাগ করেন কেন লোকেনবাবু, ঠিক আছে, আপনি বরং এক লাখ পঁচাশিই দেবেন। রাঙাকাকিমার জন্য না হয় আরও আড়াই হাজার ছেড়ে দিচ্ছি। লোকসানই গেল আমার। তা যাক। আপনার কিন্তু হরেদরে অনেক লাভ হয়ে যাচ্ছে, এখনই হয়তো বুঝতে পারছেন না, কিন্তু ক্রমে ক্রমে টের পাবেন। তখন এই পটল চাটুজ্জেকে আপনি ধন্যি ধন্যি করবেন। ব্যাচেলর মানুষ আপনি, একা থাকবেন, কিন্তু একা বলে বোধই করবেন না কখনও।
আপনি যেটাকে সুবিধে ভাবছেন, সেটাই তো আমার অসুবিধে। ভূতের সঙ্গ করার কোনও ইচ্ছাই হচ্ছে না আমার। আপনার রাঙাকাকিমা কতদিন গত হয়েছেন!
এই তো বছর পনেরো হবে।
ও বাবা! তা হলে তো টাটকা ভূতের খুব তেজ।
আরে না লোকেনবাবু, না। রাঙাকাকিমা মোটেই রাগী মানুষ ছিলেন না। খুব লক্ষ্মীমন্ত ছিলেন। ভূতপ্রেত হওয়ার কথাই নয় তাঁর। তবে কি না দুটো কচি মেয়েকে রেখে গত হয়েছেন তো, তাই তাঁদের মায়ায় দিন কয়েক আটকে আছেন। তা ছোট মেয়েটির তো এই ষোলো পুরল। দেখলেন না, মেয়েটির মুখচোখ কেমন মায়ের মতোই লক্ষ্মীশ্রী!
আমি কোনও মেয়েকে দেখিনি তো!
দেখেছেন বইকি! একটু আগে আমাদের বাড়িতে যে মেয়েটি আপনাকে চা দিয়ে গেল। সে-ই তো আমার খুড়তুতো বোন রাধিকা।
তা হবে। আমি লক্ষ্য করিনি।

হ্যাঁ, আপনি তো আবার লাজুক মানুষ।

কিন্তু পটলবাবু, এ-বাড়িতে কি তা হলে মোট চারটে ভূত?

ছুটকো ছাটকা আরও দু-চারটে থাকতে পারে। তাদের আপনি ঘরের টিকটিকি বা আরশোলার অধিক মূল্য দেবেন না। সত্যি কথা বলতে কী মশাই, আমি ধর্তব্যের মধ্যেই আনি না তাদের। দরকার হলে ওদের দিয়ে আপনি ঘর ঝাড়ু দেওয়াতে পারেন, বাসন মাজাতে পারেন, গা হাত পা দাবিয়ে নিতে পারেন, মাথা টেপাতে পারেন, নর্দমা সাফ করাতে পারেন।

ওরা আসলে কারা?

কিছু না মশাই, কেউ না। আজেবাজে সব লোক। কেউ হয়তো এ-বাড়িতে ঝি বা চাকর ছিল, কেউবা ছিল বাজার সরকার। কেউবা রাঁধুনি। না না, ওদের কথা ভেবে আপনি মন ভারাক্রান্ত করবেন না, প্লিজ!

আমাকে ছেড়ে দিন পটলবাবু। আমি বড় ভীতু মানুষ।

আহা ভীতু মানুষ তো আমিও। ভীতু আমারা কে নয় বলুন। ভয় ভীতি নিয়েই বেঁচে থাকতে হবে আমাদের।

ও-ওটা কে কথা কয়ে উঠল পটলবাবু?

কই, কেউ তো নেই এখানে!

ওই যে শুনলেন না, একজন মহিলা বললেন, কেন রে মুখপোড়া, তোকে আমরা কামড়েছি না খিমচে দিয়েছি যে ভয় পাচ্ছিস!

না লোকেনবাবু, আমি তো কিছু শুনতে পাইনি! ও আপনার মনের ভুল।

ওই, ওই আবার কে যেন কাশতে কাশতে কী যেন বলছে, শুনছেন! রাশভারী গলা! শুনছেন না?

না হে!

ওই যে বলছে, ছোকরা বয়সেই যদি এত ভয় তা হলে বুড়ো বয়সে তোর কী গতি হবে ভেবেছিস? বাঙালি ছোঁড়াগুলো ভয় খেয়ে খেয়েই সমাজটাকে রসাতলে দিল!

আজ্ঞে, আমি তো কিছুই শুনতে পাচ্ছি না লোকেনবাবু!

কিন্তু আমি শুনতে পাচ্ছি যে!

আসলে লাগোয়া বাড়িটাই তো আমার। সেখানকার কথাবার্তাই বোধহয় শোনা যাচ্ছে।

তা হলে সেটা তো আপনিও শুনতে পেতেন।

শুনে শুনে আমার কান তো হদ্দ হয়ে গেছে, তাই বোধহয় খেয়াল করিনি।

না পটলবাবু, আমার মনে হচ্ছে, কথাগুলো আপনারও কানে গেছে, কিন্তু আপনি স্বীকার করতে চাইছেন না।

তা ইয়ে, লোকেনবাবু, হয়েছে কী, এই ভরসন্ধেবেলায় ওঁরা একটু নড়েচড়ে বসেন আর কি। ঘাবড়ানোর কিছু নেই। প্রথম গলাটা আমার সেই ছোট ঠাকুমার। আর দ্বিতীয় গলাটা মেজোদাদুর।

এখনও বাড়িটা কেনা হয়নি, সবে দেখতে এসেছি, তবু যখন ভূতপ্রেতের গলা শোনা যাচ্ছে তখন বাড়িটা কী সাঙ্ঘাতিক বিপজ্জনক তা নিশ্চয়ই আপনিও বুঝতে পারছেন পটলবাবু। অমন কাঁচুমাচু হবেন না মশাই, সত্যি কথাটা স্বীকার করুন।

আসলে কী জানেন, এ যাবৎ অনেকেই তো বাড়ি দেখতে এসেছে, কখনও কিন্তু এরকম ঘটনা ঘটেনি। আজই যে কেন ঘটছে বুঝতে পারছি না।

আপনাকে স্পষ্টই বলে দিচ্ছি, আপনার বাড়ির ভূতেরা অত্যন্ত নির্লজ্জ এবং বেহায়া। ওরে বাপরে...!

কী হল লোকেনবাবু, চেঁচিয়ে উঠলেন যে।

চেঁচাব না। শুনলেন না, কে যেন লাঠি ঠুকে সিংহগর্জনে বলছে, কার এমন বুকের পাটা যে আমাদের নির্লজ্জ আর বেহায়া বলিস! সহবত জানিস না! ঘাড় ধরে এমন রামরদ্দা দেব যে...

আহাহা, আমার হাতটা ছাড়ুন লোকেনবাবু। আপনার ব্যায়াম করা শক্তিশালী হাতের চাপে আমার রোগা হাতখানা যে ভেঙে যাবে! আমি দুবলা পাতলা মানুষ।

ওটা কার গলা পটলবাবু?

বড়বাবুর গলা। খুব তেজী পুরুষ তো, আপনার কথাটা খুব আঁতে লেগেছে। তবে ওসব হল ফাঁকা আওয়াজ। রামরদ্দা দেওয়ার মানুষ উনি নন। বাড়িটা কিনে যখন থাকতে লাগবেন তখনই বুঝবেন বড়বাবার হুংকারই সার। ওই যে আপনার চিঁড়েভাজা এসে গেছে।

চিঁড়েভাজা! চিঁড়েভাজা খেতে চাইনি তো!

আহা, অত লজ্জা পাওয়ার কী আছে লোকেনবাবু। এ-বাড়ি কিনলে তো আপনি আমাদের ঘরের লোকই হয়ে যাচ্ছেন! ব্যাচেলর মানুষ আপনি, তা ধরুন, সকালের চা জলখাবারটা আমাদের বাড়ি থেকেই আসবে। না, না আপত্তি করবেন না লোকেনবাবু, ওটুকু করা তো আমাদের কর্তব্যই। পাড়াপ্রতিবেশীর জন্য আমরা সর্বদাই কিছু না কিছু করে থাকি। ও রাধিকা, যা দিদি, চট করে কফিটা নিয়ে আয়।

ইয়ে, মানে, এ-ই বুঝি রাঙাকাকিমার মেয়ে!

হ্যাঁ, লোকেনবাবু। বড় দুঃখী মেয়ে। এক বছর বয়সে মাতৃহারা। তবে আমাদের বাড়িতে আমরা ওকে কখনও মায়ের অভাব বুঝতেই দিইনি। আমার মা তো বুকে আগলে রাখে। মেয়েও বড় লক্ষ্মী। যেমন রূপ, তেমন গুণ।

চিঁড়েভাজাটা বড্ড ভালো হয়েছে তো!

আজ্ঞে, হতেই হবে। রাধু যাতে হাত দেয় তাতেই সোনা ফলে। ছোট্টটি থাকতে মা মরেছিল বলে অনেকে বলত বটে, মাতৃঘাতী অপয়া, কিন্তু তা যে নয় তা এখন সবাই বোঝে। সকলেরই ভারি আদরের মেয়ে।

আচ্ছা, একটা গান শুনতে পাচ্ছেন পটলবাবু?

হেঃ হেঃ, কী যে বলেন!

কিন্তু আমি যে শুনতে পাচ্ছি!

তা গানবাজনা তো আর খারাপ জিনিস নয়। হচ্ছে হোক না। আপনি চিঁড়েভাজাটা সাপটে খান তো।

তা না হয় খাচ্ছি। কিন্তু গানটা কে গাইছে বলুন তো! দিব্যি সুরেলা গলা! মন রে, কৃষি কাজ জান না, এমন মানবজমিন রইল পতিত আবাদ করলে ফলত সোনা। নাঃ, ভদ্রমহিলার গলায় ভারি মিঠে সুর।

তা হবে না। রাঙাকাকিমার কোন গুণটা কম ছিল তাই তো ভেবে পাই না।

একটু চুপ করুন তো পটলবাবু, ভদ্রমহিলা কী যেন বলছেন।

ও বাবা, এ যে ঝাঁটাপেটা করতে করতে বলছেন, মর! মর!

ও আপনাকে নয়।

কাকে বলছেন বলুন তো!

এই শীতকালের দিকটায় দু-একটা কাঁকড়াবিছে বেরোয় তো! সেরকমই একটা দুটো বেরিয়েছে বোধহয়।

ও বাবা! একে রামে রক্ষে নেই, সুগ্রীব দোসর! ভূতের বাড়িতে আবার কাঁকড়াবিছেরও উৎপাত!

আহা, ভাবছেন কেন লোকেনবাবু? রাঙাকাকিমা থাকতে ভয়ের আছেটা কী? মেরে মেরে ওদের বংশ লোপাট করে ছেড়েছেন। এখন দু-চারটে যা আছে তারা বিশেষ সুবিধে করতে পারে না। ঝাঁটার শব্দটা শুনেছেন। কী তেজ! কাঁকড়াবিছেদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

তাই দেখছি।

ও কী! হেঁচকি তুললেন যে! লঙ্কায় কামড় পড়েছে বুঝি! একটু জল খান। এঃ হেঃ রাধি জলের গেলাস দিয়ে যায়নি বুঝি? দেখ কাণ্ড।

জল লাগবে না। আমার লঙ্কা খাওয়ার অভ্যাস আছে।

তা হলেও খাবারের সঙ্গে জল দেওয়ারও তো একটা প্রথা আছে।

তা অবশ্য আছে। কিন্তু ও কী পটলবাবু, আমার সামনে শূন্যে যে একটা কাচের গেলাস ভেসে আছে। তাতে জলও। ভারি নরম গায় কে যেন বলল, জলটুকু খেয়ে নাও বাবা! দেখছেন পটলবাবু! শুনছেন!

ও আর দেখাশোনার কী আছে। জলটা খেয়ে ফেললেই তো হয়।

তা না হয় খাচ্ছি, কিন্তু এসব কী ভালো কথা পটলবাবু?

খারাপই বা কী বলুন লোকেনবাবু! ঝালের মুখে কেউ যদি এক গেলাস জল এগিয়ে দেয় তার মধ্যে মন্দটা কোথায় হচ্ছে?

তা হচ্ছে না বটে। তবে কিনা—

আসলে সব ঘটনারই ভালো আর মন্দ দুটো দিকই আছে।

সে তো ঠিকই।

রাঙাকাকিমা ভারি সেবাপরায়ণা মহিলা। যতদিন সংসারে ছিলেন ততদিন সকলের সুবিধে অসুবিধের ওপর কড়া নজর রাখতেন।

তাই দেখছি।

তা হলে বাড়িটা নিয়ে কী ভাবলেন বলুন।

আজ্ঞে, ভাবছি।

ভাবুন, ভেবে ঠিক করে ফেলুন। ইচ্ছে করলে না হয় দু-পাঁচ হাজার কমই দেবেন। তবে বলে রাখি এ-বাড়ি বিক্রির টাকা ওই রাধির বিয়ে খরচ বাবদই রেখে দেওয়া হবে। আজকাল বরপক্ষের যা খাঁই হয়েছে তা আর কহতব্য নয়। এটা চাই, সেটা চাই, ওটা না হলে হবে না। পাষণ্ড, পাষণ্ড।

বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে বুঝি?

না, এখনও হয়নি। মাধ্যমিকটা হয়ে যাক, তারপর আর দেরি করব না। গাঁ গঞ্জ জায়গা, এখানে মেয়েদের বিয়ে একটু তাড়াতাড়িই হয়। খোঁজখবর চলছে।

তা, ইয়ে—

হ্যাঁ, বলুন।

দাঁড়ান, কে যেন কী বলছে, একটু শুনতে দিন।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনুন না, ভালো করে শুনুন। তবে মশাই, সত্যি কথা বলতে কী, অন্তত বারো তেরোজন এ-বাড়ি কিনতে এসেছিল। এ-বাড়ির ভূতেরা কিন্তু কারও বেলায় টুঁ শব্দটিও করেনি। আপনার বেলায় যে কেন এমনধারা হচ্ছে কে জানে।

আচ্ছা, একজন হেঁড়ে গলায় কাকে জিগ্যেস করল বলুন তো।

কী জিগ্যেস করল?

বলল, গোত্র কী? বেশ হেঁড়ে পুরুষের গলা।

চিনলেন না। উনিই তো বড়বাবা। আপনাকেই জিগ্যেস করছেন বোধহয়।

আমার গোত্র জেনে ওঁর কী হবে?

নিতান্তই কৌতূহল হয়তো। বলেই দিন না।

তা। হ্যাঁ, আমরা শাণ্ডিল্য, রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ।

ব্যস, এই তো ল্যাটা চুকে গেল। এবার চিঁড়েভাজা শেষ করুন। কফি এল বলে।

ইয়ে, পটলবাবু।

বলুন।

বাড়িটা আমি নেবো।

নেবেন! আহা মশাই, বাঁচালেন। ঘাড় থেকে একটা ভার নেমে গেল। বাড়ি বিক্রি না হলে রাধির বিয়েটাই আটতে যেত।

না, না, বিয়ে আটকানোর কোনও দরকার নেই।

দাঁড়ান মশাই, দাঁড়ান। আমাকেও যেন সূক্ষ্ম গলায় কিছু বলছে।

কী বলছে?

যাঃ, এ যে সাঙ্ঘাতিক কথা।

কী কথা পটলবাবু?

রাঙাকাকিমা বলছে, এ-বাড়ি বিক্রি করা যাবে না।

তা হলে? আমি যে কিনব বলে ঠিক করে ফেলেছি।

তা তো করেছেন। তাঁর আপনাকে ভারি পছন্দ হয়েছে। তিনি চান বাড়িটা আপনাকে যৌতুক দেওয়া হোক।

যৌতুক! সে কী?

রাধিকাকে আপনার অপছন্দ নয় তো! আহা, অমন রাঙা হয়ে মাথা নোয়াচ্ছেন কেন? বাড়িটা আপনিই পাচ্ছেন। বুঝলেন?

ইয়ে, তা হলে...। আচ্ছা। বেশ তবে তাই হোক।

এই যে কফি এসে গেছে।

# গোবিন্দ ভাণ্ডার

মাধবপুরের মুদি-দোকানদার বিষ্ণুপদর ফলাও কারবার। সকাল আটটায় দোকানটি খুলতে না-খুলতেই খদ্দেরের গাদি লেগে যায়। বিষ্ণুপদর দোকানে পাওয়া যায় না হেন জিনিস নেই। কোদাল-কাস্তে থেকে দড়ি-দড়া, মশালাপতি থেকে চিঁড়ে-মুড়ি, ছাতা-লাঠি থেকে আলতা-সিঁদুর অবধি। বড়সড় ক্যাশবাক্সখানা দুপুরের মধ্যেই একেবারে ঠাসাঠাসি। দুপুরে ঘণ্টা দুয়েকের জন্য দোকান বন্ধ করে বিষ্ণুপদ নাইতে-খেতে যায়। একটু দিবানিদ্রা সেরে বিকেলে দোকানের ঝাঁপ খুলতেই ফের ঠেলাঠেলি ভিড়। ধার-বাকির কারবার তার নেই। গুণের মধ্যে বিষ্ণুপদর ব্যবহারটি বড্ড ভালো, শরীরে রোগ নেই, অসীম ধৈর্য, মিষ্টি কথা, তার দোকানে ওজন একদম ঠিকঠাক, দামও ন্যায্য। ভেজাল জিনিস বা দু-নম্বরি কারবারও নেই। শুধু মাধবপুরই নয়, আশপাশের পাঁচ-সাতখানা গাঁয়ের লোকও বিষ্ণুপদর গোবিন্দ ভাণ্ডারের খদ্দের।

যে সব দোকানে খদ্দেরের ভিড় বেশি সেখানে চুরি-জোচ্চুরির সুযোগও বেশি। ভিড়ের মধ্যে কেউ হয়তো টাকা না দিয়েই সওদা নিয়ে গেল, বা অন্যের পোঁটলা টেনে নিয়ে হাওয়া হল, বা দশ টাকার নোট দিয়ে একশো টাকা দিয়েছে বলে তম্বি শুরু করল। কিন্তু গোবিন্দ ভাণ্ডারে সেটি হওয়ার জো নেই। দিন কতক হল ফটিকবাবু বলে একজন লোক জুটে গেছেন, তাঁকে বিষ্ণুপদ ভালো করে চেনেও না, আলাপও নেই। ফটিকবাবু কড়া চোখে সব দিক নজর রাখেন। ফর্সা, রোগা, পরনে হাতে-কাচা ধুতি আর ফতুয়া, হাতে একখানা পুরোনো বিবর্ণ ছাতা, পায়ে সস্তা চটি—এই হলেন ফটিকবাবু। দোকানের বাইরে একটি কোণে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকেন। কে কত পয়সা দিল, কী নিল, কোন ঠোঙাটা কার, কে পয়সা না দিয়েই ভালোমানুষের মতো চলে যাচ্ছে, ফটিকবাবু সব নজরে রাখেন। দেখতে নিরীহ, ভালোমানুষের মতো হলে কি হয়, ফটিকবাবু কোনও ফাঁকিবাজকে ছাড়নেওলা পাত্র নন। এই তো ক'দিন আগে ক্ষ্যান্তমণি নামে একজন ঝগড়ুটে বুড়ি ভিড়ের মধ্যে এক পো ঘি নিয়ে এক পো গুড়ের দাম দিয়ে চলে যাচ্ছিল। ফটিকবাবু ধরলেন, এই যে ঠাকুমা, বলি মুড়ি-মিছরির কি এক দর ঠাওরালে! নাকি অম্বলে গুড়ের বদলে ঘি ঢালবে! ক্ষ্যান্তমণি চিলের মতো সরু গলায় চেঁচামেচি লাগিয়ে দিল, মুখপোড়া, তুই বলতে চাস কী? আমি কি চোর না বাটপাড়? বড় যে আস্পদ্দা হয়েছে দেখছি! ডাকব গাঁয়ের মুরুব্বি মাতব্বরদের? কিন্তু ফটিকবাবু ছাড়বার পাত্রই নন। বুড়ির আঁচলের আড়াল থেকে যখন ঘিয়ের বাটি বেরোলো তখন ক্ষ্যান্তমণি জোর গলায় বলল,

হ্যাঁ, ঘি নিয়েছি তো কী হয়েছে? ঘিয়ের দামই তো দিয়েছি! কিন্তু কথায় কাজ হল না। ফটিকবাবু ক্ষ্যান্তমণিকে দাম দেওয়া করিয়ে তবে ছাড়লেন।

বিষ্ণুপদ তেরছা চোখে ঘটনাটা দেখল। ফটিকবাবু থাকায় তার ব্যবসার যে বিশেষ সুবিধে হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু মুশকিল হল, ফটিকবাবু মানুষটি বিষ্টুর আত্মীয় নয়, কর্মচারী নয়, এমন কী ভালো করে চেনাজানাও নেই। ফটিকবাবু মাধবপুরের বাসিন্দাও নন। তাহলে কেন, কোন স্বার্থে তিনি বিষ্ণুপদর উপকার করার জন্য দুবেলা এসে ওই নির্দিষ্ট কোণটায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকেন সেটাই বিষ্ণুপদ বুঝে উঠতে পারে না। এতে তার উপকার হলেও অস্বস্তিও হচ্ছে। একটা উটকো লোক এসে গায়ে পড়ে উপকার করলে অস্বস্তি হওয়ারই কথা। এটা কলিযুগ কিনা, তাই সব কিছুকেই কেমন যেন সন্দেহ হয়। চোর-ছ্যাঁচড় হওয়াই বা বিচিত্র কী? হয়তো ঘ্যাঁৎ-ঘ্যোঁৎ সব জেনে নিচ্ছে। ঝোপ বুঝে কোপ মারবে!

ক'দিন ধরে খুব দুর্যোগ চলছে। একে শীতকাল, তাতে বৃষ্টি, বিষ্ণুর দোকানে খদ্দেরের আনাগোনা খুবই কম। যদিও দুর্যোগের মধ্যেও ফটিকবাবু এসে ঠিক তাঁর নির্দিষ্ট জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে আছেন। যে দু-একজন খদ্দের আসছে তাদের দিকে নজর রাখছেন।

বিষ্ণুপদ আজ আর পারল না। কর্মচারী কানাইকে জিগ্যেস করল, এই ফটিকবাবু লোকটা আসলে কে বলতে পারিস? এ গাঁয়ের লোক হলে চিনতুম।

কানাই মাথা চুলকে বলল, আজ্ঞে, ফটিকবাবুকে আমি ঠিক চিনি না।

আর এক কর্মচারী বিশ্বনাথ বলল, ফটিকবাবু আসলে কে তা জানি না, তবে দেখে বেশ ভালো লোক বলেই মনে হয়।

তিন নম্বর কর্মচারী কদম দাস একগাল হেসে বলে, আপনি নিজেই ফটিকবাবুকে চেনেন না! সে কী! লোকে তো জানে উনি আপনার ম্যানেজার, মাসে সাতশো টাকা মাইনে।

বিষ্ণুপদ হাঁ করে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, বলিস কী রে! আমার দোকানের ম্যানেজার! তাই বলে বেড়ায় বুঝি লোকটা?

আজ্ঞে না, উনি কিছু বলেন না, লোকে বলে।

বিষ্ণুপদ ভারি রেগে উঠে বলে, বললেই হল! লোকে যা-খুশি বলে বেড়াবে, আস্পদ্দা তো কম নয়! এসব এক্ষুনি বন্ধ করা দরকার।

কদম দাস মিইয়ে গিয়ে বলল, আহা চটছেন কেন মশাই? লোকে এমনি এমনি কত কথাই তো বলে বেড়ায়, কান না দিলেই হল।

বিষ্ণুপদ গম্ভীর হয়ে বলল, এই তোর বুদ্ধি! লোকে ফটিকবাবুকে আমার ম্যানেজার বলে রটাচ্ছে, সাতশো টাকা মাইনের কথা বলছে, এসব যদি চাউর হয়ে যায় তাহলে রক্ষে আছে! একদিন হয় তো কথাটা ফটিকবাবুর কানেও যাবে, তখন যদি উনি সাতশো টাকা মাইনে সত্যিই চেয়ে বসেন তখন কী হবে? না দিলে লোকজন জুটিয়ে চড়াও হবেন। দোকান যে তাহলে লাটে উঠবে।

বিষ্ণুপদর একটাই দোষ। টাকা খরচকে সে বড্ড ভয় পায়। খরচের কথা উঠলেই তার মুখ শুকিয়ে যায়, বুক ঢিবঢিব করে। মাসে তার ত্রিশ-চল্লিশ হাজার টাকা রোজগার। কর্মচারী তিনজন উদয়াস্ত খাটে, তবু মাসে একশো টাকা বেতন আর পাঁচ টাকা করে জলখাবারের পয়সা মোটে পায়। বিষ্ণুপদর পরনে হেঁটো ধুতি, গায়ে লংক্লথের জামা আর পায়ে টায়ারের চটি। মোটা চালের ভাত, ডাল আর একটা ছ্যাঁচড়া বা ছেঁচকি ছাড়া কখনও ভালোমন্দ খায় না। টাকা রোজগারের ভারি নেশা তার, আর কোনও দিকে খেয়াল নেই। বাবুগিরি অপছন্দ বলে তার বউয়ের পরনে ছেঁড়া শাড়ি, তার ছেলেপুলেগুলোর জামা-জুতো জোটে না, বাড়িতে অতিথি আসে না, ভিখিরি আসে না।

কদমের কথা শুনে বিষ্ণুর ভারি দুশ্চিন্তা শুরু হল। ফটিকবাবুর মতলবটা সে খুব পরিষ্কার বুঝতে পারছে। লোকটা যে ফ্যাক খাটার ছল করে তার ঘাড় মটকানোর তালে আছে সে বিষয়ে আর তার সন্দেহই রইল

না। চোরা চোখে চেয়ে ফটিকবাবুকে একটু জরিপ করে নিতে চেষ্টা করল। মুখখানা নিরীহ বটে, কিন্তু উঁচুদরের বদমাশদের মুখ দেখে মতলব বোঝার উপায় থাকে না। গায়ের রংটা ফর্সা হলেই কি আর ভদ্রলোক হয়? আর রোগাভোগা চেহারা হলেই কি আর কূটবুদ্ধির অভাব আছে নাকি?

খদ্দেরের অমিল বলে কানাই, বিশু আর কদম পিছনে বসে নীচু গলায় গল্পসল্প করছিল। বারবার 'ম্যানেজার' শব্দটা কানে আসছিল বিষ্ণুর। ভারি বিরক্ত হয়ে দু-একবার কড়া চোখে পিছনে তাকাল বিষ্ণু। কিন্তু কাজ হল না।

সকালের দিকটায় দোকানে বেরোবার আগে বারান্দায় বসে মুড়ি আর বাতাসা খাচ্ছিল বিষ্ণুপদ। রাখাল মাস্টার বাজার করে ফেরার পথে বিষ্ণুকে দেখে বারান্দায় উঠে এসে বলল, ওহে বিষ্ণুপদ, শুনলুম নাকি দোকানের জন্য একজন ম্যানেজার বহাল করেছ! বেশ মোটা মাইনে দিচ্ছ নাকি! এ তো খুবই ভালো কথা হে। তবে কিনা ভিন গাঁয়ের লোক না রেখে আমার ছেলে গোপালকেই ম্যানেজার করতে পারতে! দেখতে হাবাগোবা হলে কী হয়, গোপাল কিন্তু ভিতরে ভিতরে খুব হুঁশিয়ার ছেলে। তাছাড়া চারদিকে নজর। কোথায় নাড়ুটা, কোথায় মোয়াটা, কোথায় গুড়, কোথায় বাতাসা, কোথায় সিকিটা আধুলিটা সব খবর রাখে। তুমি বরং ওই উটকো ফটিককে জবাব দিয়ে দাও। বেশি নয়, ওই সাতশো টাকাই গোপালকে দিও, সঙ্গে খোরাকি বাবদ আরও শতখানেক দিলেই চলবে।

বিষ্ণুপদ এত অবাক হল যে মুড়ি চিবোতে ভুলে গিয়ে হাঁ করে চেয়ে রইল।

পথে বিপদভঞ্জনের সঙ্গে দেখা হতেই বিপদভঞ্জন শশব্যস্তে বলে উঠল, এই যে বিষ্টু ভায়া, তোমার কাছেই যাচ্ছিলাম। বলি চোখের কি মাথা খেয়েছ? ঘরের কাছে এমন হীরের টুকরো ছেলে থাকতে কোত্থেকে কোন এক ফটিককে ধরে আনলে হ্যা! সবাই যে ছ্যাঃ ছ্যাঃ করছে। আরে আমার সেজো শালাই তো হাতের কাছে রয়েছে। সাতবার মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। তাহলেই বুঝে দেখ, সাত বছরে একই অঙ্ক বারবার কষতে কষতে গোটা অঙ্ক বইটাই তো হজম করে ফেলেছে। তারপর ইংরিজি, বাংলা কোনটায় কম বলো তো? অভিজ্ঞতারও তো একটা দাম আছে, নাকি? তার ওপর লম্বাই চওড়াই আছে। ষণ্ডা গুণ্ডাও আছে, বিপদে আপদে বুক দিয়ে আগলাতে পারবে, পাজি লোককে টিট করতে পারবে। সাতশো টাকা মাইনে শুনে না কি সিটকোচ্ছিল বটে। তাকে নাকি বারোশো মাইনেয় মনোহরপুরের রাধাগোবিন্দ দাস ঝুলোঝুলি করছে। তা আমি আর তার দিদি বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করিয়েছি। তুমি আজই ফটিককে বিদেয় করো দিকি। সাতশো টাকায় সঙ্গে দিনে পাঁচ টাকা খোরাকি দিলেই চলবে।

রথতলার মোড়ে মৃগাঙ্কবাবু ওত পেতে ছিলেন। টক করে উদয় হয়ে বিষ্ণুপদর ছাতার নীচে মাথা গলিয়ে ভারি আহ্লাদী গলায় বললেন, আহা, শুনে বড় আনন্দ হল। বড় কারবারী তুমি, গণ্যমাণ্য লোক, এ না হলে কি তোমাকে মানায়? লোকে যাই বলুন বাপু, কান দিও না। কেউ বলছে কচুশাকের ক্যাশমেমো, কেউ বলছে ল্যাঙটের বুকপকেট, কেউ বলছে ইঁদুরের গুড়। ওসব ম্যানেজারি করা তো চাট্টিখানি কথা নয়। তার জন্য মাথা চাই, তৎপরতা চাই, বিশ্বাসী হওয়া চাই। যাকে তাকে ম্যানেজার করলেই তো হল না। অজ্ঞাতকুলশীলকে বেশি প্রশ্রয় দেওয়া শাস্ত্রের নিষেধ। বলি কী, ফাঁকমতো একটু আমার ছোট ছেলে বৃন্দাবনের কথাটা বেশ করে ভেবে দেখো তো। গত বছর যে চোর সন্দেহ করে বৃন্দাবনকে পুলিশে ধরে নিয়ে গিয়েছিল সেটা বড্ড ভুল করেছিল পুলিশ। বিষ্ণু দারোগা তো অনুতপ্ত হয়ে আমার হাত দুটি ধরে কেঁদেই ফেলেছিলেন।

একটু বেশি রাতের দিকে, যখন বিষ্ণুপদ বিছানায় যাওয়ার তোড়জোড় করছে তখন গাঁয়ের নেতা ষষ্ঠীপদ এসে হাজির। তার কথাবার্তায় সর্বদাই একটা বক্তৃতার ঢং থাকে। বিনা ভূমিকায় সে বলতে লাগল, বিষ্ণুবাবু, প্রথমেই আমি আপনাকে সংগ্রামী অভিনন্দন জানাচ্ছি। রফতানি বাণিজ্য প্রসারিত করে আপনি গাঁয়ে বাইরের মূলধন বিনিয়োগের রাস্তা খুলে দিয়েছেন। এতে গাঁয়ের আর্থিক অবস্থানের অস্তিবাচক পরিবর্তন ঘটেছে। বৃহৎ বাণিজ্যের সুষ্ঠ পরিচালনার জন্য বিশেষজ্ঞ নিয়োগের প্রয়োজনও আমি অস্বীকার করছি না। এটা

বিশেষজ্ঞদেরই যুগ। কিন্তু বেতন-বৈষম্য যদি দৃষ্টিকটু রকমের বেড়ে চলে এবং শ্রমিক-স্বার্থ ক্ষুন্ন হয় তবে আমাদের আন্দোলনে নামতেই হবে। আপনি ম্যানেজারকে সাতশো টাকা বেতন দিচ্ছেন। অথচ যারা দেহের রক্ত জল করে উৎপাদন বাড়িয়ে নিয়ে চলেছে তাদের দিচ্ছেন মানবতা-বিরোধী একশোটা করে টাকা। শ্রমিকের পেটে লাথি মেরে কোটি কোটি টাকা মুনাফা লুটবেন, এ তো হতে পারে না! আমার অনুরোধ আপনি শ্রমিক-কর্মচারী এবং নেতৃবর্গের সঙ্গে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে বসুন এবং শ্রমিকের ষোলো দফা দাবি মেনে নিন। নইলে...

বিষ্ণুপদর মাথা ঘুরছিল। সে দুই হাতে মাথা চেপে ধপ করে মেঝেতেই বসে পড়ল।

পরদিন সকালে দোকান আর খুলল না বিষ্ণুপদ। ছাতা মাথায় দিয়ে বাইরে ফটিকবাবুর জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। ফটিকবাবু সদর রাস্তা থেকে মোড় ঘুরে দোকানের দিকে আসছেন দেখেই বিষ্ণুপদ তাড়াতাড়ি গিয়ে খপ করে তাঁর হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে পাশে ঝোপের আড়ালে নিয়ে গিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, আচ্ছা মশাই, আপনার মতলবখানা কী বলুন তো! খোলাখুলি বলুন, কিছু চেপে যাবেন না।

ফটিকবাবু বড্ড ঘাবড়ে গেছেন। আমতা আমতা করে বললেন, আজ্ঞে মতলব তো কিছু নেই। বাড়িতে বড্ড গঞ্জনা, তাই একটু সময় কাটিয়ে যেতেই আসা।

বিষ্ণুপদ মাথা নেড়ে অবিশ্বাসের গলায় বলে, না মশাই, আপনার অন্য মতলব আছে। তা আপনার চলে কীসে? আমার দোকানের খদ্দের সামলালে আপনার লাভ কী? আপনার চলে কী করে?

ফটিকবাবু ভয়ে ভয়ে বললেন, আজ্ঞে, বিঘে দশেক পৈতৃক জমি আছে, বাড়ির বাগানে কলাটা মুলোটা হয়, আর আমার বউ সেলাই ফোঁড়াই করে কিছু পান। কষ্টেসৃষ্টে চলে যায়। নিষ্কর্মা বসে আছি বলে বেগার খেটে বেড়াই।

এই যে লোকে বলাবলি করছে যে, আপনাকে আমি সাতশো টাকা বেতন দিয়ে ম্যানেজার রেখেছি, এটা রটাল কে?

ফটিকবাবু হাঁ করে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন, আজ্ঞে তা তো জানি না।

বেগার খাটবার আরও তো জায়গা ছিল, আপনি আমার দোকানে এসে যে কেন জুটলেন?

ফটিকবাবু একটু হেসে বললেন, আজ্ঞে বিকিকিনি ব্যাপারটা দেখতে আমার বড্ড ভালো লাগে তো, তাই আপনার দোকানে আসি। কেনাবেচা জিনিসটা ভারি ভালো। পয়সা কেমন করে জিনিস হয়ে যাচ্ছে তা দেখেই আমার আনন্দ।

বিষ্ণুপদ দাঁত কড়মড় করে বলে, কিন্তু তাতে যে আমার নাভিশ্বাস উঠছে তা কি আপনি জানেন?

ফটিকবাবু ভারি লজ্জিত হলেন, কুণ্ঠিত গলায় বললেন, তাহলে তো বড় অন্যায়

হয়ে গেছে বিষ্ণুবাবু। ঠিক আছে, আমি চলে যাচ্ছি। আর আপনাকে বিরক্ত করতে আসব না।

বিষ্ণুপদ হঠাৎ হুংকার দিয়ে উঠল, চলে যাবেন মানে? চলে গেলেই হল? চলে গেলে তার হ্যাপা সামলাবে কে? আপনার জায়গায় ম্যানেজারি করার জন্য চোর জোচ্চোর বদমাশ এসে জুটবে। ওসব হবে না।

ফটিকবাবু আমতা আমতা করে বললেন, কিন্তু আপনি তো আমাকে তেমন পছন্দ করছেন না।

বিষ্ণুপদ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তা করছি না বটে, তবে আপনার এখনে চলে যাওয়াটাও ঠিক হবে না, যেমন আছেন তেমনিই থাকুন। আজ থেকে আর বাইরে নয়, দোকানের ভিতরেই বসবেন। চেয়ারের বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি।

ফটিকবাবু একগাল হেসে বললেন, বাঁচালেন বিষ্ণুপদবাবু। আপনার দোকানটা আমার বড্ড ভালো লেগে গিয়েছিল।

হ্যাঁ, আর একটা কথা।

কী বলুন তো!

মাইনে ওই সাতশো টাকাই পাবেন। আমি পাকা কাজ করতে ভালোবাসি।

বলেন কি মশাই?
ঠিকই বলছি।

# বউ-এর খোঁজে

তার একটা বিয়ে করা বউ আছে এটা নবকেষ্ট জানে। কিন্তু সে কেমন ধারা মেয়ে তা জানা নেই তার। যখন তার চোদ্দো বছর বয়স তখনকার কথা। একটা সাত-আট বছরের ছুঁড়ির সঙ্গে তার বে'হল গোয়ালপুকুর গাঁয়ে। দুই পক্ষের কী কথা-টথা হয়েছিল তা অত জানে না নব। বউকে সে ভালো করে চোখেও দেখেনি। বেশি রাতে লগ্ন ছিল, ঘুমে চোখ তখন ঢুলে আসছে। সেই সময়ের পর পরই অবস্থা গতিক সব বদলে গেল। তাদের বিষয় সম্পত্তি সব বাবা কাকাদের মধ্যে ভাগাভাগি হল। বাড়ির ভিতরে পাঁচিল উঠে তার তরফে বাঁটোয়ারা হল। তারপর তার বাবাও একদিন বুকের অসুখে মারা গেল। নবর যা আতান্তর হয়েছিল তা আর বলার কথা নয়। মাধ্যমিকের পর আর পড়াশোনা এগোয়নি। চাষবাসের কাজ তেমন জানে না, আর জানলেও মোটে পাঁচ বিঘে জমি চষে পরিবারের পেট চালানো মুশকিল।

ভাগ্য ভালো বাবা তার দুই মেয়েরই বিয়ে দিয়ে গেছেন। সংসারে শুধু নব আর তার বিধবা মা। কষ্টেসৃষ্টে চলে। মা মাঝে মাঝে বলে, ও নব, একবার গোয়ালপুকুরে গিয়ে বউটার অবস্থাটা দেখে আয়।

ছাড়ো তো মা, নিজেদেরই পেট চলে না, তার ওপর বউ এনে জোটাই আর কী!

চাষবাসের ওপর নির্ভর করলে যে চলবে না তা কুড়ি বছর বয়সেই বুঝে গেল নব। তবে ভরসার কথা হল সে বোকা নয়। আর তার বেশ সাহস আছে। ভয়ডর একটু কম। সাহস করেই সে কাপড়ের ব্যবসাটা শুরু করেছিল। অল্প পুঁজি নিয়ে কখনও মংলাহাট, কখনওবা নদীয়া থেকে শাড়ি কিনে গাঁ-গঞ্জের হাটে বিক্রি করত। সস্তা শাড়িরই চাহিদা বেশি। খুব মেহনত যেত বটে, কিন্তু দু-চার হাজার টাকা আয়ও হতে লাগল।

কাছেই যে গঞ্জ শহরটা আছে তক্কে তক্কে থেকে সেখানে একটা দোকান ভাড়াও নিয়ে বসল সে। বাহারি দোকান নয়, ছোটমতো সাদামাটা দোকান, বিক্রিবাটা খুব একটা খারাপ হচ্ছিল না। কিন্তু নব তেমন খুশি নয়। মেহনত অনুপাতে আয় আর এমন কি। তেমন জমাটি জায়গায়ও তার দোকানটা নয়। একদিন রূপশ্রী স্টোর্স-এর মালিক তেজেনবাবু কথায় কথায় বললেন, আমার বয়স হয়েছে, ছেলেপুলেও নেই, ভাবছি দোকানটা বেচে দিয়ে বেশ কিছু টাকা ব্যাংকে রেখে বাকি জীবনটা চালিয়ে দেব।

নব শুকনো মুখে দোকানের দাম জিগ্যেস করে যা জবাব পেল তাতে মূর্ছা যাওয়ার জোগাড়। অত টাকা তাকে বেচলেও হবে না। মাসকয়েক পরে তেজেনবাবু ফের দুঃখ করেছিলেন, না রে, দোকানের তেমন দাম পাচ্ছি না। নব শুনে চুপ করে রইল, কী-ই বা বলবে। তখন তেজেনবাবু বললেন, তুই যদি নিস তাহলে দিয়ে দিই।

নব মাথা নেড়ে বলে, আমার এত টাকা কোথায় খুড়ো?

নগদ কিছু দে। বাকিটা কিস্তিতে দিলেও হবে।

তো তাই হল। নবর হাতে পড়ে দোকানটার ছিরিছাঁদ ফিরল। নব চকচকে হল। বিক্রিবাটাও বাড়ল।

দু'বছরের মধ্যে তেজেনবাবুর টাকা শোধ করে ফেলল নবকেষ্ট। পুরোনো দোকানের কর্মচারী রেখে দিল। দুটো দোকান থেকে দোহাত্তা রোজগার তার।

এবার মা ধরে পড়ল, ওরে ও নব, এবার আর বারণ শুনছি না বাবা, বউটাকে নিয়ে আয়। তাদের খবরবার্তাও নেই বহুকাল।

তা নবর এখন একটা বউ হলে মন্দ হয় না। কাজ করবার বাড়িয়ে গেলেই তো হবে না, ওয়ারিশনও তো চাই। ছেলেপুলে না হলে বিষয় সম্পত্তি কার কব্জায় যাবে কে জানে।

আসলে বিয়ের কথাটা তার মনে যে উঁকিঝুঁকি মারছে তার একটা কারণও আছে। ক'দিন আগে একটা অল্পবয়সী বউ এসেছিল শাড়ি কিনতে। তখন দুপুরবেলা। তেমন খদ্দেরের ভিড় ছিল না। বউ মানুষটাকে শাড়ি দেখাচ্ছিল নবর কর্মচারী নিতাই। কিন্তু মেয়েটা তেমন মন দিয়ে শাড়ি দেখছিল না। বার দুই জল চেয়ে খেল। আর মাঝে মাঝেই ড্যাবড্যাব করে চেয়ে নবকে দেখছিল। ভারি মিঠে চেহারা মেয়েটার। তখনই নবর হঠাৎ মনে হল, এরকম একটা মিষ্টি বউ হলে মন্দ হত না তার। মেয়েটা দরদাম না করেই গোটা দুই শাড়ি কিনে নিয়ে চলে গেল।

বৃহস্পতিবার দোকান বন্ধ। বুধবার একটু বেলাবেলি কাজ-কারবার গুটিয়ে গোয়ালপুকুর রওনা হল নব। খবরবার্তা দেওয়া নেই, শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তাকে চিনবে কিনা তা-ই বা কে জানে। আরও কথা হল, তার সেই বউ কি আজও তার বউ আছে? যদি সেই বিয়েটা নিতান্তই একটা ছেলেমানুষী ভেবে তার মেয়ের আবার বিয়ে দিয়ে থাকে?

গোয়ালপুকুর যেতে দুবার বাস বদলাতে হয়। রাস্তা খুব বেশি নয়, কিন্তু ভাঙাচোরা রাস্তায় সময় অনেক বেশি লেগে যায়।

সন্ধের মুখে গোয়ালপুকুরে নেমে তার ভারি অস্বস্তি হচ্ছিল। শ্বশুরবাড়ির রাস্তা সে ভালোই চেনে। তবু যাতে ভুলভাল না হয় তার জন্য বাস গুমটিতেই, এক দোকানদারকে জিগ্যেস করে নিশ্চিন্ত হয়ে গেল। মা বলেছিল যাতে খালি হাতে না যায়। তাই একটা পরিচ্ছন্ন মিষ্টির দোকান থেকে এক বাক্স সন্দেশ কিনে নিল সে। তারপর রওনা হয়ে পড়ল।

গোয়ালপুকুর বড় জায়গা নয়। হাটখোলা পেরোলেই রথতলা। তারপর বেনেপুকুর নামে একখানা বড়সড় জলাশয়। আর একটু উজিয়ে ডাইনে মোড় দিলে তিনখানা বাড়ির পরই তার শ্বশুরবাড়ি। ভুল হওয়ার কথা নয়।

গাঁ-গঞ্জের পক্ষে তার শ্বশুর মনসারামের অবস্থা কিছু খারাপ নয়। ধানজমি যেমন আছে তেমনি অবার বিড়ির কারখানা, তেলের খনি আর গুঁড়ো মশলার চাক্কি আছে। বাড়িখানা বেশ বড়সড় আর পাকা। তবে

মাথায় টিনের চাল। সামনে একখানা ফাঁদালো ফুলের বাগান, শীতের মরশুমে বিস্তর ফুল ফুটে আছে।

একটা প্যাংলা কুকুর তাকে দেখে খ্যাঁকাচ্ছিল। সেই শব্দেই বোধহয় হেঁটো ধুতি পরা, গায়ে কেলে চাদর জড়ানো একজন বয়স্ক মানুষ বেরিয়ে এল।

কে?

আজ্ঞে আমি কেতুপুর থেকে আসছি। আমার নাম নবকৃষ্ণ দাস।

লোকটা একটু হাঁ করে চেয়ে রইল। তারপর ব্যস্ত হয়ে বলল, বাবাজীবন নাকি। আরে এসো এসো। কতকাল পরে এলে বাবা।

নবকৃষ্ণ হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ভেবেছিল বিয়ের কথা বোধহয় এরা ভুলেই গেছে। চিনতে না পারলে বা পাত্তা না দিলে বড্ড অপমান হতে হবে।

মুহূর্তের মধ্যে বাড়িতে একটা সাড়া পড়ে গেল। সে উঠে বারান্দায় শ্বশুরকে প্রণাম করতে না করতেই প্রায় ঘেরাও হয়ে পড়ল। ঘোমটা ঢাকা তিন-চারজন বউ মানুষ, গোটা পাঁচ-ছয় বাচ্চা-কাচ্চা, আরও দু'জন ছেলে-ছোকরা।

মিষ্টির বাক্সটা যিনি নিলেন, মনসারাম তাঁকে দেখিয়ে বললেন, তোমার শ্বাশুড়ি।

প্রণাম অবশ্য মেলাই করতে হল। পেলও কয়েকটা। হাতের ব্যাগখানা কে যেন আগ বাড়িয়ে নিয়ে গেল। তারপর ঘরে নিয়ে তাকে বসিয়ে চা জল মিষ্টি ইত্যাদিও দেওয়া হল।

প্রথম ধাক্কাটা সামলে ওঠার পর মনসারাম একটু কাঁচুমাচু মুখ করে বললেন, বাবাজীবন, একটু কথা ছিল।

আজ্ঞে, বলুন।

তুমি যে বকুলের খবর করতে এসেছ তা বুঝতে পারছি। কিন্তু একটা খারাপ খবর আছে বাবা।

একটু অবাক হয়ে নব বলে, খারাপ খবর?

হ্যাঁ বাবা। বকুল এ বাড়িতে নেই।

নেই। তাহলে গেল কোথায়?

এই সবই হল ওই শেফালী দিদিমণির বজ্জাতি। অল্পবয়সে বিয়ে হয়েছে শুনে একদিন এসে আমাদের যাচ্ছেতাই অপমান করে গেল। তারপর থানা-পুলিশ এল। সে বড় হুজ্জত গেছে বাবা। হেনস্থার আর শেষ নেই। তারপর মোড়ল-মাতব্বরদের হাত করে বিরাট মিটিং বসাল। তাতে সাব্যস্ত হল, নাবালিকা বিয়ে অসিদ্ধ। সুতরাং এ মেয়েকে কুমারী বলেই ধরতে হবে। চাপে পড়ে আমাদেরও তাই মেনে নিতে হল বাবা। নইলে ধোপা-নাপিত বন্ধ করে দেবে। কাজ-কারবার অচল হবে। বুঝতেই পারছ।

নবকৃষ্ণ হেসে বলল, সে তো ঠিকই। নাবালক-নাবালিকার বিয়ে দিয়ে আপনি আর আমার বাবা ঠিক কাজ করেননি। আজকালকার দিনে ওসব কি চলে? তবু বাবা একটা বিয়ে দিয়ে যখন গেছেন তখন তাঁর সম্মান রাখতে আমি বউ নিয়ে যেতে এসেছিলুম। কিন্তু সে যখন চলেই গেছে তখন আর কথা কি?

বোসো বাবা, কথা এখনও শেষ হয়নি। আজ রাতটা থেকে যাও, এখানে সন্ধের পর বাস আর থাকে না।

কিন্তু থেকে লাভটাই বা কী বলুন। যার জন্য সম্পর্ক সে-ই যখন নেই, তখন আর আমাকে জামাই বলে ভাববার কারণও থাকছে না। তা বকুল এখন কোথায়?

যতদূর শুনেছি শেফালী দিদিমণি তাকে লেখাপড়া শিখিয়ে গঞ্জের দিকে কোনও স্কুলে চাকরিতে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। শুনছি নাকি বিয়েও দেবেন।

কব্জির ঘড়িতে সময় দেখে উঠে পড়ল নবকৃষ্ণ। বলল, ছ'টা সাতান্নর ফেরার শেষ বাস। সেটা ধরতে পারব। আজ আসি। পরে ফের খবর নেব'খন।

কথাটা কথার কথা। আসলে শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে তার সম্পর্ক একরকম শেষ। আর এসে লাভ নেই। তবে বকুলের জন্য দুঃখ-টুঃখ কিছুই হল না। নাম-কা-ওয়াস্তে বউ, তার মুখটাও তো মনে নেই তার। যদি অন্য কাউকে বিয়ে করে তো করুক না। তার দায় থাকবে না।

ফিরে এসে রাতেই খবরটা মাকে শোনাল।

মা মাথায় হাত দিয়ে বলল, সর্বনাশ, নাবালিকা হোক আর যাই হোক, মন্তর পড়ে বিয়ে হয়েছিল যে! তার আবার বিয়ে দিলে পাপ হবে রে।

তা সেই পাপ হলে তার হবে। আমাদের কী?

সর্বনাশ! অমন হাল ছেড়ে দিসনি বাপ, গঞ্জে গিয়ে একটু খোঁজ নে। হাত গুটিয়ে বসে থাকলে হবে না।

মায়ের তাড়নায় পরদিনই গঞ্জে যেতে হল তাকে। বেশি খোঁজখবর করতে হল না। শুনতে পেল, কনকচাঁপা মাস্টারনি হিসেবে বেশ নামডাকও আছে। কিন্তু হুট করে গিয়ে দেখা করতে সাহস হল না নবর। কারণ বকুল আর অবোধ বালিকা নেই। লেখাপড়া শিখে নবকে অনেক দূর ছাড়িয়ে গেছে। নব মোটে মাধ্যমিক পাস। বকুল এমএ। না, বকুলের সঙ্গে তাকে মানাবে না মোটেই। শেফালী দিদিমণি তাকে বরং উপযুক্ত পাত্রেই দিন।

ফিরে এসে মাকে সামলাতে সমস্যা হল বটে, কিন্তু নব খুব বেশি মাথা ঘামাতে রাজি হল না। বলল, আমরা তো আর ভিখিরির মতো গিয়ে ঘ্যানঘ্যান করতে পারি না। আজকালকার মেয়েদের তুমি তো চেনো না, তারা আগেকার মতো নেই। আমাকে ঘেঁষতেই দেবে না। চাই কি লোক লাগিয়ে মারধরও করতে পারে।

মা তখন ভয় পেয়ে বলল, তাহলে থাক বাবা, হাঙ্গামায় গিয়ে কাজ নেই। আমি বরং তোর জন্য পাত্রীর খোঁজ করি।

নব ব্যস্ত মানুষ। তার দোকানে এখন গরম জামা এসেছে, নতুন চালানের মাল স্টক করতে হচ্ছে। দম ফেলার সময় নেই। নতুন এটা কারবার খোলারও ফিকির রয়েছে মাথায়।

সেদিন দুপুরে একটু ফুরসৎ পেয়ে হিসেবের খাতা সরিয়ে একটু জিরেচ্ছিল নব। মাস পাঁচেক হল সে দাড়ি রেখেছে। দাড়ি কাটার হাঙ্গামায় কিছুটা সময় তো নষ্ট হয়ই। বসা-কাজে পিঠে ব্যথা হচ্ছিল বলে ডাক্তার তাকে ব্যায়ামের পরামর্শ দিয়েছিল। নব আজকাল সকালে উঠে অনেকটা দৌড়ঝাঁপ করে, ব্যায়াম কসরৎ করে। জীবনে যা কিছুই মানুষ করুক না সব শরীর নির্ভর। শরীর বিকল হলে সব ফক্কিকারি হয়ে যায়।

দাড়ি রাখায় কেউ কেউ আজকাল তাকে সাধুবাবা বলেও ডাকতে শুরু করেছে। লোকে মাঝে মাঝে তার দোকানকে সাধুবাবার দোকান বলেও উল্লেখ করে। নবর অবশ্য তাতে হেলদোল নেই। দুপুরে বসে নানা কথাই ভাবছিল নব।

দু'জন মহিলা দোকানে ঢুকে শাড়ি-টাড়ি দেখছিল। একজনকে আবছা চিনতে পারল নব। আরও একদিন এসেছিল যেন। ভারী মিষ্টি চেহারার বউ-মানুষ। আজও নবর দিকে বারবার তাকাচ্ছিল মুখ ফিরিয়ে। নবর চেহারা তেমন খারাপ নয়। কন্দর্পকান্তি না হলেও তার চেহারা বেশ তেজী। কিন্তু তা বলে একজন পরস্ত্রী তাকে ড্যাবড্যাব করে দেখবে, এটাও তো ভালো কথা নয়। নব তাই মুখ ফিরিয়ে নিয়ে হিসেবের খাতায় ডুব দিল। বউটার মতলব ভালো ঠেকল না তার।

আজও বউটা দরদাম না করেই গোটা দুই শাড়ি কিনল। তার সঙ্গের মেয়েটা বলছিল, তুই কী রে! সাড়ে চারশো বলল আর দিয়ে দিলি!

নবর কর্মচারী সতু বলল, এ দোকানে কেউ এসে ঠকে যায় না দিদি। নিশ্চিন্তে নিয়ে যান।

মিষ্টি চেহারার বউটা বলল, একটু জল খাবো।

বসুন বউদি, এনে দিচ্ছি।

সতু গেল টিউবওয়েল থেকে জল আনতে।

হিসেবের খাতায় চোখ থাকলেও নবর কান সজাগ ছিল। সে টের পেল বউটা উঠে খুব ধীর পায়ে তার সামনে এসে দাঁড়াল। নব একটু অবাক হয়ে খাতা থেকে মুখ তুলে চাইল। দুটো বড় বড় চোখ তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে।

নব শশব্যস্ত বলল, কিছু বলবেন?

বউটা ঝংকার দিয়ে বলে, গোয়ালপুকুরে যাওয়া হয়েছিল কেন?
নব ভারী অবাক হয়ে বলে, গোয়ালপুকুর।
হ্যাঁ।
সেখানে একটা কাজ ছিল বটে। কেন বলুন তো।
দাড়ি রাখা হয়েছে কেন? সাধু হওয়ার ইচ্ছে নাকি?
না না, ও এমনিই। কেন বলুন তো! আপনি কে?
কে বলে মনে হচ্ছে?
নবকৃষ্ণ হাঁ করেও ফের মুখ বন্ধ করে ফেলল।
সতু জল নিয়ে এসেছিল। নব বলল, ওরে সতু শাড়ির দাম যা নিয়েছিস তা বউদিকে ফেরত দিয়ে দে।
ফেরত দেব?
দিবি না তো চাকরিটা খোয়াবি নাকি! আমারই চাকরি থাকে কিনা দেখ।
মিষ্টি চেহারার বউটি এবার হেসে আঁচলে মুখ চাপা দিল।

## মরা বাঁচা

আপনি কি সুইসাইড করতে চাইছেন নাকি?
কে বলল আমি সুইসাইড করতে চাইছি?
তাহলে গাছে দড়ি বাঁধছেন কেন?
আমার ইচ্ছে। কিন্তু আপনি কে? অচেনা লোক বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লেন যে বড়?
বাড়ির মধ্যে তো ঢুকিনি, বাগানের মধ্যে ঢুকেছি বলতে পারেন। ভাগ্যিস ঢুকেছি, নইলে দৃশ্যটা চোখে পড়ত না।
বাগানে ঢোকাও ট্রেসপাসিং। কী চাই আপনার?
আমি অলকা সেনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। উনি বাড়িতে আছেন?
তার সঙ্গে আপনার কী দরকার?
আমি ওঁকে একটা জরুরি খবর দিতে এসেছি।
খবরটা কী?
সেটা তো অলকা সেন ছাড়া আর কাউকে বলা যাবে না।
আমিই অলকা সেন।
আপনি! বিশ্বাস হচ্ছে না যে।
কী মুশকিল, বিশ্বাস না হওয়ার কী আছে?
আমার ধারণা ছিল, অলকা সেন বয়স্কা মহিলা।
আমার যথেষ্ট বয়স হয়েছে।
কত?
সাতাশ। কিন্তু আপনি কে বলুন তো।
আমার নাম বরুণ দাশগুপ্ত। দাশগুপ্ত অ্যাসোসিয়েটসের একজন কর্মচারী।
ওঃ হ্যাঁ, ওঁরা আমার অ্যাটর্নি। কী খবর বলুন তো!
খবরটা কি এই বাগানে দাঁড়িয়ে শুনবেন? ইন ফ্যাক্ট, আমি একটা অফিসিয়াল চিঠি নিয়ে এসেছি।
সেই লালচাঁদ কেসটার ব্যাপারে নাকি?
হ্যাঁ।
কেসটায় কি আমি হেরে গেছি?

হারজিত তো জীবনে আছেই।
চিঠিটা দিন।
একটু অসুবিধে আছে।
কীসের অসুবিধে?
আমাকে স্ট্রিক্টলি বলে দেওয়া হয়েছে যে চিঠিটা যেন অলকা সেনের হাতে ছাড়া আর কাউকে না দিই।
আমিই তো অলকা সেন।
সেটা আপনি বলেছেন, কিন্তু প্রমাণ দেননি। আমি আপনাকে চিনি না। সুতরাং আইডেন্টিফিকেশন ছাড়া আপনাকে চিঠিটা হ্যান্ডওভার করতে পারব না। আমার চাকরি যাবে।
কী আইডেন্টিফিকেশন চাই আপনার?
পাসপোর্ট বা ভোটার আইডেন্টিটি কার্ড কিংবা অফিসিয়াল আইডি, যাহোক একটা কিছু।
নইলে দেবেন না?
না।
ওসব আমার নেই।
তাহলে মুশকিল হল। দাঁড়ান, অফিসে ফোন করে জেনে নিচ্ছি।
তার কোনও দরকার নেই। চিঠিতে কী লেখা আছে তা আমি অনুমান করতে পারছি। লালচাঁদ কেস-এ হেরে গেলে আমাকে প্রায় বাইশ লাখ টাকা কমপেনসেশন দিতে হবে। তার ওপর মামলার খরচ, অ্যাটর্নির ফি।
দেখুন, আমি দূত মাত্র।
আপনাকে দোষ দিচ্ছি না। দোষ আমার ভাগ্যের। এই কেসটা আমার বাবার আমল থেকে চলছে। বাবার সঙ্গে লালচাঁদ কোম্পানির মামলা হয়েছিল। বাবা মারা যাওয়ার পর এতকাল কেস আমি চালিয়েছি! আর এই কেসটার জন্য আমার জীবনের সব শখ-আহ্লাদ, লেখাপড়া, ক্যারিয়ার সব নষ্ট হয়েছে। বাবার ব্যবসাটাও মার খেয়েছে। এখন আর আমার কিছু করার কিছু নেই। চিঠিটা না হলেও আমার চলবে।
সেই জন্যই কি সুইসাইড করার চেষ্টা করছিলেন?
সুইসাইড তো একটা ফর্মালিটি। আমি তো এমনিতেই মরে গেছি। আমাদের এই বাড়িটা অবধি মর্টগেজ দেওয়া আছে।
অত নেগেটিভ চিন্তা করছেন কেন? আপনি একজন ইয়ং, গুড লুকিং আর যথেষ্ট বুদ্ধিমতী মহিলা। শুনেছি আপনি বেশ কোয়ালিফাইডও। লড়াই করলে ফের সব হবে।
না, লড়াই করার জোরটাও আমার আর নেই। উপদেশ দিতে হবে না, আপনি এখন আসুন।
যেতে তো হবেই। কিন্তু ভয় হচ্ছে, আমি চলে গেলে এই দুপুরের নির্জনতায় আপনি হয়তো একটা হঠকারি কাজ করে বসবেন। দাঁড়ান গাছ থেকে দড়িটা খুলি।
খুলতে পারেন, তবে দড়ি খুললেই তো জট খুলবে না। আমার বেঁচে থাকার কোনও অবলম্বন আর নেই। দড়ি ছাড়াও বিষ আছে, আগুন আছে, জল আছে।
কী মুশকিল। আপনি ওসব ভাবছেন কেন? একটু বেঁচে থাকার কথাও ভাবুন। মানুষ কি মামলায় হেরেও বেঁচে থাকে না!
কেন থাকবে না? তাদের বেঁচে থাকার অন্য অবলম্বন থাকে। আমার কিচ্ছু নেই। মা বাবা ভাই বোন নেই, আত্মীয়রা সম্পর্ক রাখে না। ব্যবসা মার খাচ্ছে। বাড়ি মর্টগেজে। সাতাশ বছর বয়সেই আমার জীবন ফুরিয়ে গেল।
এ তো মহা ফ্যাসাদে পড়া গেল আপনাকে নিয়ে।

আপনার ফ্যাসাদ কীসের? আপনি তো আমাকে চেনেনও না। আমিও চিনি না আপনাকে। পাঁচ মিনিটের আলাপে তো কোনও দায়বদ্ধতা জন্মায় না। আপনি আসুন।

আচ্ছা, ধরুন, আমি যদি এক কাপ চা খেতে চাই, খাওয়াবেন?

কেন, হঠাৎ আপনার চায়ের দরকার হল কেন?

এমনিই। চা খেতে খেতে দু-চারটে কথা—

কোনও দরকার নেই। আপনি কোনও দোকানে চা খেয়ে নেবেন। আমাকে ডাইভার্ট করার চেষ্টা করে কোনও লাভ হবে না। দয়া করে এবার বিদেয় হোন।

এ বাড়িটা কত টাকায় মর্টগেজ দিয়েছেন?

পাঁচ লাখ। সুদে-আসলে দশ লাখ ছাড়িয়ে গেছে।

আপনার লায়াবিলিটিজ আর কিছু আছে?

না।

রাফ হিসেবে আপনার লায়াবিলিটিজের পরিমাণ বোধহয় ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ লাখ টাকা, তাই না?

হবে বোধহয়।

জীবন কি তার চেয়েও অনেক বেশি মূল্যবান নয়?

কারও কারও জীবনের দাম কোটি কোটি টাকা হতেই পারে। কিন্তু সকলের জীবনের দাম তো এক নয়।

আপনার জীবনের দাম কত বলে আপনার মনে হয়?

হাসালেন। আমার কাছে এখন জীবনের দাম কানাকড়িও নয়। কিন্তু গায়ে পড়ে আপনি এত কথা বলছেন কেন? আপনি তো জাস্ট একটা খবর দিতে এসেছেন, তার বেশি তো কিছু নয়।

হ্যাঁ, তাই। তবে আমি তো যন্ত্র নই, মানুষ। আর সেজন্যই আমার কিছু প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। মানবিক প্রতিক্রিয়া। আর আমার ধারণা, মাত্র পঁয়ত্রিশ লাখ টাকার জন্য একজন এরকম তরতাজা মেয়েকে মরতে দেওয়া যায় না।

থ্যাঙ্ক ইউ। কিন্তু আপনার তো করণীয়ও কিছু নেই। এবার দয়া করে যাবেন কি?

যাব। তবে আমার একটা প্রস্তাব আছে।

কী প্রস্তাব?

এই পঁয়ত্রিশ লাখ টাকা যদি অ্যারেঞ্জ করা যায়?

সেটা কীভাবে সম্ভব?

যদি সম্ভব হয়?

লোন? না, ধার শোধ করার ক্ষমতা আমার নেই। কেন অসম্ভব সব চিন্তা করছেন? আমি আর স্বপ্নের জগতে বাস করি না। এই মামলাটা জিতলে হয়তো সামলে উঠতাম। কিন্তু মামলাটাই আমাকে শেষ করে দিয়েছে। এখন শূন্যতা ছাড়া আমার সামনে আর কিছু নেই।

আপনার সামনে জীবনটা তো আছে।

ওসব ভাবের কথা। আমার সামনে জীবন বলে কিছু নেই।

মাত্র পঁয়ত্রিশ লাখ টাকার যে এত শক্তি তা আমার জানা ছিল না।

এবার জানুন।

শুনুন, এই টাকাটা কিন্তু অ্যারেঞ্জ করা যাবে। লোন নয়। যদি লোন বলে মনে করেন তাহলেও সুদ লাগবে না। শোধ দেওয়ারও কোনও টাইম লিমিট থাকছে না।

তাই নাকি? এমন মহান মানুষ কোথায় পাবেন?

মহাট-টহান নয়। কারও কারও টাকা খামোখা পড়ে আছে, কোনও কাজে লাগে না।

কাজে লাগবে না কেন? জমে থাকা টাকাও সুদে বাড়ে, কিংবা ব্যাংকের মাধ্যমে নানা উন্নয়নে কাজে লাগে।

তা তো বটেই। কিন্তু কোনও টাকা যদি কারও প্রাণরক্ষায় লাগে তাহলে সে টাকা ভাগবৎ টাকা হয়ে যায়। তাই না? আমার মনে হয়, ঈশ্বর আমাদের মরার জন্য পৃথিবীতে পাঠান না।

আপনি তো বেশ ভালো মানুষ! জীবনে অনেক কষ্ট পাবেন।

তা পাবো। কষ্ট এখনও পাচ্ছি। আপনার জন্য। প্লিজ একটু পজিটিভ ভাবনা ভাবুন। টাকা অ্যারেঞ্জ করার ভার আমি নিচ্ছি।

দাঁড়ান। টাকাটা কীভাবে অ্যারেঞ্জ করবেন তা আমার জানা দরকার।

না শুনলে নেবেন না?

না। কিছুতেই না।

তাহলে তো বলতেই হয়। আসলে টাকাটা আমারই।

আপনার টাকা! কোথায় পেলেন এত টাকা?

পৈতৃক সম্পত্তি। আমার এলেম খুব বেশি নয়। বাবার জোরেই আমার যা কিছু জোর।

তা হয় না। আমি আপনাকে এখনও চিনি না।

চেনেন বইকি। লোককে দেখে, কথা কয়েওতো খানিকটা চেনা যায়।

তা যায়। কিন্তু সেটুকু যথেষ্ট নয়।

তাহলে শুনুন। দাশগুপ্ত অ্যাসোসিয়েটেডের সিনিয়র পার্টনার অভিরূপ দাশগুপ্ত আমার বাবা। আমি কোম্পানির কর্মচারী এবং সদ্য জুনিয়র পার্টনারও হয়েছি।

ওঃ, আপনি তো বড়লোক।

নাঃ, তবে আমার বাবার টাকা আছে বটে।

এ প্রস্তাবের কথা শুনলে আপনার বাবা আপনাকে ত্যাজ্যপুত্র করবেন।

ভুল ভেবেছেন। গত পাঁচ বছর ধরে আমাদের কোম্পানি আপনার মামলা লড়ছেন। আজ অবধি আপনাকে মামলার খরচ বাবাদ কোনও বিল পাঠানো হয়নি। কেন জানেন? আমার বাবা জানেন, বিল মেটানোর সাধ্য আপনার নেই। তবে মামলাটা জিতলে আপনি যে বিল মিটিয়ে দেবেন সেটা বাবা বিশ্বাস করেন। কিন্তু মামলাটায় হার হয়েছে। সুতরাং টাকাটা আমরা পাব না বলেই ধরে নিয়েছি।

করুণা করছেন? করুন। আমি তো করুণারই পাত্রী।

আমাকেও এবার একটু করুণা করুন। দয়া করে প্রস্তাবটা মেনে নিন।

কী করে মানব? পঁয়ত্রিশ লাখ টাকা শোধ দেব কী করে?

অস্তিবাচক চিন্তা করলে পারা যায়।

কী ভাবে?

আমার বাবার খুব ইচ্ছে ছিল ভাগ্য বিড়ম্বিত হয়েও আপনি যে জেদ এবং আত্মপ্রত্যয় দেখিয়েছিলেন সেটাকে ক্যাপিটালাইজ করা। তিনি চান, আপনি আমাদের কোম্পানিতে জয়েন করুন।

জয়েন করব? পাগল নাকি? আমি ফিলজফিতে এমএ। কোনও ল ফার্মে ঢোকার যোগ্যতাই আমার নেই।

ডিগ্রিগত যোগ্যতা অনেকেরই আছে। কিন্তু মানুষ যে কখনও কখনও অসাধারণ মানসিক যোগ্যতা দেখায় সেটা দুর্লভ। বাবা চান আপনি আমাদের কোম্পানির কো-অর্ডিনেটর হিসেবে কাজ করুন। এটা কিন্তু করুণা নয়। বরং আমরা আপনাকে পেলে নিজেদের ভাগ্যবান মনে করব। আর আপনার লায়াবিলিটিজগুলো নিয়ে ভাববেন না, উই উইল সর্ট ইট আউট। হাসছেন? হাসছেন কেন?

আচ্ছা, আপনার মতলবখানা কী বলুন তো। মামলায় যে আমি হারব তা আমার জানাই ছিল। তার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু সেই খবরটা দিতে এসে আপনি আমাকে দুর্বল করে দিচ্ছেন কেন?

আমি একটু নিজের কথা বলব কি? শুনবেন?

বলুন।

বাবা ভাবেন আমি দুর্বলচিত্ত ছেলে। সেটা আমিও স্বীকার করি। বিপদে পড়লে সহজে ঘাবড়ে যাই। সংকট মোকাবিলা করতে পারি না। আমার বা আমাদের সামনে একজন লড়াকু মানুষ রাশ হাতে নিলে এবং দায়িত্ব বহন করলে আমরা ইনসপায়ারড হব বলে আমার বাবা মনে করেন। এর মধ্যে কোনও মামলা নেই। আর আপনি তো দুর্বল নন। এই যে মরবার তোড়জোড় করছিলেন সেটাও দুর্বলতার বশে নয়। আসলে আত্মমর্যাদার প্রশ্নেই আপনি এরকম মারাত্মক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আপনাকে আমি দুর্বল মনে করি না।

ঠিক আছে। ভেবে দেখি।

না, আপনাকে ভাববার সময় দেওয়া ঠিক হবে না। আমার সঙ্গে গাড়ি আছে। আপনি এখুনি আমার সঙ্গে চলুন।

দাঁড়ান মশাই, দাঁড়ান। চা খেতে চেয়েছিলেন তা মনে আছে?

হ্যাঁ।

আগে এক কাপ চা খান। আমি ততক্ষণে তৈরি হয়ে নিই।

হ্যাঁ হ্যাঁ, তা তো বটেই।

ভয় নেই, মরব না, সহজে কেউ মরতে চায় বলুন!
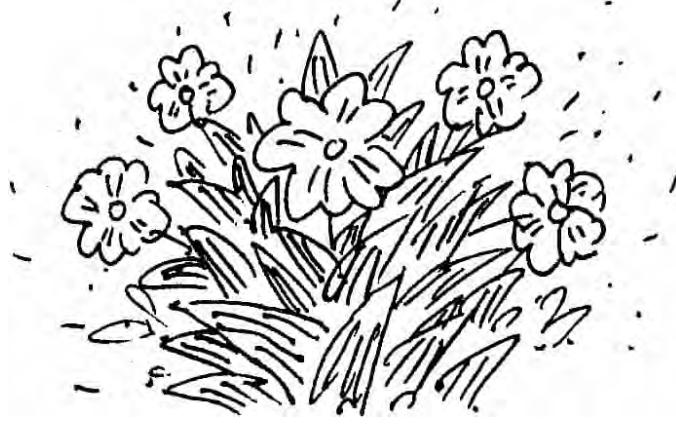
# চিকিৎসা

আচ্ছা মোহনবাবুর বাড়িটা কোথায় বলতে পারেন?

বছর পাঁচেক আগে হলে পারতুম। এখন আর পারি না।

কেন মশাই, কেন? মোহনবাবু কি এখন আর এখানে থাকেন না?

তা কে জানে মশাই, থাকতেও পারেন। তবে কিনা আজকাল আর আমার কিছুই মনে থাকে না। নাম, ঠিকানা সবই বড় ভুলে যাই। এই তো আজ সকালে পুঁই শাক আনলুম, কুমড়ো কিনতে ভুলে গেলুম, চিঠি পোস্ট করা হয়নি, গদাধরকে খবর দেওয়ার কথা ছিল, সে কথাই মনে পড়ল না।

কিন্তু আপনাকে তো তেমন বয়স্ক লোক বলে মনে হয় না। বড় জোর চল্লিশ-বিয়াল্লিশ। এ বয়সে তো স্মৃতিভ্রংশ হওয়ার কথা নয়!

না মশাই, বয়স আমার আরও কিছু কমই। যত দূর মনে আছে, আমার হিসেবমতো বয়স এই সাঁইত্রিশ হল।

আরে, তাহলে তো আপনি ইয়ং ম্যান। এ বয়সে এত ভুলভাল হচ্ছে কেন মশাই, আপনার? কোনও শক্ত অসুখ-টসুখ হয়েছিল নাকি?

উহুঁ। ছেলেবেলায় টাইফয়েড হয়েছিল একবার। কিন্তু তার পর থেকে তেমন যমে-মানুষে টানাটানির মতো অসুখ হয়নি। জলবসন্ত, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ম্যালেরিয়া আর আমাশা ছাড়া তেমন গুরুতর কিছু হয়নি কখনও। তবু আজকাল স্মৃতিশক্তি ঠিকমতো কাজ করছে না।

তাহলে তো আপনার বেশ মুশকিল যাচ্ছে!

মুশকিল বলে মুশকিল। বাড়িতে এ নিয়ে সবাই দু-পাঁচ কথা শোনাতেও ছাড়ছে না।

ভুলভাল আমাদের সকলেরই অল্পবিস্তর হয়। তার জন্য অপ্রস্তুত হওয়াও বিচিত্র নয়। আমার অবশ্য বয়স হয়েছে।

আপনার বয়স কত?

বাহান্ন পূর্ণ করে তিপান্নয় পড়েছি।

ওই বয়সে বোধহয় আমার মেমোরি ডিস্কের সব ডেটা উড়ে যাবে।

জীবনের উজ্জ্বল দিকগুলোর কথাই আমাদের ভাবা উচিত। আমার তো মনে হয় আপনার স্মৃতির যে বিভ্রম ঘটছে সেটা সাময়িক, কেটে যাবে।

পাঁচ বছর ধরে আমার স্মৃতিশক্তির ক্রম অবনতি ঘটছে। শেয়ার বাজারের দরের মতো তার ওঠা-নামা ঘটছে না, আমি আশাবাদী নই। পাঁচ বছর আগে যদি আপনি জিগ্যেস করতেন মোহনবাবুর বাড়িটা কোথায় তাহলে আমি টক করে দেখিয়ে দিতাম, এখন মোহনবাবু নামে কাউকে আমার মনেই পড়ছে না।

মোহনবাবু অবশ্য বিখ্যাত লোক নন। তবে এই অঞ্চলে আছেন অনেকদিন। তাহলে পাঁচ বছর ধরে আপনার এই সমস্যাটা চলছে।

আজ্ঞে হ্যাঁ। ময়না চলে যাওয়ার পর থেকেই।

ময়না। ময়না পাখির কথা বলছেন কি?

পাখির মতোই উড়ে গেছে বটে, তবে আমি পাখির কথা বলছি না, ময়না একটা মেয়ে।

তাই বলুন, একটা রসাভাষ পাচ্ছি যেন! একটু বসতে পারি কি?

বসুন না বসুন, এই বাইরের বারান্দাটাই বলতে গেলে আমাদের বৈঠকখানা।

হ্যাঁ, ময়নার কথা কী যেন বলছিলেন!

হ্যাঁ, ময়নার কথা, ময়না একটা মেয়ে। বছর দশেক আগে তার সঙ্গে আমার ভাব-ভালোবাসা ছিল। কথা ছিল, বিয়ে হবে। সব একেবারে ছক-বাঁধা ব্যাপারের মতো।

দুই পরিবারে কথাবার্তাও হয়ে গিয়েছিল, কোথাও কোনও গণ্ডগোল ছিল না। জাত, বর্ণ,

গোত্র এমন কি কোষ্ঠি পর্যন্ত বিচার করে বিয়েটা একেবারে অবধারিত বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল।

তবে হল না কেন?

ধীরাজ নামে একটা ছেলে খুব ভালো সাইকেল চালাত। এই শহরে ওরকম সাইকেলবাজ আর কখনও দেখা যায়নি। দু-চাকার একখানা সাইকেলে যত রকম কসরৎ দেখানো যায় সবই ছিল ধীরাজের জন্মগত। হাত ছেড়ে বা সিটে উল্টো মুখ করে বসে, বা সাইকেলের শীর্ষে দাঁড়িয়েও সে চালাতে পারত। তিন-চার ধাপ সিঁড়ি সে সাইকেল চালিয়েই উঠে পড়তে পারত। আমাদের এই বারান্দায় সে কতবার সাইকেল চালিয়ে উঠে এসেছে। তাকে বলা হত উইজার্ড। সাইকেল বাহাদুর ধীরাজ নানা প্রতিযোগিতায় ফার্স্ট প্রাইজ পেত। পরে সে ন্যাশনাল মিটেও সাইকেলের চাম্পিয়ন হয়। অলিম্পিকে যাওয়ার ট্রায়ালে সিলেক্টও হয়ে যায়।

এই রে! ময়না ধীরাজের প্রেমে পড়ল বুঝি?

না পড়াই অস্বাভাবিক। এ শহরের বেশির ভাগ মেয়েই তখন ধীরাজ-ঝোঁকা। শহরের হিরো বলতে তো তখনও ও-ই।

তারপর?

ময়নার একটা স্বভাব ছিল, সে আমাকে একটা সুপারম্যান বানানোর চেষ্টা করত। বলতে কী, তাকে খুশি করতেই আমি আমার প্রিয় বিষয় দর্শনশাস্ত্র না পড়ে ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ভর্তি হই এবং ময়নার মুখে হাসি ফোটানোর জন্যই কষ্টেসৃষ্টে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্টও হতে হয়। ময়না চাইত বলে আমি রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখি এবং এমন কী ব্যায়ামের ক্লাসে ভর্তি হয়ে মাসল ফুলিয়ে ফেলতেও হয়েছিল। শুধু কি তাই, সুন্দর দেখানোর জন্য সে আমাকে মাঝে মাঝেই বিউটি পার্লারে নিয়ে যেত এবং নানাবিধ পরিচর্যায় বাধ্য করত।

বলেন কী মশাই! আমাদের বউরা তো...যাক গে, বলুন।

শেষ অবধি সে আমাকে এসে ধরে পড়ল, তুমি ধীরাজের ক্যারিশমার কাছে হেরে যাবে এটা আমি সহ্য করতে পারছি না। তুমি সাইকেল প্র্যাকটিস করো, ধীরাজকে হারাতেই হবে।

আজ্ঞে হ্যাঁ, অত কঠিন সমস্যা। কিন্তু ময়নার কোনও আব্দার তো আমার পক্ষে উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না। সুতরাং একটা দামি রেসিং সাইকেল কিনে আমাকে তাতে সওয়ার হতে হল। জোরে চালাতে গিয়ে কতবার যে ছোটখাটো অ্যাক্সিডেন্ট হল তা বলার নয়। হাত ভাঙল, হাঁটুতে চোট হল, নাক থ্যাবড়া হয়ে গেল, শেষ অবধি কিন্তু নিষ্ঠা এবং অধ্যবসায়ের ফলে আমি বেশ ভালো সাইকেলবাজ হয়ে উঠলুম। তা বলে

ধীরাজের ধারেকাছেও নয়। ধীরাজ ছিল আমার খুব বন্ধু, কিন্তু তার কাছে টিপস নিতে ময়না আমাকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছিল। বলেছিল, ওকে শত্রু বলে না ভাবলে তুমি ওকে হারাবে কী করে?

এ তো খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার মশাই।

হ্যাঁ, কিন্তু ধীরাজ যে সার্কিটে রেস করতে নামে সেখানে আমার পক্ষে ঢোকাই মুশকিল, সুতরাং তাকে হারানোর সুযোগ কোথায় আমার? তা বলে ময়নাও হারবার পাত্রী নয়। ক্রমাগত তা না করার ফলে আমি অনেক ধরে করে অবশেষে দিল্লিতে একটা ইন্টার সিটি মিটে নাম দেওয়ার জন্য সিলেক্টও হই। সেই মিটে একটা দূরপাল্লার রেসে ধীরাজের সঙ্গে আমার পাল্লা দেওয়ার পালা অবশেষে এল।

দিলেন নাকি ধীরাজকে হারিয়ে?

তা দিলাম।

বলেন কী মশাই? হারিয়ে দিলেন?

সেটাই তো দুঃখের কাহিনী মশাই, ধীরাজ তখন জাতীয় চ্যাম্পিয়ন, তাকে হারায় এমন বাপের ব্যাটা কে? কিন্তু ময়না বলে রেখেছে, এই একটা মাত্র সুযোগ, যদি ধীরাজকে না হারাতে পারি তবে সে আত্মঘাতী হবে।

ওরে বাবা!

তাই ময়নার জন্যই জীবনে প্রথম মিথ্যাচার করতে হল মশাই, ধীরাজকে গোপনে সব খুলে বললাম। ধীরাজ আদ্যন্ত স্পোর্টসম্যান, পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলল, কুছ পরোয়া নেই। তুই আমাকে নিশ্চয়ই হারাবি। ধীরাজ হারল কিন্তু সেই রেসটায় আমিও জিতিনি। আমি হলাম পঞ্চম আর ধীরাজ সপ্তম।

আহা, তাতে কী? ধীরাজ তো হারল। ময়না খুশি হয়নি?

কই আর হল। খুব রেগে গিয়ে বলল, ধীরাজকে যখন হারালে তখন অন্যদের হারাতে পারলে না কেন? সে কী রাগ! কেঁদে কেটে একশা।

আর ধীরাজ!

ধীরাজ আমাকে বাঁচানোর জন্য সেই যে হারে, তাতে তার অলিম্পিকে যাওয়াও কেঁচে যায়। শেষ অবধি গিয়েছিল বটে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে কিন্তু সুবিধে করতে পারেনি। আর কেমন করে যেন আমার কাছে ইচ্ছে করে তার হেরে যাওয়ার কথাও ময়নার কানে পৌঁছোয়।

তারপর? বলুন মশাই!

ময়না শুধু একবার এসে ঠান্ডা চোখে আমার দিকে চেয়ে বলেছিল, সব সত্যি? আমি জবাব দিতে পারিনি। ময়না চলে গেল। আর আসেনি।

কিন্তু গেল কোথায়?

ধীরাজের সঙ্গে, আমার ওপর প্রতিশোধ নিতেই তার এই ব্যবস্থা। এখন বিদেশে কোথায় যেন আছে। সাইকেল কোচ হিসেবে মালয়েশিয়া না ফিলিপিন্স কোথায় যেন থানা গেড়েছে।

আর আপনি ডিমেনশিয়ায় জবুথবু হয়ে বসে আছেন। দূর মশাই,ময়না আর ধীরাজ তো আপনাকে বাঁচিয়ে দিয়ে গেছে। আপনার তো ফূর্তি হওয়ার কথা।

অ্যাঁ!

হ্যাঁ মশাই, হ্যাঁ। ময়নার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধলে আপনাকে যে আরও সাত ঘাটের জল খাওয়াত মেয়েটা, সেটা বুঝলেন না? মেয়েদের বায়নাক্কার কি শেষ আছে? হয়তো এর পর ধরে বসত, তোমাকে এভারেস্টে উঠতে হবে। কিংবা ইংলিশ চ্যালেন পেরোতে হবে, কিংবা বক্সিং-এ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হতে হবে।

হ্যাঁ হ্যাঁ, সেইরকমই একটা স্বভাব ছিল বটে ওর। কিন্তু তবু...

দূর দূর মশাই, ওরকম একটা লেডি ম্যাকবেথের জন্য জীবন নষ্ট করতে আছে? বিয়ের আগেই যা হেনস্থা হতে হয়েচে আপনাকে, বিয়ে করলে তো টসকে যেতেন মশাই, জীবনে শান্তি বলে কিছু থাকত না।

অ্যাঁ!

আপনার দর্শন কেড়ে নিয়েছে, শান্তি কেড়ে নিয়েছে, সততাকে ত্যাগ করতে বাধ্য করেছে এবং তারপর চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতা করে ধীরাজকে বিয়ে করেছে...ছিঃ ছিঃ...

অতটা বলা কি ঠিক হচ্ছে? আমি যে এখনও...

না মশাই, না। আপনি এখনও ওকে ভালোবাসেন বলে যা মনে হচ্ছে আপনার ওটা হচ্ছে নিজের মনের একটা অটো সাজেশন। ওটা ভালোবাসা নয়। ওই যে সবুজ গাড়িটা রাস্তায় পার্ক করা আছে, দেখতে পাচ্ছেন?

হ্যাঁ। ভারি সুন্দর গাড়ি, ওপেল, রংটাও ভারি ভালো।

গাড়ির পিছনের জানালায় দেখতে পারছেন...

হ্যাঁ, একজন সুন্দরী যুবতী।

ও আমার ছোট মেয়ে।

আপনার মতো মুখশ্রী।

তা তো হবেই, আমার মেয়েটা ভারি দুঃখী, আপনার মতোই, যার সঙ্গে বিয়ে হবে বলে সব ঠিক ছিল সে আমেরিকায় গিয়ে আর একজনের সঙ্গে ঝুলছে। খুব ভেঙে পড়েছে মেয়েটা।

না, না, এ তো খুব অন্যায়!

অন্যায়ই তো! মেয়েটার এখন সাইকোলজিক্যাল প্রবলেম চলছে, অনেকটা আপনার মতোই, সব ভুলে যায়, নিজের ঘরে চুপ করে বসে থাকে শুধু, সাজে না, টিভি দেখে না, শপিং করে না।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমিও তো ওইরকমই।

সেইজন্যই মোহন ভট্টাচার্যের কাছে নিয়ে যাচ্ছিলাম। শুনেছি মস্ত জ্যোতিষী, যদি কিছু নিদান দেন।

মোহন ভটচায! আরে দূর, ও তো একটা ফ্রড, লোককে ভয় দেখিয়ে পাথর বেচে পয়সা লোটে।

তাই নাকি? তা আপনার নেম প্লেটে দেখছি আপনারা বোস, তাই নাকি?

হ্যাঁ।

আমরা পাল্টি ঘর, ঘোষ। তা আপনারা দুই ভগ্নহৃদয় নর-নারী যদি একটু নিজেদের মধ্যে কথা কন তাহলে কেমন হয়?

সেটা কি ভালো হবে।

সাইকিয়াট্রিস্ট বা জ্যোতিষীর চেয়ে খারাপ হবে কেন? অন্তত দুজন তো দুজনের রোগ-লক্ষণ চিনবেন!

কিন্তু আমি যে আজ দাড়ি কামাইনি।

তাতে আপনাকে কিছু খারাপ দেখাচ্ছে না, গায়ে একটা জামা চড়িয়ে নেমে আসুন তো!

এই যাচ্ছি।

# প্রবন্ধ। খেলা

# সব দেশ ক্রিকেট খেললে আমরা হয়তো হালে পানি পেতাম না

বিশ্বকাপ আমাদের দেশে একটা নতুন উন্মাদনার সঞ্চার করেছে, সন্দেহ নেই। তার কারণ, এ-দেশে বিশ্বসেরা প্রতিযোগিতাগুলো কোনওটাই হয় না।

ওলিম্পিক বা ফুটবলের বিশ্বকাপ আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। ক্রিকেটের বিশ্বকাপ তবু মন্দের ভালো। যদিও বিশ্বের সব দেশ ক্রিকেট খেললে এই বিশ্বকাপের চেহারা সম্পূর্ণ অন্যরকম হত, এবং আমরাও হয়তো হালে পানি পেতাম না। ইংরেজদের এই খেলা তাদেরই। উপনিবেশগুলোর মাধ্যমে যে-কটি দেশে ছড়িয়ে গিয়েছিল, সেই কটি মুষ্টিমেয় দেশ নিয়ে এই বিশ্বকাপ। প্রকৃত অর্থে, একে বিশ্বকাপ হয়তো বলা যাবে না। তবু ক্রিকেট-বিশ্বের এটাই সেরা উন্মাদনা।

আমরা চিরকাল টেস্ট খেলাকেই প্রকৃত ক্রিকেট খেলা বলে জেনে এসেছি। এ ছাড়া কিছু অপ্রধান, তিনদিনের আঞ্চলিক খেলা চালু ছিল বটে, কিন্তু সেগুলোর তেমন গুরুত্ব ছিল না। কিন্তু একদিনের ম্যাচ হঠাৎ আবিষ্কৃত হয়ে ক্রিকেটের গোটা খোলনলচেই বদলে দিল। এখন একদিনের ম্যাচ ক্রমশ টেস্ট ক্রিকেটকে অপসারিত করে দেওয়ার চেষ্টা করছে। বিদেশের টেস্ট-ক্রিকেট যখন টিভিতে দেখায়, তখন

দর্শকশূন্য গ্যালারিগুলো দেখে ভারী মায়া হয়। বুঝতে পারি, টেস্ট-ক্রিকেটের কদর কমছে। কারণ পাঁচদিন ধরে একটি খেলা দেখার ধৈর্য, সময় বা পয়সা অনেকেরই থাকে না। উন্নত দেশগুলিতে মানুষের সময়াভাব আরও বেশি।

কিন্তু একদিনের ক্রিকেট সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। আগাগোড়া টানটান, উত্তেজক, বাহুল্যবিহীন, আদ্যন্ত পেশাদার মানসিকতার খেলা। এই খেলায় কখন কী ঘটে যায়, তা আগেভাগে বলে দেওয়া সম্ভব নয়। একই দিনে ৫০০ বা ৬০০-র কাছাকাছি রান, ১৫টা বা ২০ টা উইকেটের পতন টেস্ট ক্রিকেটে সম্ভব নয়। টেস্ট ক্রিকেটে যে উত্তেজক মশলার অভাব ছিল, একদিনের ক্রিকেট সেটাই সঞ্চার করেছে।

বিশ্বকাপ আমাদের মাটিতে এক দুর্লভ সুযোগ নিয়ে আসছে বটে, কিন্তু তিন দেশের খেলায় সে-সুযোগ খানিকটা ভাগাভাগি হয়ে যায়। ভারতের মাটিতে এটা দ্বিতীয় বিশ্বকাপ। সুতরাং খুব নতুন কিছু নয়। কিন্তু এই ক্রিকেটকে অবলম্বন করেই সমগ্র দেশটার মধ্যে একটা মৃদু জাগরণ লক্ষ করতে পারি। ইংল্যান্ডে যে ভারতীয় দল বিশ্বকাপ জয় করেছিল, তার কোনও খেলোয়াড়ই আজ ভারতীয় দলে নেই। কত দ্রুত ক্রিকেটের 'জেনারেশন' বদলে যাচ্ছে। শারীরিক সক্ষমতা, দক্ষতা, 'রিফ্লেক্স' ইত্যাদিতে একেবারে তুঙ্গে না থাকলে এ-যুগে দলে টিকে থাকা মুশকিল। অলস টেস্ট ক্রিকেটের দিন অবসিত হয়ে মার-কাট প্রতিযোগিতার 'লিমিটেড ওভার' এসে যাওয়ায় খেলোয়াড়দের 'ফিটনেস' কিন্তু অনেক বেড়েছে।

রান-আউট করার সময় শ্রীনাথ যদি পেছন ফিরে না তাকায়, এবং শেষদিকের ওভারে যদি লোফফা বল না করে, তা হলে 'স্টার' হওয়ার সম্ভাবনা তারই। শচীন একাধিক বল দেখতে পাচ্ছে বলে মনে হয়। তাকে এখন একটা বলের দিকেই মনঃসংযোগ করতে হবে। কুম্বলের বল চন্দ্রশেখরের মতোই যদি হয়ে ওঠে, এবং আজহার যদি লাফঝাঁপ না করে খেলে এবং সে যদি রাজুকে টিমে ঢোকানোর জন্য গলা না শুকোয়, এবং সঞ্জয়কে যদি জোর করে টিমে ঢোকানোর চেষ্টা না হয় এবং সিধু যদি তার প্রায় 'ক্রনিক আনফিটনেস' কাটিয়ে ওঠে এবং ফিল্ডাররা যদি মাঠের যে-কোনও প্রান্ত থেকে এক টিপে স্টাম্প ভেঙে দিতে পারে, এবং 'ক্যাচ' যদি জলাঞ্জলিতে না যায়, তা হলে, আমার মতে, ভারতীয় টিম এক, দুই, তিনের মধ্যেই আছে। খুব সম্প্রতি একটি ছেলের বল ও ব্যাট খুব ভালো লাগছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ওটিস গিবসন।

ভালো লাগছে শ্রীলঙ্কার রুমেশ কালুভিথর্নের উইকেটকিপিং ও ব্যাটিং। বেশ খেলছে মার্ক ও'। তবে দক্ষিণ আফ্রিকার খেলা অনেকদিন দেখিনি। মনে হয়, ওয়েস্ট ইন্ডিজের অধিনায়কত্বের একটু সমস্যা রয়েছে। এই টিমের প্রতিভা থাকলেও, তারা সংহত নয়। পাকিস্তানের সমস্যা যে বেশ গভীর, তা বোঝা যায় মিঁয়াদাদকে আবার ডেকে পাঠানো হয়েছে দেখে। ইংল্যান্ডের একমাত্র গ্রেম হিক ছাড়া আর কাউকেই আমি বড়দরের ব্যাটসম্যান বলে মনে করি না।

আর দল হিসেবে শ্রীলঙ্কা প্রায় সব দিকেই প্রভূত উন্নতি করেছে। অরবিন্দ ডিসিলভা, তিলকরত্নে, জয়সূর্য, মহানামা, অর্জুন রণতুঙ্গে এবং মুরলীধরনকে খুবই ভালো লাগছে। পরিষ্কার বলে দিচ্ছি, মুরলীধরনের 'বোলিং অ্যাকশন'-এ কোনও গন্ডগোল নেই। অস্ট্রেলীয় আম্পায়ারদের এ এক পুরোনো চাল।

# ক্রিকেটই তার সর্বস্ব

এ কদিনের ক্রিকেটে ব্যক্তিগত দুশো রানের গণ্ডি টপকানো কখনও অসম্ভবের তালিকায় ছিল না। আনোয়ার, সৌরভ, সচিন নিজেও অনেক আগেই করতে পারত। কিন্তু হয়নি, হয়ে ওঠেনি। এমনকী অস্ট্রেলিয়া সাউথ আফ্রিকার যে-ম্যাচে দুটো টিমই প্রথম চারশো রানের গণ্ডি পেরিয়ে ইতিহাস গড়েছিল, তাতেও ব্যক্তিগত দুশো রানের কৃতিত্ব অর্জন করেনি কেউ। টি-টোয়েন্টি ম্যাচে যখন আজকাল প্রায়ই শতরান হচ্ছে, তখন ডবলেরও বেশি ওভারের খেলায় ব্যক্তিগত দুশো কেউ করেনি কেন, এ ধন্দ আমার অনেকদিনের। তবে জানতাম, কেউ না কেউ সেটা একদিন করবেই। সেই ব্যক্তিটি কে হতে পারে তা অনুমান করতে গিয়ে গিলক্রিস্ট, হেডেন, সহবাগদের কথা মনে হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সাঁইত্রিশ বছর বয়সি সচিনের কথা মনে হয়নি। তার কারণ, সচিন তার দামাল দিনগুলিকে পিছনে ফেলে এসেছে। টি-টোয়েন্টিতে সে দলে নেই। অনেক আগেই গ্রেগ চ্যাপেল সচিনকে ওয়ান ডে থেকে স্থায়ীভাবে ছেঁটে ফেলার প্রবল চেষ্টা করেছিলেন। এবং এখনকার ভারতীয় ওয়ান ডে দল থেকেও তার বাদ যাওয়ার সম্ভাবনা ক্রমে ক্রমে জোরালো হয়ে উঠছিল।

খেলার কথা পরে। খেলার শেষে পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে রবি শাস্ত্রী যখন সচিনকে তার কৃতিত্ব নিয়ে প্রশ্ন করলেন, তখন সচিনের মুখে যে-লজ্জা ও সৌজন্য মেশানো হাসি ফুটে উঠেছিল, তা যেন একটা জানলা খুলে দিল। ভিতরকার নিরহঙ্কারী, শীলিত রুচির, প্রশস্ত হৃদয়ের মানুষটি ফুটে উঠল। আর বারবার নিজের চেয়ে ধোনি, কার্তিক আর পাঠানের প্রশংসাই পেল গুরুত্ব। নিজের কথা বলতে সচিনের বরাবর বড়ই সঙ্কোচ। হয়তো-বা তার বংশধারাতেই এই ব্যাপারটি আছে। টাকাপয়সা, প্রতিষ্ঠা, জনপ্রিয়তা কোনওটাই তাকে বিগড়ে দিতে পারেনি। আর এসবই ফুটে ওঠে তার চোখে, বাক্যে, বিবৃতিতে। মাত্র কিছুদিন আগেই মহারাষ্ট্রে বাল ঠাকরে মরাঠি অস্মিতার যে জিগির তুলেছিলেন, আদ্যন্ত ভারতীয় সচিন সেটি সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করে। সে বলেছিল, সে প্রথমে একজন ভারতীয়, তারপর মরাঠি।

ষোলো বছর বয়সে তার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক। কুড়ি বছরের টানা ক্রিকেট কেরিয়ার। চারশোর বেশি আন্তর্জাতিক ওয়ান ডে খেলা সচিন সেরে ফেলেছে। টেস্ট আর ওয়ান ডে মিলিয়ে তিরানব্বইটা শতরান হয়ে গেছে। শততমও হয়ে যাবে। দু'হাজার এগারো ওয়ান ডে বিশ্বকাপেও সে খেলবে বলে আশা করা যায়। এবং হয়তো তারপরেও সে অবসর নেবে না। এর কারণ অর্থ, খ্যাতি বা আরও মাইলস্টোনের লোভ নয়। আসলে এই খেলাটিকে এত আবেগ নিয়ে খুব কম লোকই সচিনের মতো ভালোবেসেছে। ক্রিকেট তার সর্বস্ব। তাই সচিনের ক্লান্তি নেই, একঘেয়েমি নেই, পরবর্তী প্রজন্মের প্রায় অর্ধেক বয়সি খেলুড়েদের সঙ্গে ড্রেসিং রুম শেয়ার করতে অস্বস্তি নেই। এই অদ্ভুত ক্রিকেটপ্রেম কারও মধ্যে এই আমলে দেখিনি।

ক্রিকেট এখন বর্ণময়, গ্ল্যামারময়, অর্থ এবং পুরস্কারের ভাণ্ডার। এ পোড়া দেশে ক্রিকেটই হচ্ছে মানুষের স্বপ্নপূরণের অবলম্বন। সুতরাং ক্রিকেট যারা খেলে, তাদের জনপ্রিয়তা তুঙ্গে। এই বিপুল অর্থ, যশ, জনপ্রিয়তা পেলে যে-কারও মাথা ঘুরে যেতেই পারে। আনুষঙ্গিক অতিচারও তাই স্বাভাবিক। আর সেই কারণেই নিজেকে ধরে রাখা এক কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়ায়। মুনিদের মতিভ্রম ঘটাতে যেমন দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর সুন্দরী অপ্সরাদের পাঠাতেন, এও প্রায় তেমনই এক মতিভ্রম, স্খলন এবং পতনেরও জগৎ। নিজেকে ধরে রাখা এবং গতি অব্যাহত রাখার জন্য তপশ্চর্যার মতোই সংযমের দরকার হয়। আর সচিনের সেটা আছে। ভীষণভাবেই আছে। আর তাই এখনও একটা মোক্ষম চার বা ছয় মারলে তার মুখে বালকোপম হাসি ফুটে উঠতে দেখি। বড় মালিন্যহীন মনে হয় তার মুখশ্রীকে।

এই ম্যাচটিতে যেমন। টিভি খুলতে একটু দেরি হয়ে থাকবে। যখন খুললাম, তখন আমার অতি প্রিয় ক্রিকেট-চরিত্র সহবাগ বিদায় নিয়েছে। আর সত্যি কথা বলতে কি, সচিনের কথা মনে রেখেও বলছি, সহবাগ আউট হয়ে গেলে মাঠটা যেন খানিকটা বর্ণহীন লাগে। আমরা ধারণা সচিনের সঙ্গে, তার রানের গতি ও রেকর্ডের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার একজন যোগ্য লোক হল সহবাগ। অকুতোভয় এই ব্যাটসম্যান মাঠে বিপজ্জনকভাবেই বাঁচতে ভালোবাসে, তাই যখন-তখন আউট হয়ে গেলেও তার তেমন দৃশ্যমান প্রতিক্রিয়া বা বিষণ্ণতা দেখি না। একজন খেলোয়াড়ের ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত সচিনও তাই। আম্পায়ারের অন্যায় সিদ্ধান্তও তাকে বিচলিত বা উত্তেজিত করেছে কমই। যাই হোক, সচিন খেলছিল। মনে হল, মাঠটা একটু ছোট, আউটফিল্ড দ্রুতগামী এবং ব্যাটসম্যানরা বেশ স্বচ্ছন্দেই খেলছে। সচিনের রান তখন ত্রিশ ছাড়িয়ে গেছে। টয়লেট থেকে ঘুরে আসতে না-আসতেই বোধহয় পঞ্চাশও ছাড়িয়ে গেল। একটু নড়েচড়ে বসলাম। সচিন, তথাকথিত বুড়ো সচিন কি আরও একটা সেঞ্চুরি হাঁকাবে নাকি? সচিনকে একটু বেশি গম্ভীর, বেশি সিরিয়াস আর বেশি মনোযোগী দেখছিলাম। প্রত্যেকটা বলই কেতামাফিক খেলছে। পা যথাযথ বাড়িয়ে এবং ব্যাটের ঠিক মাঝখানটা দিয়ে। আর মারের জোরটাও যেন একটু বেশি। সেঞ্চুরিটা লহমায় হয়ে যাওয়ার পর মনে হচ্ছিল, সচিনকে যেন টাইম মেশিনে দশ বছর পিছিয়ে গিয়ে দেখছি। এ যেন আজকের সচিন নয়। সেই সাঁইবাবার মতো ঝাঁকড়া-কোঁকড়া চুলওলা, রোগাটে বাইশ-তেইশের ছোকরা। না, শুধু সেই যুবকটিও নয়, তার সঙ্গে যেন ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে প্রবীণ, বিবেচক, ঠান্ডা মাথার, ধৈর্যশীল সচিনও। যে-বলটি হাঁকড়ানো

যাচ্ছে না সেটিকে গতিবেগের ওপরেই আলতো ছোঁয়ায় সীমানার বাইরে পাঠাচ্ছে। কালিস দিশাহারা, প্রতিপক্ষ এগারো জনই থতমত।

সেঞ্চুরির পর সচিনের খেলা দেখে মনে হল সে যেন ক্রিকেটের অধ্যাপক। ক্লাস নিচ্ছে। এত বিবেচনা, এত বুদ্ধিমত্তা এবং ক্রিকেটজ্ঞান আর কারই বা আছে! ক্যাপ্টেন হিসেবে সচিনের ভূমিকা ছিল নড়বড়ে। কিন্তু এ যে প্রয়োগসিদ্ধ, ত্রুটিহীন একজন পারফর্মার। এবং ব্যাকরণসর্বস্ব খেলাতেও সে সৃজনশীল।

তার একশো চুয়ান্ন রানের মাথায় কিছুক্ষণের জন্য উঠে যেতে হয়েছিল। যখন ফিরে এলাম তখন চোখ কচলে দেখি একশো বিরানব্বই। তখনই মনে হল, সচিন স্থিতধী এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সচিন কিছুতেই ভুল করবে না। যদিও তখন ছয়ছত্রখান হয়ে যাওয়া দক্ষিণ আফ্রিকার মনোবলহীন জোলো বোলিংকে প্রায় ছিন্নভিন্ন করছিল ধোনি। কিন্তু সেই ধুন্ধুমার দেখেও সচিন উদ্বুদ্ধ হল না। ওভার কমে গেছে, বলও আর বেশি বাকি নেই, তবু সচিন একটি একটি রান নিয়ে পৌঁছে গেল একশো নিরানব্বইতে। মাঝখানে ধোনির আরও কিছু ধুম-ধাড়াক্কা। সচিনের পালা অবশেষে এল। এবং খুব শান্তভাবে অফ স্টাম্পের বাইরের বলটিকে ঠেলে দিয়ে ইতিহাস হয়ে গেল সচিন। দুশো। দুশো ভবিষ্যতে আরও কেউ কেউ করবে। সহবাগ বা আর কেউ। তবে সাঁইত্রিশ বছর বয়সে, কুড়ি বছর টানা খেলে যাওয়ার ধকল সামলে আর কেউ তা পেরে উঠবে বলে কল্পনা করা শক্ত। আর যার-তার বিরুদ্ধে তো নয়, দক্ষিণ আফ্রিকার মতো এক জবরদস্ত প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে!

শেষে সবিনয়ে একটি কথা। আজকাল সচিনের প্রসঙ্গে মাঝে মাঝে ডন ব্র্যানম্যানের তুলনা এসে পড়ছে। তুলনাটা কিন্তু অনাবশ্যক। মনে রাখতে হবে শিরস্ত্রাণ, চেস্ট গার্ড, আর্ম গার্ড ছাড়াই অনাধুনিক গ্লাভস আর প্যাড পরে ডন মাত্র বাহান্ন টেস্টে উনত্রিশটি সেঞ্চুরি করেন। সেই রেকর্ড ভাঙতে গাওস্কর বা সচিনকে অনেক টেস্ট খেলতে হয়েছে। এবং ডনের অ্যাভারেজের ধারেকাছেও কেউ নেই। তবে ডনের সঙ্গে তুলনায় না এলেও সচিনের মহিমা বা গৌরব এতটুকুও কমে না। এ কথা এখন আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ভারতীয় ক্রিকেটের অবিসংবাদী কর্তৃত্ব তারই হাতে। আধুনিক ক্রিকেটে তো সচিনই সম্রাট!

## উদ্ভাসিত মহিমা

ঠিক এরকমটা বড় একটা দেখা যায় না। একটি খেলাকে জীবনের প্রায় সর্বস্ব করে নেওয়ার এই প্রবণতা প্রায় নজিরবিহীন। সচিন তেন্ডুলকরের শ্বাস-প্রশ্বাস, বেঁচে থাকা, জীবন দর্শন, আদর্শ, অনুপ্রেরণা ও প্রেম—সবই ক্রিকেট, ক্রিকেট আর ক্রিকেট। দুনিয়ায় এইরকম ক্রিকেট-প্রেমী আর কেউ আছেন কিনা জানি না, তাই সচিনকে নিয়েই আমার বিস্ময়। একই খেলা খেলতে খেলতে মানুষের একঘেয়েমি আসে, মোটিভেশন আলগা হয়ে যায়, জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্র তাকে আকর্ষণ করে, পরিবার-পরিজনের জন্য সময় দেওয়ার প্রয়োজন হয়, অন্যান্য বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ বাড়ে এবং বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শরীর ও মনের ক্লান্তিও কাজ করতে থাকে। সচিনের জীবনে ক্রিকেট ছাড়া আর কোনও বিষয়ই তেমন গুরুতর হয়ে উঠল না। এরকম একলব্যীয় সাধনার কোনও তুলনাও তো নেই!

তবে ক্রিকেটকে সচিন যেমন মহিমান্বিত করেছেন তেমন ক্রিকেটও সচিনকে করেছে এক মহান ব্রতচারী। বহুকালের মধ্যে এমন ক্রিকেট-সাধকের দেখা আমরা পাইনি। পঞ্চাশতম টেস্ট সেঞ্চুরির স্বল্পকাল আগেই তিনি বেশ পরিণত বয়সেই একদিনের ক্রিকেটে এতকালের অধরা অনন্য দ্বিশতরানের ইনিংসটিও খেলে ফেলেছেন। সচিনের যা বয়স, সেই বয়সে বেশির ভাগ খেলুড়েই 'অনেক হয়েছে' বলে খেলা ছেড়ে দিয়ে ভিন্নতর ক্ষেত্রে বিচরণের জন্য কোমর বাঁধে। কিন্তু সচিনের যেন ক্রিকেটের পরে 'আর কিছু নেই' গোছের একটা মনোভাব। আর এই মনোভাবই তাঁকে ক্রিকেট থেকে আরও বহুকাল বিরত করবে না।

পঞ্চাশতম টেস্ট সেঞ্চুরি এল সেঞ্চুরিয়নে, দক্ষিণ আফ্রিকায়, দ্রুত উইকেটে এবং বিশ্বের দ্রুততম বোলিং-এর বিরুদ্ধে। কৃতিত্ব হিসেবে অভিনন্দনযোগ্য, কিন্তু ম্যাচটি ভারত হেরেছিল। ফলে, বিনীত মরাঠি যুবক কবুল করেছেন, না জিতলে কোনও রেকর্ডই তাঁর কাছে স্বাদু নয়।

তা হোক, তবু এই বিরলতম, বিস্ময়কর কীর্তির পর সারা ক্রিকেট-বিশ্বই সচিন বন্দনায় অকৃপণ ধারাবর্ষণ করেছে। এমনকী, অস্ট্রেলিয়ায়, যেখানে ডন ব্র্যাডম্যান ঈশ্বরতুল্য শ্রদ্ধা পেয়ে থাকেন, সেখানেও গণভোটে সচিনকে ব্র্যাডম্যানের উপরে স্থান দেওয়া হয়েছে। সচিন বাস্তবিক ব্র্যাডম্যানের চেয়েও বড় ক্রিকেট খেলোয়াড় কিনা, এই প্রশ্নটির ঠিক মীমাংসা হয়নি। ভারতীয়রা চাইবেনই সচিনকে ব্র্যাডম্যানের চেয়েও বড় ক্রিকেটারের শিরোপা দেওয়া হোক। কিন্তু সেখানে একটা স্থায়ী প্রশ্ন থেকেই যায়, তা হল ব্র্যাডম্যানের নজিরবিহীন রেকর্ড। ভদ্রলোকটি ক্রিকেটের মাত্র একটি সংস্করণই খেলেছেন, সেটা হল টেস্ট ক্রিকেট। তখন পঞ্চাশ ওভার বা কুড়ি ওভারের খেলা ছিল না। খেলা হতও খুব কম। বিশ্বযুদ্ধের কারণে বেশ কয়েকবছর খেলা বন্ধও ছিল। তার চেয়েও বড় কথা, মাত্র বাহান্নটি টেস্ট খেলে তিনি উনত্রিশটি সেঞ্চুরি করেছিলেন, তাও আবার বডিলাইন বোলিংসহ বিশ্বের দ্রুততম বোলিং আক্রমণের বিরুদ্ধে! হেলমেট বা চেস্ট-আর্মগার্ডসহ অত্যাধুনিক নিরাপত্তা-ব্যবস্থাও তখন ছিল না। সুনীল গাওস্কর হেলমেট পরতেন না, স্কাল্পগার্ড পরতেন বলে জানি। কিন্তু ব্র্যাডম্যানের রেকর্ড ভাঙতে তাঁকে অনেক বেশি সংখ্যক টেস্টম্যাচ খেলতে হয়েছে, সচিনেরও তাই।

ব্র্যাডম্যান-বিরোধী বেশ কিছু ক্রিকেটার ছিলেন এবং এখনও দু'-একজন অবশিষ্ট আছেন, যাঁরা মনে-প্রাণে চান ব্র্যাডম্যানের রেকর্ড কেউ একজন ভেঙে দিক। তাঁদেরই একজন সচিনের কথা শুনে খুব উদ্দীপ্ত হয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, আচ্ছা, ও কি হেলমেট পরে খেলে? খেলে শুনে নিভে গিয়ে বলেছিলেন, ওহ, তাহলে আর কী করে ও ব্র্যাডম্যানের রেকর্ড ভাঙবে? কথাটা হল, ব্র্যাডম্যানকে হারিয়ে দিতে হলে ঠিক যে-পরিস্থিতিতে তিনি খেলতেন, সেই পরিস্থিতিতেই খেলতে হবে। মাথার দিকে ধেয়ে আসা আশি-নব্বই মাইল গতির লাফানো বল সামলানো তো চাট্টিখানি কথা নয়।

তা বলে সচিনের মহিমা কিছু ম্লান হয় না। সচিন যে-যুগে খেলছেন, সে-যুগে পরিস্থিতি আলাদা। আর তিনি তো ব্র্যাডম্যানের সঙ্গে পাঙ্গা দিতে নামেননি, তিনি ক্রিকেট খেলছেন এক আগ্রাসী ভালোবাসা নিয়ে। দুরন্ত আবেগ না থাকলে এই বয়সে এমন উচ্চতম সুষমায় মণ্ডিত শিল্পসম্মত ক্রিকেট খেলাই যায় না। তাঁর সঙ্গে যাঁরা শুরু করেছিলেন, তাঁরা অধিকাংশই আজ ক্রিকেট থেকে অনেক দূরে। দ্রাবিড় বা লক্ষ্মণ আছেন বটে, কিন্তু স্বমহিমায় নেই। কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেটে চল্লিশের কাছাকাছি বয়সের সচিন এখনও অপ্রতিদ্বন্দ্বী এবং উজ্জ্বলতম। শুধু সহবাগকে একটু আলাদা রাখছি। এই সৃষ্টিছাড়া সহবাগ বিশ্ব-ক্রিকেটের এক বিস্ময়। তাঁকে ভয় পান না বা সমীহ করেন না, এমন বোলার দুনিয়ায় নেই। তিনি একমাত্র ভারতীয় ক্রিকেটার যিনি ট্রিপল সেঞ্চুরি করেছেন। তাও দু'বার। সচিন এখনও করেননি, আশা করা যায় ক্রিকেট ছাড়ার আগে তিনি সেটিও করে ফেলবেন। তাঁর ভিতরে এখনও টগবগ করছে অফুরন্ত ক্রিকেট।

খেলোয়াড় সচিনকে ভদ্রলোক সচিন বলে চিনতে এতটুকুও কষ্ট হয় না। তিনি যে-খ্যাতি বা স্তুতির মধ্যে বাস করেন, তাতে তাঁর উদ্দীপ্ত হওয়ারই কথা। কিন্তু এক ধরনের স্বভাবসিদ্ধ বিনয় ও দীনতার কোমল লাবণ্য তাঁর মুখেচোখে ও শরীরী ভাষায় সর্বদা প্রকাশ পায়। তাঁর মধ্যে যে বিন্দুমাত্র অহংকার নেই, তা এক লহমায় বুঝতে পারা যায়। এই মানুষটির বোধহয় আত্মবোধ অনেকটাই কম। আর মহৎ শিল্পীর লক্ষণও এটাই।

আবার যখন এই সচিনকেই দেখি বাল ঠাকরের মরাঠি অস্মিতার শাসানিতে বিন্দুমাত্র বিচলতি না হয়ে দৃঢ়কণ্ঠে বলেন যে, তিনি এখনও আগে একজন ভারতীয়, তারপর মরাঠি, তখন শ্রদ্ধায় আমাদের মাথা নত হয়ে আসে।

বয়স যা-ই হোক, সচিন এখনও ক্রিকেটের মধ্য-গগনে। তাঁর অস্তমিত হওয়ার কোনও লক্ষণই আমরা দেখছি না। সচিন আরও নানা কৃতিত্বের অধীশ্বর হন, এটাই ভারতবাসীর প্রার্থনা।

# ক্রিকেটে সচিনশতক

রাজাপুর সারস্বত ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম। বাবা রমেশ একজন মরাঠি সাহিত্যিক, মা রজনী সাদামাটা চাকুরিজীবী মহিলা। প্রিয় সংগীতশিল্পী শচীন দেববর্মণের নামানুসারে বাবা রমেশ তাঁর মধ্যম পুত্রটির নাম রেখেছিলেন সচিন। যে-ফ্ল্যাটবাড়িতে রমেশ তেন্ডুলকর থাকতেন, তার নামও ছিল সাহিত্য সহবাস। এদিক থেকে সচিনের ভিতরে ক্রীড়াশক্তির জিন-ই থাকার কথা নয়, বরং বিদ্যাবত্তা, সাহিত্য বা শিল্প-সংস্কৃতির জগতেরই মানুষ হওয়ার কথা সচিন রমেশ তেন্ডুলকরের। ক্রিকেটের এই বরপুত্রটি সুতরাং এক বিস্ময়কর ব্যতিক্রম! সচিনের বড় ভাই অজিত, ছোট ভাই নীতীশ, বোন সবিতা। দাদা অজিত ক্রিকেটানুরাগী মানুষ, সচিনের ভিতরে সম্ভাবনার অঙ্কুর বোধহয় তিনিই লক্ষ করেন। আর তাঁরই প্ররোচনায় সচিন ক্রিকেট খেলতে উদ্বুদ্ধ হন। মনে রাখা ভালো, দাদা অজিত শুধু অনুপ্রাণিত করেই ক্ষান্ত থাকেননি, ছোট ভাইটিকে আগলে নিয়ে সাহচর্যে, স্নেহে, শাসনে এবং বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়ে ও সেইসঙ্গে প্রথম জীবনে সচিনের ম্যানেজার হয়ে তাঁর সবচেয়ে বড় বন্ধুর কাজটি করে গিয়েছেন। ক্রিকেটে সচিনের মহা-উত্থানের নেপথ্যে অজিতের অবদান সর্বাধিক। তারপর আচরেকর এবং অন্যান্যরা।

বিশ্বকাপ ১৯৮৭। মাঠে বল কুড়োনো, ডেনিস লিলির দ্রুতগতির বোলার তৈরির অ্যাকাডেমিতে দ্রুত বলের প্রশিক্ষণ নিতে যাওয়া ইত্যাদি নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সচিন যখন থিতু হয়ে ক্রিকেটে ব্যাটসম্যান হওয়ায়

মনোযোগ দিলেন, তখনই তাঁর জগৎ বদলে গেল। শরীর ও মন নিবেদিত হয়ে গেল, উৎসর্গীকৃত হয়ে গেল। এবং ২০১২-র ২৫ মার্চ তিনি চল্লিশ বছর বয়সের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে বিনীতভাবেই ঘোষণা করলেন যে, অদূর ভবিষ্যতে ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার কোনও ইচ্ছেই তাঁর নেই, এমনকী ২০১৫ বিশ্বকাপেও তিনি খেলতে পারেন, যখন তাঁর বয়স হবে তেতাল্লিশ।

সচিনের অবসর নিয়ে এত জল্পনা কেন? অতিরিক্ত সচিন দেখে দেখে মানুষ কি ক্লান্ত, বিরক্ত? তরুণ প্রজন্মের পথ কি তিনি অন্যায্যভাবে আটকে আছেন? সচিনের ব্যাটে সেই জাদুর স্পর্শ কি দেখা যাচ্ছে না? দৌড়ের গতি কমেছে? ক্যাচ ফসকাচ্ছেন? ফিল্ডিংয়ে বল গলে যাচ্ছে হাতের ফাঁক দিয়ে? বোধহয় এরকমই কোনও হাস্যকর কারণ হবে। কিন্তু এটিই বা ভোলা যায় কী করে যে, এই পরিণত এবং অক্রিকেটীয় বয়সেই তিনি একদিনের ক্রিকেটে বিশ্বে প্রথম এবং একমাত্র দ্বি-শতরানটি করেছেন।

এবং শততম শতরান। এই শততমটি নিয়ে অবশ্য জলঘোলা বড় কম হয়নি। নিরানব্বইতে এক বছর আটকে থাকার পর অবশেষে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কষ্টার্জিত শতরানটি এল বটে, কিন্তু সেই যূপকাষ্ঠে ম্যাচটি বলি দিতে হল। কারণ, শততমটি সুনিশ্চিত করতে একটু বেশি বল খেলতে হয়েছিল তাঁকে, নইলে ভারতের রান তিনশো ছাড়ানোর কথা। শতরানের জন্যও সেই ম্যাচে সচিন 'ম্যান অফ দ্য ম্যাচ' হননি।

সচিনের ভিতরে ক্রিকেট ক্ষুধা অপরিসীম এবং বিস্ময়কর। ক্রিকেটের প্রতি এই আগ্রাসী ও অখণ্ড ভালোবাসা আর কারও মধ্যে দেখা গিয়েছে বলে আমরা জানি না। কত ম্যাচ এ পর্যন্ত খেলেছেন তিনি? ১৮৮টি টেস্ট, ৪৬২টি একদিনের আন্তর্জাতিক, প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট ২৯২টি, তাছাড়াও পাঁচ শতাধিক অন্য কত ম্যাচ। এত খেলার পর বেশির ভাগ খেলোয়াড়েরই একটু মানসিক, শারীরিক ক্লান্তি আসার কথা, একটু ঘর-গেরস্থালির দিকে ঝোঁকার কথা, জীবনের অন্যান্য উপভোগ্যতার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার কথা। কিন্তু সচিনকে ক্রিকেট ছাড়া আর কিছুই তেমন আকর্ষণ করে না। তাই এই চল্লিশেও তিনি অবসরের কথা ভাবতেই চান না। তাঁর জন্য আর কেউ ভাবুন, তাও তাঁর অভিপ্রেত নয়। স্ত্রী অঞ্জলি তাঁর চেয়ে ছ'বছরের বড়, অর্থাৎ এখন মধ্যবয়স্কা, স্বামীর ক্রিকেট-মগ্নতা দেখে স্ত্রীও বোধহয় সচিনকে ঘরমুখো হওয়ার তাগিদ দেন না। তার কারণ সচিনের জীবনের অধিকাংশই ক্রিকেটময়াচ্ছন্ন, তাই এই খেলা থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করা মানেই এক বিশাল শূন্যতাকে জীবনে আবাহন করে আনা। সচিন কি পারবেন সেই শূন্যতাকে সহ্য করতে? মনে হয়, ক্রিকেট-হীন সচিনকে কল্পনা করতেও ভয় পান অঞ্জলি।

আবেগপ্রবণ ভিভ রিচার্ডস বলেই ফেলেছেন, ডন ব্র্যাডম্যানের চেয়েও সচিন বড় ব্যাটসম্যান। মন্তব্যটি বিতর্কসাপেক্ষ। কারণ, ব্র্যাডম্যান ৫২টি টেস্ট ম্যাচে ২৯টি সেঞ্চুরি করেছেন হেলমেট-আর্মগার্ড ছাড়াই। তার উপর একাধিক ত্রি-শত রান আর নিরানব্বইয়ের উপর অ্যাভারেজ।

ডনকে বরং এই হিসেবের বাইরেই রাখা যাক। আবেগ যা-ই বলুক, পরিসংখ্যানেরও তো কিছু বলার আছে। ডনের চেয়ে বড় না হলেও সচিন খুব পিছনেও নেই, ডনের ঠিক পরের জায়গাটিও কিছু কম শ্লাঘনীয় নয়।

সচিনের রোল মডেল ছিলেন সুনীল গাওস্কর। সুনীলও এক নিবেদিতপ্রাণ ক্রিকেটার। তাঁর সময়ে সুনীল ছিলেন ভারতের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান। ব্র্যাডম্যানের ২৯টি শতরানের রেকর্ড তিনি ভেঙে দেন, সর্বাধিক টেস্ট রানের অধিকারী হন। কিন্তু মজা হল, তাঁর উত্থান ও অবসরের ঠিক পরপরই আর এক মারাঠি সচিন এসে তাঁর গুরু ও রোল মডেলের সব রেকর্ডই চুরমার করে ছাড়লেন। এত দ্রুত এবং গায়ে-গায়ে দুজনের উত্থান যে, ধন্দ লাগে! একই শহরে প্রায় একই সময়ে দু-দুটি মহাপ্রতিভার আবির্ভাব তো স্বাভাবিক ঘটনা নয়! সচিনের খেলায় সুনীলের আদল আছে ঠিকই, কিন্তু সচিন অনেকটাই বেশি মারমুখো, আক্রমণাত্মক। তফাত হল, সুনীল খুব সফল ও সক্ষম অবস্থাতেই খেলা ছেড়েছিলেন। মধ্য তিরিশেই, যত দূর মনে আছে। তাঁর ভাবশিষ্য সচিন তা করেননি। না করে ভালোই করেছেন, তবে স্থাপন করার মতো

ক্রিকেটে তাঁর আর কোনও কীর্তি বাকি আছে কিনা সেটিই ভাবনার বিষয়। সব কীর্তিই তো স্থাপিত হয়ে গিয়েছে বলে মনে হয়।

সচিন ক্রিকেটকে যেমন দিয়েছেন, তেমন পেয়েছেনও অঢেল। ঈশ্বরতুল্য সম্মান, কুবেরের মতো ঐশ্বর্য, ব্যাপকতম প্রতিষ্ঠা, আপামর মানুষের অকুণ্ঠ ভালোবাসা, সহ-খেলোয়াড়দের আনুগত্য, কয়েক কোটি অনুগামীর জয়ধ্বনি। একজন মানুষের এরপর আর চাওয়ার কিছুই থাকে না। ভারতের তাঁর মতো ভিভিআইপি আর কে আছেন? শুধু ক্রিকেট খেলেই যে এত কিছু অর্জন করা যায়, সচিনকে না দেখলে বুঝি বিশ্বাসই হত না!

অতি সম্প্রতি এক সাংস্কৃতিক সম্মেলনে তিনি কিছু হৃদয়াবেগ উন্মোচন করেছেন। বলেছেন, কিছু যন্ত্রণার কথা। কতবার সামান্য ভুলে সেঞ্চুরি ফসকেছেন, সামান্য সূক্ষ্ম অমনোযোগে কত কীর্তি স্থাপন করা হয়নি। কিন্তু জীবনের কোনও ক্ষেত্রেই তো কুসুমাস্তীর্ণ পথ নেই। যশপ্রতিষ্ঠার পথ মানেই পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা। তাঁর একদা বন্ধু বিনোদ কাম্বলির কথাই ভাবুন না, প্রতিভা বড় কম ছিল না বিনোদের। তাঁর নিজের দোষেই হয়তো অভ্যুত্থান ঘটল না তাঁর। যন্ত্রণা তো তাঁর বহুগুণ বেশি! ক্রিকেটের বরপুত্র সচিনের প্রায় সব কাঁটাই তো ফুল হয়ে ফুটেছে? বিষণ্নতা বদলে যায়নি কি অপার্থিব প্রসন্নতায়?

সচিন খেলুন। যতদিন ইচ্ছে খেলুন, নিজের নিয়ম তিনি নিজেই তৈরি করে নেবেন, যেমন ঈশ্বর করেন।

## সচিন ও তার ভগবান

অবশেষে সচিনের সময় হল, অমোঘ সিদ্ধান্তটি স্থির করার। অনিশ্চয়তা তার মধ্যেই ছিল। কারণ, সচিনের যতটুকু আমরা জানি, তা সবটুকুই শুধু ক্রিকেটময়। কেউ কেউ সচিনকে ক্রিকেটের ভগবান অবধি বলেছেন। কিন্তু সচিনেরও ভগবান বোধহয় ক্রিকেটই। এই খেলাটির প্রতি এত আগ্রাসী ভালোবাসার কথা আমরা আর শুনেছি কি? ক্রিকেট সচিনের শ্বাস-প্রশ্বাস, তার হৃদস্পন্দন, রক্তের মতোই তার ধমনিতে ক্রিকেটের প্রবাহ। এই ক্রিকেট-প্রেম থেকেই জন্ম ওই অবসরের অনিশ্চয়তার। একথা ঠিক যে, অবসর না নিলেও সচিন আরও কিছু রান করত, কয়েকটা সেঞ্চুরি করাও অসম্ভব ছিল না, কিন্তু নিষ্ঠুর সত্য এটাও যে, সচিন ঠিক সেই সচিনও তো নেই আর! আমরা যারা প্রথমাবধি কিশোর বয়স থেকে তার খেলা দেখে আসছি, তারাই জানি বা টের পাই তার অনেক ঐশ্বর্যই কেড়ে নিয়েছে বয়স। কোনওদিন কোনও অতিমানবকেই তো রেহাই দেয়নি বয়স!

সচিন যে নিজের বয়স টের পাচ্ছে না, এমনও নয়। সে টের পাচ্ছে রিফ্লেক্স কমে যাচ্ছে, পায়ের নেই ছন্দোময় নড়াচড়া, বলের লাইনে যাওয়ার তৎপরতা ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে। এখনও মাঠে নামলে চারদিকে

গগন-বিদারী সচিন-সচিন ধ্বনি উঠছে বটে, কিন্তু পাশাপাশি পত্রপত্রিকায়, চ্যানেলে, ব্যক্তিগত আলাপচারিতাতেও প্রশ্নটা বারবার উঠছে—অবসর নিচ্ছে কবে এই মহাতারকা?

বেশিদিনের কথা নয়, ২০১০-এ সাঁইত্রিশ বছর বয়সি সচিন একদিনের আন্তর্জাতিকে বিশ্বের প্রথম ব্যাটসম্যান হিসেবে দুশো রান করেছিল। আমরা হতবাক। এই দুর্ধর্ষ রেকর্ডটা করার জন্য সাঁইত্রিশ বছর বয়সটা বাছতে হল কেন? আগেই কি করা যেত না? আসলে সাঁইত্রিশে সচিন বোধহয় নিজেরই একটা নবীকরণ করতে চেয়েছিল। ভাগ্যিস আরও দেরি করেনি। করলে ওই কাণ্ডটা অনতিবিলম্বে করে ফেলত বীরেন্দ্র সহবাগ। তবে নবীকরণের পর জ্বলে-ওঠা সচিন যে আরও একটা লম্বা ক্রিকেটীয় আয়ুষ্কাল পেয়ে যাবে, এমনটাও মনে হয়নি আমাদের। জীবনের অমোঘ সত্যগুলি অতিক্রম করার মতো জাদুবিদ্যা কি আর মানুষের জানা আছে?

কিন্তু অন্তিম বিচারে, বিজ্ঞাপন থেকে এবং অন্যান্য সূত্র থেকে কোটি কোটি টাকা ও মূল্যবান সামগ্রী অর্জন করাটাও কোনও মোটিভেশন হতে পারে না সচিনের পক্ষে। এগুলোও তার সহায়ক অর্জন মাত্র, যাকে ফ্রিঞ্জ বেনিফিট বলা যায়। সচিনের মোটিভেশনের মূলে আছে এই আশ্চর্য খেলাটাই, যার নাম ক্রিকেট।

ক্রিকেট-জীবনে তাকে একটা বিভাগেই বড্ড নড়বড়ে আর অযোগ্য মনে হয়েছে। সেটা হল অধিনায়কত্ব। ভারতের অধিনায়ক হওয়ার পর মাঠে তার এক-একটা সিদ্ধান্ত দেখে আমার মতো আনাড়িও হায়-হায় করে উঠেছে। নিবেদিতপ্রাণ এই খেলুড়েটির ভিতরে বিস্তর দক্ষতার মালমশলা ঠেসে দিলেও ওই একটা ব্যাপারে ঈশ্বর রাশ টেনে রেখেছিলেন। ল্যাজেগোবরে হয়ে তাকে অধিনায়কত্ব ছাড়তে হয়েছিল। আর তাতে খেলোয়াড় সচিনের প্রভূত উপকারই হয়েছে।

ক্রিকেটসর্বস্ব সাধনের একটা মুশকিল হল, জীবনের অন্য ক্ষেত্রগুলি অকর্ষিত থেকে যায়, খানিকটা অচেনাও। কোনও কোনও মানুষ আছেন, যাঁরা চাকরিজীবনে অক্লান্তকর্মা এবং প্রচণ্ড নিষ্ঠাবান। অবসর গ্রহণের পর তাঁরা এমন এক শূন্যতার সম্মুখীন হন যে, বেঁচে থাকাটাই অর্থহীন হয়ে পড়ে। কীভাবে অবসরকাল কাটাতে হবে, তাই তাঁরা বুঝতে পারেন না। আমার কাছে এরকম বেশ কিছু মানুষ সাহিত্যকার হওয়ার বাসনা নিয়ে এসেছেন। বগলে পাণ্ডুলিপি, চোখে প্রত্যাশা। আমি তাঁদের নিরস্ত করিনি, তবে মায়া হয়েছে। সচিনের জন্য আমার দুশ্চিন্তা এই কারণে—মানুষটি ক্রিকেট ছাড়া আর কিছুই তেমন চর্চা করেনি। ভাষ্যকার, প্রতিবেদক, প্রশিক্ষক বা পত্রকার হিসেবে সচিনের একটা নব্য প্রকাশ ঘটবে বটে, কিন্তু ওইসব জায়গায় অতিশয় ঝানু ব্যক্তিরা ইতিমধ্যেই পাকাপাকি বসে গেছেন। সচিন তেমন বলিয়ে-কইয়ে মানুষ নয়। গাওস্কর, শাস্ত্রী, হর্ষ ভোগলে সিধুর সঙ্গে সৌরভ টক্কর দিতে পারে বটে, কিন্তু সচিন নয়। তবে যাই করুক, সচিন কিছুতেই ক্রিকেট থেকে দূরে থাকতে পারবে না। কোন ভূমিকায় তাকে মানাবে সেটাই চিন্তার বিষয়। আমি চাই, সচিন কারও সাহায্য না নিয়ে নিজেই একটি অকপট আত্মজীবনী লিখুক। ভানভণিতাহীন এই মানুষটি একটি আন্তরিক ও বিস্তারিত আত্মজীবনী লিখলে, তা একটি সম্পদ হয়ে উঠতে হতে পারেন।

সচিনের উত্থানের পিছনে কে আছেন, এ প্রশ্নের অনেক উত্তর। আচরেকর আছেন, সচিনের দাদা আছে। কিন্তু ভেবে দেখতে গেলে এই অতি প্রতিভার পিছনে ঈশ্বর ছাড়া আর কারও কথা ভাবা যায় না। যাঁরা ঈশ্বর বা ভাগ্য মানেন না, তাঁরা বলতে পারেন প্রতিভাটি প্রকৃতিদত্ত। সচিন কোনও খেলুড়ে বংশের ছেলে নয়। তার বাবা বরং অনেকটাই ছিলেন বুদ্ধিজীবী। সঙ্গীতজ্ঞ শচীন দেববর্মনের ভক্ত এই মানুষটি শচীনকর্তার নামানুসারেই সচিনের নামকরণ করেছিলেন। সুতরাং সচিনের ক্রিকেটকে জিনবাহিতও বলা যাবে না। মজার কথা হল, সচিন প্রথমে ডেনিস লিলির অ্যাকাডেমিতে গিয়েছিল ফাস্ট বোলিং-এর প্রশিক্ষণ নিতে। তিনি পত্রপাঠ সচিনকে বিদায় করে দেন, অর্থাৎ তার ভিতরে একজন মারাত্মক ব্যাটসম্যান লুকিয়ে আছে, এটা সচিন নিজেও তেমন টের পায়নি। হয়তো বা ওই লুকোনো ব্যাটসম্যানটিকে আবিষ্কার করে সচিন নিজেই হতবাক হয়ে গিয়েছিল, কে জানে!

কয়েকদিন আগে একজন বিশিষ্ট মানুষ আমাকে বলেছিলেন, আর কী হবে বলুন, টিভিতে যা-ও বা একটু-আধটু ক্রিকেট দেখতুম, তাও বন্ধ হয়ে গেল! আমি অবাক হয়ে বলি, কেন, খেলা দেখা বন্ধ করবেন কেন? তিনি সখেদে বললেন, ধুস সচিনই চলে যাচ্ছে, তাহলে খেলার আর রইল কী বলুন!

সচিনের এরকম ওয়ান ম্যান ডিভোটি-র সংখ্যা কিন্তু ভারতে বড় কম নয়। একসময় গাওস্করেরও ছিল। বেচারা কোহলি, শিখর ধবন, রায়না বা ধোনি, কেউই এইসব একনিষ্ঠ ভক্তের কাছে কলকে পাচ্ছে না। অথচ ধোনির টিমটা গত কয়েক বছরে যে গোটাতিনেক বিশ্বকাপ জয় করে ফেলল, সেটা তো শুধু সচিনের কৃতিত্বে নয়! আর ক্রিকেট তো একজনের খেলাও নয়, এগারোজনের। সমস্যা হল, এই ব্যক্তিপূজার নামই ভারতীয়ত্ব।

ইদানীং ভারতীয় টিমে দু'-তিনজন অসাধারণ খেলোয়াড়কে লক্ষ করা যাচ্ছে। সচিনের রেকর্ড তারা ভাঙতে পারবে কি না, সেটা প্রশ্ন নয়। আসল কথা হল, এরা কিন্তু সচিনের ট্র্যাজিক অভাবটাকে অনেকটাই আড়াল করে দিতে পারে। সচিনের পাশাপাশি যারা খেলেছে, সেই দ্রাবিড় বা সৌরভের অবদানও কম ছিল না। তবু সচিন শুধুই সচিন।

সচিনকে বেশ কয়েকবার সাংবাদিকদের কাছে বলতে শুনেছি যে, সে ফাস্ট বল খেলতে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে। আর বোধহয় সেই কারণেই অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তার আগ্রাসন একটু বেশিই ছিল।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দুটি টেস্ট খেলার পর আনুষ্ঠানিকভাবে সচিন বিদায় নেবে ঠিকই, কিন্তু এখনও বহুদিন ধরে সারা দেশে চলবে সচিন চর্চা। এই অভাগা দেশকে সচিন অনেক অপ্রত্যাশিত মর্যাদা এনে দিয়েছে। স্বয়ং ভিভ রিচার্ডস যে-ভাষায় এবং যে-আবেগে তাকে অভিনন্দিত করেছেন, তা খুব কম খেলোয়াড়েরই ভাগ্যে জোটে। ব্র্যাডম্যান সংযতবাক মানুষ ছিলেন, কিন্তু সচিনের প্রতি তাঁর সশ্রদ্ধ উক্তিটি ভোলার নয়। ভিনদেশি সচিনের সমসাময়িক ক্রিকেটাররাও নানা প্রশংসাবাক্যে সচিনের ঝুলি ভরিয়ে দিয়েছেন।

বোধহয় সচিনের আর কিছু চাওয়ার নেই, কিন্তু আমার সংশয় অন্য জায়গায়, সচিন কি এসব চেয়েছিল? টাকাপয়সা, প্রশংসাবাক্য, পুরস্কার কিংবা ভক্তের ঢল? আমার মনে হয় সচিন এসব কিছুই চায়নি। সচিন নামক সাধকটি শুধু চায় ক্রিকেট আর ক্রিকেট খেলে যেতে। তার শুধু চাই সবুজ একখানা মসৃণ মাঠ, কয়েকজন প্রতিপক্ষ, হাতে বংশবদ ব্যাট, মুখোমুখি একজন ধেয়ে আসা আগ্রাসী বোলার। পৃথিবীতে এর চেয়ে লোভনীয় বোধহয় সচিনের কাছে আর কিছুই নয়।

তাই ক্রিকেটের মাঠ থেকে তার এই বিলম্বিত বিদায় বোধহয় তার কাছেই সবচেয়ে বেশি মর্মন্তুদ।

## শক্তি ও শিল্পের এক আশ্চর্য সমন্বয়

এই লেখাটি যখন লিখতে বসেছি, তখন সংবাদমাধ্যম এবং বৈদ্যুতিন মাধ্যমগুলিতে সচিনের হায়দরাবাদী ওয়ান ডে ইনিংস নিয়ে উচ্ছ্বাস এবং আবেগ তথা প্রশস্তির বন্যা বয়ে গেছে। দেশের বরেণ্য ক্রিকেট-বিশেষজ্ঞ ও খেলুড়েরা কোনও বিশেষণই আর বাকি রাখেননি। কাজেই এই বিলম্বিত সচিন-প্রশস্তি লিখতে বসে আমি কী লিখব, তা নিয়েই সমস্যায় পড়ে গেছি। প্রশংসাসূচক কোনও শব্দই যে আর নেই, সবই ইতিমধ্যে প্রয়োগ করা হয়ে গেছে। তবে ভরসার কথা এই যে, সচিনের ইনিংসটি আমি টিভিতে দেখেছি, এবং বেশ মন দিয়েই। ছত্রিশ বছর বয়সে এবং দীর্ঘদিন ক্রিকেট খেলে যাওয়ার ক্লান্তি ঘাড়ে নিয়েও এরকম উদ্দীপ্ত ব্যাটিং হকচকিয়ে দেয়! বিশেষত, এ-যুগের খেলুড়েদের খেলতে হয় অনেক বেশি এবং ক্রিকেটের তিনরকম সংস্করণেই তাদের অংশগ্রহণ করতে হয়। সেই দিক দিয়ে বিচার করলে এই মরাঠি যুবকটির প্রাণশক্তির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জাগে।

মুশকিল হল, এটিকে তার জীবনের শ্রেষ্ঠ ইনিংস বলব কিনা, তাই নিয়ে সংশয় আছে। আমার মতে, তা নয়, কারণ, এই অস্ট্রেলিয়া দলটি তাদের অতীতের ছায়া মাত্র এবং ভেদশক্তিতে অর্ধেক। ফর্মের চূড়ায় থেকেও প্রায় সমসময়ে গিলক্রিস্ট, হেডেন, শেন ওয়ার্ন সরে গেছে। ব্রেট লি নেই। বোলার বলতে ওয়াটসন আর কাজ-চলা-গোছের সিডল। আর যা সব বোলার, তারা কেউ ভয়াবহ নয়। তার ওপর হায়দরাবাদের পাটা উইকেটে বোলারদের বলের বিষ অনেকটাই জোলো হয়ে গিয়েছিল। তেমন পরিকল্পনামাফিক বলও করেনি তারা। নিজেদের আক্রমণ বিভাগের দুর্বলতা জানে বলেই পন্টিং ব্যাটিং নিয়ে বড় রানের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করতে লেগে যায়। সাড়ে তিনশো রান যথেষ্ট বড় রান। খুব কম ম্যাচেই কোনও দল এত বড় রান তাড়া করে জিতেছে। কিন্তু ভারতীয় দল প্রায় লক্ষ্যে পৌঁছেই গিয়েছিল। আর সেটি সম্ভব হয়েছিল ওই একটি মাত্র মানুষের জন্যই। সচিন। এদিন সচিন আলাদা কিছুই করেনি, শুধু নিজেকে নিজেরই স্বভাবসিদ্ধ উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিল। নইলে শারজায়, কলকাতায়, অস্ট্রেলিয়ায় যেসব ইনিংস দেখেছি, তাতে তার ভূমিকা ছিল অনেক কঠিন, খেলতে হয়েছিল বাঘা বোলারদের বিরুদ্ধে, দ্রুততর পিচে।

ক্রিকেটে বয়স খুব বড় কথা নয়। কারণ, ফুটবল বা টেনিসে যতখানি ফিটনেসের দরকার হয়, ক্রিকেটে তা না হলেও চলে। বয়কট বা জয়সূর্য তার প্রমাণ। সচিনও। এদিন সচিনের মারগুলির মধ্যে প্রচণ্ড শক্তির

সঙ্গে শিল্পের এক আশ্চর্য সমন্বয় ঘটে গিয়েছিল। সবই যেন ঘটছিল তার ইচ্ছেমতো। এই স্বেচ্ছাচার সচিনকেই মানায়।

কিন্তু সচিনের এই ইনিংসটির মধ্যে একটি ভয়ের কথাও আছে। তা হল, এই ভারতীয় টিমটি নিয়ে। বলা হচ্ছে, এটিই আমাদের সর্বোত্তম বাছাই টিম। প্রতিভারও ছড়াছড়ি। কিন্তু হায়দরাবাদে সচিনের এই প্রচণ্ড ব্যাটিং যখন দলকে জয়ের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিল, তখনও চৌকাঠ ডিঙোতে পারল না ভারত। তাও দেশের মাটিতে। এই লেখা যখন লিখছি, তখন গুয়াহাটির ষষ্ঠ ম্যাচটিও হয়ে গেছে এবং তাতে ভারত ল্যাজেগোবরে হয়ে হেরেছে, সিরিজ ফসকেছে। ম্যাচে সচিনও রান পায়নি। অথচ এই অস্ট্রেলিয়া দলটিকে একটুও আহামরি দল বলে মনে করার কারণ নেই। পরিবর্তন ও পরীক্ষানিরীক্ষার ভিতর নিয়ে দলটি সম্ভাব্য সমন্বয় গড়ার চেষ্টা করছে। বিপজ্জনক বোলার নেই, তিনজন ছাড়া তেমন ধারাবাহিক ভালো ব্যাটারও নেই। এই দলকে দেশের মাটিতে সুবিধাজনক পরিবেশে পেয়েও হারাতে না পারলে বিদেশে দ্রুত পিচ এবং প্রতিকূল পরিবেশে ভারতীয় দল দাঁড়াবে কী করে?

'বুড়ো' সচিনকেই যদি বারবার ত্রাণকর্তার ভূমিকা নিতে হয়, তাহলে তারুণ্যের এত আস্ফালনই বা কীসের? তাহলে কেনই বা রাহুল দ্রাবিড় বা সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে না তাড়ালেই চলছিল না? একদিন যুবরাজ রান করে দেবে, আর একদিন সহবাগ, কখনও ধোনি বা কখনও রায়না—এরকমভাবে তো খেলা চালানো যাবে না। সব ম্যাচেই সবাইকেই কিছু না কিছু অবদান রাখতেই হবে, সেঞ্চুরি না হলেও ক্ষতি নেই, রান যেন দলের পক্ষে সম্মানজনক হয়। ইরফান, ইউসুফ, জাহিরদের কী হল কে জানে, এখনকার দলভুক্ত বোলারদেরও যেন আত্মপ্রয়োগ শতকরা একশো ভাগ নয়। ব্যতিক্রম একমাত্র সচিন। খেলতে নামলে তার সবটুকু সে উজাড় করে দেবেই, কিছুমাত্র শিথিলতা দেখাবে না। এখন সে হয়তো আগের মতো ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারছে না, তবু সময়-সময় সচিন যখন সচিনের মতো খেলে, তখন বোধকরি অন্তরীক্ষে দেবতারাও ভিড় করে তা দেখেন!

## সৌরভ নিয়ত থাকে না, একদিন বিলীন হয়

আসলে খেলার মঞ্চটি অনেকটা নাট্যমঞ্চের মতো, যেখানে প্রবেশ ও প্রস্থানের নির্দিষ্ট সময় থাকে। কিন্তু সৌরভ তা মানেননি। এই নাছোড় মনোভাবের জন্যই তাঁর এই করুণ পরিণতি।

ক্রিকেট-পণ্ডিত এবং বোদ্ধারা আইপিএল তথা টি টোয়েন্টি ক্রিকেটকে নিছক বিনোদন বলেই মনে করেন, তেমন গুরুত্বও দেন না। তাঁদের এই মত ফেলে দেওয়ার মতো নয়। কিন্তু আইপিএল-এ যে-বিপুল পরিমাণ টাকা লগ্নি হয় এবং যে-বিশাল জনপ্রিয়তা গড়ে উঠেছে এই খেলাটিকে কেন্দ্র করে, তাতে একে গুরুত্ব না দিলেও ভুল হবে। ক্রিকেটারদের নিজের দলে নেওয়ার জন্য সম্প্রতি হইহই করে চতুর্থ আইপিএল-এর নিলাম হয়ে গেল। নিলামে সৌরভকে কোনও দল কিনল না বলে, কিংবা ঘুরিয়ে বললে, সৌরভ কোনও দলে স্থান পেলেন না বলে বাংলা তথা গোটা ভারতেই প্রশ্ন ও বির্তক উঠেছে।

কেকেআর তাঁকে যে নেবে না তার আভাস কিছুদিন আগে থেকেই পাওয়া যাচ্ছিল। কিন্তু অন্য কোনও দলের তো তাঁকে ডেকে নেওয়া খুবই উচিত ছিল! কেন ডাকল না, তার নানা কারণ শোনা যাচ্ছে। অধিকাংশ টিমের কোচ অস্ট্রেলিয়ান, আর অস্ট্রেলিয়ানরা সৌরভকে পছন্দ করেন না। সৌরভের ঝাঁঝালো ব্যক্তিত্ব এবং অনমনীয় চরিত্র, সাম্প্রতিক ক্রীড়াদক্ষতার দৃষ্টান্তের অভাব, আইপিএল-এর পক্ষে প্রয়োজনীয় ফিটনেস নেই ইত্যাদি। তার ওপর তিনি নিজের দর বেশি চড়িয়ে ফেলেছেন। কিন্তু এসব কোনও কারণকেই

খুব গুরুত্ব দেওয়া যাচ্ছে না। ষড়যন্ত্রের কথাও শোনা যাচ্ছে। তাও হতে পারে, কিন্তু ষড়যন্ত্রের কারণটা তো জানা দরকার! আসল কথা দু'দিনের এই নিলামে সৌরভের নামটা উচ্চারিতই হল না বলে দেশবাসী, বিশেষত বঙ্গবাসী বিস্মিত, ক্ষুব্ধ।

এটা ঠিকই যে, গত বছর আইপিএল শেষ হওয়ার পর সৌরভ আর ক্রিকেটের মধ্যে তেমনভাবে ছিলেন না। প্র্যাকটিস বা এক-আধটা রঞ্জি ম্যাচ খেলাটা বড় কথা নয়। মনে হয় ক্রিকেটের প্যাশনটা তাঁর আর তেমন নেই। এমনটা হতেই পারে। সেক্ষেত্রে নিজেকে সরিয়ে নিলেই তো হত, নিলামে যাওয়ার দরকারটা কী ছিল? নিলামের অনেক আগেই নিশ্চয়ই তিনি বিভিন্ন দলের কর্মকর্তাদের মনোভাব জেনে গিয়েছিলেন। জানাটা কঠিনও তো কিছু নয়। যে-কোনও দলের আগ্রহ তো আগে-ভাগেই প্রকাশ পায়। তিনি আভাস যদি পেয়েই থাকেন তাহলে নিলামে গিয়ে মস্ত ভুল করেছেন।

আসলে খেলার মঞ্চটি অনেকটা নাট্যমঞ্চের মতো, যেখানে প্রবেশ ও প্রস্থানের নির্দিষ্ট সময় থাকে। কিন্তু সৌরভ তা মানেননি। এই নাছোড় মনোভাবের জন্যই তাঁর এই করুণ পরিণতি। কুম্বলে প্রমুখ সময়ের আগেই নিজেদের সরিয়ে নিয়েছেন, সৌরভের কাছেও তেমনটাই প্রত্যাশিত ছিল, তা না করায় এই পরিস্থিতি। টি এস এলিয়টের ভাষায়, 'this is the way the world ends / not with a bang but a whimper!' হালে বাঙালি দুজনকে নিয়ে গর্ব করে, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ও রানি মুখোপাধ্যায়। আশা করা যায়, সৌরভ যে-ভুল করলেন, রানি অন্তত সে-পথে হাঁটবেন না!

সৌরভ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে আনুষ্ঠানিক বিদায় জানিয়েছেন বেশ কিছুদিন আগেই। বিদায়টি বেদনাদায়ক ছিল, কিন্তু নিজের মর্যাদা অটুট রেখেই তিনি সেদিন সরে এসেছিলেন। এই মর্যাদা সচেতনতা আইপিএল-এও প্রত্যাশিত ছিল তাঁর কাছে। যেমন কুম্বলে করেছেন। দ্রাবিড় লক্ষ্মণ বা আগরকর মোটেই টি টোয়েন্টি খেলার যোগ্য খেলুড়ে নন। এঁদের চেয়ে যোগ্যতায় এগিয়ে থাকা সত্ত্বেও সৌরভের জায়গা হল না কোথাও। এই অপমানটি তিনি অবশ্যই এড়াতে পারতেন। আর আপামর যে-বঙ্গবাসী তাঁর পিছনে নিরেট সমর্থন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁদেরও ক্ষোভের কারণ ঘটত না। শোনা যাচ্ছে, সৌরভ-পাগল কলকাতা তথা বঙ্গবাসী এবার কেকেআর-এর ম্যাচ দেখবেন না এবং শাহরুখের ছবি বর্জন করবেন। এসব আবেগবশে নেওয়া সিদ্ধান্ত এবং অর্থহীন। তবে এটা বোঝা যায় যে, সৌরভের এই অপমানে তাঁরাও হতমান বোধ করছেন। বাঙালির সৌরভপ্রীতি যে প্রায় নজিরবিহীন এটা সৌরভও জানেন। তাই প্রত্যাখ্যাত হওয়ার আগেই যদি আইপিএল-কে তিনি প্রত্যাখ্যান করতেন, তাহলে বঙ্গবাসী

দুঃখ পেলেও এতটা ক্ষুব্ধ হতেন না। সৌরভ নানাভাবেই ক্রিকেটের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারেন, যেমন অনেক প্রাক্তন ক্রিকেটার আছেন। আরও বলতে ইচ্ছে যায়, সৌরভের পর আর-একজন সৌরভকে খুঁজে বের করা এবং তৈরি করাও তো একটা মস্ত বড় কাজ। সেই কাজ তো সবচেয়ে ভালো পারেন সৌরভই!

## সৌরভ, এবার থামুন!

গত বছর যখন আইপিএল নিলামে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে কেউ কিনল না তখন বাঙালি হতাশ হয়েছিল, খানিকটা অপমানও বোধ করেছিল। দোষটা ঠিক নিলামওয়ালাদের নয়। আসলে বেশ কিছুদিন যাবৎ সৌরভ ঠিক ক্রিকেটের মধ্যে ছিলেন না। নানারকম সামাজিক কাজকর্ম নিয়ে বা রিয়ালিটি শো-তে ব্যস্ত থেকেছেন। যাঁরা খেলোয়াড় কেনেন তাঁরা নিশ্চয়ই অনাসক্ত এবং অনুশীলনহীন কোনও খেলোয়াড়ের প্রতি আগ্রহী হবেন না। পরে অবশ্য একটা সমঝোতা সূত্রে পুণে ওয়ারিয়র্সের সুব্রত রায় তাঁকে দলে নেন। গত বছর আইপিএল-এ চমকপ্রদ কিছু না করলেও সৌরভ কয়েকটা ম্যাচ মোটামুটি ভালোই খেলেছিলেন। এবছর যুবরাজের অসুস্থতার কারণে অধিনায়ক হয়ে তাঁর শুরুটা হয়েছিল চমৎকার। নিজে তেমন রান না করলেও তাঁর দল প্রথম দুটি কঠিন ম্যাচ জিতে শুরু করে এবং মুম্বই, চেন্নাই, দিল্লির মতো দুর্ধর্ষ দলকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়নশিপের দৌড়ে বেশ এগিয়ে থাকে। অনেকেই আশা করছিলেন, পুণের দল এবার হিসেব উল্টে দিতে পারে। কিন্তু সে আশায় জল ঢেলে দিয়ে অত্যন্ত অনুকূল পরিস্থিতিতে থেকেও পুণে দু-দুটো গুরুতর ম্যাচ হেরে সেই যে মনোবল খুইয়ে বসল, তা আর ফিরে পেল না। অধিনায়ক সৌরভ মাত্র একটা

ম্যাচে খানিক ঔজ্জ্বল্য দেখিয়ে সেই যে নিভে গেলেন, আর তাঁর উত্থান ঘটল না। বয়সের কথা তুলে লাভ নেই। বয়স কি দ্রাবিড় বা সচিনের হয়নি? তাঁরা তো সমবয়সিই, কিন্তু দ্রাবিড় এখনও আইপিএলে সর্বাধিক রানের দৌড়ে সামিল আছেন, সচিনও কিছু খারাপ করছেন না। তাহলে কি ধরে নেব যে, সৌরভের রানের ক্ষুধা আর নেই? নেই ক্রিকেটের প্রতি আবেগ বা আকর্ষণ? সম্প্রতি সুনীল গাওস্কর অবধি সৌরভকে অবসর নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। শুধু আইপিএল খেললেই হবে না, সারা বছর অনুশীলন আর ম্যাচ প্র্যাক্টিসেরও যে দরকার আছে সেটা কে না জানে!

কিন্তু এখনও ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে সৌরভের বিপুল জনপ্রিয়তা রয়েছে। তিনি চার, ছয় মারলে গ্যালারি গর্জে ওঠে। সৌরভের শিল্পসম্মত খেলার কথা লোকে আজও ভোলেনি।

ক্রিকেট যদি মাইন্ড গেমই হয়ে থাকে তবে বলতে হবে সৌরভের সেই মনটাই ক্রিকেটে নেই। পুণে তাঁকে মেন্টর করতে চাইছে, খেলাতে চাইছে না। সৌরভ খেলতেই চান। কিন্তু কিছুতেই কেন যে তাঁর ব্যাটে মনোসংযোগটা ঘটছে না।

বাঙালি আবেগপ্রবণ এবং সৌরভভক্ত। অধিকাংশ বাঙালিই চায় সৌরভ খেলুন। সৌরভও চান। কিন্তু মনে হচ্ছে, এই আইপিএল তাঁকে অনেকটাই নড়বড়ে করে দিয়েছে। সৌরভের কোনওরকম অমর্যাদা বা অপমান বাঙালির সহ্য হয় না। সুতরাং সৌরভই স্থির করুন, তিনি আর আইপিএল খেলবেন কিনা। নাকি সম্মানের সঙ্গে নিজেকে সরিয়ে নেবেন।

বয়স মানুষের শরীরী দক্ষতা, রিফ্লেক্স বা গতি কেড়ে নেয় বটে, কিন্তু দেয় অভিজ্ঞতা, পরিপক্কতা, পরিণত বুদ্ধি ও বিবেচনা। সৌরভ যে দাদাগিরি করেছিলেন, আমার তো মনে হয় অমন উজ্জ্বল ও সপ্রতিভ অনুষ্ঠান বিরল। ক্রিকেট ছাড়াও অনেক কিছু করার যোগ্যতা তাঁর আছে।

# মহারাজকীয়

জগমোহন ডালমিয়ার আকস্মিক মৃত্যুর পর সিএবি-র প্রেসিডেন্ট কে হবেন, এই প্রশ্ন দখা দিলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম বলায় কাগজে এবং অন্যান্য মাধ্যমে তাঁর সমালোচনা হয়েছিল। কিন্তু আমি তাঁর এই মন্তব্যে কোনও দোষ খুঁজে পেলাম না! তিনি তো আমাদের মতো সাধারণ মানুষের মনের কথাটিই ব্যক্ত করেছিলেন। সৌরভ শুধু একজন মহান ক্রিকেট খেলোয়াড়ই নন, মানুষ হিসেবেও তিনি ভারী বিচক্ষণ, সংযত, সৌজন্যের পরাকাষ্ঠা। নানা কারণেই আমার মনে হয়, সৌরভের প্রতিভা শুধু ক্রিকেটেই সীমাবদ্ধ নয়। 'দাদাগিরি' রিয়ালিটি শো-তে তাঁর সপ্রতিভ সঞ্চালনা 'কৌন বনেগা...'-র অমিতাভ বচ্চনের চেয়ে কোনও অংশেই কম নয়। বলতে কী, এত ভালো রুচিশীল, বৌদ্ধিক সঞ্চালনা বাংলা রিয়ালিটি শো-এ বড় একটা দেখা যায়নি।

বাংলার এখন সবচেয়ে বড় সমস্যা নতুন ক্রিকেট প্রতিভার অভাব। সৌরভের আগে এবং পরে ধারাবাহিক জাতীয় স্তরে খেলার মতো একজনকেও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। মনোজ, লক্ষ্মীরতন, গোস্বামীর মতো দু'-চারটে সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু তাদের তেমন উত্থান হল না। বাকি ঋদ্ধিমান সাহা। সে মাঝে মাঝে ধোনির জায়গায় সুযোগ পাচ্ছে বটে, কিন্তু এখনও তার জায়গা পাকা নয়। সুতরাং আপামর বাঙালি কিন্তু অনেকটাই হতাশ।

জাতীয় দলে বাংলার কোনও মুখ নেই, এটা গৌরবের কথা নয়। হয়তো-বা সৌরভ এই খেলোয়াড় খুঁজে বের করা বা তাকে প্রশিক্ষিত করে তোলার কাজে সক্রিয় হতে পারবেন। কারণ, ভারতীয় টিমে তিনি অনেক নতুনকে মর্যাদা দিয়েছেন। দলের প্রতিটি খেলোয়াড়ের সঙ্গে অধিনায়ক হিসেবে পক্ষপাতহীন আচরণের জন্যও তাঁর সুনাম ছিল। নতুন উঠতি খেলোয়াড়রা সৌরভের পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহ পেলে নিজেদের আরও বেশি মোটিভেট করতে পারবে।

জগমোহন ডালমিয়া এক ক্ষুরধার প্রশাসনিক মেধা নিয়েই জন্মেছিলেন। সিএবি থেকে আইসিসি পর্যন্ত সর্বত্রই তাঁর ছিল সমান দাপট। কিন্তু খেলোয়াড় হিসেবে তাঁর কেরিয়ার খুব উজ্জ্বল ছিল না।

সৌরভের সেটি আছে। প্রশাসক হিসেবেও তাঁর বাস্তববোধ ও কাণ্ডজ্ঞানের অভাব নেই।

এসব ক্ষেত্রে কঠিন হয়ে দাঁড়ায় দলাদলি বা গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে বিচরণ করা। এবং সম্ভব হলে সবাইকে এক ঘাটে জল খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা। নিরপেক্ষ, উদার, সহিষ্ণু মনোভাব এবং ভালোবাসা থাকলে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বকেও জয় করা যায়।

মনে হয়, সৌরভের পক্ষে কাজটা কঠিন হবে না। কারণ অনেককে নিয়ে চলার অভ্যাস তাঁর তো আছেই।

## উজ্জ্বল সম্ভাবনা

১৯৭১ সালে মেলবোর্নে বৃষ্টিবিঘ্নিত ও পরিত্যক্ত একটি টেস্ট-ম্যাচের শেষদিকে অবশিষ্ট সময়ে, হতাশ ও ক্ষুব্ধ দর্শকদের খানিকটা আনন্দ দিতে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া নিজেদের মধ্যে ৪০ ওভারের একটি ম্যাচ খেলেছিল। বলতে গেলে সেটিই প্রথম আন্তর্জাতিক সীমিত ওভারের খেলা, যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত নয়, নিছকই বিনোদনের উদ্দেশ্যে নিবেদিত।

প্রথম আনুষ্ঠানিক ও স্বীকৃত একদিনের ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৫ সালে ইংল্যান্ডে, অস্ট্রেলিয়া আর ইংল্যান্ডের মধ্যে। এসব পরিসংখ্যান অবশ্য সর্বত্রই লভ্য।

কথা হল, টেস্ট ম্যাচ একসময় যেরকম শ্রদ্ধা ও সম্মান পেত, তা এখনও পায় কিনা। হয়তো পায়, কিন্তু উপমহাদেশের বাইরে অন্যান্য দেশে খেলাটি আর তেমন দর্শক টানতে পারে না। শুধু দর্শকও নয়, এই খেলা যোগ্য খেলোয়াড়দেরও আর আকর্ষণ করতে পারছে না বলে খবর কারণ, এই খেলায় আর তেমন টাকা পাওয়া যায় না, বিশেষ নামডাকও হয় না, ক্রীড়াবিদরা তাই শরীরী দক্ষতা বা ক্ষিপ্রতাকে অন্য খেলায় নিয়োজিত করতে বেশি উন্মুখ, যেখানে টাকা, যশ ও প্রতিষ্ঠা অনেক বেশি।

দর্শক আকর্ষণ, চটজলদি অনেক টাকা এবং দ্রুত খ্যাতি অর্জনের সহজ ক্রিকেটীয় পন্থা হল একদিনের ক্রিকেট ও টি-টোয়েন্টি। একদিনের খেলার মোট আয়ু মাত্র ১০০ ওভার এবং সেই খেলায় বর্ণাঢ্যতা অনেক

বেশি। আক্রমণ ও প্রতিআক্রমণে উত্তেজনাও প্রবল। ক্রীড়াঙ্গনে গিয়ে মানুষ তো ওই উত্তেজনাটাই চান! টেস্ট-ক্রিকেট খুব কমই উত্তেজক হওয়ার ক্ষমতা রাখে।

বলাই বাহুল্য, ক্রিকেট বিশ্বজনীন খেলা নয়। হল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড বা অন্যান্য প্রায় আনকোরা দেশকেও ক্রিকেটের বিশ্বকাপে অন্তর্ভুক্ত করা হয় ক্রিকেটের ক্ষেত্র বিস্তারের জন্য। তা সত্ত্বেও ক্রিকেট বিশ্ব নিতান্তই অপরিসর। তা হোক, তবু ক্রিকেটের মহিমা তাতে ক্ষুণ্ণ হয় না। জনপ্রিয়তাই কোনও জিনিসের গুণগত উৎকর্ষ বা শৈল্পিক মানের পরিমাপক হতে পারে না। ক্রিকেট এক উচ্চ মার্গের মহান খেলা।

ব্রিটেন ক্রিকেটের ধাত্রীভূমি। এই খেলার প্রসার ঘটেছে ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদের হাত ধরেই। একদিনের বিশ্বকাপ অস্ট্রেলিয়া জিতেছে চারবার, ওয়েস্ট ইন্ডিজ দু'বার, ভারত, পাকিস্তান আর শ্রীলঙ্কা একবার করে। ইংল্যান্ডে বা দক্ষিণ আফ্রিকা একবারও নয়। ইংল্যান্ডে ১৯৮৩-র বিশ্বকাপ জিতেছিল ভারত। জেতার কথা কিন্তু নয়! ফাইনালে প্রথম ব্যাট করে ভারত যা রান তুলেছিল, তা ওয়েস্ট ইন্ডিজের বাঘা ব্যাটসম্যানদের কাছে নস্যি! ভয়াবহ রিচার্ডস একাই যে-কোনও দলকে খেয়ে ফেলতে পারেন। খেলাটি প্রথম থেকে শেষ অবধি টেলিভিশনের পরদায় দুরু-দুরু বক্ষে দেখার অভিজ্ঞতা হয়েছিল। ওই অপ্রত্যাশিত ও অবিশ্বাস্য জয় ঘটার পরও অনেকক্ষণ বিশ্বাসই হচ্ছিল না! কিন্তু ক্রিকেটের বিখ্যাত অনিশ্চয়তাই ওই খেলার ভাগ্য নির্ধারণ করেছিল। নইলে রিচার্ডস ওইরকম ফুল্ল মেজাজে মারকাটারি ব্যাট করতে করতে হঠাৎ একটা কাঁচা ভুল কেন করে ফেলবেন? রিচার্ডস বারবার মিড উইকেটের উপর দিয়ে ছক্কা আর চার মারছেন দেখে কপিল দেব দৌড়ে এসে ডিপ মিড উইকেটে দাঁড়িয়ে যান। কপিলকে ওইখানে দেখেও রিচার্ডস ফের কোন দুর্বুদ্ধিবশত ওইখান দিয়েই বলটাকে ওড়ানোর চেষ্টা করলেন কে জানে! দীর্ঘকায় কপিল দেব অনায়াসেই ক্যাচটি ধরে নিলেন। রিচার্ডস ওরকম আহাম্মকের মতো আউট না হলে ভারতের কপালে কষ্ট ছিল।

কিংবা অস্ট্রেলিয়া আর দক্ষিণ আফ্রিকার সেই সাংঘাতিক উত্তেজনাপ্রদক খেলাটি। একেবারে শেষ বলে একটি রান আউট এবং জেতা ম্যাচ হেরে বিদায় নিল দক্ষিণ আফ্রিকা। এইসব উত্তেজক মুহূর্ত এবং মারকাটারি ব্যাটিং, রবারের পুতুলের মতো তৎপর ফিল্ডিং, বোলিংয়ে নানারকম বৌদ্ধিক প্রয়োগ— মিলেমিশে একদিনের ক্রিকেটকে যে-উপভোগ্যতা দিয়েছে তাতেই ক্রিকেটের দিকে আবার মুখ ফিরিয়েছেন সাধারণ মানুষ।

বেশ কয়েক বছর পর আবার উপমহাদেশে একদিনের বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে, দুঃখের কথা এই যে, উগ্রবাদ এবং সন্ত্রাসকবলিত পাকিস্তান এই ক্রীড়াসূচিতে নেই। পাকিস্তান দলটি বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করবে বটে, কিন্তু ম্যাচ গড়াপেটার দায়ে তাদের বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট খেলোয়াড় নির্বাসনে গেছেন এবং তারও আগে নানা ডামাডোলে তাদের আরও কিছু ভালো খেলুড়ে খেলা ছেড়ে বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছেন। সুতরাং পাকিস্তানকে নামতে হবে বেশ কিছু তরুণ ও নতুন খেলোয়াড় নিয়ে যাদের বিশেষ অভিজ্ঞতা নেই। তবু পাকিস্তানকে উপেক্ষা করলে মস্ত ভুল হবে। বাংলাদেশের হয়ে মাঠে নামবেন এগারোজন বাঙালি। ভারতীয় ক্রিকেট টিমে বাঙালি বিরল। সৌরভের পর এখন তো কেউই নেই। তাই বাংলাদেশের হয়ে যে এগারোজন খাঁটি বঙ্গভাষী মাঠে নামবেন, সেটাই এখন আমাদের গৌরবের বিষয়। বাংলাদেশ উপেক্ষা করার মতো দল নয় কিন্তু। ইতিপূর্বে তারা ভারত, অস্ট্রেলিয়া ও পাকিস্তানকেও হারিয়েছে। সুতরাং এই বিশ্বকাপেও তারা কিছু কিছু হিসেব উলটে দিতে পারে।

দুর্ভাগ্য কলকাতার। প্রস্তুতির অভাবে ভারত-ইংল্যান্ডের মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ম্যাচ স্থানান্তরিত হয়ে গেল। ইডেনের পক্ষে লজ্জাজনক ঘটনা, বিশেষ করে ডালমিয়ার মতো দক্ষ প্রশাসক সিএবি-র মাথায় থাকা সত্ত্বেও। কিন্তু যা হয়েছে তাকে তো অন্যায় বা অবিচারও বলা চলে না।
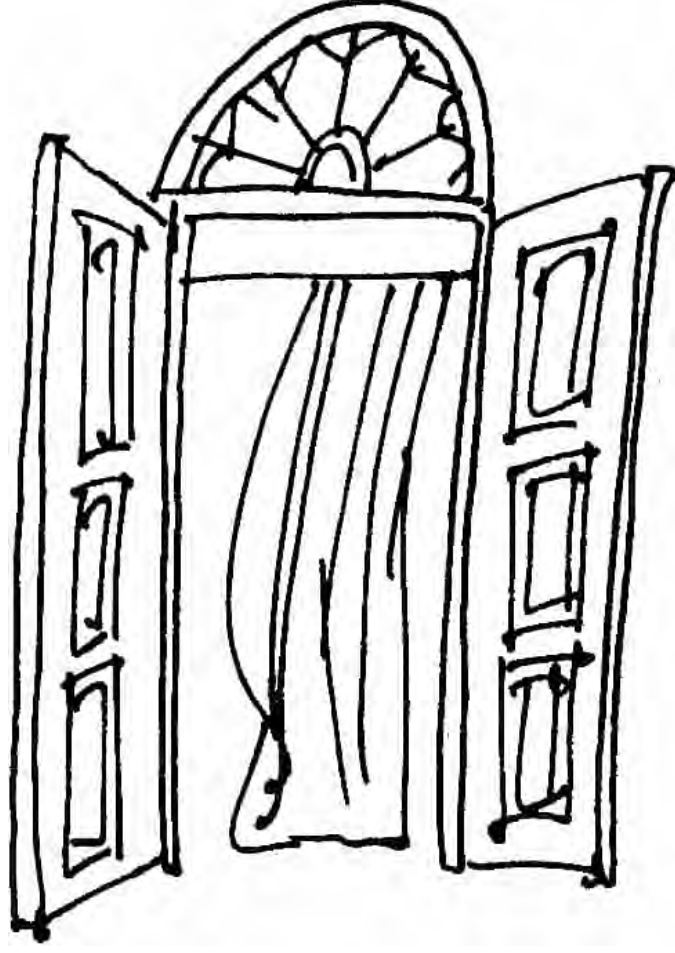
অনেকে বলছেন, এবার ভারতের সম্ভাবনা অতি উজ্জ্বল। ভারত যোগ্য দল সন্দেহ নেই, নবীন ও প্রবীণ মিশিয়ে চমৎকার ভারসাম্য রয়েছে। সহবাগ তো ছিলেনই, তাঁর সঙ্গে বিরাট কোহলির মতো একটি প্রতিভা যুক্ত হয়েছে। সচিন আছেন এবং ধোনি বিশ্বকাপ জিততে উন্মুখ। তবু কেউ কেউ এই বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডেরও

একটি সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছেন। তার কারণ সম্প্রতি ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া সফরে গিয়ে একটি লন্ডভন্ড কাণ্ড করে দিয়ে এসেছে।

ভবিষ্যদ্বাণী করে লাভ নেই, আমাদের খোলা মনে ও খোলা চোখে বসে থাকতে হবে এই অপরূপ অনিশ্চয়তায় ভরা খেলাটির শেষ পরিণতির অপেক্ষায়।
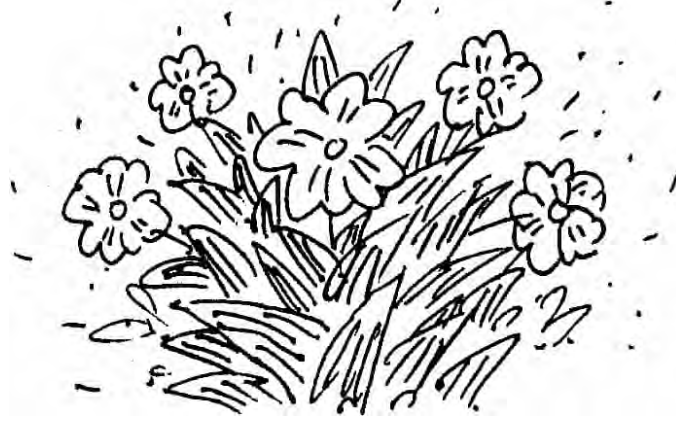
# তির্যক রচনা

# দাঁত

যার গেছে সে-ই জানে দাঁত কী জিনিস। কষের দু-একটা গেলে তত ক্ষতি নেই, কিন্তু মধ্যযৌবনে যদি সামনে কোনও এক বেরসিক, বিবাগী-স্বভাবের, ঘর-বৈরাগী দাঁত গৃহত্যাগ করতে উদ্যত হয় তখন দাঁতের মালিক বা মালকিনের অবস্থা কী হয় তা জানতে হলে মালিনীকে দেখতে হয়। আমার সঙ্গে তার সম্ভাব্য বিয়ের ভূমিকা হিসেবে যখন দুরুদুরু বক্ষের, অনিশ্চয়তার দোলায় দোদুল্যমান, নানা বাধাবিপত্তির উড়ন্ত শকুন-ছায়ায় একটা প্রেম বা প্রেম-কিনা-কে-জানে গোছের সম্পর্ক তৈরি হচ্ছিল তখনই হঠাৎ এক গরমের রোমান্টিক বিকেলে আমার পয়সায় আইসক্রিম খেতে গিয়ে জল-ভরা চোখ তুলে সে বলল, খেতে পারছি না। দাঁত সিরসির করছে ভীষণ।

সেই শুরু। সেই বেয়াড়া, রসবোধহীন দাঁতকে কিছুতেই বোঝানো গেল না, যুবতী বয়সের সুন্দরী একটি মেয়ের সুগন্ধী মুখের চমৎকার আবাস ছেড়ে তার সন্ন্যাস নেওয়ার কোনও মানেই হয় না। মালিনীর মুখ ছেড়ে কোন আহাম্মক চায় মালিন্যে নিক্ষিপ্ত হতে? তার অসুবিধেই বা কী, আরও একত্রিশজন যখন একই মুখগহ্বরে পাশাপাশি ঝগড়া-কাজিয়া এবং দুষ্টুমি না করে শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করছে? বৃহত্তর কোনও কর্তব্যের আহ্বানও তো আসেনি যে তাকে এই জরুরি সিদ্ধান্ত নিতেই হবে!

অনেক কাকুতিমিনতি, চোখের জল, চেষ্টা সত্ত্বেও তাকে রাখা গেল না। তিন মাস বাদে মালিনীর হাসি মুছে দিতে সে বিদায় নিল। এক নিষ্ঠুর ডাক্তারের সাঁড়াশি তাকে বিনা আয়াসে তুলে আনল। দুদিন বাদে মালিনী তার করুণ মুখ তুলে বলল, আচ্ছা, এখন আপনি নিশ্চয়ই আর আমার সঙ্গে মেলামেশা করবেন না! কে-ই বা করবে বলুন। যার দাঁত নেই তার বেঁচে থাকাটাই কত অর্থহীন। তাকে কেউ চায় না, কেউ ভালোবাসে না, কেউ পাত্তা দেয় না। যার দাঁত নেই সে তো বুড়ি। আমার কেবল মনে হচ্ছে, কত বুঝি বয়স হয়ে গেল আমার। জানেন, আমার বিয়েও হবে না...

আমার সমস্ত অস্তিত্ব যেন চেঁচিয়ে উঠতে চাইছিল। হবে! হবে! কিন্তু গলাটা দুঃখে এমন বুজে গিয়েছিল যে, কথাই এল না।

মালিনী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, সব শেষ হয়ে গেল!

কথাটা ঠিক নয়। সবাই জানেন আজকাল দাঁত বাঁধাইকাররা কী সাঙ্ঘাতিক দক্ষতায় দাঁত বাঁধাতে পারেন। প্রযুক্তিবিদ্যার সেই অমেয় আশীর্বাদে মালিনীর মুখও যে একদিন এই সামান্য শূন্যতাকে ভরে তুলতে পারবে এ বিশ্বাস আমার ছিল। আর মালিনীর ওই দুঃখ ভারাক্রান্ত দিনে অন্যান্য দাবিদারদের টপকে আমিই একদিন প্রস্তাবটা প্রায় দিয়ে ফেললাম, মালিনী, আমি তো আছি। চিরদিন থাকব।

মালিনী মাথা নেড়ে বলে, সব মিথ্যে কথা। কেউ থাকে না।

কথাটা একেবারে মিথ্যেও তো নয়, তাই আমি আর প্রতিবাদ করিনি।

একটি অতিথি দাঁত এল মালিনীর মুখের শূন্যতা ভরে তুলতে। তার বায়নাক্কা অনেক। সে খাবার চিবোতে নারাজ, সে রাত্রিবাসও করতে চায় না মালিনীর সঙ্গে, তাকে জলের গেলাসে রাখতে হয়। মালিনীর সঙ্গে, তার বনিবনার অভাব এমন স্তরে চলে গেল যে, চারদিকের পৃথিবীটার ওপরেই চটে গেল মালিনী। তার চেয়েও বড় কথা, কে তাকে বলেছে, এ নাকি কৃত্রিম দাঁতই নয়। মৃত মানুষের দাঁত, তুলে নিয়ে প্রসেস করা। সেই ঘেন্না তো আছেই, তার ওপর যার দাঁত সে-ও নাকি অশরীরী শরীর নিয়ে তার হারানো জিনিস খুঁজে খুঁজে ঘুরে বেড়ায়।

মালিনী একদিন দাঁত-ভেজানো জলের গেলাস থেকে ভুল করে জল খেয়ে ফেলে সারারাত বমি করে কাহিল হয়ে পড়ল। তারই দাঁত, ঘেন্নার কিছু নেই। তবু...

আর দাঁতের সঙ্গে অবনিবনার ওই সময়টায় হতাশাগ্রস্ত আশাহীন, অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে চেয়েও বোধহয় মালিনী একদিন আমাকে বলেই ফেলল, আচ্ছা, এই আমার মত রূপহীনা, গুণহীনা, বয়স্কা একজন মহিলার সঙ্গে মিশতে আপনার ভালো লাগে?

সে কী! তোমার বয়স যে শুনেছিলাম মাত্র বাইশ!

বাইশই তো! সেও কি কম! বিশেষ করে যার দাঁত নেই! কখনও পারবেন এরকম একটি মেয়েকে জীবনে গ্রহণ করে নিতে? পারবেন না। পুরুষ মাত্রই তো কাপুরুষ!

পারব! পারব! বলে আমার অন্তরাত্মা নেচে উঠল, কিন্তু আবেগের সেই ডেলা আবার আমার কণ্ঠরোধ করল।

কয়েকদিন বাদে মালিনী একদিন আতঙ্কিত গলায় আমাকে বলল, জানেন, কাল রাতে নিয়ে গেছে!

কে? কী?

দাঁত! যার দাঁত সে এসেছিল। সকালে উঠে দেখি গেলাসে দাঁতটা নেই।

কিন্তু-কিন্তু করে বললাম, ভুল করে ফেলে টেলে দাওনি তো!

ফেলে? বলে কেমন বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে মালিনী। এত মায়া হয় আমার। মালিনী মাথা নিচু করে বলে, তাই হবে বোধহয়।

আবার দাঁত অর্ডার দেওয়া হল। নতুন দাঁতের সঙ্গে সেই পুরোনো অবনিবনা। তবে একটু-আধটু ভাবও হচ্ছে।

আমাদের বিয়ের রাতেই ফের এক সাঙ্ঘাতিক ঘটনা। বিয়ের অনুষ্ঠানের পর আমরা সবে খেয়ে উঠেছি, হঠাৎ আমার নতুন বউ মালিনী আর্তনাদ করে উঠল। আমার দাঁত!

দাঁত! কী হল দাঁতের?

ওগো, আমি দাঁত খুলে রাখতে ভুলে গিয়েছিলাম। মাংসের সঙ্গে চিবিয়ে খেয়ে ফেলিনি তো! আমার পেটটা কেমন ব্যথা-ব্যথা করছে যে!

দাঁতটা পাওয়া গেল পরদিন বেসিনে। পাওয়া গেল, কিন্তু ভাড়াটে বিয়ে-বাড়ির বেসিনে পড়ে থাকা দাঁত আর মুখে নিল না মালিনী। বিয়ের পর ফের নতুন দাঁত বাঁধিয়ে আসার আগে অবধি সহস্র প্রেমালাপেও তার মুখে হাসি ফোটেনি।

এখনও বছরে ওই একটা দাঁত আমাকে বার দুই-তিন বাঁধিয়ে আনতে হয়।

## ভেজালও কিন্তু একটা আর্ট!

এর পিছনেও প্রবল বুদ্ধি, বিশাল গবেষণা, বিপুল খরচ।

হ্যাঁ মশাই, আপনি কখনও কোনও গোরুকে মিথ্যে কথা বলতে শুনেছেন? নাকি চুরি করতে দেখেছেন? গোরু কি কখনও কাউকে খুন করেছে? নিজের দুধে কখনও জল মেশাতে দেখেছেন? না তো?

না, কারণ গরু বুদ্ধিমান প্রাণী নয়।

অ্যাই! আমিও এই জবাবটাই খুঁজছিলুম। তাহলে কি বলতে চান, বুদ্ধিই যত নষ্টামির গোড়া?

তা কেন? বুদ্ধি এক নিরপেক্ষ শক্তি। বুদ্ধিকে দুর্বুদ্ধি বা সুবুদ্ধি বানানো মানুষের কাজ। বুদ্ধিকে দুর্বুদ্ধি বা সুবুদ্ধি বানাতেও সেই বুদ্ধিকেই তো কাজে লাগাতে হয়! তাহলে হরেদরে তো এটাই দাঁড়াচ্ছে যে, যত নষ্টামির মূলে সেই বুদ্ধিই ঘাপটি মেরে বসে আছে!

কথাটা উঠছে কেন?

মশাই, আগে বলুন আপনি কি ভগবানে বিশ্বাসী?

না হলে?

ক্ষতি নেই, ভগবানের যা ছিরি দেখেছি, কোথায় যেন বলেছে, কৃষ্ণের যতেক লীলা, সর্বোত্তম নরলীলা, নরবদ্ধ তাহার স্বরূপ! বুঝলেন কিনা, তা তিনিই শিশুকাল থেকে কেমন টপাটপ মিথ্যে কথা বলেন, বলুন। মাখন চুরি করে খেয়ে নিপাট ভালোমানুষের মতো যশোদাকে বলছে, ম্যায় নেহি মাখন খায়ু। অমন সত্যিবাদী যুধিষ্ঠিরকে দিয়েও মিথ্যা কথাটা তো তিনিই বলিয়েছিলেন মশাই। বেচারা অর্জুন ভালোমানুষ, ভাইবেরাদার, দাদু, খুড়ো-জ্যাঠাদের ভবলীলা সাঙ্গ করতে চাননি, তখন দুর্বুদ্ধিটা তো কৃষ্ণই দিয়েছিলেন মশাই, আহা সব্যসাচী, ওদের তো আমি মেরেই রেখেছি। তুমি শুধু একটু নিমিত্তের ভাগী হও। ঠিক কি না।

আহা, এটা বড় লঘু ব্যাখ্যা হয়ে যাচ্ছে।

তাহলে কি বলতে চান যে, কৃষ্ণ বোঝাতে চেয়েছেন, জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে? মরতেই যখন হবে, তখন দু'দিন আগে হলেই বা ক্ষতি কী? আর এইভাবেই কি তিনি আপামর জনসাধারণকে একটা গণহত্যার অধিকার দিয়ে দিলেন না?

এটা তো অতিশয় অপব্যাখ্যা!

তা কেন মশাই? দেহটা যে কিছু নয়, খোলসমাত্র। আসল হল আত্মা, দেহ ছেড়েও যে দিব্যি হেসে-খেলে বেড়াতে পারে! এসব কি মানুষকে মৃত্যুর প্ররোচনা দেওয়া নয়? যেমন, দার্শনিক শোপেনহাওয়ার বলেছিলেন, বেঁচে থাকার কোনও অর্থ নেই, সব মানুষের উচিত এক্ষুনি আত্মহত্যা করা।

আপনি আসলে বলতে চাইছেন কী?

ভারতের জনসংখ্যা কত জানেন? আর এই বিপুল জনগণকে খোরপোশ জোগানোর খরচ জানেন? খানেওয়ালা কড়োর, দেনেওয়ালা এক রাম। তা এক রাম আর জোগাতে পারছে না মশাই। ফ্যামিলি প্ল্যানিং ফেল মেরেছে, নিরোধের বিজ্ঞাপনে কাজ হয়নি, এখন যদি কেউ দরদের সঙ্গে জনসংখ্যা কমানোর দায় ঘাড়ে নেয়, তাহলে এত চেঁচামেচি কিসের মশাই?

কী বলতে চান বলুন তো?

আজ্ঞে, রেলের খাবারে ভেজালের কথাই বলছি।

কী আশ্চর্য, খাবারে ভেজাল দিলে শোরগোল হবে না?

একটু আধটু লোক-দেখানো শোরগোল করুন, ক্ষতি নেই। কিন্তু দেখবেন, সিস্টেমটা যেন বন্ধ না হয়ে যায়। ওভাবেই মশাই, ভারতের জনসংখ্যার বাড়বৃদ্ধি ধীরে ধীরে কমতে থাকবে। আলটিমেটলি দেখবেন যারা ভেজাল দিচ্ছে, তারা দেশের উপকারই করছে। আরে মশাই, দু'দিন আগে আর পরে। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তো বলেই রেখেছেন, ওহে, ওদের আমি তো মেরেই রেখেছি। রামকৃষ্ণদেবও কি বলেননি, লোক না পোক।

আপনি কি ভেজালের সাপোর্টার?

তলিয়ে বিচার করলে দেখবেন, ভেজালও একটা আর্ট। প্যারালাল কালচার, একটা বিকল্প বিজ্ঞান। এর পিছনেও প্রবল বুদ্ধি, বিশাল গবেষণা, বিপুল খরচ রয়েছে। রসায়নকে আর-এক উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সরষের তেল, হলুদ-লঙ্কা, মশলার গুঁড়ো, ওষুধ, মিষ্টি, ফাস্টফুড, ঠান্ডা পানীয়, ফলের রস—এতসব আইটেমের জন্য এক-এক রকমের গবেষণা। নোবেল প্রাইজ নাই দিন, অন্তত সম্মানটুকু দেবেন না কেন? মনে রাখবেন এই ভেজালশিল্পের উপর নির্ভর করে বহু মানুষের রুটি-রুজির ব্যবস্থা হচ্ছে।

আর মানুষের প্রাণ?

বঙ্কিম কী বলেছিলেন, মনে নেই? প্রাণ তুচ্ছ, সকলেই ত্যাগ করিতে পারে।

# বাঙালির পয়লা বৈশাখ

বাঙালি নির্লজ্জভাবে যা করে, তা যে অন্যের কাছে বিকট লাগতে পারে, এই বোধটাই এখন আর কাজ করে না।

একথা ঠিকই যে, বাংলা ভাষায় কথা বলাটাই বাঙালিয়ানা নয়। বাঙালিয়ানার আরও কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে মানসিকতা এবং জীবনযাত্রার রকম। কিন্তু দ্রুত পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে মানুষের জাতিসত্তাও কিছুটা বিভ্রান্ত। আমি বাঙালি, না মরাঠি, তামিল না পঞ্জাবি, নাকি একজন বিশ্বনাগরিক? গ্লোবালাইজেশন এক জ্বালা! তার দাপটে এবং ঝাপটায় আমাদের জাতিসত্তা, ভাষা-নাগরিকতা, প্রাদেশিক পরিচয় গৌণ হয়ে যাওয়ার মুখে। ক্ষুদিরাম থেকে নেতাজি সুভাষচন্দ্র, গাঁধীজি থেকে বীর সাভারকর বা সিআর দাশ, নিজের নিজের মতো করে দেশ থেকে ইংরেজ তাড়ানোর চেষ্টা করেছিলেন বটে, সেই তাড়নায় সাহেবরা একসময়ে ভারত ছেড়েও গেল, কিন্তু সবটাই কি গেল? রেখে গেল সাহেবিয়ানা এবং সাহেবের ভাষা। এখন ভূতের মতো ওই দুটি জিনিস আমাদের কাঁধে চেপে ঠ্যাং দোলাচ্ছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে বা পরে বাঙালিকে এত ইংরেজি বলতে শুনিনি! যত দিন যাচ্ছে, তত বাঙালি আরও বেশি জিঘাংসার সঙ্গে ইংরেজি বলছে। আজকাল কথকতার বিস্তর সভাসমিতিতে গিয়ে দেখেছি, সঞ্চালক, বক্তা, শ্রোতা সবাই নিপাট বাঙালি হওয়া সত্ত্বেও সবাই ইংরেজি কইছে। একবার তো এক সভায় বলতে উঠে বিপন্ন কণ্ঠে বলেই ফেলতে হল, মশাইরা, আমি বুঝতে পারছি না যে, আমি কলকাতায় আছি নাকি লন্ডন বা নিউ ইয়র্কে।

বাঙালির অনেক দোষের মধ্যে একটা হল চট করে অন্যের রঙে রঙিন হয়ে যাওয়া। ভারতে ইংরেজ আসার পর সবার আগে ইংরেজি শিখল বাঙালি। দলে-দলে সাহেবও হয়ে গেল বাঙালিই। সাহেব হওয়ার কম্পিটিশনে তারা এখনও এগিয়ে। আর সেটাই বুমেরাং হয়ে ফিরে আসে সেইসব বাঙালির জীবনে, যারা অস্ট্রেলিয়ায় বা আমেরিকায় থাকে। তাদের ছেলেমেয়েরা শিশুকাল থেকে স্কুলের কল্যাণে ল্যাটিন বা অস্ট্রেলীয় অ্যাকসেন্টে ইংরেজি বলে, ওরকম জীবনধারার প্রতি আকর্ষণ বোধ করে এবং প্রজন্মের দূরত্ব এসে বাবা-মায়ের কাছে ছেলেমেয়েকে পর করে দেয়। এই বিপন্নতায় প্রবাসের বহু বাঙালি পর্যুদস্ত। শুধু ভাষাই তো নয়, সেখানকার খুল্লমখুল্লা উদার যৌনতাবোধ, প্রখর স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিস্বাধীনতার ব্যাপারটাও বাঙালির হজম হওয়া দুষ্কর। তারা সাহেব সাজে, সাহেবের ভূমিকায় অভিনয়ও হয়তো করে। কিন্তু প্রকৃত সাহেব তো আর হয়ে যায় না। তাই ছেলে-মেয়ের সাহেব হয়ে যাওয়া তাদের আলোড়িত করে কমই। কতিপয় বাঙালির অবস্থা কিছুটা করুণ। তারা বিদেশে থাকে না বটে, কিন্তু এদেশেই বিদেশ-রচনার ব্যর্থ একটা চেষ্টা করে।

ইদানীং এদের সংখ্যার কিছু বাড়বাড়ন্ত দেখছি। এঁরাই বলেন, দুঃখ কী জানেন মশাই, সুকুমার রায় কী ভালো লেখেন, কিন্তু আমার ছেলে (বা মেয়ে) তো বাংলা পড়তেই পারে না!

শোনা যায় প্রাচীন বাঙালির মার্কামারা পোশাক ছিল আদুর গা আর নিম্নাঙ্গে মালকোঁচা মারা ধুতি। শীতকালে বড়জোর একটা চাদর চড়াত গায়ে। সুতরাং বাঙালির পোশাকের তেমন কোনও ট্র্যাডিশনও নেই। এখন বাঙালি যা-খুশি পরে। খাদ্যাভাসেও তার কোনও বাছাবাছি নেই। বড়ি-দেওয়া শুক্তো, ইলিশ-ভাপা যেমন খায়, তেমনই অম্লানবদনে বিদেশে গিয়ে ব্যাঙ ভাজা বা সাপের ঝোলও সে খেয়ে নিতে পারে। এমন উদার বিশ্বজনীন রসনা মাড়োয়ারি গুজরাতি, তামিলদের নেই।

বাঙালির সামান্য লক্ষণ খুঁজতে তাই হায়-হয়রান হতে হয়। কমলকুমার মজুমদার বিশ্বাস করতেন, পশ্চিমবঙ্গের বামুন-কায়েত ছাড়া আর কেউ প্রকৃত বাঙালিই নয়, বাঙালরা তো নয়ই।

তাই মুশকিল হয়েছে। এই পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরাই বরং নিজের জাতিসত্তা এবং অস্মিতা বিসর্জন দিতে বসেছে। তাই মাঝে-মাঝেই আমাদের এই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়, বাংলা ভাষা কি বিপন্ন?

তা বিপদ আছে বই কী। অভিজাত, উচ্চবিত্ত বা উচ্চমধ্যবিত্তরা যেমন ইংরেজিকে মাতৃভাষা মানতে লেগেছে, তেমনই তৃণমূল স্তরের নিম্নবিত্ত বাঙালি আবার আঁকড়ে ধরেছে অমিতাভ বচ্চন, শাহরুখ খানের ভাষাকে। হিন্দিতে বুকনি ঝাড়তে পারলে তারা বিশেষ আত্মপ্রসাদ লাভ করে। তারা রবি ঠাকুরের কোটেশন জানে না বটে, কিন্তু সাফল্যের সঙ্গে হিন্দি গান থেকে লাগসই কোটেশন ঝাড়তে পারে। যত দিন যাচ্ছে ততই যেন বাঙালিকে চেনা একটু একটু করে ভারী কঠিন হয়ে যাচ্ছে।

বিস্কুট দু'ভাগ করার মতো বাংলাকে দু'ভাইয়ের হাতে ভাগ করে দেওয়া হল বটে, কিন্তু তাতে বাঙালির আত্মপরিচয়ের সংকট বাড়ল বই কমল না। আমরা এক-টুকরো বাংলা পেলাম। ওরা পেল এক-টুকরো পাকিস্তান। পশ্চিমের বাংলার টুকরোতে নানা ঘোলা জল এসে মিশল—নানা সংস্কৃতি, ভাষা, হিন্দি সিনেমার দাপট, মার্কিন দেশের হাতছানি, ইংলিশ মিডিয়ামের আধিপত্য, গ্লোবাল হয়ে ওঠার লোভ। ওপার বাংলায় উর্দুর চাপে বাংলার অস্তিত্বই বিপন্ন। কেউ ভালো ছিলাম না আমরা। কিন্তু হঠাৎ একদিন ওপার বাংলায় বাঙালি অস্মিতার যে-বিস্ফোরণ ঘটল, তাই বোধহয় গোটা দুনিয়ায় বাঙালির এক তুলনাহীন আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠা করে দিল।

বাঙালির আরও-একটি নববর্ষ এল সদ্য। পালে-পার্বণে বাঙালি নিজের ট্র্যাডিশনকে দয়া করে স্মরণ করে আজও। হালখাতা হয়, বর্ষবরণ হয়, রবীন্দ্রগানে বৈশাখের আগমন সূচিত হয়। বাঙালির হঠাৎ মনে পড়ে, সে বাঙালি। ঘটা করে স্মরণ করে। তারপর ভুলে যেতেও বেশি সময় লাগে না। কিন্তু বাংলাদেশ বর্ষবরণকে জাতীয় উৎসব বলে মানে, তার ঘটাটাই আলাদা। দেখেশুনে কারও যদি এই বাংলা সম্পর্কে হতাশা আসে, সেটা বোধহয় ততদূর দোষের নয়।

সেদিন চিন্ময় গুহর একটা লেখায় পড়ছিলাম, প্যারিসে এক সম্মেলনে উপস্থিত দুজন বাঙালিকে পরস্পরের মধ্যে ইংরেজিতে কথা বলতে দেখে একজন ফরাসি বুদ্ধিজীবী চিন্ময়কে বলেছিলেন, ওঁরা কি মানসিকভাবে অসুস্থ? বাঙালি নির্লজ্জভাবে যা করে তা যে অন্যের কাছে বিকট লাগতে পারে, এই বোধটাই এখন আর কাজ করে না।

কমলকুমার যতই বলুন বাঙালি শুধু পশ্চিমবঙ্গের বামুন-কায়েত, শেষ অবধি না আমাদের বাঙালি খুঁজতে সেই বাংলাদেশেরই দ্বারস্থ হতে হয়!

## এ বাংলায় বাঙালির অস্মিতা কোথায়

বেশ অনেকদিন আগে একটি পুরস্কার উপলক্ষে দিল্লি গেছি। অনুষ্ঠানের পর কয়েকজন হিন্দি দৈনিকের সাংবাদিক আমার সঙ্গে কথা বলতে এলেন। আমি হিন্দিতে সড়গড় নই বলে ইংরেজিতে বলতে চাইছিলাম। ওঁরা বললেন, আরে, আপনি বাংলাতেই বলুন না, কোনও অসুবিধে নেই। অবাক কাণ্ড! আমি দিব্যি বাংলাতে বলে গেলাম, ওঁরা ওঁদের ভাষায় তা লিখে নিলেন। শুধু একজন সাংবাদিক কাতরভাবে বললেন, স্যার, আমি বাংলা একদম জানি না। আমাকে যদি হিন্দিতে সাক্ষাৎকার দেন তবে ভালো হয়। আমি বললাম, আমার হিন্দি যে বড়ই টুটাফুটা। তিনি গম্ভীর হয়ে বললেন, ওতেই হবে স্যার। এবং হলও।

ভাষাগত দূরত্ব আমাকে হিন্দি বলয়ে কিন্তু তেমন বিপাকে কখনও ফেলেনি। রামচন্দ্রের বনবাসের পথ পরিক্রমায় গিয়ে আমি ইউপি-র আম-জনতার সঙ্গে একেবার একাত্ম হয়ে গিয়েছিলাম। ১৯৭৬ সালের সেই অভিজ্ঞতা আমাকে শিখিয়েছে যে, একেবারে তৃণমূল স্তরের মানুষের সঙ্গে মিশলে, প্রয়োজন এবং আগ্রহ থাকলে, ভাষা শিখে নিতে সামান্যই সময় লাগে—আমি কাজ-চালানোর মতো হিন্দি পথেঘাটের লোকের কাছ থেকেই শিখে নিয়েছিলাম দিন চারেকের মধ্যেই।

অসম সাহিত্যসভার আমন্ত্রণে গুয়াহাটি গিয়ে তাঁদের উৎসবের আয়োজন দেখে আমি থ! বিশাল প্রাঙ্গণ জুড়ে কত যে মণ্ডপ আর কী বর্ণময় আয়োজন! ওঁদের স্লোগান ছিল 'চির চেনেহি মোর ভাষা-জননী'। অর্থাৎ, চির স্নেহময়ী আমার ভাষা-জননী। মাতৃভাষা নিয়ে অসমবাসীর আবেগ ও স্পর্শকাতরতা আমাকে মুগ্ধ করেছিল। ভাষণ দিতে উঠে ইংরেজিতে বলব কি না ভাবছি, হঠাৎ পিছন থেকে কর্মকর্তারা সমস্বরে বলে উঠলেন, আপনি বাংলায় বলুন, আমরা বুঝতে পারব। আসলে বাংলা ও অসমিয়া ভাষার দূরত্ব খুব কম। বর্ণমালা প্রায় এক, ধ্বনিগত সাদৃশ্যও চমকপ্রদ। বলতে না পারলেও আমি ভাষাটা বেশ খানিকটা বুঝতে পারি। এবং চেষ্টা করলে খুব অল্পদিনের মধ্যে তা যে-কোনও বাঙালি রপ্ত করতে পারবে।

শোনা ছিল, দক্ষিণ ভারতের লোক হিন্দি জানে না, তবে সবাই ইংরেজি বোঝে। কয়েকবার চেন্নাই গিয়ে সেই ভুল ভেঙেছে। রিকশাওলা, পানওলা, রেস্টোরেন্টের বয় কেউ হিন্দি বা ইংরেজির কিছু বোঝে না, হয় অঙ্গভঙ্গি করে বোঝাতে হয় কিংবা হাল ছাড়তে হয়। কিন্তু একজন রিকশাওলা আমাকে বলেছিল, তামিল ইজ অ্যান ইজি ল্যাঙ্গুয়েজ স্যার, ইউ ক্যান লার্ন ইট কুইকলি।

এই ঘটনাগুলো বলতে হল এটা বোঝাতে যে, ভারতবাসী যে যার মাতৃভাষার প্রতি একটা স্বতঃস্ফূর্ত আনুগত্য বহন করে চলে। মাতৃভাষাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতে আমি বড় একটা কাউকে দেখিনি। মহারাষ্ট্রেও দেখেছি মরাঠি অস্মিতা কী প্রবল!

একবার এসি টু টিয়ারে দিল্লি যাচ্ছিলাম। আমার উলটোদিকে একটি মাঝবয়সি বাঙালি দম্পতি আর তাদের একটি ইংলিশ মিডিয়ামের বছর পাঁচ-ছ'য়ের বাচ্চা। দেখলাম, স্বামী আর স্ত্রী মাঝে মাঝে একটু-আধটু বাংলা বলছেন বটে, তারপরই ভুল শুধরে ইংরেজি কইছেন। বাচ্চা পাছে বাংলা শিখে ফেলে সেই ভয়েই বোধহয়। আমার সঙ্গে ভদ্রলোকের কয়েকটি বাক্য বিনিময় হল। কিন্তু আমি বাংলা বলছি দেখে তিনি আমার সঙ্গে কথা বলার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে জানলার দিকের সিটে বসা দুই অবাঙালি যুবকের দিকে আগ্রহী হয়ে পড়লেন। যুবক দু'জন এই গায়ে-পড়া আলাপ পছন্দ করছিল না, কিন্তু ভদ্রলোক নাছোড়বান্দা। ইংরেজি না বললে তাঁর যে আইঢাই হচ্ছে তা আমি বেশ বুঝতে পারলাম। তখন খুব মন দিয়ে আমি দৃশ্যটা দেখতে এবং কথাগুলো শুনতে লাগলাম। বুঝলাম, তিনি যে দিশি এবং পাতি ইংরেজি বলছেন, তা বলতে পারাটা শ্লাঘার বিষয় নয়। তবু তাঁকে এক নিয়তি-নির্দেশেই যেন বলে যেতে হচ্ছে।

আজকাল কথাবার্তার বেশ কিছু সভা-সমাবেশে আমাকে যেতে হয় এবং সেখানেও গিয়ে দেখি, দর্শক-শ্রোতা, সঞ্চালক, বক্তা সবাই বাঙালি হওয়া সত্ত্বেও কোনও অজ্ঞাত কারণে প্রবল ইংরেজি বর্ষিত হচ্ছে। এর কারণটা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় খুঁজেছিলেন, আমি খুঁজেছিলাম এবং আমাদের মতো আরও অনেকে এখনও খুঁজছে।

অথচ দেখতে পাই কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী অবাঙালিরা চমৎকার বাংলা বলেন। হর্ষ নেওটিয়া, সঞ্জীব গোয়েনকা, গুরবক্স সিংহ বা কিশোর ভিমানির মুখে পরিশীলিত বাংলাই শুনতে পাই। অথচ উচ্চশিক্ষিত, উচ্চপদস্থ কর্পোরেট কর্তা কিংবা উচ্চমধ্যবিত্ত বাঙালির মুখ থেকে বাংলা বের করা গোরুর বাঁট থেকে হাঁসের ডিম বের করার মতোই শক্ত। আজকাল বাঙালি পপ গায়িকা বা অল্পবয়সি অভিনেত্রীরাও দেখছি সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় বাক্যটা বাংলায় শুরু করেই বাকিটা ইংরেজিতে বলেন। দু-চারটে বাংলা শব্দ দয়া করে উচ্চারণ করেন মাত্র, অথচ গান করেন বাংলায়, অভিনয়ও করেন বাংলায় সংলাপ বলে। তবু এই বকচ্ছপ ভাষার উদ্ভব হচ্ছে কেন কে জানে!

স্কুলে বাংলা আবশ্যিক হচ্ছে বলে এঁরা খুবই উদ্বিগ্ন, বাংলা শিখলে না প্রজন্ম উচ্ছন্নে যায়! আমার ধারণা, বাংলা আবশ্যিক হলে এখনকার অবাঙালিদের তেমন অসুবিধে বা আপত্তি হবে না। কয়েকটি রাজ্যে নিয়মটি আছে এবং সেখানকার বহিরাগতরা তা মেনেও নিয়েছে, অসুবিধে যদি কিছু হয়, তবে হবে কতিপয় বাঙালিরই। কিন্তু স্মরণে রাখতে হবে, ব্রিটিশ আমল থেকেই বাঙালিকে ইংরেজি, বাংলা এবং সংস্কৃত শিখতে হয়েছে। ইংরেজি শিখতে গেলে বাংলা ভুলতে হবে এমন তো কথা ছিল না!

ইংরেজি এক মহান ভাষা, আমাদের দিগন্তকে অবারিত এবং উন্মোচিত করে দেয়। সারা বিশ্বেই তার প্রসার। সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, এমনকী তথ্যপ্রযুক্তিও ইংরেজিনির্ভর। এই ভাষাকে উপেক্ষা করার উপায় নেই। রামমোহন, মাইকেল, বঙ্কিম থেকে শুরু করে তৎকালে সব শিক্ষিত বাঙালিই ছিলেন ইংরেজিতে ধুরন্ধর। তা বলে তাঁদের বাংলা ভুলবার তো দরকার পড়েনি! আর এখনকার বাঙালি পার্ক স্ট্রিটে গেলেই কেন যে ইংরেজি বলতে শুরু করে কে জানে! আমাকে প্রায় সময়ই কলকাতার ঘ্যাম হোটেল-রেস্তরাঁয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যেতে হয়। কর্মচারীদের সঙ্গে আমি তো দিব্যি বাংলায় বাক্যালাপ করি, কোনও অসুবিধেই হয় না।

কয়েকবছর আগে লা মার্টিনিয়েরের ছেলেরা এসে বলেছিল, তারা বাংলা ভাষার চর্চা শুরু করেছে এবং এই বিষয়ে একটি সেমিনার করতে চায় আমাকে নিয়ে। আমি রাজি হই, সেমিনারে শিক্ষকরাও উপস্থিত ছিলেন, সভায় ভিড়ও হয়েছিল প্রচুর। অনুরূপভাবে বারকয়েক বাংলা ভাষা নিয়ে চমৎকার আলোচনাসভা করেছিল সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ, ভারী স্বস্তি বোধ করেছিলাম।

বাংলার সরকার বাংলা ভাষা আবশ্যিক করার যে-সিদ্ধান্তটি নিয়েছেন, তা নিয়ে আপত্তি উঠবে, বিতর্কও হবে। বিশিষ্টজনেরা মতামত দেবেন। কিন্তু এক শ্রেণির বাঙালি বাংলা ভাষাকে যেমন তুচ্ছতাচ্ছিল্য করছেন, সেটা মোটেই গৌরবের ব্যাপার নয়।

নিউ ইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস-এ আমি বেশ কিছুদিন ছিলাম। সেটা বাংলাদেশিদের এলাকা। কলকাতায় বাংলা সাইন বোর্ড বেশি নেই বলে সুনীল পথে নেমে আন্দোলন করেছিলেন। আর জ্যাকসন হাইটস-এ সারি-সারি দোকানে বাংলা সাইন বোর্ড। পথেঘাটে বাংলা এবং বাঙাল ভাষাই শোনা যায়। গোটা আমেরিকায় কয়েক শতাধিক বাংলা পত্রপত্রিকা বেরোয়। আমেরিকায় তারা আর-একটা বাংলাদেশে বানিয়ে নিয়েছে। বাঙালি হিসেবে তাদের যে অস্মিতা, তা ছিটেফোঁটাও যদি এ-বাংলার বাঙালির থাকত!

# তিন টুকরো আমি

## ১। বিমানযাত্রা

পাইলট! পাইলট! বলে এক-একদিন ঘুমের মধ্যেও চেঁচিয়ে উঠে বসতুম। শব্দটা ছিল ম্যাজিকের মতো। শুনলেই শিরা টানটান, রক্তে জোয়ার, পেশীতে হিলিবিলি।

ওই অনেক ওপর দিয়ে, মেঘের ভেতরে বা সূর্যের গা ঘেঁষে গঙ্গাফড়িং-এর মতো প্লেনটা যে ভেসে যাচ্ছে তা দুহাতের পাতায় চোখ রোদ-আড়াল করে অপলক দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে মনটা কোথায় চলে যেত। মনশ্চক্ষে তখন পাইলটকে দেখতুম। রূপবান, রহস্যময়, শক্তিমান ও ভয়ংকর এক পুরুষ। তার চোখে কালো চশমা। তার পায়ের নীচে তুচ্ছ হয়ে পড়ে থাকে পাহাড় পর্বত, সমুদ্র তার কাছে গোস্পদ। আকাশ ফেঁড়ে দুরন্ত ঝড়ের মতো সে উড়ে যায় দেশ দেশান্তর। সে ইচ্ছে করলেই বোমা ফেলতে পারে, ইচ্ছে করলেই বেড়িয়ে আসতে পারে চাঁদে, ইচ্ছে করলেই সে পারে সূর্যের গায়ে পাঁউরুটি সেঁকে নিতে। পাইলটকে কখনও ভাবতুম দস্যু মোহন কখনও রবিন হুড। ম্যাজিশিয়ান, সার্কাসের খেলোয়াড়, রিং মাস্টার কুস্তিগীর ও মুষ্টিযোদ্ধা একসঙ্গে মিশিয়ে তবে একজন পাইলট। বরং তার চেয়েও কিছু বেশি।

একজন বন্ধু বলেছিল তার কাকা প্লেনের জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে মেঘ ধরেছিল। মেঘ নাকি খুব ঠান্ডা, অনেকটা আইসক্রিমের মতো। কাছে থেকে প্লেন দেখেছিলুম প্রথম মালবাজারে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার কোনও একটি প্লেন কবে ভেঙে পড়েছিল একটা ছোট্ট জঙ্গলের মধ্যে। দোমড়ানো মোচড়ানো ছিটানো সেই প্লেনটির গায়ে তখন লতা বাইছে, ঘাসজঙ্গলে ডুবে গেছে তার শরীর। করুণ সেই অবস্থা দেখে বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে, এই জিনিস একদিন আকাশে উড়ত। তবু প্রতিদিন সেই জঙ্গলে ঢুকে প্লেনটাকে দেখে আসতে হত। নেশার মতো দাঁড়ায় অভ্যাসটা। রাতে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখতুম, কালো চশমা পরা দুর্দান্ত পাইলট এসে ভাঙা প্লেনটা স্ক্রু-ড্রাইভার দিয়ে জোড়া লাগাল। তারপর সাঁ করে উড়ে গেল আকাশে।

সেইসব স্বপ্ন একদিন বাস্তবে নেমে এল। উত্তরবঙ্গের বছরওয়ারি বন্যায় সেবারও রেললাইন ভেসে গেছে, সড়ক ভেঙে পড়েছে, হারিয়ে গেছে ব্রিজ। কুচবিহারে জলবন্দী আমি ফিরব শিলিগুড়ি। তখন বেসরকারি একটি প্লেন কুচবিহার-শিলিগুড়ি ট্রিপ দিচ্ছে রোজ। ভাড়া মাথাপিছু পনেরো টাকা। টিকিট কেটে এয়ারড্রোমে হাঁ করে ঊর্ধ্বমুখে দাঁড়িয়ে আছি। প্লেন আসবে তো? অন্য কোথাও চলে গেল না তো! আর এলেও আমাকে উঠতে দেবে তো! শেষ অবধি কোনও গণ্ডগোল হবে না তো!

এল শেষ অবধি। প্রথমে দিগন্তে একটি মাছি, তারপর ফড়িং তারপর পাখি এবং সবশেষে এরোপ্লেনের আকার নিয়ে দুই প্রপেলারের নিদারুণ শব্দ করতে করতে জ্যান্ত প্লেন আমার চোখের সামনে নেমে পড়ল। চেহারা দেখে উৎফুল্ল হওয়ার মতো কিছু ছিল না প্লেনটার। পুরোনো আমলের ডাকোটা। একটু নড়বড়ে

লজঝড়ে চেহারা। নামামাত্রই একদল কুলি দরজা খুলে দুমদাম ভিতরে মাল বোঝাই করতে লাগল। যাত্রীদের বলা হল, মাল ওঠার পর তারা উঠবে। আমরা অপেক্ষা করতে লাগলুম অধীর আগ্রহে।

ককপিটে থেকে একজন রোগা, ক্ষয়াটে চেহারার খাকি ফুলপ্যান্ট আর সাদা হাফশার্ট পরা লোক নেমে এল। ডেলা পাকানো চোখ। চিনেবাদামওয়ালার কাছ থেকে সে এক আনার বাদাম কিনে ফাউ চাইল এবং তাই নিয়ে একটু বচসাও করল বাদামওলার সঙ্গে।

আমার পাশে দাঁড়ানো এক যুবক মাড়োয়ারি আমার কানে ফিসফিস করে বলল, পাইলম! পাইলট!

পাইলট! যে-শব্দ শুনে শিশুকাল থেকে আমার রক্ত উদ্দাম হত এ সেই পাইলট! কোথায় এর কালো চশমা, দুরন্ত স্বাস্থ্য রহস্যময়তা? পাইলট কি কখনও আমাদের মতো চিনেবাদাম খায়। ফাউ চায়? বিশ্বাস হল না। কী করে শিশুকাল-থেকে-দেখে-আসা স্বপ্নকে এ-রকম ভঙ্গুর বাসনের মতো চুরমার হয়ে যেতে দিই?

মাল উঠল। তারপর আমাদেরও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে উঠতে দেওয়া হল প্লেনে। ভিতরে ডাঁই হয়ে আছে তামাকপাতা, প্যাকিং বাক্স, বস্তা। বসার জায়গা বলতে প্লেনের দেয়ালে কয়েকটা ফ্লোল্ডিং অ্যালুমিনিয়ামের ট্রে-র মতো। গদি বা সিট বেল্টের ব্যবস্থা নেই। যে যার মতো বসে পড়ো। সেই ডেলা-পাকানো চোখ, খাকি প্যান্ট রোগা ভোগা চেহারার লোকটাই ককপিটে উঠল। বিকট শব্দ করে প্লেনটা কিছুক্ষণ দৌড়ে একখানা তুর্কী লাফ মারল আকাশে। আমার পাশে বসা মাড়োয়ারি যুবকটি 'বাপ রে' বলে জানলার খাঁজ আঁকড়ে ধরল। আমিও ছিটকে পড়তে পড়তে সামনের একটা প্যাকিং বাক্স ধরে সামাল দিলুম।

বিমান আবিস্কারের প্রথম যুগে বোধহয় এ-রকম অভিজ্ঞতা হত মানুষের। প্লেনের সর্বাঙ্গে ম্যালেরিয়া রুগির মতো কাঁপুনি, নাটবল্টু এবং অন্যান্য নড়বড়ে যন্ত্রপাতির ধাতব আওয়াজ অসার যাত্রীদের মৃদু বা উচ্চকিত আর্তনাদ মিলেমিশে এক আতঙ্কিত বাতাবরণ। ডাঁই করা মালপত্র দড়ি দিয়ে আঁট করে বাঁধা হয়েছে মেঝেয় বসানো আংটার সঙ্গে, তবু ঝাঁকুনিতে সেগুলো হেলে পড়তে চাইছে। একটা ছোট প্যাকিং বাক্স খানিকদূর নেচে নেচে চলেও গেল।

তবু বলব প্রথম বিমানভ্রমণের থ্রিলও কিছু ছিল। ওপর থেকে পৃথিবীর চেহারা কখনও দেখিনি। সেদিন আকাশে ঝুলে থেকে দেখলাম সেই আশ্চর্য দৃশ্য। যা কত বড়সড় মনে হত তা কত ক্ষুদ্র হয়ে গেছে। ওই তো তোরসা নদী, যার দাপটে কুচবিহার জলের তলায় কুঁকড়ে গেছে, তা নালার মতো ক্ষুদ্রকায় হয়ে পড়ে আছে, নীচে কী হাস্যকর রকমের খেলাঘর বলে মনে হল পিলখানাকে, সাইডিং-এ দাঁড় করানো একসার মালগাড়িকে দেখাল হেলে সাপের ছেড়ে যাওয়া খোলসের মতো।

মাত্র বিশ-পঁচিশ মিনিটের সেই ওড়া। মাত্র বিশ-পঁচিশ মিনিটই আমার আশৈশব-লালিত বহু ধারণার মিনার ভেঙে দিল কালাপাহাড়ের মতো। যখন শিলিগুড়ির বাগডোগরা এয়ারপোর্টে নামলুম তখন আমি অন্য মানুষ। বয়ঃসন্ধি পেরিয়ে যেন প্রাপ্তবয়স্ক, অভিজ্ঞ, বিষণ্ন।

শুনতে পাই, সেইসব পুরোনো ডাকোটা এখন আর চালু নেই। সম্ভবত, নেই সেইসব পাইলটও। কুচবিহারের সেই ক্ষুদে এয়ারপোর্ট কবে বন্ধ হয়ে গেছে, এখন সেখানে সম্ভবত ধান চাষ হয়। তবে আমাকে তার পরে আরও বহুবার প্লেন-এ চড়তে হয়েছে। বোয়িং ৭৩৭ বা এয়ারবাস। শীততাপ নিয়ন্ত্রিত সুগন্ধী অভ্যন্তর, নরম গদি, মৃদু বাজনা, স্মার্ট বিমানসেবিকা, শব্দহীন পরিবেশ, চা, কফি ও স্ন্যাকস—সব-মিলিয়ে একটা বেশ সুসভ্য বড়লোকী ব্যাপার। একটু উটকো, গেঁয়ো, আগন্তুকের মতো বসে থাকি। কিছুতেই যেন আমার সঙ্গে এইসব প্লেন-এর কমিউনেকশন বা রাপোর্ট হয় না।

তবে একবার হল। গৌহাটি থেকে কলকাতায় ফেরার পথেই বুঝি। আকাশে প্রচণ্ড মেঘ ছিল। বোয়িং স্বচ্ছন্দে উঠে গিয়েছিল মেঘস্তরের ওপর সূর্যালোকিত আকাশে। কিন্তু তলায় মেঘ থাকলে বায়ুস্তরে অসমান নানা ফাঁকফোকর সৃষ্টি হয়। ফলে আধুনিক বোয়িং অবিকল হুবহু গ্রাম্য রাস্তায় গরুর গাড়ি যেমন ঝকাং ঝকাং করে লাফায় তেমনি লাফাতে লাগল। তার সারা গায়ে ম্যালেরিয়া কাঁপুনি, মচমচ শব্দ। যাত্রীদের অনেকেই ওয়াক তুলে ফেলতে লাগলেন। একজন সুবেশা এয়ার হোস্টেস খাবারের প্যাকেট নিয়ে যেতে

যেতে ব্যালেন্সের খেলায় হার মেনে আমার গায়ে এবং পাশের দুটি খালি সিটের ওপর সবকটা প্যাকেট বর্ষণ করে নিজেও বর্ষিত হলেন তার ওপর। একবার 'সরি' বলার মতোও শারীরিক অবস্থা নয়। শুধু আমাদের দিকে চেয়ে করুণ মুখে মাথাটা নাড়লেন। সেদিন প্লেনের বেয়াদবি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, নিজের কোলে পড়ে-থাকা খাবারের প্যাকেটটি তুলে পাশের সিটে রেখে দেওয়ার ক্ষমতাটুকু পর্যন্ত আমার ছিল না। প্লেন তখন সেকেণ্ডে আট-দশ ফুট করে হাই জাম্প, লং জাম্প দিচ্ছে। কখনো দুলছে দোলনার মতো। এক-একবার প্রবল তাড়নায় মনে হচ্ছে, দু'আধখানা হয়ে ভেঙে পড়ে যাবে আধুনিক বোয়িং ৭৩৭। সিট বেল্ট কষে আঁটা থাকা সত্ত্বেও ভয় হচ্ছে, এবার ছিটকে পড়ে যাব।

কিন্তু আশ্চর্য এই, আমার তেমন খারাপ লাগছিল না। জীবনে প্রথম প্রেমের মতো আমার ভিতরেও একটি দুর্বলতা নিজের অজান্তেই থেকে গেছে। কুচবিহার থেকে যে-লজঝরে পুরোনো আমলের মালবাহী ডাকোটা আমাকে প্রথম মাধ্যাকর্ষণের মায়া কাটিয়ে আকাশে তুলেছিল তার সঙ্গে কী করে যেন আমার একটা স্থায়ী কোমল হৃদয়াবেগের সম্পর্ক থেকে গেছে। থেকে যে গেছে তা টের পেলুম এই এতদিন পর, অসমান বায়ুস্তরে নাজেহাল বোয়িং বিমানে বসে।

কুচবিহারের সেই প্লেনটা ছিল নিতান্তই গরিব-দুঃখী শ্রেণির। হতাদর সেই বিমান তামাকপাতা আর প্যাকিং বাক্স বয়ে বয়ে ইজ্জত হারিয়েছে। তার মধ্যবিত্ত পাইলট নিতান্তই পকেটের জোর নেই বলে চিনেবাদাম কেনে এবং ফাউ না পেলে ঝগড়া করে। সেই প্লেন এবং তার পাইলট আমার সযত্নে রচিত এক স্বপ্নকে ভেঙে দিয়েছিল বটে, কিন্তু ছাপোষা গেরস্তঘরের বয়ঃসন্ধির এক বালকের হৃদয়কে চমকে দেয়নি ঝা-চকচকে মহার্ঘ্য সম্ভার দিয়ে। তার সঙ্গে আমার শ্রেণীবৈষম্য ছিল না। তাই স্বপ্নভঙ্গ ঘটে থাকলেও সেই বিমান ও তার পাইলটের সঙ্গে আমার এক সহানুভূতির যোগসূত্রও রচিত হয়ে গিয়েছিল নিজের অজান্তে। বোয়িং বিমানের ওলটপালটের মধ্যে বসে সেটা স্পষ্ট টের পেলুম। স্পষ্ট টের পেলুম, আমার ভিতরে পুরোনো সেই ডাকোটা প্লেনটা হেসে খুন হচ্ছে, হাসতে হাসতে গড়াগড়ি খেতে খেতে বোয়িং ৭৩৭-টাকে বলছে, এখন কেমন, অ্যাঁ? খুব তো ফুটুনি মারছিলে, এখন কেন নাকের জলে চোখের জলে?

পৃথিবীর যে-কটি ডাকোটা আজও অবশিষ্ট আছে তারা আজ আধোবদন, ম্লানমুখ। অতি গোপনে আকশের সংকীর্ণ গলিপথ দিয়ে আজও তারা বিড়ি বা তামাক পাতা নিয়ে ওড়াউড়ি করে। তাদের ওড়ায় চিনেবাদামখেকো, রোগা ও গরিব পাইলট। একদিন গোপনে অশ্রু বিসর্জন করতে করতে তারা নিঃশব্দে বিদায় নেবে। গগনবিদারী নতুন নতুন সব প্লেন ছেয়ে ফেলবে পৃথিবীর আকাশ। সেদিন অখ্যাত অজ্ঞাত সব এয়ারপোর্টে বিড়ির বাণ্ডিল আর তামাকপাতা বোঝাই হবে বোয়িং আর এয়ারবাসে। পাইলটরা চিনেবাদাম খেতে খেতে উদাস দৃষ্টিতে দিগন্তে চেয়ে থাকবে।

পৃথিবীর এ-রকমই নিয়ম

## ২। এক নম্বর ও দু'নম্বর আমি

আমার সঙ্গে আমার দেখা হয় রাত বারোটার পর। এই যে এক নম্বর আর দু'নম্বর আমি, এদের মধ্যে একজন অবিকল আমার মতো সাদামাটা। তার নাকটা উঁচু এবং বাঁকা, দাঁত সামান্য বড়, জুলজুলে ভীতু-ভীতু চোখ, মাথায় পাতলা হয়ে আসা চুল, কোলকুঁজো, একটু ক্যাবলা, একটু আত্মসচেতন, একটু হীনম্মন্য, অবশ্যই আনস্মার্ট। আর-একজন আমি দেখতে রীতিমতো ভালো। তার নাক উঁচু হলেও বাঁকা নয়, দাঁত চমৎকার সাজানো, চোখে বুদ্ধিদীপ্ত চাউনি, সটান এবং সবল চেহারা, মাথায় ঘন কেশদাম। এই পার্থক্য সত্ত্বেও আমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক বেশ চমৎকার।

১৯৫৬-তে এক নম্বর আমির নাকের ডগা দিয়ে দু'নম্বর আমি রোম অলিম্পিকে গিয়ে দৌড়ে এবং লাফ-এ পাঁচটি সোনার মেডেল নিয়ে এসেছিল। পাঁচটিই বিশ্বরেকর্ড। ১৯৫৭ থেকে সে টানা আটবার জয় করে উইমবলডন সিঙ্গলস টেনিস খেতাব, এর মধ্যে পাঁচবার গ্র্যাণ্ড স্লাম। তারপর থেকেই দু'নম্বর আমির মাথায় চাপে পলিটিকস। পায়ে হেঁটে সে সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়ায় এবং হাজার হাজার লোকের সঙ্গে তার

আঁতাত হয়। লক্ষ লক্ষ মানুষ তাকে নিজেদের লোক বলে চিনতে পারে। ফলে ষাটের দশকের কোনো এক বছর সে তার দল নিয়ে নির্বাচনে দাঁড়ায় এবং বিপুলভাবে জয়ী হয়। সেই জয় এমনই নির্মম যে বিরোধী পক্ষের একজনও সংসদে নির্বাচিত হতে পারেনি। সে তখন নিজের দলের পাঁচজন এম পি-কে পদত্যাগ করায় এবং সেই জায়গায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে পাঁচজন বিরোধী নেতাকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত করিয়ে আনে। মোটকথা তার আধিপত্য ছিল নীরেট ও সম্পূর্ণ। এই দু' নম্বর আমি কিন্তু একজন ব্যর্থ প্রেমিক। না, যথার্থ ব্যর্থ প্রেমিক বলতে যা বোঝায়, সে কোনওদিনই তা নয়। তার জন্য অড্রে হেপবার্ন থেকে শুরু করে হেমা মালিনী বা আরও সব সুন্দরীরা পাগল। কিন্তু সে নিরুত্তাপ। জন্ম-রোম্যান্টিক হওয়া সত্ত্বেও সে জানে, প্রেমিকাকে বউ করতে নেই। সে তো গাড়ল নয়। দীর্ঘদিন যাবৎ এই দু' নম্বর আমির বয়স দাঁড়িয়ে আছে চব্বিশে। দেশের সে তরুণতম প্রধানমন্ত্রী, বিশ্বের তরুণতম পথপ্রদর্শক। লেখক হিসেবে একবার, শান্তির দূত হিসেবে একবার এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত খুলে দেওয়ার জন্য আর-একবার—এই মোট তিনবার সে নোবেল প্রাইজ পেয়েছে। তার আমলেই ভারত হয়ে দাঁড়াল বিশ্বের বৃহত্তম শক্তি। প্রতিটি ভারতীয়ই হল লক্ষ বা কোটিপতি। তার আমলে খুন জখম রাহাজানি দাঙ্গা নারী ধর্ষণ চুরি ঘুষ ভেজাল করফাঁকি কালোটাকা লালফিতা মূল্যবৃদ্ধি ধর্মঘট লক আউট ক্লোজার মিছিল বিক্ষোভ আত্মহত্যা কলেরা বসন্ত মহামারী ক্যানসার করোনারি ও সেরিব্রাল থ্রম্বসিস বিমান-রেল-বাস দুর্ঘটনা ঘাটতি বাজেট ঝগড়া মারপিট গালাগাল অপমান মাতলামি বেশ্যাবৃত্তি জনসংখ্যাবৃদ্ধি গুণ্ডামি সমকাম পশুহত্যা ইত্যাদি সম্পূর্ণ লোপ পেল। সারা দেশে অখণ্ড শান্তি আর সমৃদ্ধি। ভারতের ক্যামেরা, ভারতের লাইটার, ভারতের কলম, ভারতের মোটরগাড়ি, জাহাজ, ফ্রিজ, টিভি, ভারতের যুদ্ধাস্ত্র বা বস্ত্রসম্ভার বিদেশে এতই সমাদৃত যে সেই বিপুল চাহিদা পূরণ করায় উপায় নেই। দু'নম্বর আমি শুধু নিজের দেশকে সমৃদ্ধ করেই শান্ত থাকেনি। তার দূত গিয়ে আফ্রিকার রাজ্যে রাজ্যে বিপ্লব ঘটিয়েছে, স্থাপন করেছে গণতান্ত্রিক প্রগতিমুখী শাসনব্যবস্থা, এনেছে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি। দু'নম্বর আমি হিমালয়ের দুর্গম অঞ্চলে ড্রিলিং করে অফুরন্ত তেলের সম্ভার আবিষ্কার করেছে, সন্ধান মিলেছে বিকল্প শক্তির উৎসের। নিয়ন্ত্রিত হয়েছে বন্যা ও খরা।

রাত বারোটার পর বাড়ি ও পাড়ায় ঘুম নেমে আসে। সারাদিন নানা উঞ্ছবৃত্তি ও পরিশ্রমের পর আমি আমার টেবিলের সামনে এসে বসি। ছোট বাতি জ্বেলে মশা তাড়াতে তাড়াতে চুপচাপ চেয়ে থাকি। সারা দিনরাতের মধ্যে এইটুকুই আমার নিজস্ব সময়। এই দুর্লভ অবকাশটুকু পাওয়ার জন্য রোজ আমি ঘুম চুরি করি। এই রাতের নির্জনতায় দু'নম্বর আমি এসে মুখোমুখি বসে। তার মুখে চোখে কোনও ক্লান্তির ছাপ নেই, বয়সের কুঞ্চন নেই, নিষ্প্রভতা নেই। চব্বিশ বছরের পর তার আর বয়স বাড়েনি বলে এখনও সে কান্তিতে উজ্জ্বল। তার ভাবনাচিন্তাগুলিও অন্যরকম। ঘর সংসার বেতন বা কোনওরকম স্বার্থচিন্তা তার মাথায় আসে না। তার মাথায় কেবল বড় বড় চিন্তা। সেইসব চিন্তা জাতীয় বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ের। একমাত্র আমার সঙ্গেই তার ব্যক্তিগত স্তরে কিছু ভাবনার আদানপ্রদান ঘটে থাকে।

আজ দু'নম্বর আমি আমাকে আচমকা প্রশ্ন করল, তোমার বয়স কত?

আমি আমতা আমতা করে বললুম, কেন, তুমি কি জানো না?

না। কারণ তোমার সঙ্গেই আমার জন্ম। আমাদের একবয়সিই হওয়ার কথা। কিন্তু তুমি আমার বয়স বাড়তে দাওনি। চব্বিশ বছরে ঠেকে থেকে আমি কিছুতেই তোমার বয়স আন্দাজ করতে পারছি না।

তাহলে তোমার আর তা জেনে কাজ নেই। বয়স বলে সত্যিই কি কিছু আছে? বয়স একটা আজগুবি ধারণা মাত্র। একটা উটোপিয়া। সেকেন্ড, মিনিট, ঘণ্টা, দিন, বছর এসব কিছু নেই। মহাকাশে গিয়ে দেখ, সেখানে সূর্য নেই, দিন নেই, রাত নেই। সেখানে তোমার সময়ের হিসেব অচল।

দু'নম্বর আমি ভ্রূ-কুঁচকে চিন্তিতভাবে আমার দিকে চেয়ে ছিল। আমি একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগলুম। সে টেবিলের ওপর থেকে পেপারওয়েটটা তুলে নিয়ে একটু নাচাতে নাচাতে বলল, তার মানে তোমার বয়স হচ্ছে, এবং বয়সকে তুমি ভয় পাচ্ছো।

মাথা নেড়ে দৃঢ় গলায় বললুম, আমি বয়স মানি না।

সে অপলক চোখে আমার দিকে চেয়ে থেকে বলল, তুমি বয়স মানো না। তুমি আমাকে চব্বিশ বছর বয়সে স্থির রেখেছো। কিন্তু মুশকিল কি জানো? বয়স না মানলেও তুমি একদিন বুড়ো হয়ে মরবে, আর তুমি যেদিন মরবে সেদিন আমারও মৃত্যু। তোমার মৃত্যুর পর কেউ আমাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না।

তুমি কি আমার চেয়েও বেশি আয়ুষ্মান হতে চাও?

নয় কেন? আমার দিকে চেয়ে দেখ। এত সুন্দর ও সফল পুরুষ তুমি কি আর দেখেছো এ জীবনে?

না। আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলি, তোমার চেয়ে সুন্দর সফল ও সিদ্ধকাম কেউ নেই।

তাহলে তোমার সঙ্গেই আমাকে মরতে হবে কেন? আমি অপুষ্টিতে ভুগি না, আমার রক্তচাপ, হৃদযন্ত্র, লিভার, পেট সবই খুব ভালো কণ্ডিশনে আছে। আমার জগতে কোনও দুরারোগ্য ব্যাধি নেই, সবই আমি দূর করে দিয়েছি। আমার জীবনে কোনো দুঃখ নেই, দুশ্চিন্তা নেই। জরা আমার কাছ থেকে এখনও বহু দূরে। তবে কেন আমাকে তোমার সঙ্গেই সহমরণে যেতে হবে?

আমি তোমার মৃত্যু চাই না।

সেক্ষেত্রে তোমাকেও অমর হতে হয়।

আমি সামান্য ধরা গলায় বলি, আমি নিজে অমর নই বলেই তোমাকে অমর করতে চেয়েছিলুম। কিন্তু তা বোধহয় হওয়ার নয়। আমি কোনও ব্যাপারেই তোমার সমকক্ষ নই, শুধু ওই মৃত্যুর লগ্নটিতে তুমি আর আমি এক। না চাইলেও।

তাই বা কেন?

আমি তার দিকে করুণ চোখে চেয়ে থেকে বলি, তুমি কেন বহুদিন বেঁচে থাকতে চাও?

আমি যে বেঁচে থাকাটাকে প্রতি মুহূর্তে উপভোগ করি। কী শান্তি, কী স্বস্তি, কী সমৃদ্ধি, কী সৌন্দর্য চারদিকে। কী অগাধ আনুগত্য আমার প্রতি সকলের! আমার অঙ্গুলিহেলনে রাষ্ট্রের বা ব্যক্তির উত্থান পতন। কী খ্যাতি, কী ক্ষমতা আমার! এই উজ্জ্বল জীবন ছেড়ে কে যেতে চায় বলো!

আমি করুণ চোখে তার দিকে চেয়ে থাকি কিছুক্ষণ। তারপর বলি, তোমার আর কী কাজ বাকি আছে বলতে পারো?

সে আমার দিকে তাকিয়ে ভ্রু কুঁচকে কিছুক্ষণ ভেবে মাথা নেড়ে বলে, আমার কাজ? না, আর কী কাজ বাকি থাকবে? দেশ ও দেশান্তরে যা কিছু সমস্যা ছিল সবই আমি সমাধান করেছি।

আমি বললুম, তাহলে বেঁচে থাকতে চাও কেন?

বেঁচে থাকতে চাই বেঁচে থাকার জন্যই। আমি আবার অলিম্পিকে দৌড়োবো, আবার উইম্বলডন জিতব, আবার...

আমি জিগ্যেস করলুম, তোমার নতুন কিছু করার নেই?

নতুন! হ্যাঁ, নতুনই তো! নতুন করে আমি আবার সব শুরু করব। বাচ্চারা যেমন খেলাঘর ভেঙে দিয়ে ফের গড়ে।

তোমার নতুন কোনও জয় বাকি নেই?

জয়ের কি শেষ আছে?

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললুম। দু'নম্বর আমি বুঝতে পারছে না যে, তত্ত্বগতভাবে তার মৃত্যু ঘটে গেছে। তার আর কাজ নেই, আর জয়ের কিছু নেই।

কিন্তু এক নম্বর আমির অনেক কাজ। এক নম্বর আমি আজ পর্যন্ত কিছুই জয় করে উঠতে পারেনি। তবে ধুকধুক করেও সে এখনও বেঁচে আছে।

## ৩। রিভলভার

কেউ বিশ্বাস করবে না জানি, তবু সত্যি কথা বলতে কী, আমি আগে বেশ নিরীহ মানুষ ছিলুম। ঝগড়া, কাজিয়া, গণ্ডগোল, মারপিটে কখনও যেতুম না। একদিন হল কী, কে যেন আমার বৈঠকখানার জানালা গলিয়ে রাতের বেলা একখানা রিভলভার ফেলে গিয়েছিল। সকালে উঠে সেই রিভলভারটা দেখে অবাক হয়ে আমি সেটা হাতে তুলে নিলুম। আশ্চর্য এই যে, সঙ্গে সঙ্গে আমার রক্ত গরম হয়ে উঠল, মনে অদ্ভুত একটা কাঠিন্য এসে গেল। হঠাৎ খুব হাঃ হাঃ করে অট্টহাসি হেসে উঠলুম।

তারপরই গুড়ুম গুম। গুড়ুম গুম। গুড়ুম গুম। আমার রিভলভারের গুলিতে এখানে সেখানে লাশ পড়ে যেতে লাগল। আমাকে দেখলেই লোকে আতঙ্কে পালায়। হাটে বাটে মাঠে সকলেই বিনীতভাবে পথ ছেড়ে দেয়। আমার কৃপাদৃষ্টিতে থাকার জন্য ভেট দিয়ে যায়।

কিন্তু এসবের মূলেই কিন্তু ওই রিভলভারটা। নইলে আমার স্ত্রীকে বা আমার বাবা মা ভাই বোনকে জিগ্যেস করলেই আপনারা জানতে পারবেন, আমি মানুষ হিসেবে মোটেই খারাপ নই। আমি ভারি নিরীহ, বিনয়ী, অহিংস মানুষ। কিন্তু ওই রিভলভারটিই আমাকে হিংস্র করে তোলে। যুক্তি পরম্পরায় বিচার করলে দেখা যাবে, আমি যে-ক'জন লোককে খুন করেছি তাদের একজনেরও মৃত্যুর জন্য আমি প্রত্যক্ষভাবে দায়ী নই। দায়ী ওই রিভলভারটা। খুন সেই করে, আমি নিমিত্তমাত্র, কেবল নলটা তাক করে ঘোড়া টিপে যাই।

যাই হোক সকলেরই উঠতি পড়তি আছে। আমার রিভলভারটিরও। হল কী, একদিন একটা ঝা-চকচকে স্টেনগান আমার হাতে চলে এল। বেশ জিনিস। ধকল কম। ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি বেরোয়। আজকাল আমি স্টেনগানটা নিয়েই ঘুরি। রিভলভারটা তাকে তুলে রেখে দিয়েছি।

একদিন দেখি আমার স্ত্রী রিভলভারটার বাঁট দিয়ে দেয়ালে মশারির পেরেক ঠুকছে। আমি দেখেও কিছু বললাম না। যাক, কাজে তো লাগছে। আর একদিন রিভলভার দিয়ে আদা থেঁতো করা হল, তাও দেখলাম। তারপর একদিন আমার ছেলে সেটা নিয়ে খেলা করতে লাগল। আমি তাতেও বাধা দিলাম না।

একদিন দেখলুম, আমার প্রতিবেশী রামবাবু এবং শ্যামবাবু প্রচণ্ড ঝগড়া করছেন। রামবাবু নাকি শ্যামবাবুর জমির খানিকটা নিয়ে দেয়াল গেঁথেছেন। ঝগড়া লাগলেই আমি মধ্যস্থতা করতে এগোই। সালিশি হিসেবে আমি প্রায় অপরিহার্য। আমাকে সবাই ভয় খায় এবং মানে। দু'পক্ষের নালিশ শুনে আমি রামবাবুকে বললুম, কাজটা ঠিক করেননি। তবে কী আর করা, শ্যামবাবুকে কিছু টাকা দিয়ে দিন। এতে রামবাবু খুশি হলেন না। রাত্রিবেলা চুপি চুপি আমার কাছে এসে বললেন, শ্যাম আমার নামে মামলা ঠুকবে বলেছে। ভীষণ পাজি। ওকে কি করে টিট করা যায় বলুন তো!

আমি সোজা হয়ে বসে বললাম, টিট করতে চান?

চাই।

আমি উদারভাবে হাসলাম। রিভলভারটা ফালতু জিনিসের মতো পড়ে আছে। ওটা তাক থেকে এনে রামবাবুর হাতে দিয়ে বললাম, খুব ভালো জিনিস। পঞ্চাশটা টাকা দিলেই হবে।

রামবাবু রিভলভার নিয়ে চলে গেলেন। গভীর রাত্রে একটা শব্দ শুনলুম, গুড়ুম।

হাঃ হাঃ করে খুব হাসতে লাগলুম আমি। খুব হাসতে লাগলুম।

# সাহিত্য ও সাহিত্যিক

# উপন্যাসের অরণ্যে

মুশকিল হল, যাঁদের উপন্যাস নিয়ে আমাকে সমালোচনার কলম ধরতে হচ্ছে তাঁরা কেউ আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু, কারও সঙ্গে গলাগলি ভাব, কেউ বা অতিশয় শ্রদ্ধাস্পদ। ব্যক্তি হিসেবে এঁরা আমার এত কাছের যে, এঁরা কী লিখলেন সেটাই বড় কথা নয়, এঁরা কেমন এবং এঁদের ব্যক্তি হিসেবে আমি কী চোখে দেখি সেটাও মস্ত বড় কথা। আর সেইসব ব্যক্তিগত অনুভূতি ও মনোভাব আমার লেখনীর পক্ষে এক বিচিত্র বাধকতা। বারবার তাঁদের মুখ ও নানা অনুষঙ্গ এসে চোখের সামনে উদয় হবে আর আমি যা লিখতে চাই, তা না লিখে অন্যরকম লিখতে থাকব, যাতে তাঁরা না অখুশি হন, বা তাঁদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-ভক্তজনেরা না মনক্ষুণ্ণ হন। এই প্রতিবেদন লেখার পক্ষে আমার অনুপযুক্ততা এইখানেই। বিচারকের আসনে বসলে তাঁর কাছে অপরাধী পুত্রও সমান দণ্ডনীয়—এ নিতান্তই আপ্তবাক্য। তাছাড়া কবি-সাহিত্যিকরা ভারী স্পর্শকাতর হয়ে থাকেন বলে শুনেছি। কথাটা তেমন মিথ্যেও নয়, যতদূর জানি, খেটেখুটে একটি আয়াসসাধ্য উপন্যাস লেখার পর সেটি কারও অবিমৃশ্যকারী কলমের খোঁচায় উড়ে যেতে দেখলে কোন কথাকার খুশি হতে পারেন? মেনে নেওয়াও সহজ নয়। রেগে ওঠাই স্বাভাবিক। এবং কেউ কেউ বারান্তরে শোধ তোলার চেষ্টা করলেও তাঁকে দোষ দেওয়া যাবে না।

সেইসব ভয়-ভীতি আর অনিশ্চয়তা নিয়েই এই দ্বিধাগ্রস্ত লেখনীধারণ।

এবার পুজো সংখ্যায় সর্বমোট কয়টি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে সে হিসেবে দরকার নেই। বস্তুত সব পুজোসংখ্যা আমার হাতে আসেনি আর সবকিছু আমি পড়েও উঠতে পারিনি। যা পড়েছি তার সবক'টির আলোচনা করারও প্রয়োজন অনুভব করিনি। সঠিক আলোচনা বলতে যা বোঝায় তা করতে গেলে এই প্রতিবেদনটির মহাভারতের লক্ষণাক্রান্ত হয়ে ওঠার আশঙ্কা দেখা দেবে। আর আমি মোটেই ভালো বা চলনসই গোছেরও সাহিত্য-সমালোচক নই।

প্রথমেই শারদীয় "দেশ" পত্রিকার কথা ধরা যাক। এতে মোট সাতটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। প্রয়াত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের "অযাচী সন্ধানে"-কে আমি আলোচনার বাইরে রাখতে চাই। সত্যজিৎ রায়ের রহস্য উপন্যাস "শকুন্তলার কণ্ঠহার" কেও, আমি এই দুজনেরই ভক্ত পাঠক। "অযাচী সন্ধানে" খসড়া লেখা, লেখক তার সংশোধন পরিমার্জনের অবকাশ পাননি। আরও কারণ, তিনি এমনই এক পর্যায়ের এবং যুগের লেখক যাঁকে এই আলোচনার আসরে টেনে আনা স্পর্ধার শামিল। জীবৎকালেই তিনি কিংবদন্তী ছিলেন। আর সত্যজিৎ রায়ের উত্তরাধিকার শিশু-সাহিত্যে। তাঁর ফেলুদা সিরিজের আমি একনিষ্ঠ ভক্ত হলেও এটা জানি, শিশু সাহিত্যের বীজ তাঁর ভিতরে গভীরে সঞ্চারিত বলেই এসব লেখায় তিনি নারী চরিত্র একেবারেই রাখেন না, এমনকী মাসিমা পিসিমা গোছেরও কাউকেই না। ফেলুদার অ্যাডভেঞ্চারও তাই শিশু-সাহিত্যই।

আমাদের এই প্রতিবেদনের পরিধি সীমাবদ্ধ বলেই তাঁকে এই আলোচনার ঊর্ধ্বে রাখছি। বাকি পাঁচটির মধ্যে আরও একটিকে বাদ দিতে হচ্ছে সঙ্গত কারণেই। সেটির সমালোচনা করার অধিকার আর যারই থাক, আমার নেই।

রমাপদ চৌধুরি বছরে একটিই উপন্যাস লেখেন এবং তাঁর বিষয়বস্তু কখনোই রগরগে নয়। লেখার বাণিজ্যিক সাফল্য তাঁকে আকর্ষণ করে না, সম্ভবত খ্যাতির বিস্তারও নয়। যে উপন্যাসটি লেখেন তা-ও মাপে ছোটখাটো। 'দেশ' পত্রিকায় এবার তাঁর শারদ উপহার "আশ্রয়" নামক ছোট উপন্যাসটি। পাঠক-তোষণের কোনও প্রচেষ্টা এতে নেই, না আছে যৌন সুড়সুড়ি, না জমজমাট গল্প। নায়কের বয়স ছাপান্ন— সুতরাং রোমান্টিক প্রেমের প্রত্যাশার মাথায় এক ঘটি জল ঢেলে দিয়ে লেখক শুরু করলেন। আমরা এক ভীতু, বিরক্ত, স্ত্রৈণ, দুর্বল মধ্যবিত্ত বাঙালির অন্তঃপুরে পৌঁছে গেলুম। তার লোভ, হতাশা, একঘেয়েমিতে ভরা কর্মজীবনেও আমাদের টেনে নিয়ে গেলেন লেখক। তারপরই হিরন্ময় আর শুভার জীবনে অশুভ ছায়াপাত ঘটিয়ে বসল সতেরো বছরের ঝি যমুনা। সে গর্ভবতী। না, ভয় নেই, হিরন্ময় সে ঘটনার নায়ক নয়। নায়ক লছমন, বাড়িওয়ালার দারোয়ান। উপন্যাসের শেষে যমুনাকে তাড়ানো এবং হিরন্ময়ের পরাজিত আত্মোপলব্ধিতে কাহিনি শেষ। এক বগ্গা লেখা, শুরু থেকে টানা পড়ে শেষ করা যায়। কিন্তু শেষের পর রমাপদ চৌধুরির নাছোড় পাঠক হিসেবে আমার কিছু প্রশ্ন জাগে। এটা মধ্যবিত্তের বিবেকের অধঃপতনের কাহিনি বটে, কিন্তু গর্ভবতী যমুনাকে তাড়িয়ে দিয়ে তেমন কিছু অপরাধ এঁরা করেছেন বলে তো মনে হয় না। বিশেষ করে যমুনা যখন বোকা নয়, যখন সে বেশ চালাক ও চটপটে মেয়ে, তখন সে চট করে এত সহজে একজন পুরুষকে দেহ দিয়ে দেয়, এটাই বা কেন হবে? পুলিশ এবং ডাক্তারখানা এই দুইকে সভয়ে বর্জন করার কারণও পরিষ্কার নয়।

ভালো লাগার মতো উপাদান এই উপন্যাসের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। এর গার্হস্থ্য পরিবেশ আর অন্তরঙ্গ লিখনশৈলী মৃদু ও মেদুর সুরবাহারের মতো সারাক্ষণ বেজে যায়। মন উদাস ও বুক ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে।

কিন্তু কেবলই প্রশংসা করে গেলে সমালোচক হিসেবে আমাকে একদেশদর্শী ও পক্ষপাতদুষ্ট বলে চিহ্নিত করা হতে পারে। তাই আমি ঘোরটা কাটিয়ে উঠে আতি-পাতি করে এই উপন্যাসের দোষক্রুটি খুঁজে বের করতে চেষ্টা করেছি। খুব যে সফল হয়েছি এমন নয়। উপরন্তু রমাপদ চৌধুরি সম্পর্কে আমার দুর্বলতা এক মস্ত বাধা। কিন্তু কিছু একটু খুঁত না বের করলেই যে নয়। সেই যে বিশ্ব-নিন্দুক নেমন্তন্ন-বাড়িতে গিয়ে কেবলই রান্নার খুঁত বের করত, একবার সে কোনও খুঁত খুঁজে না পেয়ে বলে বসল, দই-টা আর একদিন থাকলেই টক হয়ে যেত। আমার এখন সেই অবস্থা। ভেবেচিন্তে আমার মনে হল উপন্যাসটির বিরুদ্ধে দু-একটি কথা বলা যায়। যেমন : এই উপন্যাসের আখ্যান অংশটি—অর্থাৎ মূল গল্পটির আর একটু পরিচর্যা করার দরকার ছিল। সেটা যথাযথ মনোযোগ পায়নি বলেই গল্পটির প্রথমাবধি যা সম্ভাব্য ছিল তাই ছক অনুযায়ী ঘটে গেছে। উপরন্তু বিষয়বস্তু সীমাবদ্ধ ও সামান্য বলেই লেখকের কলমটিও গণ্ডীতে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। কিছুই উপচে পড়েনি। কিন্তু এই উপচে পড়াটুকুই পাঠকের উপরি পাওনা। এই উপন্যাসের আর একটি খামতি হল, রমাপদবাবুর সঙ্গী হয়ে আমরা নূতনতর কোনও জগতে উপনীত হই না। ডুবে যেতে পারি না গভীর অনুভূতির দহে। স্বল্প পরিসরে তিনি যে শিল্প সৃষ্টি করেছেন তাকে শতেক সাধুবাদ দিয়েও এই নির্বোধ পাঠক তৃষ্ণার্ত রয়ে গেল। ফের এক বছরের অপেক্ষা।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের এবারকার উপন্যাসটির নামটি যেমন চমকপ্রদ তেমনি উপন্যাসটিও। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী অঞ্চলের পটভূমিতে একদিন ধর্ষিতা মৃতপ্রায় একটি মেয়ের আবির্ভাব ঘটার পর চাবুকের শব্দ তুলে গল্প ছুটেছে তুরঙ্গমের বেগে, পাঠককে রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনায় টান-টান রেখে। ভ্যানরিকশার চালক এবং কবিয়াল বাবাজি এই উপন্যাসের নায়ক তথা অ্যান্টিহিরো। আছে বাবাজির বন্ধু ও আর এক ব্যর্থ কবিয়াল ত্রিলোচন। উপন্যাসের পটচিত্রে আরও অনেক চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে। বি এস এফ-এর শিখ ক্যাপ্টেন, একজন সৎ ডাক্তার, দুষ্টপ্রকৃতির লোক ও নানা বিশেষ ধরনের চরিত্র। পরিসর অল্প হলেও এইসব

চরিত্র কলমের এক-আধটি আঁচড়ে এত জীবন্ত হয়ে উঠেছে যে, ভারী চেনা-চেনা লাগে তাদের। উপন্যাসের নেপথ্যে রয়েছে একটি কিংবদন্তী এবং মাঝে মাঝে ফ্যান্টাসি। সুনীল এই উপন্যাসে একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছেন ব্যালাডধর্মী কিছু লোকায়ত গীতিকবিতা রচনা করে। কবি হিসেবে তাঁর অসামান্য ক্ষমতাকে এই নতুন সৃষ্টিধর্মিতায় প্রয়োগ করে তিনি দারুণ কাজ করেছেন। উপন্যাসের কেন্দ্র-চরিত্রে রয়েছে কিছু গরিব অসহায় অথচ নিষ্পাপ সাধারণ মানুষ, যাদের জীবন, কর্মকাণ্ড, ভাগ্য সবই নির্ধারিত হয় বুদ্ধিমান ধূর্ত মতলববাজ ক্ষমতাশালীদের দ্বারা। তাছাড়া এদের মস্ত শত্রু অশিক্ষা, কুসংস্কার, ভয়, পীড়ন, শোষণ। সুনীল তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সাবলীলতায় সমাজের খণ্ডচিত্রগুলি গড়ে তুলেছেন। বাহুল্যবর্জিত ধানাই-পানাইহীন এই উপন্যাসের ছিলা সর্বদাই টানটান, আর কেন্দ্রে মক্ষিরাণীর মতো বিরাজমানা জ্যোছনাকুমারী ওরফে বীণা ওরফে ফতিমা তো এক অনবদ্য চরিত্র। সে হিন্দু না মুসলমান, পাগল না স্বাভাবিক, দেবী না মানবী, বাস্তব না কল্পনা তা গুলিয়ে যেতে থাকে। সুনীল তাকে শাশ্বত নারীর প্রতীক হিসেবেই গড়েছেন যার না আছে সম্প্রদায়, না দেশ, না ধর্ম। অস্তিত্বের জৈব সংকট তাকে অবিরল রক্তাক্ত করে বটে, কিন্তু এই সেই নারী যার জন্য কুরুক্ষেত্র, যার জন্য রাম-রাবণের লড়াই, যার জন্য ট্রোজান ওয়ার। আবার এই নারীর জন্যই কবি গান বাঁধে, পুরুষ পাগল হয়, শয়তান গোঁফে তা দেয়।

আমি যে কত অপদার্থ সমালোচক তার মস্ত প্রমাণ এই ঘোরলাগা, লোককাহিনির লক্ষণাক্রান্ত, মায়াবী উপন্যাস জ্যোছনাকুমারী পড়তে পড়তে আমি চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দিয়েছি। কঠোর সমালোচক কখনও ভাবাবেগে ভেসে যান না। আর আমি উপন্যাস পড়তে গিয়ে কখন যে সেই সীমান্ত অঞ্চলের লোকজনের ভিড়ে মিশে গেছি তা টেরই পাইনি।

বাঙালি বিশ্বনিন্দুক পরশ্রীকাতর। আমি তাদের একজন হয়ে সুনীলককে এত সহজে রেহাই দিই কী করে? সে একখানা চমৎকার উপন্যাস লিখেছে, এটাই বা সয়ে নেওয়া উচিত হবে কি? তদুপরি আমাকে তো সুনীলকে সাধুবাদ দেওয়ার কাজই দেওয়া হয়নি। ভেবেচিন্তে সুতরাং জ্যোছনাকুমারীর কিছু ত্রুটিও আমাকে বের করতে হচ্ছে। সেদিকে সুবিধেও আছে। সুনীল একটু ঢিলাঢালা প্রকৃতির মানুষ, স্বভাবতই কিছুটা অসতর্ক, লেখেও ভীষণ তাড়াতাড়ি, সুতরাং তাঁর লেখায় কিছু ফাঁক ফোকর খুঁজে বের করা শক্ত নয়।

এক নম্বর কথা হল, জ্যোছনাকুমারী ওরফে বীণা ওরফে ফতিমা তিন দিন উপোস থেকে বিস্তর পথ হেঁটে (কত মাইল তা লেখক বলেননি, তবে ধরে নিচ্ছি কম করেও মাইল পনেরো), দুবার ধর্ষিতা হয়ে এবং মৃতবৎ পরিত্যক্তা হওয়ার পরও আবার উঠে এবং বিস্তর হেঁটে ইন্ডিয়ায় যখন পৌঁছে গেল তখন সে হসপিটাল কেস। নাকে নল, শিরায় স্যালাইনের ছুঁচ নিয়ে মূর্ছিতা হয়ে পড়ে থাকার কথা। কিন্তু একটু বাদেই তাকে গপাগপ ভাত খেতে দেখা যাচ্ছে। আর তার এত গর্দিস ঘটানোর পরও লেখকের যেন মনে হল যথেষ্ট হয়নি। তিনি গাঁয়ের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মারমুখো কিছু লোককে জুটিয়ে আনলেন, যারা এসে ভাতের পাত থেকে টেনে তুলে জ্যোছনাকুমারীর ওপর ডাইনী সন্দেহে আসুরিক অত্যাচার চালিয়ে গেল। সুনীলের মতো কোমলহৃদয় মানুষের কাছ থেকে এরকম নিষ্ঠুর ও অযৌক্তিক নারী নির্যাতন অপ্রত্যাশিত। সে নাকি মেয়েদের প্রতি ভারী দুর্বল, এই নাকি তার নমুনা? উপন্যাসের সমগ্র কাহিনিচক্রে যেভাবে নিষ্পেষিত, অপমানিত, লাঞ্ছিত ও পুনরায় ধর্ষিতা হয়ে মেয়েটি প্রাণ হারাল তাতে আর কোনও মহিলার উচিত নয় সুনীলকে প্রেম নিবেদন করা।

সাপ নিয়ে সুনীলের ধন্ধ যে কতদিনে কাটবে! ক্যাপ্টেনকে বিষাক্ত সাপ কামড়েছে কি না তা সাপটাকে দেখেও বোঝা গেল না? আর বিষাক্ত সাপ কামড়েছে কি না তা না জেনে কোনো ডাক্তার কি অ্যান্টিভেনাম ইনজেকশন দেয়? সাপের লাইনে আর সুনীলের হাঁটা উচিত নয়। সাপ ছাড়াও ভালো ভালো উপন্যাস হয়। পথের পাঁচালী'ই আছে হাতের কাছে। আর ধর্ষণকারী কি আগে থেকেই জানত যে, অমুক দিন বেলা ততটার সময় সে একটি মেয়েকে ধর্ষণ করার সুযোগ পাবে এবং তাই আগেভাগেই দেশে যাওয়ার জন্য পরদিন থেকেই লম্বা ছুটি মঞ্জুর করিয়ে রেখেছিল? তার ওপর আবার বাবাজির রিকশাই তাকে স্টেশনে

পৌঁছে দিল! এবং জুৎমতো বিকেলের ট্রেনও সে পেয়ে গেল! না, এটা দেখছি বড্ডই বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। আর বাঙাল ভাষায় ভূতও সুনীলের ঘাড়ে অনেকদিন ধরে বসে ঠ্যাং দোলাচ্ছে। কী দরকার ডায়ালেক্টের? বিশেষ করে যখন সুনীলের হাতে বাঙাল ভাষার বাপান্ত বা জগাখিচুড়ি ঘটে যাচ্ছে! তবে এ-ও বলি, এ জিনিস মঞ্চে বা চলচ্চিত্রে ওতরাবে খুব। জ্যোছনাকুমারী যাত্রায় বা মঞ্চে বা দূরদর্শনে বা ফিলমে এল বলে।

জনপ্রিয় সাহিত্যিক বলতে সঞ্জীব। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়। পাঠক-পাঠিকা, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের মুখে মুখে তাঁর লেখা থেকে উদ্ধৃতি শোনা যায় আকচার। যে লঘু হাস্যরসাত্মক বা শ্লেষধর্মী লেখার জন্য তাঁর এই ব্যাপক জনপ্রিয়তা সেটা ছাড়াও সঞ্জীবের একটি সিরিয়াস দিক আছে। ''পায়রা'' এবং এ জাতীয় আরও কয়েকটি উপন্যাসের ভিতরে সেই আদ্যন্ত সিরিয়াস শক্তিমান এক কথাশিল্পী উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সেই সিরিয়াস সঞ্জীব পাঠক-পাঠিকার কাছে তেমন প্রিয় নন। তাঁরা যে-সঞ্জীবে অভ্যস্ত সেই সঞ্জীব ছাড়া অন্য কোনও সঞ্জীবকে বরদাস্ত করবেন না।

শারদীয় ''দেশ'' পত্রিকায় সঞ্জীবের 'দুটি দরজা' হয়তো সেইসব পাঠক ও পাঠিকাকে হতাশ করবে। কারণ এটি বেশ সিরিয়াস ধরনের লেখা। উপন্যাসের শুরুতেই আমরা একটু চমকে উঠি সুধা নাম্নী আপাতসুখী এক বিবাহিতা যুবতীর বীভৎস আত্মহত্যার ঘটনায়। ভারী ডিটেলসে ঘটনাটি ধরেছেন লেখক। কেরোসিন ঢালা থেকে আগুন লাগানো এবং তারপর আত্মহননকারিণীর মৃত্যুকালীন অনুভূতি মিলিয়ে শুরুটাই আমাদের চমকে দেয়।

এই সুন্দরী মেয়েটির মৃত্যুই উপন্যাসের অভ্যন্তরে একের পর এক দরজা খুলে ঘটনার স্রোত বেয়ে নিয়ে যায় মানুষের লোভ, কাম, ক্রোধ, মোহ মাৎসর্যের কুম্ভীপাকে। সেই পাঁক থেকেই উঠে আসে রামলালরূপী শয়তান, আসে মিলনের দাদার মতো মেরুদণ্ডহীন সব প্রাণী। আসে প্রবৃত্তির হাতে ক্রীড়নক নারান, শৈবাল শঙ্কর। উপন্যাসের নায়ক সুধার স্বামী মিলন। এই চরিত্রটির মধ্যে অসহায় মানুষটির বেদনা চমৎকার ফুটেছে। ফুটেছে মাধুরী আর মিলন-সুধার মেয়ে সুমিও।

''দুটি দরজা'' উপন্যাসে কাহিনির গতি উদ্দাম এবং প্রচণ্ড জমকালো। ঘটনার ঘনঘটাও লক্ষ করার মতো। চরিত্রের সংখ্যাও কম নয়, এবং সেইসব চরিত্রও নানামুখী ও বিচিত্র। হাজী সাহেব যেমন স্পষ্টতই ধর্ম, ধীর, বিচক্ষণতা ও প্রায় বিবেকের প্রতীক, তেমনি আরও কিছু প্রতীক-ধর্মী চরিত্র এই উপন্যাসে দেখতে পাই। সব মিলিয়ে উপন্যাসটির একটি দিকই প্রধান হয়ে ওঠে। তা হল এর পাঠযোগ্যতা এবং উপভোগ্যতা।

সঞ্জীবের লেখার প্রসাদগুণ ও উপভোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠে না। পাঠককুল তাঁর পক্ষে অনেককাল আগেই রায় দিয়ে রেখেছেন। কিন্তু যে ধরনের সিরিয়াস লেখা লিখে সঞ্জীব কিছু পাঠকের আনুকূল্য পাননি এবার সেটাই ফিরে পেলেন। কারণ সঞ্জীবের সিরিয়াস লেখায় যাঁরা বিমুখ তাঁরা অবশ্যই এই উপন্যাসটি গোগ্রাসে গিলবেন। এর টানটান টেনশন, বর্ণাঢ্য চরিত্র, উচ্চকিত সংলাপ এবং গতি এক অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ সৃষ্টি করে ফেলেছে।

আবার বলি, সমালোচক হিসেবে আমি যে অপদার্থ তার কারণ সঞ্জীব আমার অন্যতম প্রিয় লেখক বলেই তাঁর বিরুদ্ধে কিছুই প্রায় ভেবে উঠতে পারি না। তবে এ কথাটা নিশ্চয়ই বলা যায় যে, সঞ্জীবের এ ধরনের লেখায় তেমন অভ্যাস নেই। তিনি যখন সিরিয়াস লেখা লেখেন তখন তা আদ্যন্ত সিরিয়াস। যখন মজার লেখা লেখেন তখন তার মধ্যে সঞ্চারিত করে দেন জীবনের সহজ সত্যগুলি। তার বাইরে এ হল সঞ্জীবের তৃতীয় ধরনের লেখা। গতিময়, জমজমাট, নাটকীয়। এই তৃতীয় ধরনটায় সঞ্জীবের অনভ্যস্ত বিচরণ। তাই কখনও কখনও দ্বিধাগ্রস্ত। মাঝে মাঝে অতি নাটকীয়তা এসেছে, এসেছে সাজানো সংলাপও। এসব যেন একটু পেশী প্রদর্শনের মতো মনে হয়েছে। যেন সঞ্জীব দেখাতে চাইলেন, 'আমিও পারি।'

সঞ্জীব অবশ্যই পারেন। সে বিষয়ে আমার দ্বিধা নেই। কিন্তু সঞ্জীবকে এই উপন্যাসের মধ্যে আবিষ্কার করে আমি এতটা আনন্দিত হইনি যতটা হয়েছি ''লোটাকম্বল'' বা ''পায়রা''য়। তাঁকে আবিষ্কার করা না গেলেও তাঁর ক্ষমতার প্রমাণ হিসেবে পাঠক এই উপন্যাসকে স্মরণ করতে পারেন।

তরুণ ও শক্তিমান কথাকার সুব্রত মুখোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই বেশ বিখ্যাত হয়ে পড়েছেন। তাঁর লেখায় গ্রামের অনুষঙ্গ যেমন চমৎকার ফোটে তেমনি মানুষ দেখার নিবিড় ও ধ্যানী চক্ষুও তাঁর আছে। "মধুকর" উপন্যাসটি পড়তে পড়তে বারবার জল-মাটি-মানুষের কাছে ফিরে যাচ্ছিলাম। এ প্রাকৃতজনের উপন্যাস। উপাদান সংগৃহীত হয়েছে একেবারে নীচুতলার খেটে-খাওয়া মানুষজনের ভিতর থেকে। সুব্রত যে-পথ নিয়েছেন সে-পথে একসময়ে তারাশঙ্কর এবং অংশত সমরেশ বসুর বিচরণ ছিল। সেই হিসেবে তিনি এঁদের উত্তরসুরি।

গল্পের শুরুতে মধুকর বারিক, তার নাতি বাদল, ছোটবউ পলাশী, বড়বউ বীণা, বড় ছেলে চন্দ্রপাল—অর্থাৎ মধুকরের সংসার ও বিচিত্র জীবনের উদঘাটন ঘটে যায়। মধুকর কাঠের মিস্ত্রী, নৌকো তৈরি করে। সংসারচিত্র সর্বত্রই গোলমেলে। মধুকরের সংসারটিও তার ব্যতিক্রম নয়। অভাব অনটন, অশিক্ষা, কুসংস্কারে আচ্ছন্ন কয়েকটি রক্তের সম্পর্কের মানুষ কিছুতেই মোয়া বেঁধে উঠতে চায় না।

নৌকো গড়ার পিছনে শুধু মেহনতই থাকে না। থাকে বংশানুক্রমিক দক্ষতা, সূক্ষ্ম শিল্পবোধ এবং নো-হাউ। মধুকর বারিক ক্রমহ্রাসমান সেইসব সাবেক কারিগরদের একজন। এই নৌকো গড়ার গল্পই এই উপন্যাসের উপজীব্য। আর সেই বৃত্তান্ত ঘিরেই যত চরিত্রের আগমন নির্গমন।

সুব্রত বেশ ভালোভাবেই এই অভিজ্ঞতাটি কব্জা করেছেন। কলকাতার অদূরের এক গঞ্জ—যাতে গ্রাম ও শহরের মেশামেশি—যেখানকার মানুষগুলোর মধ্যেও গ্রাম্যতা আর শহুরেপনা মিশেছে—সে জায়গাটি ভারী ফুটেছে তাঁর লেখায়।

কিন্তু "মধুকর"কে তবু অসাধারণ উপন্যাস বলতে দ্বিধা করছি। তার কারণ, সুব্রতর পথটাই কঠিন। ওই পথে তাঁর সঙ্গে পাল্লা টানতে আরও কয়েকজন বাঘা কলমবাজ রয়েছেন। তারাশঙ্কর, সমরেশ তো ছিলেনই, অনেকাংশে মানিক এবং অদ্বৈত মল্লবর্মন, হালফিল সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ আর আবুল বাশার। সুব্রতকে সুতরাং কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামতে হচ্ছে।

"মধুকর" পড়তে আমাদের খুবই ভালো লাগে। কিন্তু এই কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতার পথটিতে যেসব কাঁটা ছড়িয়ে আছে সেগুলিই তাঁর প্রতিবন্ধকতা করেছে যথারীতি। নিজে তিনি অতিশয় ভালোমানুষ বলেই বোধ হয় এই উপন্যাসে একটা ভালোমানুষির নির্মোক রয়েছে। জীবনের নানা কুশ্রীতা দেখবার চেষ্টা করেছেন, আবার এক উদাসীন প্রাকৃত দার্শনিকতার লোভও এড়াতে পারেননি। চরিত্রগুলির উপস্থাপনার পর সেগুলিকে তেমন বিকশিত হতে দেননি। আর তেমন সংঘাতও বা এল কই? তবু পুজোসংখ্যার উপন্যাসের ভিড়ে তাঁর এই স্নিগ্ধ লেখাটি আমাদের খানিকটা জুড়িয়ে দেয়। তবে আবার বলি, তাঁকে শক্ত পাল্লা টানতে হবে, শক্ত হতেও হবে।

বিমলদা—অর্থাৎ বিমল কর সেই কৈশোরের আমাকে এমন ভূতগ্রস্ত করে তুলতেন তাঁর এক-একটা ছোটগল্প দিয়ে যে অবাক মানতুম। "পার্ক রোডের সেই বাড়ি" গল্পে কী-ই বা উপকরণ ছিল? একটি যুবতী মেয়ের বিয়ে ঘটে উঠছে না। ব্যস, ওইটুকু নিয়ে এমন লিখলেন যা তাঁর পক্ষেই লেখা সম্ভব। ওই যাদুবিদ্যা খুব বেশি লোকের জানা নেই। ভাষা তাঁর আর এক মস্ত আয়ুধ। আরও এক অস্ত্র সংলাপ। সুতরাং বিমলদা—অর্থাৎ বিমল কর যে-কোনও বড় সাহিত্যিকেরই মস্ত বড় প্রতিদ্বন্দ্বী।

শারদীয় আনন্দবাজারে এবার তাঁর উপন্যাস "উত্তরের হাওয়া"। ক্রমশ দুর্নীতির পথে অবতরণরত পবিত্র আর তার বউ বাসন্তীকে নিয়ে একটি পরিবারের উন্মোচন। এই দিয়ে শুরু। বিমল কর কখনও উচ্চকিত হাঁকডাকের লেখা লেখেন না। একটু নরম, আত্মকথনের মতো তাঁর ভঙ্গি। শুরুতেই তার ঘোর লাগা গদ্যে কবিতার অনুষঙ্গ বয়ে আসে। সংসারের চিত্রটি ঘন ও পরিচিত হয়ে ওঠে দ্বিতীয় অধ্যায়ে যখন লেখক উপস্থিত করেন পবিত্রর বাবা তারাপদ ও মা অমলাকে। আসে টুনি, পবিত্রর বোন। পরিমল বা পলকেও পরোক্ষভাবে উপস্থিত করে দেন লেখক, যে পল অকস্মাৎ ধর্মগুরুকে আশ্রয় করে সংসারাশ্রম ত্যাগ

করেছে। দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত পরিমল অবশ্য তার সন্ন্যাস নেওয়ার কারণটি কাউকেই জানতে দেয়নি। মানুষের ঘৃণা বা অনুকম্পার হাত থেকে আত্মরক্ষাই ছিল তার বৈরাগ্যের আসল কারণ।

এই উপন্যাসের আর এক চরিত্র চাঁদু। শেষ অবধি তার মৃত্যু ঘটেছে দুর্ঘটনায়। উপন্যাসের যবনিকাও নেমে আসে তার পর।

সামাজিক বা রাষ্ট্রিক সমস্যা বিমল করের লেখায় ততটা প্রাধান্য পায় না, যতটা পায় ব্যক্তিগত অস্তিত্বের সংকট, একাকিত্ব, কমিউনিকেশনের অভাব এবং কবিতার মতো এক ধরনের মানসিক গুঞ্জন।

মননশীল লেখকেরা গল্পের পরিকাঠামো তৈরি করতে পারেন না। পারেন না বলার চেয়ে বলা ভালো, করেন না। জীবনের কোনও ঘটনাই তো গোলাকার নয়। গল্পের উপাদান থাকে সামান্য, চরিত্র গুটিকয়, সংলাপ অংশ কম। এইসব মননশীল লেখার গতিও হয় মন্থর। প্রতিটি চালচলন কথা পরিস্থিতিতেই লেখক থেমে থেমে ধীরে ধীরে বিশ্লেষণ করতে থাকেন। সামান্যর ভিতরে তাঁদের অসামান্যের খোঁজ।

উত্তরের হাওয়া কিসের প্রতীক? মৃত্যুর? যদি তা নাও হয়ে থাকে, অবশ্যই তা হাহাকার বয়ে আনে, বয়ে আনে তাপহীনতা। বিমলদার সব লেখাতেই রোগ ভোগ মৃত্যুর অনুষঙ্গ চলে আসে। তাঁর মানসিকতা অতিশয় জটিল ও অতিঅনুভূতিশীল। সেই কারণেই প্রচলিত মানদণ্ডে তাঁকে বিচার করা কঠিন। কিন্তু যে কারণে তিনি ভিড় থেকে আলাদা ও একক তা এখন পরিণত বয়সেও সমান ক্রিয়াশীল। ''উত্তরের হাওয়া'' সেই বিমল করকেই ফের ফিরিয়ে এনেছে।

কিন্তু একটু ক্লান্তির ছাপ কি আছে কোথাও?

মননশীলতার বিপদও এইখানে? তিনি যে ধরনের লেখায় অভ্যস্ত তা তাঁকে কিছু ক্লান্ত করে তুলবেই। ''উত্তরের হাওয়া'' উপন্যাসের মধ্যেও আমরা সেই ক্লান্তির কিছু ছড়ানো চিহ্ন দেখি। যেখানে নাটকীয়তা গড়ে তোলার সম্ভাবনা আছে, যেখানে গতি সঞ্চার করার সুযোগ আছে, সেখানে কাহিনিকে তিনি কাব্যময়তায় এলিয়ে দিয়েছেন। ছেড়ে দিয়েছেন সহজ সুযোগ।

কী তিনি বলতে চেয়েছেন, কী ছিল তাঁর উদ্দেশ্যে বা কোন লক্ষ্যে তিনি ধাবিত হয়েছিলেন তা সামান্য আবছায়া রয়ে গেল। আসলে সেরকম কোনও উদ্দেশ্যনির্ভর নয়ও এই উপন্যাস। এ লেখকের আত্মকথনের মতো। স্বগত সংলাপের মতো বয়ে যাওয়া।

উপন্যাস শেষ করার পর সামান্য উদাস মন, একটু ব্যথাতুর বুক নিয়ে পাঠককে কিছুক্ষণ বসে থাকতে হয়। উত্তরের হাওয়া তখন শূন্যতাকে আরও শূন্য করে তোলে। কিন্তু একটা অভাববোধও থেকে যায়। মনে হয় উপকরণ যা-ই হোক বিমল কর ইচ্ছে করলে তাকে আরও জোরালো করতে পারতেন। আরও লক্ষ্যাভিমুখী।

আমরা বিমল করের জন্য আবার অপেক্ষা করব।

সমাজের বা রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেসব হালফিল সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে তা নিয়ে প্রয়োজনীয় ও তথ্যবহুল সত্যানুসন্ধানী উপন্যাস একমাত্র শংকরই বাংলায় লিখেছেন। এ ব্যাপারে তাঁর সহজসিদ্ধি রয়েছে। ''কত অজানারে'' দিয়ে যাঁর জয়যাত্রা শুরু এবং যিনি আজও অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু সেই শংকরের প্রতিটি গ্রন্থই আজ বেস্টসেলার। এই অসাধারণ জনপ্রিয়তা আর কারও আছে বলে জানি না। শংকরের অভিজ্ঞতা ব্যাপক ও গভীর। কর্মসূত্রেও তিনি নানা মানুষের সংস্পর্শে এসেছেন, ভ্রমণ করেছেন দেশে ও বিদেশে। উপরন্তু সহজ ও সরল এক মানসিকতার অধিকারী বলে তাঁর লেখায় প্রসাদগুণ চমৎকার।

এবারকার শারদীয় আনন্দবাজারে তাঁর রচিত উপন্যাসটির নাম ''কাজ''।

উপন্যাসটি শুরু হয়েছে কারখানার কর্মী সদানন্দ মজুমদার আর সাহিত্যিক সুধাকর নন্দীর সদ্য গড়ে ওঠা অসম বন্ধুত্ব নিয়ে। লেখক সুধাকর একসময়ে এক কারখানাতে চাকরি করতেন। তা ছেড়ে পুরো সময়ের লেখক হয়েছেন। ফলে তাঁরও এক সাহসী জীবনযুদ্ধের অভিজ্ঞতা আছে। আছে লেখক হওয়ার নেপথ্য কাহিনি—যে কাহিনি অনেক লেখকের সঙ্গেই মিলে যাবে। সদানন্দের কাহিনিও পাশাপাশি চলে আসে, তার

পরিবার মেয়ে-জামাই বউসহ। আছে তার বন্ধু শশধর। তারও মেয়ে-জামাই। আছে শ্বশুর-জামাইয়ের সাফল্যের চাপা প্রতিযোগিতা।

কিন্তু এই উপন্যাসের আসল পটভূমি হল কারখানা এবং তার শ্রমিক সমস্যা, ইউনিয়ন আন্দোলন, লক আউট। সদানন্দর জামাই কাজ করে সুইডিশ ইনজিনিয়ারিং-এ—যেখানে মাইনে ভালো, সুযোগ সুবিধে বেশি। একদিন সেই কারখানা লক-আউট হয়ে গেল। ক্রমে জামাইয়ের অবস্থা পড়তে শুরু করল। প্রধান হয়ে উঠল অস্তিত্বের সংকট। অনেক চরিত্র এনেছেন শংকর। সব চরিত্রই ঈষৎ বক্র, কীটদষ্ট, সমাজেরই প্রতিচ্ছায়া উপন্যাসের সর্বত্র বিস্তৃত হয়েছে।

এই চমৎকার পাঠযোগ্য উপন্যাসটি আমাদের সামনে যে সমস্যাটিকে তুলে ধরতে পেরেছে তা বর্তমান পশ্চিম বাংলার এক প্রজ্বলন্ত সংকট। সম্প্রতি কাগজে বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের আত্মহত্যার খবর পর পর কয়েকদিন বেরিয়েছে। কলকাতার রাস্তায় ঘাটে এইসব শ্রমিকদের একরকম ভিক্ষাপাত্র নিয়েও আমরা ঘুরতে দেখেছি। কারা এর পিছনে, কী এর কারণ তা শংকর অতিশয় যোগ্যতার সঙ্গে জানেন।

জামাই জগদীশকে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার জন্য সদানন্দ মিথ্যে মেডিক্যাল রিপোর্ট বের করলেন বটে, কিন্তু সেটা হল একটি বিশেষ ক্ষেত্রের সমাধান। গোটা অব্যবস্থাটির কী হবে তা শঙ্কর বলেননি। বরং একটু হাল ছেড়ে দিয়েছেন। আমাদের প্রত্যাশা একটু অন্যরকম ছিল।

শংকর ঐতিহ্যানুসারী লেখক। শরৎচন্দ্র, শরদিন্দু, বিমল মিত্র যে গল্প কথনের চমৎকার ধারা প্রবর্তন করেছেন সেই ধারাটি অনুধাবন করলে শংকরের রচনার ঘরানা চেনা যাবে। হৃদয়গ্রাহ্য, ঠাসবুনোটি গল্প এবং চমৎকার রসবোধ এইসব রচনার প্রাণ। শংকর সাহিত্যের আঙিনায় ঢুকে পুরনো মূল্যবোধ বা রীতিনীতি ভাঙচুর করে হঠকারিতার পরিচয় দেননি। তিনি পাঠ নিয়েছেন সেইসব ওস্তাদের কাছে যাঁরা সাবেক কালের গয়নার মতোই নীরেট ও খাঁটি সোনা। সুতরাং আজ এক শক্ত মাটিতে জোরের সঙ্গেই শংকর দণ্ডায়মান।

বুদ্ধিজীবীরা তাঁর লেখা পড়েন কি না বলা শক্ত। তবে জন-অভিনন্দন তো তিনি অফুরান পেয়েছেন। এই উপন্যাসেও পাবেন। তবু বলি, এই উপন্যাসের সুধাকর নন্দী লেখক হয়েও যেন ঠিক লেখকের চরিত্র হয়ে উঠতে পারেননি। পারেনি সদানন্দও। আর গল্পের ঠাসবুনোটের মধ্যেও একটা কৃত্রিমতা থেকেই যায়। ''কাজ'' তাঁর অন্যান্য রচনার মতোই জনপ্রিয় হবে হয়তো, কিন্তু অনন্য হবে না। ''কত অজানারে'' বা ''নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরি''র মতো রচনার জন্য আমরা আবার তাঁর কাছে হাত পাতব।

পাঠক হিসেবেই শংকরের কাছে আমার আর একটি আর্জি আছে। রঙ্গ রসিকতার একটা টানে তিনি মাঝে মাঝে ভেসে যান। তাতে গল্পের কিছু খামতি ঘটে যায়। ওটি নিয়ন্ত্রণ করলে আমাদের কাছে তিনি আরও দুর্ধর্ষ হয়ে উঠবেন।

মানুষের হারিয়ে যাওয়া নিয়ে গল্প লেখারও একটা ধারা বাংলা সাহিত্যে আছে। আর জীবনেও তো এ ঘটনা কতই ঘটে। উপন্যাসের শেষে লেখক একটি ঘোষণাও দিয়েছেন যে, সংবাদপত্রে প্রকাশিত কিছু খবরের সঙ্গে উপন্যাসের মিল থাকলেও এই উপন্যাসের সব চরিত্রই কাল্পনিক।

ঘোষণার প্রয়োজন আমার ছিল না। খবরের কাগজের খবর উপন্যাসের বিষয় হতে পারবে না এমন কোনও কথা নেই। বরং খবরভিত্তিক উপন্যাস লেখারই এখন রেওয়াজ। সুতরাং দেবশ্রী-সত্যনারায়ণের ঘটনার সঙ্গে প্রবল সাদৃশ্য সত্ত্বেও বলি, দিব্যেন্দু খুবই স্থিতধী লেখক বলেই তাঁর হাতে গরম খবর সাহিত্যের উপাদান অবশ্যই হয়ে উঠতে পারে।

''অন্তর্ধান'' আনন্দবাজারে প্রকাশিত দিব্যেন্দুর শারদীয় উপন্যাস।

দিব্যেন্দু কার কাছে পাঠ নিয়েছেন তা বলা শক্ত। তাঁর পঠন-পাঠনের ব্যাপকতা, উন্নত রুচি ও প্রবল ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছে তাঁর জীবনেরই শক্ত কাঠামো অবলম্বন করে। দেখেছেন অনেক, ভুগেছেনও বোধ হয় কম নয়। ফলে জীবন থেকে উপাদান গ্রহণ করার পাঠ সম্ভবত তিনি নিজের কাছেই নিয়েছেন। তবু তুমুল

সাদৃশ্য আছে তাঁর মেজাজের সঙ্গে কখনও বিমল করের, কখনও নরেন্দ্রনাথ মিত্রের। শুধুমাত্র মেজাজেরই মিল, আর কোনও মিল নয়। দিব্যেন্দুর গদ্যভঙ্গি আলাদা, তাঁর দেখার চোখও নিজস্ব।

আপসহীনতা দিব্যেন্দুর আর এক মস্ত গুণ বলে তিনি কখনও নিজস্ব চরিত্র থেকে, নিজের গণ্ডি থেকে ভ্রষ্ট হননি। যেমনটি লিখতে তাঁর ইচ্ছে হয় বা ভালো লাগে ঠিক তেমনটিই লেখেন। পাঠক-তোষণের ধাত তাঁর নয়। দীর্ঘকাল ধরে তাঁর লেখা অনুধাবন করে বুঝেছি, দিব্যেন্দু নাটুকে গল্প লিখতে চান না, জমজমাট ঘটনার সংঘটন তাঁর রুচিসম্মত নয় এবং অনেক চরিত্র নিয়ে কারবার করতেও তাঁর আগ্রহ নেই।

''অন্তর্ধান'' উপন্যাসের নায়ক মধ্যবয়স্ক সুশোভন আর তাঁর স্ত্রী লীনা। সুশোভন অধ্যাপক ছিলেন। সমাজে মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত সম্মানিত একজন ভদ্রলোক। ইনা—নিরুদ্দিষ্টা অষ্টাদশী ইনা তাঁদের একমাত্র সন্তান। যেদিন সুশোভনের দাদা মারা গেলেন সেদিন থেকেই ইনা নিরুদ্দেশ। এই দুই ঘটনা একযোগে কেন দিব্যেন্দু ঘটালেন তার কারণ আমি খুঁজে পাইনি বটে, কিন্তু উপন্যাসের শুরুতেই একটা শোক আবহ গড়ে উঠতে যে লেখক দিলেন তা তাঁর সেই জেদী দুঃসাহসেরই পরিচায়ক।

এর পর সারা উপন্যাস জুড়েই ইনার খোঁজ। সেইসঙ্গে টুকরো স্মৃতি, বিষণ্ণ আবহ, সুশোভন ও লীনার কিছু আত্মানুসন্ধান। তার পাশে অর্জুন, অর্থাৎ সুশোভনের ভাইপো এবং অনিবার্য আরও গুটিকয় চরিত্রকে লেখক আনতে বাধ্য হন। কিন্তু কাউকেই তার ভূমিকার চেয়ে বেশি এক তিলও কাহিনিতে স্থান দেননি।

কাহিনিই বা বলতে চাইছি কেন? দিব্যেন্দু তো গল্প লেখেন না। জীবনের এক ধরনের নিজস্ব ব্যবচ্ছেদ আছে তাঁর। মনোযোগ দিয়ে তিনি সেটাই করেন। এই উপন্যাসে এত নাটকীয়তার উপকরণ থাকা সত্ত্বেও এটি কখনওই উচ্চ গ্রামে ওঠে না, রুদ্ধশ্বাস হয়ে পড়ে না, সুশোভনের নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত সেখানে অত্যন্ত নিরুত্তাপভাবে বিধৃত হয়েছে।

এই উপন্যাসটির ছিদ্র খুঁজতে যাওয়া বৃথা। কিছু পাঠক অবশ্যই এটিকে গ্রহণ করবেন। কিছু পাঠক অবশ্যই এটিকে বর্জনও করতে পারেন। দিব্যেন্দুর তাতে কিছু এসে যায় না। কিন্তু আমি বলব, কাহিনিকে অমন নীরক্ত করে তুলতে দিব্যেন্দুকে মাথার দিব্যি দিয়েছেটাই বা কে? আর সুশোভনকে হারিয়ে যেতে দিয়ে উপন্যাসটিকে দায়সারাভাবে শেষ করার একটি সুযোগ তিনি নিয়েছেন। লোহিতের চোয়াল শক্ত করে তুলেও ভবিষ্যতের কোনও ইঙ্গিত দিতে পারেননি। ইনা তাহলে খামোখা নিরুদ্দেশ হল কেন? তার প্রিয় লেখক দিব্যেন্দু পালিতকে একটি উপন্যাসের প্লট উপহার দিতে?

সমরেশ মজুমদার কেন এত জনপ্রিয় তার বিবিধ কারণ আছে। একটি কারণ হল, তিনি সহজেই গল্প জমিয়ে তুলতে পারেন। এ কাজটি ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছে। গল্প ভেবে ওঠা, গল্পের সূত্র ধরে বিভিন্ন চরিত্রকে পারস্পরিক সংঘাতবিন্দুতে আনা এবং আবহ ও পরিমণ্ডল রচনা সহজ কাজ নয়। লিখতে বসলেই লেখকরা গল্পের অভাব টের পান হাড়ে হাড়ে। সংলাপ লিখে সংক্ষেপে পাতা পূরণ করবেন, তা ছাই সংলাপও আসতে চায় না। পাত্র-পাত্রীকে মুখোমুখি করে তোলাটাই যে বেশ শক্ত হয়ে দাঁড়ায়।

সমরেশের এ সমস্যা নেই। 'জন যাজক' কথাটিতে ধর্মের গন্ধ আছে, উপন্যাসের মধ্যেও আছে। উপন্যাসটি পড়ে আমার ধারণা হল, সমরেশ ধর্মের ভণ্ডামিকে আক্রমণ করতে চেয়েছিলেন। ধর্মগুরুদের মুখোশ ধরে টানাহ্যাঁচড়াও করেছেন কিছুক্ষণ। বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিল তখনই। কারণ মুখোশ খুললে কার মুখ বেরিয়ে পড়ে কে জানে! এই উপন্যাসের বড় মহারাজ, সেজো মহারাজ, ছোট মহারাজের চরিত্রে যে একালীন অনেক ধর্মগুরুর আদল এনে ফেলেছেন তিনি। কিন্তু কাউকেই আইডেন্টিফাই করতে সাহস পাচ্ছেন না।

ছোট মহারাজকে কলকাতায় একরকম গৃহবন্দি করে রাখা হয়েছিল, তাঁর চরিত্রে আনুগত্যের অভাব বা বিদ্রোহের কিছু লক্ষণ দেখা দেওয়ায়। ছোট মহারাজ নিরুদ্দেশ হলেন। এবং তাই দিয়ে শুরু হয়ে গেল জমাটি উপন্যাস।

কাহিনির মধ্যে ঢুকলে আমি নিজেই খেই হারিয়ে ফেলব। তবে এর মধ্যে নকশাল আন্দোলন, গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন, ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ সব উপাদানই লেখক নিপুণ হাতে মিশিয়েছেন। তাঁর গল্প বলার সহজ সিদ্ধি থাকায় উপন্যাসটি উত্তেজক, রহস্যময়, গতিশীল হয়ে উঠতে দেরী হয় না। আসে নানা সূত্র ধরে অজস্র চরিত্র। স্বল্প পরিসরেও লেখক সেগুলির প্রতি সুবিচারই করেছেন। কেউ গুরুত্ব হারায় না।

কিন্তু মুশকিল হল অন্য জায়গায়। শেষ অবধি ধর্মগুরুদের মুখোস খুলবার চেষ্টাটিও বর্জন করলেন লেখক। বরং শেষ অধ্যায়েও বিপ্লবী ছোট মহারাজকে পিতার আসনে অভিষিক্ত করে দিয়ে একরকম গুরুবাদের জয়গানই গেয়ে ফেললেন।

বলাটা হয়তো ঠিক হবে না, এই উপন্যাসে গড ফাদারেরও কি একটু আদল আছে? ছোট মহারাজের মধ্যে মাইকেল চরিত্রের কিছু আভাস? সেজো মহারাজাকে খলচরিত্র করে তোলার মধ্যেও কি আছে কোনও জনশ্রুতির প্রশ্রয়?

এই উপন্যাসকে সত্যাশ্রয়ী যদি বলা না-ও যায় তবু এ কথা বলতেই হবে যে সমরেশ একটি নতুন পথে অভিযান করলেন। চরিত্রে, কাহিনিতে অভিনবত্ব যেমন আছে, তেমনি আবার অতিনাটকও বড় কম নেই। একজন সাহিত্যকারের পক্ষে এতসব ঝাল মশলা ক্ষতিকারক হয়ে উঠতে পারে। প্রয়োজনও ছিল না।

নীললোহিতের সুবিধে হল, তার যেমন বয়স তিরিশের কোঠায় যেতে চায় না, তেমনি আবার ষোড়শী অষ্টাদশীর দেখাও সে হামেশাই পায়। নায়িকা মুমু অবশ্য অষ্টাদশী নয়। যখন আঠারোয় পড়বে তখন তাকে চুমু খাওয়ার অধিকার দিতে হবে নীলুকে। চন্দনদা আর নীপা বউদির বিয়েতে নেমন্তন্ন খেয়েছিল নীলু, সতুরাং তাদের মেয়ে মুমু একরকম বালিকাই বলা যায়। আপাতত একটি ছোট্ট স্টেশনে মুমু চেকারের হাতে ধরা পড়ে হেনস্থা হচ্ছে। নীললোহিত দেখছে।

নীললোহিতের গ্রন্থসংখ্যা বড় কম হল না, বড় কম হয়ে উঠল না তার পাঠক-সংখ্যাও। ছেলে-বুড়ো নির্বিশেষে নীললোহিতের নামে পাগল। তার কারণ অবশ্যই নীললোহিতের যৌবন। যৌবন আর ভ্রমণ—নীললোহিতের ধনুক আর তির। লক্ষ্যভেদও অব্যর্থ। নীললোহিত মানেই পুষ্পধনু। যৌনতা ততটা নয়, নীললোহিতের প্রধান উপাদান বয়ঃসন্ধি, তার রহস্যময়তা, তার ঘোরলাগা মায়াবী জগৎ।

গল্প শুরু করতে নীললোহিত কখনও কোমর বাঁধে না। যেখান-সেখান থেকে যেমন-তেমনভাবে শুরু হয় তার গল্প। আর শুরু হতে না হতেই কয়েকটি আঁচড়ে ফুটে উঠতে থাকে রেল স্টেশন, মানুষজন, আকাশ, ঋতু সব কিছু। কী অনায়াসে, কী সাবলীলতায়!

নীললোহিত দেখেছে অনেক, ঘুরেছেও অনেক, তবু তার চন্দ্রবোড়া সাপ কেন যে ফণা তোলে তা বুঝে ওঠা মুশকিল। সাপ সম্পর্কে নীললোহিতের আরও একটু অভিজ্ঞতা দরকার। কিন্তু এই সামান্য ত্রুটি ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। আসল কথা হল, একাদশী বালিকা বা কিশোরী মুমু আর তার পারিপার্শ্বিক। একটু খ্যাপাটে বাঁধনছাড়া মুডি মুমুকে কারই বা ভালো না লাগবে! আর এইসব কচি মেয়েদের চিত্র নীললোহিতের মতো আর কে-ই বা আঁকতে পারে।

বর্ণময়, চিত্রময়, গতিময়, উষ্ণ ও ঘনিষ্ঠ এই উপন্যাসটি নীললোহিতের পাঠককুলকে অবশ্যই আপ্লুত করবে। ছোট্ট এই উপন্যাসটির মধ্যে ঝটিকার বেগ যেমন আছে, তেমনি আছে বিস্তার। চরিত্র, কাহিনি, শাখাপ্রাশাখায় এতটুকু পরিসরে এতখানি কী করে পোরা গেল সেটাই অবাক কাণ্ড!

বাংলা সাহিত্যের লেখিকার অভাব আমাদের মাঝে মাঝে প্রশ্নাতুর করে তোলে। বিশেষ করে গদ্যে তাঁদের বিচরণ এতই কম যে, কোনও মহিলার লেখা পেলেই মনোযোগী হয়ে উঠি। এই আকালে বাণী বসুর আবির্ভাব অকালবৃষ্টির মতো সুখ-সংবাদ।

তবু মহিলা হিসেবেই নয়, বাণী বসু একজন কথাশিল্পী হিসেবেই প্রবল শক্তির অধিকারিণী। তাঁর আবির্ভাব সাম্প্রতিককালে ঘটলেও অতি অল্প বয়সে তিনি বিপুল খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা পেয়ে গেছেন।

তাঁর ''অন্তর্ঘাত'' উপন্যাসটির একটি পশ্চাদভূমি রয়েছে। তা হল অনতিঅতীতের নকশাল আন্দোলন। আন্দোলন প্রায়-অবসিত, আন্দোলনকারীরাও অধিকাংশই পুনর্বাসিত। অতীতের এক বিপ্লবী তার গোপন পাপ বা বিশ্বাসঘাতকতার স্মৃতিকে শীতের সাপের মতো ঘুম পাড়িয়ে যখন প্রবল সাফল্যের উজ্জ্বলতা নিয়ে ফিরে এল বিদেশ থেকে তখনই এই রহস্যকাহিনির মতো রোমাঞ্চকর উপন্যাসের শুরু। উপন্যাসটি একবগ্গা নয়, টুকরো-টাকরা নানা সংলাপ, খবর, তথ্য ছড়িয়ে আছে। তবু গল্পের ঘন বুনোট একটুও আলগা নয়।

''অন্তর্ঘাত'' কেমন উপন্যাস তার ব্যাখ্যা করা কঠিন। এমন নয় যে এটি একটি দুরূহ সাহিত্যকর্ম। কিন্তু লেখিকার কৃতিত্ব এখানেই যে, টান টান ছিলার ওপরে স্থাপিত শর সর্বদাই লক্ষ্যাভিমুখী। অতীতের পাপের একটি চরম প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা লেখিকা করেছেন বটে, কিন্তু সেই পরিণতি সর্বৈব অবিশ্বাস্য। তবু পড়ার সময় কিন্তু একটুও অস্বাভাবিক লাগে না। এই উপন্যাসের অবিশ্বাস্য গল্পাংশ আরও আছে, যা বাস্তবসম্মত নয়, প্র্যাকটিক্যালও নয়, তবু লেখনীর গুণে তা বিশ্বাসযোগ্য তো হয়েই ওঠে, আমাদের আন্দোলিতও করে।

আর কিছুদিনের মধ্যেই বাণী বসু অপ্রতিরোধ্য ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠবেন, এরকম একটা সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। শুধু ভয়, জনপ্রিয়তার মায়াবী ফাঁদটিকে, তিনি যদি চিনতে পারেন এবং এড়াতে পারেন তাহলে বহু কণ্ঠে তাঁর জয়ধ্বনি অবশ্যই শোনা যাবে। এ-কথা ''অন্তর্ঘাত'' পড়ে মনে হল, তার কারণ এই উপন্যাস পাঠ করার যে আনন্দময় অভিজ্ঞতা, পাঠ শেষে তার রেশ বা প্রতিক্রিয়া আর দীর্ঘস্থায়ী হয় না। উপন্যাস উপন্যাসের সীমারেখাতেই শেষ হয়। আমাদের খুঁচিয়ে জাগিয়ে তোলে না, ব্যাপৃত করে না আত্মানুসন্ধানে। একজন নবীন লেখিকার পক্ষে ''অন্তর্ঘাত''-এর মতো উপন্যাস লিখে ফেলা নিশ্চিত কৃতিত্বের কাজ, কিন্তু নবীনা বলেই কেন লেবেল আঁটবেন তাঁর মতো শক্তিময়ী লেখিকা?

পরী-পুষি জিষ্ণুকে নিয়ে বুদ্ধদেব গুহর উপন্যাস ''ধুলোবালি'' শুরু হয়েছে। আনন্দলোকে প্রকাশিত তাঁর এই উপন্যাস তাঁর অন্যান্য রচনার মতো রোমান্টিক প্রাণবান এবং কিছুটা মুখর। হেমপ্রভা আর হীরু এই দুই প্রবীণ প্রবীণার প্রেমের দৃশ্য চলে আসে এর পরেই। এই দুজনের দেহ-সম্পর্ক অবৈধ, কিন্তু বহুকাল ধরে চলে আসছে। পরী এঁদেরই সন্তান, যদিও তার প্রকাশ্য পিতৃপরিচয় হেমপ্রভার মৃত স্বামীর নামেই। হেমপ্রভা আর হীরুর দ্বিপ্রাহরিক সম্ভোগ শুরু হওয়ার মুহূর্তেই আসেন বৃদ্ধ অভাবগ্রস্থ বাড়িওলা তারিণীবাবু। ইতিমধ্যে উপন্যাসের রং বদলাতে থাকে। এক পথদুর্ঘটনায় মারা যায় পুষি, জিষ্ণুর সঙ্গে স্কুটারে যাওয়ার সময়, মিনিবাসের ধাক্কায়। পরী দেখি বার-এ বসে মদ খায়, লোভী পুরুষের দৃষ্টি উপভোগ করে এবং চ্যাটাং-চ্যাটাং কথায় সবাইকে নাজেহাল করতে ছাড়ে না, বিশেষ করে জিষ্ণুকে। পুষির মৃত্যুর পর একরাতে পরী চলে এল জিষ্ণুর কাছে। যা হওয়ার হল। বাহ্যতে কাজিন হলেও পরী জানে যে, সে তার বাবার সন্তান নয়। ফলে সেদিক দিয়ে বাধা ছিলনা তার।

বুদ্ধদেব যত প্রবীণ হচ্ছেন ততই কি চটুল হচ্ছেন? ইদানীং তাঁর যৌন সম্ভোগের বর্ণনায় যে নিত্য নতুন মাত্রা যোগ হচ্ছে। ইংরিজি ও বাংলা এমন সব শব্দ ব্যবহার করছেন তিনি যা এযাবৎ বাংলা সাহিত্যে ব্যবহার করতে কারও সাহস হয়নি। তা বলে তাঁর সহজসিদ্ধ রোমান্টিক প্রেমকেও তিনি বাদ দেননি। এই উপন্যাসে প্রেমের সম্মোহন ছড়িয়ে রয়েছে এক বিকিরণের মতো।

জিষ্ণু চরিত্রটিও লেখকের এক চমৎকার চয়ন। সে ভাল চাকরি করে। মোটামুটি উচ্চ সমাজে তার মেলামেশা আছে। উদার ও নম্র-হৃদয় অথচ সাহসী ও অসহায় এই চরিত্রটির মধ্যে আমরা কিন্তু পৃথুর ছায়াটুকুও পাইনি। সেই কারণেই জিষ্ণুকে আমার লক্ষণীয় মনে হয়েছে সাধারণত লেখকদের কিছু পোষা চরিত্র থাকে, বার বার সেই চরিত্রের ছায়া নানা রচনায় এসে পড়ে। জিষ্ণু যে মাধুকরীর পৃথুর প্রভাবমুক্ত হতে পেরেছে তা বুদ্ধদেবের যথেষ্ট শক্তিসত্তার পরিচায়ক। কারণ পৃথু ও জিষ্ণু যথাক্রমে জঙ্গলে এবং শহরে বাস করলেও তাদের নিয়ন্ত্রিত করেছে প্রায় একই ভাগ্যচক্র।

পিকলুর চরিত্র রচনাতেও অভিনবত্ব আর আবিষ্কারক চক্ষুর পরিচয় পেয়ে যাই। পিকলু অবশ্য স্মরণযোগ্য হয়ে থাকবে স্মরণযোগ্য হয়ে থাকবেন তারিণীবাবুও।

কিন্তু শেষ অবধি জিষ্ণুকে অনিকেত ও ঘাতকের শিকার না করে তুললেও লেখক পারতেন। মৃত্যু আছেই, কিন্তু তাকে যখন তখন ব্যবহার করলে আমাদের অনেক কিছুই অজানা থেকে যায়। জিষ্ণুর আরও একটু সংগ্রাম বাকি ছিল, বাকি ছিল তার নিজের ও নিয়তির সঙ্গে আপসরফাও। এত অবধারিত ছিল না তার মৃত্যু। লেখক এড়াতে পারতেন।

আজ বুদ্ধদেব এমন এক উচ্চতায় আসীন রয়েছেন এবং এমনই এক বিশাল পাঠকমণ্ডলী তাঁর সৃষ্টি হয়েছে যে, তাঁকে সহজে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যাবে না। তবে মাঝে মাঝে তাঁর ইদানীংকালের লেখা পড়ে মনে হয়, বুদ্ধদেব একটা আধুনিকতাকে আবিষ্কার করতে চাইছেন, মেয়েদের ক্ষেত্রে বা ছেলেদের ক্ষেত্রেও মড পোশাক, মদ্যপান, খোলাখুলি যৌনতা বিষয়ে প্রগলভ হওয়া, মার্কিন ইংরিজিতে কথা বলা এবং অনেক কিছু না মানা—এসবই কিন্তু আধুনিকতার অমোঘ লক্ষণ নয়। আধুনিক মানসিকতা একটা বিশেষ মনোভঙ্গি ও চিন্তার প্রসেস, যা অবিরল পরোক্ষে প্রথা ও প্রকরণকে জীবনযাত্রার সঙ্গে তুলনা করছে, মেলাতে চাইছে, এবং কিছু কিছু বর্জন করে কিছু কিছু গ্রহণ করে এগিয়ে চলেছে। এই গ্রহণ-বর্জনের মধ্যে তার আদিম জৈব সত্তাই ক্রিয়াশীল থাকে। সুতরাং মাকে 'শী ইজ আ বিচ' বললেও কিন্তু আধুনিকতা হয় না। আর খোলাখুলি যৌনতার মধ্যেও তা বোধহয় নেই। অবশ্য বুদ্ধদেব এ ব্যাপারে অনেকের চেয়ে অনেক বেশীই জানেন। ধুলোবালি উপন্যাসের আরও একটা দিক আমার কাছে দুর্বল লেগেছে। তা হল এর ইমোশন। একটু বোধ হয় বেশী স্থানে স্থানে।

তবু বুদ্ধদেবের জয়যাত্রা দেখতে পথের পাশে দাঁড়িয়ে রইলুম।

সিরাজ সেই আশ্চর্য জড়িবুটিওয়ালা যার ঝোলা থেকে কখন কী যে বের করে আনবে ঠিক ঠিকানা নেই। কখনও অজ পাড়াগাঁর গহীন রাজ্যের গল্প, কখনও কলকাতার ঝা চকচকে সমাজের, কখনও গোয়েন্দাকাহিনীর কূটচক্র, কখনও বা অত্যাধুনিক সায়েন্স ফিকশন—অনধিগম্য প্রায় কোনও বিষয়ই তাঁর নয়। ভাষা তাঁর বশংবদ, বাক্যবন্ধে কখনও কবিতা, কখনও রূঢ় পাথুরে জমির রুক্ষতা। তবু সিরাজের নিজস্ব এক ভঙ্গিমা আছে, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তীব্র রুচিবোধ এবং পঠনপাঠন চেষ্টা থেকে জারিত বৈদগ্ধ্য। যতখানি গুরুত্ব তিনি এ যাবৎ পেয়েছেন তার ঢের বেশী পাওনা ছিল।

'নিষিদ্ধ অরণ্য' উপন্যাসে তবু কেন যে দ্বিতীয় অধ্যায়ের শুরুতেই তিনি 'সখ্যতা' লিখলেন সেটা কিছুতেই বুঝে ওঠা গেল না। ''সখ্যতা'' সিরাজের মতো বিজ্ঞ লিখলেও ভুল, আমার মতো অজ্ঞ লিখলেও ভুল।

গ্রামীণ পটভূমিতে নিষিদ্ধ অরণ্যের শুরুটি কিন্তু ভারী সুন্দর। ইন্দ্র, দিনমণি আর তার মেয়ে প্রজ্ঞা, পাঠান বাচ্চা মজহারুদ্দিন কেউই তথাকথিত নাগরিক চরিত্র নয়। সিরাজ গ্রাম চেনেন নিজের করতলের মতো। মানুষগুলিকে তিনি চিনেছেন আরও প্রগাঢ়ভাবে। আত্মার দোসর হিসেবে।

ইন্দ্র ও প্রজ্ঞার মেলামেশা তথা প্রেম নিয়ে কিছু সমস্যা সূচনাতেই ঘনিয়ে ওঠে। ওঠা স্বাভাবিক। সমাজটা গ্রামীণ। শেষ অবধি ইন্দ্রকে শিকার করল বাঘ, প্রজ্ঞা বনে মরল জঙ্গলের আগুনে। প্রজ্ঞার রহস্যময় জন্মবৃত্তান্তও লুপ্ত হল সেই সঙ্গে।

মজহারুদ্দিনই এই উপন্যাসের প্রাণপুরুষ। উপন্যাসের তাবৎ ঘটনা ও চরিত্রের যোগসূত্রও সে। মজহারকে লেখক জাগ্রত বিবেক হিসেবেই সৃষ্টি করেছেন। মজহারের মতো চরিত্রসৃষ্টিতে সিরাজ যে কত সিদ্ধহস্ত তা আমরা জানি। সিরাজের আর এক সিদ্ধি প্রকৃতিকে জীয়ন্ত করে তোলায়। প্রকৃতি ও পরিবেশকে সিরাজ তাঁর ভাষার জাদুতে জাগিয়ে তুলতে পারেন। একটি খাজাঞ্চিখানাও এই উপন্যাসের কেন্দ্রে রয়েছে, আর আছে নানা লোকজন সেটা ঘিরে।

সিরাজের এই নাতিদীর্ঘ উপন্যাসের চিন্তা ও গভীরতা ভারী বিস্ময়কর। এইটুকু পরিসরে তিনি কত কিছু বলেছেন। আর কত চরিত্রেরই না সমাবেশ ঘটেছে। গ্রামীণ অন্ধ বিশ্বাস, ধর্মীয় গোঁড়ামি, কুসংস্কার, মূর্তি পূজা, অলৌকিক ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গ এসে গেছে ঘটনার স্রোতে। খানিকটা উদ্দেশ্যমূলকভাবেই মজহারকে

দিয়ে লেখক এইসব বিষয়গুলি পুনর্মূল্যায়ন করিয়েছেন। তাতেও অবশ্য মজহরি চরিত্র রক্তমাংসহীন বকাবাজ বক্তৃতাসর্বস্ব হয়ে ওঠে না। বরং শেষ অবধি মজহারের প্রচ্ছন্ন প্রভাব থেকে যায় পাঠকের মনে।

সংলাপে কিছু কৃত্রিমতা সিরাজের থাকেই। তাঁর গ্রামীণ চরিত্রগুলিও বড্ড সাজিয়ে কথা কয়, আর বেশ কেতাবী শব্দও ব্যবহার করে। আর মাঝে মাঝে চরিত্রদের মধ্যে লেখক নিজে অনুপ্রবেশ করে তাঁদের মুখোস খুলবার চেষ্টা করেন। ফলে অনেক সময়েই চরিত্রগুলি তাদের স্বভাবজ আচরণ হারিয়ে ফেলে।

তবু সব মিলিয়ে (ট্র্যাজিক শেষ অংশটি ছাড়া) উপন্যাসটি ভারী নতুন রকমের অভিজ্ঞতার শরিক করে আমাদের। একটা নতুন জগতের দরজাও খুলে দেয়।

বিমল মিত্র মশাইকে আমি এই আলোচনার বাইরে রাখতে চাই। তিনি সাহিত্যিকদের অভিভাবকস্বরূপ। বাংলা সাহিত্যকে তিনি এতাবৎকাল যা দিয়েছেন তার মূল্যায়ন হতেই অনেক সময় লাগবে। আজও যে তিনি অতিশয় সক্রিয় ও সফল সেটাকেই আমাদের সৌভাগ্য বলে মনে করি। তাঁকে নমস্কার জানিয়ে আমরা অন্য প্রসঙ্গে চলে যেতে চাই।

হর্ষ দত্ত নবীন কথাশিল্পী। এতই নবীন যে, তাঁকে নিয়ে বেশী কথা বলতে যাওয়াটা কিছু হঠকারিতা হবে। অভিজ্ঞতাবলেই জানি, প্রস্তুতি পর্বে নিন্দা বা প্রশংসা দুটোই ক্ষতিকারক। এই সময়ে লেখক নিজেকে নিজেই বার বার বিচার করেন, বাতিল করেন, শোধন করেন, আর সেইটেই তাঁর নিজস্ব স্টাইলটিকে স্থির করে দিতে থাকে।

হর্ষ যে উপন্যাসটি এবার লিখেছেন তার নামটিই অতীব রোমান্টিক। "ময়ুরাক্ষী, তুমি দিলে।" নায়িকার নামও ময়ুরাক্ষী। তার বন্ধু হল সুনীত, হায়াৎ, চয়ন। দুর্ঘটনায় মৃত হায়াৎ-এর সন্তান গর্ভে ধরে আছে ময়ূরাক্ষী। সে নিজেও সেই একই দুর্ঘটনায় আহত। গল্পের নানা জটিলতার শেষে সুনীত ও ময়ুরাক্ষীর মিলন। এ কোনও ত্রিকোণ প্রেমের গল্প নয়। তরুণ হর্ষ যে-সমস্যাটি নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন তা এমনই বিস্ফোরক এবং যন্ত্রণাময় যে সূচনাপর্বের লেখকের পক্ষে যা দুরন্ত সাহসের কাজ।

হর্ষর এখন যা বয়স তাতে প্রেম ও তার যন্ত্রণার দিকটাই মুখ্য উপজীব্য হয়ে ওঠার কথা। সে হিসেবে এটি প্রেমের কাহিনীই বটে। তবু তার ছত্রে ছত্রে এক রোমান্টিক যন্ত্রণা আর রক্তক্ষরণের চিহ্ন আছে।

হর্ষ যে ভবিষ্যতে অতিশয় সফল লেখক হয়ে উঠবেন তাতে সন্দেহ নেই। তবে কিছু ফেনিলতা, কিছু অতিরিক্ত ভাবাবেগ—যা বয়সেরই দোষ—তাঁকে বর্জন করতে হবে। অনুশীলন পর্বে অবশ্য এগুলো আপনা থেকেই সরে যায়। এ নিয়ে হর্ষকে দুশ্চিন্তা করতে হবে না। আপাতত আমরা খুবই ভরসা নিয়ে তাঁর দিকে চেয়ে থাকব।

একটি রহস্যময়, স্মৃতিভারে আক্রান্ত, বিধুর আবহের মধ্যে শুরু হয়েছে শক্তিমান কথাশিল্পী আবুল বাশারের উপন্যাস 'ভোরের প্রসূতি'। সিতারা তার গোপন অঙ্গে একটি গুলির চিহ্ন দেখেছে নিশুত রাতে। গভীর রাতে সে পার্টি অফিসের জন্য বুনছে এক বিশাল পাটি। তার স্বামী জীবন সেখ বারান্দায় ঘুমোচ্ছে। দূরে বন্দুকের শব্দ। অঞ্চলটি ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত।

দুই দেশের সীমান্তরেখা বরাবর যে সব স্তম্ভ আছে সেগুলির আকৃতির জন্য বলা হয় ভি পয়েন্ট। ভি পয়েন্ট এই উপন্যাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ। আর ফরিয়াদীর চর—সেও সীমানারই আর এক মার্কামারা ভূখণ্ড। ওপার থেকে দোষঘাট করে যারা পালিয়ে আসে, ফরিয়াদীতে তাদেরই বসত। অবস্থা বুঝে তারা দুই বাংলায় যাতায়াত করে থাকে। এই ফরিয়াদীর বসবাসকারীদের পুলিশ বা বি এস এফ কেউই ভাল চোখে দেখে না।

গল্পের শুরু এই ফরিয়াদীর চরে, বন্দুকের শব্দে, যুবতীর গোপন অঙ্গের কাছাকাছি গুলির ক্ষতে, পার্টিতে কাস্তে হাতুড়ি তারার নকশা তোলায় এবং বি এস এফ-এর দাউ দাউ টর্চের হঠাৎ জ্বলে ওঠায়। উপন্যাসের উপকরণ ও সম্ভাবনার পূর্বাভাস পেয়ে যেতে আমাদের মোটেই দেরী হয় না। সীমান্তের পাপচক্রে শামিল

হয়ে যায় সিতারা। তার মহাজন ত্যানার ব্যবসাদার খবিরুদ্দি, স্যাঙাৎ দিলদার। গল্প জমে উঠতে দেরী হয় না।

আবুল বাশার গ্রাম চেনেন চমৎকার। মানুষজনকে বুঝতেও তাঁর দেরী হয় না। দেখার চোখ যথেষ্ট তীকষ্ন ও নিবিষ্ট। আর যে কাহিনী তিনি লিখেছেন তাও ভারী বাস্তব। এরকম তো সীমান্ত অঞ্চলে ঘটেই থাকে, ঘটতেই পারে।

যে উচ্চগ্রামে উপন্যাসকে তিনি বেঁধেছেন, যে ঝোড়ো ঘটনাবলীর টানে উপন্যাস এগিয়েছে তাতে দম ফেলার সময় মেলে না। যৌনতার বিবরণও যেন খোলাখুলি। ব্যবহৃত হয়েছে যথেষ্ট স্ল্যাংও। সিতারাকে ঘিরেই আবর্তন কাহিনীর। তার উত্থান পতন মিলন বিরহ শোক।

দিলদার এক চমৎকার চরিত্র। এল পি। লেখক ব্যাখ্য করেছেন লফঙ্গা পার্টি। মহাজনের হাতের ক্রীড়নক। তার মৃত্যুর পর সিতারার জীবনের একটা পর্ব শেষ হয়। জীবন ব্যাপারী তাকে তালাক দিয়েছিল। সেই আবার এসে হাত ধরে বলল, এ পারের তালাক এ পারেই রইল। ঘাটপারে আমাদের জিন্দেগীর সব দোষ কাটান যায় তারাবিবি।

প্রচ্ছন্ন রাজনীতির একটি পটভূমি। এই উপন্যাসের আর এক লক্ষণীয় দিক।

সুখপাঠ্য গতিময় এই উপন্যাসেও বাশারকে সঠিক খুঁজে পাওয়া গেল বলে মনে হয় না। এত গল্প, এত কথার পরও বাশার এখনও যে তাঁর নিজস্বতা খুঁজছেন সেটা বোঝা যায়। মাঝে মাঝে দু'চারটি দার্শনিক মন্তব্য আছে, আছে কিছু সিদ্ধান্ত। তবু নিতান্তই নাটকীয় ভাবাবেগই প্রধান হয়ে উঠেছে উপন্যাসে। বড্ড বেশী প্রশ্রয় পেয়েছে জনপ্রিয়তার সহজ উপাদান। বাশার অনেক বেশী শক্তিমান লেখক, তিনি বহু দূর যাবেন। তাঁর পথে এই উপন্যাসটি হয়তো মাইলস্টোন হয়ে থাকবে না। তবু খানিকটা অনুশীলন তো সেরে নিলেন। বাশার যখন বাস্তবিকই গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াবেন তখন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী পাওয়াই মুশকিল হবে।

দুলেন্দ্র ভৌমিক কয়েক বছর হল নিয়মিত লেখা শুরু করেছেন। প্রকাশমাত্রই তাঁর উপন্যাস জনপ্রিয় হয়েছে, চলচ্চিত্রেও রূপায়িত হয়েছে। সেই সব দিনরাত্রি উপন্যাসে রাজনীতির অবক্ষয় এবং বিপথগামী তরুণ সমাজের যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে তাও চলচ্চিত্রের মতোই ঘুরে যায় চোখের সামনে। রাজনীতি এই উপন্যাসেরও মস্ত উপজীব্য। কলকাতা এবং শহরতলীর প্রেক্ষাপটে বিস্তৃত এই কাহিনীর মধ্যেও অনেক চরিত্রের সমাবেশ। রাজনীতির বিচিত্রও ও অদ্ভুত চরিত্র দুলেন্দ্র বেশ শক্ত হাতেই এঁকেছেন। ভাল লাগে সুধাকরকে।

দুলেন্দ্রকে অভিনন্দন।

যে কাহিনী নিয়ে মতি নন্দী শঙ্খমালা লিখেছেন তা স্বল্প পরিসরে বিবৃত করার বিষয় নয়। শঙ্খর বালিকা বয়স থেকে যৌবনপ্রাপ্তি পর্যন্ত বড্ড কম বিস্তারিত হয়েছে। অথচ এই বয়ঃসন্ধির সময়টাই ছিল মতির তুরুপের তাস। তবু মতি নন্দী মতি নন্দীই। এই উপন্যাসের ছত্রে ছত্রে সেই আপোসহীন, রুক্ষ, অ-রোমান্টিক কিন্তু তীকষ্নধী মতি নন্দীর স্বাক্ষর আছে। আভাকে খুন করার ব্যাপারটা আমার ঠিক মনঃপূত হয়নি। গল্প তাড়াতাড়ি শেষ করার জন্যই কি? এই উপন্যাসের শেষাংশও যেন ঠিক মতি নন্দীর মতো নয়।

মতিকে যেসব উপন্যাসের জন্য লোকে স্মরণ করে শঙ্খমালা নিশ্চয়ই তার মধ্যে পড়বে না। তবে শক্তিমান লেখকের কোনও রচনাই তো ফেলনা নয়, কিছু না কিছু সত্যের উন্মোচন তাতে পাওয়াই যায়।

মতি দীর্ঘজীবী হোন।

দেবেশ রায়—এই নামটির মধ্যেই এক সময়ে চমক ছিল। পঞ্চাশের দশকে বাংলা ছোটো গল্পে অনেক ভাঙচুর করেছিলেন তিনি। ছিলেন নব গল্প আন্দোলনের পুরোধাদের অন্যতম। উপন্যাস লিখতে শুরু করেন আরও পরে। বেশীর ভাগই বাণিজ্যিক কাগজে নয়। কালীয়দমন পড়ে আমি একেবার মুগ্ধ হয়ে যাই।

এবার শারদীয় প্রতিক্ষণে প্রকাশিত 'কনস্ট্রাকশনের সময় এরকম ঘটে থাকে' উপন্যাসটিও অন্যরকম। ঠিক দেবেশ রায়ের মতোই। দেওঘর জেলা অর্থাৎ পূর্বাঞ্চল সাঁওতাল পরগনা অর্থাৎ দেহাত হল তাঁর এই

উপন্যাসের পটভূমি। কী অনায়াস বাস্তবসম্মত ওই অঞ্চলের মানুষদের চিত্র!

একটি বাঁধ তৈরি করার জন্য একটি জনপদ উচ্ছেদ এবং আনুষঙ্গিক পুলিশী অত্যাচার, গণধর্ষণ—যা বিহারের গ্রামাঞ্চলে প্রায়ই ঘটে থাকে—এই উপন্যাসের বিষয় বটে, কিন্তু সেই সূত্র ধরে গোটা অঞ্চলের মানুষের সুখ দুঃখ নীতিবোধ বা নীতিহীনতা, জীবনযাপনের দৈনন্দিনতা, পীড়ন ও সংগ্রামের কাহিনী এমন ঝাঁঝ নিয়ে উঠে এসেছে যে এই রচনার সামনে আমাদের খানিকক্ষণ নতজানু হতেই হয়। দেবেশ রায়ের এখন বাজারি চাহিদা নেই বলেই বোধ হয় তিনি আপনমনে নিজেকে প্রস্তুত করতে পেরেছেন। অনেক শাণিত হয়েছে তাঁর শব্দের ব্যবহার। লেখায় নির্মোহ সমদৃষ্টির বিস্তার ঘটেছে।

রাজনীতি তাঁর অতি প্রিয় বিষয়। কিন্তু সেটা কথা নয়। এ গল্পে রাজনীতি এসেছে বটে তবে সেটা জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে। যা অনিবার্য তাই তিনি এনেছেন। বিহারের গ্রামে গঞ্জে কী ধরনের ঘটনা ঘটে তা নিয়ে ফণীশ্বরনাথ রেণুর লেখা আমরা পড়েছি। ক'দিন আগেই তো প্রকাশ ঝা-র দামূল দেখলাম। তাছাড়া আকছার বিহার হয়ে ওঠে খবরের কাগজের খবর। সেই হিসেবে এই উপন্যাসের কাহিনী অভিনব কিছু নয়। বরং বিষয়টি একটু চর্বিত চর্বণ বলেই মনে হবে। অভিনবত্ব দেবেশ রায়ের লেখায়—অর্থাৎ লেখার গুণে। দেহাতী সংলাপে হিন্দীতে কোথাও কোথাও একটু আধটু গণ্ডগোল আছে—যা অবশ্য ধর্তব্যের মধ্যেই নয়।

আমার আর এক প্রিয় লেখক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় যুগান্তরে শারদীয় সংখ্যায় লিখেছেন বাম অলিন্দ। শ্যামল তাঁর নিজস্বতার জন্য বিখ্যাত। এই উপন্যাসেও তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সেই অন্যরকম কিছু আছে। রঘু সেন মস্ত একজিকিউটিভ, বয়স ছাপান্ন রানিং, আর জয়শ্রীর বয়স "ডিসেম্বরে তেইশ হবে। এখন আমি বাইশ প্লাস..."।

রঘু সেন এই জয়শ্রীর সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাইছেন এবং তা সম্ভব কিনা তা নিয়ে সংশয়ও প্রকাশ করছেন। কিন্তু যতটা লঘু আর মজার বলে শুরুটা মনে হচ্ছে শেস অবধি কিন্তু তার রং ততটাই পাল্টায়। আপাত মজার পিছনে মানুষের রক্তক্ষরণ শ্যামল দেখাতে থাকে উদাসীন নির্মমতায়।

উপন্যাসটি অবশ্য ছোটো। কিন্তু শ্যামলের লেখা পড়বার অভ্যাস যাঁদের আছে তাঁরা এই উপন্যাসে শ্যামলকে তার গোটা মুদ্রাদোষ, অনবদ্য গদ্য, তির্যক চাহনি ও নানা অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি সৃষ্টির মধ্যে পুরোপুরি খুঁজে পাবেন।

যুগান্তরে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'মানুষের হাড়' আর একটি চমৎকার রচনা। স্বভাবকবির মতোই তিনি যেন স্বভাব-লেখক। পালিশ নেই, চাকচিক্য নেই কিন্তু হুড়ুম করে গল্পের মধ্যে গিয়ে ঝাঁপ খান। এই ক্ষুদ্রকায় উপন্যাসটিকে উপন্যাস বলা ঠিক হবে কিনা ভাবছি। যথেষ্ট শক্তির পরিচয় অবশ্য তিনি দিয়েছেন, কিন্তু পরিসর পাননি। পেলে কী হত কে জানে!

শারদীয় দক্ষিণীবার্তায় দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস হল 'ছেঁড়া ঘুঙুর'। মন্মথ একটি আউটসাইডার চরিত্র। একটি নাচের দলের মেয়েদের সে গোপনে বিয়ের ব্যবস্থা করে দিয়ে তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করে। মেয়েদের নানা অপবাদ ছিল। আর মন্মথর এইসব কাণ্ডের জন্য দল উঠে গেল। শুধু দুটি মেয়ে বাকি রইল বিয়ের। উপায়ান্তরহীন মন্মথ শেষ অবধি দুজনকেই বিয়ে করে সমস্যা মেটাল। ভারী নতুন রকমের হয়েছে এই উপন্যাস।

গাঙ্গেয় পত্রিকায় প্রকাশিত কানাই কুণ্ডুর অন্ধকারের মাছি উপন্যাসটিও অতিশয় উল্লেখযোগ্য। লেখক শক্তিমান, দেখার চোখ প্রখর, হাত পাকা।

একটি পারিবারিক দুর্ঘটনার শোকেই সম্ভবত একটি মেদুর ছায়া প্রলম্বিত করেছে সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের 'হিরোসিমা মাই লাভ' উপন্যাসে। শারদীয়া আজকাল-এ।

যে পড়ো পড়ো সাইকেলটি সন্দীপন অনেক দিন ধরে চালিয়ে আসছিল তার একটি চাকা যদি গদ্য তো অন্যটি চালাকি। তার সাইকেলখানির মধ্যে যে প্রদর্শনী আছে তা অবশ্যই দর্শনযোগ্য। সাবালকত্ব তাঁর ধাতে সয় না বলেই তিনি হলেন না, কিন্তু হলে আর সন্দীপনের থাকল কি? নাবালক যে যুক্তিহীন নানা কাজ

অকাজ করে বেড়ায় তাও কি ফেলনা! সুতরাং সন্দীপন ঠিক সন্দীপনের মতোই রয়ে গেলেন পঞ্চাশের দশকে, ষাটের দশকে, সত্তরের দশকে, আশির দশকেও।

'হিরোসিমায়' কিন্তু নতুন সন্দীপন। এবং বেশ খানিকটা নতুন। এখানে এমন এক মানুষকে পাই যে স্নেহশীল পিতা, উদ্বিগ্ন দাদা এবং আরও কত কী। এসব চরিত্রকে সন্দীপন একদা এড়িয়ে গেছেন। এই উপন্যাসের নেপথ্য সত্য ঘটনাটি আমি জানি বলেই নয়, উপন্যাসটির ভিতর দিয়ে যে আবেগমিশ্রিত বেদনার প্রকাশ ঘটেছে তা যে-কোনও পাঠকের চোখে জল আনতে পারে। সন্দীপন আবার আমাকে ভাবিয়ে তুললেন। নিজের ভিতরকার যে সব অস্ত্রশস্ত্র তিনি ব্যবহার করেননি, এতকাল, তাতে হাত পড়ল এবার। যদি মরচে সাফ করে শাণিয়ে নেন তো সন্দীপন যে অনেক মাথা ভুঁয়ে লুটিয়ে দেবেন।

অভিনন্দন সন্দীপন।

## ঘনাদার কাহিনি আজও সমান আকর্ষক

গ্রন্থটি সম্পাদনার জন্য প্রথমেই ধন্যবাদ জানাতে হয় সুরজিৎ দাশগুপ্তকে। সযত্নে কালানুক্রমে, প্রয়োজনীয় সংশোধন করে এই সংকলনটি গ্রথিত হয়েছে। তথ্যসমৃদ্ধ এবং সুলিখিত দীর্ঘ ভূমিকাটি থেকে ঘনাদা এবং প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পর্কে প্রায় সব কিছুই আমাদের জানা হয়ে যায়। প্রচ্ছদ, গ্রন্থে ব্যবহৃত কাগজ, মুদ্রণ, বাঁধাই সব মিলিয়ে রীতিমতো মন ভাল হয়ে যাওয়ার মতো ঘনাদার তিন খণ্ড আমাদের হাতে এল।

আজ নয়, সেই শৈশব থেকেই ঘনাদা আমাদের খারাপ মন ভাল করে দিয়ে আসছেন। কানাঘুষো শুনতুম যে, প্রেমেন্দ্র মিত্র একজন জ্যান্ত এবং আসল মানুষের আদলেই ঘনাদাকে তৈরি করেছেন। এবং সেই জ্যান্ত মানুষটি আনন্দবাজার পত্রিকার ক্রীড়া বিভাগের সাংবাদিক ব্রজদা। ব্রজদা নাকি অম্লানবদনে নানা অবিশ্বাস্য গল্প করে যেতেন এবং বাকিরা হাঁ করে শুনত। এই ব্রজদাকে দিয়ে গৌরকিশোর ঘোষও ঘনাদার আদলে কিছু গল্প লিখেছিলেন, কিন্তু প্রেমেন্দ্র মিত্রর ঘনাদা অন্য জিনিস, বাংলা রসসাহিত্যের অক্ষয় সম্পদ। ঘনাদার পরিকল্পনা যদি প্রেমেন্দ্র মিত্র কাউকে দেখে করেও থাকেন সেটা নিতান্তই নৈমিত্তিক ঘটনা। তাছাড়া ব্রজদাকে আমি দেখেছি, ক্রীড়া সাংবাদিক হিসেবে খুবই দক্ষ মানুষ। একবার হকির পেনাল্টি কর্নার ব্যাপারটা ভাল করে বোঝবার জন্য তাঁর কাছে গিয়েছিলাম, তিনি সস্নেহে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর তখন বেশ প্রবীণ বয়স। তিনি সুঁটকো চেহারার মানুষ ছিলেন না, মেসেও বাস করতেন না। ঘনাদার গল্পের অনুপ্রেরণা যদি তিনি দিয়েই থাকেন তাহলে সেটা আমাদের সৌভাগ্যেরই বিষয়।

আমার পাঠক হিসেবে একটা খটকা হল এই যে, প্রেমেন্দ্র মিত্রর সিরিয়াস গল্পের সংখ্যা এত কম কেন। তাঁর 'শ্রেষ্ঠ গল্প' গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়েছে খুবই সীমিত সংখ্যক গল্প। বলতে কী এমন শীর্ণকায় শ্রেষ্ঠ গল্প আর কারও আছে বলে মনে হয় না। তাঁর উপন্যাসের সংখ্যাও খুব বেশি নয়। তার মধ্যেও বেশ কয়েকটি গোয়েন্দাকাহিনি জাতীয় লেখা। তাঁর 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' বা 'সাগর সঙ্গমে' গোছের কয়েকটি গল্প এবং 'পাঁক' ছাড়া অন্যান্য লেখা নিয়ে তেমন আলোচনাও হয় না। কিন্তু তাঁর বিপুল খ্যাতি ঘনাদার জন্য, এক সময়ে কবিখ্যাতিও তাঁর তুঙ্গে উঠেছিল। 'সাগর থেকে ফেরা' কাব্যগ্রন্থের জন্য আকাদেমি পুরস্কার পান, এবং শুনেছি জীবনানন্দ তাঁর কবিতার ভক্ত ছিলেন।

বিস্ময়টি এইখানেই। অসম্ভব সৃজনশীল এই মানুষটির খ্যাত হওয়া উচিত ছিল তাঁর সিরিয়াস গল্প-উপন্যাসের জন্যই। কবি হিসেবেও মান্যতা পেতেই পারতেন। কিন্তু নিজের প্রতিভা ও সৃজনক্ষমতাকে তিনি এত ভাগে ভাগ করে দিয়েছিলেন যে কতগুলি ভাগ তেমন গুরুত্ব ও মনোযোগ পেল না তাঁর। প্রেমেন্দ্রর সৃষ্টিশীলতাকে অনেকটাই খেয়ে নিল চলচ্চিত্র। কখনও চিত্রনাট্যকার, কখনও পরিচালক। অনুবাদের কাজও করতে হয়েছে। ছিল বিপুল ও ব্যাপক পড়াশুনো। শুনেছি, তাস খেলতে খুব ভালবাসতেন এবং আড্ডা মারতেও। নিজের গরজে বড় একটা লিখতে বসতেন না, বসতেন সম্পাদক বা প্রকাশকের তাগিদে। বেশ পরিণত বয়স অবধি বেঁচে ছিলেন, তবু তাঁর তেমন বৃহদাকার কোনও উপন্যাস নেই। কবি-গোয়েন্দা পরাশর বর্মাকে নিয়ে যত লিখেছেন বা ঘনাদাকে নিয়ে লেখায় তাঁর যে তাগিদটা ছিল সেটা সিরিয়াস লেখায় তেমন ছিল না এটা ভাবতে কষ্ট হয়। ঘনাদার জন্য বা পরাশর বর্মার জন্য তিনি চিরস্মরণীয় হবেন ঠিকই, কিন্তু গভীর দৃষ্টি ও সৃজনক্ষমতা সিরিয়াস লেখায় আরও একটু নিবিষ্ট হলে আমরা পাঠক হিসেবে আরও লাভবান হতাম।

ঘনাদার গল্পে মূল কুশীলবরা একই থেকে যায়, গল্পের অনুষঙ্গে নানা বিদেশি চরিত্র আসে। ভূগোল, বিজ্ঞান, খানিকটা ইতিহাস, সব মিলিয়ে এক একটা ছোট গল্পই যেন আমাদের কত কিছু শিখিয়ে দেয় এবং বাড়িয়ে দেয় জ্ঞানস্পৃহা। আর বিজ্ঞান বলতে তো একটা বিষয় নয়, তার মধ্যে পদার্থবিদ্যা, মহাকাশবিদ্যা, জীববিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, কীটপতঙ্গ বিষয়ক জ্ঞান, রসায়ন, কী নেই। আমার মনে হয় না যে, শুধু ঘনাদার গল্প লিখবেন বলেই তিনি এসব পড়াশুনো করেছেন। বরং মনে হয়ে প্রেমেন্দ্রর অদম্য জ্ঞানস্পৃহাই তাঁকে এসব পড়তে বাধ্য করেছে। কল্পবিজ্ঞান বাংলা ভাষায় তাঁর হাতে যতটা পুষ্ট হয়েছে এমনটা আর কারও হাতে হয়নি। যদিও লিখেছেন এবং লিখছেন অনেকেই। সুরজিৎ ভূমিকায় লিখেছেন প্রেমেন্দ্র ঘনাদার গল্পগুলিকে কল্পবিজ্ঞান না বলে টখনন ঠ্থনত্রম নামে অভিহিত করেছেন। আমার মনে হয় ব্যাপারটা ঠিকই। কল্পবিজ্ঞানের অর্থ, যে-বিজ্ঞান এখনও মানুষের আয়ত্তে আসেনি তা কল্পনা করে ভবিষ্যৎ চিত্র বা গ্রহান্তরের কাহিনি রচনা। এই গল্পগুলি তা নয়। গুলবাজ ঘনাদা যে বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প বলছেন তা বর্তমান এবং জ্ঞাত বিজ্ঞান, যার খোঁজ আম-পাঠক জানেন না। সেদিক দিয়ে এগুলি কল্পবিজ্ঞান নয় ঠিকই, কিন্তু 'মঙ্গলগ্রহে ঘনাদা'কে কল্পবিজ্ঞান বলতে বাধা নেই। কিন্তু এই কাহিনিতে মহাকাশযাত্রায় ভারহীনতা বা অন্যান্য অবশ্যম্ভাবী ডিটেলসে বেশ কিছু ত্রুটি রয়ে গেছে।

ভূমিকা থেকে জানা যাচ্ছে যে, ১৩৫২ বঙ্গাব্দে দেব সাহিত্য কুটিরের পূজাবার্ষিকী 'আলপনা'য় প্রেমেন্দ্র তাঁর প্রথম ঘনাদার গল্পটি লেখেন। নাম 'মশা'। এর আগেই দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের শেষ দিকে জাপানে পরামাণু বোমার বিস্ফোরণ ঘটেছে এবং মহাযুদ্ধ অবসানের সুস্পষ্ট সংকেত পেয়ে বাংলায় আনন্দোৎসব হয়েছে। ঘনাদার আবির্ভাব তিথিটি তাই বেশ সংকেতময়। এবং তার পর থেকে প্রতিবারই ওই সংস্থার পূজাবার্ষিকীতে তিনি একটি করে ঘনাদার গল্প লিখতেন। ঘনাদা অচিরেই জনপ্রিয়তা লাভ করে।

উত্তর কলকাতার মেসবাড়িগুলি চালাতেন আবাসিকরাই। বাড়ি ভাড়া করে ঠাকুর-চাকর রেখে তাঁদেরই পরিচালনায় মেস চলত। কালক্রমে অবশ্য ঝামেলা পোয়াতে না পারায় মেস ব্যাপারটা উঠে যেতে থাকে, সে জায়গায় আসে বোর্ডিং হাউস। বোর্ডিং হাউস বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মালিকানার অধীনে চলে, বোর্ডাররা মাসে মাসে তাঁদের দেও টাকা মিটিয়ে দেন। মেসের আবাসিকদের যে স্বাধীনতা ছিল বোর্ডিং হাউসে তা থাকে না। এসব কথা উত্থাপনের কারণ হল, গল্পের আবহটিকে ঠিকমতো চিহ্নিত করা। মেস, বোর্ডিং-এ দীর্ঘকাল বাস করার ফলে আমার কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে। প্রেমেন্দ্র মিত্র কখনও মেস-এ বাস করেছেন কিনা জানি না, কিন্তু ঘনাদার গল্পের মেসবাড়িটির আবহ এবং পরিবেশ কিন্তু নিখুঁত। জেলা বা প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে আগত চাকরিজীবী বা ব্যবসায়ীরা এরকম মেস করে থাকতে থাকতে পরস্পরের সঙ্গে এক ধরনের আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যেতেন। পরিবারের দায়বদ্ধতা এবং শাসন না থাকায় তাঁরা বেশ বৈঠকি আড্ডা বা তাসটাস খেলে অবসর বিনোদন করতে পারতেন। বাহাত্তর বনমালী নস্কর লেনের মেসবাড়ির আড্ডাটিতে

সেই আত্মীয়সভার উত্তাপ আছে। আর আছে একেবারে খাঁটি বাঙালিসুলভ আলস্যবিজড়িত কালক্ষেপণ। আর কল্পনার বল্গাহীন বিস্তার। এই এঁদো গলির ভিতর থেকে হঠাৎ যখন ঘনাদার হাত ধরে আমরা মেরুদেশ বা আফ্রিকা বা দক্ষিণ আমেরিকার অচেনা প্রতিকূল পরিবেশে গিয়ে পড়ি তার ঝাঁকুনিটাই ভারি উপভোগ্য। প্রেমেন্দ্র মিত্র সেইসব দেশে যাননি যেখানে তাঁর ঘনাদা গেছেন। কিন্তু না গেলেও প্রেমেন্দ্র এইসব দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, আবহাওয়া, রাজনীতি এবং ইতিহাসের খবর রাখতেন। এমনকী তাদের ভাষার খবরও। ঘনাদা তাই আদ্যন্ত তথ্যবহুল। নিতান্ত গুলগল্প মনে করলে পাঠক ভুল করবেন।

নিতান্তই পুঁচকে বয়সে আমি কোনও পুজো সংখ্যায় প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনাদার গল্প প্রথম পড়ি এবং মুগ্ধ হই। ঠিক ওই ধরনের ঝকঝকে গল্প তখন আর কেউ লিখতেন না। আমাদের শিশুসাহিত্যে বিজ্ঞানমনস্কতার বেশ অভাব আছে। তাই প্রেমেন্দ্র মিত্রর ভক্ত হতে দেরি হয়নি।

মুশকিল হল, তখন পুজো সংখ্যা বড় সহজলভ্য ছিল না। গল্পের বই কেনা মানেই পড়াশুনোয় ফাঁকি, এরকমটাই ছিল অভিভাবকদের ধারণা। তাছাড়া তখন দূর মফসসলে পুজো সংখ্যা পাওয়াও যেত না বিশেষ। আর আমাদের তখন যাযাবরের মতো ঘন ঘন ঠাঁইনাড়া হতে হত বাবার বদলির চাকরির সুবাদে। বিহার বা অসমের প্রত্যন্ত জায়গায় বাংলা বই পাওয়াও যেত না তেমন।

তাই প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনাদার গল্প পড়ার জন্য আমাকে বেশ অনেকদিন অপেক্ষা করতে হয়। যখন ফের ঘনাদার গল্প পড়ার সুযোগ হল তখন আমার বাল্য-কৈশোর পেরিয়ে গেছে। কিন্তু তাতে রসাস্বাদনের কোনও অসুবিধে তো হলই না, বরং যুবা বয়সে এই গল্পগুলির প্রজ্ঞাজাত বিচ্ছুরণ আরও বেশি করে চোখে পড়ল। এখনও সমান আগ্রাসী আগ্রহে ঘনাদা পড়ি। সবচেয়ে খুশির খবর হল, ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন সংকলনে গ্রথিত ঘনাদার গল্পগুলো এখানে একসঙ্গে পাওয়া গেল।

বোধহয় 'মশা' গল্পটিই আমার পড়া ঘনাদার প্রথম গল্প। গল্পটি তেমন জটিল নয়। বনমালী নস্কর লেনে ঘনাদার প্রেক্ষাপট অতি চমৎকার বর্ণিত হয়েছে। সিগারেট অন্যদের কাছে ধার করলেও শিশিরও বাদ যায়নি, তার কাছ থেকেও সিগারেট নিয়েছেন তিনি। তারপর মশার প্রসঙ্গে আমাদের নিয়ে গেছেন সাখালীন নামক জাপানের উত্তরে অবস্থিত এক বাসের অযোগ্য দ্বীপে, যেখানে বছরে ছয় মাস তুমুল বৃষ্টি, আর বাকি ছয় মাস তুষারপাতে এবং তুষারঝড়ে সব জমে থাকে। সেইখানে নিশিমারা নামে জাপানি দুষ্ট বৈজ্ঞানিক তাঁর ল্যাবরেটরিতে বিষাক্ত মশা সৃষ্টি করেছেন। পরীক্ষামূলকভাবে সৃষ্ট সেই মশা কীভাবে নিশিমারা এবং তাঁর কুকর্মের সহচর কাফ্রি গুন্ডার ভবলীলা সাঙ্গ করে ঘনাদার চাপড়ে নিহত হল সেই কাহিনি। খুব জটিল গল্প নয়। তবু এ গল্প থেকেই জানতে পারি, মশা আসলে তিনটি শুঁড়ের সাহায্যে মানুষের রক্ত শুষে খায়।

'পোকা' গল্পটিও আবার কীটপতঙ্গঘটিত বিজ্ঞান। সেইসঙ্গে ইহুদিদের অবস্থান এবং চমৎকার এক টানটান উত্তেজক কাহিনি। গোয়েন্দা গল্পের চেয়েও ভাল। গল্প পড়তে পড়তেই জানা বস্তু বা পোকামাকড়দের লাতিন নাম, তাদের স্বভাবচরিত্র ও ক্ষমতার কথা জানা হয়ে যায়। আর গল্পচ্ছলে আহরিত হয় বলে তা মনেও থাকে। গল্পে জ্ঞান বিতরণ করার জন্য কখনও লেখেননি প্রেমেন্দ্র মিত্র, কিন্তু সেই কাজটি সুচারুরূপেই সাধিত হয়েছে।

আদ্দিস আবাবা শহরের বৈশিষ্ট্য হল তার অপরূপ গন্ধ—একথা আমাদের ভূগোলের বইতে নেই। 'সূঁচ' গল্প পড়েই প্রথম জানা হল যে, সেখানে প্রচুর ইউক্যালিপটাস গাছ জন্মায় এবং লোকে তা জ্বালানি হিসেবে পোড়ায় বলে সারা শহরে অমন সুগন্ধ ছড়িয়ে থাকে। বাস্তবেও ব্যাপারটা তাই কিনা তা জানি না, হলে আশ্চর্য হব না। প্রেমেন্দ্র না-জেনে লেখার লোক নন।

'ঘনাদাকে ভোট দিন' গল্পে যেমন আমরা সংক্ষেপে হাইতি দ্বীপের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসটা গল্পের ছলে পেয়ে যাই। ইতিহাসটাকে বেশি না খেলিয়ে গল্পের প্রয়োজনেই ইতিহাসটাকে এমন চমৎকার ব্যবহার যার তার কর্ম নয়। তথ্যকে গল্পের সঙ্গে এমন সুনিপুণভাবে মেলানো যে কী কঠিন তা ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন। মাত্রাজ্ঞানের অভাব ঘটলেই গল্প তথ্যভারাক্রান্ত মন্থর হয়ে পড়ে।

কেঁচো যে উপযোগী প্রাণী এটা আমরা মোটামুটি জানি। কিন্তু কেঁচো যে নিজের ওজনের ষাটগুণ পাথরকুঁচি সরাতে পারে সেটা 'কেঁচো' গল্পটি না পড়লে জানতে পারতাম না। আর কে-ই বা জানত মেগাসকোলাইডিস অস্ট্র্যালিস কেঁচো কাছির মতো মোটা এবং লম্বায় আড়াই হাত অবধি হয়? কীট-পতঙ্গ বিজ্ঞানের প্রতি প্রেমেন্দ্রর আকর্ষণ একটু বেশিই ছিল, আর তা বুঝতে পারি মশা, মাছি, কেঁচো, পোকা নিয়ে তাঁর বিভিন্ন গল্পে। এনটেমোলজির বিভিন্ন বিষয় তিনি তাঁর ঘনাদার গল্পে চমৎকারভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

ঘনাদার কাহিনিনিচয়কে শিশুসাহিত্য বা কিশোরপাঠ্য বলে অভিহিত করলে অবিচার হবে। ঘনাদার গল্প, পরাশর বা মামাবাবুর গল্প সর্বজনপাঠ্য। বয়স্করাই এসব গল্প বরং বেশি পড়ে। লক্ষণীয় হল ঘনাদার গল্পে কোনও নারীচরিত্রেরই দেখা মেলে না। সত্যজিতের ফেলুদার গল্পেও যেমন শুধুই পুরুষদের কাণ্ডকারখানা। কিন্তু আমরা বাস্তবক্ষেত্রে এতটা নারীবর্জিত ঘটনাক্রম তো দেখতে পাই না। আর অপরাধজগতেও কিন্তু মহিলাদের দেখা ভালই মেলে। অবশ্য এটা কোনও ত্রুটি বা বিচ্যুতি নয়, একটা অসম্পূর্ণতা মাত্র।

তিনটি খণ্ডে ঘনাদার গল্প এবং উপন্যাস গ্রথিত হয়ে আমাদের হাতে এসেছে। দেখতে পাই যে, প্রেমেন্দ্র মিত্র দীর্ঘ লেখা লিখতে পছন্দ করতেন না। তাঁর সিরিয়াস উপন্যাসের সংখ্যা খুবই কম, গোয়েন্দা উপন্যাসের সংখ্যা একটু বেশি বটে, কিন্তু সেগুলি সবই আকারে ছোট। উপন্যাস না বলে বড় গল্প বললেই হয়। দীর্ঘ রচনার প্রতি তাঁর এই অনীহা কেন তা আজও বুঝতে পারি না। শুধুই আলস্য বা ধৈর্যের অভাব? নাকি দীর্ঘ রচনার প্রয়োজন মনে করতেন না? কিংবা নানা মাধ্যমে কাজ করতে গিয়ে লেখার অবকাশ তেমন পেতেন না?

যাই হোক, তাঁর মতো সাহিত্যিকের কাছ থেকে আমাদের কিছু বেশিই প্রত্যাশা থাকে। ঘনাদা ভাল, মামাবাবু বা পরাশরও ভাল, কিন্তু এসব লেখা আমাদের এন্টারটেন করে মাত্র। পড়ে মজা পাই, সময় চমৎকার কাটে, মন ভাল হয়ে যায়। কিন্তু যে সাহিত্য আমাদের নিথর মস্তিষ্কে আলোড়ন তোলে, চমকপ্রদ জীবনসত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে শেখায়, নূতন মাত্রা যোগ করে চিন্তারাজ্যে তা তো এ নয়।

কল্লোল যুগের অন্যতম বিদ্রোহী লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্র। জীবনমন্থনজাত অভিজ্ঞতা তাঁর বড় কম নয়। পরিক্রমাও বড় কম করেননি। এবং সবচেয়ে বড় কথা তাঁর গুটি কয়েক গল্প ও উপন্যাস পড়লে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে তিনি উঁচু জাতের লেখক। নিজের এই ক্ষমতাকে তিনি ঈষৎ উপেক্ষা করেছেন বলেই আমার ধারণা। কবিতার জন্য নন্দিত হয়েছেন, পুরস্কার পেয়েছেন, কিন্তু কবিতাই তেমন পরিমাণমতো লিখলেন কই? তবু বা যেটুকু লিখেছেন তার জন্য কোনও পুরস্কারই তাঁর অপ্রাপ্য থাকেনি। কিন্তু প্রেমেন্দ্র মিত্র বলতেই যদি শুধু ঘনাদার কথা মনে পড়ে তাহলে সেটা দুঃখের ব্যাপার হবে। ভাবতে কষ্ট হবে যে শুধু ঘনাদার জন্যই তিনি স্মরণীয় হবেন।

সামান্য একটু ব্যক্তিগত পরিচয় তাঁর সঙ্গে আমার ছিল। তাঁর চোখে বোধ ও বুদ্ধির দীপ্তি, কথাবার্তায় স্নেহ ও প্রশ্রয় এবং বৈদগ্ধ্য সবই লক্ষ করেছি। কাছে গেলে বেশ ভাল লাগত। সাহস করে লেখালেখির প্রসঙ্গ অবশ্য কখনও তুলিনি, সুযোগও হয়নি। কিন্তু ইচ্ছে হত, বলি, আমাদের মুখ চেয়ে আরও একটু লিখুন।

১৯৭৩-এ প্রেমেন্দ্র মিত্রর সঙ্গে একযোগে আমিও আনন্দ পুরস্কার পাই। পার্ক হোটেলের মঞ্চে পাশাপাশি বসে তাঁর সঙ্গে প্রথম আলাপ। সেই সামান্য আলাপেই তাঁর সহৃদয়তার যে পরিচয় পেয়েছিলাম তা দুর্লভ। তার পরে আরও দু-একবার দু-একটা অনুষ্ঠানে দেখা হয়েছে এবং সৌভাগ্যবশে তিনি দেখামাত্র আমাকে চিনতে পেরেছেন। আর তাইতেই আমি যথেষ্ট শ্লাঘা বোধ করতাম। কারণ তিনি তখন আমার কাছে কিংবদন্তীর মতো।

শেষ পর্যন্ত আবার এও মাঝে মাঝে মনে হয় যে, লেখকের কাছে দাবিদাওয়া পেশ করা নিরর্থক। তিনি ইচ্ছে করলেই নিজেকে পাল্টাতে পারেন না। নিজের মর্জিমতোই তাঁকে লিখতে হবে, পাঠক যতই অন্যরকম প্রত্যাশা করুক। তাই প্রত্যাশাকে সরিয়ে রেখে যা পাওয়া যায় তাই কৃতাঞ্জলিপুটে আমাদের গ্রহণ করা উচিত। আর প্রেমেন্দ্র যা আমাদের দিয়েছেন তা বড় কমও তো নয়। তাঁকে নমস্কার।
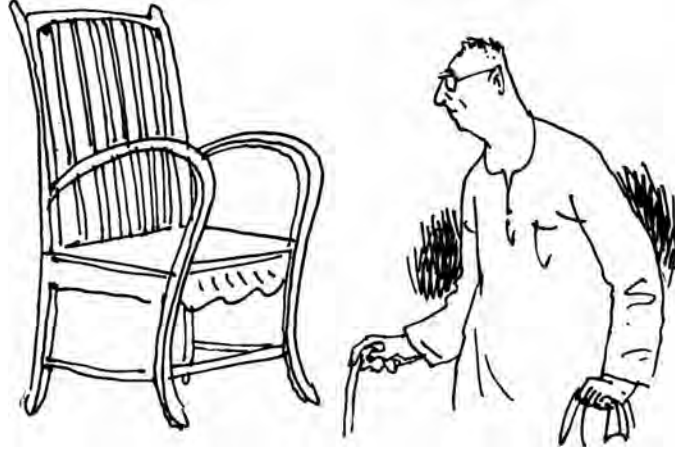
# হোমস-এর হাত আজও ছাড়েনিনি

'I consider that a man's brain originally is like a little empty attic, and you have to stock it with such furniture as you choose. A fool takes in all the lumber of every sort that he comes across...it is of the highest importance, therefore, not to have useless facts elbowing out the useful ones.'—উক্তিটি শার্লক হোমসের। এবং শার্লক হোমসের অধিকার আছে কার্লাইল কে, কোপার্নিকান থিওরি কী বা সৌরজগতের গ্রহাবস্থান কীরকম তা না জানার। যে-তথ্য তার কাজে লাগবে না, যে-খবরের কোনও প্রয়োজন নেই তা দিয়ে মস্তিষ্ককে ভারাক্রান্ত করার ঘোর বিরোধী সে। শার্লক হোমস ডাক্তার নয়, রসায়নবিদ নয়, তবু সারাদিন তার কেটে যায় হাসপাতালের রসায়নাগারে নানা ব্যক্তিগত অদ্ভুত গবেষণা বা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় কিংবা শবব্যবচ্ছেদের ঘরে নানা কৌতূহল মেটাতে।

'স্টাডি ইন স্কারলেট'-এর প্রথম লাইনেই এই লম্বা, রোগা, তীক্ষ্ন চক্ষু, খড়্গনাসা, উদ্ধত চিবুকের যুবা পুরুষটিকে আমরা ভালবেসে ফেলি, কারণ সে আর পাঁচজনের মতো নয়। পৃথিবী যে সূর্যের চারদিকে ঘোরে এই সত্যটিও তার অজানা। কথাটা উঠলে সে সপাটে বলেছিল, 'পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরুক কিংবা চাঁদের চারদিকে তাতে আমার কী এল গেল? ওটা জানার কানাকড়িও দাম নেই আমার কাছে।'

হোমসের এই উক্তিটির পিছনে লেখকের জীবনদর্শনের একটা ঝলক আছে। বাস্তবিক মানুষের প্রয়োজন নেই অনাবশ্যক তথ্যপুঞ্জে মস্তিষ্ককে ভারাক্রান্ত করে তোলার, যদি না তাকে কুইজ কনটেস্টে নামতে হয়। তবে শার্লক হোমসের জ্ঞান কতক সীমাবদ্ধ হলেও তার স্রষ্টা আর্থার কোনান ডয়েলের ক্ষেত্রে কিন্তু তা নয়। পেশায় ডাক্তার ছিলেন, সুতরাং চিকিৎসাবিদ্যা, খানিকটা রসায়ন, তাছাড়া ভূগোল, ইতিহাস, রাজনীতি, বিজ্ঞান সর্ববিষয়েই তাঁর বিস্তর পড়াশুনো ছিল। ব্যাপক পরিভ্রমণের ফলে তাঁর অভিজ্ঞতাও বড় কম ছিল না। আর সেই সব জ্ঞান তাঁর নানা লেখায় কাজে লেগেছে।

শার্লক হোমস-এর বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও কিন্তু কোনান ডয়েল একজন গোয়েন্দা কাহিনির লেখক হয়েই থাকতে চাননি। বরং তাঁর ইচ্ছে ছিল হোমসের গল্প লিখে কিছু উপার্জনের ব্যবস্থা করে চিরকালীন সাহিত্য রচনায় আত্মনিয়োগ করার। কিন্তু তাঁর অন্যান্য রচনা সমাদর পেলেও শার্লক হোমসকে সৃষ্টি করার জন্যই ডয়েলকে আজও পৃথিবীর সকলেই চেনে। তাঁর 'লস্ট ওয়ার্ল্ড' নামক অসাধারণ অ্যাডভেঞ্চার উপন্যাসটি আমি পড়েছি। বই শেষ না করে ওঠা যায় না। যেমন মজা তেমনই গল্পের টান। আর সেই সঙ্গে লুপ্ত সব প্রাচীন প্রাণীর সম্পর্কে নিখুঁত তথ্য। ডাক্তার চ্যালেঞ্জারের আরও কিছু কাহিনি আছে যা আমাদের

মুগ্ধ করে। ডয়েল যেমন সাহিত্য রচনা করতে চেয়েছিলেন তাও করেছেন। তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসের সমাদর যথেষ্ট হয়েছে, কিন্তু তিনি যে-লেখাকে তেমন মূল্য দিতে চাননি, সেই শার্লক হোমস কিন্তু সবকিছুকে ছাপিয়ে গেছে।

শার্লক হোমস নামক অতীব আকর্ষণীয় গোয়েন্দার চরিত্র সৃষ্টি করার নেপথ্যে একজন মডেল কোনান ডয়েলের ছিল। তবে এই মডেলটি কে তা নিয়ে বিস্তর বিতর্ক ও অনুমান আছে। বাস্তবিক লেখকরা বোধহয় বাস্তব থেকে হুবহু কাউকে গল্পে উপন্যাসে ব্যবহার করেন না। নানা জনের নানা বৈশিষ্ট্য জড়ো করেই তাঁরা নূতনতর চরিত্রের জন্ম দেন। হয়তো বা নিজেরও খানিকটা প্রক্ষেপ ঘটান। কোনান ডয়েল নিজে একজন অতি দক্ষ ফুটবল ও ক্রিকেট খেলোয়াড় ছিলেন, মুষ্টিযুদ্ধেও অবতীর্ণ হতেন। তাঁর বেশ মজবুত প্রকাণ্ড চেহারাও ছিল। তাই মাঝে মাঝে আমরা তাঁর ছিপছিপে দীর্ঘকায় গোয়েন্দা শার্লক হোমসের ভিতরেও বিস্ময়কর শারীরিক শক্তির প্রকাশ দেখতে পাই, হোমসের মুষ্টিযুদ্ধেও দক্ষতা ছিল। তবে মোটামুটিভাবে শার্লক হোমস আত্মগত, চিন্তাশীল, অতিশয় বুদ্ধিমান গোয়েন্দা। অলোকসামান্য তার পর্যবেক্ষণ ও অনুমানশক্তি। নিজেকে বুদ্ধিমান বলে সে জানে এবং তা নিয়ে বেশ অহংকারও আছে তার। আর আছে তার চারদিককার মানুষজনের নির্বুদ্ধিতার প্রতি একটু বিদ্রূপাত্মক মনোভাবও। বন্ধু ওয়াটসনকেও যে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ বড় কম করে না।

শার্লক হোমসের প্রথম দিককার উপন্যাসটির কথাই যদি ধরা যায়, তাহলে বলতেই হবে 'এ স্টাডি ইন স্কারলেট'-এর শুরুটি চমকপ্রদ। ওয়াটসন আর হোমসের প্রথম সাক্ষাৎ, বেকার স্ট্রিটের ফ্ল্যাটে ভাগাভাগি করে বসবাস এবং হোমস চরিত্রের উন্মোচন ভারি ভাললাগার মতো। একটি জনহীন বাড়িতে রহস্যময় খুনের ঘটনাটিও কৌতূহলের উদ্রেক করে। কিন্তু উপন্যাসটি হঠাৎ থমকে যায়, খুনি ধরা পড়ার পর। আর্থার কোনান ডয়েল এখানে যেন আর একটি নূতন উপন্যাসের অবতারণা করলেন। এই কাহিনির সূত্রপাত আমেরিকায়। খুনির অপরাধকে যেন মহত্ত্বমন্ডিত করার জন্যই এই দ্বিতীয় কাহিনির আমদানি করা হল। সেটাও কিছু খারাপ ব্যাপার নয়। অভিনব তো বটেই। জেফারসন হোপ এই কাহিনির নায়কও বটে, খুনিও বটে। ড্রেবার আর স্ট্যাঙ্গারজন নামক যে-দুটি লোককে সে হত্যা করে, তারা দুজনেই খল চরিত্রের। সুতরাং পাঠকের সমবেদনা ও সমর্থন অবশ্যই থাকে জেফারসন হোপের দিকে। কিন্তু আইন বা বিধি অলঙ্ঘ্য, অপরাধ করলে শাস্তিও পেতেই হবে। শুধু কোনান ডয়েল দয়া করে ফাঁসি অবধি জেফারসনকে বাঁচিয়ে রাখেননি। হৃদযন্ত্রের এক দুরারোগ্য অসুখে আক্রান্ত হয়েছিল জেফারসন হোপ, বিচারের আগেই সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

এই কাহিনির পরিণতি লন্ডনে ঘটলেও, কাহিনির প্রায় সবটাই আমেরিকার পটভূমিতে বর্ণিত হয়েছে। এবং বলতে নেই এই গল্পে পুরনো আমলের আবেগ, রোমান্টিক প্রেম, অবিশ্বাস্য আত্মত্যাগ এবং চরম বীরত্বের প্রকাশ ঘটায় একটা অন্য ধরনের আস্বাদ পাওয়া যায়। আর পাওয়া যায় কোনান ডয়েলের বিপুল ভৌগোলিক, ঐতিহাসকি এবং জাতি ও উপজাতির ধর্মাচরণ বিষয়ক তথ্যের গভীর জ্ঞান। সরমন জাতির মানুষদের বর্বরোচিত কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসকেও তীব্র কষাঘাত করা হয়েছে। কিন্তু বীরত্বে, আত্মত্যাগ ব্যক্তিত্বে জেফারসন হোপ সবাইকে ছাপিয়ে যায়। এমনকী শার্লক হোমসকেও একটু নিষ্প্রভ লাগে তার পাশাপাশি। তবে এই উপন্যাসটির বাঁধুনি বেশ আলগা, কাহিনির বুনটে বেশ কিছু ফাঁক-ফোকর রয়ে গেছে।

মমর্ন উপজাতীয় মানুষগুলিকে কোনান ডয়েল দেখিয়েছেন একটি অতিশয় সঙ্গবদ্ধ, ধূর্ত, নিষ্ঠুর এবং প্রচণ্ড সাহসী হিসেবে। এদের জালে পড়ে বৃদ্ধ জন ফেরিয়ার এবং তার পালিতা কন্যা লুসি যখন তাদের হাত থেকে পালাতে পারছে না, তখনই জেফারসন হোপ তাদের উদ্ধার করে নিয়ে যায়। এই উদ্ধারকার্যটি খুব একটা বিশ্বাসযোগ্য হয়নি। জন নিহত হয় এবং লুসি ফের মর্মনদের খপ্পরে পড়ে শেষ অবধি অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায়, জেফারসন প্রতিশোধস্পৃহায় পাগল হয়ে ড্রেবার আর স্ট্যাঙ্গারসনকে খুঁজে বের করতে মরিয়া হয়ে ওঠে। জেফারসনের হাত থেকে বাঁচার জন্য দু'জনেই প্রথমে ইউরোপ ও অনেক ঘুরে

লন্ডনে পৌঁছয়। তবে কপর্দকশূন্য, সম্বলহীন প্রায় যাযাবর জেফারসনও কীভাবে তাদের পিছু নিয়ে ইউরোপ ঘুরে লন্ডনে এসে হাজির হল সেটা বোঝা গেল না। আর সেই আমলের লন্ডনও তো খুব ছোটখাটো শহর ছিল না। তবু জেফারসন হোপ খুঁজে খুঁজে খুব বেশি গা না ঘামিয়েই তাদের বের করে ফেলল। হজম করতে যেন কষ্ট হয়। তারপর, প্রথমজন অর্থাৎ ড্রেবারকে সে খুন করতে কোচোয়ান সেজে এক পরিত্যক্ত বাড়িতে নিয়ে যায় এবং তার সঙ্গে বিষ বড়ি নিয়ে লটারি খেলে ভাগ্যক্রমে তাকে মারে। দ্বিতীয় জনকে সে অন্য এক পাড়ায় এক হোটেলের ঘরে মই বেয়ে উঠে ছুরিকাঘাতে হত্যা করে। পড়তে পড়তেই খটকা লাগে এবং কিছুতেই ঘটনাগুলির সম্ভাব্যতা মেনে নিতে মন রাজি হয় না। লন্ডনে সম্পূর্ণ নবাগত জেফারসন হঠাৎ কোচোয়ানের কাজ নিয়ে ফেলল এবং ভাড়া খাটতে লাগল। এটাও কেমন কেমন লাগে। আর শেষ অবধি তাকে চিহ্নিত করে যেভাবে নিজের ঘরে ফাঁদ পেতে শার্লক হোমস ধরে ফেলল, সেটাও গল্পের গরুর গাছে ওঠার মতো। একটা গোয়েন্দা কাহিনিতে এত ফুটোফাটা থাকলে স্বাভাবিক মেধার পাঠকদের একটু হতাশা আসতেই পারে। এবং শেষ অবধি রহস্য উদ্ঘাটনের পর শার্লক হোমসকেও একটু বিবর্ণই লাগে।

গোঁজামিল 'সাইন অফ ফোর'-এও কিছু কম নেই। তবে বেশ টান টান লেখা। তরতর করে পড়া যায়, বই শেষ না করে ওঠা যায় না। এই গ্রন্থে ওয়াটসনের পত্নীলাভ একটি বিশেষ ঘটনা। শার্লক হোমসের ক্ষেত্রে মহিলাপ্রীতি দেখা যায় না। কারণ হিসেবে শার্লক হোমসের অনুসন্ধানী মনোতৃপ্তিকেই দায়ী করা যায়। সে মনে করে মেয়ে এবং ছেলে দুটিই তার কাছে বিষয় মাত্র। নানা দোষগুণের সমষ্টি মাত্র। শার্লক হোমস লোকচরিত্রের পাঠক হিসেবেই এদের অনুপুঙ্খ অনুধাবন করে। কাজেই কোনও নারীর প্রতি তার আলাদা আকর্ষণের উদ্ভবও ঘটে না। যুক্তিটি যথেষ্ট জোরালো বা বিশ্বাস্য নয়। কিন্তু বেশ মজার। যাই হোক শেষ অবধি শার্লক হোমস তার শীতলতা কাটিয়ে উঠতে পেরেছিল এটাই যা স্বস্তিকর।

হোমস কাহিনির মধ্যে উপন্যাস নগণ্য। বেশির ভাগই বড় আর ছোট গল্প! 'হাউন্ড অফ বাস্কারভিল' বা 'ভ্যালি অফ ফিয়ার' বহুলপঠিত। মরিয়ার্টির কথাও পাঠকের সুবিদিত। বাংলা ভাষায় বেশ কয়েকজন লেখক হোমসের কিছু কাহিনির প্রভাবে ডিটেকটিভ উপন্যাস লিখেছেন। কোনান ডয়েলের যথেষ্ট অনুবাদও হয়েছে নানা ভাষায়। তবে এটুকু বলাই যায় যে, শার্লক হোমস যে-যুগের মানুষ সেই যুগের জীবনযাত্রা ছিল গতিমন্থর। বিজলি বাতি, টেলিফোন, দ্রুতগামী মোটরগাড়ি ছিল না। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি না থাকায় তদন্ত ছিল অনেকটাই অনুযোগ-নির্ভর ও গোলমেলে। ফলে শার্লক হোমসের নির্ভরতা ছিল সূত্র সন্ধানের ওপর এবং যুক্তি পরম্পরায় বিশ্লেষণের ওপর। এ যুগের পাঠক তা কতটা উপভোগ করবে সেটা বলা কঠিন।

তবে তৎকালে বিভিন্ন দেশে অপরাধ দমনে শার্লক হোমসের কাহিনিগুলিকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল। পুলিশের প্রশিক্ষণের পাঠক্রমেও এইসব কাহিনিকে পাঠতালিকাভুক্ত করা হয়। তবে মজার ঘটনা হল, একবার একটি সত্যি খুনের ঘটনায় স্বয়ং আর্থার কোনান ডয়েলকেই তদন্তের কাজে পুলিশকে সাহায্য করতে আমন্ত্রণ জানানো হয়। কোনান ডয়েল বিস্তর মাথা ঘামিয়ে অনেক চেষ্টায় শুধু একটা আবিষ্কার করেছিলেন যে, খুনী একজন বাঁ হাতি। অবশ্য পুলিশ ততদিনে আসল আসামীকে খুঁজে বের করে জেলে পুরে ফেলেছিল।

সে যাই হোক, কোনান ডয়েল কিন্তু শুধু শার্লক হোমসের কাহিনি লিখেই ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় এবং সমগ্র বিশ্বেই বিপুল জনপ্রিয়তা, প্রচুর অর্থ এবং অবিশ্বাস্য সম্মান লাভ করেন। রাজা থেকে শুরু করে বিশিষ্ট ব্যক্তি সকলের কাছেই ছিল তাঁর কদর। তবু কোথাও একটু অভাববোধ থেকেই গিয়েছিল তাঁর।

ডয়েলের আর একটি অভিনব ব্যাপার হল পত্নীর প্রতি নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা, যা তুলনারহিত। বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এরকম কঠোর আত্মনিয়ন্ত্রণ বিরল ঘটনা। যক্ষ্মা রোগগ্রস্ত স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য তিনি অকাতরে অর্থব্যয় করেছেন। বায়ু পরিবর্তনের জন্য নিয়ে গেছেন স্থানান্তরে। তখন এই রোগের যথার্থ চিকিৎসা ছিল না এবং মৃত্যু ছিল অবশ্যম্ভাবী। তবু সেবা যত্ন ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় কোনান ডয়েলের স্ত্রী এই রোগ নিয়েও প্রায় তেরো বছর বেঁচেছিলেন। একটু পরিণত বয়সে কোনান ডয়েলের প্রেমে পড়েছিলেন এক তরুণী। ডয়েলও

আকৃষ্ট হয়েছিলেন বড় কম নয়। কিন্তু স্ত্রীকে কখনও প্রতারণা করার চেষ্টাও করেননি। কাজেই বিবাহ-বর্হিভূত এই প্রেমটি শেষ অবধি কলুষিত বা দেহগন্ধময় হয়ে পড়েনি। শুদ্ধ ও অমলিন এরকম প্রেমের কথা এ যুগে হঠকারিতা বলেই হয়তো মনে হবে।

আসল কথা কোনান ডয়েল তাঁর গোয়েন্দা শার্লক হোমসের মতো এক আশ্চর্য চরিত্র। বহু গুণে গুণী, বহু সম্ভাবনার আকর। বহু প্রতিভার অধিকারী। তবু শেষ পর্যন্ত শার্লক হোমসেরই জনক।

বাংলা ভাষায় ইদানীং কোনান ডয়েল নিয়ে বই লেখা হয়েছে। কোনান ডয়েল সম্পর্কে তথ্যবহুল গ্রন্থরচনার প্রয়াস দেখে অবাক হয়েছি। কেননা, কোনান ডয়েল সম্পর্কে এখনকার পাঠকবর্গের ততটা তীব্র কৌতূহল থাকার কথা নয়। কারণ তিনি বহুল পরিমাণে পঠিত, চর্চিত এবং আলোচিত। বাঙালি নবীন পাঠকদের যতটুকু খবর রাখি, শার্লক হোমস বিষয়ে তাঁদের অনাগ্রহই প্রকট। বরং মধ্যবয়স্ক এবং বয়স্ক শিক্ষিত বাঙালি এখনও হোমস-চর্চা করে থাকেন। আচার্য সুকুমার সেন তো তাঁর বাড়িতে সাপ্তাহিক 'হোমসিয়ানা' আড্ডাচক্র বসিয়েছিলেন, যেখানে হোমস-চর্চার পাশাপাশি লেখকরা স্বরচিত গোয়েন্দা গল্প পড়ে শোনাতেন।

স্যার আর্থার ইগনেশিয়াস কোনান ডয়েলের জন্ম স্কটল্যান্ডের এডিনবরায়, ১৮৫৯ ক্রিস্টাব্দের ২২মে তারিখে। তাঁর বাবা চার্লস আল্টামন্ট ডয়েল মা মেরি ফোলে। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি খ্রিস্টধর্মকে অস্বীকার করে নাস্তিক হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু এই নাস্তিকতা নিরেট বা ছিদ্রহীন ছিল না। সময়ে সময়ে তিনি পরলোকচর্চার প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ডাক্তারি পড়েন ১৮৭৬ থেকে ১৮৮১ পর্যন্ত আর ছাত্রাবস্থাতেই শুরু হয় তাঁর লেখালেখিও। চেম্বার্স এডিনবরা জার্নালে তাঁর ছোটগল্প যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন তাঁর বয়স কুড়িও পেরোয়নি। ডাক্তারি পাশ করে তিনি এক জাহাজে চাকরি নিয়ে পশ্চিম আফ্রিকা উপকূল অঞ্চল ভ্রমণ করেছিলেন।

১৮৮২ সালে প্রথম এক বন্ধুর সঙ্গে, পরে এককভাবে তিনি ডাক্তারি প্র্যাকটিস করতে থাকেন। দুঃখের বিষয় তাঁর পসার ভাল ছিল না। পোর্টসমাউথে চেম্বারে রোগীর জন্য হাঁ করে বসে থাকার সময়েই তিনি লেখায় মনোনিবেশ করেছিলেন। এ সময়ে তাঁর উল্লেখযোগ্য লেখা 'এ স্টাডি ইন স্কারলেট', ফেটি বিটনস খ্রিস্টমাস অ্যানুয়ালে ১৮৮৭-তে প্রকাশিত হয়। কথিত আছে, তাঁরই প্রাক্তন অধ্যাপক যোসেফ বেল-এর আদলেই তিনি শার্লক হোমসকে সৃষ্টি করেছিলেন। লেখালিখির পাশাপাশি অমিতবিক্রমে চুটিয়ে ফুটবল এবং ক্রিকেটও খেলতেন ডয়েল এবং ক্রীড়াবিদ হিসেবেও তাঁর বেশ খ্যাতি ছিল। শুধু তাই নয়, তখনকার দিনে বিচারের নামে ব্রিটেনে যে সব অবিচার হত এবং কোনও অপরাধের জন্য বলির পাঁঠা ধরে আনত পুলিশ, তার বিরুদ্ধেও সক্রিয় এবং সোচ্চার ছিলেন তিনি। আর তাঁর উদ্যোগে ১৯০৬ সালে জর্জ অ্যাডালজি নামে একজন ফিরিঙ্গি হুমকি চিঠি লেখার এবং নির্মম পশুহত্যার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হতে হতে বেঁচে যায়। আর এই মামলার ফলেই ১৯০৭-এ ইংল্যান্ডে কোর্ট অফ ক্রিমিন্যাল অ্যাপিল প্রতিষ্ঠিত হয়। অস্কার স্লেটার নামে এক জার্মান এক বৃদ্ধাকে খুন করার অপরাধে গ্রেফতার হয়েছিল। কোনান ডয়েলের মনে হয়েছিল মামলাটি সাজানো, এবং তিনি তারও পক্ষ নিয়ে লড়াই করেন। বোঝা যায় ডয়েল শুধু লেখক ছিলেন না, একজন মানবদরদি, সমাজ সচেতন, সক্রিয় কল্যাণকামী স্বাধীনচেতা মানুষ ছিলেন।

১৯০৬ সালে মারা যান স্ত্রী লুইসা। এরপর মৃত্যু হয় ছেলে কিংমলের। মারা যান ভাই ইনেস, দুই শালা, দু'টি ভাগ্নেও। এইসব মৃত্যুর ঘটনায় বিষাদরোগ ও অবসাদ তাঁকে চেপে ধরে। ফলে তিনি পরলোকচর্চার দিকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট হন। আর এই পন্থায় তিনি আশ্রয় নেন সৃষ্টির আধ্যাত্মিকতার। এই আধ্যাত্মিকতার প্রভাবেই তিনি তাঁর প্রফেসর চ্যালেঞ্জার সিরিজের উপন্যাস 'দ্য ল্যান্ড অফ মিস্ট' লিখেছিলেন।

পরিদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে তিনি 'দ্য কামিং অফ দ্য ফেয়ারিজ' বইটি লিখে ফেলেন।

এই অস্থিরমস্তিষ্কতা এবং অলৌকিকের প্রতি আকর্ষণ ডয়েলকে হয়তো স্বস্তি দিয়েছিল, কিন্তু তাঁর ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হয়নি। জাদুকর হুডিনি তাঁর বন্ধু ছিলেন। হুডিনি অলৌকিকতার ঘোর বিরোধী ছিলেন, কিন্তু ডয়েল

বিশ্বাস করতেন হুডিনির ভিতরে অলৌকিক শক্তি আছেই। এই বিতর্কে দু'জনের বন্ধুত্বই ভেঙে গিয়েছিল।

স্যাসেক্সের ক্রোবরোতে নিজের বাড়িতে হৃদরোগে ১৯৩০ সালে মারা যান কোনান ডয়েল। তখন তাঁর বয়স একাত্তর। এক বর্ণময় বহু গুণে গুণান্বিত, বহু সম্ভাবনার আকর এবং বিচিত্র সব লেখার লেখক আর্থার কোনান ডয়েলের সব সৃষ্টিই হয়তো তেমনভাবে গৃহীত হয়নি পাঠক সমাজে। তবু যে-শার্লক হোমসকে তিনি প্রকৃত সাহিত্য খ্যাতির অন্তরায় বলে মনে করতেন, সেই দীর্ঘকায়, রোগা, তীক্ষ্ণ চক্ষু এবং বক্রনাসা গোয়েন্দাই কিন্তু আজও তাঁকে প্রবলভাবে প্রাসঙ্গিক করে রেখেছে।

## নানা রবীন্দ্রনাথের একজন

রবীন্দ্রনাথ কবে থেকে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন? শৈশব কাল থেকেই, জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই? হবেও বা। প্রতিভাবানেরা, বিশেষত বিরল শ্রেণির প্রতিভার অধিকারীরা নিজেকে টের পেতে শুরু করেন অন্য সকলের তুলনায় ঢের আগে। রবীন্দ্রনাথই বা ব্যতিক্রম হবেন কেন? তিনি যে রবীন্দ্রনাথ, কবিগুরু, বিরল প্রতিভা, একথা তিনি নিজে যতটা টের পেতেন অন্যেরা টের পেত কিনা কে জানে! তবে জীবনের শেষ পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছর রবীন্দ্রনাথকে সেকথা ভুলতে দেননি অন্যেরা। পাখি-পড়ার মতো তাঁর কাছে বারংবার নানা কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে তাঁর স্তবগান। আবার নিন্দের পাখিরা কটুকাটব্য যথেষ্টই করেছিল কলস্বরে। রবীন্দ্রনাথের চেয়ে কম শক্ত কাঠামোর লোক হলে ওই বিপুল স্তুতিতে বা নির্মম অন্যায় নিন্দেয় কবে পাগল বা নাগা-সন্ন্যাসী হয়ে ঘর ছাড়ত। রবীন্দ্রনাথ ক্লেশে বা অক্লেশে তা হজম করেছেন এবং তারপরও লিখেছেন। অর্থাৎ লিখতে পেরেছেন। কিন্তু এটা বুঝতে কখনই অসুবিধে হয়নি যে রবীন্দ্রনাথকে হজম করাই ছিল রবীন্দ্রনাথের জীবনের কঠিনতম কাজ, দুর্মরতম লড়াই। একজন শিল্পীকে দুর্ভাগ্যক্রমে এই লড়াইটাই লড়তে হয়। স্বীয় খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর সৃজনশীল সত্তার দ্বন্দ্ব। তবে সেই

খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা যার যত বেশি তার লড়াই ততই কঠিন। তখন বারবারই চরণধুলোর তলে নত করে দেওয়ার প্রার্থনা, অহংকারকে চোখের জলে বিসর্জন দেওয়ার আকুতি।

মাঝে মাঝে কল্পচক্ষে দেখতে পাই, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিধাতার এক অসম শতরঞ্জ খেলা। রবীন্দ্রনাথ জিতে নিয়েছেন খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা, আনুগত্য। অন্যদিকে বিধাতা সুকৌশলে হরণ করেছেন তাঁর প্রিয়তমা নারী, আত্মীয়, স্ত্রী, সন্তান, বান্ধব। বিধাতার প্রসন্ন ও রুদ্র দুটি নয়নেরই সম্পাত ঘটেছিল রবীন্দ্রনাথের উপর।

সুতরাং শোধবোধ। কিংবা কেই বা সে হিসেব কষবে? আমি এক বৃদ্ধা রমণীকে জানি, যিনি এগারোটি সন্তানের মধ্যে রোগে ও অপঘাতে ন-টি সন্তান হারিয়েছেন। এখনও জীবিত সেই রমণীর আর তেমন বোধশক্তি নেই, বুদ্ধি-নষ্ট শিশুর মতো ভালোমন্দ বিবেচনাহীন। রবীন্দ্রনাথ যে ব্যক্তিগত শোক একটি জীবনে বহন করেছেন এবং তার পরেও নিজের যে অটল অস্তিত্ব বজায় রেখেছিলেন সেটাও এক বিস্ময়। যক্ষ্মায় আক্রান্ত মৃত্যুপথিক আত্মজার যাতে মৃত্যুকে বরণ করতে মানসিক ক্লেশ না হয় তার জন্য তাকে পড়ে শোনাচ্ছেন উপনিষদ, প্রিয় পুত্রের মৃত্যুর পর নীরবে ছাদের উপর নিদ্রাহীন রাত্রিযাপন—খুব বীর হৃদয় না হলে এমনভাবে সওয়া যায় না গভীর শোককে। আবার এই অঘটন একজন মানুষের আলোকসামান্য খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার ঠিক বিপরীত এক ক্রিয়া। আর এইসব অঘটনই বোধহয় তাঁর জীবনে এক অদ্ভুত ভারসাম্য এনে দিয়েছিল। বিধাতা তাঁকে অনেক কিছু জয় করতে দিচ্ছেন, হরণ করে নিচ্ছেন সমপরিমাণে স্বজন, স্বস্তি, সংসার।

প্রতিভার সঙ্গেই ছায়ার মতো ঘোরে পাগলামি, বায়ুগ্রস্ততা। পাগলামির বীজ রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও ছিল। কিন্তু কৈশোরকাল থেকেই নিজেকে বেঁধে ফেললেন তিনি নানা সামাজিক দায়-দায়িত্বে। বয়সকালে হয়ে উঠলেন সংগঠক, দেশহিতৈষী, শিক্ষক, সাধক, সমাজসেবী, বক্তা, নেতা। পাগল হওয়ার সময় হল না তাঁর। ফরমায়েসি বিয়ের পদ্য থেকে নারী নির্যাতন এবং অন্যবিধ নানা বিষয়ে কবিতার বকলমে অকবিতা লিখতে হল তাঁকে। শিশুদের পাঠ্যগ্রন্থও বাদ পড়ল না কলম থেকে। নিজের মতো করে কোনও বৃষ্টিনেশাভরা ভূতুড়ে সন্ধ্যায়, শীতার্ত রাতে কুয়াশায় মাখা অলৌকিক চন্দ্রাবলোকনে, খোয়াইয়ের নিদাঘতপ্ত রিমিঝিম দুপুরে নিজের মনের মতো করে একটু পাগল হবেন বলে সাধ জাগেনি কি তাঁর? জাগলেই বা সাধ্য কী? আমরা যদি তাঁকে একটু আধুটু খেয়ালখুশি মতো পাগল হওয়ার অবকাশ দিতাম তবে রবীন্দ্রনাথ ঠিক ঠিক রবীন্দ্রনাথ হয়ে যেতে পারতেন। এতগুলো রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আমাদের হিমসিম খেতে হত না। পাছে পাগলামির উলটোপালটা তরঙ্গাভিঘাতে ভেসে গিয়ে ভাবমূর্তি মাটি হয় সেই ভয়েই কি নানা সামাজিক, রাষ্ট্রিক, সাংগঠনিক দায়-দায়িত্বের সঙ্গে নিজেকে বেঁধে ফেলে তটভূমিতে বসে একাশি বছর ধরে জীবনভোর তিনি গেঁথে গেলেন 'নানা রবীন্দ্রনাথের মালা?'

মালাখানি দেখুন। কেমন ঠাসবুনোট, বর্ণবিচিত্র, নিখুঁত সুন্দর। কোনো ফুলটিতেই একটিও মরা পাপড়ি নেই, কীট নেই। বিবর্ণতা নেই। এই খুঁতহীনতা আমাদের কেবল বিস্ময় ও তদগত শ্রদ্ধাবোধকেই উসকে দেয়। কিন্তু কখনও এক হাহাকারের বাতাস এসে আমাদের গার্হস্থ্যের খুঁটি ধরে নাড়ায় না। আমাদের দাঁড় করিয়ে দেয় না কোনও অসহায় বিপন্ন বিস্ময়ের মুখোমুখি, আমাদের নগ্ন করে দেয় না আত্মপ্রতিকৃতির নির্মম উন্মোচনে। দুঃখেরই বিষয়, রবীন্দ্রনাথ সর্বত্র সুন্দর। শুধুই সুন্দর। রূপেরই বংশ, রূপ নিয়ে জন্মেছিলেন, রূপেরই হাটে বেড়ে উঠেছিলেন। অনুগত তাঁর পারিপার্শ্বিকও তাঁর চোখের সামনে বইয়ে দিয়েছেন নিরন্তর রূপের বন্যা। তাই বোধহয় তাঁর কোনো রূপাভিসার ছিল না। দয়িত যার ঘরে, তার অভিসারে যাওয়ার কী দরকার? সেই রূপাভিসার তাঁর কখনও ছিল না, যা ছিল জীবনানন্দ বা বিভূতিভূষণের। ব্যক্তিগত শোক-দুঃখগুলিকেও তিনি অভ্যন্তরাস্থিত কোনও আশ্চর্য বকযন্ত্রে পরিশীলিত করে নিতেন, নির্মমতার সঙ্গে প্রকাশ করতেন না।

রূপাভিসারের কথায় জানি কেউ কেউ আপত্তি তুলবেন। সারা জীবন রূপ নিয়েই যাঁর যাবতীয় চর্চা, রূপসায়রে যিনি ডুব দিয়েই ছিলেন তাঁর রূপাভিসার ছিল না, এটা আবার কেমন কথা? জবাবটা একরকম

দেওয়া হয়ে গেছে, তবু ব্যাখ্যা করে বলতে গেলে বলতে হয়, স্বচ্ছল পরিবার, বনেদি বংশ এবং পারিবারিক সূত্রেই এক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ছিল রবীন্দ্রনাথের পটভূমি। শুধু সেজন্যই নয়, এক অতি উচ্চমানের রুচিশীলতা ছিল তাঁর বর্ণের মতো। ছিল রূপমুগ্ধ দুখানি অপরূপ চোখ। ছিল সহজে অক্লেশে যে কোনো ঘটনা থেকে দার্শনিক উপলব্ধিতে উপনীত হওয়ার মতো ক্ষমতা। একজন মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত লোককে প্রতিদিন জীবনধারণ ও যাপনের গ্লানি, অপমান, ক্ষুদ্রতা ও দণ্ডে দণ্ডে আত্মক্ষয়ের যে পরীক্ষা দিতে হয় তাতে তার চোখ ও মন থেকে রূপের অন্বেষণটাই যায় মরে। মৃত মন ও জীবন্ত একটি দেহ নিয়ে তার যে অস্তিত্বের মণ্ডল তা অতীব তুচ্ছ অবজ্ঞাত। তবু যখন সে হাঁটুভর ধুলো নিয়ে মাইলের পর মাইল মাঠ জঙ্গল ভেদ করে নীলকণ্ঠ পাখি দেখতে ছোটে, নিদ্রাহীন মাঝরাতে ভূতগ্রস্তের মতো ঘুরে বেড়ায় মহানগরীর পথে-বিপথে, কৃপণ এই জীবন থেকে যখন সে বহু ক্লেশে খুঁটে নেওয়ার চেষ্টা করে সৌন্দর্যের কণিকাগুলি, আমাদের সাধারণ জীবনে ব্যর্থতা ও সামান্য প্রাপ্তিগুলির নিরিখে আমরা সেই সৌন্দর্যের প্রাণপাত অন্বেষণকে রূপভিসার আখ্যা দিতে পারি। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তো ঠিক এরকম নয়। শৈশবে অন্তঃপুরের অবরোধে হাঁফিয়ে ওঠা একটি প্রাণের বেদনার কথা আমরা জানি, আমরা জানি স্কুলের ক্লাসঘরে তাঁর নিজেকে খণ্ডিত ক্ষুদ্র হতে দেওয়ার সেই কাহিনি।

কিন্তু তার পর থেকে মুক্ত রবীন্দ্রনাথকে আর কেউ বাঁধতে পারেনি। সেই মুক্তি তিনি অর্জন করে নিয়েছিলেন নিজের অপরিণত বয়সেই। নিজেকে প্রস্তুত করে নেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন নিজেরই মনের মতো করে। প্রতিভা তো ছিলই, তার সঙ্গে যুক্ত হয় ভাগ্যের আনুকূল্য। রবীন্দ্রনাথ নন, স্বয়ং রূপই চলল রবীন্দ্রনাথের অভিসারে। তাঁর কলমে জন্ম নেবে বলে সুন্দর শব্দ, অবিস্মরণীয় অলংকার, দুরন্ত বাক্যবন্ধেরা যেন শুরু করল ঠেলাঠেলি। তাঁর চোখে ধরা দেওয়ার জন্যই যেন বিশ্বপ্রকৃতিতে পড়ে গেল সাজ সাজ রব। তাঁর অনুভূতির জন্য, তাঁর শ্রুতির জন্য নানা চিন্তা, নানা গান, নানা সুর ভিড় করে এল। তখন বাংলা গদ্য সবে হামা দেওয়া ছেড়ে হাত ধরে উঠে দাঁড়িয়েছে, পদ্যে তখনও সবচেয়ে আধুনিক বিহারীলাল। এই দুই নাবালক ও নাবালিকাকে প্রায় এক শতাব্দীর দৌড় তার অর্ধেক সময়ে করিয়ে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

বাস্তবিক, আমার মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, বাংলার দুর্দশা দেখে দেবযান পরিক্রমারত কোনো দেবদূতই বুঝি আমাদের আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক হয়ে নেমে এলেন পৃথিবীতে। একজন রবীন্দ্রনাথ যে একটা জাতি বা রাষ্ট্রের কত বড়ো সম্পদ তা আমরা বুঝি। গরিবের ভাঙা ঘরে চাঁদের উদয় যেন বা! যেন বা কাঙালের ঘরে রাজার সম্পদ হঠাৎ কে ফেলে দিয়ে গেছে রাতের অন্ধকারে! আমরা বিস্মিত, কিংকর্তব্যবিমূঢ়, অপ্রস্তুত। এতটা বুঝিবা আমাদের পাওনা ছিল না।

যাতে হাত দিচ্ছেন তাতেই সোনা ফলছে। সোনা যে ফলছে তা রবীন্দ্রনাথও বুঝতে পারছেন। ধী-সম্পন্ন তিনি এও নিশ্চিত বুঝতে পারতেন যে, আমাদের তুলনায় তিনি বহু বেশি বড়ো। আর বুঝতে পারতেন বলে তিনি অবলম্বন করলেন সতর্কতা। কোনো ব্যাপারে আর নিজেকে ছোটো করতে চাইতেন না। চিঠিটাও লিখতেন সযত্নে, সতর্ক ভাষায়! কথাটি বলতেন প্রস্তুতি নিয়ে, সংযত, সুন্দর, ভাষা ও ভঙ্গিমায়। জানতেন, সকলেরই লক্ষ্যবস্তু তিনি। আর এ ছিল তাঁর নিয়তিও। পারসিক পোশাক, বাঙালি-অসুলভ বর্ণ, আন্তর্জাতিক মানসিকতা—সবমিলিয়ে পিঁপড়ের জগতে হস্তি সদৃশ তাঁর উপস্থিতি। আমাদের অবস্থাও হল অন্ধের হস্তিদর্শনের মতো। তাঁর এক এক সৃষ্টির গায়ে হাত বুলিয়ে ভাবছি, এই বুঝি প্রকৃত রবীন্দ্রনাথ। আর জাদুকর রবীন্দ্রনাথ নিজের ভিতর থেকেই আরও আরও রবীন্দ্রনাথকে বের করে আনছেন একের পর এক। কবি, গল্পকার, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক। আমরা থই পাই না, কুল পাই না, রবীন্দ্রের স্রোতে আমরা ভেসে গিয়ে পড়লাম রবীন্দ্রসাগরে।

প্রতিটি রবীন্দ্রনাথই পেতে পারতেন নোবেল পুরস্কার। তবে আমার হাতে ক্ষমতা থাকলে অন্তত আর একবার গল্পগুচ্ছের জন্য তাঁকে নোবেল পুরস্কার দিয়ে দিতাম। সংখ্যায় একশোর কাছাকাছি এসব গল্প লিখেছেন এক ছুটি পাওয়া রবীন্দ্রনাথ। ত্রিশের কাছাকাছি বয়সে শুরু হয়েছিল লেখা। খ্যাতি, অখ্যাতির

জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে কিছু দূরে সরে এবং রবীন্দ্রনাথকে খানিকটা বিস্মৃত হয়ে এবং নিজেকে অবারিত করে লিখতে পেরেছিলেন। নিজের উচ্চপর্যায়ের জীবনচর্চা থেকে কয়েক ধাপ নেমে এসে তিনি কীভাবে প্রবেশ করেছিলেন মধ্য ও নিম্নবিত্ত মানুষের ঘরদোরে, অন্তঃপুরে। তাঁর গোরা বা এলা বা নিখিলেশকে আমাদের চেনা মানুষ বলে মনে হয় না বটে, কিন্তু রামকানাই, ফটিক বা আশুকে চিনতে ক্ষণমাত্র দেরি হয় না।

রবীন্দ্রনাথের জবানিতে, 'জমিদারি দেখা উপলক্ষ্যে নানা রকমের লোকের সঙ্গে মেশার সুযোগ হয় এবং এই থেকে আমার গল্প লেখারও শুরু হয়।' অনুমান করি, পল্লিগ্রামের সাধারণ মানুষের মধ্যে এই প্রথম রবীন্দ্রনাথের অবতরণ। যুবক রবীন্দ্রনাথের কাছে সে এক নতুন অভিজ্ঞতা, বিচিত্র অভিযান। এমন নয় যে, রবীন্দ্রনাথ এদের জীবনের সঙ্গে মিশে গিয়েছিলেন। কিন্তু জন্মসূত্রে পাওয়া অসাধারণ পর্যবেক্ষণ শক্তি ও অনুমানের দ্বারা দেখা বা অভিজ্ঞতার যেটুকু ঘাটতি ছিল, তা অনায়াসে পূরণ করে পল্লিবাংলার একেবারে প্রাণ অন্তঃপুরে পৌঁছে যেতে তাঁর কোনো অসুবিধা হয়নি। তখন তাঁর বৃহৎ কর্মকাণ্ড শুরু হয়নি, সেভাবে শুরু করেননি তাঁর পরিভ্রমণ। জীবনের ব্যস্ততম দিন সেগুলো নয়। বরং বোটে বা নদীর ধারে পল্লিগ্রামের কাছ ঘেঁষে একটু অলস, বাক্যহীন, কর্মহীন সময় কাটিয়েছেন। আর তাই এত প্রাঞ্জল, এত খুঁটিনাটি বিবরণে ভরা তাঁর গল্পগুলিতে উপচে পড়েছে জীবন। সে এক অনবদ্য সুসময় বঙ্গ সরস্বতীর। গল্প যে শুধু বাস্তব ঘটনার চাক্ষুষ বিবরণ নয়, নয় সংবাদ, তাঁর চেয়ে ভালো আর কে বুঝবে? বাংলা গল্পের সেই উন্মেষকালের অগ্রপথিক এই সত্য বুঝতে পেরেই অন্তরের জারক রসে সিক্ত করে নিলেন তাঁর দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাকে। জাদু-কলমে লিখে চললেন গল্পের পর গল্প। পরতে পরতে খুলে যেতে লাগল, পল্লিগ্রাম, মানুষ, মানুষের রাগ, ঘৃণা, ভালোবাসা, লোভ, পাপ—সোজা কথায় মানুষের অনন্ত অভ্যন্তর। চালচ্চিত্রের মতো, পেখমের মতো ফুটে উঠতে লাগল পটভূমির প্রকৃতি।

রবীন্দ্রনাথ কতদূর আধুনিক তা নিয়ে আজকাল নানা প্রশ্ন ওঠে। তাঁর সমস্যা হল, তিনি প্রাচীন ও আধুনিক যুগের সন্ধিক্ষণের পুরুষ। তাঁর পক্ষে সব সনাতনকে ঝেড়ে ফেলে আদ্যন্ত আধুনিক হয়ে ওঠা সম্ভব ছিল না। অথচ মজার কথা হল, বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার সূত্রপাতও তাঁর হাতে। কবিতাতেই যেহেতু ছিল তাঁর সবচেয়ে বড়ো বাজি। তাই রবীন্দ্রনাথকে কাঠগড়ায় তুলতে হলে তাঁর কবিতা ধরেই টান মারা হয়। কবিতার কথা এখানেই উহ্য থাক। কিন্তু আধুনিকতার অভাবজনিত দায়ে রবীন্দ্রনাথকে কিছুতেই কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যাবে না, যতদিন গল্পগুচ্ছ থাকবে।

তাঁর সমসাময়িক বা অনতিপূর্বে সারা বিশ্বে যত লেখক ছোটোগল্প লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথ তাদের কারোর চেয়ে ন্যূন ছিলেন না। অন্তত আমরা যতদূর পড়তে পেরেছি। একরাত্রি, মধ্যবর্তিনী, গিন্নি, ক্ষুধিত পাষাণ, সমাপ্তি নিশীথে—বারংবার বিশ্লেষণ করে দেখেছি, কত সামান্য আয়োজনে কী অকিঞ্চিৎকর উপাদান নিয়ে তিনি মানুষকে সত্যের দুয়ারে পৌঁছে দিতে পারেন।

ছোটোগল্প ও কবিতার নৈকট্য নিয়ে কথা হয় আজকাল। রবীন্দ্রনাথ নিজে ষোলোআনা কবি হয়েও এই ভুলটা করেননি। তাঁর কবিতাকল্প ভাষাকে তিনি গদ্যের নিয়মেই সাজিয়েছেন। অনাবশ্যক লিরিককে বেনো জলের মতো ঢুকিয়ে আবিল করতে দেননি গল্পের নির্মাণ। এ কত বড়ো সংযম, তা ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন। অথচ কবিতা যে শুদ্ধতার অভিসারী, ছোটোগল্পেই সেইখানে অনায়াসে পৌঁছে যেতে পেরেছেন তিনি। বহুকাল অবধি বাল্যে পড়া ছুটির ফটিকের কণ্ঠে এক বাঁও মেলে না...দো বাঁও মেলে না...কানে বেজেছে। কতবার স্টিমার যাত্রায় শুনেছি ওই ঘোর রব। কিন্তু মৃত্যুর অতলান্ত রহস্যের গভীরতা মাপতে যে ওই চিৎকারটিকে এমনভাবে কাজে লাগান, এত অবিসংবাদীরূপে তা ভেবে আজও শিউরে উঠি।

রবীন্দ্রনাথের যে দুর্বলতাটির কথা তাঁর ঘোরতর ভক্তও স্বীকার করবে, তা হল অতি কথনের ঝোঁক। কথার নেশা ছিল তাঁর। বলতেও পারতেন সুন্দর। তাই অনেক সময়ই বিষয়বস্তুকে ঘিরে এক বিপুল লূতাতন্তুজাল রচনা করে থাকতেন। পড়তে-পড়তে কতবার খেই হারিয়ে ফেলেছি তাঁর প্রবন্ধের। উপন্যাসে ছিল অনাবশ্যক বিস্তার। এই বাহুল্য অবশ্য সুখপাঠ্যও ছিল। কিন্তু হারিয়ে ফেলত তীক্ষ্ণতা, প্রাসঙ্গিকতা,

উদ্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া। পৌঁছোনোর চেয়ে চলাটাই বোধকরি তাঁর বেশি প্রিয় ছিল। আশ্চর্যের বিষয় এই, তাঁর গল্পে কদাচিৎ এরকম বাহুল্যের দেখা মেলে। বেশিরভাগ গল্পে যতটুকু না বললেই নয়, ততটুকু রবীন্দ্রনাথ বলেছেন। একটি বাক্যকে নড়ানো যায় না সেখান থেকে। অবশ্য পরবর্তীকালের কিছু গল্প বাদে।

রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা গল্পে অনেক বিবর্তন ঘটেছে। পার হয়ে গেছে কয়েকটি প্রজন্মের সাহিত্যচর্চা। গল্পের রূপান্তর ঘটে গেছে অনেক। তবু আজও বাংলা ভাষায় এমন গল্প প্রচুর পরিমাণে লেখা ও ছাপা হয় যা রবীন্দ্রযুগকে অতিক্রম করতে তো পারেইনি, বরং সূক্ষ্মদৃষ্টির অনুভূতি ও অনুমান শক্তির অভাবে তা অন্যমনস্ক, অবিদগ্ধ পাঠকের অলস অবসর বিনোদনের উপাদান হয়ে থাকে মাত্র। বোঝা যায়, বাংলা ছোটোগল্পের যে বিবর্তন ঘটেছে তার ক্ষেত্র খুবই স্বল্প পরিসর। আর আজও যে রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ বহুল পরিমাণে পঠিত হয়, তার কারণ এইসব গল্পের বিশ্বজনীনতা। কালাতিক্রমী গুণ। পরবর্তী ছোটোগল্পে যতই বিবর্তন ঘটুক, তাতে রবীন্দ্রনাথের রচনা বাতিল হয়নি, হবেও না।

পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ যখন নানা রবীন্দ্রনাথ হয়ে উঠলেন, তখন বোধকরি এক এক সময়ে তাঁর সন্দেহ হত তিনি যথার্থই আমাদের লোক কিনা। তাই কবির আর্তস্মরে প্রকাশ পেয়েছিল এই ঘোষণা, 'মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক, আমি তোমাদেরই লোক।'

জবাবে মোক্ষদা ঝি-এর কণ্ঠস্বরে আমাদের বলতে ইচ্ছে করে, 'মরণ! আমাদের লোক নও তো তুমি কাদের লোক গো রবিবাবু? এই যে আমরা ছড়িয়ে আছি তোমার গল্পগুচ্ছের পাতায় পাতায়, কোথায় কোন আঘাটায় পড়ে থাকা সামান্য মনিষ্যিদের বুকে তুলে নাওনি তুমি? ঠাঁই দাওনি পুঁথির পাতায়? যতই জোব্বা দিয়ে ঢাকো নিজেকে, যতই বিশ্বকবি কপচাক লোকে, আমরা ঠিক জানি তুমি কাদের লোক।'

# সাহিত্যের কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী হয় না

কিছুদিন আগে আমি একটি সাহিত্য গোষ্ঠীর আমন্ত্রণে গুয়াহাটি গিয়েছিলাম। এসব ক্ষেত্রে যা হয়, এই ধরনের সংগঠনগুলি সাহিত্যের গন্ধ গায়ে মাখে, কিন্তু সাহিত্যের চর্চা সেভাবে তাদের পক্ষে করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। সংগঠন হয়তো বিশাল বড়, ক্ষমতাও অনেক, কিন্তু সাহিত্য একক ব্যক্তির সৃষ্টি। তাঁর নিঃসঙ্গতা, তাঁর গভীর চিন্তা, এগুলোর সঙ্গে সংগঠনের কোনও সম্পর্ক থাকে না। তেমনি পুস্তক প্রকাশনা তার একটা বাণিজ্যিক দিক আছে, চরিত্র আছে। সাহিত্যের সঙ্গে তার আড়াআড়ি নেই, তাকে অবলম্বন করেই সাহিত্যের প্রকাশ ঘটে। কিন্তু সাহিত্য সৃষ্টি হয় ঘরের কোণে, গভীর রাতে, নির্জন সকালে বা দুপুরে। এবং তার ভেতরে অনেক যন্ত্রণা থাকে, অনেক বেশি আত্মদহন থাকে। এসব থেকে যা কিছু উঠে আসে তার সবটাই যে অমৃতময় তা নয়, তার মধ্যে খানিকটা হলাহলও থেকে যায়। এইসব কিছু মিলিয়ে মিশিয়েই, জ্বালা-যন্ত্রণা, মধুর রস, প্রেম ভালবাসা থেকেই সাহিত্য জাত হয় বা সাহিত্য জাতীয় কিছুর সৃষ্টি হয়। গল্পই হোক, উপন্যাসই হোক, ব্যক্তিগত রচনা যাই হোক।

এখনকার বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে বলা যায় যে, সাহিত্যের বিপণনের ক্ষেত্রে, বই ছাপার ক্ষেত্রে অনেক প্রযুক্তিগত উন্নতি ঘটেছে। তা সত্ত্বেও অনেক ত্রুটি এখনও রয়ে গেছে। এখনও আমাদের প্রকাশনা সাবালকত্ব প্রাপ্ত হয়েছে বলে মনে হয় না। একটি বিদেশি বই যখন দেখি তখন তার নির্মাণ, তার ছাপা প্রথমেই নজর কাড়ে। এবং সেই বই পড়তে গিয়ে তার মধ্যে খুঁজে খুঁজে ভুল বের করতে কষ্ট হয়, ভুল পাওয়া যায় না। এত নিখুঁত ভাবে তার প্রুফ দেখা হয়, সংশোধিত হয়। সেসব জিনিস আমাদের দেশে হওয়ার উপায় নেই। আর একটা জিনিস আছে সেটা সাহিত্যের বাণিজ্যকরণ। যেটা বিদেশে অনেকদিন আগে থেকেই চালু হয়ে গেছে। সেটা হচ্ছে—লেখক তো লেখেন, ভাবের ঘোরে লেখেন। তিনি হয়তো বাণিজ্য বোঝেন না, বাজার বোঝেন না। তখন সে লেখাটা আঁকাড়া লেখা। অর্থাৎ যে-লেখাটা লেখকের একেবার মননপুষ্ট হয়ে, তাঁর হৃদয় থেকে, তাঁর ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে, যা তিনি উগরে দিয়েছেন পাতার পর পাতায়। বিদেশে সেটি বাজারজাত করার আগে প্রকাশক ওই লেখাটি যাচাই করেন যে, এটি চলবে কিনা, কতটা চলবে, কতটা জনপ্রিয় হবে। কীভাবে? এডিটর আছেন, প্রফেশনাল এডিটর। তিনি ওই পাণ্ডুলিপিটি পড়েন। পড়ে তিনি লেখককে বলেন যে, এই এই জায়গা আপনাকে বদলাতে হবে।

গ্রহণ, বর্জন অর্থাৎ এডিটিং ইজ আ মাস্ট। এটা এখন বিদেশে ম্যানডেটরি, করতেই হবে। এডিটরের হাতে ওই বইয়ের কিছু কিছু অথবা আগাপাশতলা পরিবর্তিত হয়ে যায়। তাকে এমন ভাবে উপস্থাপিত করা হয় বা করার চেষ্টা করা হয় যা বাজারজাত করলে গরম কেকের মত বিক্রি হতে পারে। এই বিপণনটা খুব

ইম্পর্ট্যান্ট। তারপরে কী হয়? সেখানে একটা বই প্রকাশের আগে অনেকরকমের বহ্বাস্ফোট থাকে। অর্থাৎ লেখককে ইন্টারভিউ করা হয় টেলিভিশন চ্যানেলে বা সাংবাদিক সম্মেলনে বা লিটারারি মিটে। ওই বইটি যেটি প্রকাশিত হয়নি তার এক্সট্র্যাক্টস নানা রকম ভাবে ইন্টারনেটে প্রচার করা হয়। বইটা তোমার কেমন লাগছে—পাঠকের মতামত নেওয়া হয়। তারপরে বইটি কত কপি ছাপা হবে সেটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, দেখা হয় কত কপি ছাপলে প্রকাশকের ঘরে কোনো বই পড়ে থাকবে না বা ক্ষতি হবে না। এ একটা বিশাল, বিপুল কর্মযজ্ঞ। সাহিত্য তখন আর ব্যক্তিগত রচনা থাকছে না। এটা একটা যৌথ উৎপাদনে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, কেননা লেখক, তার সঙ্গে সম্পাদক, তার কাটছাঁট, তার ইন্টারভিউ নানাকরমের বিপণন পদ্ধতির ভেতরে দিয়ে লেখক যাচ্ছেন বা তাঁর লেখাটা যাচ্ছে ধোলাই হতে হতে, নানারকমের শুদ্ধিকরণের ভিতর দিয়ে। তখন সেখানে অনেকের অবদান যুক্ত হচ্ছে। ফলে সেটা একটা কো-অপারেটিভ বা একটা যৌথ উৎপাদন হয়ে পড়ছে।

এই কিছুদিন আগে নইপল এসেছিলেন আমাদের দেশে। নইপল সখেদে বলেছিলেন যে, 'আমাদের উপায় নেই, এডিটর ছাড়া আমাদের বই প্রকাশ করার কথা আমরা ভাবতেও পারি না। এডিটর যা বলবে আমাদের তাই শুনতে হবে, কেননা এডিটর আমাদের অভিভাবকত্ব করেন, তিনি ঠিক করে দেন যে, কোন লেখা প্রকাশ করলে ক্ষতি হবে না প্রকাশকের।' কারণ সেখানে প্রকাশকের স্টেক অনেক বেশি, অনেক বেশি পয়সা খরচা করেন তাঁরা। আমাদের মতো দেশে, এদেশে একটা বই দু'হাজার কপি বিক্রি হলে লেখক আহ্লাদে আটখানা। দু'হাজার কপি বিক্রি হয়েছে। দুশো কপি বিক্রি হলেও অনেকে খুশি হন। রবীন্দ্রনাথ একবার একটা চিঠিতে বই প্রকাশের প্রাক্কালে লিখেছিলেন যে, এই বইটির খুব চাহিদা হবে, বিক্রি হবে বলে মনে হয়, এই বইটি পাঁচশো কপি ছাপা হোক। এটা তাঁর আবদার ছিল। মানে রবীন্দ্রনাথের বই পাঁচশো কপিও সে সময়ে ছাপা হত না। এমনই দুরবস্থা ছিল সাহিত্যের ক্ষেত্রে। এখন অবশ্য সে তুলনায় অনেকটা ভালো, চিত্র অনেকটা পালটে গেছে, তাহলেও এখনও আমাদের বাংলা সাহিত্যের প্রকাশনা অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে। যদি বলি বিক্রি, ডিমান্ড—বাঙালি পৃথিবীতে পাঁচ নম্বরে আছে। বাঙালি কিন্তু কম নেই। বাংলা ভাষায় কথা বলে এমন লোক সংখ্যার দিক থেকে পাঁচ নম্বর। এবং বাংলা ভাষা ইউনেস্কোতে স্বীকৃতি পেয়েছে পৃথিবীর সুমিষ্টতম ভাষা বলে, সুইটেস্ট ল্যাংগোয়েজ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। এবং আমরা জানি একটা দেশের, পুরো একটা দেশের রাষ্ট্রভাষা হল বাংলা। ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা শহিদ দিবস, মাতৃভাষা দিবস হিসেবে সারা পৃথিবীতে পালিত হয় বাংলাদেশের জন্য। বাংলাদেশের জন্যই বাংলা ভাষা সারা পৃথিবীতে একটা আলাদা মর্যাদা পেয়েছে, তা না হলে পেত না। কারণ এটা ভারতের একটা আঞ্চলিক ভাষা মাত্র। এত পাওয়া সত্ত্বেও, এত পাঠক বাঙালি থাকা সত্ত্বেও আমরা জানি যে, পশ্চিমবঙ্গে পাঠকের সংখ্যা, ক্রেতার সংখ্যা খুব সীমাবদ্ধ।

বাংলাদেশে বাংলা বই সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয়, মানে পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় পাঁচ থেকে সাত, কখনও কখনও দশগুণও বেশি বিক্রি হয়। আমি বাংলাদেশে গেলে যে সমাদর পাই, বাংলাদেশে গেলে পাঠকের যে-আদর এবং ভালবাসা খানিকটা উৎপীড়নও সহ্য করতে হয় বুঝতে পারি যে, এই নিখাদ ভালোবাসাটা একেবারেই সাহিত্যপ্রেম থেকে উঠে আসছে। বাংলাদেশে আমি দেখেছি যে, আপনারাও হয়তো অনেকেই দেখেছেন, তাই এটা অনেকটা মায়ের কাছে মাসির গল্প বলার মতো হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, গাঁয়ে-গঞ্জে পর্যন্ত, এমনকী যেখানে গাড়ি নিয়ে নদী পার হতে হয়, যেখানে গাড়িটা স্টিমারে তুলে দেওয়া হয় বা লঞ্চে তুলে দেওয়া হয়, সেই লঞ্চেও আর কিছু থাক না থাক একটা বইয়ের দোকান আছে। একটা পানের দোকানেও বই পাওয়া যায়। এবং সেখানে একটা রিক্সাওয়ালাও বই পড়ে। যে ঘরের কাজ করে সেও বই পড়ে। বা যাকে হয়তো ফুটপাথে বসে থাকতে হয় সামান্য কাজ করে বেঁচে থাকার জন্য তাঁরও সাহিত্য জ্ঞান আছে এবং সে লেখকদের নাম জানে। এটা কিন্তু আমাদের দেশে নেই। সেখানে আমাদের বাংলা বইয়ের কিছু ডিমান্ড ছিল। এখানে যদি কোনো বই পাঁচশো কপি বিক্রি হত, সে

বই বাংলাদেশে অন্ততপক্ষে পাঁচ থেকে দশগুণ বেশি বিক্রি হত। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় সেই বাংলাদেশে এখন প্রবলভাবে পাইরেসি হচ্ছে। যে-কারণে এখানে বই বেরোবার আগে ওখানে বই বেরিয়ে যাচ্ছে। আমার একটা ধারাবাহিক উপন্যাস বেরোচ্ছিল 'দেশ' পত্রিকায়, সেটা আধাআধি বেরিয়েছে এমন সময়ে আমাকে আমেরিকা যেতে হয়। সে যাত্রা পথে ঢাকা এয়ারপোর্টে কিছুক্ষণ থাকতে হয়েছিল। সেখানে আমার দেখাশোনা করছিলেন কয়েকজন পুলিশ অফিসার। তো তাঁরা আমাকে বললেন, চলুন স্যার আপনাকে বই দেখাই। সেখানে বুকস্টলে গিয়ে দেখলাম আমার যে উপন্যাসটা ধারাবাহিক ভাবে বেরোচ্ছে সেটা ওখানে বই হয়ে বেরিয়ে গেছে! এবং সেটা ওখানে উপন্যাসের ফার্স্ট পার্ট হিসেবে বিক্রি হচ্ছে! ওই পুলিশ অফিসার আমাকে সেই বইটি কিনেও দিতে চেয়েছিলেন।

এই বাজারটা আছে বা এই বাজারটা নেই। লেখকের লাভ হয় না কিন্তু ডিমান্ডটা আছে। অবশ্য পশ্চিমবঙ্গে বাংলা সাহিত্যের পাঠক এত বেশি নয় যাতে বিপণন বা বাণিজ্যের একটা বিশাল ইনফাস্ট্রাকচার এখানে গড়ে তোলা যাবে। অন্তত এখনও সেরকম কিছু পশ্চিমবঙ্গে সম্ভব হয়নি। কিন্তু এটা ঠিক যে ডিমান্ড আছে। যে-বইমেলায় আপনারা যাচ্ছেন, বইমেলায় গেলেই আপনারা বুঝতে পারবেন যে, পাঠক আছে। অনেকেই বলছেন যে, পাঠক পড়ে যাচ্ছে, ইন্টারনেট এসে গেছে, ই-বুক এসে গেছে, ফলে মানুষ আর পড়ছে না। কিন্তু ঘটনাটা ঠিক সেরকম নয়। কেননা আমি ই-বুক দেখেছি, ঘেঁটেছি। খুব বেশিক্ষণ কেউ কম্পিউটারে বসে পড়তে পারে না। যার খুব প্রয়োজন আছে সে পড়ে, কিন্তু কম্পিউটারটা সবসময় বগলদাবা করে সর্বত্র যাওয়াও যাবে না। বই বের করে পড়া আর একটা ল্যাপটপ খুলে বসে পড়া এক নয়। কম্পিউটারের একটা রেডিয়েশনও আছে, তাতে ক্লান্তি আসে, চোখে ক্লান্তি আসে। আমাদের সকলের কাছে সেটা অ্যাভেলেবল নয়, সকলে কম্পিউটার জানেও না, তাই কম্পিউটার প্রতিযোগিতায় বইকে বাজার থেকে সরিয়ে দেবে এমন অবস্থা আমাদের দেশে এখনও তৈরি হয়নি। এখনও ই-বুকস বা ইন্টারনেটে প্রচারিত বই খুব নিয়ন্ত্রিত, সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে আবদ্ধ রয়েছে।

কিন্তু বই তো প্রকাশিত হয়, বাঙালি লেখকরা তাঁদের হৃদয়ের তাড়নায় লেখেন, আবেগে লেখেন, কিছু করার জন্য লেখেন, প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য লেখেন। খ্যাতি এবং যশ ইত্যাদি তো আছেই, কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা লেখকের এমন একটা তাগিদ সৃষ্টি হওয়া দরকার যা থেকে তাঁর মনে হয় যে আমি না লিখে পারছি না। লেখা হচ্ছে আমার কাছে একমাত্র মানুষের সঙ্গে শেয়ার করার জিনিস। আমি আমার কথা বলতে চাই। জনপ্রিয় হওয়া না হওয়া, প্রতিষ্ঠা পাওয়া না পাওয়া, বই বিক্রি হল কি না, তা বড় কথা নয়। কথাটা হচ্ছে যে, আমি আমার এই কথা বলে রাখলাম। তুমি কে আমি তো জানি না, যেই হও আমি তোমাকে একথাটা জানাতে চাই। তোমার সঙ্গে আমার সহমর্মিতা ঘটতেও পারে, নাও ঘটতে পারে। কিন্তু আমি তো জানিয়ে রাখলাম। তুমি আমাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারো, তুমি আমাকে ফিরিয়েও দিতে পারো, আমার লেখা তোমার ভালো নাও লাগতে পারে, কিন্তু একথাটা আমার না বলে উপায় ছিল না তাই আমি বললাম।

আদিম মানুষ বহুকাল আগে, যখন তার ভাষা ছিল না, সে প্রকাশ করতে জানত না, কমিউনিকেট করতে পারত না, তখন সে অনেক সুন্দর সুন্দর দৃশ্য দেখত। কিন্তু সেটা প্রকাশের ভাষা তার নেই, কিন্তু এটা বুঝত যে, আমি তো মরে যাব, মৃত্যু অবধারিত, তা আমি যখন মরে যাব তখন আমার যে-অনুভূতি, এই যে-সৌন্দর্য দেখলাম এর শিহরন, এটা আমার সঙ্গে সঙ্গে মরে যাবে, এটা আমি কারও সঙ্গে শেয়ার করতে পারব না। মানুষ তখনই আনন্দকে সত্যিকারের উপভোগ করে, যখন কারোর সঙ্গে সেই আনন্দটা শেয়ার করতে পারে। তার একটা ভাগীদার চাই। একসঙ্গে বসে প্রেমিক প্রেমিকা চাঁদ দেখে, তার একটা আলাদা মূল্য আছে, আলাদা একটা গভীরতা আছে। একা অত ভালো লাগে না। একাকী উপভোগ্য নয় এটা, শেয়ারিং বা ভাগ করে নিলে অনেক আনন্দ তাতে।

সেই জন্যই মানুষ তখন গুহাগাত্রে খোদাই করে চিত্র আঁকত, সেই আনন্দ প্রকাশ করতে গিয়ে সে ছবি আঁকত। কেউ যদি এই ছবিটা কখনও দেখে এই আশায়, আমি আমার এই চিত্রের মাধ্যমে আপনাকে

জানাতে চাই, যে হরিণটা দৌড়ে গেল, এর অসাধারণ সৌন্দর্য আমি দেখেছিলাম, সেইটা আমি এঁকে রাখলাম। এইভাবেই হাজার হাজার বছর ধরে হাজার হাজার মানুষের অক্লান্ত পরিশ্রমে যে-গুহাচিত্র তৈরি হয়েছিল তারই ক্রমে ক্রমে বিবর্তিত রূপ হচ্ছে লিপি, ভাষা, অক্ষর। এবং আমরা যখন কলম ধরি, তখন মানব ইতিহাসে ওই লিপি আবিষ্কার করতে গিয়ে, ভাষা আবিষ্কার করতে গিয়ে যত স্বেদ ঝরেছিল তার সবকিছুর উত্তরাধিকার যেন আমাদের কলমে ভর করে। তাই কলম ধরেই আমি যা খুশি তাই লিখব এটা হয় না।

কলম ধারণের, লেখনী ধারণেরও কিছু দায় এবং দায়িত্ব আছে। সে দায়িত্ব এমন নয় যে, আমি যা খুশি লিখব, যা খুশি করব। যদি আমি যা খুশি করি যেমন খুশি আচরণ করি, সেই আচরণের যে-প্রতিক্রিয়া, তার যে-ফল তা আমাকে ছাড়বে না। সবরকম ভাবে সবকিছু করা যায় না, কিছু গ্রহণ কিছু বর্জন করতে হয়। আর সেভাবেই লেখককে তৈরি হতে হয় পরিশ্রমের জন্য। কারণ আজকে যখন একজন লেখক লেখনী ধারণ করেন তখন তার প্রতিদ্বন্দ্বী কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে যত সাহিত্যিক এসেছেন, সে শেক্সপিয়রই হোক, হোমার-ই হোক বা বেদব্যাস বা বাল্মীকি সকলেই তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী। সুতরাং তাঁর এমন কিছু লেখার চেষ্টা করা উচিত যা আর কারোর মতো নয়, যেটা তাঁর নিজস্ব। তাঁর ভাষা, তাঁর শৈলী, তাঁর স্টাইল সবটুকুই তাঁর নিজস্ব। নিজস্ব ভাষা, নিজস্ব শৈলী। সৃষ্টি করা বড় কঠিন, কঠিন কাজ। দিনের পর দিন রাত জেগে বসে থাকতে হবে, কলম কামড়াতে হবে, ভাষা ধরা দেবে না, বাক্য ধরা দেবে না, পালিয়ে পালিয়ে যাবে। একটা শব্দ হারিয়ে গেল তো চিরকালের মতো হারিয়ে গেল, তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। এরকম নানারকম ভাবে লেখকের সংগ্রাম চলে হৃদয়ের গভীরে, যেখানে তিনি একাকী, নিঃসঙ্গ। তাঁর তখন স্ত্রী নেই, ছেলে নেই, মেয়ে নেই, কেউ নেই। একা তিনি, তাঁর ভাষা, তাঁর কলম, তাঁর কাগজ। এই সব মিলে একটা তীব্র নিঃশব্দ সংগ্রাম, তার মধ্যে লেখক নিজেকে নিংড়ে নেন। সম্পূর্ণ ভাবে নিবেদিত করে দেন। এই কঠিন সংগ্রামের দিকটি মানুষের অগোচরে থেকে যায়, মানুষ বুঝতে পারে না, পাঠক বুঝতে পারে না যে, কতখানি পরিশ্রম, কতখানি ত্যাগ, কতখানি তিতিক্ষা এক একটা লেখার পেছনে আছে।

আমার মনে হয় অনেকেই এখন অতটা ভাবেন না, ভাবতে চান না বা অতটা খাটতে বা পরিশ্রম করতেও রাজি নন। অনেকটা সহজ পন্থায় এগোতে চান। আমি অনেক সময়ে ইংরেজি-বাংলা লেখা পড়তে গিয়ে দেখি বেশ লেখা, স্মার্ট লেখা। আমি অরবিন্দ আদিগা-র একটা বই পড়ছিলাম, হোয়াটই টাইগার। দারুণ! মানে শুরুটা এত ভালো লাগছিল। স্মার্টনেসের জন্য, ভীষণ স্মার্ট। কিন্তু পড়তে-পড়তে অনেকটা এগিয়ে দেখি এইরে, আর তো সামাল দিতে পারছে না, কোথায় যেন একটা গন্ডগোল হয়ে যাচ্ছে, গভীরতার কোথাও একটা অভাব। নিমজ্জমানতা নেই। কদিন আগেই দেখা হয়েছিল একজন বিখ্যাত লেখক, নামটা ভুলে যাচ্ছি, খুব জনপ্রিয় লেখক, ইংরেজিতে লেখেন, তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল কলকাতা বইমেলায়। তিনি বললেন, 'বলুন দাদা, আপনি তো আমায় চেনেন।' তা আমি বললাম যে, হ্যাঁ, চিনি। তাঁর একটা লেখা পড়েছিলাম, স্মার্ট লেখা। কিন্তু পড়তে পড়তে মনে হল যে, স্মার্ট কিন্তু পার্টিং সামথিং, আমাকে ধাঁধিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে, আমাকে চমকে দেওয়ার চেষ্টা করছে, মনে হচ্ছে বাহ, এভাবেও তো লেখা যায়। কিন্তু আমরা তো এই লেখা পড়ে বড় হইনি, যে-লেখা আমাদের টেনেছে বরাবর, গভীরে নিয়ে গেছে। দস্তয়ভস্কি, তলস্তয়, রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র বা বিভূতিভূষণ, কাফকা বা কাম্যু যা আমাদের জীবনকে অদ্ভুত অদ্ভুত সব সত্যের সম্মুখীন করে দিয়েছে।

আপনারা অনেকেই পড়েছেন কাফকা-র মেটামরফসিস গল্পটি। আমি যখন পড়েছি তখন আমার বয়স অনেক কম। তেইশ কি চব্বিশ। সবে তখন লেখালেখি করি। গল্পটা যাঁরা জানেন না তাঁদের জন্য সংক্ষেপে বলছি। একটা লোক, ভেগর সামসা নাম সে একজন সেলস ম্যান, মা আছে, বাবা আছে, ছোট বোন আছে, সুখের সংসার, শান্তির সংসার। হঠাৎ একদিন সকালে উঠে সে দেখল সে পোকা হয়ে গেছে—টার্ন ইনটু আ ভার্মিন, আ বিগ ভার্মিন। অনেকগুলো পা হয়েছে, তার খাদ্যাভ্যাস বদলে গেছে, মানুষের মতো সে আচরণ

করতে পারছে না। কিন্তু তার ব্রেনটা কাজ করছে। কথা বলতে পারছে না, কমিউনিকেট করতে পারছে না। সে প্রথমে ভেবেছিল স্বপ্ন। তারপর দেখল, না, সে সত্যি পোকা হয়ে গেছে। লেখক তখন কী করলেন, আগাগোড়া সেই পোকাদের কী সুবিধে কী অসুবিধে, একজন মানুষ পোকা হয়ে গেলে তাকে যে অসুবিধেগুলো ফেস করতে হয়, তার অনুপুঙ্খ বিবরণ দিতে শুরু করলেন। তারপর তার পরিবারের সঙ্গে যে তার একটা ডিসট্যান্স তৈরি হল সে পোকা হয়ে যাওয়ার ফলে, সেগুলোর অসাধারণ বিবরণ দিতে শুরু করলেন। আমরা গোগ্রাসে পড়ছি, বই ছাড়তে পারছি না। কী হল, কী হল এরকম ভাব। ছেলে পোকা হয়ে গেলে মা-বাবা-র ভয়ংকর একটা শকিং এক্সপেরিয়েন্স হয়, কিন্তু অন্যদিকে একটা অন্য পরিবর্তনও হচ্ছে। যে ছেলে ছিল একমাত্র রোজগেরে, এখন সেই ছেলের তো রোজগার বন্ধ, এখন কী করে সংসার চলবে। তখন তারা বাড়ির একটা অংশ ভাড়া দিচ্ছে, সাবলেট করছে। ভাড়াটেরা আসছে তারা ওই পোকাটাকে দেখে বিস্মিত, কে ওই পোকাটা, কোত্থেকে ওই পোকাটা এল, বিরাট পোকা। লজ্জায় পড়ে যাচ্ছে বাড়ির লোক, তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে। তারপর তারা কী করল, আয়া গোছের একজন মহিলাকে রাখল, যে ওই পোকাটাকে খাওয়াবে-দাওয়াবে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করবে। এরকম করে দিন যায়। হতে হতে একদিন আয়া এসে জানাল পোকাটি মরে গেছে। ওরা তখন ব্রেকফাস্ট করছিল। শুনে মা আর বাবা চুপ করে রইল। আয়া বলল পোকাটাকে নিয়ে কী করব? বাবা বলল, ওকে ডাস্টবিনে ফেলে দাও। তাই দেওয়া হল। যে পোকাটি মারা গেছে সেই পোকাটি কে? ওর ছেলে। দীর্ঘদিন ধরে যে চাপে তাদের থাকতে হচ্ছিল সেই চাপ থেকে তারা মুক্ত হল। আজকে তাদের আর কোনো চাপ নেই। আজকে তারা পোকাটার হাত থেকে অব্যাহতি পেয়েছে। মা-বাবা এবং মেয়ে—মেয়ে তখন যুবতী হয়ে উঠেছে, তিনজন বেড়াতে বের হল। সুন্দর দিন, রোদ ঝলমলে দিন। মা এবং বাবা মেয়ের দিকে তাকিয়ে ভাবছে মেয়ে তো খুব সুন্দর হয়েছে, এবার ওর খুব ভালো বিয়ে হবে।

এটা আমার কাছে পৃথিবীর যাবতীয় প্রচলিত ধ্যান ধারণাকে চুরমার করে দেয়। বাৎসল্য, পুত্র স্নেহ! সে পুত্রস্নেহ কোথায় গেল? বরং এই পুত্রের মৃত্যুতে তারা অব্যাহতি পেয়েছে, তারা খুশি হয়েছে, আনন্দিত। তাহলে কি পুত্রস্নেহ, সন্তান স্নেহ, অপত্যস্নেহ এগুলো মানুষের তৈরি করা অভিনয়? এগুলো সত্যি না মেকি? এই প্রশ্নের সম্মুখে আমাকে দাঁড় করিয়ে দেন কাফকা। কাফকা কিন্তু ব্যাখ্যা করেননি। এখানে দাঁড় করিয়ে দিয়ে সরে যাননি। নাউ ইউ ডিসাইড, হোয়াট লাইফ ইউ আর লিভিং। যাই হোক এভাবেই এক একটা গল্প আমাদের সামনে সত্য উন্মোচিত করে। সুধীন্দ্র নাথ দত্ত-র কবিতার মত, একটি ক্ষণের মানুষী দুর্বলতা প্রলয়ের পথ দিল অবারিত করে। এই প্রলয়ের পথ মাঝে মাঝে অবারিত হয়ে যায়। কিন্তু মাঝে মাঝে সত্যের সম্মুখীন হয়ে আমরা আবার নতুন করে নিজের বিচার করতে পারি। সাহিত্যের কাছে সেজন্যই আমরা ঋণী। এই ঋণ অন্য কোনো ভাবে শোধ করা যাবে না। সাহিত্য সাহিত্যই। তার প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ নেই।

# বইমেলা

আমি যখন নিজে কচি বয়সের ছেলে ছিলাম, তখন বই ছিল আমার স্বপ্নের জগতের দরজা। গল্পের মধ্যে ডুব দিয়ে কোন তেপান্তরের মাঠে রাক্ষস-খোক্কসের জগতে, পরিদের, ভূতের, পক্ষিরাজের রাজত্বে পৌঁছে যেতাম। বই তখন ছিল আমার এক দুর্লভ প্রাপ্তি। এখনকার মতো সহজ, সুলভ প্রাপ্তি তখন আমাদের ভাগ্যে ঘটত না। গল্পের বই ছিল দুর্লভ বস্তু। অনেক ঘ্যানঘ্যান করে, অনেক দিনের চেষ্টায়, এমনকি, চোখের জল ফেলে একখানা বই আদায় করা যেত। আর সে বইখানা হাতে পেলে কতবার যে পড়তুম তার ঠিক-ঠিকানা নেই।

সেই তুলনায় এ-যুগের বালক বা কিশোররা অনেক ভাগ্যবান। গল্পের বইয়ের সংখ্যাও বেড়েছে, আর অভিভাবকরাও মুক্ত হস্তে বই কিনে দেন।

এখনকার শিশুদের কাছে আরও সুখবর হচ্ছে বইমেলা। বইমেলা শুধু বই বিকিকিনির জায়গা নয়, এ হল বইয়ের উৎসব। এ হল বই নিয়ে আনন্দ। বই যে আমাদের কত বড় বন্ধু, বইমেলা সেই সত্যকেই প্রকাশ করে। আমি যদি শৈশবে এরকম বইমেলা পেতুম, তা হলে মনে হয় জীবনটাই অন্যরকম হয়ে যেত।

বইমেলায় সবচেয়ে অনন্দিত, সবচেয়ে কৌতূহলী আগন্তুক হল শিশুরা। তারা হরেকরকমের বই দেখে। ছোঁয়, ঘাঁটে, কেনে। তারপর বইয়ের প্যাকেট বগলে নিয়ে যখন বাড়ি ফেরে তখন তার হাতের মুঠোয় এক আশ্চর্য জগতের চাবিকাঠি। আমার তো মনে হয়, শিশুদের কাছেই বইমেলার আকর্ষণ সবচেয়ে বেশি।

এ-যুগের শিশুদের ভাগ্য ভাল যে, তাদের আমলে শিশুপাঠ্য গ্রন্থের সংখ্যা অনেক বেশি প্রকাশিত হয়। এখনকার ছাপা-বাঁধাইও ভাল। আর ছবিও অনেক ঝকঝকে। এইসব বই দেখলে আমার নিজের আবার বাচ্চা ছেলে হয়ে যেতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে আবার বড়দের হাত ধরে বইমেলায় দুটি বিস্ময়-মাখা চোখ নিয়ে, দুটি সাগ্রহী কচি হাত নিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াই, আর বুকে চেপে ধরি বই আর বই।

এখন আমার ছেলে ও মেয়ের মধ্যেই আমি নিজেকে খুঁজে পাই। আমার ছেলে-মেয়েও বইয়ের পোকা, তবে ওরা যেরকম টিনটিন বা আরও সুন্দর সুন্দর নানা রকমের কমিকস হাতে পায়, তা তো আমি পেতুম না। আমাদের ছেলেবেলায় কমিকস খুব সামান্যই ছিল। এখন শিশুদের দিকে অনেক বেশি নজর দেওয়া হয়।

জাপান বা আমেরিকায় শিশুরা পায় সবচেয়ে বেশি মর্যাদা এবং মনোযোগ। আমার নিজেরও কেমন যেন মনে হয়, যে-কোনও সমাজে শিশুদের প্রতিই সবচেয়ে গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

আমি বাচ্চাদের জন্য যখন লিখি, তখন সবচেয়ে বেশি আনন্দ পাই। আর, এইসব গল্প-উপন্যাসের ভেতরে ভারমুক্ত মনে নিজেকে ছেড়ে দিতে পারি। লেখার যে একটু কষ্ট আছে, সেটা তখন বুঝতেই পারি না। সবচেয়ে বেশি আনন্দ পাই যখন কচি হাতের লেখা খুদে পাঠক-পাঠিকাদের চিঠি আসে।

# দেশ ও আমি

তখন থাকতাম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট হস্টেলে। শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের গলির গলি তস্য গলির ভিতরে এঁদো, ড্যাম্প, অন্ধকার ও অস্বাস্থ্যকর একটা হাড়-জিরজিরে পুরনো বাড়ির একতলায়। সেখানেই পড়াশুনো, লেখালেখি। যত দূর মনে আছে, তখন সাহিত্যপত্রিকা বলতে 'দেশ', 'পূর্বাশা' আর 'পরিচয়'। কিন্তু হবু লেখকদের জানা ছিল যে, 'দেশ' পত্রিকায় কোনও লেখা বেরলে তা লহমায় বাঙালির ঘরে ঘরে পৌঁছে যায়। আর পঞ্চাশের দশকের ওই সময়টায় 'দেশ' পত্রিকায় প্রতি সপ্তাহে অখ্যাত কিছু তরুণ লেখক পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে রীতিমতো আলোড়ন ফেলে দিচ্ছিলেন। বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, মতি নন্দী, দিব্যেন্দু পালিত, স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, যশোদাজীবন ভট্টাচার্য, চিত্ত সিংহ, রতন ভট্টাচার্য এবং স্বয়ং বিমল করও। নতুন ধারায়, অভিনব আঙ্গিকে লেখা সেসব গল্প বা গল্পকাররা কেউ কারও মতো নন। যে যাঁর নিজের মতো পুরনো প্রথা-প্রকরণ ভেঙে নূতন নূতন মাত্রায় সংযোগ ঘটাচ্ছিলেন। 'দেশ' পত্রিকার মতো গেরামভারী সাপ্তাহিক তাঁদের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছিল নিজেদের মঞ্চটি। বড় সাধ ছিল, এই নূতন সাহিত্যযজ্ঞে যদি আমার মতো একেবারে আনকোরা আঁকাড়া একজনও কোনওক্রমে সুযোগ পেয়ে যাই! আশা বা ভরসা একটাই, 'দেশ' নূতনদের অনাদর করছে না। নেড়েচেড়ে পরীক্ষা করে দেখছে এবং জায়গাও দিচ্ছে।

পথ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না মোটেই। অন্তত উনিশ-কুড়িজন বাঘা তরুণ লেখক তখন তুর্কি ঘোড়সওয়ারের মতো দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন। তাঁদের নাম মানুষের মুখে মুখে ফিরছে। আর কী সব অসাধারণ গল্প! পড়ে চমকে যেতে হয়। এবং সঙ্গে সঙ্গে হতাশাও আসে। আমি কি ওঁদের ধারেকাছেও কখনও যেতে পারব?

সাহিত্যকার হওয়া শুধু ইচ্ছের ওপর নির্ভর করে না। অনুশীলন বা অধ্যবসায়ও নয়। আরও একটু কিছু। সেটা বোধহয় অবলোকন এবং অনুভূতিরও মুখাপেক্ষী। আমার তখন বাইশ-তেইশ বছর বয়স। বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখপত্র 'একতা'য় সদ্য একটা গল্প বেরিয়েছে আমার, তাও দ্বিতীয় চেষ্টায়। আত্মবিশ্বাসের জায়গাটা তেমন জোরালো ছিল না। ইতিমধ্যে 'দেশ' পত্রিকা দু'বার আমার গল্প ফেরত দিয়েছে। গম্ভীর মানুষ বিমল কর আমার দিকে ভ্রূক্ষেপও করেননি।

নির্লজ্জের মতো তৃতীয় গল্পটিও একদিন অতি সংকোচের সঙ্গে জমা দিয়ে আসি। বলা বাহুল্য, এই গল্পটি অবশেষে ছাপা হয়। এই কাহিনি বিস্তারিতভাবে বলাটা বাহুল্য হবে কারণ বিভিন্ন সময়ে এই ঘটনাবলী আমাকে অন্যত্র লিখতে হয়েছে। আমি বিশেষ ভাগ্যবান যে, ওই প্রথম গল্প প্রকাশের বছরেই 'দেশ' শারদীয়তে আমার গল্প প্রকাশিত হয়। আর তার পরেই বিমল করের সঙ্গে পরিচিতি ঘটে। পরিচয় ঘটে সাগরময় ঘোষের সঙ্গেও।

ডেডিকেশন কাকে বলে তা হয়তো আক্ষরিক অর্থে জানি। কিন্তু বাস্তবে বড় একটা দৃষ্টান্ত খুঁজে পাই না। সাগরদাকে দেখে ডেডিকেশন শব্দটা যেন আবার নতুন করে বুঝলাম। এমন দেশ-গত প্রাণ আর কাউকে কখনও দেখিনি। তাঁর শয়নে স্বপনে জাগরণে সবসময়েই 'দেশ' বিরাজ করত।

পঞ্চাশ বা ষাটের দশকে লিটল ম্যাগাজিনের সংখ্যা ছিল খুবই কম। কবিতার পত্রিকা কিছু ছিল বটে, কিন্তু ছোটগল্পের পত্রিকা ছিল বিরল। সঞ্জয় ভট্টাচার্যের পূর্বাশা, পরিচয়, চতুরঙ্গ ইত্যাদি। নতুন ধারার গল্প এবং তরুণদের কবিতা প্রকাশ করে দেশ খানিকটা লিটল ম্যাগাজিনের ভূমিকাও পালন করেছে তখন। মনে রাখতে হবে, তখনও তারাশঙ্কর থেকে শুরু করে চল্লিশ বা ত্রিশের দশকের দিকপাল লেখকরা বর্তমান। তবু 'দেশ' পত্রিকা নতুনদের সুযোগ দেওয়ার অভিনব উদ্যোগ নিয়েছিল। আমাদের কাছে সেটা বিস্ময় ও আনন্দের ব্যাপার হয়েছিল। সম্ভবত তরুণদের ওপর নির্ভর করার ফলেই 'দেশ' সাপ্তাহিক ধীরে ধীরে সাহিত্যের পালাবদলে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পেরেছিল।

বলে রাখা ভাল, আগে বিমল মিত্রের সাহেব বিবি গোলাম, সৈয়দ মুজতবা আলীর দেশে বিদেশে এবং অন্যান্য রচনার সুবাদে সাপ্তাহিক 'দেশ' অবিসংবাদী জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। প্রতি সপ্তাহে তরুণদের গল্প যখন প্রকাশিত হচ্ছে, তখন পাশাপাশি প্রবীণ সাহিত্যিকদের ধারাবাহিক উপন্যাস বা রচনাও প্রকাশ পাচ্ছে। ফলে দুই ধারারই একটা সেতুবন্ধন ঘটানোর চেষ্টা 'দেশ' পত্রিকার ছিল। এই উদ্যোগ না নিলে তখনকার অনেক তরুণদেরই প্রতিষ্ঠা পাওয়া আর হয়ে উঠত না।

'দেশ'-এর দফতর তখন আনন্দবাজার পত্রিকা অফিসের একটা লম্বাটে ঘরে। তখন সাগরদার কোনও আলাদা চেম্বার ছিল না, সামান্য দূরত্ব বজায় রেখে তাঁর টেবিল এবং চেয়ার। বাকিরা প্রায় পাশাপাশিই বসতেন। সাগরদাকে প্রায় সব সময়েই দেখতাম পাণ্ডুলিপি পাঠে মগ্ন হয়ে আছেন। যতদিন দফতরে এসেছেন কোনওদিনই বোধহয় পাণ্ডুলিপি পড়া বাদ যায়নি তাঁর। যখন কয়েকটা লেখা বেরিয়েছে এবং বিমলদার সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে, তখনই একদিন বিমলদা সাগরদার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। এম এ পড়ছি জেনে বললেন, পাস করে প্রফেসার হবে? আমতা আমতা করছিলাম। আসলে তাঁর প্রতি একটু ভয়ের ভাব তো ছিলই। সাগরদা অবশ্য সেটা কাটিয়ে দিলেন ভারী সহজ কথাবার্তা বলে। আমি বরাবরই মুখচোরা, কথা খুঁজে পাই না।

'দেশ' দফতরে তখন প্রবেশাধিকার ছিল অবাধ। যে-কেউ সশরীরে, হাজির হয়ে যেতে পারত। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, ঘরে বহিরাগতদের ভিড় হত। বরং উল্টোটাই। গিয়ে কখনও-সখনও এক-আধজন চেনা বা অচেনা লোককে দেখতাম। নইলে বেশির ভাগ সময়েই ঘর থাকত সুনসান, চুপচাপ এবং যে যাঁর কাজ করে যেতেন। আমি গিয়ে বিকেলের দিকে মাঝে মাঝে হাজির হলে বিমলদা খুশি হতেন এবং বসিয়ে রাখতেন। পাঁচটা বা সাড়ে পাঁচটার পর বিমলদা আমাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন কলেজ স্ট্রিট মার্কেটের আড্ডায়। বিমলদা কখনও কফি হাউসে যেতেন না। বিমলদার সঙ্গে আড্ডা দিতে আসতেন বরেন, শংকর, সত্যেন্দ্র, অজয়, বাদল, দিব্যেন্দু, রতন, স্মরজিৎ, যশোদাজীবন এবং অনিয়মিত আরও অনেকে। এই আড্ডা থেকেই ছোটগল্প : নতুন রীতি পত্রিকার সূচনা হয়। কিন্তু সেই পত্রিকা বেশি দিন চলেনি। তবে নতুন রীতি আন্দোলন কথাটা চালু হয়ে গেল। নব্য লেখকরা তখন প্রথাসিদ্ধ পাঠকদের বিস্তর নিন্দেমন্দর শিকার হচ্ছেন।

'দেশ' পত্রিকার দুঃসাহসের আর একটি দৃষ্টান্ত দিই। পঞ্চাশের দশকের শেষে, কয়েক মাসের ব্যবধানে কমলকুমার মজুমদারের দুটি দীর্ঘ গল্প 'দেশ'-এ প্রকাশিত হয়। 'মতিলাল পাদরী' এবং 'তাহাদের কথা'। আমার স্মৃতি খুব নির্ভরযোগ্য নয়। গল্প দুটির নাম সঠিক উল্লেখ করলাম কিনা জানি না। কলমকুমারের গদ্য এখন আর পাঠকদের অপরিচিত নয় হয়তো। ওই আদি বাংলা বাক্য ও শব্দবিন্যাসের বিভ্রান্তিকর আদল এবং অপরিচিত শব্দসম্ভারে কন্টকিত কমলকুমারের গদ্যভঙ্গি সাধারণ পাঠকের কাছে কঠিন, দুর্ভেদ্য, বিরক্তিকর মনে হতেই পারে। কিন্তু যাঁরা সেই কষ্ট স্বীকার করে কমলকুমারের গল্প বা উপন্যাসের মর্মে পৌঁছবেন, তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছে এক বিস্ময়কর অভিনব জীবনবোধের উন্মোচন। এই অসামান্য

কথাশিল্পী কখনওই অনুকরণযোগ্য নন, কিন্তু যে-কোনও কথাকারের কাছেই তিনি এক অফুরান অনুপ্রেরণার উৎসস্বরূপ। যখনকার কথা বলছি তখন কমলকুমার বিখ্যাত তো ননই, বরং একেবারেই অপরিচিত। আর আশ্চর্যের বিষয়, মতিলাল পাদ্রী এবং তাহাদের কথা কিন্তু অতি ঝরঝরে চলিত ভাষায় লেখা। অভিনবত্ব আছে তাদের আঘ্রাণে, যা সাদামাটা বাঙালি জীবন থেকে আহরিত নয়। আমি গল্প দুটি পড়ে বিস্ময়ে, শিহরণে অভিভূত হয়েছিলাম। অনেকদিন সেই ঘোর কাটেনি, হয়তো আজও নয়।

তখনকার 'দেশ'-এ প্রকাশিত যেসব গল্প আমাকে বিশেষভাবে নড়িয়ে দিয়েছে, সেগুলো হল বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের কানি বোষ্টুমির গঙ্গাযাত্রা, তোপ, দেবেশ রায়ের দুপুর, আহ্নিক গতি ও মাঝখানের দরজা, দিব্যেন্দু পালিতের শীত গ্রীষ্মের স্মৃতি, স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাপের চোখের ভিতর দিয়ে, জলপোকা, রতন ভট্টাচার্যের পিঞ্জর, চিত্ত সিংহের সুধন্য ও সেবারের বর্ষা। এবং এ ছাড়া সমন্ত ভদ্র, সত্যেন্দ্র আচার্য, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মল চট্টোপাধ্যায়, সোমনাথ ভট্টাচার্য এমনতর আরও অনেকেই আমাদের আন্দোলিত করেছেন। নতুন প্রকরণ, অভিনব শব্দের ব্যবহার, প্রথাবিরোধী উপস্থাপনা, গল্পহীন নানা মুহূর্তের আলেখ্য এইসব গল্প যথার্থই নতুন রীতির সূচনা করেছিল। এই আন্দোলন তবু গোষ্ঠীবদ্ধ সমষ্টির আন্দোলন ছিল না। ছিল ব্যক্তিগত প্রয়াসেরই ফসল। 'দেশ' বহির্ভূত পত্র-পত্রিকায় তখন অসামান্য কথাকার মতি নন্দী, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় এবং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের প্রকাশ ঘটে চলেছে। এঁরা প্রত্যেকেই পরবর্তীকালে 'দেশ'-এ গল্প লিখেছেন। উপন্যাসও। নিজের রাজনৈতিক আদর্শের জন্য দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায় কখনও 'দেশ'-এ লেখেননি, যেমন একটিমাত্র লেখা ছাড়া আর লেখেননি অভিমানী অমিয়ভূষণ মজুমদার। কিন্তু সাগরদা এবং বিমলদার সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপচারিতা থেকে জেনেছি, এঁদের লেখা 'দেশ' পত্রিকায় স্বাগত ছিল। আমি কোচবিহারে কিছুদিন পড়াশুনো করেছি মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ স্কুল এবং ভিক্টোরিয়া কলেজে। সেই সুবাদে অমিয়ভূষণের সঙ্গে ভালই আলাপ ছিল। সাগরদা একদিন আমাকে ডেকে অমিয়ভূষণ সম্পর্কে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক কথা জিগ্যেস করেছিলেন। বেশ আগ্রহ ছিল সাগরদার। শেষ অবধি অবশ্য যোগাযোগটা গাঢ় হয়ে ওঠেনি।

'দেশ'-এ প্রথম গল্প লিখে পেয়েছিলাম কুড়ি টাকা, যা তখনকার টাকার মূল্যমানে মোটেই কম নয়। তখন চালের কিলো এক টাকার মধ্যেই, তেল বড় জোর দু'টাকা, পাঁচ সিকে থেকে দু'আড়াই টাকায় এক কিলো মাছ পাওয়া যেত, বারো আনা বা পঁচাত্তর পয়সায় এক মিটার পাঞ্জাবির কাপড়। মনে আছে, প্রথমবার টাকা পেয়ে পাঁচ টাকা দিয়ে 'তিতাস একটি নদীর নাম' কিনে দিদিকে উপহার দিয়েছিলাম। 'দেশ' শারদীয়তে প্রকাশিত আমার তৃতীয় গল্পটির জন্য দক্ষিণা বেড়ে হল পঁচিশ টাকা।

এই টাকা নিয়েই একটা ঘটনার কথা বলি। 'দেশ'-এ তখন আমার একটা গল্প বেরিয়েছে। সদ্যই বেরিয়েছে। সেই বাবদ টাকা পেতে অফিসের নিয়মানুযায়ী এক-দেড় মাস লাগার কথা। কিন্তু সেসময় হঠাৎ কী কারণে যেন আমার ভারি টাকার টানাটানি পড়েছিল। উপায়ান্তর না থাকায় আমি একদিন ভারী সংকোচের সঙ্গে বিমলদার কাছে গিয়ে সমস্যাটা জ্ঞাপন করে, গল্পের টাকাটা পাওয়া সম্ভব কিনা তা জানতে চাইলাম। বিমলদা বললেন, সাগরদার কাছে যাও, আমি বলে দিচ্ছি।

সাগরদা সমস্যার কথা শুনলেন এবং তক্ষুনি ক্যাশিয়ার মহী গাঙ্গুলিকে ফোন করে বললেন, ও আমার সামনেই বসে আছে। টাকাটা এখনই পাঠিয়ে দিন।

মহীদা জবাবে কী বললেন জানি না। তবে সাগরদা সহাস্যে বললেন, 'আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক আছে, বই আমি দিয়ে দেব।

তখন সাগরদার সম্পাদনায় শতবর্ষের গল্প সংকলন বা ওই রকম কোনও নামের একটি বই বেরিয়েছিল। বইটি সাংঘাতিক বিকোচ্ছে। বেশ মোটা বই এবং দামও বেশি। আধঘণ্টার মধ্যেই ভাউচার সহ আমার টাকা নিয়ে এল একজন পিয়ন। সাগরদা তাঁর হাতের কাছেই থাকা আলমারি থেকে সেই বইটা বের করে স্বাক্ষরান্তে পিয়নের হাতে দিয়ে দিলেন।

আমার তখনকার দারিদ্রদীর্ণ জীবনে এইসব বদান্যতার কথা যখন আজ স্মরণ করি, তখন মনটা দ্রব হয়ে যায়। পরে মহীদার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। যেমন সুপুরুষ, তেমনই সুরসিক ছিলেন। নিয়ম ভাঙা পছন্দ করতেন না, কিন্তু কখনও সখনও, তেমন প্রয়োজনে, সব নিয়ম উপেক্ষা করে ঝুঁকি নিয়েও টাকা দিয়ে দিতেন। অন্তত বার দুই আমাকে তিনি বিপদ থেকে উদ্ধার করেছিলেন।

যত দূর মনে আছে, বাষট্টি সালে আমার 'ঘরের পথ' নামে একটা গল্প 'দেশ'-এ প্রকাশিত হয়। এবং এর পরেই আমার লেখালেখির প্রয়াসে এক অদ্ভুত শূন্যতার সৃষ্টি হয়। যাই লিখতে যাই তাই অপছন্দ হতে থাকে বলে দু'-এক পাতার বেশি এগোতে পারি না। বার বার লেখা আটকে যেতে থাকে। মাথা গরম হয়ে ওঠে। অস্থিরতা বোধ করি। তখন 'দেশ'-এ দু'-তিন মাসের মধ্যেই গল্প দেওয়া একটা নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে। না দিলে বিমলদা আর সাগরদা অসন্তুষ্ট হন। বিমলদা বার বার 'গল্প দিলে না?' বলে তাগাদা দিচ্ছেন। কিন্তু আমি কিছুতেই লিখে উঠতে পারছি না। মাসের পর মাস চলে যাচ্ছে। সেই সময়ে একদিন সাগরদা বিমলদাকে বলেছিলেন, ও নিশ্চয়ই কমিউনিস্ট, তাই 'দেশ' পত্রিকায় আর লিখতে চাইছে না।

প্রায় পৌনে দু'বছরের প্রয়াসে খরা কাটিয়ে উঠেছিলাম। গল্পটার নাম ছিল 'স্বপ্নের ভিতরে মৃত্যু'।

ছোটগল্পের মতোই, বা তার চেয়েও বেশি, 'দেশ' পত্রিকা ছিল তরুণ কবিদের প্রকাশ-মঞ্চ। তখন শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন, সুনীল, শক্তি, বিনয় মজুমদার, তরুণ সান্যাল, আনন্দ বাগচী, অমিতাভ দাশগুপ্ত, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়, শরৎ-বিজয়া, আলোক সরকার প্রমুখ এক ঝাঁক উজ্জ্বল কবি 'দেশ' পত্রিকাকে অপ্রতিরোধ্য করে তুলেছিলেন।

কবিদের মধ্যে প্রায় কেউই থেমে থাকেননি, বেশির ভাগই এখনও সৃজনশীল। কিন্তু গল্পকারদের মধ্যে অনেকেই আবির্ভাবের কিছুকাল পরেই থেমে গেলেন। যেমন রতন ভট্টাচার্য আর স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। কিছু কাল পরে যশোদাজীবনও। মিইয়ে গেলেন সত্যেন্দ্র আচার্য, সোমনাথ ভট্টাচার্য এবং চিত্ত সিংহ।

'দেশ'-এ ১৯৬৮ সালে আমার প্রথম উপন্যাস 'ঘুণপোকা' শারদীয় সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। এর পর ধারাবাহিক 'পারাপার'। লেখালেখির নিয়মিত জীবনের উদ্যোগপর্ব এটাই।

ইচ্ছে ছিল আমার তুচ্ছ স্কুল মাস্টারির চাকরিটি ছেড়ে ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের কাছে নিয়তকর্মী হিসেবে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেব। লেখালেখি থেকে মোটামুটি একটা আয় হয়, বইয়ের কিছু রয়্যালটি পাই। কষ্টেসৃষ্টে চলে যাবে। যখন এই ভাবনায় স্থিত হয়ে প্রস্তুতি নিচ্ছি, তখনই ১৯৭৬-এ আনন্দবাজার থেকে সাংবাদিকতার চাকরি নেওয়ার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ এল। একটু আকস্মিক। দ্বিধা ছিল, দোলাচল ছিল, ওই বয়সে চাকরিতে ঢুকে আর কী-ই বা হবে! আপত্তি জানালাম। কিন্তু তা ধোপে টিকল না। সন্তোষকুমার ঘোষ একরকম জোর করেই চাকরিতে জুতে দিলেন। আজ দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলতে পারি, সাংবাদিকতার চাকরিটা না করলে ভুল করতাম। এই বৃত্তি আমার দৃষ্টির প্রসার ঘটিয়েছে, পারিপার্শ্বিক দুনিয়া সম্পর্কে আমাকে সচেতন করেছে, আমার জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়েছে। তাছাড়া বিশেস সাংবাদিকতার সূত্রে আমাকে প্রায় সারা ভারতেই ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। সংবাদ সম্পাদনার সূত্রে লেখায় সঞ্চারিত হয়েছে পরিমিতিবোধ। এসেছে অনুবাদকর্মে দক্ষতা।

বেশ কয়েক বছর আনন্দবাজার পত্রিকার সংবাদ বিভাগে কাজ করার পর আমার পদোন্নতি ঘটিয়ে 'দেশ' পত্রিকার দফতরে পাঠানো হল সহকারী সম্পাদক হিসেবে। এই চাকরিটা হয়ে দাঁড়াল ভারী মজার। 'দেশ' দফতরে তখন সাগরদা, বিমলদা, জ্যোতিষদা, পঙ্কজদা, প্রমুখ অনেকে। যেন এক পারিবারিক পরিবেশ।

আমি আর সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রায় একই সময়েই 'দেশ'-এ যোগ দিই। কিন্তু ইতিমধ্যে পঙ্কজদা হঠাৎ মারা যান। বিমলদা অবসর নিয়ে চলে যান অন্য পত্রিকায়। 'দেশ' পত্রিকার পরিসর বাড়িয়ে আর একটা ঘর তৈরি হয়। সেখানে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল বসু, আনন্দ বাগচী আর আমি বসতাম। সেটা নিছক আড্ডার ঘর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তবে সাগরদা মাঝে মাঝে আমাদের নিয়ে মিটিং করতেন এবং 'দেশ' পত্রিকার উন্নতিকল্পে কী কী করা যায় তার পরামর্শ চাইতেন। আমাদের কিছু কিছু প্রস্তাব গৃহীত এবং প্রযুক্ত হয়েছিল।

সাগরদা আমাকে মোট চারটে দফতরের ভার দিয়েছিলেন। প্রবন্ধ, রম্যরচনা, ভ্রমণ এবং মাসে একটি করে সম্পাদকীয়। কিন্তু মুশকিল হল প্রবন্ধ, রম্যরচনা বা ভ্রমণ বিষয়ক লেখা নির্বাচন করে রাখলেও তা 'দেশ'-এ ছাপানোর জায়গা পাওয়া যেত না। ফলে নির্বাচিত রচনা প্রকাশ পেতে অনেক দেরি হয়ে যেত। কারণটা খুবই স্বাভাবিক। 'দেশ'-এর সীমাবদ্ধ পরিসরে গল্প, কবিতা, উপন্যাস ছাড়াও বেশ কয়েকটি নিয়মিত বিভাগ আছে। আছে আমন্ত্রিত লেখার চাপও। জমা-পড়া লেখাগুলির মধ্যে নির্বাচিত রচনাগুলি প্রকাশ করতে 'দেশ'-এর পরিসর দ্বিগুণ হওয়া দরকার, যেটা বাস্তবে সম্ভব নয়। ফলে জমা পড়া লেখা প্রচুর জমতে থাকে এবং আমাদের তেমন কিছু করারও থাকে না। সবচেয়ে বেশি জমা হয় কবিতা। অত কবিতা পড়া, নির্বাচন করা যদি বা সম্ভব, কিছুতেই তার সব কটি চটজলদি ছেপে দেওয়া সম্ভব নয়। আমার মনে আছে, আমার নির্বাচিত একটি প্রবন্ধ ছেপে বেরতে সময় লেগেছিল পাক্কা দু'বছর। যাঁরা প্রকাশের জন্য লেখা জমা দেন তাঁরা হয়তো এ ব্যাপারটা তেমন জানেন না। ফলে অনেক সময়ে তাঁরা এসে অনুযোগ-অভিযোগ করতেন, মৃদু উষ্মারও প্রকাশ ঘটেছে।

সাগরদা একবার এক সাংবাদিকের একটি দীর্ঘ বিদেশভ্রমণ বৃত্তান্তের পাণ্ডুলিপি আমাকে দিয়ে বললেন, এই লেখাটা ধারাবাহিক বেরবে। প্রচুর ভুল আছে। সংশোধনের ভার তোমার ওপর।

কপি দেখে আমার চক্ষুস্থির। এরকম কাঁচা, ভুল এবং বিচ্ছিরি গদ্যের তো সংশোধন হয় না। পুনর্লিখন ছাড়া অসম্ভব। সেই সাংবাদিককে ডেকে এনে বললাম, এটা রিরাইট করে দিন। নইলে ছাপব কী করে?

তিনি কাঁচুমাচু হয়ে বললেন, আমার সাধ্য নেই, এর চেয়ে ভাল লেখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

বেশ কয়েকদিন আসুরিক খেটে লেখাটাকে প্রকাশযোগ্য করে তুলতে হয়েছিল। অনুরূপ বাগদাদ বিষয়ক একটি ভ্রমণকাহিনির পিছনে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়েছিল আমাকে। তবে লেখাটার ভিতরে অনেক তথ্য ও সত্য ছিল, যা সাদ্দাম হুসেনের একনায়কতন্ত্রী ইরাকের প্রকৃত চেহারাটা চিনিয়ে দেয়। ইন্দিরা গাঁধীর একটি দীর্ঘ ইংরেজি লেখার সংক্ষিপ্ত বাংলা অনুবাদ করার ভার পড়েছিল আমার ওপর। লেখাটি পড়ে এই প্রথম ইন্দিরা গাঁধীর ওপর আমার শ্রদ্ধা এসেছিল। অত্যন্ত মৌলিক ও নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি আদিবাসীদের প্রকৃত সমস্যা বা মেয়েদের মুক্তিচেতনা কেমন হওয়া উচিত তা ব্যাখ্যা করেছিলেন। সংস্কারমুক্ত মানসিকতার লেখাটি আমাকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করেছিল। রাজনীতিবিদ ইন্দিরা গাঁধীর প্রতি আমার তেমন কৌতূহল ছিল না। কিন্তু চিন্তাবিদ ইন্দিরা গাঁধীর প্রতি শ্রদ্ধা হল। খুশি হয়ে খুব যত্ন সহকারে সেটি সম্পাদনা আর অনুবাদ করেছিলাম।

আজও নানা বর্ণময় অভিজ্ঞতায় 'দেশ' পত্রিকার সঙ্গে আমি জড়িয়ে আছি। এই থাকাটা কখনও তিক্ত বা অপ্রীতিকর মনে হয়নি। কখনও মনে হয়নি এই দফতরের নানা পরিবর্তন, পরিবর্ধন, নূতনের সমাগম বা পুরাতনের বিদায় কোনও অভিনব ঘটনা। প্রযুক্তি পাল্টেছে, কমপিউটার এসে কাজ সহজতর করেছে, অফিসের বহিরঙ্গ অন্য রকম হয়েছে। তবু ঐতিহ্যে, আত্মগৌরবে এই পত্রিকাটি যেন পুরনো সব কিছুকেই অলক্ষ্যে বহন করে চলেছে।
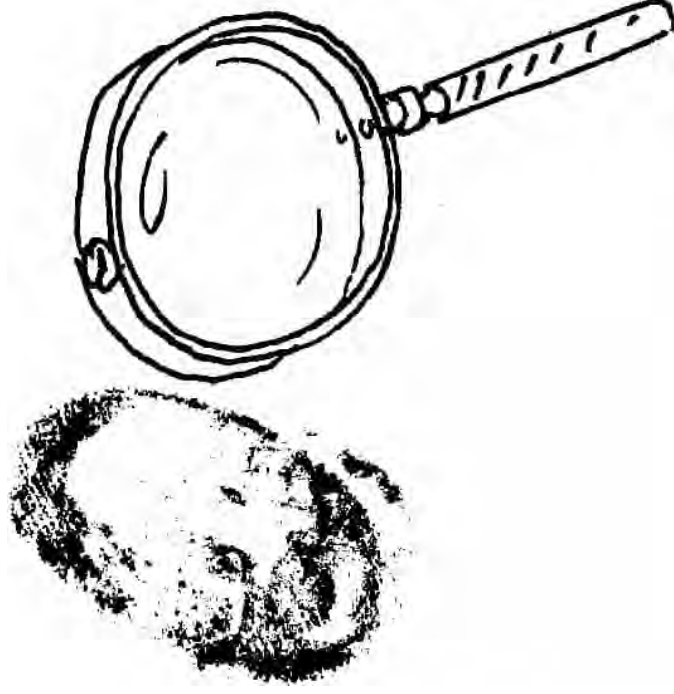
# সোনার কাঠি

জীবনের কুড়িয়ে পাওয়া অভিজ্ঞতা, জীবনযাপন করতে করতে তার যে সঞ্চয়গুলো মনের মধ্যে জমা হয়, সেগুলোই আমার লেখার উপকরণ। কখনও-সখনও দরকার পড়লে হাত বাড়িয়ে কিছু পেয়েও যাই। যখন লিখতে বসি, তখন সেগুলোই উপুড় করা কলসির মতো বেরিয়ে আসে। আমার লেখায় গ্রাম-মফসসল-শহর একাকার হয়ে যায়। আমার লেখায় পাঠকেরা মানুষ এবং তার বিভিন্ন বিচরণ ক্ষেত্রের হদিশ পাবেন। ঘূণপোকা লেখার পর পারাপার, উজান প্রভৃতি লিখি। উজান উপন্যাসের মধ্যে খানিকটা আমার ছেলেবেলার কথা আছে। এর অনেক পরে লিখি পার্থিব উপন্যাস। পৃথিবীর যে সঙ্কট তারই কথাই ফুটিয়ে তুলেছি কৃষ্ণ চরিত্রটির মধ্যে দিয়ে। উপন্যাসটির মধ্যে একটি মিশন ছিল।

আমার মনে হয়, যারা পুরোনো কাগজ কুড়োয়, তাদের মতোই আমিও লেখার উপাদান সংগ্রহ করি। স্মৃতির সরণিতে ঘুরে-বেড়িয়ে নানাভাবে সংগ্রহ করা শব্দ-গল্প দিয়েই আমি নিরন্তর মালা গেঁথে চলি। মনটাই আমার ভাঁড়ার ঘর, ওখান থেকেই আমার লেখার জোগান পাই। আমার লেখায় গল্প যৎসামান্য থাকলেও তা আমি আমার মতো করে তৈরি করে নিই। কাহিনির চেয়ে 'বক্তব্য'টাই অনেকসময় বড় হয়ে ওঠে। একটা সেলফ প্রোজেকশন লেখার মধ্যে নিশ্চয়ই থাকে, কিন্তু তার মধ্যে সম্পূর্ণ আমিটা নেই। যেখানে থাকি না, সেখানে কল্পনা আশ্রয় নেয়। এই কল্পনাশক্তিই সাহিত্য সৃষ্টির মূল রসায়ন। প্রায় প্রত্যেক সাহিত্যিকের লেখায় একটি করে ধ্রুব চরিত্র থাকে। যেমন শরৎচন্দ্রের লেখায় একটা বাউন্ডুলে চরিত্র, আমার লেখায় সেরকম না হলেও একটু পাগলাটে ধরনের চরিত্র থাকে, যে জীবন থেকে কিছুটা উদাসীন। অথচ লড়াই করে তাকে তার লক্ষ্যে পৌঁছতে হয়।

প্রত্যেককে শুরুটা করতে হয়, কাউকে না কাউকে অনুসরণ করে। আমার লেখাতেও শুরুর দিকে রস্টেল ও এলিয়টের খানিকটা প্রভাব ছিল। আবার কিছুটা বিভূতিভূষণ ও জীবনানন্দ দাশও ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে আমি সচেতনভাবেই এই প্রভাবগুলো কাটিয়ে উঠতে চেষ্টা করি। ছোটবেলায় বাড়িতে

শুকতারা, শিশুসাথী, শনিবারের চিঠি বা সচিত্র ভারত আসত। কিন্তু আমি যখন বয়ঃসন্ধি পেরোচ্ছি তখন দেশ পত্রিকা চলে এল আমার মানসিকতার খুব কাছাকাছি, বন্ধুর মতোই। মফসসলের রেল কলোনিতে তখন এই পত্রিকা আমার দূরের জানালা, কলকাতার বৌদ্ধিক জগতের সঙ্গে একমাত্র সাঁকো। মাঝেমধ্যে আমার কাঁচা কিছু লেখা এখানে-সেখানে পাঠিয়েছি, দেশ-ও তার মধ্যে ছিল। অন্য পত্রিকাগুলো সেসব ফেলেটেলে দিত। কিন্তু দেশ খামে ভরে ফেরত পাঠাত। পাছে আমি দুঃখ পাই, সেজন্য আমার স্নেহময়ী মা ফেরত আসা লেখা লুকিয়ে ফেলতেন। প্রথম লেখা প্রকাশিত হয়েছিল স্কুল ম্যাগাজিনে, কোচবিহারে মিশনারি স্কুলে ক্লাস টেনে পড়ার সময়। বিষয় ছিল দেশপ্রেম। তারপর দু'-একটা লেখা বেরোয় ওখানকার কাগজে। কলকাতার রূপাঞ্জলী বলে একটা সিনেমার কাগজেও লেখা বেরোয়। যখন এমএ পড়ি, তখন কয়েকজন বন্ধুর পাল্লায় পড়ে কাটা ঘুড়ির সুতো ধরার মতো মরিয়া চেষ্টায় আবার লিখতে বসি। কারণ, দেশ তখন নবীন লেখকদের গল্প ছাপছে। প্রতি সংখ্যাতেই নব্যরীতির গল্পের নানা চমক। বড় লোভ হয়েছিল। কিন্তু আমার প্রথম করাঘাতে দরজা খুলল না। গল্পটি ফেরত পেতে হল। দ্বিতীয় করাঘাতও ব্যর্থ। ভারি লজ্জার কথা। শেষবার আরেকটি গল্প লিখে ভাবলাম, এটাও যদি ফেরত হয় তাহলে আমার আর হওয়ার নয়। ওই শেষ চেষ্টাটি ফলবতী হয়েছিল। সেটা ১৯৫৯। বলতে গেলে ওটাই আমার প্রথম সিরিয়াস লেখার চেষ্টা।

গল্পের কাঠামো তৈরির জন্য যে রসদ, সেই রসদ বা উপকরণ আমি কখনও সচেতনভাবে সংগ্রহ করি না। আমার জীবনযাপন, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, সময়, প্রকৃতি, যে পৃথিবীতে বসবাস করছি, এমনকী পোকামাকড়-নানা ধরনের জীবজন্তু ইস্তক—এগুলোই আমাকে আমার উপন্যাসের রসদ হিসাবে সাহায্য করে। কোনও বিশেষ গল্প, উপন্যাসের জন্য আলাদা করে খড়কুটো সংগ্রহ করার কথা ভাবিনি কোনওদিন, আজও ভাবি না। কোনও প্ল্যান-প্রোগ্রাম করে আমি কখনও লিখতে বসি না। আমার নিজের কাছে লেখা একটা ধারাবাহিক পদ্ধতি। লেখার ক্ষেত্রে একসময় গল্প-উপন্যাস শেষ করতে হয় ঠিকই, কিন্তু আমার মনে হয়, সেই গল্পের কোনও শেষ নেই। তার পরেও প্রচুর গল্প-কাহিনি থেকে যায়। গল্প শুরুর আগে অনেক গল্প থেকে যায়। আসলে আমি আমার জীবনের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে জড়িয়ে থাকা নানাবিধ ঘটনাগুলিকে ক্রমশ ছোট ছোট আকারে প্রকাশ করে চলি। এককথায়, পরিপ্রেক্ষিত সেই অর্থে কিছু নেই।

আমার প্রথম উপন্যাস ঘুণপোকা। সাল ১৯৬৬। এই উপন্যাস লেখার আগেও আমার কোনও প্ল্যান ছিল না, তবে ভয় ছিল বিস্তর। যতই হোক, একটা বিরাট প্রেক্ষাপটে উপন্যাস লিখতে হয়। কী নিয়ে লিখব তা নিয়ে সংশয়, সন্দেহ, সঙ্কট ছিল। ওই সময় আমি নিজে মানসিকভাবে খুব বিপর্যস্ত ছিলাম। দেশ পত্রিকার সম্পাদক সাগরময় ঘোষের কাছ থেকে নির্দেশ পাই, আমাকে উপন্যাস লিখে জমা দিতে হবে। কিন্তু ঘুণপোকা উপন্যাসেও সেভাবে কোনও গল্প বা কাহিনি ছিল না। ছিল আমার শৈশব-কৈশোর, যৌবনের অভিজ্ঞতা। নায়কের চরিত্রকে ঘিরে কিছু টুকরো ঘটনা এসেছে ঠিকই, তবে সেগুলি অনেকটাই বিবরণমূলক। পারিপার্শ্বিকের যে রহস্যময়তা, যেগুলো আমাদের বোধের অগম্য, প্রকৃতির নানা ধরনের কর্মকাণ্ড দেখে যে প্রীতি তৈরি হয়, মুগ্ধতা আসে, আমরা বশীভূত হই—যেগুলোর সেই অর্থে কোনও যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা নেই, সেগুলোকেই তুলে আনি কলমের ডগায়। জীবনের অধিকাংশই আমাদের বোঝার বাইরে কোনও এক অলীক পৃথিবীর কথা। এই রহস্যময়তা আছে বলেই জীবন এত সুন্দর, মায়াময়, আকর্ষক।

কর্মজীবন শুরু করেছিলাম শিক্ষকতা দিয়ে। তারপর সাংবাদিকতার পাশাপাশি হাত ধরাধরি করে চলতে থাকে লেখক জীবন। শিক্ষকতা জীবনে স্কুলটা আমার বিন্দুমাত্র পছন্দের ছিল না। এমন একটা মাইনে পেতাম, যাতে মাসের তিনদিনের খরচাও কুলোত না। বাদবাকি খরচ আমাকে খুব কষ্ট করে রোজগার করতে হত। যখন লেখালিখি করে টাকা পেতে শুরু করলাম, তখন কিছুটা হলেও পরিবারে স্বচ্ছলতা আসে। এ প্রসঙ্গে বলব, মানুষের জীবনটা একটা অন্তহীন লড়াই। কিছু মানুষ নিশ্চিতভাবে রুপোর চামচ মুখে দিয়ে জন্মায়, তাদের জীবনে স্বাভাবিকভাবে অতটা 'সাফার' থাকে না। আমার ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রেই যেমন। কিন্তু আমার মধ্যে ছিল। আমি ছেলেকে বলি, তোকে সংগ্রাম করতে হয়নি বলে জীবনে অনেক কিছু

শিখিসনি। কিন্তু আমাকে জীবনে বেঁচে থাকতে অনেকটা লড়াই করতে হয়েছে। লোকচরিত্র বুঝতে হয়েছে। এই লড়াইটা মানুষের মানসিক গঠন অনেক বেশি মজবুত হয়। জীবনযুদ্ধে সে কখনও ভয় পায় না।

অন্যান্য সাহিত্যিকদের কাছে হয়তো সহজ, কিন্তু আমার কাছে লেখাটা বেশ কঠিন ব্যাপার বলে মনে হয়। তবুও আমার লেখা বহু-বিচিত্র পথে এগোয়। সায়েন্স ফিকশন থেকে ভূতের গল্প, ছোটবড় সকলের জন্য নানা ধরনের সিরিয়াস লেখাও আমি লিখতে ভালোবাসি। তবে কবিতা লেখার প্রতিভা আমার নেই। এত লিখেছি, কারণ লেখাটা আমার কাছে জীবনের অঙ্গ। আমার রুটি-রুজি। ফলে লেখাকে উপেক্ষা করতে পারি না। লেখা আমার কাছে কঠিন কারণ, চট করে আমি কিছু লিখতে পারি না। যদিও তেমনভাবে প্ল্যান-প্রোগ্রাম করে লিখতে বসি না। তবুও লেখার আগে বিষয়টাকে অধিগত করার চেষ্টা করি। লিখতে বসে তবেই পরের লাইনটা মাথায় আসে। তাছাড়া লিখতে হয় ম্যানুয়ালি। কম্পিউটার জানি না, ফলে একটা প্যারা লিখে সেটা ফেলে দিলাম বা কাটপেস্ট করে এদিক-ওদিক করলাম, তারও উপায় নেই। আর এই স্লো-রাইটার হওয়ার কারণে সম্পাদক প্রকাশকদের মুশকিলে পড়তে হয়।

ডাক্তারের ছেলে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ারের ছেলে ইঞ্জিনিয়ার হয়, কিন্তু লেখকের ছেলে লেখক হওয়ার প্রবণতা খুবই কম। আমার ছেলেমেয়েও তাই। ওরা বলে, বাড়িতে একজন লেখক থাকলেই ভালো। তাই তারা মৌলিক সৃষ্টির থেকে বেশ কিছুটা দূরে। বরং আমার স্ত্রী সোনামন গল্প-কবিতা লেখেন। কিছু পত্রপত্রিকায় প্রকাশিতও হয়েছে। একটি বইও রয়েছে।

জীবনের অনেকটা পথ পেরিয়ে এলাম। আত্মজীবনী লেখার কথা পাঠকেরা বলেন। আমার ছেলে এবং বউমাও খুব তাগিদা দেয়। দেখা যাক, লিখে উঠতে পারি কিনা! গভীর রাতে ঘুম ভেঙে গেলে জীবনের কত কথা ভিড় করে আসে মনের মধ্যে, কিন্তু সেগুলো আবার রাত ফুরোলে হারিয়ে যায়। যাই হোক, আত্মজীবনী লিখতে পারলে বোঝা যাবে, আমার জীবনে কত বর্ণময় ছেলেবেলা ছিল। কত জায়গায় ঘুরেছি, কত মানুষজন দেখেছি।

বই পড়তে পড়তে আমার লেখার ইচ্ছে, তবে লেখক হওয়ার কোনও বাসনা ছিল না। খেলাধূলা করতাম খুব। তবে বড় হওয়ার পরে বুঝতে পারি, আমি একটি অপদার্থ। কেরিয়ার বলে কিচ্ছু নেই। আগেই বলেছি, এমএ পড়ার সময় একটি লেখা দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ওটা বেরিয়েই আমার একধরনের সর্বনাশ হল অথবা বলা যায়, আশীর্বাদও হল। কোর্স শেষ করেও এমএ ফাইন্যাল পরীক্ষাটা দিলাম না। এতটাই লেখার নেশা পেয়ে বসল। বাবা খুব দুঃখ পেলেন। কারণ তিনি চেয়েছিলেন আমি অধ্যাপনা করি। কিন্তু আমি ভাগ্যবান, অধ্যাপনা করতে হয়নি বলে। অধ্যাপনা করলে হয়তো প্রথম জীবনে অতটা অর্থকষ্ট থাকত না, কিন্তু এই জীবনটাও পেতাম না। এখন অর্থকষ্ট নেই ঠিকই, কিন্তু তবুও আমি সুখের জীবনে অভ্যস্ত নই। গাড়ি থাকা সত্ত্বেও বাসে-ট্রামে-মেট্রোতে দিব্য একজন সাধারণ মানুষের মতো হাঁটি-চলি-ঘুরে বেড়াই। ব্যায়াম করি, বাজারহাট করি। কখনোই মনে হয় না, আমি একজন লেখক। এভাবেই আমি আমার চারদিকের চলমান জীবনের সঙ্গে যুক্ত থাকি। একজন পদাতিক হিসাবে ঘুরে বেড়াই, ঘুরতে ভালোবাসি, দেখতে ভালোবাসি। হাঁ করে রাস্তার ঝগড়া দেখি, দোকানে দোকানে ঘুরে জিনিসপত্র দেখি।

ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের জীবনদর্শনই আমার দর্শন। তাঁর মতো কমপ্লিট ফিলজফির মানুষ আমি দুটি দেখিনি। তিনি শুধু আমার গুরুদেব নন, পরমতম বন্ধু। ১৯৬৫ সালে আমি তাঁর দীক্ষা নিই। সেসময়ই আমার জীবনের ইতি ঘটে যাওয়ার কথা ছিল। একটা ভীষণরকম মানসিক সঙ্কটের মধ্যে পড়েছিলাম। তখনই আমি ঠাকুরের কাছে যাই। তাঁর প্রদর্শিত পথে নিজেকে গড়ে তোলার চেষ্টা করি। আমার যেটুকু হ্রী কিংবা ধী, সেই বোধবুদ্ধিতে ঠাকুরের সমতুল্য কেউ নেই। তাঁর দর্শন, অস্তি এবং বৃদ্ধি। মানুষের অস্তিত্ব আছে এবং বৃদ্ধি আসে। একজন মানুষ যে গুণাবলী নিয়ে আসে, সেই গুণের যদি ঠিকমতো বিকাশ ঘটে তাহলে সে কোথায় পৌঁছতে পারে তা ঠাকুর বাস্তবে পরীক্ষানিরীক্ষা করে দেখিয়েছেন। বেঁচে থাকো, বড় হও—এই যে ঠাকুরের আশীর্বাদ, তাঁর প্রাণের চাওয়া সকলের জন্য, এ কী কম কথা! তিনি বলতেন, মেরো না, মরো না, পারো

তো মৃত্যুকে অবলুপ্ত করো। পরিপূর্ণ জীবনমুখী এই দর্শনই তো আমাদের কাছে বেঁচে থাকার মূল মন্ত্র। মানুষের সবচেয়ে বড় আয়ুধ বা অস্ত্র। আমাদের সোনার কাঠি।

# সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়-এর আত্মপ্রকাশ

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে দেশ পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় আত্মপ্রকাশ উপন্যাসটি লেখেন। অনেকের ধারণা এটি তাঁর প্রথম উপন্যাস। কিন্তু আত্মপ্রকাশ-এর আগেই সুনীল একটি ক্ষুদ্রকার উপন্যাস লিখেছিলেন যুবকযুবতী। সেটি প্রকাশিত হয় উত্তর তরঙ্গ নামক একটি ছোটো পত্রিকায়। এ দুটি উপন্যাসই কিছুটা আত্মজীবনীমূলক এবং একই উপাদানে, প্রায় একই শৈলীকে আশ্রয় করে লেখা। তৎকালে সুনীল এবং তাঁর বন্ধুরা যেমন জীবনযাপন করেছিলেন, যে হতাশা, উদ্দেশ্যহীনতা, যেসব অনিয়ন্ত্রিত আচরণ তাঁদের অভ্যাসে পরিণত হচ্ছিল তারই আনুষ্ঠানিক বিবরণ। এই দুটি উপন্যাস পড়ে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম এই কারণে যে এভাবেও উপন্যাস লেখা যায়? প্রথাসিদ্ধ গল্পটল্প ছিল না। অনেকটা যেন রোজনামচার মতো করে লেখা। প্রভুত স্মার্ট-সংলাপের সন্নিবেশ এবং গদ্যের বুদ্ধিদীপ্ত উচ্ছলতা, পরবর্তীকালে অরণ্যের দিনরাত্রি উপন্যাসেও আবার এইসব কুশীলব এসেছেন এবং এই উপন্যাসেও অবধারিতভাবে সঞ্চারিত হয়েছে সুনীলের জীবনযাপনের কথা, তা বলে সুনীলের জীবনযাপনকে খুব অভিনব বলে ধরা যায় না। কারণ, যৌবনবয়সে, ওরকম ছন্নছাড়া জীবন আজও যুবসমাজের অনেকেই কাটান এবং তাঁদের কাটাতে হয়।

আত্মপ্রকাশ উত্তমপুরুষে লেখা এবং তার নায়ক বা কথকের নামও সুনীল। এই সৎসাহস সুনীলই অকপটে দেখাতে পারেন। নিজেকে নায়কোচিত চরিত্র না করে দলের একজন হিসেবে দোষে গুণে চিত্রিত করা খুব দুর্বল হৃদয়ের কাজ নয়। সৎসাহস সুনীলের বরাবরই ছিল। আবার দুর্বলতাও বড়ো কম ছিল না। তাঁর নায়িকারা বেশির ভাগই অনেকটা একরকম। এখনও সেই ছবিটা দেখতে পাচ্ছি বিশাল সিঁড়ির একেবারে ওপরের ধাপে ওই বালিকাটি দাঁড়িয়েছিল একটা সাদা ফ্রক পরা, হালকা শরীরের ঝকঝকে স্বাস্থ্য, আমি নীচ থেকে দেখছিলাম মেয়েটি ঘাড় ফিরিয়ে তলার মানুষদের দিকে তাকিয়ে ছিল।...ওই বয়স, ওই হাঁসের মতো শরীর, দেবীর মতো মুখের ডৌল, সাদা ধপধপে ফ্রক, ওর চোখের বিস্ময়—সব মিলিয়ে মনে হয়েছিল যেন একটি সরলতার স্থির মূর্তি, যার কাছে পৃথিবীর সব কিছুই সুন্দর...ইত্যাদি। পাঠকের কি কিছু মনে পড়ছে?

পড়ারই কথা। হুবহু একইরকম এক বিয়েবাড়িতে দান্তে জীবনে ওই একবারই বিয়াট্রিসকে দেখেছিলেন। ঠিক ওইরকম। সুনীল অবশ্য তাঁর যমুনাকে উপন্যাসে ফিরিয়ে এনেছেন।

আবার হাসপাতালে মৃত্যুশয্যায় শায়িত দাদামশাইকে দেখতে যাওয়ার ইচ্ছে এবং আলস্যবশত না যাওয়ার ঘটনাটির ভিতরে অবধারিত ছায়াপাত ঘটেছে সার্ত্র এবং কামুর। ওই বয়সের তখন ওইটেই ছিল প্রবণতা। আবার জোরালোভাবে তাতে ঢুকে পড়ছেন সুনীল নিজে, তাঁর বন্ধুবান্ধব, ছয় ও সাতের দশকের কলকাতা। তীব্র আশ্লেষ ও উদাসীনতা, দেহজ কামের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে রোমান্টিক ভালোবাসার অতিচারণ।

প্রতিবেদনের শুরুতে বলেছি, সুনীলের এই তিন উপন্যাসে প্রথাসিদ্ধ গল্প ছিল না। তার মানে এ নয় যে গল্পই ছিল না। বরং উলটো। প্রথাসিদ্ধ নয় বটে, কিন্তু জমজমাট, উত্তেজক এবং বেশ খানিকটা অভিনব ঘটনায় আত্মপ্রকাশ বিস্ময়করভাবে পাঠযোগ্য। আর এই পাঠযোগ্যতা সুনীলের পরবর্তীকালের সব গল্প উপন্যাসেই সঞ্চারিত হয়েছে।

# চলে গিয়েও সুনীল রয়ে গেল

*'এমনও তো হয় কোনোদিন*
*পৃথিবী বান্ধবহীন*
*তুমি যাও রেলব্রীজে একা—'*

যখন এ লেখা লিখছি, তখন সুনীল বড় একা হয়ে শুয়ে আছে ঠান্ডা ঘরে, পিস হাভেনে। ডোরবেল বাজিয়ে কেউ আসবে না আজ। সুনীল উঠে গিয়ে দরজা খুলে প্রসন্ন মুখে বলবে না, আরে, এসো এসো— !

বেড়াতে যেতে বড় ভালবাসত সুনীল। নতুন অচেনা কোনও জায়গায় যাওয়ার কথা শুনলেই উজ্জ্বল হয়ে উঠত চোখ। আজও সুনীল চলল নতুন এক দেশে। ওই তো সেতুটির মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। এপারে ব্যক্ত জীবন, ওপারে অজানা হিরন্ময় কুয়াশায় ঢাকা আবছায়া দেশ। সুনীল সেতুটি পেরিয়ে যাবে। ওই অচেনা মুলুক তার কেমন লাগবে কে জানে!

পৃথিবী বান্ধবহীন? সুনীলের পৃথিবী তো বান্ধবহীন ছিল না কখনও। বরং বড় বেশি বান্ধবে আকীর্ণ ছিল তার জগৎ। সকালে, বিকেলে, রাতে, দেশে, বিদেশে—সর্বত্রই সবসময়ে গিজগিজ করছে তার বন্ধু। বাঙালি, অবাঙালি সাহেব, চিনে, জাপানি। ভিভিআইপি থেকে গেঁয়ো কবি, চিত্রতারকা থেকে বরিষ্ঠ নেতা, পুলিশ বা কয়েদি, কে নয়?

বন্ধুবৈচিত্রে শক্তিও ছিল এক বিস্ময়। সুনীল তার চেয়েও কয়েক কদম এগিয়ে। বন্ধুদের জন্য দুয়ার অবারিত করে নিজের গার্হস্থ্যকেই যেন বৃহত্তর গণ্ডিতে নিয়ে ফেলেছিল সুনীল। বাইরে থেকে কত লোক এসে যে সুনীলের তিন ঘরের ফ্ল্যাটে আশ্রয় পেয়েছে, তার গোনাগুনতি নেই। সবসময়ই অতিথি-অভ্যাগতের সমাগম ঘটত বলে আমি সুনীলের বাড়িতে কদাচিৎ গিয়েছি। কখনও-সখনও বিশেষ প্রয়োজনে যখন যেতে হয়েছে, তখনই দেখতাম তার বাড়িতে কেউ না কেউ আছেই। বাংলাদেশের প্রখ্যাত গায়িকা, মরাঠি কবি, গুজরাতি চিত্র-সমালোচক বা কৃপণ কোনও আমেরিকান মেম! তারা সকলেই হয়তো সুনীলের প্রত্যক্ষ বন্ধু বা পরিচিতও নয়। কোনও বন্ধু বা চেনা লোকের সূত্র ধরে এসে হাজির হয়েছে। এইসব উটকো মানুষ আসে

এবং থাকে বলে কখনও সুনীল বা তার লক্ষ্মীমন্ত বউ স্বাতীকে অপ্রসন্ন হতে দেখিনি। একবার অবশ্য এক বায়নাদার মেমসাহেব মাসখানেকের ওপর থেকে নানা অন্যায্য আবদারে নাজেহাল করে ছেড়েছিল ওদের।

সুনীলের বন্ধু-বাৎসল্য ছিল কিংবদন্তির মতো। বন্ধুদের আবদার ফেলতে পারত না বলে নিজের জরুরি কাজ ফেলে তাদের সঙ্গ দিয়েছে, তাদের লেখা ছাপিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে, যখন ইচ্ছে নেই তখনও সুরাপান করেছে তাদের সঙ্গে বসে। প্রায় প্রতি রাতেই থাকত তার কোনও না-কোনও বন্ধুর বাড়িতে পানভোজনের নেমন্তন্ন। ফলে শুতে রাত হত। কিন্তু বিপুল যে ভালবাসা বন্ধুদের কাছে অর্জন করেছিল, তার দায় না মিটিয়েও পারত না সে।

যার দিন এইভাবে কাটে, সে তাহলে কখন লেখে? কখন পড়ে? কখন ভাবে?

এই বিস্ময়ের কথাটা আমি সুনীলের কাছে প্রায়ই ব্যক্ত করতাম। গত পঁচিশ বছরেরও বেশি সুনীল আর আমি 'দেশ' পত্রিকার দফতরে পাশাপাশিই বসি। কাজকর্মের চাপ তেমন ছিল না। আড্ডাই হত বেশি। বিরলে প্রায়ই আমি তাকে প্রশ্ন করতাম সুনীল লেখেন কখন?

সুনীল খুব হাসত। বলত, আপনার মতো আমি রাত জেগে লিখি না, আমি লিখি সকালে। তাও দু'-আড়াই ঘণ্টা মাত্র।

কিন্তু আমার বিস্ময় আর যায় না। সুনীল কবিতা লেখে, গল্প-উপন্যাস লেখে, প্রবন্ধ-নিবন্ধ-ফিচার লিখতে হয়। তার ওপর তার আগ্রাসী বই পড়ার স্বভাব। এ সবের জন্য যে সময়টা দরকার, সেটা কীভাবে সুনীল বের করে? মহাভারতের মতো বিশাল গ্রন্থও সে বহুবার পড়েছে। দেশ-বিদেশের সাহিত্য, এমনকী পুরাণ ইত্যাদিও তার দিব্যি পড়া ছিল।

আর শুধু আড্ডাই তো নয়। সুনীল সেন্সরশিপ বোর্ডের সদস্য হয়ে বিভিন্ন সিনেমা দেখত। চলচ্চিত্র প্রতিযোগিতার বিচারক হয়ে দিল্লি-মুম্বই যেত, সাহিত্য-সভায় তাকে যেতে হত ভারতের নানা প্রান্তে, প্রতি বছর তার বিদেশযাত্রা প্রায় নিয়মিত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মধ্যযৌবন থেকেই সুনীলের খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা তুঙ্গে উঠতে থাকে। ফলে ঘনঘন বিদেশের ডাক আসত। আর আমি সুনীলের সময়ের অঙ্ক মেলাতে বসে গলদঘর্ম হতাম। আমি অঙ্কে ভাল ছাত্র ছিলাম না ঠিকই, কিন্তু এই অঙ্কটা বোধহয় মেলানোর অঙ্কই নয়! এই ব্যস্তসমস্ত, আড্ডাবাজ, দিনে মাত্র আড়াই ঘণ্টার লেখকটিই কি লিখেছে 'সেই সময়', 'পূর্ব পশ্চিম', 'প্রথম আলো' সহ শতাধিক উপন্যাস? নাকি সুনীলের হয়ে ঈশ্বর লেখেন, যাঁকে সুনীল বিশ্বাস করে না।

তরুণ কবিদের প্রতি সুনীলের দুর্বলতা ও সমর্থন ছিল অনেকটা পিতৃপ্রতিম। পারলে সকলের কবিতাই সে ছেপে দেয়! এই বাৎসল্যের ফলে 'দেশ' পত্রিকায় কিছু-কিছু কাঁচা কবিতাও বেরিয়ে যেত। তাছাড়া সুনীলের 'কৃত্তিবাস' তো ছিলই, তরুণ কবিদের মুখপত্র। শক্তি আবার অকবিতা সহ্য করতে পারত না। মাঝে মাঝে সুনীলকে এসে বলত, এসব কী হচ্ছে সুনীল? কাদের কবিতা ছাপছ? সেই সময় শক্তির 'এত কবি কেন' নামে একটি বিস্ফোরক নিবন্ধও কোনও কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল।

একদিন সাগরদা আমাকে ডেকে বললেন, তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। সুনীল আর শক্তিকে মুখোমুখি বসিয়ে একটা বিতর্কের ব্যবস্থা করো। বেশ বড় লিখবে।

আমি ঘাবড়ে গিয়ে বললাম, দুই বন্ধুর ঝগড়া লাগাতে হবে সাগরদা? সেটা কি আমি পারব?

ওটা তোমাকেই করতে হবে।

অগত্যা।

শক্তি, সুনীল দু'জনেই রাজি হয়ে গেল। শর্ত ছিল একটাই। ভাল স্কচ খাওয়াতে হবে। সাগরদাকে বলতেই সেই ব্যবস্থাও হয়ে গেল!

সুনীলের দশতলার ফ্ল্যাটে আমরা তিনজন এক সন্ধেবেলায় বসলাম। স্কচের বোতল রইল আমার হেফাজতে। কারণ, প্রথম থেকেই সুরাপান শুরু হলে মজা মাটি হবে।

শক্তির ভিতরে কবিতা পাগল একটা সত্তা তো ছিলই। আমি তাকে কত অনায়াসে, কত অল্প সময়ে কত অনবদ্য কবিতা রচনা করতে দেখেছি, তার হিসেব নেই। ফলে সে খারাপ কবিতা একদম সহ্য করতে পারত না। সুনীলও কবিতা-সম্মোহিত মানুষ, কিন্তু তার প্রবল বাৎসল্য নিজের পক্ষপুটে অনেক কবিকে আশ্রয় দিতে চেয়েছিল।

বিতর্ক শুরু থেকেই জমজমাট। তবে সুনীল বারবার শক্তিকে সাবধান করছিল, শক্তি, শীর্ষেন্দু তোমাকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করছে। তুমি ওর ফাঁদে পা দিয়ো না।

কিন্তু কে শোনে কার কথা! নাম করে করে এক-একজন কবিকে নস্যাৎ করছিল শক্তি। ইচ্ছে ছিল নামগুলো বাদ দেব। কিন্তু সাগরদার কঠিন আদেশ, কিচ্ছু বাদ দেওয়া চলবে না।

সেই সাক্ষাৎকারে সুনীল কিছুটা রক্ষণাত্মক ছিল, কারণ, শক্তির অভিযোগ ছিল তার ওই স্নেহপ্রবণ প্রশ্রয়দাতার ভূমিকার বিরুদ্ধে।

'দেশ' পত্রিকার প্রচ্ছদকাহিনী হিসেবে আমাদের কার্টুন-সহ প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হওয়ায় এক তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। শক্তি-সুনীলের বিরুদ্ধে বিস্তর সভাও হয়েছিল। আমার ভূমিকা ছিল নিতান্তই নিরপেক্ষ প্রতিবেদকের, তবু আমাকেও যথেষ্ট গালমন্দ শুনতে হয়েছিল। অনেকের ধারণা ছিল আমিই নাটের গুরু!

'যুবক-যুবতীরা' বা 'আত্মপ্রকাশ'-এর মতো উপন্যাস সুনীল লিখেছিল ত্রিশ থেকে তেত্রিশ-চৌত্রিশ বছর বয়সের মধ্যে। দুটোই তার নিজের এবং বন্ধুদের লাগামছাড়া জীবনযাপনের কথা। তাদের ওই জীবনযাপন বাইরে থেকে বিচার করলে উচ্ছৃঙ্খলতা বলে মনে হতে পারে। কিন্তু ওই বয়সের প্রবণতাই হল প্রচলিত সিস্টেমের বিরুদ্ধাচরণ করা, নইলে নিজের অস্তিত্বকে অনুভব করা যায় না। সুনীল ও বন্ধুরা বহু বিপদে পড়েছে, পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে, গুন্ডার হাতে মার খেয়েছে, কিন্তু কখনও নালিশ করতে যায়নি, কাঁদুনিও গায়নি।

সুনীল নাস্তিক, সেটা ও নিজেই বহুবার বলেছে। কিন্তু ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় একদিন আমাকে বলেছিল, আমার মনে হয়, ইউনিভার্স ইজ ইন্টেলিজেন্ট।

সুনীল আর আমার মধ্যে কখনও তর্ক হত না। সুনীল তর্ক করতে ভালবাসত না। তবে মহাজগতের বুদ্ধিমত্তা নিয়ে যখন কথা বলছিলাম তখন বিশ্বসত্তার অস্তিত্বের কথা সুনীল সহজেই মেনে নিল। আমাকে প্রায়ই বলত, আমি ভাবছি এখন থেকে নিরামিষ খাব! মাঝেমাঝে এইসব ইচ্ছে ওর হত, সিগারেট ছেড়ে দেব, আজ ড্রিংক করব না, কিন্তু পেরে উঠত কই? বন্ধুরা মধুর জবরদস্তিতে ঠিক ধরিয়ে দিত।

সাহিত্যসভা বা অনুষ্ঠানে বাইরে গিয়ে অনেকবার সুনীল আর আমি এক ঘরে থেকেছি। সুনীলের ঘুম গাঢ়, আর প্রবল নাকের ডাক। এক একবার ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দিয়ে বলতাম, 'পাশ ফিরে শোও তো।' ও 'সরি' বলে পাশ ফিরে শুতো। আমি সকালে পুজো প্রার্থনা করতাম, সুনীল নীরবে দেখত। কখনও কোনও বেফাঁস মন্তব্য করত না। দু'বার সুনীলকে আমি দেওঘরের আশ্রমে নিয়ে গিয়েছি ঠাকুরের জন্মোৎসবে। সেখানে দু'বারই ভক্ত শ্রোতারা তার বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হয়েছেন।

মানুষ সুনীলকে যাঁরা জানেন, তাঁরাই খবর রাখেন, এই মানুষটির হৃদয়বত্তা কত গভীর ছিল। অর্থী প্রার্থীকে সে ফেরায়নি কোনওদিন। বেশ কয়েক বছর আগেও বেকার ছেলেদের অকাতরে জাহাজভাড়া আর এক হাজার টাকা করে দিয়েছিল আন্দামানে গিয়ে চাকরি বা কাজ করার জন্য। তখন আন্দামানে কাজের লোকের খুব চাহিদা ছিল। গাঁয়ের গরিব মেয়েদের সাহায্যার্থে খুলেছিল 'পথের পাঁচালী' নামে একটা সংস্থা, বনগাঁয়ে। কত মানুষকে যে গোপনে সাহায্য করেছে তার ইয়ত্তা নেই। বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও আমি তাই বারবার সুনীলকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতাম।

'দেশ' পত্রিকার দফতরে আমাদের ঘরে রোজই বিকেলের দিকে জমাটি আড্ডা বসত। শনিবারে সেই আড্ডা হত আরও জমজমাট। কত বিচিত্র বিষয়ে যে কথা হত, তা ভাবলে আজও অবাক হতে হয়।

দিব্যেন্দু, সিরাজ, পার্থ বসু, সিদ্ধার্থ ঘোষ, এমনতর অনেকেই জুটে যেত সেখানে।

সুনীলের কাছে মেয়েরা আসত বেশি। মহিলা-ভক্তের সংখ্যা তারই বেশি ছিল! সুনীল বিদেশে চলে গেলে মহিলা সমাগম হ্রাস পেত। একবার সুনীল আমেরিকা থেকে ফিরে অফিসে এসেছে। সেদিন প্রচুর মহিলা এসেছেন। জোরদার আড্ডা হচ্ছে। কে যেন এসে আমাকে জিজ্ঞেস করল, শীর্ষেন্দু, কেমন বুঝছেন। আমি কী যেন লিখছিলাম। মুখ না তুলেই বললাম, মীনগণ হীন হয়ে ছিল সরোবরে, এখন তাহারা সুখে জলক্রীড়া করে।

এতে পুরুষেরা হোঃ হোঃ হাসলেও মেয়েরা ভারী চটে গিয়েছিল আমার ওপর।

বরাবরই সুনীল মোটাসোটা। আমি আড়ালে তাকে তাই 'মোটকু' বলে উল্লেখ করতাম। সেই থেকে 'মোটকু' ডাকটা আনন্দবাজারে চালু হয়ে গিয়েছিল। সুনীল শুনে মৃদু-মৃদু হাসত।

একবার সুনীল রাজস্থানে বেড়াতে গিয়েছে। আমি অফিসে আড্ডায় বসে একদিন খুব সিরিয়াস মুখ করে বললাম, জানো, রাজস্থানের অনেকগুলো উটের পিঠের কুঁজ নেবে গেছে! সবাই উৎসুক হয়ে জিগ্যেস করল, কেন?

সুনীল উটগুলোর পিঠে চেপেছিল যে!

এই গল্পও সুনীল শুনেছে এবং বলেছে, শীর্ষেন্দুটা বেশ দুষ্টু আছে।

এইরকম দুষ্টুমি আমি প্রায়ই করতাম। সুনীলও আমার শুদ্ধাচার, নিরামিষ খাওয়া ইত্যাদি নিয়ে ঠাট্টা করত।

বিশেষ করে সুনীল, আমি আর দিব্যেন্দু ছিলাম খুবই ঘনিষ্ঠ। সুনীলের বৃহত্তর বান্ধববলয় থাকলেও এই তিনজনে অনেক অন্তরঙ্গ কথা হয়েছে দিনের পর দিন।

আড্ডায় প্রায়ই মুড়িমাখা খাওয়া হত। আমার জন্য আনা হত আলাদা করে পেঁয়াজ ছাড়া মুড়ি। এ নিয়ে সবাই ঠাট্টা করত, সুনীলও। আমাকে সুনীল প্রায়ই বলত, আমি সর্বভুক বলে আমার কত সুবিধে দেখুন। আমি যে-কোনও দেশে গিয়ে যা ইচ্ছে খেতে পারি। আর আপনাকে হয়তো কোথাও কোথাও উপোস করে থাকতে হবে।

মাঝেমাঝে বাইরে গেলে যে আমার উপোস করার মতো দুর্দশা হয়, তা সুনীল ভালই জানত। শিলংয়ে, গুয়াহাটিতে, আমেরিকার আটলান্টিক সিটিতে সেইসব ঘটনার সুনীল তো সাক্ষীও ছিল।

আবার দেখেছি আমার শুদ্ধাচারের প্রতি কত সতর্ক দৃষ্টি ছিল সুনীল আর স্বাতীর। আটাত্তরের বন্যায় সুনীলের গাড়িতে বাড়ি ফেরার সময় আমরা টিভোলি কোর্টের কাছে ফেঁসে গেলাম। বুকজল ভেঙে হাঁটতে-হাঁটতে গড়িয়াহাট পৌঁছলে সুনীল বলল, শীর্ষেন্দু, আপনার আর আজ যাদবপুরে যাওয়ার দরকার নেই, আমার বাড়িতে চলুন। রয়ে গেলাম। সেই রাতে ওঁরা স্বামী-স্ত্রী আর ধনঞ্জয় মিলে আমার স্বপাক খাওয়ার সুচারু বন্দোবস্ত করে দিল। তখন আর ঠাট্টা করেনি।

অফুরান প্রাণশক্তি ছিল বলে শরীরের তোয়াক্কা সুনীল কোনওদিন করেনি। মাঝে মাঝে নামমাত্র প্রাতঃভ্রমণ ছাড়া কোনও ব্যায়াম ছিল না তার। খাদ্য পানীয়ের ওপর ছিল না নিয়ন্ত্রণ। সুনীল অকুতোভয়। কিন্তু আমি ভয় পেতাম। সুনীলের ৭৫তম জন্মদিনের অনুষ্ঠানে গিয়ে মঞ্চে আমার পাশে বসা সুনীলের চেহারাটা দেখে আমার মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। সেদিন বক্তৃতায় সুনীলকে লক্ষ করেই বললাম, সুনীল, আপনাকে কিন্তু অনেকদিন বেঁচে থাকতে হবে। আর বেঁচে থাকার জন্য যা-যা করতে হয়, সবই আমাদের মুখ চেয়ে আপনি কিন্তু করবেন।

সুনীল ম্লান একটু হেসেছিল। হাত বাড়িয়ে হাতটা ধরেছিল আমার।

সেই হাতের স্পর্শটি যেন আজও আমার হাতে লেগে আছে। সুনীল কি এখন সত্যিই আমাদের নাগালের বাইরে? এক অচিনপুরের যাত্রী? সে তো আংশিক সত্য। সুনীলের অনেকটা চলে গেল ঠিকই, আবার কতটা যে রয়ে গেল! স্মৃতিতে, মননে, ধ্যানে, পাঠে। না থেকেও সুনীল অনেকদিন থেকে যাবে।

# সুনীল বিষয়ক

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রয়াত হয়েছেন বেশ কয়েকদিন হয়ে গেল। তাঁর অভাব ধীরে ধীরে সহনীয় হবে যাবে, অভ্যাসেও পরিণত হবে। এরকমই তো হয়ে থাকে, কারও জন্যই পৃথিবী থেমে থাকে না।

কৃত্তিবাসের জন্য এই লেখাটা লিখবার সময় আমার সুনীল সম্পর্কে অনেকগুলো অন্য কথা মনে আসছে। যেটা তাঁর লেখালিখি নিয়ে নয়, তাঁর জীবনযাপন নিয়ে। প্রথম যৌবনে সুনীলের অকিঞ্চন জীবনযাত্রা কায়ক্লেশে নির্বাহ হত, যেমনটা হত আমাদের প্রায় সকলেরই, বিভিন্ন সময়ে নিজের জীবনের এইসব কথা সুনীল বলেছেন যেমন, লিখেছেনও তেমন। 'যুবক যুবতীরা' বা 'আত্মপ্রকাশে' সেইসব কথা আছে, অনেক ছোটো গল্পেও আছে।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে দারিদ্র্যজনিত ক্লেশ বা তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম সুনীলের ক্ষেত্রে অতি দ্রুত শেষ হয়ে গিয়েছিল। হয়তো আমেরিকায় গিয়ে তার কিছু অর্থোপার্জন হয়েছিল এবং ফিরে এসে আনন্দবাজার পত্রিকায় চাকরি ও লেখার সূত্রেও আয়বৃদ্ধি ঘটে থাকবে। যাইহোক তেত্রিশ চৌত্রিশ বছর বয়সেই সুনীল নিজস্ব গাড়ির মালিক এবং সাউথ এন্ড পার্কের মতো অভিজাত পাড়ায় ফ্ল্যাট ভাড়া করে থাকেন। আমাদের মধ্যে সুনীলই বোধহয় সর্বাগ্রে বিয়ে করেন। গড়িয়াহাটের ফ্ল্যাটও ওই কাছাকাছি সময়ে কেনা হয়ে যায়। বলতে গেলে ছত্রিশ-সাঁইত্রিশ বয়সেই গাড়ি-বাড়ি-সন্তান ও কিংবদন্তীর মতো খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল সুনীলের। তার চেয়েও বড় কথা, এই সময়েই তাঁর বন্ধু ও সঙ্গী হয়ে উঠতে লাগল সরকারের বড় আমলা, পুলিশের বড় কর্তা, বড় ডাক্তার, নাটক-চলচ্চিত্রের অভিনেতা, শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবী এবং বিত্তবান অভিজাত মানুষেরা।

সত্যি কথা বলতে কি, সুনীলের আগে আর কোনও সাহিত্যকারই এত অল্প বয়সে এরকম যশপ্রতিষ্ঠা জনপ্রিয়তা ও প্রভাবপ্রতিপত্তির অধিকারী হননি।

সুনীলের এই অত্যাশ্চর্য উত্থান আমাদের বেশ খানিকটা হকচকিয়ে দিয়েছিল। নিজের সঙ্গে তুলনা করে দেখতে পাই সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ বছর বয়সে আমার আয় এত কম যে বাস ভাড়াটা নিয়েও ভাবতে হয়, বাড়ি

ভাড়া বাকি পড়ে যায় এবং নাম বললে বেশিরভাগ লোকই চিনতে পারে না। স্বামীর জনপ্রিয়তা যাচাই করতে আমার বউ একদিন গড়িয়াহাটের এক বইয়ের দোকানে গিয়ে আমার বই আছে কি না খোঁজ করেছিল। দোকানদার সপাটে বলে দিয়েছিল, না, ওঁর বই বিক্রি হয় না বলে আমরা রাখি না।

সত্তর-আশির সময়টায় সুনীলের অবস্থান ছিল সমাজের উচ্চতম স্তরে। আর তার ফলে বোহেমিয়ান পদচারী, এলোমেলো সুনীলকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

এত খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা পেলে যে কারও মাথা ঘুরে যাওয়ার কথা কিন্তু সুনীলের মাথাটি স্থির ছিল। কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন ও বুদ্ধিমান সুনীলকে এই বিপুল খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা একটুও টলাতে পারেনি। মানুষটা সেই একই ছিলেন বরাবর। কিন্তু একটি অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তন ঘটে গেল তাঁর জীবনযাত্রায়। সুনীলের জীবনে আভিজাত্যের অনুপ্রবেশ ঘটবার ফলেই আর সুনীলকে পদচারীর ভূমিকায় দেখা যেত না। বাস মিনিবাস ট্রাম বা লোকাল ট্রেনে আর চড়তে পারতেন না সুনীল। যেখানেই যেতেন, জেলা শহর বা গ্রাম গঞ্জে, তাঁকে ঘিরে ফেলত আমলা বা বিশিষ্টজনেরা। সুনীল সুন্দরবনে যাচ্ছেন তো স্পিডবোটের ব্যবস্থা হল, সঙ্গী হলেন বড় অফিসাররা, সঙ্গে গেল দামি খাসি, মুরগি ইত্যাদি। ফলে সুনীলের বয়স যখন চল্লিশ বা তার আশেপাশে, তখনই তাঁকে আভিজাত্যের গণ্ডীতে আবদ্ধ হয়ো যেতে হয়েছিল।

একথা মানতেই হবে যে, এইসময়েই সুনীলের লেখায় সমাজজীবনের প্রত্যক্ষ প্রভাব খানিকটা কমে গেল। লেখার জন্য সময় ও মন দেওয়াও কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কারণ সুনীলকে বারবার যেতে হত ট্যুরে, দেশে ও দেশের বাইরে। ছিল বিস্তর সামাজিক আমন্ত্রণ, সাহিত্যসভা, কবি সম্মেলন, নানা কমিটির বৈঠক, বন্ধুদের বাড়িতে আমন্ত্রণ।

সুনীলকে তখনই আমি নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা করতাম যে, ওইসব সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে নিজেকে তাঁর সরিয়ে আনা দরকার। কখনও কখনও সুনীলকে আমার বলতে ইচ্ছে করত, চলুন আজ আমার সঙ্গে মিনিবাসে উঠে গড়িয়াহাটে যাবেন। কিন্তু সুনীলকে দেখে বুঝতে পারতাম, ও পারবে না। গাড়ির সমস্যা হলে সুনীল অফিসেই আসত না। কিংবা জরুরি কাজ থাকলে ট্যাক্সি করে আসত। অর্থাৎ ওইরকম অভ্যাস থেকে আর বেরিয়ে আসা সম্ভবই ছিল না।

এইসব নিয়ে আমার একটু চিন্তা ছিল, একজন লেখক বা কবি যদি একটা বিশেষ গণ্ডীতে আটকে যায় এবং স্বাভাবিক আম জনতার জীবনযাপন না করে তাহলে তার লেখায় রসদের অভাব হবে। সুনীলেরও হয়েছিল, কিন্তু অসামান্য ট্যালেন্টের অধিকারী বলেই এই খামতি সে পূরণও করে নিয়েছিল। কিন্তু একা এবং কয়েকজন উপন্যাসে আমরা যে কনটেমপোরারি বা সমসময়ের সমাজকে পাই বা তখনকার উপন্যাসে, গল্প ও কবিতায় জীবনের যেসব আধুনিক জীবন সংকট চিত্রিত হয়েছিল তা ধীরে ধীরে অবসিত হচ্ছিল। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমি সুনীলকে তা বোঝানোর চেষ্টাও করতাম, সুনীল তা বুঝতেনও। কিন্তু কীভাবে ওই গণ্ডী ও বন্ধন থেকে বেরিয়ে আসা যায় তা খুঁজে পেতেন না।

খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা বিপদ এসে জোটে। তা হল চামচাবৃন্দ এবং তোষামোদকারী। এদের দরাজ সার্টিফিকেট অনেক সময়েই লেখক বা কবিকে নিজের সঠিক মূল্যায়নে বাধা দেয়। সুনীল দুর্বলহৃদয় মানুষ ছিলেন না, তোষামোদে ভেসে যাওয়ার মানসিকতাও ছিল না তাঁর। কিন্তু সব সময়েই এই ধরনের মানুষের সাহচর্য প্রার্থিত নয়।

আমরা যখন পাশাপাশি বসে অফিসে কাজ করতাম, তখন সুনীল কখনও কখনও আমাকে তাঁর কথা কিছু কিছু বলতেন। সেইসব ব্যাক্তিগত কথা থেকে আমি মানুষটাকে অনেকটা বুঝতে পারতাম। এটাও বুঝতে অসুবিধে হত না যে সুনীল খুব খোলা মনে সংস্কারমুক্ত হৃদয়ে পৃথিবীর ভালো-মন্দ গ্রহণ করতে পারেন। জীবনযাপনে সুনীলের সঙ্গে আমার আকাশ পাতাল তফাৎ। অনেক ব্যাপারে আমরা সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। তবু তাঁর মানসিক গঠনটি বুঝতে আমার অসুবিধে হত না। পরিচয় তো আর আজকের নয়! আমি যখন

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সেই বাইশ-তেইশ কি চব্বিশ বছয় বয়স থেকে। কাজেই আমি সুনীলকে মাঝে মাঝে একটু আধটু শাসনও করেছি।

সুনীল যখন অতীতের ইতিহাস নিয়ে উপন্যাস লিখতে শুরু করলেন তখন মনে হল এটি এক অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত। কারণ সুনীলের পক্ষে সমসময়ের সমাজজীবনে প্রবেশ করা এখন কঠিন। সেদিক দিয়ে ঐতিহাসিক উপন্যাসে সুনীল অনেকটা সাবলীল বোধ করতেন। আর হলও তাই। 'সেই সময়' উপন্যাসটি এক অসামান্য সময়ের দলিল হয়ে চিরকাল বেঁচে থাকবে। এরপর সুনীল এ ধরনের ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাসেই অধিক স্বাচ্ছন্দে বোধ করতেন। ভুলে গেলে চলবে না যে সুনীলের এসব লেখাই আর একজন শক্তিমান লেখককে প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছিল। তিনি অমিতাভ ঘোষ। অমিতাভ সুনীলকেই গুরু বলে মানেন।

কৃত্তিবাস পত্রিকার সঙ্গে আমার কোনওদিনই তেমন সম্পর্ক হয়নি। কিন্তু সুনীল অন্তত কয়েকবার আমাকে কৃত্তিবাসের জন্য লিখিয়ে নিয়েছিলেন। একবার কমলকুমার মজুমদারের ওপর লিখেছিলাম। আর সত্তরের গোড়ার দিকে কৃত্তিবাসের শারদ সংখ্যায় একটা উপন্যাস। সুনীল আমাকে বলেছিলেন, উপন্যাসের জন্য টাকা নয়, লেখকের বউকে গয়না দেওয়া হবে। শেষ পর্যন্ত গয়না ম্যানেজ করা যায়নি বলে টাকাই দেওয়া হয়েছিল এবং বেশ ভদ্রস্থ টাকা। মাঝে মাঝে সুনীলের উপরোধে গল্পও লিখেছি। কৃত্তিবাস শুধু একটি পত্রিকা তো নয় কয়েকজন শিষ্ট বান্ধবের এক মিলনগ্রন্থিও বটে। কৃত্তিবাসের প্রতি অনুরাগবশে তারাপদ রায় তাঁর একমাত্র সন্তান পুত্রটির নাম রেখেছিলেন কৃত্তিবাস।

# নিঃসঙ্গ সম্রাট

একজন উচ্চমানের চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট কী করে কলমে এতটাই সাবলীল—এটা আমার কাছে অবাক করা ঘটনা। বুদ্ধদেব আমার বন্ধুস্থানীয়। বহু গুণের নিধি। এক, তিনি উচ্চশিক্ষিত। দুই, প্রচণ্ড সুপুরুষ। তিন, নিপুণ শিকারি। চার, দক্ষ শিল্পী। পাঁচ, সু-গায়ক। বুদ্ধদেব যেখানেই হাত দিয়েছেন, সোনা ফলেছে। যদি কোনো একটা বিষয়ক ধরে থাকতেন, তাতেও সমান নাম করতেন। বুদ্ধদেব আসলে বিস্ময় প্রতিভা। অনেকেই হয়তো জানেন না, বুদ্ধদেবের বড়োমামা ছিলেন ছন্দের জাদুকর 'সুনির্মল বসু'। ওঁর মা-ও সাহিত্য নিয়ে চর্চা করতেন। বরং বাবা কোনোদিন লেখালিখি জগতের ধারপাশ মাড়ানিনি। সম্ভবত মায়ের দিক থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে বুদ্ধদেবের মধ্যে শিল্পকলা-র শিকড় চারিয়ে গেছে।

অনেকেই বলেন, বুদ্ধদেব মুখে সোনার চামচ নিয়ে জন্মেছেন। কষ্ট কাকে বলে জানেন না। বাবা উচ্চমানের চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। নিজের বড়ো ফার্ম ছিল। বসন্ত রায় রোডে মস্ত বাড়ি। বাবার আদেশে পরিবারের বড়ো ছেলে বুদ্ধকেও চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সি নিয়ে পড়তে হয়েছিল। পরে বাবার ব্যবসাও সামলেছেন দক্ষ হাতে। তারপরেও যে শিল্পসত্ত্বাকে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিলেন, এটাই বা পারে কয়জনা?

বুদ্ধদেব বৈচিত্র্যময়। জীবনকে ভালোবাসেন। কাছ থেকে না দেখলে তাঁর এই বৈচিত্র্যপ্রিয়তা বোঝানো মুশকিল। তাঁর চরিত্রে যেভাবে পরস্পর বিরোধী গুণের সমন্বয় ঘটেছে, সেসব দেখে পাঠককুল কিছুটা হলেও অনুভব করতে পারবেন তাঁকে। তবে মানুষটা যে যথেষ্ট খোলা মনের, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই কারও। তার সবচেয়ে ভালো উদাহরণ, যাঁর যেটা ভালো লাগত হয় চিঠিতে নয় সাক্ষাতে বুদ্ধদেব প্রশংসায় ভরিয়ে দিতেন মন থেকে। মানুষ ভীষণ স্বার্থপর। কাছের মানুষের প্রশংসাও করতে পারে না প্রাণখুলে। সেখানে বুদ্ধদেবের এই প্রশংসা করার ভঙ্গি তাঁকে ব্যতিক্রমী করেছে।

বুদ্ধদেবের গান আমার একাধিক ভালোলাগার একটা। রবীন্দ্রসঙ্গীত, পুরাতনী, টপ্পা, সব ধরনের গান তাঁর গলায় ভারি মিষ্টি শোনায়। শুধু গানের জন্যেই ভদ্রলোকের অসংখ্য মহিলা ভক্ত। অবশ্য এমনিতেই সাহিত্যিক-লেখকরা কলমের জোরে মহিলা-মহলে বিশেষ পাত্তা পেয়ে থাকেন বরাবর। সেখানে বুদ্ধদেবের মতো একাধিক গুণের মানুষ মহিলা পরিবৃত হয়ে থাকবেন, এটা আর আশ্চর্যের কী? তবে ঋতুর জায়গা বুদ্ধদেবের কাছে আলাদা ছিল। ঋতুকে বড্ড ভালোবাসতেন বুদ্ধ। শুনেছি, আজও ওঁর ঘরবাড়ি তেমনটাই রয়েছে, যেমনটা ঋতু সাজিয়ে রেখে গিয়েছিলেন। খুব স্ট্রং ছিল ওঁদের বন্ডিং।

তবে একটা ব্যাপার বড়ো অবাক করে আমায়। আনন্দ পুরস্কার ছাড়া কেন আর কোনো স্বীকৃতি পেলেন না বুদ্ধদেব? একটা সরকারি স্বীকৃতি বা অ্যাকাডেমি পুরস্কার তো প্রাপ্যই ছিল ওঁর। তবে এটাও ঠিক,

আশাপূর্ণা দেবী কোনো অ্যাকাডেমি পুরস্কার না পেয়েই জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পেয়েছিলেন। পুরস্কার পেতে গেলে আরও কিছু বিশেষ গুণ থাকা দরকার কী?

অনেকেই বুদ্ধদেবের লেখায় রোমান্সের প্রাবল্য পান। এর জন্য নারী নিয়ে তাঁর পক্ষপাতিত্বকেই কাঠগড়ায় তুলেছেন বেশিরভাগ মানুষ। একটা কথা তাঁদের জানা দরকার, লেখায় লেখক চাইলে একাধিক নারী-সংসর্গ করতে পারেন। তার মানেই এটা নয়, তিনি নারী-শিকারি। লেখায় নিজেকে এভাবে প্রকাশ করাটা কিন্তু লেখকেরই মুনশিয়ানা। আমি তো বুদ্ধদেবের লেখার প্রতি ছত্রে এক অদ্ভুত মজার প্রলেপ দেখেছি। জীবনকে ভালো না বাসলে এমন মজা করা যায় না।

আশপাশের কাছের মানুষগুলো যদি আগেভাগেই পাড়ি জমান, তাহলে ৮০ পেরোলেই নাকি অনেকেই একা হয়ে পড়েন। এর জন্য পারিবারিক পরিকাঠামোও অনুঘটকের কাজ করে। বুদ্ধদেবের দুই মেয়েই কলকাতার বাইরে কর্মরত। তবু ফাঁক পেলেই দেখে যান বাবাকে। অনেকের মুখেই শুনি, আজকাল নাকি নিঃসঙ্গতায় ভুগছেন জীবনপিয়াসী বুদ্ধদেব। বসন্ত রায় রোডের যৌথ পরিবারে ফিরে গেলে এমনটা ঘটত না হয়তো। তবে আমার বিশ্বাস, মানুষটার মনের জোর ভীষণ। বুদ্ধদেব বরাবর অকুতোভয়। আমার যতদূর ধারণা, দুর্গতিকে দুর্গ বানিয়ে তাতেই আয়াস করে বাস করতে পারেন। তাই আপাত একাকিত্বকে হয়তো তারিয়ে তারিয়েই উপভোগ করছেন জীবনপুরের এই পথিক।

# শূন্যতা আজও টের পাই

জীবনে যে-কয়েকজন রাশভারী মানুষ দেখেছি, তার মধ্যে সাগরময় ঘোষকে ধরাই যায়। কিন্তু মুশকিল হল, আপাতদৃষ্টিতে রাশভারী মনে হলেও সাগরদার অবরোধ ভেদ করে একটু ঘনিষ্ঠ হলেই তাঁর অন্য চেহারা, যেমন রসিক তেমনই আড্ডাবাজ।

সেই উনিশশো ঊনষাট-ষাট সালে আমরা কলেজ পড়ুয়া ছোকরা বই তো নয়। আমার বাইশ-তেইশ বছর বয়সে প্রথম গল্প বেরোয় দেশ পত্রিকায়। লেখার সূত্রে মাঝে মাঝে দেশ পত্রিকার দফতরে যেতে হত। বিমল করের সঙ্গে সামান্য আলাপ হয়েছে মাত্র। তিনিও গম্ভীর মানুষ। আর আমি নেহাত মুখচোরা, আনস্মার্ট, লাজুক এবং ভিতু। তখন একটাই ঘর এবং কোনও পার্টিশন ছিল না দেশ পত্রিকায় অফিসে। এক কোণে সাগরদা একটা বড় টেবিলের পিছনে চেয়ারে বসে সবসময়ে কিছু না কিছু পড়তেন। বেশির ভাগই জমা দেওয়া উপন্যাস বা অন্য কোনও রচনা। আমরা গেলে চোখ তুলে তাকাতেনও না। আমিও চোরাচোখে এক-আধবার তাকিয়েছি। কথা বলার কারণও ছিল না, সাহসও হয়নি।

এক বছরের মধ্যেই দেশ-এ আমার বেশ কয়েকটা গল্প প্রকাশ পেল। বিমলদার সঙ্গে খানিকটা ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেল। এমনকী কলেজ স্ট্রিট মার্কেটে তাঁর বৈকালিক আড্ডায় হাজিরাও দিতাম নিয়মিত। তখনও সাগরদার সঙ্গে বাক্যবিনিময় হয়নি।

সাগরদার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল একটা ঘটনার ভিতর দিয়ে। আমার তখন হঠাৎ খুব টাকার দরকার। তখন পঞ্চাশ টাকা মানে অনেক টাকা। দেশ পত্রিকায় আমার একটা গল্প বেরিয়েছে। সেই বাবদে টাকা পাওনা আছে। কিন্তু স্বাভাবিক নিয়মে টাকাটা পেতে আরও খানিকটা দেরি হবে। আমি বিমলদাকে গিয়ে বললাম, গল্পের টাকাটা যদি একটু আগে পাওয়া যায়। বিমলদা বললেন, সাগরদাকে ধরো, ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আমি সভয়ে পিছিয়ে এলাম, ওরে বাবাঃ, সে আমি পারব না।

তখন বিমলদা আমাকে অভয় দিয়ে নিজেই সাগরদার কাছে নিয়ে গেলেন। পরিচয় দিতে হল না, সাগরদা উজ্জ্বল একটা হাসি হেসে সস্নেহে বসতে বললেন। তারপর আমার পরিবার পরিজন সম্পর্কে খোঁজখবর নিলেন। খুব সংকোচের সঙ্গে আমার সমস্যার কথা বলতেই, উনি সঙ্গে সঙ্গে ক্যাশে ফোন করে ব্যবস্থা করে দিলেন। একটু বাদে ক্যাশ থেকে লোক এসে টাকা দিয়ে গেল।

এরপর থেকে মাঝে মাঝে সাগরদার কাছে গিয়ে বসেছি, বুঝতে পারতাম তিনি আমার লেখা পছন্দ করেন। একদিন বললেন, মাস্টারি করার কী দরকার! লেখকদের তো আনন্দবাজারই চাকরি দেয়।

জবাবে কিছুই বলতে পারিনি। পাছে উমেদারির মতো শোনায়।

এটা বোধহয় বাষট্টি-তেষট্টি সালের কথা, সে-সময়ে আনন্দবাজার পত্রিকায় একটা চাকরি পেলে আমার জীবনটাই পাল্টে যেতে পারত। কিন্তু সংকোচে, লজ্জায় সাগরদাকে একটা ইতিবাচক জবাব অবধি দিতে পারিনি। সাগরদা বোধহয় ধরে নিলেন যে, আমার চাকরিটাতে আগ্রহ নেই। ফলে পরের কয়েকবছর আমাকে দুর্বিষহ আর্থিক কষ্ট এবং তীব্র সংকটের মধ্যে কাটাতে হয়েছে। স্কুলের যে-চাকরি করতাম তার কোনও বেতনকাঠামো ছিল না, স্কুলটিও ছিল অতি নিম্নমানের। যা বেতন পেতাম তা দিয়ে গ্রাসাচ্ছাদন দূরের কথা, মাসের দশটা দিনও চলত না।

ঈশ্বর যা করেন তা মঙ্গলের জন্যই করেন। হয়তো ওই কষ্ট ও কৃচ্ছ্রসাধনেরও কিছু প্রয়োজন ছিল আমার জীবনে। ঘাতসহ ও শক্তপোক্ত হওয়া এবং দারিদ্রের প্রভূত চেহারাটা চেনারও দরকার ছিল। কিন্তু সাগরদা যে আমার জন্য কিছু করতে চেয়েছিলেন, সে কথাটা ভোলবার নয়।

শান্তিনিকেতনের মানুষ বলে রবীন্দ্রপ্রীতি ছিল তাঁর মজ্জাগত। কিন্তু রবীন্দ্র প্রসঙ্গে কখনও তাঁকে বাড়াবাড়ি করতে শুনিনি। মাঝে-মধ্যে তাঁর ঘরে গেলে অনেক স্মৃতিচারণ করতেন। ইস্টবেঙ্গলের মস্ত সমর্থক ছিলেন। ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের ম্যাচ দেখতে শান্তিনিকেতন থেকে বেশ কয়েকবার সাইকেল চালিয়ে কলকাতায় এসেছিলেন। অসাধারণ রবীন্দ্রসংগীত গাইতে পারতেন বলে লোকমুখে শুনেছি। কিন্তু অজ্ঞাতকারণে স্বেচ্ছায় গান গাওয়া ছেড়ে দেন। তা নিয়ে কখনও কোনও আক্ষেপ করতেও শুনিনি তাঁকে।

উনিশশো সাতষট্টিতে শারদীয় দেশ-এ আমার প্রথম উপন্যাস 'ঘুণপোকা' বেরোয়। দেশ পত্রিকায় গল্প লেখা শুরু করার আট বছর পর। কিন্তু বছরের প্রথম দিকে সাগরদা যখন আমাকে ডেকে উপন্যাস লেখার প্রস্তাব দিলেন, তখন সেটা দিলেন একটু অদ্ভুতভাবে। আমাকে তাঁর ঘরে ডেকে নিয়ে বললেন, এবার শারদীয়ায় তুমি বা বরেন যে-কেউ একজন উপন্যাস লিখবে। কে লিখবে তা তোমরা দু'জনে আলোচনা করে ঠিক করো।

প্রস্তাবটা আমার মোটেই মনঃপূত হল না। একে তো বরেন আমার ভীষণ ভাল বন্ধু এবং সিনিয়র লেখক। অসামান্য কিছু গল্প আর গোটা দুই উপন্যাস লিখে তার তখন বেশ খ্যাতি। তার সঙ্গে আমার এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা মোটেই অভিপ্রেত নয়। সাগরদা যে দু'জনের কাউকেই অগ্রাধিকার দেননি, তাতে তাঁর পক্ষপাতশূন্যতা হয়তো প্রকাশ পেল, কিন্তু আমি পড়লাম মুশকিলে। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত বরেন রাজি হল না, তার একটা পারিবারিক সংকট চলছিল বলে। আমিও লিখব না বলে ঠিক করেছিলাম, কারণ আমারও একটা সংকটের সময় যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত বরেনই আমাকে রাজি করায়।

আনন্দবাজার পত্রিকায় স্বত্বাধিকারী এবং সম্পাদক অশোককুমার সরকারের বন্ধু ছিলেন সাগরদা। শুনেছি স্বদেশি আন্দোলনে তারা একসঙ্গে জেলও খেটেছেন। সাগরদাকে দেশ পত্রিকার সম্পাদক করে নিয়ে আসেন অশোকবাবুই। তাঁর নির্বাচন যে ভুল ছিল না, তা পরবর্তী পঞ্চাশ বছরে সাগরদা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছেন। একটি সদ্যোজাত পত্রিকাকে তিনি ধীরে ধীরে বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য পত্রিকায় উন্নীত করে দেন। আর কত যে প্রতিভাবান সাহিত্যিককে তিনি আবিষ্কার করেছেন, তা-ও কারও অজানা নয়। বিমল মিত্র, সৈয়দ মুজতবা আলী, বিমল কর, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী এবং আরও অনেকে।

দেশ পত্রিকা যখন জনপ্রিয়তার শিখরে তখন সাগরদা স্থির করেন নতুন লেখকদের তুলে ধরা দরকার। এ কাজের ভার দেন বিমল করকে। ফলে ছয়ের দশকে একসঙ্গে এক ঝাঁক নতুন গল্পকারের আবির্ভাব ঘটল দেশ পত্রিকায়। সংখ্যায় তখন ছিল জনাকুড়ি। শেষ পর্যন্ত সকলেই টিকে থাকতে পারেননি। কিন্তু বেশ কয়েকজন পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠা পান।

সাগরদার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর বুঝতে পেরেছি, দেশ পত্রিকা হল ওঁর ধ্যান এবং জ্ঞান। আমি একবার ওঁকে বলেছিলাম, আপনি বোধহয় আপনার ছেলেমেয়ের চেয়েও দেশ পত্রিকাকে বেশি ভালবাসেন, শুনে উনি খুব হেসেছিলেন। নিজে ভাল গান গাইতেন, চমৎকার লিখতেন। কিন্তু দেশ-এর সম্পাদক হওয়ার

পর প্রায় সবই বন্ধ করে দেন। নিজের সম্পাদিত পত্রিকায় লিখতে সংকোচ বা দ্বিধা ছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু লেখক হওয়ার চেষ্টাই তাঁর ছিল না, দু'চারটে মাত্র বই প্রকাশিত হয়েছিল।

একবার সাগরদার ঘরে ঢুকেছি কী একটা কাজে। দেখি একজন প্রবীণ লেখক বসে আছেন। সাগরদা কথা প্রসঙ্গে হাসতে হাসতেই তাঁকে বললেন, এবার আপনারা বিশ্রাম নিন, তরুণ লেখকদের জন্য জায়গা ছেড়ে দিতে হবে না? অর্থাৎ দেশ পত্রিকার স্বার্থে যখন নির্মম হওয়া দরকার তখন সাগরদা তা অনায়াসে হতেন। একবার এক রাজনৈতিক প্রভাবশালী নেতার উপন্যাস দেশ-এ ছাপানোর জন্য দেওয়া হয়। তারপর শুরু হয় নানাদিক থেকে প্রভাব খাটানো এবং চাপ সৃষ্টি করা। প্রায় সময়েই কিছু ক্যাডার ছেলে-ছোকরা এসে সোজা সাগরদার ঘরে ঢুকে জিগ্যেস করত, অমুকদার উপন্যাসটা কবে বেরোচ্ছে সাগরদা? অন্য কেউ হলে চাপ সামলে নিতে পারত কিনা জানি না। কিন্তু সাগরদা অকুতোভয়ে জানিয়ে দিলেন, সেই উপন্যাস তিনি কিছুতেই ছাপবেন না। অবশ্য সেটা ছাপানোর উপযুক্তও ছিল না। এরকম সাহসিকতা তাঁর বহুবার দেখেছি।

উনিশশো ছিয়াত্তর সালে আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে আমার কাছে আহ্বান এল। আমি সাংবাদিকতার কাজে যোগ দিই। কয়েক বছর সাব-এডিটর হিসেবে আমি এক অতি উপভোগ্য কর্মে নিরত ছিলাম। সাংবাদিকতার অমূল্য অভিজ্ঞতা আমার চিন্তা ও মানসিকতায় বিশাল পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। তারপর আমার পদোন্নতি ঘটিয়ে সহকারী সম্পাদক হিসেবে দেশ পত্রিকায় পাঠানো হয়। একেবারে সাগরদার প্রত্যক্ষ খবরদারিতে। লেখা নিয়ে আমার গড়িমসি, কালক্ষেপ এবং দীর্ঘসূত্রতা নিয়ে সাগরদার অসন্তোষ বহু দিনের। কিন্তু আমি নাগালের মধ্যে ছিলাম না বলে সাগরদা বিশেষ তর্জন-গর্জন করতে পারতেন না। এবার কাছে পেয়ে খুব খুশি। হেসে বললেন, এবার আর ফাঁকি টাকি চলবে না, বুঝেছ?

সাগরদাকে সবাই সমীহ করতেন বটে, কিন্তু আমি দেখতাম, ব্যক্তিগত আলাপচারিতার ক্ষেত্রে তিনি অনেক মজার অভিজ্ঞতা শোনাতেন। আমি মাঝে মাঝে তাঁর ঘরে গেলে পাঠ থামিয়ে আমার সঙ্গে অনেক গল্প করতেন। পড়াশুনোর সূত্রে আমি কিছুদিন কোচবিহারে ছিলাম বলেই অমিয়ভূষণ মজুমদারকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতাম। একবার কী একটা অনুষ্ঠানে কোচবিহার গিয়ে অমিয়দার সঙ্গে লেখালেখি নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছিল। ঘটনাটা সাগরদা জানতে পেরে আমাকে ডেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অমিয়ভূষণ সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন করলেন। এবং এমন কথাও জিগ্যেস করলেন যে, দেশ পত্রিকায় লিখতে বললে অমিয়ভূষণ রাজি হবেন কিনা। আমি বললাম, ওঁর হয়তো দেশ পত্রিকার ওপর একটা অভিমান ছিল। সেটা এখন নেই। আমি হয়তো রাজি করাতে পারি।

পরে অবশ্য এ ব্যাপারটা আর এগোয়নি।

সাগরদা আমাকে অনেকগুলো দায়িত্ব দিয়েছিলেন। প্রবন্ধ, রম্যরচনা, ভ্রমণকাহিনি। মাঝে মাঝে আমাদের কয়েকজনকে ঘরে ডেকে মিটিং করতেন, দেশ পত্রিকায় কীভাবে নতুনত্ব আনা যায়। সাগ্রহে শুনতেন, পরামর্শ গ্রহণও করতেন। পুরনো ধ্যান-ধারণায় আটকে থাকার লোক ছিলেন না তিনি। আর সবচেয়ে বড় কথা, আধুনিক গল্প আর কবিতা দুইয়েরই তিনি সমঝদার ছিলেন।

একবার সাগরদা আমাকে ডেকে একটা বেশ দীর্ঘ ভ্রমণকাহিনি ধরিয়ে দিয়ে বললেন, ম্যানুস্ক্রিপ্টে অনেক গন্ডগোল আছে। কিন্তু উপায় নেই, লেখাটা ছাপতেই হবে। তুমি ভাল করে পড়ে কারেকশন করে দাও।

সেই হাতে লেখা ম্যানুস্ক্রিপ্ট পড়তে গিয়ে আমার চক্ষু চড়কগাছ। বানানের মা-বাপ নেই, বাক্য গঠনে ভুল, বাংলায় ভুল। অথচ লেখক একজন সাংবাদিক। বাংলা পত্রিকাতেই কাজ করেন। এত ভুল শোধরাতে গেলে গোটা ভ্রমণকাহিনি নতুন করে আমাকেই লিখতে হয়। আমি সেই সাংবাদিককে ডাকিয়ে এনে সবিনয়ে বললাম, প্রাথমিক সংশোধনটা আপনিই করে দিন। ঘষামাজা আমি করে দেব।

তিনি কাঁচুমাচু হয়ে হাতজোড় করে বললেন, আমার দ্বারা এর বেশি হবে না দাদা। যা করার আপনিই করে দিন।

প্রচুর খেটেখুটে লেখাটাকে দাঁড় করাতে হয়েছিল। কিন্তু কেন লেখাটি ছাপাতে হবে, তা বোধগম্য হচ্ছিল না প্রথমে। পরে বুঝতে পারি, পূর্ব ইউরোপের এমন একটি দেশে সাংবাদিকমশাই গিয়েছিলেন, যে-দেশ সম্পর্কে তেমন কিছু জানা ছিল না এতদিন।

এইরকমই একটা লেখা ছিল ইরাক নিয়ে। আনকোরা লেখিকার লেখা। সাগরদা আমাকেই তার ভার দেন। লেখাটা খারাপ নয়, কিন্তু মাঝে মাঝে কিছু বিস্ফোরক মন্তব্য এবং বিপজ্জনক পর্যবেক্ষণ ছিল। সেগুলো না কাটছাঁট করলে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হতে পারত। এই লেখাটিও ইরাকের অজানা অভ্যন্তরকে অনেকটাই উন্মোচিত করেছিল।

এঁদের লেখা পরে আর কখনও ছাপা হয়নি। কারণ কার কাছ থেকে কতটা আদায় করা যাবে, এটা সাগরদা ভালই বুঝতেন।

সাগরদাকে ঘিরে বিতর্কও কম ছিল না। লেখক বা লেখা নির্বাচনে তাঁর ছিল প্রবল উন্নাসিকতা। পছন্দ অপছন্দের ব্যাপারটাও ছিল তীব্র। তাতে খুব স্বাভাবিক কারণেই অনেকে হতাশ হতেন।

এই উন্নাসিকতার ফলে আমার মনে হয়, কয়েকজন লেখকের প্রতি হয়তো অবিচার হয়েছে। আমি নিজে একবার আমার এক লেখক বন্ধুর জন্য তাঁর কাছে দরবার করি। সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলেন না বটে, কিন্তু মিষ্টি করে হেসে এমন কিছু কথা বললেন যে, আমাকে নিরস্ত হতে হল।

আশি বছর বয়স পেরিয়েও সাগরদা নিয়মিত দফতরে আসতেন। আর্থারাইটিস-এ তাঁর কোমর বেঁকে সামনের দিকে শরীরটা ঝুঁকে থাকত। নিশ্চয়ই কষ্ট হত। কিন্তু দেশ দফতরে না এসে তিনি সোয়াস্তি পেতেন না।

অবশ্য শেষ অবধি শরীর আর দিত না বলেই তাঁর আসা-যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। একদিন দেহের নির্মোক ছেড়ে চলেও গেলেন। দেখতে দেখতে তাঁর শতবার্ষিকীর বছর এসে গেল। কিন্তু শূন্যতাটা আমরা অনেকেই আজও টের পাই।

# লম্বা রেসের ঘোড়া

সমরেশ, আমি দু-জনেই উত্তরবঙ্গের বাসিন্দা। দেশভাগের পর আমরা চলে আসি শিলিগুড়িতে। সমরেশের বাবা চলে যান জলপাইগুড়ি জেলার ডুয়ার্সে। ছোটোবেলা চা-বাগান অঞ্চলে কাটানোর ফলে উত্তরবঙ্গের প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং পটভূমি সমরেশের সাহিত্য জীবনে এবং মানসিক গঠনে অনেকটাই ছাপ ফেলেছে। আমি যখন কলকাতায় পড়াশোনার পাশাপাশি লেখালিখির কাজ করছি সেই সময় সমরেশ আমাদের বোর্ডিংয়ে ওর এক বন্ধুর কাছে আসত। সেখানেই ওর সঙ্গে প্রথম পরিচয়। প্রথম দেখায় আমি ওকে একজন ডাকাবুকো, খুব চালাকচতুর, সুপুরুষ এবং স্মার্ট একটি ছেলে ভেবেছিলাম। যতদূর মনে আছে, সমরেশ তখন নাটক করত। মঞ্চে অভিনয় ওর কাছে তখন চূড়ান্ত প্যাশন। এর বেশ কিছুদিন পর দেশ পত্রিকায় সমরেশের গল্প প্রকাশিত হয়। ওর লেখা পড়ে একটা কথাই মনে হয়েছিল, সমরেশ অত্যন্ত শক্তিমান কথাশিল্পী।

সমরেশ অনেক পরে লেখালেখি শুরু করেও সাহিত্যের আকাশে খুব দ্রুত উঠে এসেছে। লিখতে শুরু করার কিছুদিনের মধ্যেই তার ধারাবাহিক উপন্যাস দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। এবং প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সেই ধারাবাহিক দুর্লভ জনপ্রিয়তা লাভ করে। সেই জনপ্রিয়তা কিন্তু পাঠককে তোষণ করে আসেনি। এসেছে তার বিরল গদ্য এবং কাহিনি বয়নের বিরল দক্ষতার ভিতর দিয়ে।

সমরেশের ডাকনাম বাবলু। আমি এখনো তাকে বাবলু বলেই ডাকি।

অনিমেষ ও অর্ককে নিয়ে তার ট্রিলজি 'উত্তরাধিকার-কালবেলা-কালপুরুষ' ইতিমধ্যেই ধ্রুপদী সাহিত্যের মর্যাদা অর্জন করেছে। সমরেশ আমার মতে একজন অত্যন্ত সংবেদনশীল লেখক। অনেকেরই হয়তো মনে নেই, নাটকের প্রতি ভালোবাসা থেকেই সমরেশ পরবর্তীকালে সিনেমা বা সিরিয়ালের জন্য কলম ধরেছিল। এবং এখানেও সে অত্যন্ত সফল।

আমি তার রচনা বা বই ধরে আলোচনায় যেতে রাজি নই। কারণ, সমসাময়িক কালের লেখকদের প্রকৃত মূল্যায়ন করা যে কারোর পক্ষেই অত্যন্ত কঠিন। সমরেশ যা লিখেছে, তা বাঙালি বহুকাল ধরেই পড়বে। এটা আমার বিশ্বাস। আর আমি এখনো দেখি, সমরেশের মধ্যে একজন ছটফটে যুবক জেগে আছে, যার বয়স হয় না, যার মন বুড়িয়ে যায় না। এক অদ্ভুত প্রাণচঞ্চলতা তাকে এখনো সজীব রেখেছে। যদিও এখন আর সমরেশের আগের সেই কালো কুচকুচে, কোঁকড়া চুলগুলো নেই। সেই ছিপছিপে সমরেশ এখন আর তেমন ছিপছিপেও নেই। বয়সের ভারে বাড়তি মেদের প্রলেপ শরীরজুড়ে। তবু মনের তারুণ্য আজও নষ্ট হতে দেয়নি সে।

সমরেশের আরেকটা গুণ, সে তার জীবনকে অনেকটা ব্যাপ্ত করতে পেরেছে। ছড়িয়ে দিতে পেরেছে নানাদিকে। আর পাঁচটা সাধারণ ভেতো বাঙালি গৃহস্থের মতো গণ্ডিবদ্ধ জীবনযাপন করেনি। সমরেশ আমার চেয়ে বয়সে কিছুটা ছোটো। কিন্তু তাকে আমি যতটা ভালোবাসি ঠিক ততটাই শ্রদ্ধা করি।

এবার আনন্দবাজার পত্রিকার পুজোসংখ্যায় তার যে উপন্যাস বেরিয়েছে তা পড়ে মুগ্ধ হয়েছি। বয়স কিন্তু তার কলমে থাবা বসাতে পারেনি। এখনো ঝরঝরে তার লেখনী। সাবলীল শব্দচয়ন। শুভবোধ থাকলে যে কোনো বাধাই বাধা নয়, এই উপলব্ধিকেই ভারি সুন্দরভাবে এই উপন্যাসে তুলে ধরেছে সমরেশ। সুতরাং, একথা মানতেই হয়, সমরেশ এক লম্বা রেসের ঘোড়া। সারস্বত সাধনা করে সে অনেক পুরস্কার পেয়েছে। বহু পাঠকের অজস্র অভিনন্দনে ধন্য, আপ্লুত তার জীবন। তবু বলি, তার প্রকৃত পুরস্কার বা সঠিক মূল্যায়ন সে লাভ করবে নিজের ভিতর থেকেই। কারণ, লেখক যখন বুঝতে পারে যে, সেযা লিখতে চেয়েছিল তাই সে লিখতে পেরেছে তখনই তার মন এক অনির্বচনীয় তৃপ্তিতে পূর্ণ হয়ে ওঠে। সেটাই তখন তার কাছে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

## অল্প সময়ে বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন

আগের মতো এখনও সঞ্জীবকে আমার ভীষণ ভালো লাগে। খুব রসিক মানুষ। সবসময় রঙ্গরসিকতার প্রবণতা ছিল ওর মধ্যে। সেইসঙ্গে সঞ্জীব খুব পড়াশোনা করা মানুষ। কত ধরনের লেখা পড়তে যে ওকে দেখেছি, তার ইয়ত্তা নেই। পড়ুয়া হিসাবে খুব সিরিয়াস গোছের। এককথায় একজন পণ্ডিত মানুষ। শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, মা সারদা-সহ অন্যান্য সাধকদের নিয়েও ওর অগাধ পড়াশোনা। ব্যক্তিগত জীবনে সঞ্জীব মোটামুটি ধর্মাচরণ করে। এই দিকটিও আমার বেশ পছন্দের।

লেখালেখি সম্পর্কে একটাই কথা বলার, একসময় সরস রচনা লিখে ও এতটাই জনপ্রিয়তা পেয়েছিল যে, তা না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। অত অল্প সময়ের মধ্যে এত বিপুল জনপ্রিয়তা পেতে বাংলা সাহিত্যে আমি আর কাউকে দেখিনি। এই দিক দিয়ে ওর কোনো জুড়ি আছে বলে আমার জানা নেই। রসসমৃদ্ধ লেখায় সঞ্জীব সিদ্ধহস্ত। ওকে প্রথাগত টিপিক্যাল কোনো ছাঁচে ফেলা যায় না। সঞ্জীবের লেখা সঞ্জীবের মতোই।

আনন্দবাজারে আমার প্রবেশ ১৯৭৬-এ। দেশ পত্রিকায় কাজের সুযোগ পাই আশির দশকের প্রথমদিকে। সঞ্জীব অবশ্য দেশ-এ যোগ দিয়েছিল আমার আগেই, সাগরময় ঘোষের সম্পাদনা সহযোগী হিসাবে। তারপর আমরা একসঙ্গে বহুদিন কাজ করেছি। কিন্তু আমার টেবিল ছিল সঞ্জীবের থেকে বেশ কিছুটা দূরে, বলা চলে উলটোদিকে। আমি, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, আনন্দ বাগচী, সুনীল বসু-আমরা বসতাম একদিকে। ফলে সঞ্জীবের নিত্য নিয়মিত হাস্যরসের টুকরো-টাকরা আস্বাদনের সুযোগ সবসময় আমার হত না। কিন্তু নিত্য দেখা হত, গল্পোগাছা হত। বিশেষ করে যখন কোনো আড্ডায় বসতাম, যেমন বিমল করের সাহিত্য আড্ডায় তখন সঞ্জীব যেন খাপখোলা তলোয়ার। বুদ্ধিদীপ্ত কথাবার্তায় যে কারও চোখ টানতে পারত।

শুধু কথায় নয়, সঞ্জীব খুব কাজেরও। দেশ পত্রিকার পুরো প্রোডাকশনটাই ছিল ওর কাঁধে। সবসময় খুব ব্যস্ত দেখতাম। প্রুফ দেখা থেকে শুরু করে পেজ লে-আউট, কোন ছবি যাবে, কী ক্যাপশন হবে! লেখা পাতায় না আঁটলে সম্পাদনা করা, আরও কত কী! অত কাজের মধ্যেও ও ছিল ভীষণ সরস। পত্রিকার

তরফ থেকে সঞ্জীব শ্রীলঙ্কা, মেক্সিকো প্রভৃতি জায়গায় গেছে। ফিরে এসে একটার পর একটা জনপ্রিয় ধারাবাহিক লিখেছে। প্রায় সব ধরনের লেখালেখিতে ও খুব পারঙ্গম।

বিমলদা ছিলেন সঞ্জীবের সাহিত্য গুরু। তাঁর হাত ধরেই ওর প্রকৃত অর্থে সাহিত্যে মনোনিবেশ। ভীষণ বাকপটু। এখনও ওর কথা শুনলে লোকে হো-হো করে হেসে ওঠে। চেহারা ভেঙে গেলেও মুখের কথা বিন্দুমাত্র সরসতা হারায়নি। ওর বাড়িটি এমন জায়গায় তা কলকাতার মধ্যে পড়ে না বলেই আমার মনে হয়। ওটাকে আমার উত্তর মেরু বলতে ইচ্ছে করে, আর আমি থাকি দক্ষিণ মেরুতে। ফলে সাক্ষাৎ খুব একটা ঘটে না, তবে মাঝে মাঝে সভা-সমিতিতে দেখা হয়ে যায়। তখন আবার ওর উষ্ণ সান্নিধ্য লাভ করি।

সবশেষে বলব, শুধু আধ্যাত্মিক নয়, সঞ্জীব আরও বহুদিন তার সরস কলমটি বাংলার পাঠকদের জন্য বাঁচিয়ে রাখুক। কারণ, বাংলা সাহিত্যে এখন রম্য লেখকের বড়োই অভাব।

## কল্পলোকের সন্ধান পাই

আমাদের সময়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কবি প্রণব। হৃদয়বান এবং তদগত কবি। সরকারের বড়ো পদে চাকরি করেছে। দুর্ভাগ্যক্রমে স্ত্রী ও একমাত্র কন্যাকে হারিয়ে একা হয়ে গিয়েছে। তা সত্ত্বেও ওর মধ্যে জীবনের প্রতি অকুণ্ঠ ভালোবাসা ভীষণভাবে দেখতে পাই।

প্রণব আমার প্রতিবেশী। ভীষণ মজার মানুষ। হাসতে এবং হাসাতে ভালোবাসে। ধাঁধা, ম্যাজিক, সংগীত—জীবনের নানা দিক নিয়ে ওর প্রবল উৎসাহ। আমি মুগ্ধ হই ওর জীবনবীক্ষণ দেখে। নিজে কবিতা লিখতে পারি না, এটা আমার জীবনের আপশোশ, কিন্তু আমি কবিতার মনোগ্রাহী পাঠক। গদ্য লেখক হয়েও কবিতাপ্রীতির কারণেই প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়ের কবিতা বহুদিন ধরে পড়ে আসছি। ওর কবিতায় সেভাবে চটক বা জেল্লা নেই, কিন্তু কবির আন্তরিকতায় এবং তন্নিষ্ঠ আবেগে মন্থন করা এক মনের বার্তা আমাদের কাছে পৌঁছে দেয়। প্রণবের কবিতার মধ্যে কল্পলোকের সন্ধান পাই।

প্রণবের মৃত্যুবিষয়ক কবিতাগুলির মধ্যে আমাদের বহু প্রয়াত বন্ধুর স্মারকচিহ্ন ছড়িয়ে রয়েছে। সেইসব কবিতায় কবির যে রক্তক্ষরণ দেখতে পাই, তা মথিত করে। সম্প্রতি রোটারি সদনে প্রণবের ৮০ বছর পূর্তি ও কবিতা সমগ্র প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি ভীষণ খুশি।
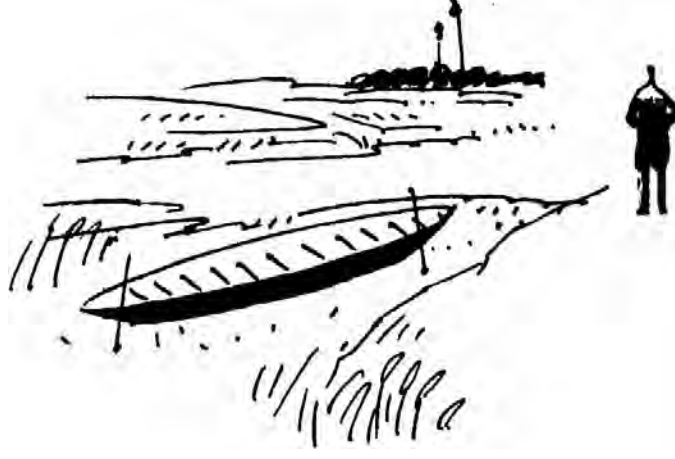
# সুহাসিনীর পমেটম ও তার লেখক

মাত্র দুই তিন বৎসর যাবৎ আমি শ্রীকমলকুমার মজুমদার মহাশয়ের সহিত পরিচিত আছি। সেই পরিচয় আজ পর্যন্ত কখনও ঘনিষ্ঠতায় পর্যবসিত হয় নাই। বস্তুত তাহার কারণ এই যে এই শহরে তাঁহার ও আমার বিচরণ ক্ষেত্র বিভিন্ন। সম্ভবত আমাদের স্বভাব ও দৃষ্টিভঙ্গিও ভিন্ন প্রকৃতির। তথাপি এই রহস্যময় মানুষটিকে আমি বারংবার কৌতূহলের সহিত নিরীক্ষণ ও পর্যালোচনা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। তাহাতে আমার এইরূপ ধারণা হয় যে তিনি (শ্রীকমলকুমার মজুমদার) আইনমান্যকারী, সুশীল স্বভাবের নাগরিকতার ঊর্ধ্বে বিচরণ করেন। অথচ তিনি এইরূপ সহবৎ শিক্ষা ও অভ্যাস করিয়াছেন যে তাঁহার সহিত ব্যবহারে আমাদের তথাকথিত আধুনিক স্বভাবজ অবিনয় ও বিস্মৃত ভদ্রতাবোধের জন্য মনে মনে কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হইতে হয়। সামাজিকতার দিক দিয়া তিনি প্রাচীনতার প্রতি অনুগত। সম্ভবত এ কারণে আমি যখনই তাঁহার সম্ভাষণের প্রত্যুত্তর করিয়াছি তখনই তাঁহার ও আমার মধ্যে এক প্রান্তর প্রমাণ ব্যবধান অনুভূত হইয়াছে। মনে হয়, তিনি কোনো একটি বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া দীর্ঘদিন যাবৎ এই প্রাচীন সামাজিকতা ও সহবৎ অভ্যাস করিয়াছেন এবং এই ব্যস্ততা ও সময় সংক্ষেপের যুগেও তাহা বজায় রাখিয়াছেন। এইরূপে তিনি সবিনয়ে পারিপার্শ্বিকের সহিত আপস এড়াইয়া চলেন কিনা তাহা বলা মুশকিল। আবার এইরূপ দেখা যায় যে তিনি দ্রুত চলাফেরা করেন, কথাবার্তা দ্রুতবেগে বলেন এবং এক প্রসঙ্গে অধিকক্ষণ স্থায়ী হইতে পারেন না। অথচ মনে হয় তাঁহার ভিতরকার মানুষটি স্থির হইয়া আছে, তাহার ব্যস্ততা নাই, চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা নাই, লক্ষ্যে পৌঁছিবার প্রতি উদাসীন। সেইখানে তিনি এক অত্যাশ্চর্য ধার্মিকতার সূত্রে প্রবাহমান মনুষ্যত্বের মৌল ও আন্তর লক্ষণগুলির সংজ্ঞা নির্ণয়ের চেষ্টা করিতেছেন। সাময়িকতার স্রোতকে স্পর্শ করেন না বলিয়াই বোধহয় তাঁহার রচনাগুলির গতি শ্লথ, বিস্তার বিশাল, উদ্দিষ্ট লক্ষ্যস্থল রহস্যময়ভাবে বিবিধ।

রহস্য—এই শব্দটি আজিও আমাদের কত আকর্ষণ করে! এখন আমরা বয়সের দিক দিয়া বালকত্ব ছাড়াইয়া উঠিয়াছি। আমাদের এখন এইরূপ বিশ্বাস যে পৃথিবীর বিচিত্র অজ্ঞেয়র অনেকাংশ আমাদের বিশ্লেষণাত্মক মেধার আলোকে উজ্জ্বল, এখন আমরা কথোপকথনের মাঝখানে হঠাৎ টিকটিকির ডাক শুনিয়া তিন টোকা দিয়া 'সত্যি, সত্যি সত্যি' বলিয়া উঠি না, আমাদের অজানা কোনো সমুদ্র পর্বত কিংবা উপত্যকা আজ আর পৃথিবীতে নাই। তবু বারংবার মনে হয় এখনো রহস্য রহিয়া গিয়াছে। কবে কোন অশোক ও আনন্দময় শৈশব হইতে ওই শব্দটি আমাদের আকর্ষণ করিতেছে। সেই আকর্ষণে আমরা কখনো ধীরে কখনো দ্রুতবেগে বয়সের জাঙ্গল ভাঙ্গিয়া অগ্রসর হইতেছি। রহস্য—এই মোহময় শব্দটি সৃষ্ট না হইলে

সম্ভবত কিছু মানুষ এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিত না। তাহারা এই মনুষ্য জীবনকে প্রত্যাখ্যান করিত। আশৈশব এই শব্দটি হইতে আমার মনে উদ্ভুত বিমূর্ত ও স্বপ্নময় চিত্রগুলিকে আমি যত ভালোবাসিয়াছি আজ মধ্য যৌবনে শ্রীকমল কুমার মজুমদারের রচনাগুলির প্রতি আমার আকর্ষণ অনেকটা সেই প্রকার। তাঁর রচিত 'তাহাদের কথা' যখন প্রথম পাঠ করি তখনই প্রথম বহুকাল পরে আমি ক্ষণেকের জন্য বয়ঃসন্ধির বালকের মতো নিজের চতুষ্পার্শ্বস্থ বাস্তবতার ভিতরে এক অলীকতার উপস্থিতি অনুভব করিয়া রোমাঞ্চিত হইয়াছিলাম। আজ স্বীকার করি সেই রচনার এবং শ্রীকমলকুমার মজুমদারের অন্যান্য রচনার অনেকাংশ আমার নিকট আজিও স্পষ্ট নহে। তাঁহার ব্যাকরণ বিদ্রোহী বাক্য অসচ্ছলতাই তাঁহার রচনাকে আমার নিকট প্রিয় করিয়াছে—এইরূপ ধারণা ভ্রমাত্মক। রহস্যময়তা আমার প্রিয় যতক্ষণ তাহা প্রকরণ-গত। উপরন্তু শ্রীকমলকুমার মজুমদার অলৌকিক বিষয়বস্তু লইয়া লেখেন না। তাঁহার রচনায় স্পষ্ট আধ্যাত্মিকতাও লক্ষ করা যায় না, বাস্তবাতিরিক্ত কোনো কিছু তাঁহার রচনায় লক্ষ করিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। কমলকুমার যে জগৎ ও যে সব মানুষ লইয়া লেখেন তাহা আমার পরিচিত নহে, কিন্তু পাঠকালে তাঁহার জগৎ আমার নিকট প্রত্যাক্ষত সত্য বলিয়াই বোধ হয়। তবুও কোথাও তাঁহার রহস্যময়তা থাকিয়া যায় যাহা আজিও আমার অনধীত বিষয়গুলির মতো নাগালের বাইরে রহিয়া গিয়াছে।

তাঁহার সাম্প্রতিক দীর্ঘ রচনা 'সুহাসিনীর পমেটম' এক পরিচিত অপরিচয়ের কথা বলিয়াছে। কেননা ইহা আমার পরিচিত জগতের কথা নহে। আমার পারিপার্শ্বিক ও সময়ের সহিত ইহার সমতা নাই, ইহা এক দূর জগতের কথা যে স্থানে এক বিস্মৃত পেগান ধর্মীয় আলোক নিষ্পাপ সুন্দর সুহার স্পষ্টবাদিনী ধর্মরক্ষিত মুখশ্রীকে আলোকিত করে। যে স্থানে খ্রিস্টান যোহন একাদশী অপরের পত্রপাঠের পাপে অনৈসর্গিক স্বর ও তাড়নায় উন্মত্তের মতো আশ্রয় ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। স্বপ্ন সুন্দরীর নিকট নিজের প্রাণ প্রিয় পাখিটিকে উৎসর্গ করিবার মানসে যাহার তীব্র অনুসন্ধান আমাদের নিকট আশ্চর্য বলিয়া বোধ হয়। শুদ্ধ সৌন্দর্যের নিকট আমরা অধমর্ণ নহি, আমাদের ঋণ নাই, তথাপি, যোহন একাদশীর প্রায় ভূতগ্রস্ত হৃদয়ের এই উন্মোচন আমাদের ভিতরকার এক গ্রানাইট অন্ধকারকে চমকাইয়া তুলিতে চাহে। যেন এক অপরিচয়ের কণ্ঠস্বর আমাদের বুকের ভিতরে বলিতে থাকে তোমার সর্বস্ব দিয়া পরিশোধ করো। হায়! আমরা কী পরিশোধ করিব! আমরা অপরিণত বুদ্ধি লখাইয়ের মতো কেবল চিৎকার করিয়া বলিতে পারি 'কী সুন্দর, ইস কী সুন্দর!' এই গল্পে কমলকুমার সুন্দরের কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু সুন্দর করিয়া বলিয়াছেন—এ কথা বলিতে পারি না। তাঁহার বর্ণনাভঙ্গি হৃদয় বিদারক। কমলকুমার সুন্দর করিয়া কখনো বলেন না। তাঁহার লেখার মধ্যযুগীয় ধ্রুপদী চাল যাহার দ্বারা তিনি ফিনফিনে শৌখিন রোমাঞ্চিকতার বাবুয়ানা হইতে গা বাঁচাইয়া চলেন তাহা তাঁহার নির্মোক মাত্র। সম্ভবত এরূপে প্রথমেই সযত্নে তিনি তাঁহার রচনার বহিরঙ্গে মুক্ত কেশীর শক্ত বেড়া বাঁধিয়াছেন যাহাতে সর্বসাধারণের সমাবেশে তাঁহার রসের হাটটি না ভাঙ্গিয়া যায়। অথচ প্রগাঢ় জাগর চৈতন্যের দ্বারা তিনি শব্দ নির্মাণ করেন এবং পদবিন্যাসে ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালকে ভোজনের পঙক্তিতে সারি সারি বসাইয়া কাব্যবিরোধী ভয়ঙ্কর একধরনের কবিতার জনক হইয়া বসেন। তবু অনেকের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া আমার এইরূপ বলিবার ইচ্ছা হয় যে তাঁহার রচনা সুখপাঠ্য নহে। বরং তাঁহার রচনা পাঠের অভিজ্ঞতা যন্ত্রণা দায়ক। কেননা তাহা কাব্যের বিশেষ প্রবহমানতা হইতে বঞ্চিত, তাহা অঙ্কশাস্ত্রের শ্রমসাপেক্ষ হিসাব মতো রচিত হইয়া থাকে।

প্রাজ্ঞ সমালোচক হয়ত বলিবেন, 'পমেটম' নামক রূপটানটি সৌন্দর্যের প্রতীক। হয়তো তাহাই—সৌন্দর্য সচেতন একটি গ্রাম্য বালিকার আদরের পমেটমের কৌটাটি এই গল্পে হয়তো অংশত প্রতীক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এইরূপ প্রতীক আরও বহু রহিয়াছে যাহা খুঁটাইয়া দেখিতে গেলে এই রচনাকে প্রতীকের আদর্শ খনি বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু প্রতীক আধুনিক মনন-বিরোধী, যাহা সোচ্চার ও সহজ তাহাকে ঘুরাইয়া প্রতীকের পাকচক্রে লইয়া গিয়া ফেলার মতো কাল-অপচয়ী প্রচেষ্টা সনাতন শিল্প-শৈলীর কৌশল মাত্র। আমরা প্রতীকের কৌশলে আজ আর বড় বিশ্বাসী নহি। কিন্তু আমার মনে হয় সাহিত্য ও শিল্পের যে কয়েকটি

কৌশল আমাদের অধিগত আছে কমলকুমার তাহার অতিরিক্ত আর একটি কৌশল আয়ত্ত করিয়াছেন। তাঁহার 'সুহাসিনীর পমেটম' নামক দীর্ঘ রচনাটি অঙ্গ সৌষ্ঠবের যে ঠাটটি ধরিয়া রাখিয়াছে তাহা প্রতিমা নহে, প্রতীক বলিয়াও বিশ্বাস হয় না, তাহা কেবল একটি উপল উল্লঙ্ঘনকারী স্রোত। যাহা, যেখানে প্রতিমাও ও প্রতীক লয়প্রাপ্ত হয়, সেই অনন্তের দ্বারদেশে পৌঁছিবার চেষ্টা করিতেছে। তাই তাঁহার এই রচনাটির সর্বত্র এক শ্বাসরোধকারী ডানা-ঝাপটানোর শব্দ যাহা ক্ষীণায়ু এই পার্থিব জীবন যাপনকে অতিক্রম করিয়া যাইতে চাহিবার প্রয়াস, আর '...হাতে চন্দন কাঠটি লইয়া বারংবার আঘ্রাণে, কায়মনোবাক্যে সৌরভ চালিত, অপূর্ব মোহনবত্বের কিনারে যে অতর্কিতে পৌঁছিয়াছে, এমত কামনা ইদানিং আসে, ওই স্থল হইতে আর যেন ফিরিতে কদাচ না হয়, ইদৃশী অভিলাষ তাহার এনেথ মনে ধ্রুব!'

সাধারণ অর্থেই তাঁহার রচনা অতিশয় বাস্তব ও সত্য। কেবল সেই বাস্তবতার উপরে, নরনারীর প্রাকৃত সম্পর্কের উপরে তিনি এক অলৌকিকতার মায়াপর্দা বিছাইয়া রাখিয়াছেন। তদুপরি তাঁহার অতিশয় পোটেন্ট মননের ভিতরে স্থানকালের ব্যবধান ও বিভিন্নতা ঘুচিয়া যাওয়ার অতীত ও ভবিষ্যৎ ও বর্তমান, আমাদের পারিপার্শ্বিক ও দূর দেশ ও নক্ষত্রমণ্ডলী, প্রকৃতি ও মানুষ একাকার হইয়া বহিয়া চলিয়াছে। কাহাকেও বিচ্ছিন্ন করিয়া বুঝিবার চেষ্টা নিষ্ফল। আপাত বিভ্রম সৃষ্টিকারী প্রক্ষিপ্ত প্রকীর্ণ গদ্য অংশগুলির ভিতরেও কোথাও যেন ওই সত্য ও বাস্তবতা মূলীভূত হইয়া আছে—যাহা আমাদিগকে স্পষ্টও কিছুই বলিতে চাহে না কেবল মাত্র আঙ্গুলি সংকেত করিয়া ভিড়ে মিলাইয়া যায়। এইসব প্রকীর্ণ অংশগুলিতে যেন কমলকুমার নিজে এই কাহিনীতে যুক্ত আছেন, যেন তিনি তাঁহার সুহা ও লখাই, যোহন ও শৈবালীর পাশাপাশি চলিতেছেন, লখাইয়ের মতো তিনিই বলিতে চাহেন, 'আঃ যা কিছু সমস্ত সবাইকে আমি পাখার বাতাস করব, পা ধুয়ে দেব, শীতে গা ঘেঁষে থাকব, তোমারা সবাই নিশ্চিন্তে ঘুমোবে।'

বস্তুত 'সুহাসিনীর পমেটম' নামক রচনাটির কোনো সার-সংক্ষেপ হয় না। হওয়া উচিতও নহে। আমি সেই চেষ্টা হইতে বিরত রহিলাম। কমলকুমারের রচনা ঘরে ঘরে জনে জনে পাঠ করিবে ইহা আমি ভরসা করি না। যাঁহারা পাঠ করে তাহারা সম্ভবত জানে একমাত্র নিষ্ঠাশীল ধার্মিকতা ব্যতীত ভিন্নতর বিশ্বাস হইতে এবম্বিধ সৃষ্টিশীলতা সম্ভবপর নহে। সেই ধার্মিকতা যাহা বাস্তবকে স্পর্শ করিয়া গভীর ধ্যানের ভিতরে লইয়া যায়। যাহা প্রমত্ত রিরংসার দৃশ্যে যোহন একাদশীর পাখিটিকে শূন্যে ছাড়িয়া দিয়া সৌন্দর্যের স্তবগান করিয়া উঠে, যৌনকাতর পরপুরুষে আসঙ্গলিপ্ত মাতার সম্মুখে সাক্ষ্যরূপে পুত্রকে দাঁড় করাইয়া দিয়া অবিচল থাকে, যাহা কোটি মানুষ্যকে পারত্রিক দুঃখ সকল ক্লেশে বহন করিতে উৎসাহ যোগায়, তাহার সহিত সৌন্দর্যের সম্পর্ক দূর নহে।

# চিরযুবা

নীরেনদার সঙ্গে কবে প্রথম পরিচয় হয়েছিলো তা আজ আর মনে নেই, তবে নিশ্চয়ই অনেকদিন আগে এবং খুব সাদামাটা ভাবে, নীরেনদার ব্যক্তিত্বের মধ্যেই এমন একটা আত্মীয়তার স্পর্শ রয়েছে যে, বয়স ও খ্যাতিতে অনেকটা এগিয়ে থাকা সত্ত্বেও পার্থক্যটা কবে কখন অজান্তে খসে গেছে। অনেককেই দাদা ডাকি বটে, কিন্তু সংকোচের পর্দাটুকু কাটাতে পারি না। নীরেনদার কাছে ওসব নেই, এক ঝাপটায় সব ব্যবধান ঘুচিয়ে তিনি যত চট করে কাছের মানুষ হয়ে উঠতে পারেন তত আর কেউ বোধহয় পারেন না।

কবি হিসেবে আমার তিনি যত প্রিয়, মানুষ হিসেবে ততটাই, তিনি একবার কি দুবার আমার বাসায় এসেছেন এবং স্বল্প অবসরেই গোটা পরিবারটির আপনার মানুষ হয়ে উঠতে তাঁর বাধা হয়নি।

বেশ কয়েকবছর আগে আচমকাই তিনি আমাকে ছোটোদের জন্য একটি গল্প লিখতে বলেন। তার আগে আমি ছোটোদের জন্য কখনো কিছু লিখেছি বলে মনে পড়ে না। লেখাটি সংকোচে তাঁকে দেওয়া গেল। এমন কিছু লেখা সেটা নয়, কিন্তু নীরেনদা এমন গগনবিদারী প্রশংসা করে বেড়ালেন যে লজ্জায় মরি। তবে ওই প্রশংসাটুকু একজন লেখকের আত্মবিশ্বাস অর্জনের সহায়ক, বলা যায়। নতুন একটি ক্ষেত্রে বিচরণের করার মুখে ওই প্রশংসাটুকু ছিল ছাড়পত্র।

নীরেনদাকে যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই জানেন বাঙালিদের মধ্যে একটু বেমক্কা রকম দীর্ঘকায় শক্ত কাঠামোর অতিশয় সুপুরুষ এই মানুষটিকে প্রথম দৃষ্টিপাতেই অসাধারণ মনে হতে বাধ্য। নীরেনদার গায়ের রং ফর্সা নয় তবু এক প্রাণচঞ্চল অভ্যন্তরের দীপ্তি তাঁর অস্তিত্ব সর্বদাই বিকিরণ করে। মেদহীন কেজো মানুষের মতো শরীর, সময়নিষ্ঠ কাজপাগল, কবি নীরেন্দ্রনাথ শুধু কবিতা লিখেই ক্ষান্ত থাকেন না, ছন্দ নিয়ে শব্দ নিয়ে তাঁর ভাবনা চিন্তা ব্যাপক এবং গভীর।

নীরেনদা পাক্ষিক আনন্দমেলা পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন। সম্পাদনা তাঁর চাকরি মাত্র। কিন্তু এই কাজটিকে নিতান্ত চাকরি হিসেবে দেখলে তাঁর পক্ষে এরকম প্রথম শ্রেণীর একটি পত্রিকা সৃষ্টি সম্ভব হত না। প্রত্রিকাটির পাতায় শিশু পাঠক পাঠিকাদের জন্য ছড়ানো থাকে মণিমুক্তা, বানান ভুল ছাপার ভুল তাঁর পত্রিকায় থাকে না, থাকে না এক শব্দের দুরকম প্রচলিত বানান। কী দানবীয় পরিশ্রম এর জন্য তিনি করেন তা চোখে দেখলে তবে বিশ্বাস হয়।

বেশ কিছুদিন আগে আনন্দবাজার পত্রিকায় একটি বিরক্তিকর অবরোধ ঘটেছিল, সকলেই জানেন। দিনের পর দিন আমরা অপারগ হয়ে রাগ চেপে রেখে, ঘাড় গুঁজে ঘরে বসে থেকেছি। কিছুই করার ছিল না আমাদের। তবে আমাদের মধ্যে কেউ কেউ সক্রিয় হয়ে এই অবরোধের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার

চেষ্টা করেছিলেন। এদের মধ্যে নীরেনদাও ছিলেন। রাত দশটায় লোডশোডিং এর মধ্যে তিনি আমার বাড়ি গিয়ে স্বাক্ষর সংগ্রহ করে আনেন।

পথসভায় সর্বত্রই তিনি উপস্থিত থাকতেন এবং অসাধারণ বক্তৃতা দিতেন। যেদিন ধর্মঘটবিরোধীরা লাঠি ইঁট গালিগালাজ উপেক্ষা করে অফিসে ঢুকেছিলেন সেইদিন নীরেনদার ভূমিকা ছিলো দেখার মতো। ফরিদপুরের বাঙাল সব প্রতিরোধ ভেঙে অগ্রবর্তীদের একজন হয়ে সোৎসাহে অপিসে ঢোকেন, রাত বারোটা অবধি লেখেন এবং রাত দুটোয় বারো ঘণ্টার উপোস ভেঙে খিচুড়ি খান।

নীরেনদার মতো মানুষরা কখনো বুড়ো হয় না। বয়স তাঁদের ক্ষেত্রে একটি ইউটোপিয়া মাত্র। সময়কে হার মানিয়ে যে দুর্দান্ত প্রাণশক্তি ও অফুরন্ত উদ্যম তাঁর মধ্যে নিয়ত প্রকাশ পায় তা কজন তথাকথিত যুবকের আছে? বার্ধক্য তো ভয়েই কাছে আসতে চাইবে না।

## মাতৃত্বের প্রতিমূর্তি আশাপূর্ণা দেবী

বজ্রশীল বাজপেয়ী নামটা শুনলে যে চেহারাটা চোখে ভেসে ওঠে বজ্রশীল ঠিক তেমনটাই ছিলেন। ব্যায়ামবীর, বিশালদেহী, অতীব শক্তিমান পুরুষ। যতদূর মনে আছে গল্পটির নাম 'একটি দীর্ঘশ্বাসের জন্য'। রোগাভোগা পেটরোগা নায়ক সুখাদ্যের প্রতি আকর্ষণ থাকলেও খেতে পারতেন না। তবে তিনি রোজ ভালো ভালো অতি সুস্বাদু খাবার তৈরি করিয়ে বজ্রশীলকে খাওয়াতেন। এই গল্পের শেষে যে সূক্ষ্ম রসটির অবতারণা হয়েছে তা মনোবিজ্ঞানের ব্যাপার এবং তা এক সত্যের উদ্ভাসও বটে।

এইরকম অজস্র অবিস্মরণীয় ছোটোগল্প আর বাংলার মাটি-জল প্রকৃতি আর বাঙালির ঘর সংসারের নিবিড় ও গভীর চিত্র বহনকারী তার ধ্রুপদী উপন্যাসগুলির ভিতর দিয়ে আশাপূর্ণা দেবীকে চিনেছি, তাঁর সঙ্গে চেনা হওয়ার অনেক আগে থেকেই তিনি আমাদের ঘরদোর গেরস্থালিতে ঢুকে বসে আছেন।

বোধহয় আমার দিদির বিয়েতে কেউ অগ্নিপরীক্ষা উপন্যাসটি উপহার দিয়েছিল। তখন আমার বয়স বোধহয় ষোলো বা সতেরো। টক করে পড়ে ফেললাম। আশাপূর্ণার সেরা লেখাগুলোর সঙ্গে তুলনীয় নয় বটে, কিন্তু সেই বয়সে এই রোমান্টিক উপন্যাসটি আমাদের বয়ঃসন্ধির শিহরণ। বইটি প্রকাশের অনতিকালের মধ্যেই সুচিত্রা উত্তমের সিনেমা হয়ে গেল। সেই ছবি আজও পরম সমাদরে দেখছে দর্শক।

সমান তালে ছোটো আর বড়দের জন্য লিখেছেন। তাঁর একটা লেখাও কখনও ফ্যালনা মনে হয়নি। প্রতিটি লেখারই পিছনেই থাকত যত্ন এবং মনঃসংযোগ। নিজেকে মোটিভেট করা এবং প্রয়োগ করার প্রক্রিয়ায় তাঁর নিষ্ঠা আমাকে আজও অবাক করে।

প্রথম তাঁকে চাক্ষুষ করি পয়লা বৈশাখে একবার আনন্দ পাবলিশার্সের হালখাতা অনুষ্ঠানে গিয়ে। সন্দেশ, কাজুবাদাম আর গেলাসে ডাবের জল দেওয়া হয়েছিল। তিনি জল মনে করে ডাবের জল দিয়ে একটু হাত ধুয়ে ফেলেছিলেন। সবাই হাঁ হাঁ করে ওঠায় একটু হেসে বললেন, জানো তো, ডাবের জলে হাত ধুলে হাতের রান্না ভালো হয়। অমন শান্ত আত্মস্থ মহিলার এই স্মার্টনেসটাও চমকপ্রদ।

পরে নানা অনুষ্ঠানে বা টি ভি প্রোগ্রামে তাঁর সঙ্গে বহুবার দেখা হয়েছে। পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হয়েছে। একদম মা মাসির মতোই আটপৌরে সাদামাটা মহিলা। অতিশয় স্নেহপ্রবণ, অত্যন্ত শান্ত আত্মস্থ মানুষ। তিনি যখন গোলপার্কের সরকারি আবাসন ছেড়ে গড়িয়ার কাছে বড় রাস্তার ওপর বাড়ি করে চলে যাওয়া স্থির করলেন তখন আমি তাঁকে বলেছিলাম, এত ভালো জায়গা ছেড়ে বড় রাস্তার ওপর অত দূরে কেন থাকতে যাচ্ছেন? রাস্তার গোলমাল, শব্দ খারাপ লাগবে না?

তিনি সহাস্যে বললেন, না বাপু, আমার বহুকালের ইচ্ছে সদর রাস্তার ওপর বাড়ি করে থাকব। লোকজন, গাড়িঘোড়া দেখব।

তিনি গড়িয়ায় চলে যাওয়ার পর কিছুদিন আমাকেও ওই অঞ্চলে বাসা করতে হয়েছিল। প্রতিবেশী হিসেবে আশাপূর্ণা দেবীকে ভাবিনি কখনও। অত বড় লেখিকার বাড়িতে কখনও হানা দিতাম না। কিন্তু তিনি ডাকলে বা তেমন প্রয়োজন হলে যেতাম। আর গিয়ে দেখতাম, তিনি কোনও না কোনও ঘরকন্যার কাজে ব্যস্ত। কুটনো কোটা বা রান্নাবান্নার দেখভাল। বলতেন, আমি ঘরসংসারের কাজকে কখনও উপেক্ষা করিনি। সব সামলে তবে লিখেছি।

তাঁর স্বামী কালিদাস গুপ্তকে দেখেছি। মিতবাক, সংযত পুরুষ। শুনেছি, তাঁর সহায়তা ও প্রবল সমর্থন না পেলে আশাপূর্ণা দেবী লেখিকা হয়ে উঠতে পারতেন না। স্বামী ভালো চাকরি করতেন, আশাপূর্ণা দেবীর ছেলেও ছিলেন পাসপোর্ট অধিকর্তা। কিন্তু আশাপূর্ণা দেবী ওদের কথা উঠলেই বলতেন, আমি শুধুই কেরানীর বউ, শুধুই কেরানীর মা।

অহংকার ব্যাপারটা বোধহয় কোনওদিন আশাপূর্ণা দেবীর বাড়ির চৌকাঠও ডিঙোতে পারেনি। আমি বোধহয় বারদুয়েক টিভিতে তাঁর সাক্ষাৎকার নিয়েছি। তাঁর সম্পর্কে কোনও প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করলেই তিনি উলটে আমার লেখার কথা বলতে শুরু করতেন। আমি পরে তাকে বলতাম, আচ্ছা আশাদি, সাক্ষাৎকার তো হচ্ছে আপনার, সেখানে আমার কথা বলেন কেন?

আশাদি ভারী ভালোমানুষের মতো হেসে বলতেন, তোমার কথা বলবনা, তা কি হয়?

বয়সে তিনি আমার মায়ের চেয়েও বড় ছিলেন, বাবার চেয়েও। তবু তাঁকে দিদিই ডাকতাম। এমন সহজে মানুষকে আপনার করে নিতেন যে, মনেই হতনা অত বড় একজন লেখিকার সান্নিধ্যে গেছি। বড় লেখকদের তখনও ভয় পেতাম। কিন্তু তাঁকে দেখলে ভয় নয়, বরং একটা আত্মীয়তা বোধ করেছি।

বলতে নেই আজও এখনও তার যে কোনও পুরোনো লেখা হাতে পেলেই সব কাজ ফেলে পড়ে ফেলি। তাঁর লেখার ভিতরে এমন স্নিগ্ধভাবে জীবনসত্যের উন্মোচন আছে যা আমাকে বিস্মিত করে। কারণ আদ্যন্ত এই গৃহবধূ কীভাবে এত অভিজ্ঞতা অর্জন করলেন, এত বিচিত্র মানুষের নাড়ি নক্ষত্র জানলেন, জীবনের এত জটিলতার সন্ধান করলেন তা আজও গভীর রহস্য। আসলে সংসারে আবদ্ধ থেকেও তীক্ষ্ম মেধা এবং গভীর পর্যবেক্ষণ ও সেইসঙ্গে মননের রসায়নই দুনিয়াকে তার প্রত্যক্ষের পরিধিতে এনে দিত। এ একরকমের তন্নিষ্ঠ ধ্যান। ঘর সংসারের সঙ্গে নিবিড় যোগ ছিল বলেই তাঁর মূল্যবোধ কখনও দিশাহারা হয়নি। তিনি নারীর যন্ত্রণা, ব্যথা, বঞ্চনা যেমন বুঝতেন, তেমনি সমাজে ও সংসারে তাদের সঠিক স্থান নির্ধারণ করতেও ভুলচুক করতেন না। মাণিমাণিক্যের মতো তাঁর গল্পে উপন্যাসে আমরা জীবনমুখী অভিজ্ঞতার শরিক হয়ে যাই। অনেক লেখক মৃত্যুর পর বিস্মৃত হয়ে যান, আশাপূর্ণা তা হননি। দেহাবসানের পরেও তাঁর বই আজও বাঙালি পাঠক পাঠিকা পরম সমাদরে বুকে তুলে নেয়।

সাহিত্য আকাদেমি তাঁকে পুরস্কৃত করেনি। কেন করেনি তা ঈশ্বর জানেন। এটা তাঁদেরই দুর্ভাগ্য। কিন্তু জ্ঞানপীঠ সেই ভুল করেনি। তাঁদের ধন্যবাদ।

আশাদির কোনও ক্ষোভ বা প্রত্যাশার বালাই ছিল বলে মনে হয় না। যখনই কথা বলেছি, দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে তাঁকে প্রসন্ন ও নিরুদ্বেগ বলে মনে হয়েছে। নিজের লেখালেখি সম্পর্কে আগ বাড়িয়ে সোচ্চার মন্তব্য কখনও করতেন না। এই মানুষটি মানুষের কাছ থেকে তাঁর যথাযথ পুরস্কার অনেক পেয়েছেন। প্রতিষ্ঠানিক পুরস্কার তাঁকে আর কতটা নন্দিত করবে! তবু বলি, সাহিত্য আকাদেমি বেশ কয়েকজন অযোগ্যকে পুরস্কৃত করেছেন, যাদের নাম আর এখন উচ্চারিত হয় না। আশাপূর্ণার মতো একজন প্রধান ও বিশিষ্ট লেখিকা কেন তাদের বিবেচনায় স্থান পেলেন না তা কে বলবে।

আশাদির বেশ কিছু ভাষণ আমি শুনেছি। সেগুলো এত ঘরোয়া, এত খোলামেলা এবং মনোগ্রাহী যে ভাষণ বা বক্তৃতা বলে মনেই হত না। যেন নিজের বৈঠকখানায় বসে আপনজনদের নিজের কথা শোনাচ্ছেন। আর কথার মধ্যে বিন্দুমাত্র অহং-এর স্পর্শ নেই, উচ্চকিত মন্তব্য নেই, বিন্দুমাত্র অসূয়া বা বিদ্বেষের প্রকাশ নেই। যতবার তাঁর কথা শুনেছি। ততবার নতুন করে মুগ্ধ হয়েছি।

লেখার প্রকরণে তিনি বিশেষ পরীক্ষা নিরীক্ষা করতেন না। ভাষার ব্যবহারেও কোনও অভিনবত্বের অবতারণা করেননি। কিন্তু তাঁর বিষয়বস্তুর মধ্যেই নতুনত্ব ছিল। বিশেষ করে ছোটো গল্পে তিনি মানুষের এমন সব প্রবণতা বা দুর্বলতা কিংবা অনুভূতিকে উন্মোচিত করতেন যে পাঠককে নড়েচড়ে বসতে হত।

আর আশ্চর্যের বিষয়, সমসাময়িক তরুণ লেখকদের সকলের লেখাই তিনি পড়তেন। তরুণ লেখকদের লেখায় ট্র্যাডিশন লঙ্ঘন করা, দুর্বোধ্য গদ্যের ব্যবহার এবং অভিনবত্ব সৃষ্টির নানা প্রচেষ্টায় কণ্টকাকীর্ণ যে বস্তু সৃষ্টি হত তার রসাস্বাদন সাধারণত প্রবীণ লেখকরা খুব একটা করতে চাইতেন না। আশাপূর্ণা দেবী তার ব্যতিক্রম।

দেখাসাক্ষাৎ যে খুব হত তা নয়। কিন্তু যখন হত তখনই তাঁর স্নেহের স্নিগ্ধ ছায়াটি যেন আমার ওপর পড়ত। মনে হত যেন মায়ের কাছে বসে আছি। তাঁর ভিতরে ওই প্রগাঢ় মাতৃত্বের ভাবটাই খুব প্রবল ছিল। সর্বদাই সাদা খোলের শাড়ি পরতেন, কোনও রূপটান ব্যবহার করতেন না, স্নিগ্ধ একটি হাসি তাঁর মুখখানাকে সর্বদাই আলো করে রাখত।

বাংলা সাহিত্যকে তিনি যা দিয়ে গেছেন সেই সম্পদ বাঙালি তথা ভারতবাসী দীর্ঘকাল ভোগ করবে। শুনেছি তাঁর বিখ্যাত ট্রিলজি হিন্দি এবং অন্যান্য ভাষায় প্রচুর বিক্রি হয়। তাঁর বাংলা বইগুলি এতটুকু জনপ্রিয়তা আজও হারায়নি। দেহাবসানের পরেও তাঁর গতি আজও অপ্রতিহত।

শতবর্ষে আশাপূর্ণা দেবীকে স্মরণ করা হচ্ছে। কিন্তু তিনি তো একটুও বিস্মৃত নন। হবেনও না দীর্ঘকাল। বরং তাঁর নতুন নতুন মূল্যায়ন হবে, নবীন পাঠকরা নতুন চোখে তাঁকে পুনরাবিষ্কার করবে।
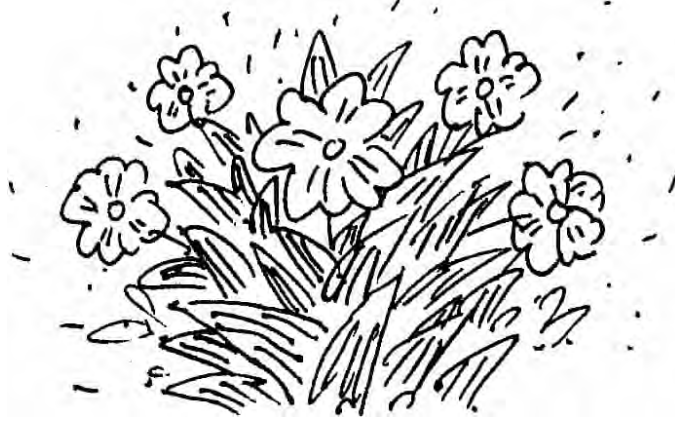
# বর্ণময় সিরাজ

আমাদের ঘনিষ্ঠ, গুরুত্বপূর্ণ বন্ধু ছিল সিরাজ। সিরাজ খুব শুদ্ধ মানুষ ছিল। তাঁর মৃত্যুতে আমি নিঃসঙ্গ হয়ে গেলাম। সেই নিঃসঙ্গতা অনুভব করব প্রতি মুহূর্তে।

দুজনে পাশাপাশি বসে, একই অফিসে একই টেবিলে কাজ করেছি বলে নয়, আমাদের মনের মধ্যে সেই বন্ধুত্বটা কোথাও শিকড় ছড়িয়ে ছিল। প্রগাঢ় ছিল। যদি এককথায় বলতে বলা হয়, তাহলে বলব, ওর চারিত্রিক গুণটাই এমন ছিল যে ওকে ভালো না বেসে থাকা যায় না।

আমি তখন কলেজ স্ট্রিটের কাছে একটা মেসবাড়িতে থাকতাম। তার আগে থেকেই আমার সঙ্গে সিরাজের আলাপ, বন্ধুত্ব। সেই বন্ধুত্ব ক্রমশ গাঢ় হয়েছে। ডালপালা ছড়িয়েছে সুখে-দুঃখে। যখন মেসবাড়িতে থাকতাম তখন প্রায় নিয়মিতই কফিহাউসে আমাদের আড্ডা বসত। আড্ডা চলত মেসবাড়ির ঘরটাতেও। তর্ক চলত। তর্কের বিষয়বস্তু সংস্কৃত কোনও শব্দের অর্থ নিয়ে হতে পারে, আবার তর্ক জমে উঠত ধর্ম-সংক্রান্ত কোনও বিষয় নিয়েও। কত বিষয়, কত আলোচনা, কত তর্ক। নিরন্তর। সেই তর্কের সময়েই বোঝা যেত সিরাজ মানুষটা নিরীহ, স্বল্পবাক, নরম-সরম মানুষ হলেও প্রচণ্ড তার্কিক। বিশেষত তাত্ত্বিক তার্কিক। এত তর্ক হয়েছে, অথচ কখনও কোনও ব্যক্তিগত বিষয়ে আমাদের তর্ক হয়নি। সবসময় তর্ক হয়েছে কোনও তত্ত্বকে ঘিরে। কখনও আবার কোনও শাস্ত্র জিজ্ঞাসাই তর্কের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। এবং সে তর্কে আমরা দুজনেই উপকৃত হয়েছি। পরস্পরের জ্ঞান বেড়েছে। সমৃদ্ধ হয়েছি। স্বাস্থ্যকর তর্ক ছিল সেটা।

বন্ধু তো বন্ধুই হয়। সিরাজের সঙ্গে বন্ধুত্বের পরতে কখনও মনে হয়নি হিন্দু-মসুলমান ব্যাপারটা। অথচ আমি হিন্দু, সিরাজ মুসলমান। আমি নিরামিষাশী। সিরাজের ওসবের বালাই নেই। আমি প্রবলভাবে আস্তিক আর ও প্রচণ্ড নাস্তিক। মনে পড়ছে ও আমাকে বলত, আমি হচ্ছি ওর অসাম্প্রদায়িক বন্ধু। কেন বলত? আমি জানি না। আর আমিও দেখেছি ওর মতো ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ খুব কম আছে।

স্বশিক্ষিত মানুষ ছিল সিরাজ। আরবি-টারবি সেভাবে সিরাজ পড়েনি। কিন্তু আরবি ভাষায় বা শাস্ত্রের লেখার ইংরিজি অনুবাদ পড়েছিল। আর পড়াশুনো করেছিল সংস্কৃত নিয়ে। ওর ঠাকুমা তো হিন্দু ব্রাহ্মণঘরের মেয়ে ছিলেন। সেটা অন্য প্রসঙ্গ, অন্য কথা। ওর নানা বিষয়ে খোঁজখবর রাখা, ইতিহাসের বিভিন্ন দিক নিয়ে পড়াশুনো করা, সববিষয়ে এত প্রবল আগ্রহ আমাকে মুগ্ধ করেছিল।

এই তো দিন চার-পাঁচ আগেও ফোনে কথা হয়েছে। পঞ্চাশ বছরের বন্ধুত্ব। তবে ইদানীং দেখাসাক্ষাৎ সেভাবে ছিল না। কিন্তু আমি জানতাম, সিরাজ আছে। জানতাম, আমি ফোন করলে ও ওপাশ থেকে ফোনটা তুলবে। কথা বলবে। এই যে আজকে ও নেই, এটা এক শূন্যতা মনে হচ্ছে।

ও যত বই লিখেছে তার মধ্যে আমি ব্যাক্তিগতভাবে প্রিয় বই বলব 'উত্তর জাহ্নবী'। গ্রামবাংলার জীবনটাকে ও করতলগত করে রেখেছিল। ওর মতো প্রত্যন্ত প্রান্তের গভীর কথা আর কেউ বলতে পারত বলে আমার মনে হয় না। আসলে জীবনটা তো ওর বর্ণময় ছিল! 'উত্তর জাহ্নবী'র চরিত্রগুলি, 'রানিকুঠির বৃত্তান্ত'র চরিত্রগুলো সবই ভীষণভাবে চেনা। আলকাপের দল নিয়ে ও গ্রামে গ্রামে ঘুরেছে। এই জীবনের অভিজ্ঞতা, অজানা কথা সব উঠে এসেছে ওর লেখায়। অনেকেই 'অলীক মানুষ' নিয়ে উচ্ছ্বসিত হন। আমার কাছে কিন্তু 'অলীক মানুষ'-এর থেকে 'উত্তর জাহ্নবী' অনেক বেশি ওর রিপ্রেজেন্টটিভ উপন্যাস। 'অলীক মানুষ'-এ কোথাও একটা আরোপিত ব্যাপার আছে। ধার করা বিষয় আছে। ম্যাজিক রিয়্যালিটির ফিলোজফি উঠে এসেছে এই উপন্যাসে। কিন্তু 'উত্তর জাহ্নবী'? এখানে কোনও ধার নেই। কোনও জাদুবাস্তবতার প্রায়োগ নেই। নিজের মানুষের নিজের কথা ফুটে উঠেছে উপন্যাসে। আমি ওকে বারবার বলেছি যে, কর্নেল সিরিজের লেখাগুলো ছাড়ো। সিরিয়াস উপন্যাস লেখো। হেসে বলত, সিরিয়াস উপন্যাস সহজে মাথায় আসে না ওর। হালকা চালে কর্নেল লিখতেই ওর সুবিধা হয়। তাছাড়া কর্নেল তো ওকে জনপ্রিয়তা দিয়েছিল।

সিরাজ আর নেই। একই শিফটে দুজনে কাজ করেছি। দুজনে দুজনের বাড়িতেও যাতায়াত করেছি। ওর স্ত্রীকেও আমি খুব স্নেহ করতাম।

সিরাজ অতিশয় স্নেহপ্রবণ মানুষ ছিল। নিজের স্ত্রী-পুত্র-কন্যার সঙ্গে স্নেহবন্ধনটি যে গভীর তা ওর কথাবার্তা থেকেই বুঝতে পারতাম। চারটি ছেলেমেয়েই ভারী মিষ্টি। সহবত জানে। ওর বউ হাসনে আরা বয়সে ওর চেয়ে অনেক ছোট বলে এ নিয়ে আমরা, বন্ধুরা খুব সিরাজের পিছনে লাগতাম, তবে হাসনে আরার সঙ্গে ওর সম্পর্ক ছিল গভীর ও নিষ্ঠ।

তবে সিরাজের বাস্তববুদ্ধির অভাব ছিল খুব। দুমদাম খরচ করে দামি জিনিস কিনে ফেলত। হঠাৎ বাই উঠল খোসবাসপুরে নিজের গ্রামে একটা বাংলোবাড়ি বানাবে। আমি বললাম, দূর পাগল, ওখানে তো তোর পৈতৃকবাড়িই আছে। তাছাড়া গাঁয়ে গিয়ে বাংলোতে থাকবে কে? কিন্তু কথাটা সে কানে তোলেনি, বিস্তর টাকা খরচ করে বাংলো বানিয়েছে, যা তালাবন্ধ পড়ে থাকে। পৈতৃকবাড়িও ফাঁকা, বেশিরভাগটাই তালাবন্ধ।

দোষ-গুণ মিলিয়েই তো মানুষ, সিরাজ তবু বর্ণময় ছিল। বিচিত্র জীবন, বিস্তীর্ণ অভিজ্ঞতা, শীলিত পাণ্ডিত্য সব নিয়ে সিরাজ ঠিক সিরাজের মতোই।

# আধ্যাত্মিক রচনা

# শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র—একটি সাহিত্যিক বিশ্লেষণ

ঠাকুরের কথা, ঈশ্বরের কথা, পরম পিতার কথা, ধর্মের কথা বুঝবার জন্য সকলের জীবনেরই দুঃখ, সংকট বা সমস্যার একটা পটভূমি বোধহয় দরকার। বাস্তবপক্ষে মানুষ এমনিতে যেমন বা যতটাই ঈশ্বর-বিশ্বাসের ভাবে ভাবিত হোক না কেন সংকট বা সমস্যা এবং দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সে যেমন ভাবে তাঁকে খোঁজে তেমন সুখের সময়ে নয়। আর দুঃখ হল ঈশ্বর-বিশ্বাসের একটা পরীক্ষাও। এর ভিতর দিয়েই তাঁর সকাশে যাওয়া সহজতর হয়। ঋণমুক্ত হওয়া যায় নানা প্রবৃত্তির অভিভূতি থেকে, আর প্রবৃত্তি বা রিপুগুলিকে চেনাও যায় সহজে।

শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সম্পর্কে যখনই কিছু লেখার জন্য লেখনী ধারণ করার কথা ভেবেছি তখনই এক দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব এসে আমাকে আন্দোলিত করেছে। থেমে গেছি। মনে হয়েছে, আমি বোধহয় পেরে উঠব না। পেরে উঠব না, কারণ এঁর জীবন আরও আরও পূর্বতন মহাপুরুষদের মতো সহজ ও সরল ভক্তি-রসাশ্রয়ী নয়। ইনি সনাতন আর্য হিন্দুধর্মের শক্ত ভিতের ওপরেই মনুষ্য সমাজকে দাঁড় করাতে চান বটে, কিন্তু ওঁর ধর্মাচরণ এত বেশি বাস্তবমুখী, এত বেশি আচরণ-সাপেক্ষ এবং এত সূক্ষ্ম ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন এঁর দর্শন, সাহিত্য, কাব্য এতই গভীর ও নতুন যে সহজ বুদ্ধিতে এঁর পরিমাপ করতে গেলে ঠিক থৈ পাওয়া যায় না। যা তিনি বলেছেন তা সারাটি জীবন ধরে নিজে কাঁটায় কাঁটায় অনুসরণ করেছেন, কোথাও কোনও খেলাপ নেই। কখনও কারও সঙ্গে আপস রফায় যাননি, একটা জীবন তিনি কখনও নিজের বলা কথার উল্টোটি বলেননি, নিজের দেওয়া উপদেশের বিরুদ্ধে চলেননি। আচরণশীলতা, চর্চা, অভ্যাসের ভিতর দিয়ে ধর্মাচরণকে তিনি ফলিত ও জীবনমুখী করে দেখিয়ে গেছেন, ধর্ম প্রকৃতপক্ষে কল্পনাবিলাস অহেতুক কৃপা বা ঈশ্বরের কৃপণ দান প্রাপ্তি নয়। ধর্ম মানুষকে উচ্ছল, অনাসক্ত, অনলস, উজ্জ্বল, দক্ষ ও সফল করে যদি তুলতেই না পারে তবে ধর্মের আর কোনও উদ্দেশ্য দিয়ে আমাদের কাজ নেই।

ধর্ম কথার অর্থ যা ধারণ করে থাকে। অর্থাৎ মানুষের জীবনকে যা ধারণ করে এবং তার বৃদ্ধিকে যা অবাধ করে। মানুষের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য কিছু না কিছু থাকবেই। ধর্ম তার এই বৈশিষ্ট্যগুলিকেই ফুটিয়ে তোলে।

দীক্ষা অর্থে দক্ষতা। মানুষ তার সব-বৈশিষ্ট্যে দক্ষ হয়ে উঠে নিজে যখন সার্থক হয় এবং অপরকে সার্থক করে তোলে তখনই প্রকৃত ধর্মাচরণ হল। বৈরাগ্য, সন্ন্যাস, ত্যাগ, সাধনা, ব্রহ্মচর্য এসব যদি নিজের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া যায় তাহলে মানুষের প্রকৃতিদত্ত বৃত্তি ও প্রবৃত্তিগুলিকে কিছুতেই নিয়ন্ত্রণে আনা যায় না, বরং তা থেকে নানা রকম বিবৃত্তি ও উৎপাতের সৃষ্টি হতে থাকে। সুতরাং বৈরাগ্য, সন্ন্যাস, ব্রহ্মচর্য এসব সহজভাবে জীবনে প্রতিপালিত হয় না। এক ধরনের মানসিক ব্যায়াম ও কসরতে পর্যবসিত হয়। কিন্তু প্রকৃত গুরু পুরুষোত্তমের আশ্রয় নিয়ে যদি তাঁরই সেবায় নিজের বৃত্তি ও প্রবৃত্তিগুলিকে জীবনমুখী করে নিয়োগ করা যায় তাহলে সন্ন্যাস ব্রহ্মচর্য আপনিই আসে।

ঠাকুরের কাছে যাওয়ার আগে ঈশ্বরবিশ্বাস বলে আমার কিছুই তেমন ছিল না। গুরুবাদের তীব্র বিরোধীও ছিলাম। আর বিশেষ করে বিরাগ ছিল ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের প্রতি। নানা গুজব ও রটনা তো ছিলই তাঁর সম্পর্কে।

কিন্তু জীবনের এক দুর্বহ দুঃখের দিনে পাকেচক্রে যখন তাঁর কাছে গিয়ে হাজির হলাম তখন তিনি ঈশ্বর না গুরু না অবতার তা কিছুই বুঝিনি, কিন্তু এক লহমায় তাঁকে আমার আপনজন বলে মনে হয়েছিল।

এই 'আপনজন' বলে মনে হওয়াটাই এমন এক অলৌকিক বোধ যা সহজে বোঝা যায় বটে, কিন্তু বহু বাক্য দিয়েও কিছুতেই বোঝানো যায় না।

আমরা কয়েক বন্ধু তাঁর কাছে গিয়েছিলাম। প্রসূন মিত্র, শশাঙ্ক সরকার, চন্দন মজুমদার, মুকুল গুহ এবং আমি। শশাঙ্ক সরকার ঠাকুরের শিষ্য ছিল, একটি ইংলিশ মিডিয়াম মিশনারি স্কুলে চাকরি করে। লম্বা, লকলকে সুদর্শন এই যুবকটিও জীবনে এক প্রবল ধাক্কা খেয়ে পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিল একদা। এই ঘটনার বেশ কিছুদিন আগে সে দীক্ষা নিয়েছিল বটে, কিন্তু স্বভাবত কিছু খেয়ালী হওয়ায় সে দীক্ষার পর করণীয় কিছুই করত না। বড়লোকের আদুরে ছেলে ছিল সে, তাই স্বভাব কিছুটা উগ্র, কিছুটা অগোছাল। নিক্কো বোর্ডিং ছিল হ্যারিসন রোডের ওপর, আমহার্স্ট স্ট্রিট ক্রসিং-এর কাছে। সেখানে সে থাকত। বাথরুমের পাশে, ছোট্ট ডবল সিটেড ঘরে। আমার সঙ্গে যখন তার পরিচয় তখন সে জীবনের সেই বড় ধাক্কাটা সামলে ঠাকুরকে আঁকড়ে ধরেছে। নিরামিষ খায়, ধ্যান করে।

আমি যখন মানসিক বিপর্যয়ে আক্রান্ত হয়ে ভিতরে ভিতরে জ্বালা যন্ত্রণায় জ্বলে খাক ও ক্ষয় হয়ে যাচ্ছি, যখন আত্মহত্যা করা ছাড়া অন্য পথ সুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, বুদ্ধিতে দেখা দিচ্ছে নানা ওলটপালট তখন একদিন শশাঙ্কের ঘরে গিয়ে হানা দিলাম। তার সাদা চাদর পাতা পরিচ্ছন্ন বিছানা, তার পরিষ্কার জামাকাপড়, টেবিলে এবং দেয়ালে ঠাকুরের ছবি—এসবের মধ্যে গিয়ে হঠাৎ কেন যেন ভালো লাগতে লাগল। যতক্ষণ শশাঙ্কর ঘরে থাকতাম ততক্ষণ মনটা বেশ ভাল থাকত। আর শশাঙ্কও বুঝতে পেরেছিল, আমার মানসিক সংকট চলছে। তাই সে বলত, আমার মাস্টারির সময়টুকু বাদ দিয়ে সারাক্ষণ আমি তোমার জন্য এ ঘরে অপেক্ষা করব। তোমার যখন খুশি এসো, মাঝরাত হলেও দ্বিধা কোরো না।

বাস্তবিকই শশাঙ্ক তখন আমাকে মস্ত এক সহায়তা আর সাহচর্য দিয়েছিল। না দিলে কী যে হত তা ভাবতেও আজ আতঙ্ক হয়।

মৃত্যুচিন্তা, নশ্বরতার চিন্তা মানুষকে যখন পেয়ে বসে তখন ভূতের মতোই পায়। আর তীব্র ওই বিষাদরোগ এমনই সাঙ্ঘাতিক যে, শত্রুরও যেন ওই রোগ না হয়, এমন প্রার্থনা স্বতঃই মনে আসে। শশাঙ্কর ঘরে গেলে কিছুক্ষণের জন্য যে ওই পাষাণভার থেকে আমার মন মুক্ত থাকত সেটা আমি সবিস্ময়ে লক্ষ্য করতাম। মনে প্রশ্ন হত, তবে কি এ ওর ঠাকুরেরই প্রভাব?

ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সম্পর্কে অনেক অপপ্রচার ও রটনা আছে। কতকাল আগে থেকে 'শনিবারের চিঠি' ও অন্যান্য ব্যক্তি এই কাজে ব্রতী হয়েছেন। তাঁদের যুক্তি ও সিদ্ধান্ত ঠাকুরের বিপক্ষে গেলেও তাঁরা পরে-প্রচারে স্বীকার করেছেন যে, মানুষটি ক্ষমতাবান। ইনি লোককে সম্মোহিত করে রাখেন! তাঁর চারিত্রিক

অপবাদও প্রচুর রটিত হয়। আবার যাঁরা স্বচক্ষে ঠাকুরের কীর্তনযুগের লীলা দেখেছেন তাঁরা তাঁর বিরোধী হয়েও সভায় তাঁকে এড়িয়ে চলেছেন। আমরাও এসব বিষয়ে সচেতন ছিলাম।

শশাঙ্ক যখন ঠাকুরের কথা একটু আধটু আমাকে বলার চেষ্টা করত তখন কিন্তু আমি তেমন প্রতিবাদ করতাম না। আমি চুপ করে বসে শুনতাম। এবং ঘরের পরিমণ্ডলে একটি মৃদু নিরাময়কারী শান্ত পরিমণ্ডলকে অনুভব করতাম। আমার তাপিত হৃদয় যেন শান্ত হয়ে তার উদ্যত ফণা নামিয়ে নিত।

তিন চার দিন বাদে শশাঙ্ক একদিন বলল, চল, খোদ কর্তার কাছে গিয়ে তোমার মানসিক সংকটের কথা বলবে। দেখ না, কী হয়।

প্রস্তাবটা আমার খুব খারাপ লাগল না। মনে হল, উনি হিপনোটাইজ করলে করুন না। আমার এখন সম্মোহিত থাকারই প্রয়োজন। দুঃসহ দুর্বহ এই বিষাদ আমি আর বইতে পারছি না।

প্রসূন, শশাঙ্ক, মুকুল, চন্দন আর আমি। আমাদের সকলেরই বয়স তখন ত্রিশের এদিক ওদিক। আমার নিজের বয়স তখন ঊনত্রিশ। ১৯৬৫ সালের জানুয়ারির শেষ বা ফেব্রুয়ারির শুরু। সঠিক তারিখটা মনে নেই। রাত্রির ট্রেনে আমরা পাঁচ জন হৈ হৈ করে চেপে বসলাম। গল্প গুজবেই পথটা প্রায় কেটে গেল। যশিডি মোটে ছয় ঘণ্টার রাস্তা। ঢুলতে ঢুলতে যখন ভোর রাত্রে 'যশিডি', 'যশিডি' চিৎকার শুনে হুড়মুড় করে নামলাম তখন কনকনে শীত।

যশিডি থেকে সৎসঙ্গ আশ্রম মাইল পাঁচেকের পথ। স্টেশনে ভাঁড়ে গরম চা খেয়ে টাঙ্গায় চেপে রওনা দেওয়া গেল। আর সঙ্গে সঙ্গেই জুড়িয়ে গেল দুটি চোখ আর বুক। কোন এক রহস্যময় অলৌকিক পুরুষের সন্নিধানে চলেছি আমরা, কিন্তু যাওয়ার পথের প্রাকৃতিক শোভাও যে অনুপম। ছোট ছোট টিলা, আদিগন্ত উচ্চাবচ প্রান্তর আর লালমাটির এই দেশটির প্রেমে পড়ে যেতে হয় প্রথম দর্শনেই। প্রাকৃতিক শোভা আশৈশব আমি বড় কম দেখিনি। কিন্তু দেওঘরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আমাকে আজও যত সম্মোহিত করে তত আর কোনও জায়গা নয়।

পথে যেতে যেতে পাঁচ জন মিলে নানা রঙ্গ রসিকতা আর ঠাট্টা ইয়ার্কি হচ্ছিল। প্রসূন অর্থাৎ আকাশবাণীর প্রসূন মিত্র এক সময়ে দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশনে চাকরি করেছে। কিন্তু তখন সে ঠাকুরের কাছে যায়নি বা তাঁকে কখনও দেখেনি। শশাঙ্ক ছাড়া আমরা আর কেউই দেখিনি তাঁকে। আমার বুকটা মাঝে মাঝে গুড়গুড় করছিল। ধর্মের বকলমে কত ভণ্ডামিই তো আছে, ইনি খাঁটি না ভেজাল তা কী করে বুঝব?

দেওঘর সৎসঙ্গ নগরের প্রবেশ পথে যে তোরণ এখন রয়েছে তা তখন ছিল কিনা মনে নেই। যতদূর জানি ছিল না। লেভেল ক্রসিং পার হয়েই বাঁ ধারে চমৎকার কম্পাউন্ড ঘেরা চৌধুরি ভিলা। কোনও বড়লোক একদা বানিয়েছিলেন, সৎসঙ্গ বাড়িটি কিনে নিয়ে গেস্ট হাউস বানিয়েছে। মাঝখানে হলঘর আর গুটি চারেক শোওয়ার ঘর, সামনে বেশ বড় একটি লন।

এই বাড়িতে থাকতেন পরেশদা, অর্থাৎ পরেশচন্দ্র ভোরা। এখন ইনি সৎসঙ্গের মুখপত্র 'আলোচনা'-র সহকারী সম্পাদক। সেই সাতসকালে তাঁর ঘুম ভাঙানো হল, উনিও কবোষ্ণ লেপের আশ্রয় ছেড়ে উঠে এসে যে উজ্জ্বল হাসিমুখে আমাদের গ্রহণ করলেন সেই অমলিন হাসি তাঁর আজও অম্লান আছে।

একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে আমরা মাইলখানেক দূরে আশ্রমে রওনা হলাম। রাজনারায়ণ বসু রোডটি এতই শান্ত, বৃক্ষছায়ায় সংবলিত যে মনটা স্নিগ্ধ হয়ে যায়। চারদিকে ভোরের একটি পরিচ্ছন্ন আবহ।

সবে রোদ ফুটেছে। আমরা গিয়ে আশ্রমের চৌহদ্দিতে ঢুকলাম।

ঠাকুর তখন নিরালা নিবেশে বসতেন। মাঝখানের উঠোনে সামিয়ানা ছিল কিনা মনে নেই। কিন্তু তাঁর পার্লারে একটু রোদ পড়ে ছিল, এটা মনে আছে।

একটু দূর থেকেই তাঁকে দেখা যাচ্ছিল। পার্লারের মস্ত মস্ত খোলা জানালা দিয়ে তখন অবারিতই দেখা যেত তাঁকে।

মুক্তকণ্ঠে বলি অমন রূপ জন্মেও দেখিনি। তাঁর দেহবর্ণ ছিল তাম্রাভ গৌর। তখন তাঁর বয়স সাতাত্তরের মতো। ওই বয়সে যে অমন দেবোপম রূপ কোনও মানুষের থাকতে পারে তা আমার ধারণায় ছিল না। তাঁর পরনে ছিল চিরাচরিত ধুতি, গায়ে একখানা ফতুয়া, কাঁধের ওপর দিয়ে আলগোছে ফেলে রাখা একখানা বালাপোশ। তামাকের গন্ধে মম করছে চারপাশ। আর ওই পার্লারে থেকে ধূপ বা অন্যান্য গন্ধ দ্রব্যের এবং কাঠের নিজস্ব গন্ধ এবং সর্বোপরি তাঁর দৈবী উপস্থিতির এক সুঘ্রাণ মিলেমিশে এমন একটা পরিমণ্ডল রচনা করেছিল যে ভারি মনোরম লাগল আমাদের।

কিন্তু যে জিনিসটি আমাকে আমূল চমকে দিয়েছিল তা হল তাঁর দু'খানি চোখ। সেই দুই চোখের বর্ণনা কী ভাবে দেব? বহুবার চেষ্টা করে দেখেছি, পারিনি। আয়ত দুই বিশাল চক্ষু থেকে এক কারুণ্যের আলো হীরক দীপ্তির মতো ছড়িয়ে পড়েছে। চোখ যে অত দ্যুতিময় হতে পারে তা আমার ধারণার অতীত ছিল। অন্তর্ভেদী সেই চোখের দিকে বেশীক্ষণ চেয়ে থাকাই ছিল অসম্ভব। সুন্দর চোখ তো অনেকেরই থাকে, কিন্তু ওরকম যোগীচক্ষু বিরল।

প্রসূনই আমাকে বলল, এঁকে আমি আগে কখনও দেখিনি। কিন্তু প্রকৃত যোগীচক্ষুর অধিকারী এই মানুষটির কাছে আমার অনেক আগেই আসা উচিত ছিল।

ঠাকুর কথা বলতেন কম, শুনতেন বেশী। যা শুনতেন তা মন দিয়ে নিবিষ্ট হয়ে শুনতেন। একটি দুটি কথায় জবাব দিতেন। তাঁর পার্লারে ভোর থেকে রাত্রি অবধি অবিরল মানুষের যাওয়া আসা। ওরকম মানুষ-মাতাল আমি তো কখনও দেখিনি। পার্লারটাই ঠাকুরের শোওয়া বসা দিন রাত্রি অবস্থানের ঘর। কিন্তু সেই ঘরে অন্দর ও বাহির একাকার হয়ে গেছে। লাগোয়া একটি ঘরে বড়মা থাকেন, সে ঘরখানাও দিনরাত্রি মানুষের সমাগমে মুখরিত।

দেখেশুনে মনে প্রশ্ন হল, ইনি খান বা ঘুমোন কখন? এঁর কি ব্যক্তিগত জীবন বলে কিছু নেই?

ধীরে ধীরে জেনেছি, সেই কৈশোরকাল থেকেই তাঁর ব্যক্তিগত জীবন বলে কিছু ছিল না, এখনও নেই। সারাদিন এক জনস্রোত এসে এই মহাসমুদ্রের কাছে নিজেদের বিলিয়ে দিচ্ছে। আর মানুষও যে কত রকম। উচ্চতম কোটি থেকে নিম্নতম কোটির, বিচিত্র ও বহুবিধ এত মানুষকে সামাল দেওয়া যার তার কাজ তো নয়।

আমাদের প্রথম মুগ্ধতা ধীরে ধীরে গাঢ় থেকে গাঢ়তর হচ্ছিল। যতবার তাঁর কাছে যাই, ততবারই যেন মনে হয়, এঁর মতো কাউকে তো কখনও দেখিনি। হাজার জন মানুষের মধ্যে থাকলেও এঁকে আলাদা বলে চিনে নিতে এক লহমাও লাগে না।

রে হাউজারম্যান নামে যে মার্কিক সৎসঙ্গী সেই ত্রিশের দশক থেকে ঠাকুরের কাছে আছেন। তিনি একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ঠাকুরের কাছে গেলে তুমি ইলেকট্রিসিটির মতো কিছু কি টের পাও?

বাস্তবিক ঠাকুরকে কখনও স্পর্শ না করলেও আমি দু একবার তাঁর তিন চার ফুট দূরত্বের মধ্যে গেছি। আর তখন যে এক তড়িৎবাহী পরিমণ্ডলকে খুব স্পষ্ট অনুভব করেছি তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কেমন যেন গা শিউরে উঠত, অদ্ভুত এক অনুভূতি হতে থাকত।

প্রথমবারের কথা বলি। ঠাকুর যজন, যাজন, ইষ্টভূতি এই তিন স্তম্ভের ওপর তাঁর জীবনাদর্শকে স্থাপন করেছেন। সেই সঙ্গে স্বস্ত্যয়নী ও সদাচার। যাই হোক, যজন, যাজন ও ইষ্টভূমি এই তিনটি নীতির মধ্যেই জীবনের যত কিছুর পরিপূরণী শক্তি রয়ে গেছে। শুনতে ছোট্ট তিনটি কথা। কিন্তু কার্যত এই তিনটি নীতি যে কোনও মানুষেরই অমৃত-অভিসারের পরম পাথেয় এবং এক বৃহৎ কর্মযজ্ঞ। যজন কথার মধ্যে নিহিত আছে ব্যক্তিগত নামধ্যান পরায়ণতা। জপ ধ্যান নিয়ে অনেক কথা আছে। বীজ নামও আছে অনেক রকম। আমি শ্রী শ্রী ঠাকুরের সৎনাম গ্রহণ করার পর এই নাম জপের যে প্রত্যক্ষ শরীরী স্বরূপ অনুভব করেছি তা আমার মতো নাস্তিককে খুবই বিস্মিত করেছিল। শুধু আমার অভিজ্ঞতা বলে কথা নয়, যে লক্ষ লক্ষ মানুষ এই সৎনাম গ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে যাঁরাই কয়েকদিন নিয়ম মতো এই নাম জপ করেছেন তাঁদের সকলের

অভিজ্ঞতাই কম বেশী একই রকম। যাঁরা নাম ধ্যানে প্রাগ্রসর তাঁদের অভিজ্ঞতা যে কত বিচিত্র, অনুভূতি যে কত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তরঙ্গকে ধরেছে তার ইয়ত্তা নেই। সহজ স্বাভাবিক ধ্যানেই শঙ্খনাদ ঘণ্টাধ্বনি শোনা যায়, দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজের সত্তাকে অনুভব করা যায়। তবু এসব অনুভূতি বা উপলব্ধিকে ঠাকুর খুব বেশি প্রশ্রয় দিতেন না।

এক সময়ে এমন হয়েছিল যে, শিষ্যরা ধ্যানের নেশায় খুব বুঁদ হয়ে থাকতেন, কাজেকর্মে গা করতেন না। ঠাকুর তখন এইসব অনুভূতি কিছুটা হ্রাস করে দেন। নাম ধ্যানে যে আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় তাতে তো সন্দেহ নেই, কিন্তু কাজকর্মের ভিতর দিয়ে হাতে কলমে যদি জগতের মঙ্গল করার উদ্যোগ না থাকে তবে সেই আধ্যাত্মিকতার মূল্য কী? ঠাকুর যে ধর্ম করার জন্য এসেছেন তা ফলিত ধর্ম, তা সকলকে নিয়ে, গোটা জগৎকে মঙ্গলাভিমুখী করার ধর্ম, তা শুধু ব্যক্তিগত মোক্ষ নয়। ধর্ম মানেই অস্তিত্বকে রক্ষা করে বর্দ্ধনের পথে অগ্রসর হওয়া, সবাইকে নিয়ে। এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হলে আমাদের যেরকম পারিপার্শ্বিকের ওপর নির্ভর করতে হয়, সেরকম পারিপার্শ্বিকও আমাদের ওপর নির্ভরশীল। কাজেই নিজের যদি ভাল চাই তাহলে পারিপার্শ্বিকেরও ভাল চাইতে হবে, তাকেও পোষণ দিতে হবে পালন করতে হবে। এই সরল লজিক মানতে বোধহয়ও আপত্তি হবে না। ধর্ম অর্থে জীবন ও বৃদ্ধির ধর্ম, অন্য কোনও ধর্ম নেই।

ঠাকুর যখন ধর্মকে আমাদের হাতের মুঠোয় এনে দিলেন, সহজসাধ্য করে তুললেন, ধর্মের ফলিত রূপ যখন আমরা একটু একটু উপলব্ধি করতে লাগলাম, তখনই ধর্ম সম্পর্কে অনেক ধোঁয়াটে ধারণা, অনাবশ্যক কল্পনা, ধাঁধা কেটে যেতে লাগল, অনেক কঠিন তত্ত্বকথা হয়ে যেতে লাগল সরল সহজ।

কিন্তু এসব উপলব্ধি হয়েছে পরে। ঠাকুরকে নিয়ে আমাদের প্রাথমিক অভিজ্ঞতার কথা সবে তো শুরু হয়েছে।

প্রথমবার দেওঘরে আমরা বোধহয় পাঁচ দিন ছিলাম। আশ্রমের বাইরে দোকানে সুস্বাদু আলুর চপ, কচুরি, বাঁধাকপির বড়া দেদার খাই। ভাঁড়ের পর ভাঁড় চা, আর সেইসঙ্গে আড্ডা বিতর্ক। সেই বিতর্কের সবটাই ঠাকুরকে নিয়ে। ঠাকুরকে তখনও আমরা গ্রহণ করিনি। ওদিকে শিষ্যরা আমাদের নানা ভাবে ঠাকুরের মহত্ব বোঝানোর চেষ্টা করছেন, যাজন করছেন। আমরাও তর্কে মেতে জাল কেটে বেরিয়ে পড়ার চেষ্টা করছি। তখন দীক্ষা, গুরুকরণ ইত্যাদি ভাবতেই আমাদের ভেতরটা সংকুচিত হয়ে পড়ে। ওসব মানি না। ঘোরতর নাস্তিক আমি তো ছিলামই তখন।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, যখনই ঠাকুরের কাছে গিয়ে বসি তৎক্ষণাৎ মনটা যেন ভাল হয়ে ওঠে। সেইসঙ্গে একটু কেমন যেন গা শিরশির করা ভয় ভয় ভাবও। কারণ তাঁর ওই দুখানা অন্তর্ভেদী চোখ। কিছুতেই ওই চোখে চোখ রাখতে পারতাম না। বুক দুরদুর করত।

ঠাকুরের কাছে আমার জিজ্ঞাসা ছিল অনেক। কিন্তু আমি স্বভাবে লাজুক বলে এবং ঠাকুরের কাছে সর্বদাই বহু-লোকের ভীড় বলে কিছুতেই কোনও কথা জিজ্ঞেস করতে পারতাম না। কিন্তু সকালে বা সন্ধ্যায় বেশ কিছুক্ষণ আমি ঠাকুরের কাছে বসে থাকতাম। কেন কে জানে, সেই সান্নিধ্য আমার বড় ভাল লাগত।

ঠাকুরের কাছে দুটো প্রশ্ন নিবেদন করব বলে মনে মনে স্থির করে রেখেছিলাম। তীব্র মানসিক বিষাদ শুরু হওয়ার পর থেকে আমি নানা ধর্মগ্রন্থ খামচা খামচি করে পড়েছি। স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলীতে কল্পান্তের কথা পেয়েছিলাম। স্বপ্ন যখন শেষ হয় তখন বিশ্ব জগতের সমস্ত গ্রহ নক্ষত্র জ্যোতিহারা হয়ে পরস্পর এক হয়ে পিণ্ডের আকার ধারণ করে। সেই পিণ্ড আবার একদিন বিস্ফোরিত হয় এবং নতুন করে সৃষ্টি হয় গ্রহ, নক্ষত্র, নীহারিকা। কল্পান্ত সত্যিই ঘটে কিনা এ ছিল আমার প্রথম প্রশ্ন।

দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল, দীক্ষা গ্রহণ না করে যদি আমি ঠাকুরের উপদেশ ও পরামর্শ অনুযায়ী চলি তাহলে আমার কোনও উপকার বা উন্নতি হবে কিনা। দীক্ষা গ্রহণের অর্থ তখন অন্যের কাছে মাথা নোয়ানো, আত্মবিসর্জন এবং আত্মাবমাননা।

যাই হোক, স্বপ্ন আর দীক্ষা বিষয়ে আমার দুটি প্রশ্ন কিছুতেই উত্থাপন করে উঠতে পারছিলাম না।

একদিন সন্ধ্যেবেলা নিরালা নিবেশে ঠাকুরের সামনে বেশ লোকের ভীড়। নানা সমালোচনা চলছে। ঠাকুরের কাছে যাঁরা বসেছেন তাঁরাই জানেন সর্বদাই সেখানে জ্ঞানের চর্চা হত, শুধু বসে থাকলেই কত বিষয় যে জানা হয়ে যেত তার ইয়ত্তা নেই।

সেদিন সন্ধ্যায় আমার বন্ধুরা চায়ের দোকানে আড্ডা মারতে গেছে। আমি বিষণ্ণ মনে নিরালা-নিবেশে ঠাকুরের কাছে বসে আছি। সেদিন বেশ ভীড় ছিল পার্লারে। কলকাতা থেকে কোনও এক পণ্ডিত ব্যক্তি এসেছেন, তিনিই ঠাকুরকে নানা প্রশ্ন করছিলেন। বিভিন্ন প্রসঙ্গে আলোচনাও করছিলেন।

আমার কানে সেসব আলোচনা খানিকটা ঢুকছিল, খানিকটা ঢুকছিল না। আমি ঠাকুরের দিকে চেয়ে বসে ছিলাম। আর ভাবছিলাম, ইনি কি সত্যিই ক্ষমতাবান? নাকি সবাই ফককিকারি? ইনি কি সত্যিই আমাকে শান্তি দিতে পারেন? নাকি নানা কথার যে প্রচার শুনি সেগুলোই সত্যি? মনে নানা সংশয় হাজারো প্রশ্ন, প্রবল অবিশ্বাস, তীব্র আকর্ষণ সব মিলিয়ে মিশিয়ে এক সাংঘাতিক দোলাচলের মধ্যে তখন আমার দিন কাটছে।

হঠাৎ এই অন্যমনস্কভাবের ভিতরেই কানে এল কলকাতার সেই পণ্ডিত ঠাকুরকে প্রশ্ন করছেন, আচ্ছা ঠাকুর, উপনিষদে যে কল্প এবং কল্পান্তের কথা আছে তা কি সত্যিই হয় নাকি? কল্পের শেষে সব সৃষ্টির লয় হয়ে বিশ্বজগতের সব ম্যাটার পিণ্ডাকার ধারণ করে এবং তার থেকেই আবার সৃষ্টি শুরু হয়?

আমি এই প্রশ্ন শুনে সচকিত হয়ে নড়েচড়ে বসলাম। কিন্তু ঠাকুর এ প্রশ্নের কী যে একটা উত্তর দিলেন তা দূর থেকে ভাল শুনতে পাইনি। তবে ঠাকুর খুবই সংক্ষেপে কিছু একটা বলেছিলেন।

পণ্ডিত এবার দ্বিতীয় প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা ঠাকুর, যদি কেউ ভেবে থাকে যে, আপনার কাছে দীক্ষা না নিয়ে যদি সে আপনার নির্দেশিত পথে চলে তাহলে তার কোনও উন্নতি হবে কিনা।

এ প্রশ্নটি শুনেই আমি এমন স্তম্ভিত ও হতচকিত হয়ে গেলাম যে, সে অবস্থার কথা এখন বর্ণনা করতেও পারব না। হঠাৎ দেখি, ঠাকুর স্মিত মুখে প্রসন্ন চোখে আমার দিকেই চেয়ে আছেন।

কী জানি কেন, হঠাৎ ভীষণ ভয় হল, মনে হল, এখানে আর এক মুহূর্তও থাকা উচিত হবে না। এরা নিশ্চয়ই যাদুবিদ্যা জানে, থট রিডিং জোন বা ঐ ধরনেরই অপ্রাকৃত কিছু। ঠাকুর সম্ভবত আমার মনের অভ্যন্তরটাও দেখতে পান। অনেক গোপন কথা তো উনি জেনে নেবেন।

এক সাংঘাতিক আতঙ্কে আমি হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে সবেগে পার্লার থেকে বেরিয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে যেখানে আমার বন্ধুরা আড্ডা মারছিল সেই চায়ের দোকানে হাজির হলাম।

আমার উদ্ভ্রান্ত চেহারা ও আতঙ্কিত দৃষ্টি দেখে বন্ধুরা সচকিত হয়ে উঠল। প্রসূন বলল, কী রে, কী হয়েছে?

আমি আতঙ্কিত গলায় বললাম, এখানে আমাদের আর থাকা ঠিক হবে না। চল, কলকাতায় চলে যাই।

কেন, কী হল রে হঠাৎ?

দিস ম্যান ইজ ডেনজারাস।

কে, ঠাকুর?

হ্যাঁ, ঠাকুর ছাড়া আর কে?

বন্ধুরা তখন আমাকে ধরে বসাল। সকলেরই সাংঘাতিক কৌতূহল। ঘটনার কথা শুনতে চায় সবাই। একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে ধীরে ধীরে ঘটনাটা বললাম।

আশ্চর্যের বিষয়, কেউই অবিশ্বাস করল না এবং আমি যতটা ভয় পেয়েছিলাম সেরকম ভয়ের অনুভূতিও কারও হল না। প্রসূনের চোখ তো ছলছল করতে লাগল। সে বলল, ঠাকুরকে প্রথম দেখেই আমি বুঝেছি, ইনি সামান্য মানুষ নন। অনেক সাধু দেখেছি বটে, কিন্তু এরকম যোগীচক্ষু আমি আর দেখিনি।

প্রসূন দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলে কিছুকাল শিক্ষকতা করেছিল কয়েক বছর আগে। তখনকার সময়ে সে কখনও ঠাকুরের কাছে আসেনি বা আসবার আগ্রহ বোধ করেনি। বরং বিরাগই ছিল। এবার সে আফশোস করে বার বার বলছিল, না এসে খুব ভুল করেছি। এতগুলা বছরে অনেক এগিয়ে যাওয়া যেত।

সেইদিন, অর্থাৎ এই ঘটনার পর বাকি রাত্রিটা আমার কিছু অস্থিরতার মধ্যে কেটেছিল। ঘটনাটি যে অলৌকিক, ব্যাখ্যার অতীত তা বুঝতে পারছি, কিন্তু মন মানছে না, যুক্তিবোধ বলছে, যদি কাকতালীয় হয়ে থাকে! এরকম তো হতেই পারে।

কিন্তু মন যে একটা ঝাঁকুনি খেয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। নানা যুক্তিতর্ক আপন মনেই আউড়ে গেছি।

প্রতিদিনই কেউ না কেউ আমাদের যাজন করেছেন, তর্কবিতর্ক বিস্তর হয়েছে, কিন্তু ঠাকুরের আশ্রয় গ্রহণ বা দীক্ষা নেওয়ার বিষয়ে কেউই আমাদের সদুত্তর দিতে পারেননি। শুধু ঠাকুরকে দেখেই আমাদের যা কিছু যাজন হচ্ছিল।

এর মধ্যেই একদিন বিকেলে চৌধুরি ভিলায় এলেন ননীগোপাল চক্রবর্তী। সৎসঙ্গের বর্তমান সম্পাদক ননীদা। তীক্ষ্ন ও অতিকায় সুদর্শন তাঁর চেহারা। ধবধব করছে গায়ের গৌর বর্ণ। তেমনি তাঁর অনুপম বাচনভঙ্গি।

তিনি এসে বললেন, আপনাদের কী সব প্রশ্ন আছে বলে শুনেছি। যদি দয়া করে আমাকে বলেন তবে আমি সাধ্যমতো জবাব দেওয়ার চেষ্টা করতে পারি।

মানুষটির চেহারা এবং বাচনভঙ্গি আমার বেশ ভাল লাগল। তবু একটু তর্ক বাধানোর জন্য বললাম, আমাদের অনেক প্রশ্ন। সব কিছুর জবাব কি আপনি দিতে পারবেন?

ননীদা বিনয়ের সঙ্গে বললেন, সাধ্যমতো চেষ্টা করব।

আমি প্রশ্ন করলাম, মৃত্যুর পর মানুষের অস্তিত্ব কি থাকে? তার কি সত্যিই পুনর্জন্ম হয়?

ননীদা কি একটা জবাব দিতে যাচ্ছিলেন, আমি একটু রূঢ়ভাবে বাধা দিয়ে বললাম, দেখুন, এ ব্যাপারে শাস্ত্রে টাস্ত্রে যা আছে সেগুলো আমরা জানি। ওসব তত্ত্বকথা দয়া করে বলবেন না। আমার প্রশ্ন হল, মৃত্যুর পর যে আত্মার অস্তিত্ব থাকে তা আপনি বাস্তবভাবে জানেন কিনা, এব্যাপারে আপনার কোনও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে কিনা। যদি না থাকে তবে বাগ্বিস্তার বৃথা।

ননীদা কিন্তু সামান্য মাত্রও বিচলিত হলেন না। বললেন, ঠিক আছে, তাই বলব। শুধু একটি ছোট্ট কথা বলে নিই। আপনি যে আছেন এটা যদি সত্যি হয় তবে আপনি যে ছিলেন সেটাও সত্য হতে বাধ্য। আর আপনি যে থাকবেন সেটাও সত্য। আপনি আছেন অথচ আপনি ছিলেন না বা থাকবেন না এটা তো হতে পারে না। বৈজ্ঞানিকভাবেই একথা বলা যায় তো!

আমি প্রসূন মুকুল চন্দন মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম। আমিই বললাম, ঠিক আছে। আপনার কথাটা মেনে নিচ্ছি। এবার বলুন।

ননীদার মেয়ের গল্প বোধহয় অনেকেই শুনে থাকবেন। দীক্ষাপূর্ব জীবনে ওঁর শিশুকন্যা জলে ডুবে যায়। জীবন্ত অবস্থাতেই তাকে জল থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল। ননীদা স্বয়ং লাইফ সেভিং সোসাইটির সদস্য এবং জলে ডোবা মানুষের চিকিৎসাও তিনি জানতেন। মেয়েকে জল থেকে তুলে তাকে উপুড় করে শুইয়ে ম্যাসাজ করার সময় যখন মেয়েটির সাড়া ফিরে আসছে সেইসময় এক গ্রাম্য হাতুড়ে ডাক্তার এসে উল্টো পরামর্শ দেয় এবং ননীদা সেই বিপদে বুদ্ধি স্থির রাখতে না পেরে সেই পরামর্শ মেনে ম্যাসাজ করতে গিয়ে বিপদ ডেকে আনেন। মেয়েটি মারা যায়। ননীদা এই ঘটনা থেকে শোকে এবং ক্ষোভে উন্মাদের মতো হয়ে যান। তাঁর অধীত বিদ্যা তিনি প্রয়োগ করতে পারলেন না! হাতুড়ের পরামর্শে বুদ্ধিভ্রংশের মতো উল্টো কাজ করে বসলেন! ফলে তাঁর আত্মবিশ্বাস নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, এই জীবনে একজন সদগুরু না লাভ করলে যাবতীয় বিদ্যা, কর্ম, প্রয়াস বৃথা যাবে। এই তীব্র আকুলতা ও অনুসন্ধিৎসা থেকেই তিনি একদিন ঠাকুরকে খুঁজে পান। শুধু তাই নয়। দীক্ষা গ্রহণের পর যে মেয়েটি তাঁর ঘরে জন্ম নিল সে হল জাতিস্মর। সে জলে ডুবে যাওয়ার কথা বলত। মেয়েটি জন্মানোর পরই ঠাকুর ননীদার স্ত্রীকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেন, তুই কাঁদিস কেন? আগের মেয়েটির জন্য? ও-ই তো আবার তোর কোলে এসেছে।

গল্পটি তিনি এমনভাবে বলেছিলেন আমাদের মন ভারি আর্দ্র হয়ে গেল। এরপর ননীদার সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ আলোচনা হল। ঠাকুরকে নিয়ে, দীক্ষার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে, সংঘ নিয়ে।

ননীদা চলে যাওয়ার পর আমরা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বললাম অনেকক্ষণ। চন্দন অর্থাৎ চন্দন মজুমদার বয়সে আমাদের সকলের ছোটো, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, অশোকনগরে বাড়ি এবং দর্শন শাস্ত্রে এম এ। চন্দন এমনিতে চমৎকার স্বভাবের ছেলে বিনয়ী, ভদ্র, ভালমানুষ। তবে দর্শন চিন্তায় বিভোর থাকত বলে সে ছিল ভীষণ অন্যমনস্ক আর ভুলো মনের মানুষ। হঠাৎ চন্দন আমাকে বলল, দাদা, আমি ভেবে দেখলাম। আমাকে দীক্ষা নিতে হবে। আজই।

আমি অবাক হয়ে বললাম, বলিস কী? সত্যি দীক্ষা নিবি?

মনে আছে চন্দন হাতজোড় করে বলেছিল, আপনি বাধা দেবেন না। পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষের ভীড়ে আমি সামান্য একজন চন্দন মজুমদার। দীক্ষা নিয়ে যদি আমি বেঁচে থাকার পথ পাই তবে দোষ কী?

বাধা দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। বরং চন্দন দীক্ষা নেবে শুনে আমি মনে মনে কেমন যেন দারুণ খুশিই হয়েছিলাম। বললাম, নে দীক্ষা। আমারও ধারণা, ঠাকুরের বেশ শক্তি আছে। উনি সত্যিকারের পাওয়ারফুল মানুষ।

সেই সন্ধেবেলাতেই চন্দন ঠাকুরবাড়ি চলে গেল। ঠাকুরের অনুমতি নিয়ে তাঁরই নির্দেশে শরৎদার (হালদার) কাছে সৎনাম গ্রহণ করল।

প্রসূন চাকরি করত আকাশবাণীতে। সে ভয়েস অফ আমেরিকায় সংবাদ পাঠকের পদে ইন্টারভিউ দিয়ে চাকরি একরকম পেয়ে বসেছিল। ডাক এলেই ওয়াশিংটনে গিয়ে কাজে যোগ দেবে। এবং সেই চাকরির আশায় সে আকাশবাণীর চাকরিতেও ইতিমধ্যে ইস্তফা দিয়ে বসে আছে। সংসারে তখন তার প্রবল টানাটানি। কিসে কার যাজন হয় তা বলা খুবই কঠিন। হাজার কথাতেও একজন হয়তো মাথা নোয়ায় না। কিন্তু একটা কথাতেই তার হয়তো সব কাঠিন্য জল হয়ে যায়। ঠিক মনে নেই কে, তবে কেউ একজন প্রসূনকে খুব আন্তরিকভাবে বলেছিল, দাদা সুদূর আমেরিকায় চলে যাচ্ছেন, সৎনামটা গ্রহণ করে যান। ভাল হবে।

এতদিন তুমুল তর্ক বিতর্কে যে কাজ হয়নি একজন নাংলা লোকের এই নরম কথায় সেই কাজ হল। প্রসূন দীক্ষা নেবে বলে মনস্থ করে ফেলল। চন্দন যেদিন দীক্ষা নিল তার পর দিনই সকালবেলায় প্রসূন গিয়ে হাজির হল ঠাকুরের কাছে। তার মনোগত ইচ্ছে ছিল ননীদার কাছে নাম নেওয়া। ঠাকুর, কী আশ্চর্য, ননীদাকেই আদেশ দিলেন প্রসূনকে দীক্ষা দিতে।

আমাদের দলের দুজনের এই দীক্ষাগ্রহণ আমার কাছে একটা স্বস্তিদায়ক ঘটনা। দীক্ষান্তে এই দুজনের মধ্যে কী পরিবর্তন হয় তা পর্যবেক্ষণ করাই ছিল আমার বাসনা। যদি দেখি ওদের মধ্যে লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটেছে তাহলে দীক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে আমিও অস্তিবাচক চিন্তা করতে পারি।

রে হাউজারম্যানকে আমার প্রথম আলাপেই বড় ভাল লেগেছিল। এই ছিন্নবাধ্য মানুষটি তখন ঠাকুরের সঙ্গে দীর্ঘদিন অতিবাহিত করেছেন। মার্কিন নাগরিক হাউজারম্যান সেনাবাহিনীর অফিসার ছিলেন। ব্রহ্মদেশে তাঁর পোস্টিং ছিল। সেখান থেকে বদলী হয়ে দেশে ফিরে যাওয়ার পথে কলকাতায় কয়েকদিন থাকতে হয়েছিল। সেই সময়ে আকস্মিক ভাবে স্পেন্স নামে একজন দেশবাসীর সঙ্গে দেখা।

স্পেন্স বিদগ্ধ পণ্ডিত, দার্শনিক, তদুপরি ধনীর দুলাল। তবু বহুকাল আগে তিনি স্বদেশ, আত্মীয়স্বজন ও সম্পদ ছেড়ে ঠাকুরের কাছে চলে এসেছেন। আর ফিরে যাননি। নীলচক্ষু উদাস দৃষ্টি এই মানুষটিকে দেখলেই শ্রদ্ধা হয়।

স্পেন্স হাউজারম্যানকে ঠাকুরের কথা বললেন। বললেন, 'কী অনিত্য বস্তু নিয়ে মেতে আছ! বাঁচতে চাও তো, অমৃতের স্বাদ পেতে চাও তো চলো হিমাইতপুর।

হাউজারম্যানের যুদ্ধক্লান্ত হতাশাগ্রস্ত মন তক্ষুণি সায় দিল। আমেরিকার ওই উন্মত্ত জীবনস্রোত আর সুখের পিছনে নিরন্তর ছোটবার একঘেয়েমি তাকে আর টানছিল না। স্পেন্স-এর সঙ্গে সে রওনা হয়ে পড়ল হিমাইতপুর।

তারপর দীর্ঘদিন কেটেছে। ত্রিশ বছরের ওপর সে রয়ে গেছে ঠাকুরের কাছে। ঋত্বিকের পাঞ্জা পেয়েছে। বহু মার্কিন নারী পুরুষকে সে এনেছে ঠাকুরের কাছে।

আমি যখন তাকে আশ্রমে প্রথম দেখি তখন তার বয়স চল্লিশের এধার ওধার। উৎসাহ উদ্দীপনায় টগবগে এক তরুণ। ঠাকুর বলতে পাগল। খুব বিড়ি খেত আর সারা আশ্রমে নানা কাজে ছুটে বেড়াত। ক্লান্তিহীন, শ্রান্তিহীন, সদাচঞ্চল এই মানুষটিকে আমার বেশ ভাল লেগেছিল। তুলনায় স্পেন্স ছিল গম্ভীর, স্বল্পবাক, চিন্তাশীল, ধীর স্থির।

(হাউজারম্যান পরবর্তীকালে নিউইয়র্কে ঠাকুরের মন্দির তৈরি করেছে এবং এখন সেখানেই ঠাকুরের কাজ নিয়ে আছে।)

আশ্রমে আরও কয়েকজন আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন ডেগলাল। ডেগলাল স্থানীয় লোক। একসময়ে সে ঠাকুরের এবং আশ্রমেরও প্রবল শত্রু ছিল। লাঠিবাজি সে বড় কম করেনি। কিন্তু ক্রমে ক্রমে সে ঠাকুরের অমেয় এবং অমোঘ আকর্ষণে তাঁর সান্নিধ্যে আসে। নিরক্ষর ডেগলালকে ঠাকুরই লেখাপড়া শেখান, বি-এ পাস করান এবং আমেরিকায় পর্যন্ত যাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। ডেগলালকে আমি যখন প্রথম দেখি, সে তখন ঠাকুরের একরোখা ভক্ত। ঠাকুরের বিরুদ্ধে কেউ টুঁ শব্দ করলে সে লাঠি নিয়ে তেড়ে যায়। প্রসূন না জেনে চায়ের দোকানের আড্ডায় কী একটু ঠাট্টা করেছিল, ডেগলাল তাকে এই মারে কি সেই মারে। ঋত্বিকের পাঞ্জাধারী ডেগলাল কাহারও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেককেই দীক্ষা দিয়েছে।

আমার সঙ্গে তার একরকম ভাবসাব হয়ে গেল।

দিন পাঁচেক অবস্থানে আরও অনেকের সঙ্গে আলাপ ঘটল বটে, কিন্তু ঘনিষ্ঠতা হওয়ার অবকাশ ছিল না। পাঁচ দিনে অবশ্য যথেষ্ট সৌহার্দ্য ঘটল পরেশদার সঙ্গে। এই মানুষটি আমাদের রেঁধে খাওয়াতেন, যত্ন আত্তি করতেন। আর ছিলেন সদাপ্রসন্ন, হাস্যমুখ ও উষ্ণ হৃদয়ের অধিকারী। একুশ বছর বাদে আজও তাঁকে সেই একইরকম লাগে। তেমন কোনও পরিবর্তন ঘটেনি।

আমাদের প্রথম আশ্রয়স্থলটির নাম চৌধুরি ভিলা। সামনে মস্ত লন, বড় বড় ঘর, বিশাল বাথরুম, সব মিলিয়ে একটি অভিজাত বাড়ি। চারদিকে গাছগাছালি বিস্তর। তেমনই নির্জনতা। পাশেই যশিডি-দেওঘর রেল লাইন। রোদ হাওয়ার ছড়াছড়ি ছিল চৌধুরি ভিলায়। পরিবেশটি আমার অনেক বাল্যস্মৃতি জাগিয়ে তুলেছিল। আমরা ছেলেবেলায় এরকমই নির্জন ও সুন্দর সব রেল বাংলোয় ছিলাম। আমি ছটফট করতে লাগলাম। তখন আমার অস্বাভাবিক মানসিক অবস্থায় সেই নিরানন্দ ঘর ও সেই বিষণ্ণ মানুষটি যেন ভূতের মতো চেপে বসছিল।

আশ্রমে ফিরে এসে হাঁফ ছাড়লাম বটে। কিন্তু দীর্ঘকাল সেই সন্ধ্যার স্মৃতি আমার মনকে প্রভাবিত করেছে।

চৌধুরি ভিলা থেকে ঠাকুর বাড়ির দূরত্ব এক কিলোমিটারের মতো হবে। ওই রাস্তাটুকুর বড় সৌন্দর্য ছিল। আজও আছে। তবে নির্জনতা ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। গাছপালা বেশ কেটে ফেলা হয়েছে। আর রাস্তাটি হয়েছে জরাজীর্ণ। আমরা ওই পথটুকু যখন গল্প করতে করতে হাঁটতাম তখন মনে হত এই চমৎকার সময় তো কখনও কাটাইনি।

দীক্ষা নেওয়ার আগে থেকেই ঠাকুরের প্রতি আমার একটা প্রচ্ছন্ন ভয় মিশ্রিত আকর্ষণ জন্মায়। ভয় কেন, তা আগেই বলেছি। মনে হত, ইনি আমার ভিতরের সব কথা টের পাচ্ছেন। আর আকর্ষণ অনুভব করেছি

তাঁর ওই অহং শূন্য ভাবটির জন্য। ঠাকুর তখনও এক রহস্যে ভরা মানুষ, দেবতা কি না জানি না। তাঁর সম্পর্কে নানা অপপ্রচার আছে, সেগুলো নিয়েও ভাবছি। আবার মানুষটিকে অস্বীকারও করতে পারছি না।

প্রসূন তো বলেই ছিল, উনি যদি শত পাপও করে থাকেন তবু এঁর মতো শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ নিষ্কলঙ্ক মানুষ আমি আর দেখিনি। বহু সাধু সন্ন্যাসী দেখেছি, কিন্তু এরকম যোগী চক্ষু জীবনে এই প্রথম দেখলাম।

পরবর্তী জীবনে সাধু সন্ন্যাসী দেখার বিস্তর অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে। আমি সকলের মধ্যেই ওই উজ্জ্বলতা, ওই কাঁচ স্বচ্ছ গাত্র ত্বকের ভিতর দিয়ে বিকীরিত প্রভা, দুই আয়ত চক্ষুর অন্তর্ভেদকারী দৃষ্টি খুঁজেছি, পাইনি। আসলে তাঁর মতো দ্বিতীয়টি আর নেই কিনা।

যাই হোক, প্রথমবার ঠাকুরকে দেখে আমার অনেক দিন ধরে জমে ওঠা ধ্যান ধারণায় একটা ঘা পড়েছিল। ভিতরে ভিতরে এক ধরনের আগ্রহও পিপাসা জেগে উঠেছিল। কিন্তু বাধা দিচ্ছিল অহং-বোধ। দীক্ষা গ্রহণ মানেই তো মাথা নোয়ানো, নিজের স্বাধীন ব্যক্তিসত্তাকে বির্সজন দেওয়া এবং খানিকটা ছোটো হয়ে যাওয়া। যদি অন্যের হাত ধরেই আমাকে চলতে হয় তবে আর আমার কৃতিত্ব রইল কোথায়? এইসব ছেলেমানুষি দ্বিধাদ্বন্দ্ব তখন প্রবল। দোটানার মধ্যে পড়ে মনটা বারবার বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছে।

এই দ্বিধাগ্রস্ত মন নিয়েই চার পাঁচদিন দেওঘরে অবস্থানের পর কলকাতায় ফিরে এলাম। কিন্তু মনে হচ্ছিল, এ যেন স্বর্গ থেকে বিদায়। জীবনে ওই তিন চারটে দিনের মতো সুন্দর সময় খুব কমই কাটিয়েছি। খুব গভীর জীবনবোধের একটা আভাস, এক রহস্যে ভরা জগৎ যেন চুম্বক পাহাড়ের মতো আকর্ষণ করছিল সর্বক্ষণ। নিজেকে এই পরিবেশ থেকে প্রায় ছিঁড়ে আনতে হল। কিন্তু চোখে মায়াঞ্জনের মতো লেগে রইল ঠাকুরের অপার্থিব মুখশ্রী, দেওঘরের অসামান্য প্রকৃতি আর নানা টুকরো স্মৃতি।

কলকাতায় পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভালুকের মতো চেপে ধরল মেলাংকলিয়া। যে বিষাদ-রোগ কুরে কুরে খাচ্ছিল আমাকে, এখন তা বহু গুণ বেড়ে হালুম বাঘের মতো বিশাল হাঁ করে গোটাগুটি গিলে ফেলতে চাইছিল আমাকে। ওরকম মেলাংকলিয়া রোগ আমার মহা শক্রুরও যেন না হয়। তার যে কী গভীর যন্ত্রণা, কী নৈরাশ্যের খাদের মধ্যে যে বাস করতে হয় তখন, কী বান্ধবহীন ও একা লাগে নিজেকে তার বোধহয় সঠিক বর্ণনাও হয় না।

'দুঃখরোগ' নামে একটা গল্পের মধ্যে তার কিছু প্রত্যক্ষ বিবরণ দিয়েছিলাম।

ফিরে আসার পর মেলাংকলিয়া যেমন বাড়ল তেমনি মনটা উন্মুখ হয়ে রইল ঠাকুরের দিকে। উনি কি সত্যিই পারেন আমার বিষাদরোগ সারাতে? উনি সত্যিই মহাপুরুষ? উনি কি সত্যিই ঈশ্বরত্বের অধিকারী? না কি ভণ্ড? না কি সবটাই সাজানো ব্যাপার? ব্যবসা? যত ভাবি তত ছটফট করতে থাকি। ঠাকুর সম্পর্কে নেতিবাচক প্রচারগুলোকে তখন কিছুতেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না। তাঁকে যে অন্যরকম দেখে এসেছি।

ঠাকুর নিজেই বলেছেন, সন্দেহ হল ঘুণপোকার মত। প্রশ্রয় দিলে ভিতরে ভিতরে সে মানুষকে ফোঁপড়া করে দেবেই। সন্দেহের বিষ তখন আমাকেও কুরে কুরে খাচ্ছে।

দীক্ষা-পূর্ব জীবনে আমার অভিজ্ঞতায় দুটি ব্যাখ্যার অতীত ঘটনা ঘটেছিল। তারই একটি ঘটনা এই সময়ে।

তখন মেলাংকলিয়ার জন্য রাতে ভালো ঘুম হত না। বেঙ্গল কেমিক্যালস বা ওই ধনের কোনও কোম্পানির একটা ব্রোমাইড মিকশ্চার তখন বাজারে চালু ছিল। আমি সেই ওষুধ এক শিশি কিনে এনেছিলাম, রাত্রে শোওয়ার সময় সেই ওষুধ খেয়ে শুলে শরীরটা কেমন যেন কাঠের মতো আড়ষ্ট বোধ হত। যাকে ঘুম বলে তা হত না বটে, তবে এক ধরনের ঝিমুনি আসত।

সেই ওষুধ খেয়ে একদিন শুয়েছি। একতলার মেসবাড়ির জানলার ধারেই আমার চৌকি। মাঝরাতে হঠাৎ এক বিকট শব্দে তন্দ্রা কেটে গেল। জানালার ধারে রাস্তার ওপর অন্তত পনের কুড়িটা কুকুর প্রাণান্তকর চিৎকার করে ঝগড়া লাগিয়েছে, সেই শব্দে ঘুম ভেঙেই আমার বুকের মধ্যে এমন ধপাস ধপাস করতে লাগল যে, মনে হচ্ছিল এক্ষুণি এই চেঁচানি বন্ধ না হলে মরে যাব। শরীরের সমস্ত স্নায়ু যেন ছিঁড়ে যাচ্ছিল সেই শব্দে। মাথা ঝিমঝিম করছিল। এমনিতে কুকুরের ঝগড়া কতই তো শুনেছি, এখনও শুনি। কিন্তু তখন

দুর্বল স্নায়ু, দুর্বল মাথা, অনিদ্রা পীড়িত শরীর ও মস্তিষ্কে সেই শব্দ যেন মুহুর্মুহু হাতুড়ির ঘা মারছিল। আমি যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠলাম। এবং কে জানে কেন অস্ফুট স্বরে বললাম, তুমি আমাকে আর যন্ত্রণা দিও না, আমি তোমার কাছে দীক্ষা নেবো।

এই কথাটা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে পলকে যেন একলব্যের বাণ কুকুরের মুখ বন্ধ করে দিল। বিবদমান অতগুলি কুকুর কী করে যে একসঙ্গে একেবারে চুপ করে গেল তা কে বলবে? আর সেই কুকুরেরাই পালিয়ে গিয়ে মাড়োয়ারি হাসপাতালের কাছ বরাবর আবার ঝগড়া শুরু করল। কী আশ্চর্য, দূরাগত সেই কুকুরের চেঁচামেচি ঘুম পাড়ানি গানের মতোই ক্রিয়া করল আমার ওপর। বহুদিন বাদে প্রগাঢ় নিদ্রায় আমি ঢলে পড়লাম।

সকালে উঠে প্রাতঃকৃত্যাদি সেরেই গেলাম শশাঙ্কর কাছে। বললাম, সামনে সরস্বতী পুজোর ছুটি আছে, চলো দেওঘরে গিয়ে দীক্ষা নেব।

এই কথায় শশাঙ্কর যে আনন্দ হল তা দেখার মতো। অবেগে সে আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল। সেই সময়ে পেটের এক নিদারুণ যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছিল সে। সেই যন্ত্রণা প্রায় ভুলে গিয়ে সে যেতে রাজি হল আমার সঙ্গে।

এইখানে বলে রাখি শশাঙ্কর সেই পেটের যন্ত্রণা কিছুদিন পর পেপটিক পারফোরেশন বলে নির্ধারিত হয়। একেবার শেষ সময়ে ডায়াগোনসিস হয়েছিল। আর চব্বিশ ঘণ্টার মতো দেরি হলেও হয়তো সে বাঁচত না। মেডিক্যাল কলেজে অপারেশনের পর সে বেঁচে যায়।

যাই হোক, নির্দিষ্ট দিনে অর্থাৎ ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে সরস্বতী পুজোর আগের রাত্রে আমি আর শশাঙ্ক দেওঘরে রওনা দিলাম। মনটা নানা আশঙ্কায়, অনিশ্চয়তায়, দ্বিধায় ভরা। দীক্ষা নেওয়াটা ঠিক হবে কিনা তখনও বুঝতে পারছি না। আধো ঘুমের মধ্যে কুকুরের চিৎকারে ত্রস্ত হয়ে অনির্দেশ একজনকে কথা দিয়ে ফেলেছিলাম, দীক্ষা নেবো। শুধু সেই কথার মান রাখতে ব্যক্তি স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে চলেছি। কাজটা কি ঠিক হচ্ছে? আর সেই অনির্দেশ্য ব্যক্তিটি যে ঠাকুরই তা জেনেও বার বার মনে হচ্ছে, আর কেউ নয় তো!

এইসব দ্বিধা দ্বন্দ্ব মানুষের খুবই স্বাভাবিক। আমরা তো কোন ছার, স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দেরই ছিল।

মনে আছে রাত্রে ট্রেনে আমি আর শশাঙ্ক রওনা হলাম। শশাঙ্ক বেশ অসুস্থ। পেটে অসহ্য ব্যথা। ভীড়ের গাড়িতে শোওয়ার জায়গা পাওয়া গেল না। বসে বসে গল্প করতে করতে চলেছি।

মাঝরাতে যশিডি পৌঁছে স্টেশনের বাইরে চা খেয়ে নিলাম। তারপর টাঙ্গা ধরে সোজা চৌধুরি ভিলা। ভোর রাত্রের দেওঘর আমার মনের ওপর এখনও সেই প্রথমবারের মতোই মায়াজাল বিস্তার করে। পরিখার বাতাস, বনজ গন্ধ এবং উচ্চাবচ ভূ-প্রকৃতি সব মিলিয়ে একটা স্বপ্নস্বপ্ন পরিবেশ।

দরজায় ধাক্কাধাক্কি করতে পরেশদা ঘুম চোখে এসে দরজা খুলে দিলেন এবং আমাকে দেখে সত্যিকারের খুশির হাসি হাসলেন। দীক্ষা নিতে এসেছি, ঠাকুরের আশ্রয় নিতে এসেছি, এর চেয়ে আনন্দের বিষয় যে কোনও ভক্তের কাছে আর কী হতে পারে?

স্নান সেরে, পরিচ্ছন্ন হয়ে ঠাকুরবাড়ি গিয়ে হাজির হলাম। সবে সূর্যোদয় হয়েছে। নিরালা নিবেশে প্রসন্ন মুখে ঠাকুর বসে আছেন। চারদিকে সমাসীন তাঁর প্রিয় মানুষেরা।

প্রণাম করে বললাম, ঠাকুর, আমি দীক্ষা নেবো।

ঘাড় কাৎ করে সম্মতি দিলেন, তারপর কার দিকে যেন চেয়ে বললেন, ওরে, শৈলেনকে ডাক তো।

শৈলেন, অর্থাৎ শ্রী শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তখন সদলবলে ইউনিভার্সিটির জন্য কোথায় যেন জমি দেখতে যাচ্ছেন। গাড়ি প্রস্তুত। তাঁর তখন সময় নেই। খবর পেয়ে ছুটে এলেন।

ঠাকুর আমাকে দেখিয়ে দিয়ে শৈলেনদাকে বললেন, একে দীক্ষা দিয়ে দে।

শৈলেনদা সামান্য দ্বিধায় পড়ে গেলেন। তাঁকে তক্ষুণি রওনা হতে হবে। অথচ দীক্ষা দিতে গেলে যাওয়াই হবে না। হাত জোড় করে বললেন, ঠাকুর, আমি যে কাজে বেরোচ্ছি, সময় নেই।

ঠাকুর সামান্য ধমকের সুরে বললেন, যা বলছি কর না। দীক্ষা দিয়ে দে।

শৈলেনদা ঠাকুরকে তাড়াতাড়ি প্রণাম করে আমাকে নিয়ে এলেন দীক্ষা গৃহে।

কোনও পূর্ব পরিচয় ছিল না শৈলেনদার সঙ্গে। সেই প্রথম পরিচয় হল। মানুষটি ভারি বিবেচক, বিনয়ী, মৃদুভাষী। আমাকে সামনে বসিয়ে দীক্ষা দানের উদ্যোগ করছিলেন।

কিন্তু তখন আমি মনের যে জ্বালায় জ্বলছি তাতে মানসিক ভারসাম্য বলতে কিছু নেই। মনে হচ্ছিল, এই যে দীক্ষা নিতে যাচ্ছি এর ফলে আমার ব্যক্তি স্বাধীনতা গেল, দাসখৎ লিখে দেওয়া হল এবং বিসর্জন দেওয়া হল আত্মমর্যাদা। কিন্তু এর বিনিময়ে আমি কী পাবো? হয়তো কিছুই নয়। হয়তো গোটা ব্যাপারটাই একটা ফককিকারি।

তাই আমি দীক্ষা নেওয়ার প্রাক মুহূর্তে শৈলেনদাকে বললাম, দেখুন, আমি দীক্ষা নিচ্ছি একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে। আমার সেই উদ্দেশ্য যদি সফল না হয় তাহলে ছ মাস পর কিন্তু আমি দীক্ষা ছেড়ে দেবো।

একথায় শৈলেনদা একটু থতমত খেয়ে গেলেন। তারপর বললেন, কী উদ্দেশ্যে আপনি দীক্ষা নিচ্ছেন তা কি আমাকে বলবেন আপনি?

আমি আমার মেলাংকলিয়ার কথা তাঁকে সংক্ষেপে বললাম। তারপর জানালাম, এই মেলাংকলিয়া সারে কিনা তা আমি ছ'মাস দেখব। কাজ না হলে দীক্ষা ছেড়ে দেবো।

শৈলেনদা একটু হেসে বললেন, দেখুন, ঠাকুরের কাছে ধর্ম করতে কম লোকই আসে। সকলেই আসে কোনও না কোনও উদ্দেশ্য বা স্বার্থ সিদ্ধির জন্য। বেশির ভাগই আর্ত মানুষ।

আমিও সেরকমই এক উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি।

শৈলেনদা খুব নিরুদ্বেগ গলায় বললেন, আপনার চেয়ে ঢের বেশি কঠিন সংকট নিয়ে লোকে এখানে আসে। সেই তুলনায় আপনার সমস্যা কিছুই নয়। আপনি ছ'মাস সময় চেয়েছেন। আমি বলি ততদিন লাগবে না। ঠাকুরের এই অমৃত মন্ত্র নিয়ে যদি সাত দিনও আপনি ঠিকমতো চলেন তাহলেই হবে। আমার প্রশ্ন হল, আমি যা যা বলে দেবো তা ঠিকমতো করতে পারবেন তো?

পারব। ডুবন্ত মানুষ তো কুটোও আঁকড়ে ধরে।

তাহলে ছ'মাস নয়, সাত দিন যদি আপনার সমস্যার সমাধান না হয় তাহলেই দীক্ষা ছেড়ে দেবেন।

তাঁর ওই মনের জোর এবং বিশ্বাসের গভীরতায় আমি বেশ প্রভাবিত হলাম। যদিও তাঁকে আমার তখনও এতটা বিশ্বাস হচ্ছে না। সন্দেহ কাজ করছে ভিতরে ভিতরে।

বিনা আড়ম্বরে দীক্ষা হয়ে গেল। বীজমন্ত্রটি পাওয়ার পর থেকেই আমি ভয়ে হোক, উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য হোক, যান্ত্রিকভাবে জপ করে যেতে লাগলাম।

দুপুরে ঠাকুরের সঙ্গে একান্তে সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করতেই তা মঞ্জুর হল। তখন ঘরে বিশেষ কেউ ছিলেনও না। আমি আর পরেশদা নিরালা নিবেশে তাঁর সামনে গিয়ে বসলাম। ঠাকুরের সঙ্গে আমার দূরত্ব মাত্র দু তিন হাত। অত কাছে আর কখনো যাইনি তাঁর। সেই প্রথম তাঁর নৈকট্যে আমার একটা অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল তাঁর চারদিকে একটি অভ্রান্ত বৈদ্যুতিক বলয় রয়েছে। তাঁর অস্তিত্ব থেকে একটা কোনো শক্তি বা দ্যুতি বা ব্যাখ্যার অতীত কোনো কিছু আমাকে স্পর্শ করছে।

ঠাকুর মন দিয়ে আমার সমস্যার কথা শুনলেন। আমি অবশ্যই খুবই সংক্ষেপে আমার কথা বলেছিলাম। দু'তিন মিনিটও বোধহয় লাগে নি। আসলে তাঁর অত কাছাকাছি বসে আমার কেমন স্নায়ুদৌর্বল্য ঘটেছিল। বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। ওরকম কোনও ভগবৎ মানুষের দেখা তো কখনও পাই নি। ওই অভ্রভেদী ব্যক্তিত্ব, দুটি হীরকদীপ্ত চোখ, অন্তর্ভেদী গভীর দৃষ্টি এসবই আমার কাছে এক পরম বিস্ময়।

ঠাকুর আমার সমস্যাকে কিন্তু একেবারেই গুরুত্ব দিলেন না। মাথা নেড়ে বললেন, তুমি উল্টোটা ভাবো। তুমি অজর, অমর, মৃত্যুর কথা ভাববে কেন? ওসব ভাবতে নেই।

আমি বললাম, ভাবতে তো চাই না। কিন্তু ভাবনা আসে যে।

ঠাকুর তেমনি দ্বিধাহীন ভাবে শুধু বললেন, ওসব ভাবতে নেই।

এর মধ্যেই পরেশদাকে তামাক সাজতে বললেন। তারপর চুপ করে গেলেন। আমি তাঁর দিকে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছি, আর তাঁর অসহনী দীপ্তি সহ্য করতে না পেরে মাথা নিচু করছি বারবার।

শেষে বললাম, আপনি আশীর্বাদ করবেন, যেন আমি এই মানসিক সংকট কাটিয়ে উঠতে পারি।

ঠাকুর মাথা হেলিয়ে সম্মতি দিলেন।

প্রণাম করে চলে এলাম। তাঁর সঙ্গে আমার একমাত্র একান্ত সাক্ষাৎকারে এইভাবেই শেষ হল।

ডুবন্ত মানুষ যেমন কুটো আঁকড়ে ধরে আমি তেমনি ধরেছিলাম সদ্যলব্ধ বীজমন্ত্রটিকে। এটুকু বুঝেছিলাম, বীজমন্ত্রটাই আসল। ওর কথাটাই একমাত্র আমাকে রক্ষা করতে পারে। আর যদি বীজমন্ত্র জপে কাজ না হয় তাহলে আর কিছুতেই হবে না। তাই দীক্ষা নেওয়ার পরেই আমি পাগলের মতো জপ করে গেছি। যান্ত্রিকভাবে, ভক্তি বিশ্বাস ছাড়াই এবং সন্দেহাকুল মনেই। পরদিন দেওঘর ছাড়লাম। চলে গেলাম মুরি। সেখানে আমার ছোট পিসিমা তখন থাকতেন। সেখানে দুদিন অবস্থানের পর কলকাতায় ফিরে এলাম। আর ফিরেই বুঝতে পারলাম, আমার মেলাংকলিয়া বা বিষাদরোগ সম্পূর্ণ সেরে গেছে।

বিষাদের কাঁটাটি ঠাকুর কখন সন্তর্পণে তুলে নিয়েছেন তা আমি অনেক ভেবেও আজ অবধি বুঝে উঠতে পারিনি।

মাঝে মাঝে অলৌকিক নিয়ে আমাকে কেউ কেউ প্রশ্ন করে। আমি তার সদুত্তর দিতে পারি না। অলৌকিককে তো ব্যাখ্যাও করা যায় না। কিন্তু জানি আমাদের বুদ্ধির যুক্তির অতীত কত কী ঘটে যায়।

ঠাকুরের কাছে যাওয়ার আগে আমার জীবনে ঠিক এরকম ঘটনা কখনও ঘটে নি।

কিন্তু পৃথিবীর এমন কোনও ঘটনাই ঘটে না যার পিছনে পারম্পর্য নেই, বা যা অযৌক্তিক বা অলৌকিক। ঠাকুর নিজেও তাই বলতেন, কোনও ঘটনা আমাদের স্বাভাবিক বোধবুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না বলেই যে তা অলৌকিক তা কিন্তু নয়। কারণ থাকেই, তবে হয়তো তা আমাদের সাধারণ যুক্তি বা বোধের অগম্য।

বীজমন্ত্র বা নাম জপ করলে রোগ সারে, অনেক সংকটের সমাধান হয় তা আমি নিজের বাইশ বছরের দীক্ষিত জীবনে অসংখ্যবার দেখেছি। নাম যে কতখানি অঘটনঘটনপটিয়সী তা আমার ঠেকে শেখা।

যে তিনটি স্তম্ভের ওপর ঠাকুর তাঁর জীবন সত্যকে স্থাপন করেছেন তা হল যজন যাজন ইষ্টভৃতি। এই আপাত সহজ তিনটি আদর্শকে অনুসরণ করলে যে কোনও মানুষের ভিতরকার সুপ্ত ক্ষমতা জেগে উঠতে থাকে। সে যে কতখানি হয়ে উঠতে পারে তার ঠিক ঠিকানা নেই। কিন্তু এই তিনটি করণীয়কে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, আপাতসহজ মনে হলেও মোটেই তা সহজ নয়। ওই তিনের মধ্যে একজন মানুষের গোটা জীবনের সব কিছুই পোরা রয়েছে। ওই তিনের মধ্যেই জীবন রহস্যের সব সমাধান। আর করতে গেলে দেখা যায় যজন যাজন ইষ্টভূমি এই তিনটি পরস্পর এতই সম্বন্ধযুক্ত যে একটি না করলে অন্যটি হয়ে ওঠেনা। যজন যাজন ইষ্টভৃতি নিয়ে বহুজন বহু কথা বলেছেন, বহু ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, তবু শেষ হয়নি। আরও বহুকাল ধরে এই নিয়ে আলোচনা গবেষণা হতেই থাকবে।

ঠাকুর স্বয়ং এক অতলান্ত রহস্য। একদিকে চূড়ান্ত বাস্তববাদী, অন্যদিকে এক অপার্থিব অলৌকিক প্রেমিক পুরুষোত্তম। কীর্তনের যুগে, অর্থাৎ ঠাকুর যখন নব্য যুবা, তখন নিজেকে ঘিরে এক ভাব পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছিলেন। তখন তিনি সমাধিস্থ হতেন প্রায়ই, আর তাঁর যাঁরা ঘনিষ্ঠ তাঁরাও উন্নীত হতেন ভাবময় এক পর্যায়ে। তখন ধ্যান করতে বসলেই নানা জনের নানা দর্শন ও শ্রবণ হত। ঠিক কতদিন চলেছিল এই অবস্থা তা সঠিক বলা মুস্কিল। তবে ক্রমে ক্রমে এই ভাবমুখিনতা হ্রাস করে কর্মকাণ্ডের দিকে ঝুঁকলেন ঠাকুর। তার কারণ খুবই সহজ। কর্ম ছাড়া মানুষের মুক্তি নেই, মোচন নেই, সম্পূর্ণতা নেই। কর্মের কথাই বারংবার আমাদের শাস্ত্রাদিতে বলা হয়েছে।

এই কর্মযুগ যখন শুরু হল তখন ঠাকুর তাঁর স্বভাবসিদ্ধ গতিবেগ সঞ্চার করে দিলেন তার মধ্যে। কাজের সেই দ্রুত তালের সঙ্গে কীর্তন যুগের সঙ্গীরা তেমন সঙ্গতি রাখতে পারলেন না। একটু থতমত খেয়ে

গেলেন। হয়তো একটু ক্ষুব্ধও হলেন কেউ কেউ। বেশ তো ছিল ভাবে মাতোয়ারা হয়ে থাকার ভক্তিময় যুগ। তবে এই কর্মকাণ্ড কেন?

আসলে ঠাকুরকে প্রাকৃতজনদের বুঝতে একটু অসুবিধে হয় এই কারণেই। জীবনের অতি দ্রুত তাল তাঁর। এক আয়ুর মধ্যে যেন দশ বিশ হাজার বছরের কর্মকাণ্ডের ভার নিয়েছিলেন তিনি। এই দ্রুততার সঙ্গে তাল রাখতে পারে কোন মানুষ?

শুনেছি, ঠাকুর এত দ্রুতবেগে হাঁটতেন যে, তাঁর ভ্রমণ সঙ্গীরা দৌড়েও তাঁর সঙ্গে পেরে উঠতেন না। হাঁটার ভঙ্গির মধ্যে এক ভাসমানতাও ছিল তাঁর। যা কিছু কাজের কথা তাঁর মাথায় আসত তা তৎক্ষণাৎ রূপান্তরিত না করে শান্তি পেতেন না। মাঝে মাঝে ভক্ত শিষ্যদের কাছে এমন সব আব্দার করতেন যেটাকে প্রায় অসম্ভব বা অসাধ্য বলেই মনে হত।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাঁর সেই সব অসম্ভব আব্দার পূরণ করতে নিতান্ত নাংলা সব শিষ্যরাও ঠিক পেরে উঠত। মানুষের যোগ্যতা বৃদ্ধির দিকে ঠাকুরের লক্ষ্য ছিল সর্বাধিক। অধিকাংশ মানুষই যে নিহিত গুণাবলীর সম্যক ব্যবহার করে না, ঠাকুর সেই লুকোনো গুণাবলীই টেনে বের করতেন। তাই সামান্য মানুষকে অসামান্য কাজের দায়িত্ব দিতে দ্বিধা বোধ করতেন না। আর এইভাবে কত অযোগ্যকেই যে ঠাকুর যোগ্য করে তুলেছেন তার ইয়ত্তা নেই।

এই আলোকসামান্য দার্শনিক এবং অনন্য চিন্তাবিদ যে বাস্তববোধেও অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তার দৃষ্টান্ত তাঁর কর্মকাণ্ড। পাবনার হিমাইতপুর গ্রামে তিনি যা গড়ে তুলেছিলেন সেটা বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়। ব্রিটিশ আমলে অলস বাঙালি যখন মোটামুটি কোনওরকমে বেঁচে থাকাটাই বেঁচে থাকার চূড়ান্ত বলে ধরে নিয়েছিল তখন ঠাকুর স্বনির্ভরতার পথ খুলে দিয়েছেন মানুষের কাছে। ইংরেজ বিতাড়নই যে স্বাধীনতা এটা তিনি কখনোই মানতেন না। স্ব-নির্ভর, কান্ডজ্ঞানসম্পন্ন, বাস্তব বোধের অধিকারী, স্বনির্ভর সমাজ গঠিত না হলে স্বাধীনতা বা স্বরাজ যে নজরুলের ভাষায় 'পোড়া বার্ত্তাকু' তে পরিণত হবে তা তিনি বহুবার বলেছেন। মানুষের চরিত্র গঠনের কোনও প্রকৃত প্রয়াস যেমন পরাধীন যুগেও ছিল না, তেমনি এ যুগেও নেই। কিংবা যা আছে তা মনুষ্য চরিত্র অনুধাবন না করেই এক ধরনের ভাসা ভাসা জ্ঞানের ওপর মানুষের চরিত্র গঠনের বিচ্ছিন্ন ও অপ্রতুল প্রয়াস।

ঠাকুরের সংস্পর্শে যারাই এসেছেন তাঁরাই জেনেছেন, প্রতিটি মানুষই তাঁর কাছে কেমন পরম সম্পদের মতো ছিল। কোনও মানুষেকেই তিনি কখনো তুচ্ছ বা সামান্য ভাবতেন না। প্রত্যেককেই দিতেন তাঁর নিজস্ব মূল্য। আর প্রত্যেকের ভিতরেই দেখতে পেতেন যার যার বৈশিষ্ট্য মাফিক সম্ভাবনার বীজ। মানুষের উপরেই ঠাকুরের নির্ভর ছিল বলে মানুষকে সম্পদ করে তোলা কত সহজ হয়েছিল তাঁর পক্ষে।

হিমাইতপুরের মতো গ্রামে তিনি সেই আমলে যে সংগঠন গড়ে তোলেন তা অবিশ্বাস্য। বিশ্ববিজ্ঞান থেকে শুরু করে গেঞ্জিকল, ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে ছুতোর কামারের কাজ অবধি সব ব্যাপারেই সৎসঙ্গ এক বিশাল কর্মযজ্ঞ খুলে বসেছিল। ছিল ওষুধ তৈরির কারখানা, প্রেস ইত্যাদিও। আর এইসব ঠাকুর গড়ে তুলেছিলেন অতি সাধারণ সব মানুষকে নিয়েই।

মানুষের পরিশ্রম করার ক্ষমতা কতখানি তার সম্যকধারণাই আমাদের নেই। আমরা একটু কাজ করেই বিশ্রাম খুঁজি। ঠাকুরের সঙ্গ যাঁরা করেছেন তারাই জানেন ঠাকুর তাঁর সঙ্গীসাথীদের দিয়ে অতি মানুষের খাটুনি খাটিয়েছেন। কিন্তু তাতে তাঁদের আয়ুক্ষয় তো হয়ই নি, বরং আয়ুবৃদ্ধি ঘটেছে, স্বাস্থ্যের ঔজ্জ্বল্য ও কর্মক্ষমতা বেড়েছে বহুগুণ। ডাক্তাররা মানুষকে দিনে আট ঘণ্টা ঘুমোনোর পরামর্শ দেন, কিন্তু ঠাকুর বলতেন, চার ঘণ্টা ঘুমই বহুত। এবং ওই চার ঘণ্টা ঘুমও তিনি বোধহয় কখনোই ঘুমোন নি। দিনের পর দিন ঘুমহীন কেটে যেত তাঁর এবং সঙ্গীদের। এই নিদ্রাহ্রাসের অভিজ্ঞতা আমারও আছে। দেখেছি, ঠাকুরের কাজকর্ম যজন যাজন নিয়ে থাকলে ঘুম খুব কমে যায় এবং শরীরে আসে বাড়তি উদ্যম।

ঠাকুর ফ্যাটিগ লেয়ার পার হয়ে যাওয়ার কথা বলতেন। অর্থাৎ খুব কঠিন পরিশ্রমের পর যে শ্রান্তি আসে তা সাময়িক এবং মানুষ যদি তারপরও কাজ চালিয়ে যেতে থাকে তাহলে এক সময়ে ওই শ্রান্তির ভাবটা কেটে বাড়তি উদ্যম দেখা দেয়। এটা শুধু মুখে বলেই ঠাকুর ক্ষান্ত হননি, করে এবং করিয়ে তবে ছেড়েছেন। ঘুমের ক্ষেত্রেও তাই। মানুষের যখন ঘুম পায় তখন একটু জোর করে জেগে থাকলে ঘুমের ভাবটা কেটে গিয়ে মানুষ আবার চনমনে হয়ে ওঠে।

ঠাকুর অনেক কাজই করতেন প্রচলিত ধ্যান ধারণা ও যুক্তির সম্পূর্ণ বিপরীত পদ্ধতিতে। যুক্তির পরিধি বড়ই ছোট। বুদ্ধি বা যুক্তি দিয়ে পৃথিবীর সব রহস্যের উন্মোচন অসম্ভব।

ঠাকুরের সব ব্যাপারেই ধ্যান ধারণা ও বক্তব্য এত স্পষ্ট, দ্বিধাহীন ও পরিষ্কার ছিল যা এইযুগের দ্বিধাহীন মানসিকতার কাছে খুবই বিস্ময়কর মনে হবে। কখনো কোনো অবস্থাতেই নিজের বক্তব্য থেকে তিনি এক চুল সরে যাননি, আবার কখনো কোন বিতর্কেও জড়িয়ে পড়েন নি। যে কথা সত্য ও যা মঙ্গলপ্রদ তা অকপটে বলতে তাঁর কোনও দ্বিধা ছিল না, কিন্তু বলার মধ্যে বিনয় ও হৃদয়গ্রাহীতা ছিল গভীর।

আমার নিজের কাছে ঠাকুরের অনেক কথাই তেমন মনঃপূত হয়নি প্রথম প্রথম। বিশেষ করে বর্ণাশ্রম ও বিবাহ সংক্রান্ত কঠোর মনোভাবে আমার সায় ছিল না। খাদ্যাখাদ্যের বাছ বিচার, অন্যের হাতে অন্নগ্রহণ ইত্যাদি ব্যাপারও পছন্দ ছিল না। অত্যাধিক ভক্তি ও প্রেমকেও কেমন যেন দাসত্ব বলে মনে হয়েছিল কিন্তু ক্রমে ক্রমে এইসব ধোঁয়াশা কেটে যেতে লাগল। আপোষহীন ঠাকুরের সঙ্গে আপোষ করে নিতে আমার একটু সময় লেগেছিল, এই যা।

তারপর ক্রমে ক্রমে যতই ঠাকুরকে বুঝবার চেষ্টা করেছি ততই সত্যের অনন্ত মুখ খুলে গেছে। তাঁর মধ্যে অবগাহন করতে একবার শুরু করলে আর অন্য কোথাও ডুব দেওয়ার ইচ্ছে হয় না। ঠাকুর কাউকে সর্বত্যাগী সাধু বানাননি, এমন কি যজ্ঞিদেরও এক ধরনের বাঁধনে বেঁধে রেখেছিলেন। কিন্তু তাঁর নিয়তকর্মীরা অনেকেই ছিলেন কঠোর তপস্বীদের চেয়েও অধিক কৃচ্ছ্রসাধনে অভ্যস্ত। সাধুদের জীবনযাপনে ততটা সংযম এবং কৃচ্ছ্রসাধন নেই। ঠাকুর যেমন চলনায় নিজে চলতেন এবং যেমন চলনা শিষ্যদের মধ্যেও তাঁর অভিপ্রেত ছিল তা বড় সহজ নয়।

ঠাকুরের সাংগঠনিক যুগে এই সন্ন্যাসীপ্রতিম নিয়তকর্মীরাই ঠাকুরের বাণী বহন করে গেছেন ভারতবর্ষের দূর ও দুর্গম প্রত্যন্তে। তাঁরা যে অসাধ্য সাধন করেছেন তার প্রকৃত মূল্যায়ন এখনও হয়নি। দারিদ্র্য, ক্ষুধা, দীর্ঘ-প্রবাস, ভর্ৎসনা, লাঞ্ছনা এসবই তাঁদের সয়ে নিতে হয়েছে। আর এর ভিতর দিয়েই ঠাকুর তাঁদের প্রকৃত মানুষ হওয়ার পথে ঠেলে নিয়ে গেছেন।

গুরু কে এবং কেমন, গুরুর গুরুত্ব কতখানি তা চোখে আঙুল দিয়ে ঠাকুরই আমাদের প্রথম বুঝিয়ে দিলেন, দেখিয়ে দিলেন। আজকাল সাধক পুরুষেরা মানুষকে আধ্যাত্মিকতার দীক্ষা দেন বটে, কিন্তু সংকোচ বশে কঠোর অনুশাসন তাদের ওপর আরোপ করেন না। খাদ্যাখাদ্য, সদাচার, বর্ণাশ্রম ব্যক্তিগত সততা, শৃংখলাপরায়ণতা ইত্যাদি ব্যাপারে শিষ্য শিষ্যাদের তাঁরা ঢালাও স্বাধীনতা দিয়ে দেন। এর ফলে তারা দীক্ষার ভিতর দিয়ে দক্ষ হয়ে ওঠার সুযোগ কমই পায়। দীক্ষার পর তাদের চরিত্রে তেমন কোনো পরিবর্তনও আসে না। গুরু একজন মাথার ওপর আছেন, শুধু এই ভরসায় তারা যেমন খুশি চলে।

ঠাকুরের পদ্ধতি সম্পূর্ণ আলাদা। তিনি যেমন প্রতিটি মানুষের দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে নিতেন, তেমনি প্রত্যেককে নিত্য পালনীয় অনুশাসনের আওতায় আনতেন। শুকনো উপদেশ দিয়ে ছেড়ে দেওয়ার মানুষ তিনি ছিলেন না। যারা তাঁরা আশ্রয় নিয়েছে তাদের ভালমন্দের দায়িত্বও সুতরাং তিনি স্বীকার করে নিতেন। এখনও নেন। তারা কেউ অনিয়ম করলে, বিধি ভঙ্গ করলে, উল্টো রকম চললে যা ঘটবার তা ঘটত। তারপরেও তিনি ক্ষমা করতেন এবং বিধিমতো আবার তাকে সঠিক পথে চালানোর চেষ্টা করতেন।

আধুনিক যুগে ঠাকুর কিন্তু কালপ্রাচীন প্রায়শ্চিত্তবিধি পুনঃপ্রচলন করেছেন। এ এক অদ্ভুত দুঃসাহস ও দূরদর্শিতা যুগপৎ তাঁর মধ্যে দেখা গেল। দুঃসাহস এই কারণে যে এইসব ক্লেশদায়ক প্রায়শ্চিত্ত এ যুগের

ধৈর্যহীন মানুষের গ্রহণ বা স্বীকার করার কথাই নয়। দ্বিতীয়ত, এই প্রায়শ্চিত্ত কতদূর ফলপ্রসূ তা নিয়েও সন্দেহ থাকাটা স্বাভাবিক। ঠাকুরের দেওয়া এই প্রায়শ্চিত্তবিধি নিয়ে দু'চার কথা বলার প্রয়োজন তো আছেই, তার চেয়েও বড় কথা এই প্রায়শ্চিত্ত জিনিসটা যে কত গুরুত্বপূর্ণ তাও দেখা দরকার।

ঠাকুর পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছেন, প্রায়শ্চিত্ত দণ্ড নয়। শাস্তি নয়। মানুষ যখন সত্তা-বিরোধী কিছু করে তখন সে তার স্বাভাবিক চিত্তবৃত্তি থেকে ভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে আবার সে চিত্তে অর্থাৎ মঙ্গলে অধিষ্ঠিত হয়। কিন্তু কোনও কার্যের জন্য অনুতপ্ত হয়ে প্রায়শ্চিত্ত করার পর আর ওই কার্যটি কখনো করতে নেই। বারবার অপরাধ করা আর বারবার প্রায়শ্চিত্ত করা কিছু মানুষকে ভ্রষ্টই করে।

সামান্য কোনও বিচ্যুতির জন্য সহজ প্রায়শ্চিত্তের বিধান হল, একদিন হবিষ্য করা। বিভিন্ন রকম লঘু বা গুরু বিচ্যুতির জন্য শিশু প্রাজাপত্য, প্রাজাপত্য, পিপীলিকামধ্যস্থ চান্দ্রায়ণ, যবমধ্যস্থ চান্দ্রায়ণ, মহাসান্তপন ইত্যাদির বিধান রয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় এর মধ্যে এমনই জীবনীয় এক শুদ্ধিকরণ রয়েছে যার কোনও তুলনা হয় না। ঠাকুর লুপ্তপ্রায় এইসব প্রায়শ্চিত্ত বিধিকে আবার প্রচলিত করেছেন মানুষের ক্লিষ্ট, বিচ্যুত চলনাকে আবার গতিবেগ সম্পন্ন ও উজ্জ্বল করতে। তার চেয়েও বড় কথা, এইসব প্রায়শ্চিত্ত যে নিতান্তই কুসংস্কারাচ্ছন্ন প্রথা নয়, এসব যে অতিশয় বাস্তবভাবে ফলপ্রসূ এবং অমৃতবাহী তাও সুপ্রমাণিত হয়েছে। ধর্মীয় বিধিনিষেধের মধ্যে অনেকগুলোই নিছক গোঁড়ামি এবং অন্তঃসারশূন্য। কিন্তু কিছুবিধিনিষেধ এবং নিদান অতিশয় কার্যকরী। কিন্তু কোনটা গ্রহণীয় কোনটা বর্জনীয় তা বিচার করার মতো সত্যদৃষ্টি তো আমাদের নেই। ঠাকুর সেই অতি প্রয়োজনীয় নির্বাচনটি করে দিয়েছেন দয়া করে।

এইসব প্রায়শ্চিত্ত যাঁরা করবেন তাঁরা প্রভূত উপকার পাবেন ঠিকই, কিন্তু মনে রাখতে হবে অপরাধ, পাপ বা বিচ্যুতির জন্য প্রকৃত অনুতাপ আসা চাই এবং পাপ স্খলনের জন্য সতঃসিদ্ধ আগ্রহের সঙ্গে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। অনুতাপই হল গোড়ার কথা এবং পাপ বিনিমুক্ত হওয়ার আগ্রহই প্রায়শ্চিত্তের সার্থকতা এনে দেয়।

তবে অদীক্ষিত কারও পক্ষে এই প্রায়শ্চিত্ত করা সম্ভব নয়। কারণ, নামধ্যান-পরায়ণতা এবং ইষ্টনিষ্ঠা ধরে না রাখলে প্রায়শ্চিত্ত উল্টো ফলই দিতে পারে। প্রায়শ্চিত্ত করা মানেই আরও বেশি ইষ্টমুখী হওয়া।

ঠাকুরের দেওয়া এরকম প্রায়শ্চিত্তবিধি অন্যত্র দেখতে পাওয়া যায় না। মানুষ আজকাল স্বেচ্ছায় এসব কষ্টকর ব্যাপারে যেতে চায় না বলে অন্যান্য ধর্মীয় সংগঠনে এগুলোর প্রচলন নেই। কাজেই ঠাকুরকে এ ব্যাপারে পথিকৃৎ বলতেই হয়।

আমার নিজের জীবনে এই প্রায়শ্চিত্তের যে কি বিশাল ও গভীর তাৎপর্য আছে তা বোধহয় ভাষা দিয়ে প্রকাশ করা যাবে না। তবে প্রায় পাঁচ ছয় বছরের দারিদ্র্য ব্যাধি একটিমাত্র শিশু প্রাজাপত্যে কেটে গিয়েছিল। অবশ্য অনুতাপও ছিল গভীর।

কতরকমের ভুলচুক যে আমরা সব সময়ে করে চলেছি, নিত্য পাতিত্যের দোষ ঘটে যাচ্ছে তা দেখবার চোখই আমাদের নেই। মানুষ তো নিজের ব্যাপারে ভীষণ রকমের অন্ধ। কিন্তু ভুলচুক ধরতে দ্বিধা করা উচিত নয়। নিজেকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে নির্মম ভাবে জবাবদিহি আদায় করতে হয়। যত বড় অপরাধই ঘটে থাকুক না কেন, ঠাকুর ক্ষমাশীল, ঠিকই আবার পাপ থেকে বিনিমুক্ত করে তুলবেন। আর তাঁর দেওয়া অমৃতবাহী প্রায়শ্চিত্ত চিত্তকে করবে শুদ্ধ ও পবিত্র।

এই যুগে বসে ঠাকুর যে সব অমোঘ মুষ্টিযোগ আমাদের দিয়ে গেছেন তা তুলনা রহিত। এ যুগের ধারার সম্পূর্ণ বিপরীত। এ যুগের মানসিকতার সঙ্গে বেখাপ্পা এইসব মুষ্টিযোগকে আপাতদৃষ্টিতে বিচার করলে আমরা ঠকে যাব। এ হাতে-কলমে অনুরাগ ও আগ্রহ নিয়ে করে দেখলে তবেই এর গভীরতা ও সার্থকতা বোঝা যায়। তাছাড়া মানুষের নিহিত গভীর পাপবোধ এবং অনুতাপের দাহ থেকে মুক্তি পাওয়ার পথও তো ঠাকুর ছাড়া আর কেউ হাতে কলম করে দেখাননি।

পাপবোধের যন্ত্রণা যে কী সাংঘাতিক তা আজকালকার মানুষেরা কে-ই বা না জানে? এই পাপবোধ থেকে মুক্তি পাওয়া প্রবল ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও উপায় জানা নেই বলে সারা জীবন তাকে এক দুরারোগ্য যন্ত্রণা কুরে কুরে খায়। নানা আধি ব্যাধি এবং পাগলামিরও সৃষ্টি হয় এই মানসিক চাপ থেকে। জীবনটা তার কাছে উপভোগ্য, গতিময়, সৌন্দর্যমণ্ডিত মনে হয় না।

অথচ কত সহজেই, সামান্য আয়াসেই যে এগুলোকে কাটিয়ে ওঠা যায় তা ঠাকুরের কাছে না এলে বুঝতেও পারতাম না। মানুষের জন্য ঠাকুর যে কত করেছেন তার বুঝি হিসেব হয় না। কিন্তু প্রায়শ্চিত্তবিধি তাঁর প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা বোধকে গভীর করে তোলে।

অবশ্য মনে রাখতে হবে অদীক্ষিতদের পক্ষে এসব প্রায়শ্চিত্ত করা সম্ভব নয়। মনে হয়, ঠাকুরের আশ্রয় ভিন্ন অন্য কোনও ভাবেই এইসব প্রায়শ্চিত্ত তেমন ফলবতী হবে না। কারণ প্রকৃত নামধ্যানপরায়ণতা ছাড়া কঠোর ব্রতধারণ অর্থহীন। খ্যাপন ও প্রকৃত অনুতাপই হচ্ছে প্রায়শ্চিত্তের মূল কথা আর প্রগাঢ় নাম ধ্যান করলে প্রায়শ্চিত্তের কষ্টটাও তেমন বোধ করা যায় না।

ঠাকুরের বর্ণাশ্রম বিষয়ে মতামত নিয়ে একটু আলোচনা করা যেতে পারে।

এই একটি বিষয়, যা নিয়ে সারা দেশেই তুমুল আপত্তি উঠেছে। বিশেষ করে তথাকথিত বুদ্ধিজীবী মহল থেকে। বর্ণাশ্রম যে অতিকায় অর্থহীন, যুক্তিহীন কুসংস্কার, এ যে বর্ণহিন্দুদের অপরাপর শ্রেণীকে দাবিয়ে রাখার কৌশলমাত্র সে বিষয়ে অনেকেই সোচ্চার।

কথাটা সম্পূর্ণ অযৌক্তিকও নয়। ঠাকুরের কাছে আসবার আগে এ ব্যাপারে আমার মতামতও অনুরূপ ছিল। মানুষে মানুষে সমান এই আপ্তবাক্যে আমার গভীর বিশ্বাস ছিল।

ঠাকুরের কাছে আসার পর তাঁর মতাদর্শের যে দু'একটির সঙ্গে আমার দ্বিমত ঘটেছিল তার মধ্যে একটা ওই বর্ণাশ্রম প্রসঙ্গ। বর্ণাশ্রম মানেই যে জাতিভেদ এবং বিদ্বেষ এটা আমাদের সমাজেও মাঝে মাঝে প্রকট হয়ে পড়ে। তার ওপর এই প্রথা খুব একটা কালপ্রাচীন নয়। চার বেদের মাত্র একটিতে বর্ণাশ্রমের সামান্য উল্লেখ পাওয়া যায় বলে শিবনাথ শাস্ত্রী দেখিয়েছেন।

কিন্তু কথা হল, বর্ণাশ্রম নিয়ে হিন্দু সমাজে যতই জল ঘোলা হয়ে থাকুক এটির মূলে যে বৈজ্ঞানিক মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এ বিষয়ে দ্বিমত থাকা উচিত নয়। ঠাকুর যখন আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন যে, প্রকৃতিতে কোথাও সাম্য নেই, সর্বত্রই এই সৃষ্টির বিচিত্র প্রকাশের ভিতরে ওই বর্ণাশ্রমই রয়েছে। আম, জাম, কলা, কমলালেবু, ঘোড়া, ভেড়া, কুকুর, গরু, ধান, গম সব কিছুর ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে প্রকৃতিতে কোনও একঢালা ব্যবস্থা নেই। বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শ্রেণী ভাগ ঘটেই আছে। মানুষের মধ্যেই যে আছে তা তো অনস্বীকার্য। তবু যে অনেক আধুনিক মানুষ বর্ণাশ্রমকে স্বীকার করতে চায় না তার প্রধান কারণ, বর্ণাশ্রমের চোরা পথ দিয়ে দুর্বলতর শ্রেণীর মানুষের ওপর শোষণ ও অত্যাচার চালানো সহজ। আর সে ঘটনা ঘটেছেও অনেক কিন্তু সেইজন্য ধর্ম জিনিসটাকেই যারা দায়ী করেন তাদের বুদ্ধি বিবেচনার প্রশংসা করা যায় না। পৃথিবীতে মানুষে মানুষে সংঘাত নানা কারণেই ঘটে থাকে, দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচারও ঘটে প্রকৃতির নিয়মে। ধর্ম বরং মানুষে মানুষে বিভেদের অবসান ঘটানোর জন্যই যা কিছু নীতিবিধি প্রশ্ন দেয়। মনুর অনুশাসন নিয়েও অনেক প্রশ্ন উঠেছে সঙ্গত কারণেই। কিন্তু মনুর সংহিতায় যেসব পৈশাচিক ব্যবস্থার বিধান দেওয়া আছে যেগুলোকে প্রক্ষিপ্ত অংশ বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। সে আমলে এরকম তো পুঁথির লিপিকাররা হামেশাই করতেন।

ধর্মকে নানা ধরনের বিবৃতির পাঁক থেকে ঠাকুর উদ্ধার করেছেন তাঁর অনবদ্য সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এবং প্রয়োগের দ্বারা। ঠাকুর কঠোরভাবে বর্ণাশ্রম মানতেন, কিন্তু তাঁর মধ্যে বিভেদের বালাই ছিল না। সৎসঙ্গে চার বর্ণের হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান সকলেই কি মিলেমিশে যায়নি? ধর্মের উদ্দেশ্য জীবনমুখী, ধর্মের উদ্দেশ্য মানুষকে মঙ্গলে অধিষ্ঠিত করা, ধর্মের উদ্দেশ্য মানুষকে যোগ্য সফল ও সার্থক করে তোলা। ঠাকুর যে

বর্ণাশ্রম মানতেন তার পিছনে একটা অর্থনৈতিক কারণও ছিল। বর্ণ অনুযায়ী বৃত্তিকে আশ্রয় করলে আজ দেশে যেমন বেকার সমস্যা থাকত না, তেমনি আবার বিচিত্র উৎপাদনে দেখা যেত অতিকায় দক্ষতা।

আজকাল গ্রামীণ সমাজে বেকারের সমস্যা যে এত ভয়াবহ তার কারণ কুটিরশিল্পগুলির অকালমৃত্যু। আমাদের দূরদর্শিতার ফলে আমরা কুটিরশিল্পের জিনিসগুলি বৃহৎ শিল্পে উৎপাদন করতে শুরু করেছিলাম। ফলে লাঙলের ফাল, কোদাল, কুড়ুল দা সবই তৈরি হতে লাগল বৃহৎ ইস্পাত কারখানায়। গাঁয়ের কামার বৃত্তি হারাল। তাঁতীদেরও দাঁড় করিয়ে দেওয়া হলো কলের বস্ত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায়। গ্রামের অর্থনীতির বুনিয়াদ এইভাবে ভেঙে পড়ল। ঠাকুর বারবার বর্ণানুযায়ী বৃত্তির কথা বলতেন, যাতে বংশগত দক্ষতা থেকে পর পর উন্মেষশালিনী বুদ্ধি ও দক্ষতা গজিয়ে ওঠে। বৃত্তি তাহলে অটুট থাকত। গ্রাম্যভিত্তিক ভারতবর্ষকে রাতারাতি শিল্পায়নের মাধ্যমে অগ্রগতির পথে নিয়ে যেতে গিয়ে আমরা এই বিপুল অনাবশ্যক বেকার সমস্যা তৈরি করতাম না।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ঠাকুরকে গ্রহণ করেন শেষ বয়সে। তাঁর অনেক ধাঁধা ও মানসিক দ্বন্দ্ব ঠাকুর মোচন করেছিলেন বটে, এবং তিনিও ঠাকুরকে বুঝতে পেরে উঠে পড়ে কাজে লাগবার উদ্যোগ করছিলেন। কিন্তু তখন আর তাঁর আয়ুর সময় বিশেষ ছিল না। তার মধ্যেই গান্ধীজীকে অনুরোধ করে তিনিই আশ্রম পরিদর্শনে পাঠিয়েছিলেন। এসেছিলেন দেশবরেণ্য অনেক নেতাই। আশ্রমের কর্মকাণ্ড দেখে তাঁরা প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন, একথাও সত্যি। কিন্তু ঠাকুরের জীবনমুখী দর্শনের ভিতরে তাঁরা তো গভীরভাবে প্রবেশ করেননি। ফলে ঠাকুর সম্পর্কে তাঁদের বোধটা হল ওপরসা ওপরসা।

বৃহৎ ব্যক্তি বা নেতাদের দিয়ে যে এই আন্দোলন হওয়ার নয় তা বাস্তববাদী এবং প্রবল কাণ্ডজ্ঞান ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ঠাকুর ভালোই জানতেন। বিশেষ করে বড় মানুষদের অহং ও নিজস্ব অবসেশন প্রবল হওয়ায় তা এই কাজের বাধা হয়ে দাঁড়াবে। ঠাকুর তাই নির্ভর করেছিলেন সাধারণ মানুষদের ওপর। তারা খুবই সাধারণ, অনেকেরই শিক্ষা দীক্ষা নামমাত্র, অনেকের নানাবিধ দুঃখ দুর্দশা। ঠাকুর এইসব মানুষকেই তাঁর মতো করে গড়ে পিটে নিতে লাগলেন। তাঁর কর্মশালা তো মানুষ তৈরির কারখানাই।

সজনীকান্ত দাস ও কতিপয় মানুষ ঠাকুর সম্পর্কে যে প্রতিকূল প্রচার শুরু করেছিলেন তার পিছনে কতগুলো মোটা কারণ ছিল। সজনীকান্ত মোহিতলালকে লেখা কতিপয় চিঠিতে উল্লেখ করেছিলেন যে, 'নকুড় ঠাকুরের আশ্রম' নিয়ে বাজার গরম করা লেখার জন্য তাঁর 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকার প্রচার সংখ্যা বেড়ে গেছে। এরকম চললে অচিরেই তিনি নিজস্ব প্রেস কিনে ফেলতে পারবেন। সোজা কথা, ঠাকুরের স্ক্যান্ডাল করে সজনীকান্ত দু'পয়সা আয় করতে চেয়েছিলেন এবং সে কাজে তিনি সফলও হন।

ধর্মীয় পুরুষেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিরূপ সমালোচনা ও স্ক্যান্ডালের শিকার হয়ে থাকেন, এটা দেখা গেছে। ঠাকুরের ক্ষেত্রে এরকম ঘটা স্বাভাবিক ছিল। তবে তাঁর ওপর অত্যাচার হয়েছে নানা রকম। এইসব অপবাদ তাঁর উদ্দেশ্যে বর্ষণ করেছিল সেইসব লোক যাদের কায়েমী স্বার্থে এই মানবদরদী বাধা হয়ে উঠছিলেন।

দীক্ষা পূর্ব জীবনে ঠাকুর সম্পর্কে এই সব অপবাদ আমিও বিশ্বাস করতাম।

অপবাদের আরো কারণ ঘটেছিল ঠাকুর শ্রেষ্ঠ পুরুষের বহুবিবাহের সপক্ষে মত প্রকাশ করায়। সুপ্রজননের জন্য বরেণ্য পুরুষদের একাধিক বিবাহ প্রাচীন কাল থেকেই চলে এসেছে। ঠাকুরের নিজেরও একাধিক বিবাহ হয়। আর এই নিয়ে জল ঘোলা হয়েছিল বড় কম নয়।

ঠাকুরের প্রথম বিবাহ সরসীবালা দেবী অর্থাৎ বড়মার সঙ্গে। বলাই বাহুল্য, খুব অল্পবয়স থেকেই ঠাকুরকে শিষ্য ভক্ত পরিবৃত এক ব্যস্ত জীবন কাটাতে হত। গভীর রাতে অবধি শিষ্যদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা, ভোর না হতেই নামধ্যান। বেশিরভাগ রাতে আদৌ ঘুমই হত না কারো। নববিবাহিতা বড়মাকে তাই স্বামীসঙ্গ থেকে বঞ্চিত হতে হয়েছে বরাবরই। হাড় ভাঙা পরিশ্রমে তখন গড়ে উঠছে আশ্রম। ঠাকুরের তখন ব্যক্তিগত জীবন যাপনের সুযোগ কোথায়? ঠাকুরকে বরাবরই ব্যক্তিগত জীবন যাপন থেকে বঞ্চিত হতে

হয়েছে। যাঁরা ঠাকুর সম্পর্কে কিছু মাত্র জানেন তাঁরাই এই কথার সত্যতা স্বীকার করবেন। একদিক দিয়ে দেখতে গেলে, তাঁর যে জীবন তাতে একটি বিয়েও করে ওঠা বোধহয় সম্ভব ছিল না। মা বাবার আদেশে এবং সংসারী সন্ন্যাসীর আদর্শ রক্ষার্থেই তিনি বিবাহ করেন।

দ্বিতীয়া স্ত্রী সর্বমঙ্গলা দেবী সরসীবালারই কনিষ্ঠা ভগ্নী। তিনি ছোটমা হিসেবেই পরিচিত। তিনি যখন ঠাকুরকে বিয়ে করতে চাইলেন তখন ঠাকুর তাঁকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিরস্ত করার অনেক চেষ্টা করেন। তাঁর যে জীবন তাতে যে স্ত্রীর সঙ্গে দাম্পত্য জীবন যাপনের সম্ভাবনা নেই, এমন কী শারীরিক নৈকট্যও যে দুর্লভ সব বুঝেই ছোটমা তাঁকে পতি হিসেবে বরণ করতে চেয়েছিলেন।

ঠাকুরের বিবাহ নীতি অনুসারে, পুরুষ কখনোই বিবাহে আগ্রহ প্রকাশ করবে না। বিবাহে আগ্রহী হবে নারীই। তার ভূমিকাই মুখ্য হবে। বর্ণ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা স্বভাব ও মেজাজ মর্জির সাম্য ঘটলে তবেই বিয়ে। দ্বিতীয় বিবাহের ব্যাপারে ঠাকুর আরো কঠোর। কোনো মহিলা যদি কোনো বিবাহিত পুরুষের শৌর্যেবীর্যে স্বভাব-চরিত্রে আকৃষ্ট হয়ে তাকে বরণ করতে চায় তবে তাকে প্রথমে অভিভাবকের অনুমতি নিতে হবে। তারপর সেই পুরুষের অনুমতি প্রার্থনা করতে হবে এবং সবচেয়ে বড় কথা সেই পুরুষের প্রথমা স্ত্রীর অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। প্রথমা স্ত্রী যদি সন্তুষ্ট হয়ে সম্মতি দেন তবেই বিবাহ সম্ভব। অন্যথায় নয়।

সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে, বহু বিবাহ পুরুষের কামুক ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল নয়। আর এই নীতিবিধি সঠিক ভাবে অনুসরণ করলে পুরুষদের বহু বিবাহ যে আকছার ঘটবে না, এ কথা বলাই বাহুল্য।

বহু বিবাহ প্রচলনের পিছনে ঠাকুরের আর একটা উদ্দেশ্য, বিহিত অনুলোম অসবর্ণ বিবাহকে পুনঃপ্রচলিত করা। বর্ণ সংমিশ্রণের ফলে তেজবীর্যসম্পন্ন প্রতিভাবান মানুষের আবির্ভাব ঘটে থাকে। উচ্চ বর্ণের শ্রেষ্ঠ পুরুষ প্রথম বিবাহ শাস্ত্রানুসারে অবশ্যই স্ববর্ণে করবেন। পরবর্তী বিবাহ অন্য বর্ণে করার অধিকার তাঁর থাকবে। তবে উচ্চ বর্ণ বা বংশের কন্যাকে বিবাহ করা বিধি নয়। তাতে প্রতিলোম সংমিশ্রণ ঘটে এবং বর্ণসংকর জন্মায়।

এই নিয়ে কিছু লেখালেখি করতে গিয়ে আমাকে বিস্তর সমালোচনা, গালমন্দ ও অভিসম্পাতের লক্ষ্যস্থল হতে হয়েছে। কারণটা খুবই স্বাভাবিক। এই তথাকথিত প্রগতির পাগলা স্রোতে সব প্রথাকে ভাসিয়ে দেওয়ার এক অবিমৃশ্যকারী খুনে জেদ মানুষকে পেয়ে বসেছে। গভীর চিন্তা, অনধ্যান, কোনও বিষয়কে পূর্বাপর পারম্পর্যে বিচার, গবেষণা, অনুসন্ধান ইত্যাদির ধার আজকালকার ধৈর্যহীন মানুষেরা ধারেন না। সমাজে একটা লুটমারের চেহারা সর্বত্র প্রকট। এই এলোমেলো মানসিকতার মানুষকে কোনও প্রথা বা মূল্যবোধের যথার্থতা বোঝাতে যাওয়া বেশ ঝকমারির ব্যাপার। বিশেষ করে বর্ণাশ্রম নিয়ে কথা তুললে কিছু মানুষ প্রবল রকম অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন।

কিন্তু এরকম হওয়া উচিত নয়। স্বজাতিতে ও স্ববর্ণে কোনও মানুষই ছোট নয়। বর্ণাশ্রম যদি গুণ ও কর্ম অনুসারেই স্পষ্ট হয়ে থাকে তবে কোন গুণ অন্য গুণের চেয়ে খাটো?

মানুষে মানুষে সকলেই সমান-এই আপ্তবাক্য যাঁরা আওড়ে বেড়ান তাঁরা নিজেরাই ওই কথাটিকে বিশ্বাস করেন কিনা সন্দেহে। প্রকৃতিতে যখন কোথাও এরকম সাম্যের ব্যবস্থা নেই তখন মানুষের মধ্যেই বা থাকবে কোন যুক্তিতে। পশু পাখি গাছপালা ফল ফসল সব কিছুতেই প্রকৃতির নিজস্ব নিয়মে রয়েছে অসংখ্য বৈচিত্র্য। প্রকৃতি কখনো একঢালা নিয়মে একঘেয়েমি সৃষ্টিকর্মে রত নয়। আর সেই বৈচিত্রের পথে মানুষেরও সৃষ্টি। কট্টর সাম্যবাদীও বাজারে গিয়ে ল্যাংড়া আমটিই খোঁজেন, গঙ্গার ইলিশ খোঁজেন, পাকা রুই খোঁজেন, কাশ্মীরী আপেল বা দার্জিলিঙের কমলালেবুই তাঁর পছন্দ। পোষেন ভাল জাতের অ্যালসেশিয়ান কুকুর বা কাবলি বেড়াল। রেস-এর দিন স্টেটসম্যানে আগে দৌড়বাজ ঘোড়াদের বংশতালিকা ছাপা হত যাতে ভাল ঘোড়া বাছতে পান্টারদের সুবিধে হয়। ফসলের ক্ষেত্রে কতরকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে জলদি জাতের সঠিক ফলনশীল শস্যের বীজ তৈরি করতে। গরু, ঘোড়া, ভেড়া, কুকুর এ নিয়েও তো পরীক্ষা ও গবেষণার অন্ত নেই। আর এই সবটাই প্রজনন নির্ভর। সুপ্রজননই এই কর্মকাণ্ডের লক্ষ্য।

মানুষ শুধু তার নিজের বেলাতেই এই নীতি প্রয়োগ করতে নারাজ। এই অবৈজ্ঞানিক মনোভাব নিন্দার্হ।

কেউ কেউ অবশ্য বলেন, মানুষের মধ্যে গুণ ও প্রকৃতিগত ভেদ থাকতে পারে, কিন্তু বর্ণাশ্রম সঠিক শুদ্ধিকরণ নয়।

একথাও মানা যায় না। ভারতবর্ষেই বর্ণাশ্রম নামক শুদ্ধিকরণ খানিকটা বৈজ্ঞানিক ভাবে হয়েছিল। অন্যত্র হয়নি। এই শুদ্ধিকরণ পরে অবশ্য জাতপাতের লড়াই এবং গুণভেদ সৃষ্টি করেছে কিছু সমাজপতি ও শাস্ত্রজ্ঞানহীন কুসংস্কারাচ্ছন্ন গুরু পুরোপুহিতের হাতে। বিদ্বেষ ও ঘৃণার মনোভাবও যে দেখা দেয়নি এমন নয়। কিন্তু এর মুখ্য কারণ আমাদের অনুন্নত ও পরাধীন দেশে প্রকৃত শিক্ষা দীক্ষা ইত্যাদির অভাব এবং দেশে দীর্ঘকালীন নানা বিশৃঙ্খলা। গ্রাম জীবনের কুপমণ্ডুকতায় আবদ্ধ সমাজে পবন লাগা খুবই স্বাভাবিক। আলস্য, মূঢ়তা, অশিক্ষা, কুসংস্কার আমাদের মানসিকতাকে অসাড় করে রেখেছিল।

আজ যদি বর্ণাশ্রমকে জেনেটিক ইনজিনিয়ারিং-এর আওতায় আনা হয় তাহলেও না হয় বুঝতে পারতাম বর্ণাশ্রমের যথার্থতা যাচাই করার কিছু উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু যাচাই না করে নিতান্তই ভাবালু প্রগতিপরায়ণতার নামে বর্ণাশ্রমকে তাচ্ছিল্য করা যুক্তিসিদ্ধও তো নয়। মানুষের মধ্যে প্রাকৃতিক শ্রেণীবিভাগ হয়েই আছে। চরিত্র, প্রবণতা, দক্ষতা, বর্ণ অনুসারে মানুষ আলাদা রকমের হয়।

আমাদের দেশে জাতপাতের লড়াই বা শ্রেণী বিদ্বেষের মূলে অর্থনৈতিক বৈষম্যও একটা বড় রকমের কারণ। মোটামুটি সকলেরই যদি জীবন ধারণের জন্য ন্যূনতম ভদ্র উপার্জন থাকে এবং সমাজে যদি সে নিজের ভূমিকা ও গুরুত্বটিকে উপলব্ধি করতে পারে তাহলে এই বৈষম্যের বোধ হ্রাস পেয়ে যায়। আমাদের দেশে অর্থনৈতিক বৈষম্যই যে বড় বেশি প্রকট।

ঠাকুরের একটা প্রধান লড়াই ছিল এই দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে। আরও বিশদ করে বলতে গেলে দারিদ্র্য ব্যাধির বিরুদ্ধে। দারিদ্র্যের মূলে যে মানুষের আকর্মণ্যতা, আলস্য, মূঢ়তা অনেকটাই কাজ করে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

এখানে একটি ছোট ঘটনার উল্লেখ করা যাক। একবার ঠাকুরের এক মুসলমান শিষ্য তাঁর কাছে এসে নিজের দুঃখ দুর্দশার কথা বলছিলেন। ঠাকুর সবই শুনলেন, কিন্তু কোনো সমাধান না দিয়ে শুধু বললেন, তুই আমাকে সীতাশাল চাল খাওয়াতে পারিস?

চাষীটি অসহায় ভাবে বলল, সীতাশাল ধানের চাষ করতে মেলা জল লাগে, অনেক অসুবিধা।

এই বলে সে তার প্রতিবেশীদের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ, মামলা মোকদ্দমা, দুঃখ দুর্দশার কথা ফের বলতে লাগল। কিন্তু ঠাকুর বারবারই তার কাছে আব্দার করতে লাগলেন, ও মণি, আমারে সীতাশাল চাল খাওয়াতে পারিস না?

চাষীটি যখন তার অসুবিধের কথা বলল তখন ঠাকুর সকৌতুকে বললেন, তোর ক্ষেতের কাছে তো একটা খাল আছে। সেখান থেকে নালা কেটে জল আনতে পারবি না ক্ষেতে?

চাষীটি বলল, তা কী করে হয়? অন্যের ক্ষেতের ওপর দিয়ে নালা কাটলে ওরা কি ছেড়ে দেবে?

ঠাকুর মৃদু হেসে বললেন, ওদের বুঝিয়ে বলবি যে, এতে ওদের সুবিধাই হবে। সকলের সঙ্গে ভাবসাব করে দেখিস, পারবি।

এই ঘটনার বছর খানেক বাদে সেই মুসলমান চাষীটি গরুর গাড়ি বোঝাই সীতাশাল চালের বস্তা নিয়ে হাজির হল আশ্রমে। তার পরনে নতুন লুঙ্গি, গায়ে নতুন পিরাণ, মুখে হাসি। ঠাকুরকে সীতাশাল চাল খাওয়াতে হবে, শুধু এই অনুরাগের টানে সে তার প্রতিবেশীদের সঙ্গে ভাব করেছে, খাল কেটে জল এনেছে, আর সদ্ভাব বজায় রাখার ফলে মামলা মোকদ্দমা ঝগড়া কাজিয়া মিটেছে, ফলে দূর হয়েছে তার দারিদ্র্য ব্যাধি। এর মধ্যে কোনো অলৌকিক নেই বটে, কিন্তু আছে গভীর বাস্তববোধ ও মনুষ্যচরিত্র সম্পর্কে সম্যক ধারণা।

ঠাকুরের জীবনে অযোগ্যকে যোগ্য করে তোলার উদাহরণ অসংখ্য। মানুষকে ধর্ম দান করাই শ্রেষ্ঠ দান বলে মনে করতেন ঠাকুর। বিপন্ন বা অভাবগ্রস্তকে সাহায্য করাই বড় কথা নয়, তাকে যোগ্য ও দক্ষ করে তোলাই হল আসল। আর মানুষের উন্নতি শুধু একমুখী হোক তা নয়। সর্বতোমুখী হোক। এইটেই ঠাকুর চাইতেন। ঠাকুরের জীবন মানুষ অর্জনের জীবন। তাই নির্বোধ, বাচাল, পাগল, দুঃস্থ, মতলববাজ, চতুর কোনও মানুষকেই অবহেলা করেন নি। যে এসেছে তাকেই তাঁর পরিমণ্ডলে সস্নেহে গ্রহণ করেছেন। ধৈর্য ধরে শুনেছেন তাঁর কথা, সমাধান দিয়েছেন। ঠাকুরকে এর জন্য গুনাগার দিতে হয়েছে অনেক। কিন্তু শেষ অবধি মানুষের নেশা তাঁকে ছাড়েনি।

ঠাকুরের জীবনের অজস্র ঘটনার মধ্যে একটি ঘটনা আমাকে খুব আকর্ষণ করে। এর মধ্যে কেউ হয়তো অলৌকিকত্বের গন্ধ পাবেন। আমি তা মনে করি না। ঠাকুরের জীবনে অসম্ভব ঘটনাগুলোও এত অনায়াসে ঘটেছে যে, সেগুলোকে তাঁর কাছের মানুষেরা অস্বাভাবিক বলে মনে করেনি। মজার কথা হল ঠাকুরের বিরুদ্ধপক্ষের লোকেরাও তাঁদের প্রচারে বিশেষভাবে ঠাকুরের অলৌকিক ক্ষমতার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করেছেন। এটা তো এক সময়ে বিশালভাবেই প্রচার লাভ করেছিল যে অনুকূলচন্দ্র হিপনোটিজম জানেন এবং তাঁর কাছে যে যায় তাকেই বশীভূত করে ফেলেন। কেউ কেউ বলেছেন, ঠাকুরের কাছে নাকি একটি অত্যাশ্চর্য পাথর ছিল, যা দিয়ে তিনি নানারকম ভুতুড়ে কাণ্ডকারখানা ঘটাতেন। তাঁর পোষা ভূত টূত আছে এমন ধারণাও তাঁর গ্রাম হিমাইতপুর ও আশেপাশের অঞ্চলের লোকদের ছিল। অবশ্য এসব ধারণার উৎপত্তি হয়েছিল কিছু অঘটন থেকেই। ঠাকুরের বিরুদ্ধপক্ষের লোকেরা তাই তাঁর সম্পর্কে একটু ভয়ও পোষণ করেছেন।

আমি যে ঘটনার কথা বলছি তা তাঁর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় খানিকটা বোঝানোর জন্য। তাঁর এক শিষ্য এবং নিয়তকর্মী আশ্রমে থাকেন। দেশ থেকে হঠাৎ একদিন চিঠি পেলেন তাঁর একমাত্র প্রিয় পুত্রটির সাঙঘাতিক অসুখ। ডাক্তার একরকম জবাব দিয়ে গেছে। ছেলে বাবাকে একবার দেখতে চায়। স্ত্রীর কাছ থেকে এই মর্মান্তিক চিঠি পেয়ে তিনি সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের কাছে গিয়ে হাজির হলেন। কম্পিত গলায় শুধু বললেন, ঠাকুর —

ঠাকুর তাঁর দিকে চেয়ে শশব্যস্তে বলে উঠলেন, আরে আমি তো আপনাকেই ডাকতে লোক পাঠিয়েছি। ভীষণ জরুরি দরকার। আপনাকে এক্ষুণি উড়িষ্যায় রওনা হতে হবে। আধ ঘণ্টার মধ্যে। যান, তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিন।

শিষ্য ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললেন, আজ্ঞে আমার যে বিপদ—

ঠাকুর কথাটা একেবারেই কানে তুললেন না। ভীষণ ব্যস্ত হয়ে বললেন, কথা কওয়ার সময় নেই। যা বলার ফিরে এসে বলবেন। গাড়ি যে ছাড়ে! যান তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নিন।

শিষ্যটি একটু দ্বিধায় পড়লেন। একদিকে গুরুর আদেশ, অন্যদিকে ছেলের আয়ু। কী করেন? শেষ অবধি ভাবলেন, ছেলেকে বাঁচানোর ক্ষমতা তো আমার নেই। যা হওয়ার হবে। গুরুর যখন এত ইচ্ছা তখন উড়িষ্যাতেই যাই।

তিনি কম্পিত হৃদয়ে অশান্ত মনে রওনা হয়ে গেলেন।

উড়িষ্যায় কাজকর্ম মিটতে কুড়ি পঁচিশ দিন লেগে গেল। তারপর আশ্রমে ফেরার পালা। যত আশ্রমের কাছে আসছেন ততই বুক কাঁপছে। কী সংবাদ অপেক্ষা করছে সেখানে কে জানে।

ঘরে এসে একটি পোস্টকার্ড পেলেন। স্ত্রীর লেখা। খোকা ভাত পথ্য করেছে। সুস্থ হয়ে উঠছে।

বুক থেকে জগদ্দল পাথর নেমে গেল। পোস্টকার্ডটি নিয়ে চললেন ঠাকুরের কাছে। একথা সেকথার পর ঠাকুর নিজেই হঠাৎ জিগ্যেস করলেন, আমার কাছে তো খুব খাটছেন, ওদিকে বাড়ির খবর টবর সব ভাল তো?

শিষ্যটি কেঁদে বললেন, আজ্ঞে সেই কথা বলতেই আসা।

চিঠি দুটিই তিনি ঠাকুরের হাতে দিলেন। বললেন, ঠাকুর আমার খোকার যে অসুখ তা আপনি সর্বজ্ঞ নিশ্চয়ই জানতেন। আমি জানতে চাই আপনি কেন খোকার কাছে আমাকে যেতে না দিয়ে উড়িষ্যায় পাঠালেন।

ঠাকুর প্রথমটায় হেসে টেসে অন্য কথা বলে প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যেতে লাগলেন। কিন্তু নাছোড় শিষ্য কিছুতেই না ছাড়ায় ঠাকুর অবশেষে সখেদে বললেন, মানুষ অনেক সময়ই আমার অনেক আচরণ দেখে আমাকে নিষ্ঠুর বলে মনে করে। কিন্তু ওই নিষ্ঠুরতার মধ্যে বৃহৎ মঙ্গলই লুকিয়ে থাকে। আপনার ছেলে শুনেছি আপনাকে ভীষণ ভালবাসে। মুমূর্ষু ছেলে অধীর আগ্রহে বাপের জন্য অপেক্ষা করছে, আর সেই আগ্রহ, আর তীব্র ইচ্ছাশক্তিতে সে মৃত্যুকেও ঠেকিয়ে রেখেছে, লড়াই করছে রোগের সঙ্গে। ঠিক সেই সময় যদি তার বাবা গিয়ে তার সামনে দাঁড়ায় অমনি তার সব লড়াই শেষ হয়ে যাবে, 'বাবা এসে গেছে' এই আনন্দেই সে তৎক্ষণাৎ আবার ঢলে পড়বে রোগের কবলে। মৃত্যু ঘটবে। কিন্তু বাবা আসছে না বলে ছেলে সারাক্ষণ লড়াই চালিয়ে যেতে থাকবে, আর ক্রমে ক্রমে রোগ হার মানতে থাকবে তার ভালবাসার কাছে। এখন বুঝলেন তো?

এটা মোটে একটি ঘটনা। এরকম হাজার হাজার ঘটনা ছড়িয়ে আছে ঠাকুরের একাশি বছরের আয়ুষ্কালে, কিন্তু ঘটনাগুলির অলৌকিকত্বের আলোয় ঠাকুরকে আলোকিত করতে গেলে তাঁর জীবনদর্শনকেই অপমান করা হয়। ঠাকুর এই ঘটনাগুলোকে যখন ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দিয়েছেন তখন তাঁর বৈজ্ঞানিক মানসিকতা গভীর, অন্তর্দৃষ্টি আর বাস্তববোধ আমাদের মুগ্ধ করেছে।

ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র বাংলা ভাষা নিয়ে যে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন তার তুলনা গোটা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেও খুঁজে পাওয়া যাবে না। ভাষাজ্ঞানেও তিনি সম্পূর্ণ অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও একক। বাক্য গঠন, শব্দ চয়ন ও অনবদ্য সব শব্দকে প্রায় হিমঘর থেকে তুলে এনে তিনি প্রয়োগ করেছেন তাঁর গদ্যে। মেকানিজম শব্দটির সঠিক বাংলা প্রতিশব্দ আমি কোথাও খুঁজে পাই নি। ঠাকুর 'মরকোচ' শব্দটি যখন ব্যবহার করলেন তখন চোখের ঠুলি মরে গেল। ইন্টারেস্ট শব্দটিরও সঠিক বাংলা প্রতিশব্দ নেই। ঠাকুর 'অন্তরাস' শব্দটি আমাদের চিনিয়ে দিয়েছেন। এরকম অজস্র ও অসংখ্য শব্দ ও ধাতুর মূল অর্থ ধরে তিনি যে কত কিছুকে ব্যাখ্যা করেছেন তারও ইয়ত্তা নেই। অথচ নিজের হাতে তিনি তো এসব লেখেন নি, মুখে বলে গেছেন এবং তা লিখে নেওয়া হয়েছে। আর মুখে বলে যাওয়া ওই নির্ঝরের মতো গদ্য কি করে যে পূর্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষা করেছে সেটাই পরম বিস্ময়ের। এক এক জায়গায় এক পৃষ্ঠা ব্যাপী একটিই বাক্য তিনি রচনা করেছেন, কিন্তু কোথাও বাক্যের ভারসাম্য ক্ষুণ্ণ হয়নি। কোনো কোনো গ্রন্থে তাঁর গদ্য এতই জটিল ও কঠিন যা কমলকুমার মজুমদারকেও ধাঁধায় ফেলে দিতে পারত। আজ থেকে পঞ্চাশ ষাট সত্তর বছর আগেকার ওইসব রচনা থেকে আমরা বাংলা গদ্যের প্রকৃত ধ্রুপদীরূপ পাই যা আজ অবধি অন্য কারও রচনায় পাইনি। ঠাকুরের গদ্য নিয়েও অদূর ভবিষ্যতে বিস্তর পরীক্ষা নিরীক্ষা ও আলোচনা হবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ঠাকুরকে পরিপূর্ণ দার্শনিক বলে অভিহিত করতে হয় একটিই কারণে। তিনি কোনো প্রসঙ্গকেই আলোচনার অযোগ্য মনে করেননি বলে পৃথিবীর দুর্মরতম পাপ থেকে আধ্যাত্মিকতার দুরূহতম কূট প্রসঙ্গ নিয়ে অভিমত দিয়েছেন। আর কী প্রাঞ্জল ও সুগভীর সেই কথা। ঠাকুরের এইসব আলোচনার মধ্যে সকলেই স্বীয় প্রশ্নের জবাব খুঁজে পেয়ে যান। এই সম্পূর্ণতা আমি কোনো মহাপুরুষের গ্রন্থে খুঁজে পাইনি। সেইজন্য তাঁকে অধিকতর সম্পূর্ণ বলে অভিহিত করা ছাড়া উপায় নেই।

কারও প্রতি অশ্রদ্ধা ঠাকুর ভীষণ অপছন্দ করতেন। এবং জগতের পূর্ব পূর্ব অবতার পুরুষদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও নতি এতই প্রগাঢ় ছিল যে, প্রার্থনার মন্ত্রে রাম কৃষ্ণ বুদ্ধ যিশু মহম্মদ চৈতন্য রামকৃষ্ণ সকলকেই প্রণাম করার ব্যবস্থা রেখেছিলেন। রামকৃষ্ণ দেবকে কখনো ভগবান ছাড়া বলতেন না। এই শ্রদ্ধাবনত প্রেমিক মানুষটিকে, দুঃখের বিষয়, তার সমকাল সঠিক চিনতে পারেনি। অবশ্য এরকম ব্রাহ্মী পুরুষকে কদাচিৎ তাঁর

সমসাময়িকেরা চিনতে পেরে থাকে। বিশেষ করে বুদ্ধিজীবীরা এইসব মানুষকে যদিও বা খানিকটা বুঝতে পারেন, কিন্তু নিজের অহংবোধ আহত হয় বলে কদাচ এঁদের কাছে নতি স্বীকার করেন না।

দেশ ভাগের এক বছর আগে ঠাকুর হিমাইতপুরে তাঁর সযত্নে গড়ে তোলা আশ্রম এবং সেখানকার বিশাল লোকসেবামূলক নানা প্রকল্প অবহেলায় ফেলে দেওঘরে চলে এলেন। তখন তাঁর এই স্থানত্যাগের কারণ কেউ বুঝতেই পারছিলেন না। বছর না ঘুরতেই বুঝতে পারলেন। দেওঘরে তাঁর তো প্রায় কিছুই ছিল না। যথেষ্ট ঘর বাড়ি নেই, তেমন টাকা পয়সা নেই, অব্যবস্থা এবং বিশৃংখলা চরমে। তবু তার মধ্যেই আবার তাঁকে ঘিরে গড়ে উঠতে লাগল একটি নানা কর্মকাণ্ডমুখরিত লোকপাখী আশ্রম। এখানেও তাঁকে স্থানীয় লোকদের নানা বিরোধিতা ও শত্রুতার সম্মুখীন হতে হয়েছে, মারদাঙ্গা বড় কম হয়নি। কিন্তু সব প্রতিকূলতাকেই তিনি তাঁর অসামান্য ব্যক্তিত্ব দিয়ে অনুকূল করে নিতে পারতেন।

১৯৬৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যখন নানা সন্দেহের দোলায় দুলেও আমি তাঁর সৎনাম গ্রহণ করি তখনও তাঁর সম্পর্কে সম্যক কোনো ধারণা ছিল না। ধারণা যে আজও হয়েছে তাও নয়। আমাদের অবস্থা অন্ধের হস্তিদর্শনের মতো। তাঁর জীবনদর্শন এত ব্যাপক, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ বিশ্লেষণে ভরা যে গড়পড়তা মস্তিষ্কসম্পন্ন কোনো মানুষের পক্ষে বুঝে ওঠা কঠিন এবং অসম্ভব। তবে যেটুকু বুঝতে পেরেছি তাতে তাঁর বিশালত্বের আভাস পেতে কোনো অসুবিধে হয় না। স্বাস্থ্য, সদাচার, শিক্ষা, বিবাহ, সন্তান পালন থেকে শুরু করে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা কিছুই তাঁর বিষয় বহির্ভূত নয়।

বিংশ শতাব্দীর এই অনন্যসাধারণ মানুষটিকে নানা অপপ্রচারের অন্তরালে নির্বাসিত রাখা হয়েছিল দীর্ঘদিন। তবু তাঁর সন্নিধানে গিয়ে মুগ্ধ হয়ে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, সুভাষচন্দ্রের বাবা ও মা জানকীনাথ বসু ও তাঁর স্ত্রী। বিভূতিভূষণ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে মোহিত হয়েছিলেন। গিয়েছিলেন শরৎচন্দ্র, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, রাধারানী ও নরেন্দ্র দেব। দেশনেতাদের মধ্যে অনেকে। তাছাড়া হিন্দু মুসলমান খ্রিষ্টান বাঙালী অসমিয়া ওড়িয়া মারাঠী বিহারী শিখ দক্ষিণী অজস্র অগুন্তি শিষ্যকে একটি ভাবসূত্রে গ্রথিত করা কত অনায়াসে সিদ্ধ হয়েছিল তা আশ্রমে এলেই বোঝা যায়। জাতীয় সংহতি জিনিসটি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যতই কঠিন হয়ে পড়ছে ততই চোখে বেশি করে পড়ছে সৎসঙ্গ সংগঠনে এক আদেশে বাঁধা একটি সংহত গণচরিত্রকে।

ঠাকুর কে বা কী তা এই সামান্য রচনার দ্বারা আর কতটুকু প্রকাশ করা সম্ভব? এ যেন পিদিম জ্বেলে সূর্যকে চেনানোর অক্ষম চেষ্টা। তবে বিশ্বাস করি, পরবর্তী প্রজন্মের মানুষেরা তাঁকে আবছায়া বোধের অন্তরাল থেকে নিজেদের মেধা, বোধ ও বিশ্বাস দিয়ে প্রকটিত করে দেবে জগৎ সমক্ষে। আমরা অপেক্ষা করব।
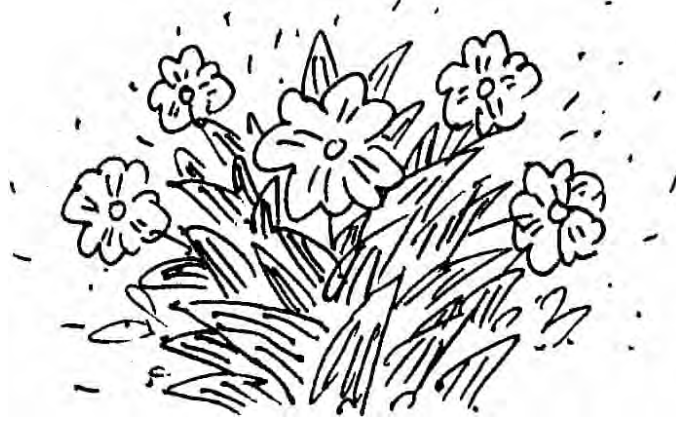
# দুই ঠাকুর প্রসঙ্গে

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র নিরামিষ প্রসঙ্গে যা বলেছেন তার বৈজ্ঞানিক কারণ অনেক গভীর ও ব্যাপক। আধুনিক বিজ্ঞান গবেষণার মাধ্যমে এখনও ততটা গভীরে যেতে পারেনি। কিন্তু আমিষ আহারের অবগুণ সম্পর্কে তার চৈতন্যদয় হতে শুরু হয়েছে।

আবার বর্ণাশ্রম প্রসঙ্গে ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র যা বলেছেন সেটারও সমর্থন মৃদুভাবে শুরু হয়েছে Genestics গবেষণায়। ধীরে ধীরে উন্মোচিত হতে চলেছে মানুষ, জীব ও উদ্ভিদের শ্রেণী গোত্র প্রজাতির অমোঘ বিভাজনের মূল সত্য। ঠাকুর যা যা বলেছেন তার সবই ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে বৈজ্ঞানিক গবেষণায়। কিন্তু ঠাকুর চেয়েছিলেন এসব গবেষণা আমাদের দিয়ে করাতে। যদি ঠাকুরের সেই আকূলতাকে সঠিক মূল্য দেওয়া যেত এবং যদি আমরা কাজে নামতাম তাহলে এত বছর অপেক্ষা করতে হত না। ঠাকুর যা বলছেন —তা-ই সত্য, একথা প্রথমেই ধরে নিলে কাজের সুবিধা হবে। বেত্তং পুরুষ সবটা নিজেই করে দেন না। দিলে মানুষের লাভ নেই। তিনি আমাদের পথটা ধরিয়ে দেন, তুকটা শিখিয়ে দেন। সেইটে ধরে এগোলেই কাজ হয়।

বিশ্বাস, ভক্তি আর রেখে না থাকলে ঠাকুরকে ঠিকঠাক বোঝা যায় না। যাতে আমরা তাঁকে বুঝতে পারি তার জন্যই তিনি সহজ হয়েছেন। আবার ততটা সহজ নন, যাতে বিনা আয়াসে তাঁকে বুঝে ফেলা যায়। পাণ্ডিত্যের কাছে তিনি মোটেই সহজলভ্য নন, বুদ্ধি দিয়েও তাঁর কিনারা পাওয়া কঠিন। অহং দিয়ে তাঁকে মাপা অসম্ভব। কিন্তু ভালোবাসলে তিনি জল হয়ে যান। ঠাকুর নিজেই ভালবাসার এক মানুষী প্রতিরূপ। তাঁর আয়ুধ, তাঁর অবলম্বন একমাত্র ওই ভালবাসাই—যা শত্রু মিত্র নির্বিশেষে সকলকেই টেনে নেয় কাছে। তাঁর অহংবোধ নেই, অভিমান নেই, ক্ষোভ নেই, অভাববোধ নেই। ঠাকুরের জীবনটা এত খোলামেলা, এতই ব্যক্ত যে কোনও মানুষ যে এরকম জীবন যাপন করতে পারে তা না দেখলে বিশ্বাস হয় না। ব্যক্তিগত জীবন বলতে তাঁর কিছুই ছিল না। তাঁর জীবনযাপনও ছিল ব্যক্ত, ব্যাপ্ত, উন্মুক্ত। তাঁর বিশাল হৃদয় প্রবাহিত হয়েছে ওই বিশাল উন্মুক্ত জীবন বেয়েই। এরকম ছাড়া ঠাকুরকে যে মানায়ও না। শরীর তাঁর সুস্থ থাকত না, ওরকম অতি অনুভূতিশীল মানুষের পক্ষে সুস্থ থাকাই কঠিন। সব সময়েই তাঁরা অন্যের মন ও শরীর দ্বারা সংক্রামিত হচ্ছেন। সুস্থ থাকবেন কী করে? তবু শরীরের জন্যও ছুটি নিতেন না। মানুষের সঙ্গ করতেন নিরন্তর। ঠাকুরের যে নেশা মানুষের উপর ছিল তা অন্য কারও মধ্যে কখনও দেখিনি। কী ধৈর্য্য, কী সহনশক্তি থাকলে নিরন্তর মানুষের উ□□পারিত বিষ হজম করা যায় তা সহজেই অনুমেয়। এক হিসাবে ঠাকুর প্রকৃত অর্থেই নীলকণ্ঠ। মানুষ ঠাকুরের কাছে এসে সর্বদা নিজের দুঃখ-দুর্দশা-সন্তান-শোক-ব্যর্থতা-

বিকৃতি-পাপ ইত্যাদির কথাই বলেছে। ভাল কথা শুনিয়েছে আর কজন? জীবনভোর প্রতিটি দিনই ঠাকুর এই সব মানুষের গ্লানিরই অংশীদার হয়েছেন। তাই প্রকৃত অর্থে তিনি মানুষের ব্যথার ঠাকুর দুঃখের ঠাকুর। ব্যথা হরণ করেন, দুঃখ ভার টেনে নেন নিজে মানুষকে মুক্ত করে দেন জীবনের অঙ্গনে। ভগবান রামকৃষ্ণদেবের মধ্যে এ জিনিষ ছিল। ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র ও ঠাকুর রামকৃষ্ণ এক ও অভেদ বলেই মনে হয়।

আমার নিজের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। বুকে যে মহা-অন্ধকার নিয়ে তাঁর কাছে গিয়েছিলাম তা কখন ঘুচিয়ে দিয়ে মহা-উদভাসে জীয়ন্ত করলেন আমাকে, কে জানে। তারপর নানা উত্থান-পতন, সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়ে তাঁকে নিয়ে চলা। যা বুঝেছি, ঠাকুরকে ধরলেই হয় না, তাঁর কথা, তাঁর অনুশাসন নিজে পালন করতে হয়। সপরিবারে অনুসরণ করতে হয় এবং অন্যকেও সামিল করতে হয় তাতে। নইলে শুধু তাঁর দীক্ষা নিলেই কিন্তু কাজ ফুরোয় না। বরং শক্ত কাজের তখনই শুরু।

ঠাকুরের পথে চলা শক্ত ভাবলে শক্ত। সোজা ভাবলে সোজা। ঠাকুরকে যদি ভালবেসে কেনা যায়, যদি বিশ্বাস করা যায়, নির্ভর করা যায় তাহলে এক লহমায় তাঁর কাজ হয়ে যায় সহজ। আর ওই ভালবাসাটা না এলে শক্ত মনে হয়। ঠাকুর বলেছেন, আমি তাঁকে ভালবাসি এমনতর ভাব বস্তুকে তৃপ্তি দেবার জন্য যেমন-যেমন যা-যা করে, শুধু তাই করলেই আপনিই ভক্তি ভিতর থেকে ক্রমে ক্রমে মাটি ফুঁড়ে ফোয়ারা বের হবার মতো বেরুতে থাকে।

ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সত্য, শিব, সুন্দরের সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা দিয়েছেন এইভাবে, সত্য মানে থাকার ভাব, শিব মানে মঙ্গলময়, সুন্দর মানে চির আদরনীয় যা। প্রসঙ্গতঃ বলছেন, জীবনের পোষণার ভিতর দিয়ে বিবর্তন, বিবর্দ্ধনের পথে চলাই কাম্য।

জীবন-ঠাকুরের সমস্ত জীবনাদর্শনটার মূল কথাই হল জীবন। ঠাকুরের দর্শন হল বাঁচতে ও বাঁচাতে শেখা ও শেখানো। যশ-প্রতিষ্ঠা-অর্থ পেয়েও মানুষ যে অসুখী জীবন যাপন করে তা আমরা ঘরে ঘরে দেখতে পাই। মানুষের একমাত্র ক্ষণিক মুক্তি মিলছে উত্তেজক আনন্দে। মদ খেয়ে জুয়া বা সিনেমা-থিয়েটার বা নাচ-গান মানুষকে কিছুক্ষণের জন্য বাস্তব ভুলতে সাহায্য করে বটে কিন্তু পরক্ষণেই তাকে নিক্ষেপ করে শরীর ও মনের অন্ধকারে। প্রকৃতি তার চালকের আসনে বসে থাকে বলে প্রকৃত আনন্দের সাক্ষাৎকার তার জীবনে ঘটেই না। শুধু আনন্দ কেন এই জীবন, এই চৈতন্য, এই অস্তিত্বের অর্থও তার কাছে পরিস্কার নয়। জীবনযাপন আমরা করি বটে কিন্তু কেন এই জীবন সে প্রশ্নের উত্তর আমাদের জানা নেই। ঠাকুরের কাছে আসা মানেই জীবনের পাঠশালায় প্রবেশ করা। আমরা যেন অবোধ বালক বালিকা। তাঁর কাছে বসে এই অস্তিত্বের, এই জগতের, এই জীবনের পাঠ নিচ্ছি।

বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, শিল্প এসব ব্যাপারকে আমরা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখি বা বিচার করি, অন্যায়টা খুঁজিনা, ঠাকুরের কাছে কিন্তু এগুলো বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়। সমন্বয় সূত্রটি দিয়েই গ্রথিত। আর সবকিছুর মূলেই যে এক ইষ্টকেই একতা না থাকলে কিছুই সম্যক বোধ করা যায় না এটা তিনিই আমাদের শিখিয়েছেন।

এই যুগে মানুষের প্রগতির যে সব লক্ষণ দেখা যাচ্ছে তার ভাল মন্দ বিচার করার ক্ষমতা সাধারণ মানুষের যেমন নেই, বুদ্ধিজীবীদেরও আছে বলে মনে হয় না। ঠাকুর বলেছেন, 'যখন বিধিবিপ্লব হয়, ঔদ্ধত্য ও ব্যতিক্রম-দুষ্ট হওয়াই যেখানে বাহাদুরি ও বীর্য্যের পরিচায়ক হয়, চরিত্রদৃষ্টি যখন আদরনীয় উৎসর্জ্জনা বলে খ্যাতি লাভ করে। তখন সাবধান, ঐতিহ্য, সংস্কার, সংস্কৃতিকে নির্যোলভাবে আলিঙ্গন করে সদৃশ বিবাহ ও ঐ বৈধী অনুচলনকে দৃঢ় করে তদনুগ আত্মনিয়মন-সঙ্গতিশীল হয়ে চলো, নয়তো, বিক্ষুব্ধ ঝঞ্ঝা ব্যক্তিত্ব ও জাতিকে জাহান্নমেই প্রতিষ্ঠা করে চলতে থাকবে। ঠাকুরের এই বাণীটি অনুধাবন করলেই বোঝা যায় এই যুগকে তিনি কী গভীরভাবে বুঝতেন। বিধিবিপ্লব মানে বিধি যা জীবনীয় যা, অস্তিবৃদ্ধিমুখী যা তাকে বলে দেওয়া বা অস্বীকার করা। অন্ততঃ আমার অনুমান তা-ই। এই বিপ্লবের জোয়ারেই এখন দুনিয়া ভেসে যাচ্ছে। বাঁধ দেওয়ার মতো তেমন কেউ নেই। এই বিধিবিপ্লবের প্লাবনে দুনিয়ায় একটা উল্টো পুরাণের প্রবণতাই দেখতে পাই। উনিশ শতকের শেষ ও বিংশ শতকের অনেকাংশ জুড়ে ঠাকুরের লীলার সময়। আর এই

সময়টাতেই সভ্যতার ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা ঘটনা ঘটেছে। দু-দুটি বিশ্বযুদ্ধ, পরমাণু বোমা, ভারতের স্বাধীনতা এবং বিশ্ব জুড়ে মূল্যবোধের অবনমন। শেষেরটাই সবচেয়ে মারাত্মক। এই যুগলক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে ঠাকুরের আবির্ভাব অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

নামধ্যানের প্রবাহ বজায় থাকলে যজন-যাজন-ইষ্টভৃতি-স্বস্ত্যয়নী-সদাচার আপনিই ঠিকঠাক হয়ে আসে। এই পঞ্চস্তম্ভের ওপর ঠাকুরের অতুলনীয় জীবন দর্শন দাঁড়িয়ে আছে। এর কোনওটায় ফাঁক বা ফাঁকি থাকলে হবে না। এই পঞ্চমত তো আসলে জীবন বৃদ্ধির দাঁড়া। ফাঁকি বুকি ঠাকুর পছন্দ করতেন না। ফাঁকি দিলেই নিজেকেই ফাঁকে পড়তে হবে। সেই ফাঁক ভরাট করা পরে কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

এই ফাঁকি বা ফাঁক সম্পর্কে আমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে। দয়াল ঠাকুরের আশ্রয় নেওয়ার পর থেকে ধীরে ধীরে এই বোধটুকু হয়েছে যাতে নিজের ফাঁক ও ফাঁকিটা অন্ততঃ ধরতে পারি। নাম বা ধ্যান করতে গিয়ে অনেক সময়েই দেখা যায়, নাম হচ্ছে না, কিন্তু নামের একটা প্রতিধ্বনি হবেই মাত্র, একটা রিনিঝিনি। ওটাকেই নাম বলে মনে হয়। কিন্তু তা নয়, সুস্পষ্ট মানস উচ্চারণে নামটি ভিতরে—বিশেষ করে আজ্ঞাচক্রে জাগ্রত করে নিতে হলে খুব সচেতন ও সচেষ্ট থাকা প্রয়োজন। এলানো রকমে করলে হয় না। ঠাকুর যে নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে আমাদের বাঁধতে চেয়েছেন সেটা যদি স্বেচ্ছায় এবং সাগ্রহে আমরা মেনে না নিই তাহলে অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়া অসম্ভব। আমাদের অভীষ্ট কী তাও আমরা জানি না। আমাদের অভীষ্টও ঠাকুরই নির্দেশ করে দিয়েছেন। এই মহাজগতের মধ্যে আমাদের জন্ম ও অস্তিত্ব এক অদ্ভুত সংগঠন। বৈজ্ঞানিক দার্শনিক কারও পক্ষেই ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়নি কেন এই অস্তিত্ব। এই ত্রাণবন্যা, এই ত্রাণের উৎস কী, লক্ষ্যই বা কী? মানুষ যত বিশ্বজগৎকে জানার চেষ্টা করছে ততই আরও বিভ্রান্তিতে পড়ে দিশেহারা হয়ে যাচ্ছে। নানাভাবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে জীবনকে, কিন্তু কিছুই স্পষ্ট হচ্ছে না। যত দিন যাচ্ছে ততই বোঝা যাচ্ছে, বিজ্ঞান নয়, মানুষকে হাঁটু গেড়ে বসতে হবে আধ্যাত্মিকতার কাছেই। আর আধ্যাত্মিকতার ভিতর দিয়েই একই হবে নতুন বিজ্ঞান-দর্শন। ঠাকুর তাঁর সব দর্শনকেই বলেছেন বিজ্ঞান। তাঁর মতো বিজ্ঞানমনস্কতা মহাপুরুষদের মধ্যে আর দেখা যায়নি। বিজ্ঞান তো শুধু বৈজ্ঞানিক গবেষণা বা আবিষ্কার নয়, বিজ্ঞান হল বাস্তব প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ওপর দাঁড়িয়ে বিশ্বরাজ্যের অন্বেমান ও উৎথাপন। ওটা একটা পথ ও পদ্ধতি, ঠাকুর অবৈজ্ঞানিক কিছুই পছন্দ করতেন না। তাঁর সমস্ত কথাবার্তার মধ্যেই ছিল অনিবার্য ও অমোঘ বৈজ্ঞানিক সত্যাবলোকন। সারাজীবন ঠাকুর বিজ্ঞানের কথাই বলেছেন, বাঁচার বিজ্ঞান, বাঁচিয়ে রাখার বিজ্ঞান, বড় হওয়ার বিজ্ঞান, বড় করে তোলার বিজ্ঞান, আমরা যে চোখ-ধাঁধাঁনো অবাক করা বিজ্ঞানের চমক আজকাল দেখছি সেই বিজ্ঞানেরও প্রয়োজন আছে বৈকি। কিন্তু মঙ্গলমুখী জীবনমুখী বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা আরও বেশী। ঠাকুর যা কিছু করেছেন তার মধ্যে ইষ্ট ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তাই ঠাকুরের দর্শন-বিজ্ঞান সম্পূর্ণ কল্যাণমুখী। কল্যাণ সম্পর্কে মানুষের ধ্যানধারণা নিতান্তই ভাসা ভাসা। ভাল-মন্দের বোধও তাদের পরিষ্কার নয়। আর ধ্যান-ধারণা চিন্তার ক্ষেত্র অপরিচ্ছন্ন থাকায় কী করলে ভালো হয় সে সম্পর্কেও মানুষ উল্টোপাল্টা মত দিয়ে থাকে। অনেক সময়ে এক মানুষই বিভিন্ন সময়ে সম্পূর্ণ বিপরীত মতামত প্রকাশ করে। আজকের দুনিয়া এই পারম্পর্যহীন, বোধহীন, সত্যহীন জীবনধারণার শিকার। তাই ক্রমশঃ মানুষের জীবনে ঘনিয়ে উঠছে অনিবার্য পাশবিকতার প্রাধান্য। আজ মনে হয়, ঠাকুর এসেছিলেন এই মহা সর্বনাশের হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করতেই। বনের বাঘে খায় না, মনের বাঘে খায়—এই কথাটি ঠাকুর বারবার নানাভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। মানুষ যাতে নিজের মনের সঙ্গে লড়াইতে জয়ী হতে পারে তার জন্যই ঠাকুর প্রবৃত্তিজয়ী নানা চারিত্রিক আয়ুধে মানুষকে বলীয়ান করতে চেয়েছেন। মানুষকে আত্মস্থ, সৎকর্মপরায়ণ, তন্নিষ্ট, ভক্তিমান, বিনয়ী দেখতে বড় ভালবাসতেন দয়াল ঠাকুর।

ঠাকুরকে নিয়ে চলা মানে হচ্ছে, জীবনমুখী চলা, অস্তিমুখী অভিগমন। মৃত্যুর ছায়াও ঠাকুর পছন্দ করতেন না। তার সবটুকুই জীবন ও অস্তিত্বের সারাৎসার। তিনি বলেছেন, জীবন যদি না চাও, মৃত্যু চাইতে হবে না।

মৃত্যু-বিরোধী ছিলেন বলেই ঠাকুরের সব কথাই এমন আশ্চর্য জীবনমুখী। শুধু মানুষ নয় তাঁর গভীর মমতায় মাখা ছিল গোটা জীব ও জড় জগৎ।

# ধর্ম

যতদূর জানি আমাদের কূলদেবতা হলেন জগদ্ধাত্রী। আমাদের ময়মনসিংহের বাড়িতে জগদ্ধাত্রীর বড় একটা ছবি ছিল ঠাকুরের আসনে। সেই সঙ্গে অবশ্য পেতলের গোপাল, লক্ষ্মীর পটও ছিল। আমাদের একটা কাপড়ের দোকান ছিল ময়মনসিংহের বাজারে, তার নাম ছিল জগদ্ধাত্রী ভাণ্ডার। আমাদের পরিবারের অনেকেই আবার ছিলেন রামঠাকুরের ভক্ত এবং শিষ্য। স্বয়ং রামঠাকুর আমাদের ময়মনসিংহের বাড়িতে এসেছেন এবং অবস্থানও করেছেন। আমাদের ময়মনসিংহের বাড়ির পাশেই ছিল গোলোকপুর জমিদারের বাড়ি। যাদের সঙ্গে আমাদের বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। শ্রী শ্রী ঠাকুরের বাবা শিবচন্দ্র ওঁদের এস্টেটেই এক সময়ে চাকরি করতেন। সেই সুবাদেই কিনা জানি না, মাতা মনমোহিনী মাঝে মাঝেই গোলোকপুরের বাড়িতে আসতেন। আমার পিসিমাদের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা ছিল। আমার বাবাকে দেখেছি, খুব কালীভক্ত। আর মা সারদেশ্বরী আশ্রমে স্বয়ং গৌরীমার কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারার মানুষ। বলতে পারা যায় আমার পরিবারে অনেক ভাবধারার একটা সম্মেলন ঘটেছিল।

আমার বিশ্বাস, আমি কোন পন্থা নেব, কার অনুশাসন গ্রহণ করব এটা ঠিক আমার ইচ্ছাধীন ছিল না। ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের কাছেই ঘাটবাঁধা ছিল বলে আমাকে তাঁর কাছেই আসতে হয়েছে। ঠাকুরকে যত দেখেছি, বুঝবার চেষ্টা করেছি, আঁকড়ে ধরেছি ততই মনে হয়েছে সম্পর্কটা বোধহয় এক জন্মের নয়। আরও

মনে হয়েছে, দীক্ষা নেওয়ার আগে থেকেই হয়তো বা আমার জন্মের পর থেকেই তিনিই আমাকে নিয়ন্ত্রণ করছেন।

ঠাকুরের মতো এমন আশ্চর্য মানুষ, এমন আশ্চর্য আবির্ভাব আমি তো আর দেখিনি। আর তাঁকে না দেখলে বোধহয় আমার ঘোর নাস্তিকতার অবসানও ঘটত না। তাঁর কাছে গিয়ে যে আমার অনুসন্ধান শেষ হল এমন নয়। বরং ঠাকুর আমার মধ্যে নূতনতর প্রশ্ন জাগিয়ে ছিলেন। নূতনতর এক প্রক্রিয়ায় জীবনকে বদলানোর চেষ্টা করতে গিয়ে খাতবদলের সমস্যাও এল অনেক। পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে শুরু হল নানা দ্বন্দ্ব ও বিতর্ক। এই সব হওয়া অনিবার্যই ছিল। ঠাকুরের প্রদর্শিত পথ তো কুসুমাস্তীর্ণ নয়। দ্বন্দ্ব নিজের মধ্যেও, কিন্তু এটা বেশ বোঝা গেল ঠাকুর সাদা সরল পথেই চলেন, ঘুরপথের পথিক নন, যা ভাল তা আপাত বিচারে যতই অনভিপ্রেত বলে মনে হোক সেটাকেই তিনি গ্রহণ করেন। লোকের কথায় চলেন না।

লোকের ধারণা ধর্ম মানে কিছু সদুপদেশ। তার বেশি কিছুই নয় এবং ধর্মের সঙ্গে বুজরুকির সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ, এ ধারণা মিথ্যেও তো নয়। ধর্মের নামে প্রবঞ্চনা, প্রতারণা ঘটে। বুজরুক বা ম্যাজিকওয়ালাদের অভাব নেই। ঠাকুরের কাছে গিয়ে প্রথম বুঝলাম, কঠোর এবং অনমনীয় অনুশাসনবাদ ছাড়া ধর্মাচরণ হয় না। আর ধর্মাচরণ মানেই হচ্ছে জীবনযাপন, ঘরগেরস্থালী, চাকরিবাকরি, প্রেম প্রণয়, সন্তান পালন, কৃষিকাজ, শিক্ষা, লোকব্যবহার সর্বত্রই ধর্মাচরণ করা। প্রচলিত ধারণার সাথে ঠাকুরকে মেশানো যাবে না।

এ যুগে মানুষের বিশ্বাসের ক্ষেত্রটি খুবই দুর্বল। তার কারণ নানা মতবাদে জর্জরিত মস্তিষ্কে মানুষের মন এখন সততই সন্দেহাকুল। ফলে কোনও কিছুকে সহজ সরল ভাবে বিশ্বাস করতে বা নির্ভর করতে পারে না, কিন্তু বিশ্বাস না থাকলে আধ্যাত্মিকতার পথে অগ্রসর হওয়া কঠিন। আর এই বিশ্বাস অর্জনের জন্য ঠাকুর যে পন্থা নির্দেশ করেছেন তা হল নাম-ধ্যান, জপ, সঙ্গে সদাচার এবং নিষ্ঠা। বিশ্বাস ঠেলে উঠবে। আপাত দৃষ্টিতে ঠাকুরের ভরভরাট সংসার ছিল। সেই সংসারের কর্তা হিসেবে নিজের যথা কর্তব্য ঠাকুর পালনও করতেন। তবু খুব প্রকট ভাবেই বোঝা যেত যে তিনি সংসারে সংসক্ত নন, বরং তাঁর ব্যক্তিগত সংসারের সীমানাকে তিনি জগৎ সংসারের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন।

আমান ঈশ্বর-পুরুষ, পূর্ণাবতার ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সংসারজ্ঞান তবু এত টনটনে কী করে ছিল সেইটাই বিস্ময়ের। আর তিনি এবার যেন এসেছেন সংসারী মানুষদের জন্যই। কতিপয় সন্ন্যাসী-যতি তৈরি করেছিলেন ঠিকই, তবে সংখ্যায় বেশি নয়। যতি-সন্ন্যাসীদের গেরুয়া বা কৌপীনও ধরাননি, কিন্তু জীবন-যাপনে কঠোর অনুশাসন আরোপ করেছিলেন। যতিরা সাজা সন্ন্যাসী নয়, সত্যিকারের সন্ন্যাসী। ভিক্ষান্নে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে হবে, পরিবারের সঙ্গে সংস্পর্শ বর্জন করতে হবে ইত্যাদি। অনেকেই এই কঠোর ব্রত ধরে রাখতে পারেননি। কিন্তু যারা ধরে রাখতে পারগ হয়েছেন তাঁদের উপলব্ধির জগৎ উন্মোচিত হয়েছে। ঠাকুর নিজে যতি আশ্রমে প্রতি দিনই বেশ কিছুটা সময় কাটাতেন। যতিদের অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করতেন। শ্রী শ্রী ঠাকুরের 'যতি অভিধর্ম' গ্রন্থটিকে কাব্যগ্রন্থের মর্যাদা দেওয়া যায়। তার ভাষা ও বাক্য এতই অসাধারণ যে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়। যেখানে তিনি নির্দেশ করেছেন, যতিদের মাথার ওপর ছাদ হবে মহাকাশ, শয্যা হবে ভূমি ইত্যাদি। রিক্ত জীবনের ঐশ্বর্য যেথায় রয়েছে যতি যেন তারই অভিযাত্রী। প্রকৃত সন্ন্যাসী কাকে বলে যতিদের জীবন-যাপন দেখলেই তা বোঝা যায়। কোনও ভেক নেই, গেরুয়া নেই, কিন্তু সৎ-এ ন্যস্ত হওয়ার শর্তগুলির মান্যতা আছে। ঠাকুর ধর্মকে কতটা জীবনীয় ও ফলিত করে তুলেছেন তা তাঁর এইসব উদ্যোগের ভিতর দিয়ে বোঝা যায়।

ঠাকুর স্বস্ত্যয়নী প্রসঙ্গে কত যে আলোচনা করেছেন তার হিসেব নেই। স্বস্ত্যয়নীকে তিনি এক উচ্চতম মর্যাদার আসনে বসিয়েছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র যে স্বস্ত্যয়নী ব্রত প্রবর্তন করেছেন তা একটি অনন্যসাধারণ মাঙ্গলিক লোককল্যাণমুখী প্রকল্প বিশেষ। স্বস্ত্যয়নী কথাটার অর্থ হল সু+অস্তিঅয়ন, অর্থাৎ প্রকৃষ্টভাবে বেঁচে থাকার পথ বা পন্থা। মানবজীবনের চরম ও পরম সম্ভাব্যতাকে বাস্তবে ফলিত করে তোলাই জীবনের সাধনা। তার জন্য চাই দেহ, মন, ইচ্ছাশক্তি ও পারিপার্শ্বিকের ইষ্টানুকূল নিয়ন্ত্রণ, সামঞ্জস্য ও

সমাধান, তারই অপূর্ব সঙ্কেত স্বস্ত্যয়নীর পাঁচটি নীতির মধ্যে কেন্দ্রীভূত করা আছে। স্বস্ত্যয়নী ব্রত পালন করা মানে এ পাঁচটি নীতিরই নিখুঁত অনুশীলন ও অনুসরণ করা।

ঠাকুর স্বস্ত্যয়নী ব্রতর সুদূরপ্রসারী ফলের কথা বহুভাবে বলেছেন, তাঁর দেওয়া এই ব্রতর পাঁচটি নীতি হল।

১) শ্রীবিগ্রহের মন্দির ভেবে যত্ন করিস শরীরটাকে
সহনপটু সুস্থ রাখিস। বিধিমাফিক পালিস তাকে
২) প্রবৃত্তি তোর যখন যেমন যেভাবেই উঁকি মারুক
ইষ্টস্বার্থ প্রতিষ্ঠাতে ঘুরিয়ে দিবি তার সে ঝোঁক।
৩) যে কাজে যা ভাল বলে আসবে মনে তৎক্ষণাৎ
হাতে কলমে করবি রে তা রোধ করে তার সব ব্যাঘাত।
৪) পাড়া পড়শির বাঁচা বাড়ায় রাখিস রে তুই স্বার্থটান
তাদের ভালয় চেতিয়ে তুলিস ইষ্টানুগ করে প্রাণ,
৫) নিজের সেবার আগে রোজই শক্তিমতো যেমন পারিস
ইষ্ট অর্ঘ্য ভক্তিভাবে শুচিতে নিবেদন করিস,
এই নিয়মে নিত্যদিন প্রতি কাজেই সর্বক্ষণ
স্বস্ত্যয়নীর নিয়মগুলি পালিস দিয়ে অটুট মন,
ত্রিশটি দিন হয়ে গেলে মাসিক অর্থ (তিনটি টাকা) সদক্ষিণার
ইষ্টভোজ্য পাঠিয়ে বাকি মজুত রাখবি বর্দ্ধনায়।

স্বস্ত্যয়নীর মজুত অর্থ থেকেই লোককল্যাণমুখী একটি ভান্ডার গড়ে তুলতে হবে। যথেষ্ট অর্থ সঞ্চিত হলে তা দিয়ে চাষের জমি কিনে তা থেকে আয় করা যায়। সেটা সম্ভব না হলে, যে লগ্নিতে ক্ষতি হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই এমনতর লগ্নি করা যেতে পারে। যথা ফিক্সড ডিপোজিট বা ডাকঘরের নানা প্রকল্প। এই লগ্নি থেকে যা আয় হবে তা থেকে লোক কল্যাণকর কাজে ব্যয় করতে হবে এবং কিছু অংশ অর্থভান্ডার বৃদ্ধি কল্পে রাখতে হবে। জীবনের জটিল, গভীর সমস্যা, মানসিক বিকার থেকে গ্রহদোষ বা ভাগ্যবিপর্যয় সবই জয় করা সম্ভব। নিষ্ঠা ভরে স্বস্ত্যয়নী নিয়মিত করলে, এবং স্বস্ত্যয়নীর উদ্বৃত্ত অর্থ ঠাকুর নির্দেশিত লোককল্যাণকর সেবায় নিয়োজিত হলে, এই উদ্বৃত্ত অর্থ কোনও ক্রমেই কারও নির্দেশেই কোনও সংঘেই দেওয়া যায় না। এই অর্থ নিজের নামে সঞ্চিত রেখে, ক্রমবর্ধমান লগ্নির মাধ্যমে বাড়িয়ে তা থেকে লোকসেবা নিজের হাতেই করা বিধি। এর প্রত্যয় যারা করে তারা স্বস্ত্যয়নীর অন্তনির্হিত মঙ্গলের অধিকারী হতে পারে না, তবে যাদের সন্তান নেই বা উপযুক্ত উত্তরাধিকারীর অভাব বা নিঃসঙ্গ ব্যক্তি শেষ বয়সে সঞ্চিত স্বস্ত্যয়নীর উদ্বৃত্ত লোককল্যানকর কাজে ব্যয় করার জন্য বিশিষ্ট ও বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি বা ইষ্টভ্রাতার তত্ত্বাবধানে তা সংঘের তহবিলে দিতেও পারেন।

শ্রী শ্রী ঠাকুর স্বস্ত্যয়নী প্রবর্তন করেছেন মানুষের পরার্থপরতা ও সেবাবুদ্ধি জাগ্রত করার জন্য এবং তার নীতি বিধি তিনিই স্থির করে দিয়েছেন। স্বস্ত্যয়নীর পঞ্চনীতির মধ্যেই এই অর্ঘ্য কীভাবে ব্যয় করতে হবে তা বিস্তারিত বলা আছে। বিকল্প কোনও পন্থা নির্দেশ করেননি। সুতরাং ঠাকুরের নির্দেশিত পন্থা থেকে বিচ্যুত হলে তা আর তাঁকে নন্দিত করে না। ইষ্টেত্তর স্বার্থে নিয়োজিত হয়ে ব্রতভঙ্গ ঘটে। আর স্বস্ত্যয়নী কাঁটায় কাঁটায় পালন করলে কী হয় তা আমার নিজের জীবনেই একাধিকবার প্রত্যক্ষ করেছি। স্বস্ত্যয়নী চরণামৃত যে গ্রহদোষ খন্ডন করে সে বিষয়ে ঠাকুর যা বলেছেন তা এক জ্বলন্ত সত্য। সুতরাং এই মহান ব্রতটির গুরুত্ব বুঝে শ্রী শ্রী ঠাকুরের নির্দেশ অনুসরণ করাই বিচক্ষণতার কাজ।

স্বস্ত্যয়নী নিয়ে ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই গবেষণা হবে। আমার তো বহুবার মনে হয়েছে ব্রতবিধির পাঁচটি নীতির মধ্যে এক গভীর জীবনবোধ নিহিত রয়েছে। ব্যাখ্যা করলে ওই পাঁচটি নীতি নিয়ে গবেষণামূলক বই লেখা

যায়। ঠাকুর নিজে স্বস্ত্যয়নী নিয়ে অনেক কথা বলেছেন। বিশেষ করে ভূ-সম্পত্তি স্বস্ত্যয়নীর অধীনে আসতে শুরু করলে একদিন স্বস্ত্যয়নীর এক বিশাল কৃষি বিপ্লবও সম্ভব হয়ে উঠতে পারে। ভাগবৎ অর্থনীতির প্রকৃত রূপ আমরা তখনই প্রত্যক্ষ করব। শুধু কৃষিজমি নয়, যে লগ্নিতে ক্ষতির আশঙ্কা নেই বা ফাটকার ভয় নেই সেরকম নিরাপদ প্রকল্পে স্বস্ত্যয়নীর অর্থ নিয়োগ করা যায়। আর এই ভাগবৎ মঙ্গলমুখী কাজের ভিতর দিয়েই ব্রতধারীর জীবন প্রসার লাভ করতে থাকে। ঠাকুর স্বস্ত্যয়নী ব্রত প্রবর্তন করে আমাদের সামনে অশেষ মঙ্গলের দরজা খুলে দিয়েছেন।

মুশকিল হল স্বস্ত্যয়নীর উদ্বৃত্ত অর্থ দিয়ে চাষের জমি কেনা নিয়ে। যাঁরা গ্রামে থাকেন তাঁরা পাবেন, যারা শহরে থাকেন তাঁদের পক্ষে জমি দিয়ে চাষ করানো কঠিন। প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ছাড়া ওতে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশি। ঠাকুর তাই নিরাপদ লগ্নির কথাও বলেছেন। ডাকঘর বা সরকারি ঋণপত্র মারফত লগ্নিতে বাধা নেই। মোট কথা স্বস্ত্যয়নীর সম্পদকে রক্ষা ও ক্রমবর্ধমান রেখে লোক কল্যাণের কাজে নিয়োজিত করা। সেটা না হলে স্বস্ত্যয়নী ব্রত গ্রহণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

'তপো বিধায়না' দ্বিতীয় খণ্ডে ঠাকুর একটি আত্মোৎসর্গ যজ্ঞের কথা বলেছেন। এই যজ্ঞ সম্পাদন করা সহজ ও সংক্ষিপ্ত। প্রথমে আচমন 'নমো বিষ্ণুবে, নমো বিষ্ণুবে, নমো বিষ্ণুবে' বলে কোষাধৃত জল একটু পান করে বাকিটা মাথায় লেপন করতে হবে। তারপর উচ্চারণ করতে হবে। আকাঙক্ষাতত চক্ষু প্রাজ্ঞগণ বিষ্ণুর পরমচলন সতত দর্শন করেন। আমার অন্তর বাহির সেই চলনস্নাত হোক। তারপরের পর্যায়, হাতে জল নিয়ে বলতে হবে, 'হে অগ্নি, আমাদের ঐশ্বর্যের নিমিত্ত সুপথে লইয়া চল, হে দেব, তুমি বিশ্বকর্মবিদ, আমাদের কুটিল পাপরাশি বিদূরিত কর, তোমাকে আমাদের ভূয়োঃ ভূয়োঃ প্রণাম।' এরপর এই মন্ত্র, 'আদিত্যাদি নবগ্রহ ও ইন্দ্রাদি দশদিকপাল আমার নমস্কার গ্রহণ করুন। প্রজাপতি ব্রহ্মার্ষিগণ আমার নমস্কার গ্রহণ করুন। সর্বদেবগণ, আমার নমস্কার গ্রহণ করুন। হে নিখিলাত্মক পুরুষোত্তম, আমার নমস্কার গ্রহণ করুন। হে আমার জীবনী আচার্য আমার আভূমিলুণ্ঠিত প্রণাম গ্রহণ করুন। এরপর আত্মোৎসর্গ 'প্রভু, হৃদয়বল্লভ, ভারাক্রান্ত জীবন নিয়ে আজ তোমার সান্নিধ্যে উপস্থিত, নিজেকে উৎসর্গ করতে তোমার স্বস্তি সংবর্ধনার যাগচারী করে, আমার জীবন তোমার অস্তি বর্ধনী অর্চন অভিসারণায় নিয়োজিত হউক। আমার প্রতিটি পদক্ষেপ তোমার ইষ্টানুগ শুভচর্চায় নিরত থাকুক, আমার প্রাণনদীপনা সুখ সাফল্য অনুচর্য্যায় তোমাকে সুদীর্ঘ জীবনের অধিকারী করে তুলুক নির্ব্যাধি নিরুদ্বেগ করে; ঐ অনুচর্য্যা আমার যা কিছু সবকে নিরত চলনে নিয়ন্ত্রিত করে তুলুক, তুমি আমার প্রভু, তুমি আমার সত্তাসর্বস্ব, তুমি আমার পরপারের পুণ্যতোরণ ইত্যাদি।

এই আত্মোৎসর্গ মন্ত্রটি ঠাকুর কেন দিয়েছিলেন তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না, এটি নিত্য করণীয় কিনা বা কোন পরিস্থিতিতে করা প্রয়োজন সে বিষয়েও কিছুই জানা যায়নি। তবে এই চার পর্বের আত্মোৎসর্গ মন্ত্রটি আমার কাছে অতিশয় তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়, আর এটি রোজ করার কিছু সুফলও আছে আমার ধারণা। অবশ্য সব মন্ত্রই উচ্চারণ করতে হয় ভক্তি ও নিষ্ঠার সঙ্গে। ঠাকুরকে ভালবেসে যদি করা হয় তবেই তা ফলপ্রসূ হয়ে ওঠে। নইলে নিষ্প্রাণ আবৃত্তি হয়ে থেকে যায়। ঠাকুরের কাছে যখন প্রথম গেলাম তখন তাঁকে চিনি না, জানি না, তাঁর সম্পর্কে অনেক বিরূপ কথাও কানে এসেছে। তার ওপর তাঁকে ঘিরে এত মানুষের ভিড় যে কাছে যাওয়ার উপায় নেই। শুধু প্রথম দর্শনের চমকটুকুই আমার সম্বল। দুটি অপার্থিব হীরকদ্যুতিময় চোখ এবং সর্বাঙ্গে গলিত অহং-এর প্রকাশ। কিন্তু ভালো করে জানবার বা বুঝবার আগেই ব্যাখ্যার অতীত কয়েকটি ঘটনা ঘটে গেল। যেগুলি অবশ্যই আমাদের বিচারে অলৌকিক। কিন্তু ওই ঘটনাগুলির ভিতর দিয়েই ঠাকুর আমাকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে ঠিক জায়গাতেই, ঠিক মানুষটির কাছেই এসেছি। ওই অশৈলী ঘটনাগুলি না ঘটলে তাঁর শক্তি সম্পর্কে আমার কোনও ধারণা হত না। শুনেছি ঠাকুরের লীলাকালের প্রথমদিকে, কীর্তনের যুগে অলৌকিক ঘটনা ছিল নিত্য নৈমিত্তিক, তার সাক্ষী হিমাইতপুরের হাজারো হাজারো মানুষ এবং ভক্তবৃন্দ। ওইসব ঘটনার ফলেই ঠাকুর সম্পর্কে নানা লোককথা

ছড়িয়ে পড়ে এবং বিচিত্র কিংবদন্তী সৃষ্টি হয়। এই সব ঘটনাবলীর ফলে অনেকে আকৃষ্ট হত। অনেকে ভয়ও পেত। আবার স্বার্থান্বেষীরা অন্য অর্থ খুঁজত।

প্রেরিত পুরুষরা প্রায় সকলেই তাঁদের পারিপার্শ্বিকের দ্বারা নিপীড়িত হয়েছেন, লাঞ্ছিত ও গঞ্জিত হয়েছেন। তার কারণ একটাই। তাঁরা অন্য আর পাঁচজনের মতো আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থান্বেষী, অনুদার জীবন যাপন করেন না। তাঁরা ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার অনুশীলন করেন এবং সর্বভূতে সমদৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে থাকেন। তাই তাঁদের সঙ্গে আর পাঁচজনের মেলে না। এই অন্যরকম হওয়ার দরুণই তাঁরা আক্রোশের শিকার হয়ে পড়েন। শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের ক্ষেত্রেও ঠিক একই ব্যাপার ঘটেছিল। তাঁর কথা, আচরণ, তাঁকে ঘিরে ভক্ত বলয় এবং কিছু অনৈসর্গিক ঘটনা, এ সবই কিন্তু মানুষের বৈরীতার জন্ম দিয়েছিল। ঠাকুর হিমাইতপুরেই জন্মেছিলেন। সুতরাং তাঁকে বাল্যাবধি সবাই গাঁয়ের আর পাঁচটা ছেলের মতো দেখত। কিন্তু অসাধারণত্ব ছিল বটে, কিন্তু সেটাকে কেউ গুরুত্ব দেয়নি। কিন্তু হঠাৎ যৌবনে সেই অনুকূলচন্দ্রকে ঘিরেই যখন এক উন্মাদনা সৃষ্টি হল তখনই গাঁয়ের মাতব্বররা চটলেন, ঈর্ষাপরায়ণ হলেন এবং বিরুদ্ধতা শুরু করলেন। তাঁকে আধ্যাত্মিক পুরুষ বলে মেনে নেওয়া গাঁয়ের বা কাছের মানুষদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। সাধারণত কাছের মানুষের ভিতরে দেবত্বের বা কোনও অসাধারণত্বের উদ্ভব মানুষ বিশ্বাস করতে চায় না, মানতেও তাদের অহং-এ লাগে। শুধু পাড়া-প্রতিবেশীই নয়, তাঁর আপনজনদের কে কতটা তাঁর স্বরূপ বুঝতে পেরেছিলেন সেই প্রশ্নও থেকে যায়।

মানছি যে, ঠাকুরকে বুঝতে পারা কঠিন। এমন একটা লৌকিক গার্হস্থের নির্মোক আরোপ করে রাখতেন যে, তাঁকে সাদামাটা ভাবে দেখে বোঝার উপায় ছিল না, তিনি একজন আধ্যাত্মিক পুরুষ, পূর্ণজ্ঞানের অধিকারী এবং পূর্ণ অবতারও। রামকৃষ্ণদেবকে নিয়েও এরকম বিভ্রান্তি ছিল। ঠাকুরের ক্ষেত্রে বাধা ছিল আরও বেশি। কারণ তাঁকে ঘিরে একটা অপপ্রচারও খুব চালু ছিল। এক হল, তিনি সম্মোহন জানেন। দুই হল, তাঁকে নিয়ে মানুষের মাতামাতি। তিন হল, নানা অলৌকিক ঘটনা। আর সে আমলে ঠাকুরেরই শিষ্য কৃষ্ণচন্দ্র দাসের বৈরীতার ফলে 'শনিবারের চিঠি' নামক জনপ্রিয় এক সাময়িকীতে ঠাকুরের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক অপপ্রচার। ফল কিন্তু উল্টোই হয়েছিল। ঠাকুরের নাম নিন্দাবাহিত হয়েও ঘরে ঘরে পৌঁছে যায়। আজ 'শনিবারের চিঠি' অবলুপ্ত এবং ঠাকুরের প্রতিষ্ঠা অতিশয় ব্যাপক। ঠাকুর ওই অপপ্রচার বন্ধ করার তেমন কোনও চেষ্টাই করেননি। যদিও শিষ্যদের দিক থেকে প্রবল প্ররোচনা ছিল।

প্রচার যেমন দরকার তেমনি সঙ্গে সঙ্গে দরকার ঠাকুরকে হৃদয়ঙ্গম এবং হৃদয়স্থ করা। সেটা না হলে প্রচারও তো কেবল ঢক্কানিনাদে পর্যবসিত হয়। ঠাকুর যে যাজনের কথা এত করে বলেছেন তা কেবলমাত্র বাক সর্বস্ব প্রচার হলে তো কথাই ছিল না। বকবক করে গেলেই যাজন হয়ে যেত। যাজন মানে নিজের ভিতরে ঠাকুরের বোধ ও বুদ্ধিকে জাগিয়ে তোলা। চৈতন্যের উন্মেষ যথাযথ না হলে ব্যক্তিত্বে তার ছাপ পড়ে না। আর ব্যক্তিত্ব প্রকাশ না পেলে মানুষকে প্রভাবিত করা কঠিন হয়। কিন্তু যে মানুষ ঠাকুরকে নাছোড় হয়ে ধরেছে, ঠাকুরের ধান্দাতেই সর্বদা উন্মুখ তেমন মানুষকে দর্শন করলেও যাজনের কাজ হয়ে যায়। আধ্যাত্মিক জগৎটাই গুরু নির্ভর, গুরু-কেন্দ্রিক এবং গুরু-সর্বস্ব। আর ঠাকুরের মতো গুরু পুরুষোত্তমকে পেলে এক জন্মেই বহু জন্মের সাধনা সাধ্যে চলে আসে। যেহেতু ঠাকুরের আশ্রয় নেওয়ার আগে আমার জীবনে তেমন কোনও আধ্যাত্মিক চর্চা ছিল না, কিংবা ছিলেন না কোনও বিগ্রহ বা বিশেষ দেবতা সেইজন্যই ঠাকুরকে গ্রহণ করে তাঁকে আঁকড়ে ধরতে আমার খুব বেশি অসুবিধে হয়নি। অন্য কোনও অভিভূতি তেমন বাধা হয়নি। আমার জীবনে আমার মায়ের প্রভাব অত্যন্ত গভীর। মায়ের মধ্যেই আমি বোধহয় দেবত্বকে খানিকটা পেয়েছি। মা ধর্মপ্রাণা মানুষ ছিলেন। সারদেশ্বরী আশ্রমে তাঁর কৈশোরকাল কেটেছে। স্বয়ং গৌরীমার মাধ্যমে তাঁর দীক্ষা হয়। ছেলেবেলা থেকেই আমাদের পরিবারে ঈশ্বরভক্তি ও পুজো অর্চনা দেখে এসেছি। তা সত্ত্বেও কলকাতায় এসে নানা প্রগতিবাদীদের প্রভাবে এবং রাজনৈতিক সংস্পর্শে আমার ঈশ্বরবোধ উধাও হয়, বিশেষ করে সোপেনহাওয়ারের নেতিবাদী এবং হতাশাবাদী দর্শনচর্চার পর এই নাস্তিকতা প্রগাঢ় হয়।

ঠাকুরের আশ্রয় লাভ করার পর আমার জীবনে যে আলোর স্পর্শ পাওয়া গেল তা একটু নতুন রকমের। ঠাকুরের আধ্যাত্মিক দর্শনে ভাববাদিতা নেই, আছে কড়া এ অনুশীলনের নিয়মানুবর্তিতা, এই ব্যাপারটাই অভিনব। ঠাকুর তাঁর শিষ্যদের শুধু দীক্ষা দিয়েই ছেড়ে দেন না, তাদের দিয়ে যথাকর্ম করিয়েও নেন। ঠাকুরের বক্তব্যের মধ্যে কোনও সময়েই আবছা বা ধোঁয়াটে কোনও দার্শনিকতা থাকে না। ঋজু ভাষায় যুক্তিনিষ্ঠ পরম্পরায় নিবেদিত তাঁর জীবন-দর্শনটির রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে আছে তাঁর অপার ভালবাসা আর অস্তিবাদী প্রবণতা।

আমাদের দোষ দুর্বলতা আছেই, পতন উত্থানও অবধারিতভাবে থাকবেই। ঠাকুর সম্ভবত নির্বিঘ্ন জীবন তেমন পছন্দ করতেন না। মানুষ যদি বিঘ্নহীন নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করে তাহলে তার আত্মশক্তির উদ্বোধন হয় না, বিপর্যয় মোকাবিলার কূটকৌশল অনায়ত্ত থাকে এবং দক্ষতা ও উপস্থিত বুদ্ধির অভাব ঘটে। মানুষ ঠেকে শিখুক, দক্ষ ও পারঙ্গম হয়ে উঠুক, দুর্গতিকেই দুর্গ বানিয়ে নিক এমনটাই ঠাকুরের ঈপ্সিত ছিল। বাধা বিপত্তিগুলি বেশিরভাগ সময়েই মানুষের বন্ধুর মতোই কাজ করে, বাধা পেলে ভেঙে পড়তে নেই, হতাশ হতে নেই। আমার নিজের জীবন আবর্তসংকুল। কৈশোরকাল থেকেই দেশভাগের ফলে আমার শিক্ষাক্রম ব্যাহত হয়েছে। পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রথম ছাত্রাবাস ও পরে বোর্ডিং বা মেসে জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়টা কাটাতে হয়েছে। লেখালেখির কারণে পেশাগত জীবনে কৃতবিদ হইনি। তদুপরি ছিল আমার মেলাংকলিয়ার সমস্যা। দুর্বল মানসিকতার দরুন, সাহস, উদ্যমের অভাবের দরুন তেড়েফুঁড়ে কিছু একটা করে ফেলার মনোভাবও ছিল না। মধ্যযৌবনে আমার জীবনে শ্রী শ্রী ঠাকুর যখন যুক্ত হলেন তখনই আমার জীবনতরী খানিকটা সুস্থির হল। একটা লক্ষ্য ও গতি লাভ করল। তাঁর আশ্রয় না পেলে কী হত তা ভাবতেও ভয় হয়।

ঠাকুরের সঙ্গে প্রথম দেখা হওয়াটাই ছিল বিস্ময়ের উৎস। বিস্ময়ের কারণ হল, সারা জীবনে, সেই ছেলেবেলা থেকেই আমি ধর্মীয় পুরুষ, সাধক সাধিকা, ফকির দরবেশ বা সাধু সন্ত কিছু কম দেখিনি। কিন্তু কারও ভিতরেই এরকম প্রবল শক্তির সন্ধান পাইনি।

ঠাকুর যে এক ডায়ানামিক এনার্জির উৎস তা প্রথমবারেই টের পেয়েছিলাম। আর তাঁর অন্তর্যামিত্ব, এ দুটোই পরম বিস্ময়কর এবং যুক্তি-তর্কের অতীত। দীক্ষা একটা অনুষ্ঠান বলে জানতাম। দীক্ষা নিলে কিছু হয় বলে বিশ্বাসও করতাম না। কিন্তু ঠাকুরের দীক্ষা নেওয়ার পর হাড়ে হাড়ে টের পেলাম দীক্ষার গভীরতা এবং প্রতিক্রিয়া কত সাংঘাতিক।

ঠাকুরের লোকব্যবহার যেটুকু দেখেছি তাকে দৃষ্টান্ত হিসেবে ধরলে কাজটা আমাদের পক্ষে কঠিন হবে। কারণ ওরকম স্নেহ, দরদী, অনুসন্ধিৎসু এবং সহানুভূতিশীল মানসিকতা অর্জন করা এ যুগে অতিশয় কঠিন কাজ। তাও ঠাকুর এমন সব মানুষকেই তাঁর কাছে পেয়েছেন যাদের যোগ্যতা বা মেধা নিতান্ত গড়পরতা। কিংবা বলা ভাল, তার চেয়েও একটু নিম্নস্তরেরই। ঠাকুরের বিশাল সত্তাকে পূরণ বা ধারণ করার ক্ষমতাই তাদের ছিল না, কাজেই ঠাকুরকেই এইসব মানুষকে গড়েপিটে নিতে হয়েছে।

'ডংকা মেরে সংসার করবি, আর ব্রহ্ম সিংহাসনে বসে থাকবি' পুণ্যপুঁথির মধ্যে ঠাকুরের এই কথাটা আমাদের পক্ষে এক দিক-নির্দেশক বাণী, ঠাকুরের আধ্যাত্মিকতার স্বরূপটা এই কথা থেকেই খানিকটা বোঝা যায়। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীদেরও যে বৃত্তি-প্রবৃত্তির হাত থেকে রেহাই নেই তা আমরা বিস্তর দেখেছি। ঠাকুর বলতেন, জোর করে কাম দমন করলে তা মস্তিষ্কের বারোটা বাজিয়ে দেয়। ঠাকুর কথা প্রসঙ্গে অনেকবার বলেছেন, বিয়ে না করে বিকারগ্রস্থ হওয়ার চেয়ে বরং বিয়ে করাটাই ভাল। আর সংসারজীবনেও হাঁসের মতো বাস করা সম্ভব। তাই ওই পুণ্যপুঁথিরই অন্যত্র তিনি বলেছেন, বনের চেয়ে ঘরের সন্ন্যাসীই পাগল বেশি। অর্থাৎ সংসারী সন্ন্যাসীর মতো সন্ন্যাসীই নেই। কিন্তু সংসারী বলতে আমরা যেমন বুঝি ঠাকুরের ঈপ্সিত সংসারীর সঙ্গে তার তফাত আছে। একজন পরিপূর্ণ মানুষের মধ্যে প্রকৃতিদত্ত সব রকম সুরক্ষা কবচ দেওয়া আছে। আছে মেধা, অনুভূতি, কল্পনা, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বোধ, দয়া, মায়া, প্রেম। কিন্তু মানুষ তার এই

ঐশ্বর্যকে কাজে লাগাতে পারে কমই। তার ওপর ভুল বিয়ের দোষে সন্তানের অনেক প্রকৃতিদত্ত ক্ষমতা বা শক্তি বিকশিত হতে পারে না। ঠাকুর চাইতেন, একেবারে গোড়া থেকে অর্থাৎ সন্তানের জন্মেরও আগে থেকে আমূল সংস্কার। তার জন্যই বিয়ের ব্যাপারে সর্বাগ্রে সর্তক হওয়া প্রয়োজন। বিবাহ যদি বিধিসম্মত না হয় তাহলে সুসন্তান আসবে না। সুসন্তান সুবিবাহের ফলেই সম্ভব। ঠাকুরের এই সর্বাত্মক যুক্তিসিদ্ধ নিদানটির গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নাতীত। কিন্তু এখানকার প্রগতিপন্থী, আবেগতাড়িত মানুষ সমাজ সত্যের গভীরে যেতে নারাজ।

তারা বাইরে থেকে ওপরসা ওপরসা বিচারে মানুষের মধ্যে কোথাও ভেদাভেদ নেই, বর্ণাশ্রম একটা কুসংস্কার এবং প্রেমই মুখ্য নির্ণায়ক ইত্যাদি মতবাদের প্রবল সমর্থক হয়ে উঠেছে। ফলে মিথ্যা বিবাহে যথেচ্ছাচার ঠেকানো অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিবাহের এই নৈরাজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা একমাত্র ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রই দৃঢ়তার সঙ্গে করেছেন, আর কোনও ধর্মীয় পুরুষদের মধ্যে এই প্রবণতা দেখা যায়নি। ঠাকুরের একক কণ্ঠস্বর একদিন না একদিন সমগ্র বিশ্বেই শ্রুত হবে বলে আমার বিশ্বাস। কারণ বিবাহের নৈরাজ্যই মনুষ্যত্বের বুনিয়াদকে নড়বড়ে করে দেবে এবং তখন মানুষ সংশোধনের জন্য ঠাকুরের নেতৃত্বে ঘুরে দাঁড়াবে। নরনারীর মধ্যে প্রেম-প্রণয় নিষিদ্ধ করতে হবে, এমন নয়। কারণ প্রাকৃতিক কারণেই ঋজি ও ঋচির মধ্যে আকর্ষণ থাকবেই। কিন্তু আজকাল নরনারীর প্রেম এত অগভীর ও পলকা যে, সহজেই, সামান্য কারণেই তা ভেঙে যায়। ঠাকুর বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রবল বিরোধী ছিলেন। প্রতিলোম বা অশাস্ত্রীয় বিয়ে হলে অন্য কথা। কিন্তু বর্ণাযুগ বিয়ের বিচ্ছেদ সমাজের ভিত আলগা করে দেয়। বিবাহ মানে শুধু রোমান্স বা যৌনতা তো নয়, তা এক নির্মাণ।

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের যে মিলগুলো দেখতে পাই তা সামান্যই। শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃতের উদ্দিষ্ট শ্রোতারা মোটামুটি সাধু-সজ্জন এবং উচ্চবর্গের শিক্ষিত শিষ্যরা, আধ্যাত্ম জগতে কিছু অগ্রগমন না ঘটলে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনমার্গের কূট কথাগুলি বোঝা কঠিন। শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের কিন্তু তা নয়। তাঁর বাণীগ্রন্থগুলি অতীব কঠিন ঠিকই, কিন্তু সাধারণ, শিক্ষাহীন, গড়পড়তা মস্তিষ্কের মানুষের জন্য তাঁর বিপুল অনুশাসন বাণী দেওয়া আছে। যেমন অভিনব, তেমনই সহজ ও সুবোধ্য। তবে উচ্চমার্গের দার্শনিক চিন্তনের প্রকাশ যেখানে, সেখানে ভাষার জটিল বিন্যাস ও প্রকাশ ভঙ্গির কাঠিন্য রয়েছে। আমার মনে হয় রামকৃষ্ণ বা অনুকূলচন্দ্রের তুলনা সম্ভব নয়, কারণ, দুজনে দুটি ভিন্ন যুগের প্রতীক। কিন্তু মূলে যে তাঁরা একই তাও বোঝা যায় তাঁদের অনুশাসনবাদের সারাৎসার হৃদয়ঙ্গম করলে।

কিন্তু ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা করতেন, আমি যদিও আমার মায়ের কাছে রামকৃষ্ণের কথা শুনে বড় হয়েছি এবং যৌবনকালে তাঁর জীবনী নিয়ে করা ছবি বা থিয়েটার দেখেছি, কিন্তু মধ্যযৌবনে আমার যুক্তিবাদ প্রবল হওয়ায় সেই শ্রদ্ধাটা হারিয়ে গিয়েছিল। আসলে ধর্ম, ঈশ্বর কিছুই মানতাম না। ঠাকুরের কাছে আশ্রয় পাওয়ার পরই আমি শ্রীরামকৃষ্ণের মহিমা কিছুটা উপলব্ধি করি ঠাকুরের কথা থেকে, প্রাসঙ্গিক আলোচনায় ঠাকুর বহুবার রামকৃষ্ণদেবের কথা উল্লেখ করতেন। তাঁর জীবনদর্শনের ব্যাখ্যাও করতেন। আমার তো মনে হয় রামকৃষ্ণদেবকে এত গভীরভাবে ঠাকুরের মতো কম লোকই বুঝেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের চেয়ে মা সারদার প্রতি আমার ভক্তি কিছু কম নয়, মা সারদার মধ্যে আমি যেন আমার মায়েরই ছাপ দেখতে পাই। ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র মা সারদা সম্পর্কে কিছু বলেছেন কিনা তা আমার জানা নেই, কিন্তু এই অপার ব্যক্তিত্বশালিনী মহিলার ছবি বা মূর্তি দেখলেই আমার মাথা নত হয়ে আসে।

শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রকে নিয়েই আমার জীবনের যত পরীক্ষা নিরীক্ষা। আজও তাঁর সঙ্গে নিত্যদিন আমার নানা রকম সমঝোতা করে চলতে হয়। তাঁর অনুশাসন সর্বদা মেনে চলতে পারি না, আলস্য, 'গো বিটুইন' এবং নানা অভিভূতি চলে আসে। নাম ধ্যান ঠিক মতো হয় না, তাই তাঁর সঙ্গে আমার নিত্য অবনিবনা বড় কম হয় না। আবার সম রকম অবনিবনা নিয়েই তাঁকে শেষ আশ্রয় আঁকড়ে ধরেও থাকি। তার কারণ আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি এবং চোখে ঠাকুরের অনুশাসন ও জীবনবাদের অবিসংবাদী কার্যকারণ আমরা

ধরতে পারি না। অবনিবনার কারণ সেটাই। আবার যখন জীবনের কোনও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার ভিতর দিয়ে তাঁর বাণীর অলঙ্ঘ্য সত্য উদ্ভাসিত হয় তখন বুঝতে পারি তিনিই পরম পুরুষ। ঠাকুরের সঙ্গে আমার নিত্য এই বোঝাপড়া হয়েই চলেছে। ভক্ত যখন পরম ভক্তি ও বিশ্বাসে উত্তীর্ণ হয় তখন আর তার মনে সন্দেহের বা সংশয়ের কোনও কাঁটা থাকে না, দ্বিধা বা দ্বন্দ্বও থাকে না। সেই উত্তরণের জন্যই আমাদের অপেক্ষা এবং তপস্যা। ঠাকুর চাইতেন আমরা যাতে কর্তা না সেজে কর্তৃত্বের ভার তাঁর হাতেই ছেড়ে দিই। কর্তা সাজতে গেলেই বিপদ। আমরা জ্ঞান-প্রজ্ঞার তেমন অধিকারী নই বলে প্রায়ই সিদ্ধান্ত ভুল হয়। ভুল পথে চলতে থাকি। ভুলভাবে জীবন যাপন করি। একমাত্র প্রেরিত পুরুষের অনুশাসনই আমাদের এই প্রমাদপরায়ণতা থেকে রক্ষা করতে পারে।

আমার জীবনের এক সংকটকাল বা সন্ধি সময় হল ১৯৬৭-৬৮ সাল। সেই সময়ে জীবনে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। খুব দুশ্চিন্তা উদ্বেগে দিন কাটছিল। পরিস্থিতি এমন, যা আমার নিয়ন্ত্রণে নেই। এমন বোধ বুদ্ধি বা বিদ্যা নেই যে সঠিক সিদ্ধান্ত সাহসের সঙ্গে নিতে পারি। তাই তখন সব উপেক্ষা করে একমাত্র ঠাকুরের ওপরেই নির্ভর করে থাকতে হল। তা বলে দোলাচল বা দ্বিধা ছিল না এমনও নয়। আর সে সময়ে আমার সাহিত্য-জীবনেরও এক সন্ধিক্ষণ। ফলে প্রবল উৎকণ্ঠা আর উদ্বেগের মধ্যে একমাত্র নির্ভরতার অবলম্বন ছিলেন ঠাকুর। এই সংকট চলেছিল বৎসরাধিক। এই দীর্ঘ সময় ঠাকুরের সৎনাম, তাঁর স্মরণ-মনন আর ধ্যানই ছিল আমার সেই তরঙ্গ সংকুল সময়কে অতিক্রম করার একমাত্র উপায়। আর সেই সময়ে দেখেছি ঠাকুরের সজবছল দয়া কিভাবে বারবার আমার বেপথু জীবনতরীকে সঠিক অধিগমনে পরিচালিত করেছে।

চল্লিশ বছরের ওপর ঠাকুরের পথে চলার যে চেষ্টা করেছি তাতে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে বটে। কিন্তু জীবন ও জগৎ সম্পর্কে একটা বাস্তব ধারণাও তৈরি হয়েছে। ওই যে ঠাকুর বলেছেন, সূক্ষ্ম-সার্থক, বিভেদ বিচার, সকল অনুভব। ক্ষিপ্র চিন্তা স্মৃতি কর্ম ধ্যানেরই বিভব। অতটা না হলেও সামান্য কিছু অর্জন যা হয়েছে সেটাই আমাকে রক্ষা কবচের মতো ঘিরে রয়েছে। এটা টের পাই, সোজা সাপটা কথা হল, আমি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করার জন্য বা ঈশ্বর দর্শনের জন্য তো খুব ব্যাগ্র ছিলাম না। নিজের মানসিক সংকটে ঠাকুরের দ্বারস্থ হয়েছিলাম। এই জীবন-যাপন যাতে দুর্বিষহ হয়ে না ওঠে। আমার নিয়ন্ত্রণের কার্যকারণ যাতে আমার জীবনকে বিপর্যস্ত করতে না পারে, তার জন্যই একজন শক্তিমানের আশ্রয় চেয়েছিলাম। সেই শক্তিমানকে নতজানু হয়ে বরণ করেছি মাত্র, আধ্যাত্মিক উন্নতি নিয়ে মাথা ঘামাইনি। কিন্তু খুব চেষ্টা করেছি আমার জীবন-চর্যার সঙ্গে ঠাকুরকে যথাসম্ভব মিশিয়ে নিতে, তাতে ঠকিনি। ঠাকুর এতই দয়াবান যে, খুঁতো ভক্তকেও সতত রক্ষা করেন। অন্যমনস্কতা এবং স্লো রিফ্লেক্সের জন্য আমাকে প্রায় সময়েই নানারকম গোলমালে পড়ে যেতে হয়। তখন আমার একমাত্র উপায় থাকে নাম আর ঠাকুর, যিনি স্বয়ং নামের ফলিত রূপ। ওই নামই বুদ্ধি ও উপায় যোগায়।

দীক্ষার প্রকৃত অর্থ দক্ষতা অর্জন। ঠাকুর এই দক্ষতার পথটিই আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন, কে কোন বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করবে তা নির্ভর করে তার জন্মগত, বর্ণগত বৈশিষ্ট্যের ওপর। কিন্তু দক্ষতা অর্জনের জন্য আড়ে হাতে লাগতে হবে। আর মনে রাখতে হবে আমাদের সব কর্মই যেন ইষ্ট বা মঙ্গলমুখী হয়।

আমাদের মেধা বুদ্ধি দৃষ্টি ও শ্রবণের যতেক ভ্রান্তি আছে সেগুলিকে দূর করে দেয়। শুভবুদ্ধির উদ্বোধন হয়। নাম করতে করতে চলাফেরা করলে দেখা যায় একটা নিরাপত্তার ঘেরাটোপ সর্বদাই ভক্তকে ঘিরে রাখে। আর নাম করা মানে হল ঠাকুরের সঙ্গ করা, সঙ্গে থাকা।

আমার ঠাকুর ধরা জীবনের অভিজ্ঞতা যেমন মধুর তেমনই চমপ্রদ। অবিশ্বাসী, নাস্তিক ছিলাম বলেই বোধহয় ঠাকুরের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর সব ঘটনাই আমাকে চিন্তিত ও স্তম্ভিত করেছে। এসবকে অলৌকিক আখ্যা দিলে ভুল হবে বরং বলা যায় ভক্তের প্রতি তাঁর অফুরান ভালবাসাই যেন জীবনের নানা দুর্যোগের মেঘকে কাটিয়ে দিয়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের 'সত্যানুসরণ' বইটির কথা অনেকেই জানেন। এই সত্যানুসরণ ঠাকুরের কোন বয়সে লেখা এবং কত দিনে তা নিয়ে বিতর্ক আছে। বিতর্ক ঠাকুরের জীবনী নিয়েও বড় কম নেই। কালানুক্রমে তাঁর জীবনের ঘটনা পঞ্জী সাজানো যায়নি। যাই হোক সত্যানুসরণ রচনার কাল যদি নির্ণয় করা নাও যায় তাতে অসুবিধে খুব বেশি নয়, কিন্তু মুশকিল হল পাঠভেদ। আমরা তিন চার রকমের পাঠে সত্যানুসরণ নানা উপদেশ যুক্ত হয়েছে। আমি সব কটি সংস্করণই বারংবার পড়েছি। আমার মনে হয়েছে যে-কোনও সংস্করণের সত্যানুকরণই আমাদের পথ দেখাতে পারে, কিন্তু ঠাকুর কেন এই পরিবর্তন বা সংশোধন করেছিলেন সে বিষয়ে প্রায় কিছুই জানা যায় না। ঠাকুরের জীবন কাহিনীর মতোই তা রহস্যাবৃত। শুনেছি সত্যানুসরণ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে ঠাকুর শেষ অবধি প্রথম মুদ্রণটিকে অনুমোদন করেন, কিন্তু সেটি লভ্য না হওয়ায় দ্বিতীয় মুদ্রণটিকে অনুমোদন করেন। সেই সত্যানুসরণটি যেমন প্রচলিত আছে তেমনি আর একটি পাঠান্তর যুক্ত সংস্করণও গিধনী এবং হিমায়েতপুরে প্রচলিত রয়েছে। এই পাঠান্তরে অবশ্য তেমন কেনও বৈপরীত্য নেই, কিছু সংযোজন আছে, এবং এই সংযোজন শ্রীশ্রীঠাকুরের অনুশাসন অনুসারী, যথোপযুক্ত গবেষণা হলে এ বিষয়ে আরও তথ্য উদ্ঘাটিত হবে। কিন্তু গবেষণা কবে হবে সেটাই ভাবনার বিষয়।

আমার দীক্ষা হয়েছিল ১৯৬৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। ঠাকুরের নির্দেশে শ্রদ্ধেয় শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য আমাকে সৎনাম প্রদান করেন। প্রথম প্রথম নিত্য কর্ম করতে ভুলভাল হত। নিষ্ঠা ছিল না, বোর্ডিং-এ থাকতাম বলে সদাচার পালনও সম্ভব ছিল না। অনুশাসনগুলো মেনে চলার আগ্রহ বা আবেগও তৈরি হয়নি। কাজেই ভুলভাল হতই। কিন্তু যান্ত্রিকভাবে নাম করতাম খুব, আর ইষ্টভৃতি কখনও বন্ধ করিনি কিংবা পাঠাতেও কার্পণ্য করিনি। অবশ্য ইষ্টভৃতি বেশ কয়েকবার চুরি হয়েছে। দীক্ষার পর হঠাৎ করেই আমার জীবনে কিছু শুভ পরিবর্তনের সূচনা হল। যে এঁদো, অস্বাস্থ্যকর বোর্ডিং-এ নানা অখাদ্য খেয়ে থাকতাম সেই বোর্ডিং ছেড়ে দক্ষিণে অভিজাত পূর্ণ দাস রোডে অতি সুভদ্র তিন চারজন যুবকের তৈরি মেসবাড়িতে আমার আর মুকুল গুহর ঠাঁই হয়ে গেল। যে জঘন্য জায়গায় ছিলাম তার তুলনায় স্বর্গ। কাছেই গড়িয়াহাট, গোল পার্ক, লেক। আমার চাকরির স্থল স্কুলটিও কাছেই। দীক্ষার এক বছরের মধ্যেই পরিবর্তন ঘটতে লাগল। ১৯৬৭ সালের পুজোসংখ্যা 'দেশ'-এ আমার প্রথম উপন্যাস ঘুণপোকা বেরোয়, আর তার আগেই আমার ভাবী স্ত্রীরও আর্বিভাব ঘটে। দীক্ষার পরপরই আমার জীবন আমূল পাল্টে যায়। তবে অভাব কষ্ট ছিল, রোজগার ছিল নাম মাত্র। তার ওপর হিসেবী নই বলে অপচয়ও হয়ে যেত। শুধু এখনকার জীবনে একটাই অস্তিবাচক দিক ছিল আমার। তা হল ঠাকুরের প্রতি প্রগাঢ় এক ভালবাসা আর টান, তাতে হয়তো স্বার্থের গন্ধ ছিল, কৃতজ্ঞতা ছিল, তবু টানটাও তো মিথ্যে নয়।

ওই টানটুকুই যা ছিল আমার, ভক্তি-বিশ্বাস বা তপশ্চর্যা তো কিছুই ছিল না। যেমনকে তেমন জীবন যাপন করছি, মাঝে মাঝে ঠাকুরকে গিয়ে দেখে আসি আর ওইটুকু নিয়েই বুঁদ হয়ে থাকি। তখন এমন অবস্থা যে সারাদিন ঠাকুরের কথা ভাবতে ভাল লাগে। ঠাকুরের কথা বলতে আর শুনতে ভাল লাগে, অন্য প্রসঙ্গ তেমন আকর্ষণ করে না। রাত দুটো আড়াইটে পর্যন্ত জেগে থেকে আমরা চার পাঁচজন গুরুভাই ঠাকুর প্রসঙ্গ নিয়ে তুমুল আড্ডা দিই রোজ। ওই সময়টাই কিন্তু আমার আর্থিক দৈন্য ছিল সাঙ্ঘাতিক, হিসেবী না হওয়ায় আরও টানাটানিতে দিন কাটত। কিন্তু আনন্দের অবধি ছিল না। ১৯৬৭ সালে আমার প্রথম উপন্যাস বেরোলো শারদীয় 'দেশ' পত্রিকায়, বইটা শ্রীশ্রীঠাকুরকে উৎসর্গ করেছিলাম। বইটি প্রকাশের পর ঠাকুরকে নিবেদন করতে দেওঘরে গেছি। দুরুদুরু বক্ষে সসঙ্কোচে বই নিয়ে ঠাকুরের পার্লারে গিয়ে প্রণাম করে যখন নিবেদন করলাম তখন ঠাকুর মৃদু ঘাড় নাড়লেন, হয়তো ওইটুকু তাঁর গ্রহণ। বইটি তিনি আর একজন ভক্তের হাতে দিতে বললেন, দিলাম। তখনও ওই ভক্তের সঙ্গে পরিচয় হয়নি, পরে হয়েছিল। তিনি কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ঠাকুর নিজে হাতে বইটি নেননি বলে আমার মনটা একটু খারাপ হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু আমার মন বলেছিল ঠাকুর যা করেন তা কল্যাণের জন্যই করেন। তাঁর সব আচরণের মধ্যেই সুদূর

প্রসারী কোনও মাঙ্গলিক কারণ থাকেই। নিজের হাতে না নিয়ে তিনি হয়তো আমার মঙ্গলই করতে চেয়েছিলেন।

ঠাকুরের আচার আচরণ বা সিদ্ধান্ত কিংবা আদেশ ইত্যাদির বিচার করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তার কারণ, তিনি পূর্বাপর ঘটনাশৃঙ্খলকে জানেন, আমরা তা জানি না। ফলে অনেক সময়ে ঠাকুরের অনেক সিদ্ধান্ত বা আচরণ আমাদের যুক্তিতে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তিনি যাকে যা বলতেন সে যদি তা বিনা প্রশ্নে সমাধা করত তাহলে তার মঙ্গল অবশ্যম্ভাবীই ছিল। কিন্তু মানুষ অনেক সময় নিজের বিচারবোধ প্রয়োগ করতে গিয়ে ঠাকুরের নির্দেশকে পাশ কাটায় এবং নানা দুর্বলতায় জড়িয়ে পড়ে। যাঁরা পরম ভক্ত বলে প্রতীয়মান হতেন তাঁদের কয়েকজনের ক্ষেত্রে এরকমই ঘটেছে।

আমার প্রথম বই ঘুণপোকা ঠাকুরকে উৎসর্গ করায় অনেকেই প্রশ্ন করেছিল। মা-বাবাকে উৎসর্গ না করে কেন ঠাকুরকেই করা হল। আমি বলেছি, আমার মা-বাবা তখন খুব বৃদ্ধ ছিলেন না। বাবা হয়তো ষাটের কাছাকাছি, মা মধ্য পঞ্চাশ, কিন্তু ঠাকুরের বয়স তখন আশি। কাজেই ঠাকুর দেহে বিরাজমান থাকাকালীন তাঁকে আমার ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার স্মারক হিসেবে আমি ওই সামান্য নিবেদনটুকু করতে চেয়েছি। তাঁকে তো আর কিছুই দেওয়া হয়নি আমার।

শুধু বলি, নানা ঘাত প্রতিঘাত পেরিয়ে ঘূণপোকা উপন্যাসটি গত পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে বিক্রি হয়ে আসছে। ঠাকুরের স্নেহকণা হয়তো বা বইটির সঙ্গে রয়েছে। আজ খুব নিবিষ্টভাবে যদি ভাবি তাহলে হয়তো বুঝতে পারব যে, ঠাকুর আমাকে যা দিয়েছেন তা সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি নয়। তার চেয়ে ঢের বেশি কিছু। তিনি দিয়েছেন একটা জাগরণ। আমাদের সত্তার অনেকটাই তো ঘুমিয়ে থাকে। তাই চোখ থাকতেও আমাদের সঠিক পর্যবেক্ষণ নেই, কান থাকতেও সূক্ষ্ম শ্রবণ নেই, বাক থাকতেও নেই সঠিক বাক্যের সময়োচিত প্রয়োগ। তাই আমরা একধরনের প্রতিবন্ধীই। বুদ্ধি, বোধ, বিবেচনা, সিদ্ধান্ত সব কিছুতেই কত ভুলভাল নিয়ত হয়। ঠাকুরকে আঁকড়ে থাকলে, নামধ্যান চললে আস্তে আস্তে এইসব প্রতিবন্ধকতা কাটতে থাকে, আর খুলে যায় অনুভূতির জগৎ।

সুক্ষ্ম অনুভব না থাকলে এই ব্যক্ত জীবনের ভাঁজে ভাঁজে যে যত কিছু আছে তা টের পাওয়া যায় না। কত সূক্ষ্ম সৌন্দর্য, কত বর্ণ, কত মিহি শব্দ, পতঙ্গ ও পিঁপড়ের জগৎ! সূক্ষ্ম অনুভূতি থাকলে একজন অচেনা মানুষকে দেখলেও কত কী বলে দেওয়া যায় তার সম্পর্কে।

ঠাকুরের মধ্যে এই অপার্থিব ব্যাপারটি দেখেছি। তাঁর জাগ্রত চৈতন্যে সব কিছুরই ছায়াপাত ঘটত। কত কী টের পেতেন। সীমাহীন ওই প্রজ্ঞা আর অনুভূতির আধার ছিলেন তিনি। কী অপরূপ যুক্তিপরম্পরা ছিল তাঁর কথায়, একটি দুটি বাক্যে কত কঠিন বিষয়কে জলের মতো সহজ করে দিতে পারতেন। অনেক সময়ে ভাববার চেষ্টা করেছি। ঠাকুর কিভাবে এই জগৎটাকে অবলোকন করেন, জগৎটা তাঁর কাছে কেমন প্রতিভাত হয়, তিনি কি মহাজগতের শেষ দেখতে পান? কিন্তু ভাবতে গিয়ে কূলকিনারা পাইনি কখনও, কিন্তু টের পেয়েছি, তিনি আমাকে ভেদ করে আমার অন্তর্জগৎকে দেখতে পান।

কিভাবে পান? ঠাকুর বলতেন, আমার প্রতি তোমার ভালোবাসাই আমাকে তোমার অন্তর্যামি করেছে। ওই ভালোবাসাই তাঁর আয়ুধ, ওইটেই তাঁর প্রকরণ। এক অফুরাণ প্রেমেরই মূর্ত রূপ হলেন ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র। নামময়, প্রেমময়, অনুভূতিময় বেত্তা পুরুষ।

আমি কেরানি না লেদমেশিন চালাই, আমি ভাবুক না বস্তুবাদী, ধূর্ত না বুদ্ধিমান, আমার মতলব ভাল না খারাপ এটা বুঝে নিতে তাঁর লহমাও লাগত না। একজন বুদ্ধিজীবী মানুষ একবার আমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলেন আশ্রমে। তাঁরা শুনেছিলেন যে, ঠাকুর হিপনোটিজম জানেন। সুতরাং তাঁর স্ত্রী তাঁকে ঠাকুরের চোখের দিকে তাকাতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। সেই বুদ্ধিজীবীকে যখন ঠাকুরের পার্লারে নিয়ে যাওয়া হল ঠাকুর সেই যে মুখ ফিরিয়ে নিলেন, একবারও সেই ভদ্রলোকের দিকে ফিরেও তাকালেন না। বুদ্ধিজীবীর সঙ্গী সাথীরা একটু অপমান বোধ করলেন, পরে ক্ষোভও প্রকাশ করেছিলেন। পরে আমি ব্যাপারটি বুদ্ধিজীবী ভদ্রলোকের ঘনিষ্ঠ

একজনের কাছে জানতে পারি যে তিনি ঠাকুরের কাছে গিয়েছিলেন একটা বিতৃষ্ণা আর ভয় নিয়ে, পাছে সম্মোহিত হয়ে পড়েন।

ঠাকুরের মহিমা তাঁর অসাধারণ অতিলৌকিক শক্তি, অন্তর্ভেদী দৃষ্টি টের পেতে আমার এক লহমাও লাগেনি, কিন্তু তাঁর দর্শন ও অনুশাসন বুঝতে সময় লেগেছে। এখনও কত কী জানবার ও বুঝবার আছে। কিন্তু আমার মধ্যে একটা ঝিমুনো স্বভাব আছে। নিজেকে কর্ম তৎপর করে তুলতে পারি না। অনেক সময়ে আলস্য ভেজা কম্বলের মতো চেপে ধরে। নামধ্যানে বিরতি যায়। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতাবলে এই জ্ঞানটুকু হয়েছে যে, ঠাকুর আমাকে আমার চেয়েও অনেক বেশি চেনেন, অনেক বেশি গভীরভাবে জানেন। আর তাই মাঝে মাঝে এমন সংকটে ঠেলে দেন যখন আমি প্রাণের ভয়ে পরিত্রাহি নামধ্যান করি। সম্ভবত, ওইভাবেই কিছুটা ক্ষতিপূরণ হয়।

আমার মতো আলাভোলা, আনমনা, বেহিসেবী এবং অপদার্থ মানুষ যে আজও পৃথিবীতে বেঁচেবর্তে আছে এটাই তো তাঁর অপরিসীম দয়া বলে আমার মনে হয়। ঠাকুর না থাকলে আমার কী তীব্র দুর্দশা হত তা ভাবতেও আমি আতঙ্কিত হই। প্রতি কাজেই আমাকে তাঁর ওপর নির্ভর করে চলতে হয়। আমার সব কাজেই তিনি একটু না একটু থাকেনই। আমি জানি এটা ভক্তি নয়। দুর্বল মানুষের অসহায় অবলম্বন, কিন্তু ওইভাবেই তো আমি ঠাকুরকে পেয়েছি। আমার পরম মুশকিল আসান হিসেবে, আমার দুঃখ-বেদনা-নিঃসঙ্গতা-অবসাদের সূত্র ধরেই তাঁর সকাশে আমার যাওয়া। নইলে কি আর যেতাম?

# সাধারণ মানুষ

Go between বা দ্বন্দ্বীবৃত্তি—অর্থাৎ কথা দিয়ে তা না রাখা বা সময়মতো হাতের কাজটি সেরে না ফেলা বা আলস্যবশত সময় ও সুযোগের সদ্ব্যবহার না করা বা সহজ কথায় মানসিক জড়তা যে মানুষের পক্ষে কতটা ক্ষতিকারক তা আমার মতো হাড়ে হাড়ে কম লোকই জানে। তার কারণ, আমি নিজে এই দোষে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। আর ঠাকুরের আশ্রয় না পেলে এই একটি দোষেই বোধহয় এতদিনে আমাকে শেয়ালে শকুনে ছিঁড়ে খেত। কেন ঠাকুর দ্বন্দ্বীবৃত্তিকে এতটা আপছন্দ করতেন, কেন এই অপরাধকে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্বের সঙ্গে খারিজ করতে চাইতেন তা প্রতি মুহূর্তেই আমরা টের পাই বটে, কিন্তু এর থেকে পবিত্রাণ লাভের জন্য যতটা উদ্যোগ বা মনোবলের সাহায্য নেওয়া উচিত তা হয় আমাদের নেই কিংবা ইচ্ছে করেই নিই না। ইচ্ছাশক্তি এক মস্ত বড় শক্তি। এর দ্বারা অনেক অঘটনই ঘটিয়ে ফেলা যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমরা এই শক্তিকে নিতান্তই তুচ্ছজ্ঞানে উপেক্ষা করি। আমরা জীবনে টাকা পয়সা, গাড়ি-বাড়ি, সন্তান, সুখ-শান্তি অনেক কিছুই চাই বটে, কিন্তু নিরাময়লাভ, যোগ্যতর হয়ে ওঠা, শুচি হয়ে ওঠা এইসব চাহিদা আমাদের একরকম নেই বললেই চলে।

একবার চব্বিশ পরগণার একটি ছোটো শহরে ঠাকুরের জন্মোৎসবে এক বক্তার ভাষণ শুনছিলাম। তিনি বিদগ্ধ ব্যাক্তি। মানুষের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে ঠাকুরের দেওয়া দর্শনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা অনেকক্ষণ ধরে করেছিলেন। দীর্ঘ দু ঘণ্টা ধরে বলেও তিনি পুরো ব্যাপারটা কেমন যেন সাপটে উঠতে পারছিলেন না। আমি শুনতে শুনতে একটু ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছিলাম এবং সামান্য উত্তেজিতও হয়েছিলাম। তাঁর পরে যখন আমার পালা এল তখন আমি অভদ্রের মতো বলে ফেলেছিলাম যে ঠাকুরকে ধরে আমার সমস্যা বরং আরো বেড়ে গেছে। যতদিন অন্যায় বা দোষঘাটকে সঠিক চিনতাম না, বর্ণাশ্রম বা বিবাহ নিয়ে মাথা ঘামাতাম না, আমিষ নিরামিষের বালাই বা বাছাবাছি ছিল না ততদিন বেশ একরকম ছিলাম। এগুলো মাথা চাড়া দিল ঠাকুরকে ধরার পরই। আর তাতে ঠক্কর বাড়ল, মানসিক দ্বিধা দ্বন্দ্ব এল, শুরু হল অভ্যন্তরীণ লড়াই। তাতে সমস্যা বাড়ল বৈ কমল না তো! আমার বক্তব্য ছিল, ঠাকুরের দেওয়া সমাধান কতটা যুক্তিযুক্ত তা জীবনে বা কার্যকরভাবে করে না বুঝলে কথাগুলো আমাদের মুখে শোনাবে মুখস্থ বিদ্যের মতো। তাতে না আছে নিজের উপকার, না পরের।

আজ বুঝতে পারি, সেই শ্রদ্ধেয় বক্তাকে সর্ব্বসমক্ষে ওরকম আক্রমণ করা আমার উচিত কাজ হয়নি। ঠাকুরের কথা বলতে হবে বলেই তিনি বলেছেন, তাঁর দোষ কী? আর মুখস্থ বিদ্যা উগরে দেওয়া ছাড়া অনেক সময়ে আমাদের উপায়ও থাকে না।

সুখের বিষয়, মাঝে মাঝে আমাকে বক্তৃতা দিতে মঞ্চে দাঁড়াতে হলেও মুলতঃ আমি বক্তা নই। ঠাকুর সম্পর্কে আমার যেটুকু বুঝ তা সামান্য একজন চাষাভুষো বা গ্রাম্য মানুষের মতোই। সোজা কথায় আমি বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে ঠাকুরকে বুঝতে যাইও না, চাইও না। সাধারণ মানুষদের সমস্যা কণ্টকিত জীবন অত্যন্ত ছোটো মাপের। সেখানে বড় কথা ঢুকতেই পারে না। তাদের বুদ্ধিবৃত্তি চিদবৃত্তি সবই সংকীর্ণ গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ। তারা পৃথিবীর সমস্যা, অ্যাটম বোমা, বিশ্ব শান্তি নিয়ে মাথা ঘামায় না, বড় বড় বক্তার বিস্তারিত ভাষণ তারা চিত্রার্পিত হয়ে বসে শোনে বটে, কিন্তু ফিরে যায় ঘোলাটে মাথা নিয়ে। বক্তৃতার মধ্যে তারা নিজেকে খুঁজে পায় না। কিন্তু 'ঠাকুরের কথা শুনছি, পূণ্য হচ্ছে,' এ ধরনের একটা মনোভাব তাদের আছে বলেই শোনে।

কিন্তু এমন যদি হত যে, বক্তৃতার ভিতরে সে নিজেকে আবিষ্কার করতে পারত, ধরতে পারত তার দোষক্রুটি, তার সামান্য সব ভূল-ভ্রান্তি, তাহলে কিন্তু তারও উপকার হত, হত গোটা সমাজেরও। কারণ এই সাধারণ মানুষই সমাজে সর্ব্বাধিক।

ঠাকুর একদিক দিয়ে যেমন সহজ, অন্যদিক দিয়ে আবার তেমনই কঠিন ও জটিল। তাঁর সমগ্র দর্শনকে সম্যকভাবে বুঝবার মতো মেধা বা বোধ এবং গ্রহণক্ষমতা আমাদের নেই। কিন্তু তাঁর সহজ মানুষের জন্য সহজ কথা বুঝতে কোনও অসুবিধে নেই। আর তার চেয়েও বড় কথা, ঠাকুর শুধু বুঝবার বা শুনবার জন্য নয়। ঠাকুরকে তখনই প্রগাঢ়ভাবে বোঝা যায় যখন তাঁর কথাগুলো কাজের ভিতর দিয়ে জীবনে প্রতিফলিত করতে চেষ্টা করি আমরা।

ঠাকুরের কাছে ধর্ম যে ফলিত ধর্ম সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ধর্মাচরণের জন্য আলাদা বা বাড়তি প্রয়াস, ধর্মের নামে দৈনন্দিন জীবন থেকে আলাদা কোনও আচরণ তিনি বুঝতেন না। ধর্মাচরণ মানে সারাদিন ধরে মানুষ যা যা করে, এমন কি তার নিতান্ত ব্যক্তিগত জীবন বা চিন্তা ভাবনার জগৎও এর বাইরে নয়। ধর্ম যদি একজন মানুষকে সর্ব্বতোভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে তবে জীবন ধারণে দুই উদ্দেশ্য—অস্তি ও বৃদ্ধি—ব্যর্থ হয়ে যায়। ধর্ম যদি ফলিত ধর্মই না হয়, যদি কেবল বুঝ ও বোধের জগতেই নির্বাসিত থাকে, অথচ যদি তা কিন্তু গোঁড়ামি ও সংস্কারেই পর্যবসিত হয় তাহলে তা দিয়ে আমাদের কোনও লাভ নেই। ধর্ম আমাদের দক্ষ, যোগ্য, চালাক চতুর, ছমছমে করে তোলে। ধর্ম দিয়েই অভাবকে তাড়ানো যায়, বহু মানুষের মৈত্রী ও বন্ধুত্ব লাভ করা যায়, ধর্ম দিয়েই জয় করা যায় শত্রুকে। সব চেয়ে বড় কথা ঠাকুরের ফলিত ধর্মের চর্চা যে মানুষ নিজের জীবনে সক্রিয়ভাবে অনুষ্ঠিত করে তার অভ্যন্তরের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব রাগ লোভ সবই ক্রমে ক্রমে তার বশ মানতে থাকে।

এটা কিভাবে হয় তা ব্যাখ্যা করা কঠিন বটে, কিন্তু নিজের জীবনেই বহুবার দেখেছি, একটা কিছু অন্যায় বা অন্যায্য কাজ করতে গেলে হঠাৎ তাঁর মুখ মনে পড়ে যায়। একটা দ্বিধা আসে, মনটা কিন্তু কিন্তু করতে থাকে। আগু-পিছু চিন্তা না করেই এতকাল যা খুশি তা করে এসেছি। হঠাৎ দীক্ষান্তে জীবনে ভিন্নতর বুদ্ধি বিবেচনা কাজ করতে শুরু করে, আর তাই যা খুশি তা আর করতে পারি না।

এটা হয় যদি তাঁর সম্পর্কে ভালোবাসার জমিটা একটু তৈরি হয়। ঠাকুরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক মোটামুটি স্বার্থের। আমরা কিছু না কিছু পাওয়ার জন্যই তাঁকে ধরি। ঠাকুরও এটা জানতেন। আর জানতেন বলেই প্রাপ্তির দরজা তিনি খুলেই রেখেছেন এন্তার। সাধারণ মানুষের চাহিদা কী এবং তাকে কতদূর যোগ্য ও দক্ষ করা যায় তা নিয়েই সারা জীবন ঠাকুর কত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। তাঁর সঙ্গে অধিকাংশ ভক্তেরই যে স্বার্থের সম্পর্ক সেটা মনে রেখেই তিনি ইষ্টভৃতি, যজন ও যাজন এই তিন স্তম্ভের ওপর তাঁর দর্শনকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। ইষ্টভৃতির ভিতর দিয়ে প্রতিদিনই মানুষের যা কাম্য সেই অর্থের একটা অংশ ইষ্টে

নিবেদিত হয়। প্রতিদিনই তাই একটু একটু করে ক্ষয় পেতে থাকে তার অর্থলোভ। যাজনের ভিতর দিয়ে অল্পে অল্পে সে বিস্তার লাভ করতে থাকে। একজন আত্মকেন্দ্রিক মানুষ হতে থাকে বহুকেন্দ্রিক। আর এই দুইকে সাহায্য করতেই দরকার হয় যজনের। যজন হল তাঁকে নিয়ে আপনার মনে এক দ্বৈত খেলা, তাঁকে নিজের সঙ্গে যোগ করে নেওয়া, নিজেকে তাঁর মধ্যে মিশিয়ে দেওয়ার অবিরল প্রায়াস। যা থেকে ছোটো-আমির অবলুপ্তি ঘটে, বড়-আমি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এই তিনের ভিতরে যা আছে তা-ই জগতের সারাৎসার। এই তিনের ভিতরেই আমাদের জীবনের সবকিছু।

কিন্তু হায়, এত বুঝেও আমাদের ভিতরে কিছুতেই সেই কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙতে চায় না। কয়েক হাজার বছরের জমাট আলস্য আর জড়তা সহজে কি কাটতে চায়?

ভরসা এই, ঠাকুর একদিন না একদিন জাগাবেনই। হয়তো অনেক গোলক ধাঁধায় ঘুরপাক খাওয়ার পর। আর কেউ যদি ঠাকুরের দয়ায় জেগে ওঠে, তাহলে সে তো লহমায় পৌঁছেই গেল অমৃতের দরজায়।

তোমার ধর্ম্ম যদি জীবের,
বিশেষতঃ মানুষের মুখে
একমুঠো অন্ন তুলে দিয়ে
বাঁচায় সমর্থ ক'রে
সেবায় যোগ্য করে তুলতে না পারলো—
সপারিপার্শ্বিক সে যাতে বাঁচতে পারে—
বাড়তে পারে—
এমনতর ক'রে—
তুমি কি মনে কর
তা তোমার কাছে জ্যান্ত?
—আর, তাতে তোমার সার্থকতাই বা,
কতটুকু?

**শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র**